অসীমান্তিক

বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত

তিন ধারার এক উৎস

অসীমান্তিক

বাংলা ছোট গল্প সংকলন

প্রধান সম্পাদক

হাসান আজিজুল হক

সম্পাদক

সাধন চট্টোপাধ্যায়

হারুন হাবীব

দুলাল ঘোষ

অক্ষর

আগবতলা ত্রিপুবা

প্রধান সম্পাদকের কথা

মাত্র একশ' বছরেব মধ্যে বাংলা ছোটো গল্প যে সমৃদ্ধি অর্জন কবেছে তা অকল্পনীয। ছোটো গল্প মাথা উঁচু কবে, বিশাল পতাকা উড়িযে বাজপথে হেঁটেছে যেমন, তেমনই বাধা পথ থেকে নেমে এসে ঢুকেছে জনজীবনেব নির্মম বাস্তবেব সমস্ত কুঠুবিতে — সেইজন্য তৈবী করে নিযেছে নতুন পথ, সরল, সিধে, আঁকাবাঁকা বা স্বপ্নিল সব পথ। আবছা গলিঘুঁজি বা দীপ্তিমান তীর্যক সড়ক। ভাষায শৈলীতে নির্মাণ কৌশলে বাংলাব ছোটো গল্প তুলনাবহিত কিংবা বলা যায পৃথিবীব যেকোনো ভাষাব সাফল্য উজ্জ্বল গল্পেব সঙ্গে তুলনীয।

যদি মনে বাখি, বাংলা ভাষায কথা বলে প্রায় বিশ কোটি মানুষ, যদি কল্পনা করে নিতে পাবি পশ্চিমেব সিংভূম মালভূমেব উচ্চভূমি থেকে পূর্বেব শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম বাঙ্গামাটি পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমিব বিশালতা, যদি উত্তবপূর্ব ভাবতেব ত্রিপুবা-আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলেব হিসেবটাও এর সঙ্গে যোগ কবতে পাবি, তাহলে বাংলা ভাষাব পশ্চাদভূমির বিশালত্ব আমাদের অবশ্যই অভিভূত করবে। এমন বিশাল বৈচিত্র্যেব পটভূমিতে এখন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনার যতবড় ছবি আঁকি না কেন, তাকে যথেষ্ট বড় বলে মনে হবে না এবং অতীতেব অর্জন যত গৌরবময় হোক-না, তা আমাদের প্রাপ্য ছিলও না এমন কথাও মনে হবে না। আব বর্তমানেব অমৃত সম্ভাবনার কথা বলা মোটেই স্তোকবাক্যে আত্মপ্রতাবণার সামিল হবে না। এ এক নিরেট বাস্তব যে বাংলাসাহিত্য ইতিমধ্যে যা অর্জন করেছে — রবীন্দ্রনাথেব উপস্থিতি সত্ত্বেও — তাব চেয়ে বহুগুণে বিস্তৃত বিচিত্র গভীব সমৃদ্ধি সৃজন কবা তার পক্ষে সম্ভব।

বলতে পাবি, আবেগে আক্ষেপে সংক্ষেপে আর্তনাদ কবে জানাতে পারি, কোন বিভাজন মেনে নেযা হবে না, কোন বিভাজনই প্রকৃত বিভাজন নয। কিন্তু সত্য হ'ল বিভাজন ঘটে গেছে। এখন বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গ ভাবত বাষ্ট্রেব অন্তর্ভুক্ত অঙ্গবাজ্য ; ত্রিপুবা আসামও তাই, তাবা পশ্চিমবঙ্গের অংশ নয। অসমীয়া ও বাংলাভাষী একটা অস্থিব ত্রিকোণেব মধ্যে আছে আর বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সার্বভৌম একটি বাষ্ট্র। সংস্কৃতি ও সাহিত্যেব ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বিভাজন কার্যকব নয় একথা ভাবালুতা-আশ্রয়ী খানিকটা সত্য হলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্য নয। অভ্যাসমাফিক আবেগমাখা

ঐক্যের কথা বলা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার ধরাছোঁয়া বাঁচিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের স্বতন্ত্র ইতিহাস সুরচিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। ১৯৪৭ সালে পৌঁছেই নিজের নিজের ঘর দেখা দিচ্ছে, আলাদা হয়ে যাচ্ছে হেঁসেল। বাংলাদেশ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের ধারাবাহিকতা মেনে নেয়, তারপর থেকে তার নিজের ইতিহাস শুরু করে। উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলাভাষা চর্চা বা সাহিত্য-ফসল আলাদা করে চোখে পড়েনি, যেন তার অস্তিত্বই নেই, যা বা যেটুকু আছে তা বুঝি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের সঙ্গে মিশে গেছে। পরিতাপ করি আর ক্ষোভ জানাই বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু এই রকম।

এই পরিস্থিতিতে, তিনভাগে খণ্ডিত সমগ্র বাংলাভাষী ছোটোগল্প নিয়ে 'অসীমান্তিক'। দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, বা বলা যায় অপ্রাপনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা। মানবজীবনের প্লাবন দিয়ে মানচিত্র ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা। কিন্তু একথা ঠিক, আধুনিক রাষ্ট্রের সীমানা সঙ্গীন উঁচিয়েই থাকে, দৃঢ় মজবুত এই পাঁচিল। অন্যদিকে রাজনীতির আত্মপরতাকেও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। এইসব বিভেদকে কৃত্রিম বলা গেলেও দেশ ও সমাজের তফাৎকে ঠিক উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি পশ্চিমবঙ্গে বা উত্তরপূর্ব ভারতে বা বাংলাদেশে একই বাংলাভাষার সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করে, ভাষার একটা মৌলিক একত্র এবং বাংলা ভাষা জগতের চিরচেনা স্ব-সাদৃশ্য সত্ত্বেও আর্থ-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাঠামোর ভিন্নতায় সেটাকেই স্বাভাবিক বলে গণ্য করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সাহিত্যের মধ্যে খুব বড়দাগের তফাৎ আছে বলে যারা মনে করেন এবং এই দুই দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পার্থক্যকেই এর কারণ হিসেবে নির্দেশ করতে চান, তাঁরা বোধহয় অনেক কার্যক্রম সূত্রের মধ্যে মাত্র একটি স্থূল সূত্রকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে চান। মিথ্যে নয় যে সাতচল্লিশের পর বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস এতই ভিন্ন একটা পথ ধরেছে যে এদেশের সাহিত্য বাস্তব কারণেই বিশাল বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে তার যোগসূত্রটিকে বজায় রাখতে পারেনি। ভাষাগত শিল্পগত উৎকর্ষের চাইতে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বিদ্রোহের সবল জোরালো উচ্চারণ এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে এরকম ভিন্নতার কথা তুললে বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্যের বহুবৃত্ত তৈরী করা যায়। বাংলাদেশেরই উত্তর দক্ষিণ অঞ্চলের সাহিত্যের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের পার্থক্য কি ইতিমধ্যেই খানিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ? ধর্ম, সংস্কৃতি অঞ্চল-প্রাধান্য, জীবন-বিন্যাসের তফাৎ, কথ্য ভাষার বিভিন্নতা — নানা কারণেই নানা স্বকীয়তা দেখা দিতে পারে ; তবু বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ একটা সাহিত্য আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারি। তাহলে বৃহত্তর ঐক্য-বন্ধনের মধ্যে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপূর্ব ভারতের এক বৃহৎ, বিশাল, মহৎ বাংলা সাহিত্যের কথা আমরা ভাবতে পারব না কেন ? তাতে তো আমরা হারাচ্ছি না কিছু বরং প্রাপ্তিই বাড়ছে, গরীব হচ্ছি না হচ্ছি ধনী। দিগন্ত চোখের সামনে দেয়াল তুলছে না, দিগন্ত বরং পিছিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। মন পাচ্ছে মুক্তি জুটছে পুষ্টি, সাহস ও শক্তি। এ তো বৃহৎ বিশ্ব অর্জনের মতই। এই সভ্যতাকে যেভাবে আমরা দেখছি, মানুষের যেকোন কৃতিত্বে সমস্ত মানবজাতি ভাগ বসাতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের তিন ভূ-খণ্ডের জন্য তিনজন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। নিজ নিজ অংশের গল্প গ্রহণ বর্জন তাঁরা স্বাধীনভাবেই করেছেন। এখানে তাদের নির্বাচনই চূড়ান্ত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পাদকগণ গল্প নির্বাচন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক সেরা বাংলা গল্প বাছাইয়ের চেষ্টা করেননি। বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত লেখকদের লেখা গল্প নেননি, এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অনেক বিখ্যাত লেখকের গল্পও গ্রহণ করেননি। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা গল্প বর্তমানে যেখানে পৌঁছেছে, তারই নমুনা তুলে ধরেছেন তিনি নতুন গল্পকারদের লেখা নিয়ে। ভাষায় ভঙ্গিতে বর্তমান গল্পের চেহারাটা তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশ পর্বের সম্পাদক তা করেন নি। তিনি চোখ রেখেছেন দু'দিকে। ৪৭ থেকে ৯৭ পর্যন্ত লিখিত বাংলার ছোটগল্পের ধারাবাহিকতা যেন বোঝা যায় এবং দ্বিতীয়, ভাল গল্প যেন গৃহীত হয়। দু'দিকে চোখ রেখেছেন বটে তবে ভাল লেখক বা ভাল গল্প যে বাদ পড়েনি -- কারণ যা-ই হোক এবং নানারকম

কারণেরই দেখা মিলতে পারে — তা নয় ; এই জন্য এই নির্বাচনকে সম্পূর্ণত ত্রুটিমুক্ত বলা যাবে না। সম্পাদক খুব কম সময় পেয়েছেন একথাও মনে রাখতে হবে। উত্তরপূর্ব ভারতের গল্প সম্বন্ধে আমি মন্তব্য করতে পারি না। সত্যিকথা এই যে, উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা গল্প সম্বন্ধে আলাদাভাবে কোন অবয়ব আমি এখনও গড়ে তুলতে পারিনি। আমার পাঠও খুবই কম।

আশা করি, এই সংকলন প্রকাশ থেকেই তার স্বাতন্ত্রতা প্রকাশ করার কাজ শুরু হবে। প্রকাশকের উদ্যোগকে অযুত সাধুবাদ জানাচ্ছি।

গল্পক্রম

বাংলাদেশ

পশ্চিমবঙ্গ

উত্তরপূর্ব ভারত

বাংলাদেশ পর্ব

বাংলাদেশের গল্প ঃ দু'চার কথা যা না বললেই নয়

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরা-আসামসহ উত্তরপূর্ব ভারতের লেখকদের গল্প নিয়ে সাম্প্রতিক ধারার একটি গদ্য সংকলন বেরোবে — আয়োজনটি জানবার পর থেকে বইটি হাতে পেতে উদগ্রীব ছিলাম আমি। পরবর্তী সময়ে প্রকাশকের অনুরোধে বাংলাদেশ পর্বটির সম্পাদনার ভার আমার হাতে এসে পড়ে অনেকটা কাকতালীয় ভাবে। কর্মটি বেশ ঝামেলার, বুঝতেই পাচ্ছিলাম। সে যাই হোক, গোটা বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের গদ্যচর্চার চেহারা, এবং একই বই-এর মলাটে, সত্যি বলতে কি, আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ এক উদ্যোগ মনে হয়েছে। এক ভাষাসংস্কৃতিকে, তার যৌথ ইতিহাস আর শাশ্বত সংস্কৃতিকে দেশ-প্রদেশের সীমান্ত দিয়ে ভাগ যে করা যায় না, বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত করা যায় না, সেই সত্য-উচ্চারণের সাথে আমার বিশ্বাসের সম্পর্ক। অতএব দায়িত্ব নিতে খুব একটা সংকোচ বোধ হয়নি।

বাংলাদেশের ছোটগল্পে, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা-উত্তরকালে, একটি তাৎপর্যময় পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত গল্প সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সমাজের প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গগুলি, ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তপাতের কাহিনীগুলি উঠে এসেছে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে, এমন কি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বিরূপ রাজনৈতিক আর সামাজিক পরিবেশেও গল্পকাররা পাকিস্তানি ধর্মাশ্রিত-শোষণের কথা বলেছেন, বাঙালির আত্ম-অহংকারের জয়গান গেয়েছেন এবং খেটে খাওয়া মানুষের আশা-নিরাশা এঁকেছেন। একই সাথে উঠে এসেছে মুক্তচিন্তার কথা, লড়াই আর লড়াকুদের জীবনবিশ্বাসের ঘটনাপ্রবাহ, হয়েছে ধর্মীয় মৌলবাদীদের স্বরূপ উদঘাটন -- যা ছিল সময়ের প্রাসঙ্গিক দাবি। ষাটের দশকে, সেদিনকার পশ্চিমপাকিস্তান-শাসিত পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তানে গল্প সাহিত্যে সমাজ সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে প্রভূতভাবে। এই সময়ে বিস্ময়কর কিছু ছোট গল্প লিখেছেন জীবনবাদী গল্পকারগণ — যাঁরা ছোটগল্পকে শুধুমাত্র কাহিনীতে সীমাবদ্ধ রাখেননি একই সাথে নানান পরীক্ষানিরীক্ষায় তাকে শুদ্ধতম শিল্পে রূপ দিয়েছেন। সত্তর দশকেও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আবেগ আরহ বর্তমান ছিল, এবং বলতে গেলে ভাষা ও শৈলীতে সেই কাজগুলির অনেগুলিই ছিল সাহিত্যের গর্ব। তবে আশির দশক থেকে আগের ধারার বিচ্ছিন্ন কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, নিজস্ব নতুন উচ্চারণের চেষ্টা হচ্ছে, যদিও এই সব তরুণদের বাগী কলমে এখনো পর্যন্ত নতুন আলাদা ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মোট কথা, ষাট-দশক থেকে আমাদের গল্পসাহিত্য ক্রমান্বয়েই নিরীক্ষাধর্মী ও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে, শৈলী এবং অন্তরে, এবং অনস্বীকার্যভাবে তা বিশ্ব ছোটগল্পের মানে তুল্য। তবে দুর্ভাগ্যটা হচ্ছে, বাংলাদেশের সাহিত্যকে বাইরের পৃথিবীতে জানাতে অনুবাদের অতি-প্রয়োজনীয় যে কাজটি সমাধা হওয়া দরকার ছিল— তা আজও পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যাঁরা সুপরিচিত— নবীন এবং প্রবীন মিলিয়ে — তাঁদের বেশির ভাগের একটি করে গল্প আমি রাখতে চেষ্টা করেছি এই সংকলনে। তবে সব লেখকের শ্রেষ্ঠ লেখাটি

বাছাই করেছি, এমন দাবীর সঙ্গত কারণ নেই। সব ক'টি গল্প লেখকের স্বনির্বাচিতও হয়নি। অবশ্য এগুলির বেশির ভাগই পাঠকনন্দিত, আলোচিত।

আমি এখানে প্রবীন এবং প্রয়াত সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং হাসান হাফিজুর রহমানের মতো লেখকের গল্প যেমন নির্বাচন করেছি, তেমনি অধুনা আলোচিত ওয়াসি আহমেদ, মণীশ রায় ও মনি হায়দারের মতো প্রতিশ্রুতিবান নবীনদেরও গ্রন্থিত করেছি। এ-ছাড়াও আছেন শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রাহাত খান, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রশীর আল হেলাল, রশীদ হায়দার, সেলিনা হোসেন, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, কায়েস আহমেদ, রাবেক আবদুল্লাহ্, মঞ্জু সরকার, সুশান্ত মজুমদার এবং ভাস্কর চৌধুরী। আমার নিজেরও একটি গল্প এই গ্রন্থে রয়েছে।

দুই বঙ্গের যৌথ কবিতা সংকলন পর্যাপ্ত না হলেও ইতিমধ্যে কয়েকটি বেরিয়েছে। এগুলো পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতাও পেয়েছে বেশ। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে এ ধরণের যৌথ কোনো প্রয়াস হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবু বলবো – যৌথ এই প্রয়াসগুলি এখনো অপর্যাপ্ত। এ ধরণের গ্রন্থ যত বেশি প্রকাশ পাবে পাঠক তত বেশী গোটা বাংলা সাহিত্যকে জানবার সুযোগ পাবে। আমাদের একথা স্বীকার করতে সংকোচ থাকা উচিত হবে না যে, বাংলা সাহিত্য মানে শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাহিত্য নয়, এবং যা কেবল পশ্চিমবঙ্গেরও নয়; বাংলা সাহিত্য মানে গোটা বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের সাহিত্য, যদিও তা দুই দেশের তিন অঞ্চলের সীমানায় বিস্তৃত। তথাকথিত ধর্মবাদীরা, বিভাজনের প্রবক্তারা মানুক না মানুক বাংলা ভাষাসাহিত্যের বিভক্তিকে মেনে নেয়া কোনো [illegible] পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গতও নয়।

দুই বঙ্গের বাইরেও বাংলাসাহিত্যের আরেকটি ভুবন আছে। আমাদের ভাষাসাহিত্যের তৃতীয় এই ভুবন ত্রিপুরা এবং আসাম-সহ বিস্তৃত উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল। এই ভুবন যেমন নতুন নয়, গৌনও তেমনি নয়, যদিও এর স্বীকৃতি এ যাবত খুব একটা মিলেনি। বাংলা ভাষাসাহিত্যের ব্যাপকতা আর বাস্তবতার স্বার্থেই একে মেনে নিতে হবে।

হারুন হাবীব
ঢাকা বাংলাদেশ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

মিলির হাতে স্টেনগান

'ওমা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস !'

এরপরও মিলি দাঁড়িয়ে রইলো। জানলা বন্ধ করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে তার ডান হাত জানলার বাঁদিকের পাল্লায় রাখা, আরেকটা হাত জানলার শিকে। দুটো হাতই ভিজে যাচ্ছে, পানির ঝাপ্টা এসে পড়ছে চুলে ও মুখে। সামনের রাস্তা, রাস্তার ওপাশে ল্যাম্পোস্ট ও তার পাশে ঝাঁপ-ফেলা পানের দোকান এবং গলির নালা ও পানির মিলিত গন্ধ এই কড়া, এই হালকা। স্পষ্ট শোনা যায় কেবল আব্বাস পাগলার ধমক। আকাশের দিকে তাকিয়ে আব্বাস পাগলা একনাগাড়ে চিৎকার করে, তার চিৎকার তেপান্তরের মাঠে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজের সঙ্গতে ডাকাতের-হাতে-পড়া পথিকের আর্তনাদের মতো কড়াৎ করে বাজে। মিলির মা মনোয়ারা হ্যাঁচকা টানে জানলা বন্ধ করে। জানলার পাশে বিছানায় বালিশ ভিজে গেছে, বালিশের অড় খুলে মনোয়ারা মশারি টাঙাবার দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। জানলার তাকে বি.এস. সি. ক্লাসের কেমিস্ট্রি বইয়ের ধুলোপড়া মলাটে পানির থ্যাতলানো ফোঁটা। হাল্কা নীল রঙের শাড়ির আঁচল দিয়ে বই মুছতে মুছতে মনোয়ারা বলে, 'কখন থেকে বলছি জানলা বন্ধ কর, জানলা বন্ধ কর! রানা আসুক, মজাটা বুঝবি!' মিলি খুব মনোযোগ দিয়ে আব্বাস পাগলার একটানা ধ্বনিকে শব্দে ভাগ করার চেষ্টা করে। রানাকে তার ভয় পাবার কিছু নাই, এইসব ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্যে রানার বয়েই গেলো!

ভেতরের বারান্দা থেকে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলো মিলির বড়ো ভাই, এরই নাম রানা। ঢুকেই বললো, 'চিরুনিটা দেখি।'

'টেবিলে দ্যাখো!'

ঘরের একমাত্র টেবিলে রাজ্যের জিনিস। এক পাশে ক্লাস এইটের বইপত্র, মিলির ছোটোবোন লিলি বছর দুয়েক ধরে ঐ ক্লাসেই পড়ছে; বইপত্রের পাশে আয়না, চিরুনি, পাউডার কেস, স্নোর কৌটা, তেলের বোতল, সেফটিপিন, শ্যাম্পুর বোতল। গতকাল পর্যন্ত অনেক-আগে-শেষ শ্যাম্পুর খালি বোতল এবং স্নোর খালি কৌটাও ছিলো। রানা আজকাল এইসব ফালতু জিনিস দেখতে পারে না বলে মনোয়ারা ওগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তবে টেবিল কখনো এলোমেলো থাকে না, মনোয়ারা বা লিলি যে যখন আসছে একবার গুছিয়ে রেখে যাচ্ছে। সুতরাং এক সেকেন্ডে চিরুনি পাওয়া যায়। ক্লাস এইটের মলাট-লাগানো বইয়ের স্তূপে আয়না ঠেকিয়ে তক্তপোষে বসে রানা ধীরেসুস্থে চুল আঁচড়ায়। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মনোয়ারা মিলিকে ডাকে, 'হাতে হাতে কাপ-পিরিচগুলো ধুয়ে ফেল তো।'

'আসি আম্মা!' কিন্তু মিলি ফের জানলা একটুখানি ফাঁক করে দাঁড়ালো। বৃষ্টি বেশ চেপে এসেছে। পানির ঠাসবুনুনি ধারার তোড়ে আব্বাস পাগলার মুখ কান নাক মাথা আলাদা হতে পারে না। ওর বলকানো ছাদে রিবাউন্ড হয়ে বৃষ্টির মোটা ধারা মিহি হয়ে সাদা ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাবার জবাবে আব্বাস পাগলা গর্জন করে উঠলে তার মস্ত হাঁ মশালের আলোয় উদ্ভাসিত পাহাড়ের গুহার মতো প্রতিধ্বনিময় হয়ে ওঠে। সেই বিদ্যুৎ ফের আকাশের মুখে থুতুর মতো ছুঁড়ে দিতে দিতে সে যে বলে কিছু ঠাহর করা যায় না। আরেকটু

মনোযোগ দিলে বোঝা যাবে এই ভরসায় মিলি একটু গুছিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আব্বাস পাগলার শব্দ চাপা পড়ে রানার কথায়, 'মিলি, চা দে।'

মিলি বিরক্ত হয়, 'এইতো সবাই চা খেলো। চা খাওয়ার সময় তুমি রোজ থাকো কোথায়?'

ভেতর থেকে আম্মা ডাকে, 'মিলি, রানার চা নিয়ে যা।'

চায়ের পেয়ালার পিরিচে ঝোলা গুড় মাখানো দুটো টোস্ট বিস্কিট। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে টোস্ট শুদ্ধ পিরিচ রানা ফিরিয়ে দিলো।

'খাবে না?'

নাক কুঁচকে রানা বললো, 'এসব খাওয়া যায়?'

মিলির কিন্তু খুব খেতে ইচ্ছা করে। বিকালবেলা চায়ের সঙ্গে কিছু থাকে না। রানার জন্যে আম্মা কোত্থেকে কি বার করে দেয়। গুড়-মাখানো টোস্টে কামড় দিতে দিতে ফের জানলা খুলতে গেলে রানা বলে, 'খুলিস না।'

'বৃষ্টি কমে গেছে, খুলে দিই?'

'না থাক।'

'গরম লাগছে তো।'

'আঃ!' রানা ধমক দেয়, 'ঐ পাগলা শালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।' জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রানা বালিশে ঠেস দিয়ে বসলো, 'শালা চ্যাঁচায় কী! ইনটলারেবল বাস্টার্ড!' মিলি তখন বন্ধ জানলা থেকে রান্নাঘরে চলে যায়। রানার কথা আর শেষ হয় না, 'কাল ইভনিংটা স্পয়েল করে দিলো।' তারপর জোর দিয়ে সংকল্প জানায়, 'আজ আসুক শালা! ঘাড় ধরে বের করে দেবো।'

কিন্তু বের করে দেওয়া কি এতো সোজা? কাল সন্ধ্যায় সোহেল না সিডনি না ফয়সল কি নাম, ফর্সা-রোগা ছেলেটা, বলছিলো, 'দ্যাখো, এসব লোক দেখতে পাগল পাগল হলে কী হবে, এ বেটাদের সঙ্গে একটু রেসপেকট করে কথা বলা ভালো। কার ভেতর কী পাওয়ার আছে কে বলতে পারে! রিস্ক নিয়ে লাভ কি? কেয়ারফুল থাকাই ভালো।' ছেলেটা কিন্তু নিজেই একটু অসাবধান টাইপের; বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টেলিভিশনের জন্য প্লাগ-পয়েন্ট লাগাচ্ছিলো, বাঁদিকে ঝোঁকটা এমন ছিলো যে একটু এদিক-ওদিক হলেই পড়ে যেতো। রানারা পঞ্চপান্ডবের চারজন মিলে বিকালবেলা কোত্থেকে একটা টেলিভিশন নিয়ে আসে, সেটা চালু করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

এদিকে রানার ঘর মানে ওর বাবারও ঘর। ছেলে সেখানে সবান্ধব টেলিভিশন ফিট করায় ব্যস্ত। বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সরু গলিতে ঘোলা সূর্যাস্ত দ্যাখা ছাড়া আশরাফ আলীর আর কোনো কাজ থাকে না। আবার বারান্দায় এসে জুটেছিলো আব্বাস পাগলা। তাই নিসর্গে সম্পূর্ণ মগ্ন হওয়া আশরাফ আলীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না, কারণ আব্বাস পাগলার তক্ষুনি একটা স্টেনগান দরকার। রানাকে বলে দশটা না পাঁচটা না, একটা স্টেনগান জোগাড় করে দেওয়ার জন্য আশরাফ আলীকে সে খুব বিনীত অনুরোধ জানায়। দুটো তিনটে বিনীত বাক্য প্রয়োগের পর তার গলা চড়ে গেলে মগরেবের নামাজ পড়তে আশরাফ আলী ভেতরে ঢোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রানাদের মধ্যে প্রবেশ ঘটলো আব্বাস পাগলার।

সোহেল না সিডনি না ফয়সল,– ফর্সা-রোগাটা বাঁদিকে ডানদিকে সমান ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আব্বাস পাগলাকে সম্মান জানায়। তার দ্যাখাদেখি রানা এবং আরেকজন- সোহেল না সিডনি না ফয়সল– এটা অবশ্য কালো-লম্বা–সেও দাঁড়ায়। বাকি রইলো একজন। এর একটি গাড়ি আছে বলে তবু একে একটু আলাদা করা যায়। তো এই সর্বশেষ যুবকটি,– সোহেল না সিডনি না ফয়সল–নাম তিনটে এই তিনজনেরই, কিন্তু মিলির কাছে এদের সবাইকে একই রকম মনে হয়, এদের আরেকজন বন্ধু আছে, সে আজ আসে নি, এমন হতে পারে যে এই তিনটে নামের মধ্যে তার নামটিও রয়ে গেছে, সেদিক থেকে বিবেচনা

করলেও সুনির্দিষ্ট নামে এদের একেকজনকে সনাক্ত না করাই ভালো,– সেও বসে থাকা অবস্থাতেই একটু সোজা কিম্বা একটু বাঁকা হলো। কিন্তু এতো লোকের অবস্থানের অদলবদল, আনকোরা নতুন টেলিভিশন সেট–আব্বাস পাগলার গায়ে এসব একটুও আঁচড় লাগাতে পারলো বলে মনে হয় না। রানার সামনে সে হাত পাতে, 'রানা, স্টেনগান দিলি না ?' টেবিলে রাখা ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে আব্বাস পাগলা– ঠোঁটে দিতে না দিতে ফর্সা-রোগা দেশলাই জ্বালিয়ে তার সামনে ধরে। কিন্তু সিগ্রেটের মাথায় আগুন স্পর্শ করার মুহূর্তে কাঠি নামিয়ে নেয়, 'উল্টো হলো তো !' ফিল্টারের দিকটা আব্বাস পাগলার ঠোঁটে নেই, সামনে। সিগ্রেট ঠিক না করেই আব্বাস পাগলা হাত থেকে জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে ফিল্টারে আগুন ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই-কাঠির আগুন আব্বাস পাগলার আঙুল পর্যন্ত এসে পড়ায় মিলির ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী একটু একটু জ্বলছিলো। কিছুক্ষণ পর না-ধরানো সিগ্রেট আব্বাস পাগলা খুব কষে টান দিতে শুরু করে।

তিনটে চেয়ার ও দুটো তক্তপোষে সবাই ভাগাভাগি করে বসলে ফর্সা-রোগা ঝুঁকে জিগ্যেস করে, 'কেমন আছেন ?' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আব্বাস পাগলা মহাসুখে না ধরানো সিগ্রেট টানে, তার চোখে ধোঁয়া লাগার অস্বস্তি পর্যন্ত ফোটে। মিলি নিজের চোখজোড়ায় সেই অনুপস্থিত জ্বালা অনুভব করার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ফর্সা লম্বা বসেছিলো তক্তপোষের এক ধারে, আরো খানিকটা ঝুঁকে গলা আঠালো করে নিবেদন করে, 'কাল পরশু একটা পারমিট পেতে পারি।' জবাবে আব্বাস পাগলা 'হোগার মইদ্যে ব্যান্ডেজ বান্দলে সিগারেটের স্বাদ থাকে ?' বলে ফিল্টার টিপড সিগ্রেট জানলার দিকে ছুঁড়ে মারে, শিকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অক্ষত সিগ্রেট ট্রাঙ্কের আড়ালে পড়ে রইলো। আজ সকালবেলা মিলি ওটা কুড়িয়ে নিয়ে গন্ধ শুঁকে আবার ওখানেই রেখে দিয়েছে। 'কাল একটা পারমিট পাবো', ফর্সা-রোগা আরো ঝুঁকে পড়েছিলো, 'মজনু ভাই ওয়ার্ড দিয়েছে ম্যানেজ করে দেবে।'

'কী ?'

ফর্সা-রোগা দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, 'মজনু ভাই ওয়ার্ড দিয়েছে। আহসানুল হক মজনু। ভালো পার্টি পেলে ছেড়ে দেবো, না ইউটিলাইজ করবো ? আপনি যা হুকুম করবেন তাই করবো।' চেয়ারের ওপর দুই ঠ্যাং তুলে আব্বাস পাগলা হুকুম করে রানাকে, 'স্টেনগান দে।'

টেলিভিশনের পর্দায় পুরুষ ও মেয়েদের তোড়ে দেশাত্মবোধক গান করা দেখতে দেখতে গাড়িওয়ালা বিড়বিড় করে, 'ইভনিংটা স্পয়েল করে দিলো।' এরপর গত ২৪ ঘন্টায় রানা এই বাক্যটি কয়েকবার রিপিট করেছে।

আব্বাস পাগলা ফের হাত পাতে, 'কইলাম, আমারে একটা স্টেনগান দে ! একটা স্টেনগান পাইলে ব্যাকটিরে আমি পানির লাহান ফালাইয়া দিবার পারি !' 'স্টেনগান কোথায় ? আমি কি– ?' রানা বিরক্ত হতে শুরু করেছিলো, কিন্তু ফর্সা-রোগার চোখে চোখ পড়তেই কথাটা আর শেষ করতে পারে না। রানার সমস্যার আর অন্ত নাই। কার দিকে টেনে সে কথা বলে ? একজন শালা গাড়ির মালিক। ওর বাপও টপ লেবেলের এম.পি.। আবার সেক্রেটারিয়েট আত্মীয়-স্বজনে ভরা। ওদিকে বিজনেস বলো এ্যাকশন বলো– সব ধরনের ব্যাপারে ফর্সা-রোগার মাথা একেবারে পরিস্কার। সুতরাং কারো দিকে পক্ষপাত না দেখিয়ে রানা ভেতরে গেলো এবং কয়েক ফোঁটা পেচ্ছাব করে এবং মাকে অনাবশ্যক নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলো। আসতে না আসতে আবার আব্বাস পাগলা। 'কাল বাইতে একটা চানাস্ পাইছিলাম। বাইত ভইরা চাঁদনি আছিলো না ? আসমান এক্কেরে ধবধবা, ইট ওয়াজ ক্লিয়ার লাইক এ, লাইক এ, লাইক এ।' জুতসই উপমা খুঁজে না পাওয়ায় ভাঙা রেকর্ডের মতো সে একই কথা কয়েকবার বলে। কয়েক বছর আগে স্কুলে মাস্টারি করার সময়ও সে প্রচুর উপমা দিয়ে পড়া বোঝাতো এবং উপমান ও উপমিতের সন্তোষজনক সামঞ্জস্য না ঘটা পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কয়েকবার 'লাইক এ' বলতো। এই কারণে ছাত্রদের মধ্যে সে 'লাইক স্যার' উপাধি অর্জন করে এবং নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পাগলা কথাটি যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত রোকনপুর, একরামপুর এমন কি লক্ষ্মীবাজারের একটি এলাকা জুড়ে ঐ নামেই পরিচিত ছিলো। হঠাৎ

উপমা জুটে গেলে আব্বাস পাগলাব একই শব্দেব পুনরাবৃত্তিব অবসান ঘটে, 'লাইক এ হোয়াইট শিট অফ পেপাব। একটা পিচ্চি মেঘ ভি আছিলো না। এক মিনিট বাদে বাদে কল আসতাছে, এ্যালার্ট থাকো, এ্যালার্ট থাকো। গেট প্রিপেয়ার্ড ফর দি ফাইনাল এ্যাকশন!' একটু বিরতি দিয়ে সে একটা হুঙ্কার ছাড়লো, 'আমাব ভি আছে, ব্যাকটি বানাইয়া ঠিক কইরা থুইছি! ফাইনাল মেসেজ আইয়া পড়ুক, আমি স্ট্রং কানেকশন কইরা বাখছি, ইনস্ট্রাকশনেব লাইগা ওয়েট কবতাছি, দেহি!' দিনবাত চ্যাঁচামেচি করার ফলে তাব গলা সবসময় ভাঙাভাঙা, ভাঙা গলা পেবিয়ে এবড়ো খেবড়ো ধ্বনি বেবিয়ে এসে শ্রোতাদেব কানে খোঁচা মারে। এইসব খোঁচাখুচি সামলে নিতে নিতে ফর্সা-বোগা জিগ্যেস কবে, 'কাব ইন্সট্রাকশান?'

রান্নাঘব থেকে মনোযাবা ডাকে, 'মিলি!'

দবজাব আড়াল থেকে ওদেব দ্যাখা বাদ দিয়ে মিলিকে মাযেব কাছে যেতে হয। রান্নাঘর থেকে ট্রে নিয়ে ফেব রানাদেব ঘবে যাচ্ছে, আশবাফ আলী জাযনামাজ গোটাতে গোটাতে বলে, 'রনি নিয়ে যাক না?'

'না মিলি যাক।' পেছনে মনোযাবা। ট্রেব ওপব ভালো কবে দেখে আশবাফ আলী কপাল কোঁচকায, 'এতো প্যাটিস খাবে কে?'

রান্নাঘবে ফিরে যাবাব আগে ট্রেব ওপব একটি চাযেব কাপ থেকে সবেব টুকবা তুলে মনোযাবা মেঝেতে ফেললো। আম্মাব পেছনে বনি ঘুবঘুব কবছে আব ঘ্যান ঘ্যান কবছে, 'আম্মা, প্যাটিস দিলে না, আম্মা প্যাটিস দিলে না?' আম্মা বলছে 'আব নেই!' বনি বলছে,'দাও না! ভাইয়া কতো বড়ো প্যাকেট নিয়ে ঢুকলো!' আম্মা বলছে, 'থাকলেই একবারে সব খেতে হবে, না? কাল সকালে নাশতা কবিস!' বনি বলছে, আম্মা বলছে, বনি বলছে, আম্মা বলছে! — বানাদেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আম্মা ও বনিব বলাবলি আড়াল হয়ে যায়।

বানা ওব পড়াব টেবিল বেখে দেয সবাব মাঝখানে। মিলিব সঙ্গে মুখোমুখি হলে ফর্সাবোগাব মাখোমাখো মাকা চোখে মুখে লাল বঙ ক্যাট-ক্যাট কবে ওঠে, এই জিনিস মিলি আগেও লক্ষ কবেছে কালো-লম্বা এক্সট্রা স্মার্ট হয, 'বানা কাল বিকালে ঢাকা ক্লাবেব প্রোগ্রামটা মিস কইবো না! বাইভ থার্টি শার্প!' তাব মুখটা মিলি ভালো কবে দেখে নেয। অত ছটফট কবাব দবকাব কী বাপু? প্রেম ট্রেম করতে চাইলে সবাসবি বললেই পারে। এরা তো সব একই টাইপেব, মিলি কী বাছাবাছি কবতে বসবে, না তাই কবা তাব পোষায? তবে গাড়িওযালা কিন্তু যেমন ছিলো, তেমনি বইলো। হায় বে, আম্মাব টার্গেট তো এই গাড়িওযালাই। কিন্তু মিলিব দোষ কী? বড়ো লোকেব ছেলে, কতো ভালো ভালো মেয়েমানুষ দ্যাখে, এদেব চোখে পড়া কি তাব মতো মেয়েব কম্ম? — নইলে মিলিব আপত্তি কী? সব তো একই।

আব্বাস পাগলা বলে, 'খুব ভোবেব দিকে হালাগো আর্টিলাবি — এ্যাট লিস্ট এ হ্যান্ড্রেড টু এ থাউজ্যান্ড, এক লাখও হইতে পাবে, আর্টিলাবি পাস কবলো, আমি সিগন্যালেব লাইগা বইসা বইছি।' একটু থেমে ফিস ফিস করে, 'ট্রেটবগুলি কম্যুনিকেশন ডিসরাপ্ট কইরা দিলো।'

ট্রে থেকে এক এক কবে প্যাটিস, ফিবনি, চানাচুবেব প্লেট ও চায়েব পেয়ালা নামে। সেদিকে আব্বাস পাগলাব কোনো মনোযোগ নাই। 'বাইত তহন কিছু বাকি বইছে। চান্দে হালায় তহন ভি পুবা ফোকাস মাবতাছে। একবাব উপবে চাইয়া দেখি, ঐগুলি কী? আসমানেব মইদ্যে উঁচানিচা এগুলি কী? গাত মালুম হয না? — হ, তাই তো! এন্টায়াব স্কাইস্কেপ হ্যাজ বিন বেপড মিজাবেবলি! খালি বাঙ্কাব, ট্রেঞ্চ, এইখানে গর্ত, ঐখানে খন্দ! — একেবে ঝালাঝালা কইবা ফালাইছে, বুঝলি না?' এর মধ্যে থুক কবে ছোট্টো একটু হেসেও নিলো, 'তগো কী কই? আমি তো হালায ঠিক দেখতাছি, কাবা আছে, কেল্লায় আছে — লগে লগে বুইঝা ফালাইছি! মগর!' এবাব তার আকাশচিত্রবর্ণনা এতো দ্রুত হয যে শব্দ বিন্যাসে ঘোবতব অনিয়ম দ্যাখা দেয তখন তাকে ঠিকঠাক অনুসবণ কবা বেশ মুশকিল। তবে একনিষ্ঠ মনোযোগ দিয়ে শুনলে তার ব্যাকবণ মোটামুটি আয়ত্তে আসে এবং কুচি কুচি ছবিগুলো সম্পাদনা করলে জানা যায় যে শত্রুর যুদ্ধকৌশল সবটাই আব্বাস পাগলাব নখদর্পণে এবং তাদের বিনাশ করাব

চূড়ান্ত নির্দেশের জন্যে অস্থির হয়ে সে একটু চোখ ফিরিয়েছিলো, তক্ষুনি হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ছিন্ন সম্পর্ক হয়ে পড়ে। একটি মাত্র অস্ত্র হাতে থাকলে আব্বাস পাগলা কি হেড কোয়ার্টারের অর্ডারের জন্য প্রতীক্ষা করবে? 'একটা স্টেনগান থাকলে হু বদারস ফর দি ফাইনাল মেসেজ?'

'কি মেসেজ?' ফর্সা-রোগা খুব ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করে, 'কী মেসেজ হুজুর?'

আব্বাস পাগলা হঠাৎ চাঁদের চেয়ে ধারালো কোনো গ্রহ, এমন কী, বলা যায় কোনো নক্ষত্রের মতো ওর দিকে সোজাসুজি ফোকাস মারে। তার দুটো চোখের ঘোলাটে জমিতে কেবল কাটাকুটি। চোখজোড়া সঙ্কুচিত হয়ে তীক্ষ্ণ ও ছুঁচলো হলে চারজন বন্ধু নিজনিজ নিতম্ব ও আনুমানিক শিরদাঁড়ায় প্রায় স্থির হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে চোখজোড়া সম্পূর্ণ খুলে ফেলে আব্বাস পাগলা হুঙ্কার ছাড়ে, 'হু আর ইউ?' তোপধ্বনির মতো দ্বিতীয় হুঙ্কার বাজে, 'টেল মি হু আর ইউ!'

মিলি ছিলো দাঁড়িয়ে। পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে আওয়াজটা সামলে নিলো। ফর্সারোগার মুখ একেবারে তেলজলরসশূন্য অক্ষরহীন দোমড়ানো সাদা কাগজের মতো পড়ে আছে ধড়ের ওপর, আর একটি হুঙ্কারেই উড়ে যেতে পারে। গাড়িওয়ালা বারবার দরজার দিকে দেখছে; হঠাৎ যদি আব্বাস পাগলার এ্যাকশন শুরু হয় তো প্যাটিস চানাচুর ঝিরঝির প্লেট চায়ের পেয়ালা এ্যাশট্রে প্রভৃতি বোঝাই টেবিল সরিয়ে, নতুন টেলিভিশন সেটের গা ঘেঁষে মেঝেতে রাখা ট্রাঙ্ক টপকে এবং লাস্ট বাট নট দি লিস্ট আব্বাস পাগলাকে ওভারটেক করে তবে কিনা বেচারা পৌঁছুতে পারবে দরজার কাছে। আর গাড়িতে পৌঁছুতে ওর ঢের দেরি, গাড়ি রেখে এসেছে বড়ো রাস্তায়। লম্বা-কালো উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঘষছে, বেচারার হাতের ঘাম কিছুতেই মোছা যাচ্ছে না।

কিন্তু শেষবার আক্রমণ প্রত্যাহার করে নিয়ে আব্বাস পাগলা দরজার দিকে চলে গেলো। 'চুতমারানি, খানাকির বাচ্চা, তগো ব্যাকটিরে আমি চিনি। আমার প্যাটের মইদ্যে থাইকা ইনফর্মেশন বাইর কইরা এনিমি ফ্রন্টে পাঠাইবার তালে আছো, না? ইস্পাইং করনের আর জায়গা পাইলি না?' তারপর বারান্দায় গিয়ে 'ও আশরাফ সাহেব, এনিমির ইস্পাই ছ্যামরাগো এ্যাসাইলাম দিয়া বহুত মৌজ মারেন, না?' বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়। এতোক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকার পর আব্বাস পাগলার পেছনে পেছনে মিলি বারান্দায় গেলো। একটু পরে মনোয়ারা এসে বলে, 'একি মিলি! এখানে কী?'

'দ্যাখো না!' মিলি আঙুল দিয়ে দ্যাখায়, পানের দোকানের সামনে হাত পা নাড়িয়ে আব্বাস পাগলা খুব চ্যাচাচ্ছে।

আম্মা বিরক্ত হয়েছে, 'যা, রানা ওদিকে কখন থেকে চিনি চাইছে, দ্যাখ!'

কিছুক্ষণ পর নিজেদের ঘরের জানলায় দাঁড়ালে আব্বাস পাগলাকে মিলি আর দেখতে পায় না। জানলায় দাঁড়াবার একটু পরেই বন্ধুদের সঙ্গে রানা বেরিয়ে গেলো। ওরা দোকানে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট কিনেছে। ওদের দুজন মিলির জানলার দিকে তাকালো। ঘাড় কিম্বা কাঁধ চুলকাবার জন্য আরেকজনেকেও এদিকে মুখ ফেরাতে হয়, ল্যাম্পপোস্টের ঘোলা আলো তিনটে মুখে পাউডারের মতো ছড়িয়ে পড়ায় একজন থেকে আরেকজনকে আলাদা করা যায় না।

কাল তো তবু আকাশটা পরিষ্কার ছিলো। ঝোলাগুড় মাখানো টোস্ট না ছুঁয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে হঠাৎ গাড়ির হর্ন শুনে রানা আজ বেরিয়ে গেলো তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। অনেক রাত করে রানা ঘরে ফিরলে মনোয়ারার দরজা খুলে দেওয়ার শব্দে মিলি জেগে ওঠে। রাস্তায় আব্বাস পাগলা তখন লম্বা বিবৃতি দিয়ে হাততালি দিচ্ছে।

'খেয়ে এসেছি', জড়ানো স্বরে খবরটা জানিয়ে রানা আব্বার ঘরে ঘুমোতে গেলে আম্মা এই ঘরে আসে। মিলির পা দুটো ঠিক করে নিজের বিছানায় বসে আম্মা একা একা পান সাজে। 'কোথায় যায়! এতো রাত করে কোথায় থাকে!' মায়ের নিশ্বাস ঐ তক্তপোষ থেকে মেঝেতে এবং মেঝের হিম ও ছোটো শূন্যতার আর্দ্রতা নিয়ে মিলির গায়ে শিরশির করে। তার উঠে পড়তে ইচ্ছা করে। আম্মাকে ভুলভাল একটা পান সাজিয়ে দিলে হতো। কিন্তু মিলি জেগে আছে টের পেলে সশব্দ নিশ্বাস চেপে রাখা ছাড়া আম্মার আর উপায় থাকবে না। মিলি তাই শুয়েই থাকে এবং এই ওলটপালট সময়ে রানার কবে যে কি হয় - এই ভাবনা

মাথায় খামচা দিলে তাকেও কয়েকটা নিশ্বাস গিলে ফেলতে হয়। আম্মার ভাবনা আম্মার, বানার জন্যে ঘরের এতো শ্রী আসছে, তার সঙ্গে একটু বয়েসয়ে কথা না বললে কি চলে ? আবার মিলির ভাবনা মিলির। কারো চোখেই তাই জলের সঞ্চার হয় না এবং মিলির চোখ করকর করে। তখন পাশ ফিরলে স্বস্তি পায়। এইভাবে রাত্রি গড়ায়। বাইরে আব্বাস পাগলার হাততালি এখন স্পষ্ট ও উচ্চশব্দ। তালির মাঝে বিরতি খুব দ্রুত কমে আসছে। তার তাক্ তাক্/ তাক্ তাক্ তাক্, তাক্ তাক্ / তাক্ তাক্—এই তালের নিয়মিত ও দ্রুত পেটায় বাইরের নীরবতা সংহত। আম্মার একাকী জাগরণের নিশ্বাসের পটভূমিতে তাক্ তাক্ / তাক্ তাক্ তাক্ ক্রমেই তেজি হয়, কিছুক্ষণের ভেতর ভাবি হাতের গলি-কাঁপানো তালি দেখতে দেখতে আম্মার নিশ্বাস প্রশ্বাস সব গ্রাস করে ফেলে। জানলা দিয়ে হাততালির ধ্বনি ছলকে ছলকে এসে ঘরময় থৈ থৈ ভাসছে। মিলির চোখেমুখে ছলাৎ ছলাৎ ঝাপ্টা মারে তাক্ তাক / তাক্ তাক্ তাক্ হাততালি। তাক্ তাক্ / তাক্ তাক্ তাক্ – মিলির চোখ জলময়। তাক্ তাক্ / তাক্ তাক্ তাক্ -- তার চোখ জোড়া নিঃশব্দে বন্ধ হয়, চোখের জলভরা শাঁসে এখন অন্ধকার। তাক্ তাক্ / তাক্ তাক্ তাক্ –চোখের পানি ঘন হতে হতে কালো মেঘের আকার ও রঙ পায়, অন্ধকার এখন নিশ্ছিদ্র। তাক্ তাক্ / তাক্ তাক্ তাক্ -- অন্ধকারের ভেতর ডিমের মধ্যে বড়ো হওয়ার স্পন্দন অনুভব করা যায়, তখন সেই হাততালির সঙ্গে পা ফেলে মিলি একটা উঁচু ক্রেনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। ক্রেনের মাথায় রেলিং-ঘেরা ছোট্টো একটি জায়গা, রেলিঙের ওপর আব্বাস পাগলা। তার হাতে তালির বদলে এখন স্টেনগান। বানা এবং কর্সা-রোগার হাতে মিলি এই জিনিসটা আগেও দেখেছে, এর নাম স্টেনগান হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আর এতো নিচে থেকে জিনিসটা স্পষ্ট ঠাহর করা কঠিন। আকাশের দিকে তাক করে আব্বাস পাগলা নিশানা ঠিক করছে। যুদ্ধরত শত্রুসৈন্যরা মিলির দৃষ্টির অনেক বাইরে। আব্বাস পাগলা ক্রেনের সিঁড়ি বেয়ে আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে বলে তার এলোমেলো উড়ন্ত চুলের কালো শিখা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। কোমরে শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে মিলি সিঁড়ির ধাপ ভাঙছে, আব্বাস পাগলার চুল কালো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলে, সেই দিকে চোখ রেখে সে ওপরে উঠছে। এক ধাপ এক ধাপ করে মিলি বেশ অনেকটা উঠে পড়ে। হঠাৎ মিলির সমস্ত শরীর দুলে উঠলো। – তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে তার পা ফস্কে গেছে, অনেক ওপরে কালো আগুনের শিখা,–মিলি পড়ে যাচ্ছে গভীর নিচের খাদে।

তবে ভূমি স্পর্শ করার আগেই তার চোখ খুলে যায় ; দ্যাখে, ঘরে ঘন-ঘোর অন্ধকার। পাশের বিছানায় মায়ের মিহিসুরে নাকডাকা ও নিজের বিছানায় লিলির নিশ্বাসের একটানা আওয়াজ। মিলির তখন মুখের তালু খা খা করছে, তার তখন দারুন পানির পিপাসা। স্বপ্নকে মুহূর্তে স্বপ্ন বলে সনাক্ত করতে পারলেও তার খুব ইচ্ছা করে, জানলা খুলে ওপরে যতোটা পারে একবার দেখে নেয়। কিন্তু ক্রেনের সিঁড়ির এতোগুলো ধাপ ভাঙা এবং পা ফস্কে নিচে গড়ার ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে। পানি আর খাওয়া হয় না, জানলা খোলার জন্যে ওঠার আগেই মিলি ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্রেন থেকে নেমে এসে পরদিন দুপুরে আব্বাস পাগলা ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো। বেলা একটা দেড়টার দিকে বাইরের দরজায় কড়ানাড়া শুনে দরজা খুলতেই সামনে আব্বাস পাগলার জখম-হওয়া ট্রাকের মতো থ্যাবড়ানো মুখ।

'বানা কৈ ? বানারে ডাক।'

'বাসায় নেই।'

'নে-ই !' আব্বাস পাগলা মুখ ভ্যাংচায়, 'নেই ! নাই কেল্লায় ? কৈ গেছে ? কারে হাইজ্যাক কররো ? দুই ঘন্টা আগে দেখলাম মস্তানগুলি টেলিভিশন লইয়া আইলো, অহন গেছে রেফ্রিজারেটর আনতে ? কৈ গেছে, কইলি না ?'

ধমক খে[illegible] থাকে। ওরা টেলিভিশন নিয়ে এসেছে পরশু, আর লোকটা কিনা পুরো দ[illegible]নিকে গুটিয়ে [illegible] এল দুই ঘন্টায় ! লোকটা এতো শক্তি পায় কোত্থেকে ? আব্বাস পাগ[illegible] মুখের দিকে সে স[illegible]বি তাকায়। এই সময় পাগলা বারান্দায় উঠে আসে।

লোকটিকে ভালো করে দ্যাখার জন্য মিলি দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলে ওদের দূরত্ব দাঁড়ায় দুই থেকে আড়াই হাত। আব্বাস পাগলার গায় পচা ডিম ও স্যাঁতসেঁতে কাপড়ের ভ্যাপসা গন্ধ। ঠিক তাও না। নবদ্বীপ বসাক লেনে বেহানাদের বাড়িতে যেতে একটি হালুইকর দোকানের কারখানার পেছনটা পার হতে হয়। সেখানে মাঝে মাঝে এই গন্ধ পাওয়া যায়। তার মস্ত বড়ো মুখের বেগুনি-কালো জমিতে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ির ঘন কাঁটাবন। দাড়ি তার বড়ো ছুঁচলো, এখান থেকেই মিলির ঘাড় কুটকুট করে, ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে সে আস্তে আস্তে ঘাড় চুলকে নেয়। বানার ওপর আব্বাস পাগলা মহা চটা, 'খাটাশটা কৈ গেছে কেউরে কইয়া যায় নাই ?'

বারান্দায় একটা মোড়া পাতা ছিলো, আব্বাস পাগলা রাজকীয় ভঙ্গিতে মোড়ায় বসে হুকুম করে, 'বস !' কিন্তু আর কোনো আসন না থাকায় মিলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আব্বাস পাগলা এবার গলা নামিয়ে বলে, 'বানায় তরে কিছু দিয়া গেছে ?'

'না।'

'কিছু কইছে তরে ?'

'না।'

'খালি না, না, না !' আব্বাস পাগলা চিৎকার করে, 'ঠিক আছে ! আমি ভি দেইখা লমু ! খানকির বাচ্চারে কইস, আব্বাস আলী মাস্টারের লগে বজ্জাতি করলে হালারে এক্কেরে জানে মাইরা ফালামু, বুঝলি ?'

কিন্তু এই চিৎকার কাটিয়ে উঠে মিলি জিগ্যেস করে, 'ভাইয়া আপনাকে কী দেবে ?' এই কথায় পরশুদিন সন্ধ্যাবেলাকার মতো তার চোখ ছুঁচলো হতে শুরু করলো, চোখের পাতা ব্যবহৃত হচ্ছে শক্ত আঙুলের মতো, চোখের পাতা দিয়ে আঁকড়ে ধরে সে তার চোখের গোলাটে লাল সব ও তার ওপরকার আঁকিবুঁকি ছেঁকে ফেলতে চায়। হঠাৎ তার ভাঙাভাঙা গলায় হুঙ্কার বেরিয়ে আসে, 'শাট আপ !' ঘরের নোনা ধরা দেওয়াল কাঁপে, মিলির পা হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। নিচে গভীর খাদে পড়ে যেতে যেতে সে ওপরের দিকে তাকায় ; না, ওপরে কেবল ছাদ, ছাদে কড়ি-বর্গা, বাড়িওয়ালার ঠিকা-ঝির মশলা বাটার শব্দ। মিলি তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লা ধরে ফেললো। লিলি রানি স্কুলে, আব্বা অফিসে, আম্মা বাথরুমে ঢুকেছে একগাদা ময়লা কাপড় নিয়ে। খালি ঘর পেয়ে আব্বাস পাগলার হুঙ্কার সারা বাড়ি স্বেচ্ছাভ্রমণ সারে।

ভিজে শাড়ি-ব্লাউজ কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে মনোয়ারা এসে দাঁড়ালো। প্রথম এক আধ মিনিট বেচারা কোন কথাই বলতে পারে না। তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি পরে আসবেন। বাসায় কেউ নেই।' তার ক্ষীণকণ্ঠের অনুরোধ আব্বাস পাগলার হুঙ্কারধ্বনির ফাঁকে ফোকরে কোথায় লুকায় তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। আব্বাস পাগলা মিলির দিকে চোখ রাখে, 'তুমি হেইদিনের ছেমরি, আমার লগে দুষমুনি করো ?'

মনোয়ারা দু'জনকে দু'রকম নির্দেশ দেয়, 'মিলি, এদিক আয়, ঘরের ভেতর আয়। আপনি এখন যান, বললাম তো বাসায় কেউ নেই। যান, পরে আসবেন। মিলি, ঘরে আয়।'

মিলি ব্যাকুলভাবে জানতে চায়, 'আপনাকে কী দেওয়ার কথা আছে ? আমি ভাইয়াকে বলে রাখবো। কী দেবে ?'

'তোমাদের কইতে হইবো ? বেঈমানের বইনরে সিক্রেট আউট কইরা দিমু ?' আব্বাস পাগলা হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো। 'আরে আরে, সবা আইয়া পড়বো না ? মনে লয় আউজকা আসমানের ব্যাকটি অকুপাই করবো।' বলতে বলতে সে চার ধাপের সিঁড়ি লাফিয়ে নামে, 'খানকির বাচ্চারা, তোমরা দুনিয়ার পুরাটাই কব্জা করছো, অহন আসমান চোদাইবার তালে আছো, না ?'

কিন্তু আকাশ জুড়ে কিসের আয়োজন ? মিলি ওপরে যতোটা পারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। ওপরে কেবল আকাশ। সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মেঘ সব ধুয়ে মুছে সাফ। নীলচে সাদা আকাশ আসন্ন শীতকালের অনিবার্য বৈধব্যের জন্যে এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে, তার শরীরে

গয়না বলতে কিছু নাই। নাঃ! মিলি ভালো করে তাকালো, নাঃ! কোথাও কিছু নাই। লোকটা এতো কী করে দ্যাখে?

বড়ো বড়ো পা ফেলে আব্বাস পাগলা এগিয়ে যায়, যেতে যেতে চ্যাঁচায়, 'এনিমি এ্যাডভান্স করতাছে, যাই গিয়া, এইবার এ্যামবুশ করবার পারলে চুতমারানি ব্যাকটিরে এক্কেরে ফিনিস কইরা দেই!' তার একটা হাত মাথায়, ছোটোখাটো গোলাবারুদ কি বোমার কুচি সে এই হাত দিয়ে ঠেকাতে পারবে।

আশরাফ আলী অফিস থেকে ফিরলে মনোয়ারা হৈ-চৈ করলো, এসব পাগল ছাগলের সঙ্গে এতো বড়ো মেয়ে কিনা যেচে কথা বলে! কখন কী করে বসবে, এদের কিছু ঠিক আছে? আশরাফ আলী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, 'না, না, এদের এ্যাভয়েড করতে হয়। সব জায়গায় আজকাল আই, বি'র লোক। কে যে কী ডিসগাইজ নিয়ে আসে!'

'আই, বি হবে কেন?' মনোয়ারা বিরক্ত হয়, 'তুমি কি এমন মস্ত বড়ো মানুষ যে তোমার ঘরে আই. বি. ঢুকবে?'

'আহা, আমি কেন? আমি কেন?' দু'একবার তোতলালেও আশরাফ আলী শেষ পর্যন্ত বুকে বল নিয়ে বলে, 'তোমার ছেলে বড়োলোক হচ্ছে না, 'ছেলের জন্যই একটু মানুষের মতো দিন চলছে, আবার ছেলেকে হিংসা করে!' মনোয়ারা হঠাৎ রেগে যাওয়ায় আশরাফ আলী ফ্যাকাশে হয়ে যায়, 'আরে না, না। আমি ঠিক তা বলিনি! মানে রানাকে তো আজকাল সবাই চেনে টেনে, মানে পপুলার তো, তাই ধরো।' আশরাফ আলীর গোঁফদাড়ি কামানো মুখে কোনো ভাঙচুর নাই, সেখানে চট করে রেখা-উপরেখা তৈরি হয় না। কিন্তু তার ঠোঁট ও চোখ এলোমেলো হয়ে খসে পড়বার উপক্রম হয়। বাপের জন্য মিলির একটু মায়াই হয়, আব্বা যে কখন কী ভাবে! তার ইচ্ছা করে বাপকে বলে যে আই.বির বাবা বাপ, তাদের বাপের সঙ্গে রানার কড়া লাইন। দামি দামি সব জিনিসপত্রে ঘরবাড়ি ভরে তুললো, গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে না, আর আই, বি আসবে তাকে ধরতে?

আব্বাস পাগলা পরদিন ফের আসে। আজ মনোয়ারা তার বোনের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে বোনের ছেলের বিয়ের শাড়ি কিনতে, দরজায় ধাক্কা শুনে মিলি একবারে মোড়া হাতে দরজা খুললো। আব্বাস পাগলা প্রথমেই বলে, 'বাইখ্যা যাই নাই?'

'না।'

মোড়ার ওপর আব্বাস পাগলা ধপাস করে বসে পড়ে। তাকে হতাশ ও উদ্বিগ্ন দ্যাখায়। 'রানায় আউজকাও দিলো না, না?' তার গলায় একটু অভিমান, 'আমার প্রবলেম বুঝবার চায় না। তামাম রাইত আমার ঘরের উপরে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ছে। কাউলকা বেলা দুইটা বাজলে আমারে সিগন্যাল পাঠাইলো, ইস্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠাইছিলো, আমার কানের মইদ্যে লাইট মারলো পরে চোখের উপরে সাউন্ড পাইলাম, হালায় কি চোখা সাউন্ড, চোখের পাতা আমার খালি ফাল পাড়ে লাইক, লাইক, লাইক এ বাম্পিং স্যাভর জেট।— কি? না, রাইত দুইটা বাজলে দুশমুনে পজিশন লইবো;— কোন জায়গায়? — না, কয় চান্দের ঐ সাইডে। ঐ সাইডটার ভিউ দুনিয়া থাইকা ঠিক ক্লিয়ার আসে না। পাহাড় পর্বতই বেশি, মাউনটেনিয়াস জোন। পাহাড়ের মইদ্যে গাত উত আছে না? — দুশমুনে হালায় গাতগুলিরে আর্টিলারি বানাইয়া রাখছে।'

আব্বাস পাগলা কথা বলে যাচ্ছে এক নাগাড়ে। একবার সে মিলিকে বোঝায়, একবার আকাশ দ্যাখে। এর ফাঁকে একেকবার বারান্দার দেওয়ালে চুনসুরকি খসে-পড়া মানচিত্রের দিকে চোখ কুঁচকে কি সনাক্ত করতে চেষ্টা করে। গুহাময় পাহাড়-পর্বত খচিত চাঁদ দ্যাখার জন্য মিলির মনটা ছটফট করে উঠলো। এখন বেলা মোটে বারোটা সাড়ে বারোটা। দুপুর ভালোভাবে জমবে, বিকাল হবে, — দিন ছোটো হয়ে আসছে, বিকালটা তবু একেবারে ফ্যালনা নয়। সন্ধ্যায় আজকাল পাতলা কুয়াশা পড়ছে, আকাশের নীলচে কালো বুকে কুয়াশা মিলিত হলে তারপর রাত্রি। সে এখনো মেলা দেরি। তারো পরে মধ্যরাত। মধ্যরাত্রির চাঁদে দখলদার বাহিনীর কাঁটাতার-ঘেরা ক্যাম্প। জনবিরল চাঁদের অপর পিঠে পাহাড় পর্বতের ভেতর সেই ক্যাম্প কী

রকম দ্যাখায় ? আব্বাস পাগলা এগুলো কি সব দেখতে পায় ? সেই ক্যাম্পের দিকে চোখ রেখে নিরস্ত্র হাতে বেচারা কী করে ওদের গতিবিধি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনবে ?

'বুঝলি ? চান্দের পশ্চিম দিকে'– চোখ বন্ধ করে আব্বাস পাগলা দিকনির্ণয় করে, 'হিলি রেঞ্জ থাইকা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এ্যাঙ্গেল কইরা কয় মাইল উড়তে পারলেই নদী, বহুত বড়ো নদী।'

'নদীর নাম কী ?' হঠাৎ জিগ্যেস করে ফেলেও মিলি আব্বাস পাগলার কাছে ধমক খাওয়ার ভয়ে কুঁকড়ে যায় না, কারণ চাঁদের নদীর নাম জানা তার খুব দরকার। 'নাম কইতে পারুম না।' আব্বাস পাগলা বিরক্ত হয় না, 'নদীর আবার নাম কিয়ের ? এই চুতমারানিরা গেছে, খানকির বাচ্চাগুলি অহন নাম দিবো।– নাম দিবো, দাগ দিবো, খতিয়ান করবো, কবলা করবো, দলিল করবো, মিউটেশন করবো,– হালারা বাপদাদাগো সম্পত্তি পাইছে তো, বুঝলি না ? নদীর দোনো পাড়ে পজিশন লইয়া রেডি হইয়া আছে। দুনিয়ার পানি বাতাস মাটি আগুন পাত্থর তো জাউরাগুলি পচাইয়া দিছে, অহন পচাইবো চান্দেরে।'

এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছে সে, তার কথার আঁচে উস্কোখুস্কো চুল দপদপ করে ওঠে আর নামে। মিলি বুঝতে পারে যে আব্বাস পাগলার করোটির ভেতর কোথায় অঙ্গার রয়েছে, তারই তেজে তার কালো চুল ধকধক করে জ্বলে। সেই গোপন অঙ্গার ছোঁবার জন্য মিলির আঙুলগুলো কাঁপে। একবার ছুঁতে পারে তো এই ঘোরতর দুপুরবেলা চাঁদের ভেতর সৈন্য সমাগম স্পষ্ট দ্যাখা যায়।

'মেইন প্রবলেম তো কেউরে কই নাই।' মূল সমস্যাটিকে গোপন রাখা দরকার বলে সে মোড়া নিয়ে সামনে এগোয়। দরজার চৌকাঠে বসে-পড়া মিলির কাছাকাছি এসে সে আস্তে আস্তে বলে, 'কুত্তার বাচ্চাগুলি চান্দের গ্র্যাভিটেশন বাড়াইয়া দিতাছে। এতোগুলি মানুষ গেছে, এতোগুলি আর্মস লইয়া গেছে, গ্র্যাভিটেশন বাড়বো না ? অহন কী হইবো ? তুই ক, অহন কী হইবো ?' মিলি বলতে না পারলে আব্বাস পাগলা নিজেই জবাব দেয়, 'অহন দুনিয়ার জানোয়ারগুলির লাহান চান্দের বাসিন্দাগো পায়ের মধ্যে গোদ হইবো, জিন্দেগিতে অরা আর উড়বার পারবো না।'

'কারা উড়তে পারে ?' সাঙ্ঘাতিক কৌতূহলে মিলি একটু এগিয়ে আসে। এখন তাদের মধ্যে ব্যবধান এক থেকে দেড় হাত। কিন্তু আব্বাস পাগলার গা থেকে পচা ডিম, স্যাঁতসেঁতে কাপড় ও নবদ্বীপ বসাক লেনের হালুইকরের কারখানার পেছনদিককার নালার মিলিত গন্ধ আসছে না। কিংবা এমন হতে পারে যে নিঃশ্বাস নিতে মিলি ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু আব্বাস পাগলার কথা তো স্পষ্ট শোনা যায়, 'চান্দের ব্যাকটি জীব উড়বার পারে। চান্দের ওজন আমাগো এই ধুমসা দুনিয়ার একাশি ভাগের একভাগ। অরা উড়বো না ক্যালায় ? তুই সাইন্স পড়লে আমারে এতোটি কথা কইতে হয় ?' তবে মিলি বিজ্ঞান পড়েনি বলে আব্বাস পাগলা রাগ করে না, বরং ছোট্টো করে একটু হাসে, 'আরে ছেমরি, তর ওজন যদি পঞ্চাশ পাঁচপঞ্চাশ পাউন্ড রিডিউস করবার পারস তো আমি তোরে গ্যারান্টি দিতাছি তুই ভি উড়াল দিবার পারবি। পারবি না ?' বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিওয়ালা আব্বাস পাগলার এই গ্যারান্টি অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না মিলির। মিলির ওপর আব্বাস পাগলা বেশ আস্থা স্থাপন করেছে। চাঁদে বিভিন্ন সময় তার অভিযানের কথা সে ফিস ফিস করে ফাঁস করে দিচ্ছে। চাঁদ এমন একটা জায়গা যেখানে সব শালাই সব সময় ভাসে, ওড়ে এবং দোলে। সেখানে কারো সঙ্গে কারো ক্র্যাশ হয় না। নিল আর্মস্ট্রংকে আব্বাস পাগলা অনেক আগেই এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছিলো। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই কেপ কেনেডি থেকে এ্যাপোলো ১১ তে চাঁদের দিকে রওয়ানা হবার ঠিক আগের মুহূর্তে নিল আর্মস্ট্রং আব্বাস আলীর ইংরেজিতে লেখা,–হ্যাঁ ইন কিংস ইংলিশ,–চিঠিটা ভালো করে পড়ে নেয়। আব্বাস আলী লিখে দিয়েছিলো যে চাঁদে গিয়ে তাদের হাঁটাহাটি করতে হবে না। দিব্যি উড়াল দিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু হাজার হলেও ওরা পৃথিবীর পয়দা, তাই তার কথাটাকে তেমন আমল দেয়নি। এখন নিল আর্মস্ট্রং লোকটি কে–প্রশ্ন করতে মিলি ভরসা পায় না। সাধারণ জ্ঞান তার কম। সে শুধু জানতে চায়, 'তা উনি উড়েছিলেন ?'

আব্বাস পাগলা বলে, 'অফ কোর্স। মগর, বুঝলি না ? এই ইনফর্মেশনটা ব্যাটা সিক্রেট রাখছে। কইলেই তো আমার চিঠির কথাও কইতে হয়। তাইলে অরা ক্রেডিট লইবো ক্যামনে ? নেমকহারামের পয়দাগুলি !' আঙুলের কড়ে ১৯৬৯ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত গুণে সে বলে, 'চাইরটা বছর ভি পুরা হয় নাই, অকুপেশন আর্মি গিয়া চান্দের বহুত এরিয়া ক্যাপচার কইরা রাখছে, বুঝলি ?' চারপাশে একবার দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আব্বাস পাগলা বলে, 'আমি ব্যাকটিরে সাফ কইরা দিবার পারি। ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এ্যাঙ্গেল কইরা এমুন ফায়ারিং করুম, বুঝলি, ফটাফট ফালাইয়া দিমু। প্যাসিফিকের যে স্পটটার মইদ্যে নিল আর্মস্ট্রং নামছিলো, হালারা ঐ জায়গার মইদ্যে পইড়া এক্কেরে ফিনিস হইয়া যাইবো।' একটু থেমে সে আক্ষেপ করে, 'রানায় আমারে দিলো না। একটা স্টেনগান দিবো, —আমারে জবান দিয়া অহন খালি ঘুরাইতাছে ! উই হালায় ভি অকুপেশন আর্মির লাগে লাইন দিছে কৈ যাই ? খালি দালাল, খালি কুইসলিং !' মন খারাপ করার ভঙ্গিতে সে বলে, 'ঠিক আছে ! আমারে তো চিনে নাই। এই কোলাবোরেটারগুলিরে আমি টিকটিকি দিয়াও মারাই না। অহন ঠ্যাকায় পইড়া আইছি। ঠিক আছে একদিন না একদিন তগো ব্যাকটিরে কব্জার মইদ্যে পামু, দুই উংলির মইদ্যে ধইরা তগো মাক্ষির লাহান জাইত্তা মারুম !' নক্ষত্র কি অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে আসা রোদ কি গোলাবারুদের আঁচ এড়াবার জন্য কপালে হাত রেখে লম্বা পা ফেলে আব্বাস পাগলা বড়ো রাস্তার দিকে রওয়ানা হয়। তার ধ্যাপড়া পায়ের নিচে টায়ারের স্যান্ডেল এবড়োখেবড়ো রাস্তায় থ্রাপ থ্রাপ আওয়াজ করে। ডাঙা থেকে শূন্যে ওঠার আগে সে কি পা ঝাপটাচ্ছে ? মিলি খুব মনোযোগ দিয়ে আব্বাস পাগলার হাঁটা লক্ষ করে।

পরদিন সকালে একটা ফোক্সওয়াগন গাড়িতে রানা ফিরে আসে। গাড়ি চালাচ্ছে সে নিজে, মনে হয় মালিকও সে নিজেই। ঘন্টা দেড়েক পর মিলিকে ডেকে রানা জিগ্যেস করে, 'মিলি, আব্বাস পাগলা তোকে ইনসাল্ট করেছে ?'

'না তো !' মিলি অবাক হয়, 'কে বললো ?'

'অনেকেই বললো। আম্মাও জানে। তোকে নাকি ব্যাটা গালাগালি করেছে ?'

'আরে না ! উনাকে তুমি কী নাকি দিতে চেয়েছিলে, তাই নিতে এসেছিলেন। দিচ্ছো না কেন ?'

রানা বিরক্ত হয়, 'ওটা একটা থরোব্রেড বাস্টার্ড !'

রানার তলব পেয়ে আসতে হয় আব্বাস পাগলার ভাইকে। রানা রাগ ঝাড়ে এখন তার ওপরেই, 'এইসব পাগল ছাগলকে ঘরে চেন দিয়ে বেঁধে রাখবেন। না হলে আমরাই যা করার করবো। পাড়ায় এই পাবলিক নুইসেন্স টলারেট করা যায় না।'

ছোটো ভাইয়ের জন্যে রমজান আলীর দুঃখের শেষ নাই, 'তকদিরে নাই, বি.এস.সি. পাশ করবার পারলো না, দুইবার পরীক্ষা দিলো, আমার কতোটি ট্যাহা পানিত ফালাইলাম ! ফেল করলি, কারবারের মইদ্যে ঢোক, বাপ-দাদাগো আমলের কারবার আমাগো । — না, ইস্কুলের মাস্টার হইবো। বিশ বাইশ বছর আগে বি.এস.সি. ফেল করছে, তখন ল্যাখাপড়া আছিলো, ফেলের ভি ভ্যালু দিছে ! সালাউদ্দিন মিয়ার বইনের জামাইরে ধইরা একরামপুর ইস্কুলের মইদ্যে ঢুকলো। ইস্কুল তো অর ভালোই ফিট কইরা গেছিলো। পোলাপানে বহুত ইজ্জত করছে।'

সোহেল না সিডনি না ফয়সল কি নাম, ফর্সা-রোগাটা আব্বাস পাগলার জীবনী শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়, বলে, 'আমি প্রথমে দেখেই বুঝেছি।' সে কি বুঝেছে তা বোঝবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করে রমজান আলী তার বিলাপ অব্যাহত রাখে, 'মহল্লার মানুষে ভি ইজ্জত করছে। চার বছর হইলো এই বিমারি ধরছে। স্বাধীনের টাইমে ইন্ডিয়া গেলো, কৈ কৈ যুদ্ধ করছে, অহন ওয়ার ছাড়া আর কথা নাই। শীতের টাইমে আমাগো ভি পাগলা বানাইয়া ছাড়ে। ৩/৪ দিন বাদে বাদে ফাল পাইড়া চিক্কুর ছাড়বো, কি কমু, ভাড়াইটা থাকবার চায় না। দোতলার ভাড়া বাড়াইতে পারি না !'

'ডাক্তার দ্যাখান, ডাক্তার দ্যাখান।' গাড়িওয়ালা ছেলেটি,- সোহেল না সিডনি না

ফয়সল কি নাম, — তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়, 'ডাক্তার দ্যাখান, ডাক্তার দ্যাখান।'

'ডাক্তারে হাকিমে হাজার বারোশো টাকা বারাইয়া গেছে। ত্যালপড়া, পানিপড়া, শিরনি, তাবিজ—কিছু বাদ রাখছি ?'

গাড়িওয়ালা বলে, 'পাবনা পাঠিয়ে দিন।'

পাবনা পাঠাতে হলো না। রানা এবং ফর্সা-রোগা দু'তিনদিন একটু দৌড়াদৌড়ি করার ফলে পি.জি. হাসপাতালের সাইকাট্রি ওয়ার্ডে লাল ছাপ মারা সাদা চাদর বিছানো শয্যায় আব্বাস পাগলা স্থাপিত হলো। বেলা ৩টার দিকে বাড়ি ফিরে আব্বাস পাগলার কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে রানা দ্যাখে মুখে মাথায় লেপ জড়িয়ে মিলিটা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। এতো বড়ো মেয়েটার ছেলেমানুষি এখনো গেলো না। যখন একেবারে ছোটো ছিলো, একটু একটু পড়তে শিখেছে, তখন খবরের কাগজে মিলি কেবল নিখোঁজ সংবাদ দেখতো। রানাকে বলতো, 'ভাইয়া এই জায়গাটা পড়ো তো।' একসঙ্গে স্কুলে যাবার সময় কোনো ছেলে মেয়েকে একা একা যেতে দেখলে থমকে দাঁড়াতো, 'ভাইয়া, ছেলেটা দেখতে ঠিক ঐ ছবির মতো না ? দ্যাখো, পরনে নীল রঙের হাফ শার্ট, কথা বলে দ্যাখ, ঠিক বাঙলায় কথা বলে।' রানা তো দুই বছরের বড়ো, তার বড়োত্ব দ্যাখাবার জন্যে একটু রাগ না করলে চলে ?— 'দূর ! এ ব্যাটা কোনো বাসায় কাজ করে।' কিংবা, 'আরে দ্যাখো না, হাতে টিফিন ক্যারিয়ার দেখছিস না ? অফিসে ভাত নিয়ে যাচ্ছে।' আবার দ্যাখো, এখন পাগল ছাগলের চিৎকার শোনার জন্যে এতো বড়ো হলো, রানা আস্তে আস্তে ডাকে, 'মিলি !'

মিলি ধরফর করে উঠে বসলো।

রানা বলে, 'আব্বাস পাগলার এ্যাডমিশন হয়ে গেছে। মজনু ভাই টেলিফোন করে দিয়েছিলো। গণভবন থেকে ফোন পেয়ে সাইকাট্রির প্রফেসার বলে, 'পাবনা পাঠাবার দরকার কী ?' প্রফেসার নিজের ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়ে নিয়েছে।' মিলি চুপচাপ শোনে। তারপর রানার খাবার বেড়ে দিয়ে নিজের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ায়। রাস্তার ওপার আব্বাস পাগলার বাড়ির ছাদে শেষ দুপরের রোদ। শীত এসে গেলো। তাদের উত্তরমুখো এই স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে কয়েকটা মাস রোদ পড়বে না বলে মিলির মন খারাপ হয়ে যায়।

মিলির আজকাল জানলায় দাঁড়াবার দরকার হয় না। তাকে নিয়ে তবু মনোয়ারার দুঃখের সীমা নাই। 'সেভেন এইট পর্যন্ত পড়া ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ম্যাট্রিক পাশ করলো। আমার রানাই কতো লোককে পার করে দিলো !' আবার আশরাফ আলীও মিনমিন করে, 'বি.এ. পরীক্ষাটা দে না ! রানা গ্র্যাজুয়েশনটা নিলো না, তুই একবার ফেল করে কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলি ! না হয় প্রাইভেট দে।'

পরদিন দুপুরে মিলি গেলো রেহানাদের বাড়ি। আম্মাকে বললো, 'বইপত্রের সঙ্গে কতোদিন টাচ নেই, ওর কাছ থেকে একটু দেখে আসি।'

রেহানাদের বাড়ির পথে নবদ্বীপ বসাক লেনে হালুইকরের কারখানার পেছন দিয়ে রিকসা যাচ্ছে, মিলি খুব জোরে নিঃশ্বাস নেয়, নাঃ সেই ভ্যাপসা গন্ধটা আজ নাই, কারখানার চুলায় মস্ত কড়াইতে জিলাপি ভাজা হচ্ছে, তার গন্ধ একেবারে পেটের ভেতর ঢুকে যায়, ওর একটু বমি বমি লাগে।

রেহানা বাসায় নাই। ভালোই হলো। থাকলে নাহোক ঘন্টা খানেক তো বসতেই হতো। শীত পড়ে গেছে, হাসপাতালে পাঁচটার পর হয়তো ঢুকতে দেবে না।

ওয়ার্ডটা ছোটো। ১০/১২ টা বেড হবে কি-না সন্দেহ। আব্বাস পাগলাকে দরজা থেকেই দ্যাখা যায়। অর্ধেক-খাওয়া একটা কলা হাতে সে বারান্দার দিকে কী দেখছে। তার ঘাড়ের নিচে বালিশ। মাথা খাটের সঙ্গে ঠেকানো কলা সে ধরেছে লাঠির মতো, আঙুলের ভাঁজ দেখে মনে হয় কলায় অতিরিক্ত চাপ পড়ছে, যে কোনো সময়ে ভেতরকার শাঁস সবটাই বেরিয়ে পড়তে পারে। আব্বাস পাগলার চোখজোড়া সম্পূর্ণ খোলা, কিন্তু এখান থেকে তার চোখের রঙ অস্পষ্ট। ভেতরে ঢোকার আগে মিলি একটু ঘাবড়ে যায় এবং অস্বস্তি বোধ করে। সে একবার পেছনে তাকালো। বারান্দার রেলিঙের পর খানিকটা জায়গা ফাঁকা, তারপর

হাসপাতালের প্রধান দালান। এই দোতলার বারান্দা থেকে আকাশের অনেকটা চোখে পড়ে। হাল্কা রোদে আকাশ প্রায় বর্ণহীন। শীতের শেষ দুপুরবেলায় শূন্যতা সবরকম বাহুল্যবর্জিত ; শূন্যতা ও শূন্যতার গন্তব্য মহাশূন্য তাই ধারালো বর্ণহীনতায় ঝকমক করে। এই বিরান আকাশে আব্বাস পাগলা কি না লিখে ফেলতে পারে। কৈ মিলি তো পারে না ! প্রায় এক মিনিট বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিলি তার টিপটিপ-করা বুক সামলে নিলো। তারপর ঘরে ঢুকে দাঁড়ালো আব্বাস পাগলার বিছানার পাশে।

'স্লামালায়কুম। কেমন আছেন ?'

'ভালো।' আব্বাস পাগলা একটু নড়াচড়া করে, হাতের কলার অবশিষ্ট অংশ মুখে দিয়ে জড়ানো স্বরে বলে, 'রানার বইন না ?' খাটের নিচে থেকে টুল টেনে নিয়ে মিলি বসলে আব্বাস পাগলা বলে, 'রানা কৈ ? রানায় আহে নাই ?'

'ভাইয়ার কি আসার কথা ছিলো ?' আব্বাস পাগলার বহু-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো ভেবে মিলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'ভাইয়ার কিছু নিয়ে আসার কথা ছিলো কি ? ''

'আরে কতো মানুষ কতো কি আনে !' অন্য কোণে একটি বিছানার দিকে আব্বাস পাগলা আঙুল দ্যাখায়, 'দশ নম্বরে এই আপেল আইতাছে, আঙুর আনে, সুপ হর্লিক্স হাবিজাবি কতো কি খায়।'

'ভাইয়াকে কি আনতে বলবো ?' মিলির এই ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে আব্বাস পাগলার স্বরের ক্লান্তি কমে না, একই রকম ধুকে ধুকে সে বলে, 'রানায় আমারে কইয়া গেলো মঙ্গলবারের মইদ্যে একদিন আইবো। কৈ ? দশবারোদিন হইলো আইছি, ব্যাটাই চুঁপটাও মারলো না।'

এই কথা শুনে মিলির বুকের বল ফের ফিরে আসে। সময়ের প্রচলিত বিভাগকে লোকটা অগ্রাহ্য করে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দেড় মাস তো হবেই, দেড় মাস সময়কে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে সে এক সপ্তাহে ছেঁটে ফেলতে পারে।

মিলি জিগ্যেস করে, 'ওকে কিছু বলবো ?'

'কইবি না ? হাসপাতালে ভাত তরকারি বহুত কম দেয়, বুঝলি ?'

'কম দেয় ?' মিলির রাগই হয়, আব্বাস পাগলার মতো মানুষ কম খেয়ে থাকবে কী করে ?

'বহুত কম। কি বালের ইঞ্জেকশন দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখে, পাঁচ ছয় ঘন্টা ঘুমাইয়া উঠি, মনে লয় কি প্যাটের মইদ্যে খালি আগুন জ্বলবার লাগছে।'

শুধু খাবার চাই ? মিলি নিশ্চিত হবার জন্যে বলে, 'ভাইয়াকে কি বলবো ?'

'আমার বহুত ভুখ লাগে রে।' তার খালি পেট আরো ফাঁকা করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, 'রানায় একটা ধমকি দিলে হালারা আমার ভাতের কোটাটা বাড়াইয়া দেয়, বুঝলি না ?'

এইসব শুনতে শুনতে মিলি দেখছিলো, দরজার ওপারে বারান্দা, বারান্দায় রেলিঙ ডিঙিয়ে হাসপাতালের মূল দালান। এই উঁচু দালান দিয়ে মহাশূন্য আড়ালে পড়ে গেছে। না, এখানে শুয়ে সৈন্যসমাবৃত মহাকাশ দ্যাখার কোনো উপায় নাই।

কিন্তু রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়লে আকাশ ও গ্রহনক্ষত্র জুড়ে অস্পষ্ট সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ মিলি একটু একটু দেখতে পারে বৈ কি ! আজ ভাঙা চাঁদের সঙ্গে সাঁটা গোল চাঁদের ছায়া। কোনো একটা উঁচু ছাদ কি পানির ট্যাঙ্কের মাথায় কি ক্রেনের সবচেয়ে উঁচু আঁকে দাঁড়িয়ে আব্বাস পাগলা ওকে আঙুল দিয়ে দ্যাখাচ্ছে, 'দূর ছেমরি, ঐ তো। আরে তুই কি কানা হইলি ? আরে ঐ তো ট্যাঙ্ক দ্যাখতাছস না ? চান্দ থাইকা ঐগুলি আসমানে গেলে উড়বো বুঝলি ? মাটির উপরে নামলে ছুটবো, লাইক লাইক ইলেকট্রিসিটি ; ইলেকট্রিক কারেন্টের লাহান ছুটবো, বুঝলি না ?' মিলি একটু একটু দেখতেও পাচ্ছে, ঐ তো ট্যাঙ্ক। যুদ্ধের পর টিকাটুলিতে খালাম্মার বাড়ির দোতলা থেকে ওরা এইসব ট্যাঙ্ক দেখে এসেছে। তবে ঐগুলো চলে পানিতে ও ডাঙায়।

আর এগুলো ? আব্বাস পাগলা বলছে, 'এইগুলি উড়াল দি দিবার পারে, এইগুলির মইদ্দে ইবলিসের ব্রেন ফিট করা, বুঝলি না ?' ব্রেনওয়ালা সেইসব ট্যাঙ্ক মিলির চোখের সামনে স্পষ্ট আকার নিতে শুরু করেছে, এমন সময় শুরু হলো প্রবল গুলিবর্ষণ। সমস্ত আলো নিভে গেলো। কাউকে আর দ্যাখা যাচ্ছে না। ইস ! এই গোলাগুলির জবাব দেওয়ার মতো একটা গ্রেনেডও আব্বাস পাগলার সঙ্গে নাই। মিলির রাগ হয়, তোমাদের ঘরে ঘরে স্টেনগান, এলেমজি, এসেমজি। তোমাদের পকেটে পকেটে রিভলভার, পিস্তল। তোমাদের বগলে কুঁচকিতে গ্রেনেড। একটি মাত্র অস্ত্র দিয়ে এই লোকটির হাত দুটোকে তোমরা তৈরি করতে দিলে না ? দ্যাখো কি রকম ফায়ারিং চলছে, এখন তোমরা কী করবে ?– 'মিলি ! এই মিলি ! খাট থেকে নাম, নিচে নেমে শুয়ে পড় !' গুলিবর্ষণের প্রবল আওয়াজে আম্মার ফিসফিস কথা ভালো করে বোঝা যায় না।

মিলি উঠে বসলো। ঘর অন্ধকার। দরজা জানলা সব বন্ধ। ঘরের ওপরের দিকে ভেন্টিলেটর দিয়ে আবছা আলো আসছে, ছাদের দুই বর্গার ফাঁকে চুনসুরকি-খসা একটা ছোট্টো জায়গায় পড়ে সেই আলো আর নিচে নামে নি। রনি বলে, 'আপা, মেঝের ওপর শুয়ে পড়ো।' লিলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'জানলার ওপারেই !' মিলিকে কে যেন টেনে মেঝেতে প্রায় গড়িয়ে নামালো। তাদের এইসব কান্ড কারখানায় মিলির হাসি পায়; চাঁদে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবার জন্য শত্রুসৈন্য নিচে গোলাবর্ষণ করে চলেছে, আর এরা ধরে নিয়েছে যে গুলি চলছে জানলার বাইরে গলিতে !– এদের এখন বাঁচায় কে ? কানের একেবারে কাছে শোনা গেলো, 'সরে যা, জানলা দিয়ে গুলি–।' মনোয়ারার বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। 'গলিতেই, না ভাইয়া ?'– এবার রনির গলা। 'না না ভাইয়া যে বললো বড়ো রাস্তা–।, লিলি শেষ করতে না করতে আশরাফ আলী সাবধান করে, 'আঃ। বেশি কথা বলো কেন ? কে কোথায় শুনে ফেলবে ?' গোলাগুলির চেয়ে আই.বি'র লোকের ভয়ে আশরাফ আলী বেশি তটস্থ। 'বোধহয় বড়ো রাস্তায়।' রানা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে এই কথা বললো বটে কিন্তু তার চাপা স্বরে বোঝা যায় বেচারা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে তার হাতে ধাতব অস্ত্রের শীতলতা টের পাওয়া যাচ্ছে। তার হাতের অস্ত্রের কথা কি সবাই বুঝতে পেরেছে ? সেই জন্যই কি মনোয়ারা, আশরাফ আলী এবং রনি ও লিলি একেবারে চুপ হয়ে গেলো ?

গুলিবর্ষণ বন্ধ হওয়ার মিনিট বিশেক পর মনোয়ারার চাপা অনুনয় উড়িয়ে দিয়ে রানা চলে গেলো নিজের ঘরে। ওর ঘর মানে ওর বাবারও ঘর। তবে আশরাফ আলী নিজের ঘরে না গিয়ে শুয়ে থাকে এই ঘরের মেঝেতেই। ভোর হওয়ার আগে আগে আব্বা ও রানার ঘরে গিয়ে মিলি দ্যাখে টেবিলে মাথা রেখে রানা চেয়ারে বসে রয়েছে। তার বড়ো বড়ো চুল ছুঁয়ে আলগোছে শুয়ে রয়েছে ছিদ্রওয়ালা একটা লোহার অস্ত্র। যুদ্ধের পর এই জিনিসটি নিয়ে রানা বাড়ি ফিরেছিলো। এটা নিয়ে ভাইয়া তখন কতো কথা বলতো। আর এটা এখন কোথায় রাখে, কখন লুকিয়ে নিয়ে বেরোয় কিছু জানা যায় না। ভাইয়াটা কি হয়ে যাচ্ছে, কতোদিন চুল কাটে না ! মিলি কি রানাকে এখন জাগিয়ে দেবে ? থাক, বেচারা আরেকটু ঘুমিয়ে নিক।

সকালবেলা জানা গেলো বড়ো রাস্তার মোড়ে ব্যাঙ্ক লুট হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের দরজায় দুটো লাশ ধুলায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

আজকাল মিলির সারাটা সকাল কাটে রানার ঘরে। রানার চেয়ার টেবিলে সে পড়ে, রানার ও আব্বার জিনিসপত্র গোছায়, রানার স্যুটকেস খুলে মাঝে মাঝে কাপড় চোপড়ের নিচে অস্ত্রটিকে দ্যাখে এবং মুছে রাখে। গোসলের আগে আম্মাকে একটু আধটু সাহায্য করে। রান্নাবান্নার ব্যাপারে মিলিটা আনাড়ি, কিছুক্ষণ রান্নাঘরে থাকলে আম্মা নিজেই পাঠিয়ে দেয়। দুপুরবেলা পর্যন্ত রানার ও আব্বার ঘরের বাইরে ওকে আসতে হয় না। মাঝে মাঝে মনোয়ারাকে বলে, 'আম্মা, রেহানাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। তা আজ যাবো কাল যাবো করতে করতে যাওয়ার আর দরকার হলো না।

মার্চের প্রথমদিকে আম্মার কথা মতো মিলি লেপকাঁথা ট্রাঙ্কে তোলার আয়োজন করছে, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়লো।

'কেমন আছো মিলি ? ভালো ?'

ক্লিন শেভ-করা গাল, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পাট ভাঙা শার্টপ্যান্টের ভেতরে আপাদমস্তক আব্বাস পাগলা।

ঝকঝকে দাঁতে সে হাসছে, 'মিলি, ভালো আছো ? রানা কোথায় ?' 'আপনি ?' মিলি বলে, 'কবে এলেন ?'

মুখের হাসি অব্যাহত রেখে আব্বাস পাগলা জানায়, 'পরশু দিনের আগের দিন। তোমার লগে'— এক পলক বিরতি দিয়ে আব্বাস পাগলা বলে, 'একটু ব্যস্ত ছিলাম, তোমার সঙ্গে দ্যাখ্যা করতে পারি নাই।' মিলি একটা মোড়া পেতে দিলে আব্বাস পাগলা প্যান্টের ক্রিজ অক্ষত রাখার উদ্দেশ্যে খুব আলগোছে বসে। বলে, 'রানার সঙ্গে আমার দ্যাখা হইছিলো, দ্যাখা হয়েছিলো। তে রানায় বলে তুমি নাকি কৈ বেড়াইতে গেছো, কোথায় নাকি বেড়াতে গেছো।' কথা ভালো করার জন্য আব্বাস পাগলাকে একই বাক্য দুবার করে বলতে হয়, 'তা কোথায় গেছিলা ? কবে আসছো ? এসেছো কবে ?'

'না, কোথাও যাইনি তো !'

'বুঝছি !' আব্বাস পাগলা লাজুক লাজুক হাসে, 'মিলি, তুমি হাসপাতালে গেছিলা, রানা জানে না, না ?'

মিলি জবাব না দিলে মসৃণ গালে একস্ট্রা রঙ উপচে পড়ে। এছাড়া গালের ও ঠোঁটের কোণে গুপচিতে তার লাজুক হাসি বড়োলোকের বিয়ে বাড়িতে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে লালনীল বাল্বের মতো মিটমিট করে জ্বলে। বিয়েবাড়িতে এইসব টিমটিম করা আলোতে মিলি অস্বস্তিবোধ করে। কিন্তু এখন সে ঐ আলো টালো লক্ষই করে না। কারণ আকাশজুড়ে আব্বাস পাগলার দ্যাখা ছবি সে নিজের চোখে দ্যাখার জন্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত গুছিয়ে নিচ্ছে।

আব্বাস পাগলা বলে, 'মিলি, রানাকে একটু দরকার ছিলো।'

'এক মিনিট' বলে মিলি রানাদের ঘরে গেলে আব্বাস পাগলা বলে, 'মিলি, এখন চা দিও না।'

মিনিট তিনেক পর শাড়ির আঁচলের ভেতর হাত গুটিয়ে মিলি ফিরে আসে।

'রানা নাই, না ? রানার সঙ্গে একটু দরকার ছিলো।'

'এই জন্যে তো ?' আঁচলের ভেতর থেকে হাতজোড়া বের করে মিলি তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আব্বাস পাগলা তখন মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ায়, 'এ কী ?'

মিলি দুই হাতে শিশুর মতো করে শোয়ানো স্টেনগান এগিয়ে ধরলো, 'তাড়াতাড়ি নিন। আম্মা এসে পড়বে।'

আব্বাস পাগলার ফিটফাট মুখ ঝুলে পড়ে, তার মুখ এখন একরঙা, মানে কেবলি কালো, তার লালনীল হাসির মিটমিটি বাল্ব সব ফিউজড হয়ে গেছে, সে বিড়বিড় করে, 'মিলি আমি না ভালো হইয়া গেছি। তুমি বোঝো না ? আমার ব্যারাম ভালো হইয়া গেছে।'

কিন্তু মিলির হাতের ভঙ্গি অপরিবর্তিত। সে কেবল আব্বাস পাগলার চোখ দেখছে। ঐ চোখজোড়ায়-দ্যাখা সমস্ত ঘটনা মিলি নিজে দেখতে পারলেই আব্বাস পাগলার সঙ্গেও শত্রুপক্ষ ঠেকাবার কাজে নেমে পড়তে পারে। কিন্তু আব্বাস পাগলার চোখের বহুবর্ণ জমি ঘুমের ঘষায় ঘষায় পানসে সাদা হয়ে গেছে। তার দুই চোখের রঙ-জ্বলা কালো মণি পদ্মপাতায় জলের মতো টলমল করে -- কখন পড়ে কখন পড়ে। মিলি তাই বলে, 'ও।'

'রানারে একটু বুঝাইয়া কইয়ো। রানারা কয় বন্ধু একটা ইন্ডেটিং ফার্ম করছে। রানা ইচ্ছা করলে আমারে প্রভাইড করতে পারে।'

মিলির চোখজোড়া এখন সম্পূর্ণ হাট করে খোলা। মনে হয় চোখের গহ্বরে আব্বাস শুদ্ধ বারান্দাটা গ্রাস করে নেওয়ার জন্য মনে মনে সে মন্ত্র পড়ছে। আব্বাস মাস্টারের গা শিরশির করে ওঠে। তার সাফ-সুতরো মাথার কাঠামো একটুখানি কাঁপে। 'মিলি, আমি ভালো হইয়া

গেছি। আচ্ছা আসি।' বলে আব্বাস মাস্টার বারান্দা থেকে টলোমলো করে নামতে না নামতে মিলি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

ঘরে এসে মিলি আধ মিনিটও দাঁড়ায় নি। ভেতরের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে উঠে সে দ্যাখে যে ধোয়ামোছা মসৃণ ঘাড় নিচু করে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে আব্বাস মাস্টার। গোলগাল মুণ্ডুটা তার অতিরিক্ত নোয়ানো। এটা তার ধড়ের সঙ্গে কোনোমতে সাঁটা। তার পেছনে আর একটি মানুষ, এর মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটিও সংশ্লিষ্ট ধড়ের ওপর ঢিলেঢোলা ভাবে ফিট-করা। কয়েক পা এগিয়ে গেলে এই দুটোর কোনটা যে আব্বাস মাস্টারের তা ঠাহর করা যায় না। এদের পর আর একজন পানের পিক ফেলে উল্টোদিকে হাঁটে। পরের লোকটি হাঁটে পানের পিক না ফেলে। এর পর দু'জন লোক হাঁটছে পাশাপাশি। ডানদিকেরটা চশমার ভেতর দিয়ে মিলিকে দেখতে দেখতে হাঁটে। চশমাবিহীন বাঁদিকেরটা হাঁটে মিলিকে না দেখতে দেখতে! এইসব পার্থক্যে কিছু এসে যায় না, কারণ গলির মাথায় পৌঁছবার আগেই সবগুলো মুখ একই রকম ঝাপশা হয়ে আসে। ওখানে বড়ো রাস্তায় বড্ডো ভিড়। ট্র্যাফিক পুলিসের বাঁশির অবিরাম শব্দে রিকসা, স্কুটার, হোন্ডা, কার, বাস, ট্রাক, ঠেলাগাড়ি এবং পথচারীরা সব একই তালে এবং একই গতিতে নড়াচড়া করে, একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করে সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ কি রঙবাজি শুরু হলো, দুপুরবেলার রোদে মানুষ ও যানবাহন ও রাস্তা ও ট্র্যাফিক পুলিসের দাঁড়াবার উঁচু জায়গা ও ফুটপাথ ও রেস্টুরেন্ট ও দোকানপাট ও তারের জটা-মাথায় ইলেকট্রিক পোল—সবাই মিলে মিশে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে? ওমা! এ কী ধরনের রোদ? আকাশের দিকে মুখ তুললে মিলি টের পায় যে চারদিকের বাতাস চাপা হয়ে আসছে। চাঁদ তাহলে এতক্ষণে শত্রুর কব্জায় চলে গেছে! দখলকারী সেনাবাহিনীর একনাগাড় বোমাবাজিতে চাঁদের হাল্কা মাটির ধুলা এবং বারুদের কণা নিচে ঝরে পড়েছে। রোদ ও বাতাস তাই ধোঁয়াটে ও ভারি, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বৈ কি! হাতের স্টেনগানের ইস্পাতে আঙুল বুলাতে বুলাতে পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে মিলি আরো ওপরে দ্যাখার চেষ্টা করে। রাস্তায় মানুষজন ও যানবাহন তো বটেই, ইলেকট্রিক তারের জটাধারী পোল এবং আশেপাশের ছাদের টেলিভিশনের এ্যান্টেনাগুলো পর্যন্ত তার চোখের লেবেলের নিচে। তবে কি-না চাঁদের রেঞ্জ এখনো মেলা দূর, ওকে তাই দাঁড়াতে হয় পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। এতে হচ্ছে না। এবার একটা উড়াল দেওয়ার জন্য মিলি পা ঝাপ্টায়।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

ধনুকের মত বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়ীটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ী। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়ীটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঠাল গাছে ভরা জঙ্গলের মত জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছা আবৃত মাটিতে ভ্যাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হতো? সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় সখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মত করে নিতো। যত্ন করে লাগাত মরশুমী ফুল, গন্ধরাজ, বকুল, হাস্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসতো। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হাল্কা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিতো। তারপর গা ঢেলে বসে গল্পগুজব করতো। আমজাদের হুঁকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো। কাদের গল্প প্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনীময় হয়ে উঠতো। কিংবা পুষ্পসৌরভে মাদর জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই বা কী এসে যেতো? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করতো তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে-থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়ীটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই, তাদের সামরিক শক্তিমান অনুমান করে বাড়ীর মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো, তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ-শহরে এসে তারা যেমন তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদযাস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়ীটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়ীতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশ পলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ী চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু এমন বাড়ী পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। অবশ্য সে-ভয় কাটতে দেরী হয় না। সে-দিন সন্ধ্যায় সদলবলে এসে তারা দরজার তালা ভেঙ্গে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়ীটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মত মনে হয় না। কোন অপরাধের চেতনা যদি-বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাথিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার উপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোট্ট ঘরটি, তাতেও চার চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো শুধু

বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই ফুটের চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কণ্ঠে বলে, আপনাদের তকলিফ আমরা কী বুঝি না? একদিন আমরা কী কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সে-ই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা-ভরা উক্তিতে।

ঐ ঘরটা?

নীচের তলায় রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভালো করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্চিতে বাঁধা দুটি বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘন্টা হলো এ্যাকাউন্টস-এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানা-পত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ীর বারান্দায় আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হতো।

নেহাৎ কপালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খল খল করে ওঠে। যদি ঘন্টা দুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে আলোতেই দিব্যি চলে যাবে।

বা কিপ্পনতা যদি করতে চায় —

অবশ্য এসব কথা পরাহত বাড়ী সন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথা সময়ে বে-আইনী বাড়ী দখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ আসে।

সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমত মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে এরা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কী বাড়ী উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না। দু দিনের মধ্যে মস্ত বাড়ীটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময় মত এখানে না এসে শহরের অন্য কোন প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়ী দখলের ফিকিরে ছিলো। মন্দ ভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকার স্বস্ব এক কথা, অন্যায়ের উপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা। হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রুখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানী মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্রঘরের ছেলে। বাড়ী দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা ভাঙ্গি নাই, ইঁট-পাথর খসিয়ে চোরা বাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইন-কানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়ীওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর রব তোলে। যাবো কোথায়? সখ করে কী এখানে এসে উঠেছি?

সদলবলে সাব-ইনস্পেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না-বেহক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো উপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে, এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ী দখলের বিষয়ে সরকারী আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বলোনা কাউকে কিন্তু।

কথাটা অবশ্য কারোই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটির গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উস্কানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে, কী হে, চা-মিষ্টি হয়ে যাক।

রাতারাতি সবগরম হয়ে উঠে প্রকাণ্ড বাড়ীটা ? আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না — শুধু এ-বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলা-মেলা ঝকঝক তকতকে এ-বাড়ী তাদের মধ্যে একটা নূতন জীবন সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসী পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তুলনায় এ-বাড়ীর বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে মস্ত মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মত আম-জাম-কাঁঠালের বাগান —এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মত এক একখানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো-বাতাস কখনো তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনীতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার দু-হাজারওয়ালাদের মত মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জৌলুষ আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধি মুক্ত হবে। রোগাপটকা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যে পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলার আবর্জনা ভরা ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়ীতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁতসেতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকতো যে রাস্তার ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছতো না, ঘরের কোণে ইঁদুর-বেড়াল মরে পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিলো। ইউনুসের জ্বরজারী লেগেই থাকতো, থেকে থেকে শেষরাতে কাশির দমক উঠতো। তবু পাড়াটি ছাড়েনি এক কারণে। কে তাকে বলেছিলো, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য তো করতোই, সময় সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ীর নিশ্ছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নিতো। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা যায় নাই!

খানাদানা না হলে বাড়ী সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মোঘলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেরই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানির হাতে শেখা বিশেষ ধরনের পিঠা তৈরীর কৌশলটি শেষ পর্যন্ত অখাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ-প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে। গানের আসরও বসে কোন কোন সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লা কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমোনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে এবং নিজের গলার বলিষ্ঠতার উপর ভর করে নিশিথ রাত পর্যন্ত একটি অবক্তব্য সঙ্গীত সমস্যা সৃষ্টি করে।

এ-সময়ে একদিন উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ-হাত উঁচু ইঁটের তৈরী একটি মঞ্চের উপর তুলসী গাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠানে পায়চারি করছিলো, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ শীতল করা রৈ রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্র কেউ কেউ ছুটে আসে উঠানে।

কী ব্যাপার ?

চোখ খুলে দেখ!

কী ? কী দেখবো ?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিলো বলে প্রথমে তুলসী গাছটা নজরে পড়ে না তাদের।

দেখছো না ? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছো না ?

উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ-বাড়ীতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোন হিন্দুয়ানীর চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে।

গায় সবুজ রঙের পাতায় খয়েরী রঙ ধরেছে। নীচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়তো বহুদিন তাতে পানি পড়েনি।

কী দেখছো ? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল।

এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। আকস্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে-বাড়ী এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা ক-টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে বাড়ীটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিলো, সে-বাড়ীর চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসী গাছটি হঠাৎ সে-বাড়ীর অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ্য করে মোদাব্বের আবার হুঙ্কার ছাড়ে।

ভাবছো কী অত ? উপড়ে ফেলো বলছি।

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই। তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়ীতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকীত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের নীঝর এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ-প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যে বন্ধ থাকে নাই।

যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায় ? মতিন একসময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়েপট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ার রেলওয়েপট্টিতে সে-মহিলা কোন আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ী সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে শাড়ীটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্ণভাবে সে শাড়ীটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোন চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কী হয় নাই, আকাশে যখন দিগন্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে বলে,

থাক না ওটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাব্বের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আছে, সকালে নিয়মিতভাবে কোরাণ তেলাওয়াৎ করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতিসন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কী ?

অক্ষত দেহে তুলসীগাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে সেটি রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পরমুহূর্তেই অসচেতনায় নিমজ্জিত হয়, তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছু-পা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই ফলে সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাক-বিতণ্ডার স্রোতে মনের সে দুর্বলতা-অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্যদিনের মত রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

— ওবাই তো সবকিছুর মূলে, মোদাব্বেব বলে। উলঙ্গ বালব্-এব আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে। — তাদেব নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যই তো দেশটা ভাগ হলো।

কথাটা নূতন নয়। তবু আজ সে উক্তিতে নূতন একটা ঝাঁঝ। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদেব অবিচাব-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের বক্ত গবম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।

দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ কবে। বলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী?

মোদাব্বেরেব ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হযতো তাব বিশ্বাসেব কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে বান্নাঘবেব পাশ দিয়ে যাবাব সময তুলসী গাছটা মোদাব্বেবের নজবে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হযে পাবে না। তাব তলে যে আগাছা জন্মেছিলো সে আগাছা অদৃশ্য হযে গেছে। শুধু তাই নয়। যে গাঢ় সবুজ পাতাগুলো পানিব অভাবে শুকিয়ে খযেবী রঙ ধবেছিলো, সে পাতাগুলো কেমন সতেজ হযে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটিব যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে।

মোদাব্বারের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি সাঁ করে কচু কাটাব কায়দায় সে তুলসী গাছেব ওপব দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিযেই। তুলসী গাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসী গাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসেব সর্দি সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিলো। তুলসী পাতাব বসের প্রযোজন হয নাই তাব।

তাবা ভেবেছিলো ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্রকম্যানেব জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুব আলো-হাওয়ার মধ্যে নূতন জীবন শুরু কবেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরী হয় না। তবে শুধু ততখানিই দেবী হয যতখানি দবকার সে বিশ্বাস দৃঢ় পরিণত হবাব জন্যে। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদাকণই মনে হয।

সেদিন তাবা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালেব পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ী বান্নার আয়োজন শুক কবেছে, এমন সময় বাইবের সিঁড়িতে ভারী জুতার মচ্‌মচ্ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবাব উঁকি দিয়ে মোদাব্বের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস কবে বলে।

পুলিশ? আবাব কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়তো রাস্তা থেকে কোন ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়ীতে ঢুকেছে এবং তাবই সন্ধানে পুলিশের আগমন হযেছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খবগোসেব গল্পের মত ঠেকে। শিকারীর সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুজে বসে পড়ে খরগোস ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কী চোর নয়? সব জেনেও তারাই কী সত্য কথাটা স্বীকার না করে এ-বাড়ীতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্যে?

পুলিশদের নেতা সাবেকী আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটিকেও মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন কড়িকাঠ গোণে। ওপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়তো সে কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশুপক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার ?

আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট্ করে উত্তর দেয়। আপনারা বে-আইনীভাবে এ-বাড়ীটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতূহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিকে চেয়ে থাকে।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাড়ী ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে মোদাব্বের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে, কেন, বাড়ীওয়ালা নালিশ করেছে নাকি ?

এ্যাকাউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনস্টেবল দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে বাড়ীওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

কোথায় বাড়ীওয়ালা ? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশ-দলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয়ে যেন।

তবে ?

গভর্নমেন্ট বাড়ীটা রিকুইজিশন করেছে।

এবার আর হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোন কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়।

আমরা কী গভর্নমেন্টের লোক নই ?

এবার কনস্টেবল দুইটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ্ড সে-বাড়ীতে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেবে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানা রকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে ; যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরী হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা ?

পরদিন মোদাব্বের যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চব্বিশ ঘন্টা থেকে সাতদিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেও সে ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার মোদাব্বের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না-বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ী ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মত এসেছিলো, তেমনি ঝড়ের মতই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়ীতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে সেখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকে খবর-কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরী রঙ। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি।

কেন পড়েনি সে-কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

শওকত ওসমান

আখেরী সংক্রান্ত

সলিম চাচাই প্রথমে জিদ ধবলে। পূর্ষোপুর্ষি চলে আসছে, আর এ বছর হবে না ? এ কেমনতব কথা ? পাড়াব অন্যান্য সকলে গা কবেনি। গা করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। খরচ আছে। গাঁওয়ারা তাজিয়া বের করতে অন্তত দু'শ টাকা। এত টাকা হয়তো চাঁদায় তুলতে হবে। কিন্তু যে-অবস্থা, জোর-জববদস্তিতে দু'চার আনা জোগাড় হোতে পারে সুহিল্লেয কেউ হাত উপুড় কববে না। এখন চাচার উপব নির্ভর। পাড়াব মুরুব্বী মানুষ, রাস্তা বাংলানোব মালিকও তিনি।

প্রথমে যতটা কঠিন ভাবা গেল, কাজে নেমে তা আব বইল না। চাঁদা উঠতে লাগল। পাড়ার কুঁচো ছেলেরা পাড়াব বাইবেও নুলো বাড়ালো, হালফিল নতুন পয়সাওয়ালাদেব যেদিকে ঘাঁটি। আব এমন একটা সওয়াবের কর্ম। না বলবে কে ?

চাচাই বললে, এবার মিস্ত্রী ডাকিযে আমবা দুল্‌দুল্‌ বানাব যেন খুব চোখে-ধবা জিনিস হয। লাঠি-খেলা তো উঠেই গেছে। চাচা নিজে ছিলেন এককালে ভাল খেলোয়াড়। এবাব নিজেই তালিম দিলেন আব বললেন, জোওয়ান পোলাবা এক-আধটু নেশা হয়তো কববে মিছিল নিয়ে যাওয়ার দিন, কিন্তু মাৎলামি চলবে না। নিজে কী কড়া শাস্তি দেবেন এমন বেযাদবদেব, তাও খিস্তি সহযোগে বয়ান কবলেন সলিম চাচা। এ ব্যাপারে তাব শাসন কড়া সবাই জানে।

এসব তো হোলো। পুরাতন উল্লিঝুল্লি ট্যানা, কাঁথা তাও কিছু দবকার। বাত্রে মশাল না জ্বালাতে পারলে আর মিছিলের জৌলুস কী ? এসব জোগাড়ের ভার পড়েছিল আমাব উপব। চাচা বললেন, সদরুদ্দি, এদিকটা দেখো। মশালেব ব্যবস্থা কবতেই হয়। পাড়ার বেশনওয়ালা দু'টিন কেবোসিন চাঁদা দেবে। সোবহান আল্লা ! অবিশ্যি আবো কয়েক টিন কিনতে হবে। তবু এ কী কম উপকাব ? পুরাতন লেপ-তোষক ছেঁড়া তাও জোগাড় হয়ে গেল। পাড়ায় দুই ঠেলাওয়ালা ছিল, তাবা বললে আখেবীব দিন গাড়ী দেবে অর্থাৎ নিজেবা টানবে। তোফা জৌলুস ! গোড়ায় যাবা নিমরাজী ছিল যথা আর্শেদ চাচা, রফিক মাদবব, অগয়রহ সবাই নানা কাজে কাঁধ দিলে। তোফা জৌলুস ! মাল আব জান্‌ এক ঠাঁয মিশলে দুনিয়াই ফতে কবে ফেলা যায, এ তো মহব্বমেব দশ দিন, এক পাড়াব ব্যাপাব।

মহল্লা গেঁজে উঠল। আখড়া সরগবম। কাবণ, সব ঠিকঠাক, খাপ খেযে আসছে। ঘ্যাচ। কিন্তু কল বিগড়ে গেল একদম আখেবে।

সলিম চাচা আমাকে ভালবাসে। কাবণ বছব দুই ইস্কুলে গিযেছিলাম। খববের কাগজ চাচাকে পড়িয়ে শোনাতে পাবি। হাতেব পাঁচ আমি। সুতবাং পাক্‌ড়া গেলাম। বললেন, সদরুদ্দি, তুমি নিজে যাও। এ ছেলেছোকবার কাজ নয়।

ফ্যাসাদেব কথাটা বলে ফেলি। মহব্বম ত হবে। কিন্তু ঢোলের বাজনা ছাড়া এসব জমবে নাকি ? মিছ্‌বীব সুতো ওই আওযাজ। শেষে দেখা গেল, ঢুলী পাওয়া যাচ্ছে না। নদীব ওপার জেলেপাড়া। চাচা লোক পাঠিযেছিলেন, কিন্তু ঢুলী নেই। তাই আমার উপব ববাদ্দ। সেই জন্যেই আজ আপনাদেব গল্প বলাব সুযোগ পেলাম। দিনটা মনে থাকাব মত।

মাথাব উপর বোঝাটা কত ভারী, একটু আন্দাজ করুন। হাতে একটা বিকেল আব গোটা

বাত আছে। কাল সকালেই পযলা মহব্‌রম, আখ্‌ড়া বসবে। ঢুলী চাই-ই। কোন রকমে সাবা যেত ব্যাপারটা। কিন্তু পাশেব মহল্লাও এবার খুব সাজছে-গুজ্‌ছে। চাচা কাবো বাঁয়ে বওয়াব ছেলে নন। টেক্কা মারা চাই-ই সব কাজে। মুরুব্বি মানুষেব মনে যদি এমন ফখব থাকে, তা ধর্তব্যেব মধ্যে আসে না।

একজনেব সঙ্গে বেবিয়ে পড়লাম। গানবাজনা এদেশ থেকে উঠে যাযনি। একটা ঢুলী পাব না? এ কখনও হোতে পারে না।

প্রথমে ধাক্কা দিলে নদী। কথায বলে আড়ে নদী সতব ক্রোশ। জোযাব ছিল। মাঝি খেয়া নিযে গেছে ওপাবে। ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি। নদী পাব হোতে হোতে বেলা প্রায শেষ। তাবপব দু'মাইল হাঁটলে জেলেপাড়া। চান্নী বাত আছে' সেই আকাশ-পিদিমই ভরসা। একটা হ্যাবিকেন সঙ্গে না নিযে ভুলই কবেছি।

সাঁঝ লেগে গেল। এখন বুঝলাম, যাবা বেগব ঢুলী-জোগাড কেন ফিবে গেছে। বেশীব ভাগ ভিটে খাঁ খাঁ করছে। লোক আছে বা নেই। এক ভিটেয উঠতে গিযে বাঁ দিকে শেযাল পড়ল, পালাচ্ছে। দু'জনেই ভয় পেযেছি। তবে যাত্রাটা ভালই মনে হচ্ছে। আপনাবা এসব মানেন আর না মানেন, আমার সেদিন মনে সায দিচ্ছিল, ব্যবস্থা কবতে পাবব। চাচাব কাছে আমাব মুখ বাঁচবে।

পেবেসানিব শেষ থাকে না। প্রথমেই আমাদেব খবব পায পাড়াব কুকুব-কুল। তাবপব মানুষ, যদি দু-একজন থাকে। এখন সাঁঝ পহব। কিন্তু গাঁ-টা যেন নিশুত। ভিটায উঠে ডাকাডাকি কবলে, সাড়া পাওযা যায না। এক জাযগায জোব কবে উঠলাম। অনেক হাঁকাহাঁকিব পব এক বুড়ী বেরুল। হাড়গোব চেহাবা। চি চি শব্দে কী যেন জবাব দিলে সেই জানে। একে, একে দিয়ে আব কী কাজ হবে? আবাব ভিটে থেকে নামি। আব এক জাযগায এক বুড়ো বেরিযে এলো। সে হাঁপানি বোগী। তাকে কিছু জিজ্ঞেস কবাই বৃথা।

বাগে আমাব জিদ চড়ছিল। শেষে ঠাণ্ডা। হাল্লাক হেঁটে হেঁটে। তামাম এলাকা ঘুবে দেখব, এমন নিযত তবু ছাড়িনি। সে একদম মনেব ভেতবেব কথা। বাইবে সঙ্গীকে নিযে এক জাযগায বসে জিবিযে নিলাম।

চাঁদ বাস্তা দেখাচ্ছে, সেই সান্ত্বনা, হোঁচট খেতে হচ্ছে না।

বাত এগারোটাব দিকে এক ভিটেয উঠলাম। বনফুলেব গন্ধ পাওযা গেল। কিন্তু নাক তখন কিছু নিতে বাজি না। হাঁক দিলাম, কেউ আছো নি?

কোন জবাব আসে না।

পাঁচ-সাতটা খুপ্‌বী খুপ্‌বী ঘব। ভাবলাম, এখানে নিশ্চয মানুষ আছে; তাই প্রথমে উঠানে দাঁড়িযে অনেক হাঁক হাঁকলাম! সব বেফজুল। তাই আবো একহাত এগিয়ে গেলাম। এবাব দরজায ধাক্কা। ধাক্কা কাজ দিলে। ঘরের ভেতব মানুষেব নড়াচড়া শোনা যায।

কেউ বাড়ী আছো নি?

কে — বা —

দবজা খোলেন।

কি চান?

এই আওয়াজে আশ্বস্ত হই।

একবাব দবজা খোলেন, বাইবে আসুন।

ক্যান?

বাইবে আসুন না।

কিন্তু আবাব সব নিঝ্‌ঝুম। ডাক দিই তবু সাড়া মেলে না।

শেষে হাঁক দিলাম, ও বাবা, আমবা চোব-ডাকাত নই। বিপদে পড়েছি। দবজা খুলুন।

এতক্ষণে সিসেম খুলল। বিপদের দোহাই কাজে লাগে।

বেরিয়ে এলো এক বুড়ো। সত্তরের কাছাকাছি বয়স। আন্দাজ করলাম কুঁজো ভাব দেখে। মুখ তো দেখাব কথা নয়। তাও দেখলাম একটু পরে যখন পিদিম জ্বালিয়ে নিয়ে এলে বুড়ো গোবিন্দ জলদাস।

বাবাবা কী চান ?

আমবা বিপদে পড়েছি।

কন কী কবা লাইগব।

আপনি ঢোল বাজান ?

এককালে বাজাতাম।

ইতিমধ্যে বুড়ো পিড়া এনেছে ঘব থেকে। আমবা মুখোমুখি বসা। এখন বাজান না ?

না, বাবাধন। সখবখ হব গ্যাছে গ্যা।

এখানে কোন ঢুলী পাওয়া যাবে ?

না।

বহু উপর থেকে কে আমাকে আমি এবং আমাব সঙ্গীকে আছড়ে ফেলে দিলে।

বুড়ো কল্‌কে সেজে এনে দিল। ধোঁয়া ছাড়ি আব চাবদিক হাতড়াই।

দ্যাখেন, আপনাকে বলতে সাহস হয় না, আপনি যেতে পাবেন না ? এককালে তো বাজাতেন। খুব দবকাব।

বাবা, ঘাটেব মড়া, আমারে –

আমবা আবো অনুনযেব মহড়া চালাই।

বুড়ো শেষ বায় দিলে : হব গ্যাছে গ্যা বাবাবা। অহন আব কী বাজাইতাম। ভুইল্যা গ্যাছি গ্যা।

কাল আমাদেব মহর্‌বম শুরু। সকাল থেকেই ঢোলেব দবকাব। যদি ঢুলী না পাই – বুড়ো মাঝপথে আমাকে থামিযে দিযে অজানিত উত্তেজিত স্বরেই বলে, কী কইলেন ?

কাল আমাদেব মহব্‌বম। ঢুলী পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

কী কইলেন ? কিন্তু বুড়ো আব আমার জবাব শুনতে রাজি নয়। হঠাৎ সবল মানুষের মত উঠে পড়ে পাশেব এক ঘরের দিকে সে আড়াল হোযে গেল।

আমরা দুইজন থম্ব। বসে থাকি। কিছুক্ষণ পরেই বুড়োব গলা শুনতে পাই, গগন, জল্‌দি উড্‌। ভদ্দর লোকবা বইস্যা আছেন।

বুড়ো ফিবে এলো সঙ্গে আব একজন জোযান, তবে মুখে কৃচ্ছতাব দাগ বোঝাই। বুড়ো বলে চলে, এদেব বড় ঠ্যাকা। পববেব কাম — পুণ্যকর্ম — ঝুট কইযা তো ফিরাইয়া দিতে পারি না।

জওয়ান কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সে তখনও চোখ কচলাচ্ছে।

যাবি না ? বুড়োব স্বব ঈষৎ রুক্ষ।

যামু বাবা।

বুড়ো উঠে গেল।

আমি কূলে উঠছি। কাজেই মুখ আব বেশী খুলতে হয না। কিন্তু বুড়ো যখন একটা নি-চাম ঢোল উঠানেব উপর আছড়ে ফেলে দিলে, আমার পাঁজব ক'টা পর্যন্ত নাড়া খেয়ে গেল।

দ্যাহেন ঢোলের দশা।

এখন কী করবেন ?

বুড়ো দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে অভয় দিতেই যেন লোলচাম পেটের উপর টোকা মেরে অদ্ভুত শব্দ তুললে। বললে, আইতেন জওয়ান কালে। এই প্যাড থাইকত ভরা। হালা এহানেই ঢোল বাজাইতাম। অহন হালা প্যাডও ফাঁইস্যা গ্যাছে গ্যা, শব্দ ওডে না। তহন ঢোল লাইগত না।

আমাদের খুব ঠেকা। ঢোল চাম দিয়ে ছেয়ে নেওয়া যায় না ?

চাম পাইবেন কুই ?

শহরে।

বুড়ো সন্দেহে মাথা দুলিয়ে যা বলেন, তার মর্মার্থ, যে সে চামড়ার কাজ নয়।

কূলে উঠে ভরাডুবি। নসীব !

বুড়ো অভয় দিলে। ঘাবড়ান না। পুরাতন মাটির হাঁড়ি দিতা পারবেন না ?

তা পারব।

তয় চইলব।

তারপর সে সত্যি একটা হাঁড়ি নিয়ে এসে বাজিয়ে দিল। প্রায় ঢোলের শব্দ। তবে মৃদু, তাই সে ছেলেকে সঙ্গে নিচ্ছে। দুটো হাঁড়ি যথেষ্ট আওযাজ দেবে।

তব ভাঙা ঢোলটা আমার সঙ্গী হাতে ঝুলিয়ে নিতে চাইছিল যদি আমাদের শহরতলীতে কোন ব্যবস্থা হয়। গোবিন্দ নিতে দিলে না।

আট-দশ দিনের ব্যাপার, বুড়ো মানুষ পারবে তো ? আমি সন্দিহান।

গোবিন্দ জলদাস জবাব দিলে, পুণ্যকর্মে গতর না লাইগলে এডা রাখনের দরকার কী ?

সে ঠিক বলেছিল। বিনা নালিশে গোটা পথ হেঁটেছে সে। আমরা যখন আখড়ায় পৌঁছলাম, রাত চারটে বাজে। সলিম চাচার উদ্বেগ আমি আঁচ করেছি মিথ্যা নয়। তিনি তখনও আখড়ায় হাই তুলছিলেন। জেগে আছেন।

আমাকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন।

চাচা, ঢুলী পেয়েছ ?

আমি গোবিন্দ জলদাস-কে দেখিয়ে দিলাম। উত্তেজনায় চাচা গোবিন্দকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, আসেন, ভাই। আপনি আমাদের ইজ্জত রেখেছেন।

তারপরই আমার দিকে চোখ, সদরুদ্দি, ঢোল কোথা ?

আমি জবাব দিলাম, ঘাবড়াবেন না। আছে।

হাসান হাফিজুর রহমান

আরো দুটি মৃত্যু

নাবাযণগঞ্জ থেকে বাহাদুবাবাদ যাচ্ছে যে বাত্রিব ট্রেনটা, এই যে স্টেশনে এসে থামল, মাত্র দু'মিনিট দাঁড়ায় এখানে। অন্ধকাব বাত, কিছুই চোখে পড়ছে না। স্টেশন ঘরটাব জানালা ও দবজায় যে আলোব আভাস ছিল, চোখের ওপব অকস্মাৎ ঝাপটা দিয়ে চলে গেছে ট্রেন থামতে না থামতেই। কামবাগুলোব আলোকিত গহ্ববকে চাবদিক থেকে মুড়ে দিয়েছে কালো বাত। বাইবে হাতটি মেলে ধবলেও চিহ্নিত কবা যাবে না। ভীষণ শীত পড়ছে। যাত্রি কেউ উঠবে, কি উঠবে না কে দেখে! ভেতরে সব গুটিশুটি মেরে বসে আছি নির্লিপ্ত হয়ে।

এমন সময় পাশেব কামবা থেকে আওয়াজ শোনা গেল, এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই, আরে দেহ না? কথাগুলো শেষ হতে না হতেই ব্যস্তসমস্ত থপথপ পায়েব আওয়াজ, চুড়িবও শব্দ। মানুষেব হাঁপানোব সাথে সাথে কে যেন কামবা ছেড়ে সামনে এগুতে লাগল। তারপর আমি যে কামবাতে বসে ছিলাম সেইটেব দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল যাবা, তারা চিৎকাব কবে উঠল, এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই, আবে দেহ না!

কিন্তু ততক্ষণে ঘন্টি বাজিয়ে দিল স্টেশনেব। গার্ডও চলাব ইঙ্গিত জানাল হুইসিল বাজিয়ে। কেউ এবাব অধৈর্য হয়েই যেন হাতল খুলে দরজাটা ভেতবেব দিকে ঠেলল যত জোবে পাবে। নিচে কিশোব কন্ঠে ভয়ার্ত চিৎকারও শোনা গেল একটা, কাকীমা গো! শব্দটা সেই ভযাবহ নিথব নিস্তব্ধতাকে মুচড়ে দিল যেন। যে লোকটা উঠতে দেবে না বলে দবজাটা চেপে ছিল এতক্ষণ, সেও এমনি বিমূঢ় হয়ে গেল যে, তাব হাত দুটো নিজেব থেকেই সবে এল, নিজেও পেছিয়ে গেল দু'পা। এবপর প্রথমে একটি পুটলি ও টিনেব সুটকেস ঠেলে দিয়ে ভেতবে উঠলেন প্রৌঢ় একজন হিন্দু ভদ্রলোক। সাধাবণ ধুতি কাপড় পবেছেন, ঘিয়ে বঙেব চাদর গায়ে জড়ান। দাঁড়াবাব একটু জাযগা কবে নিয়েই হাত বাড়িয়ে নিচেব থেকে কিছু তোলার জন্য এমন সযত্ন ভঙ্গিতে চেষ্টা কবতে লাগলেন যেন ঠুনকো কাচের কিছু তুলছেন। কিন্তু যা তুললেন তা একজন মেয়েলোক। মধ্যবয়স্কা, প্রায় ত্রিশ। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয যে, স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। উঠে পড়েই মেঝেব ওপব মুখ থুবড়ে বসে হাঁপাতে লাগল। এবপর ছোট একটি মেয়ে উঠল, ন'দশ বছবের, দৌড়তে দৌড়তে। কেননা ট্রেন ততক্ষণে হুইসিল বাজিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ঝকঝক করে।

আমরা যেটায় বসেছিলাম সেটা একটা 'একুশ জন বসিবেক' কামবা। ঠাসাঠাসি করে বসে, একজন অন্যজনেব উপর ঢুলে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙছিলাম আব ঘুমাচ্ছিলাম। দু'জন বেপবোযা লোক উপবে দেদাব জাযগা কবে নিয়েছে। আমি নিজে ঘুম তাড়ানোব চেষ্টা করছিলাম। কাবণ তন্দ্রার ঘোবে পাশের লোকটিব শবীবেব ওপব পবপব দু'বাব ঢুলে পড়াব জন্যে যে বিভীষিকাময় আপত্তি শুনেছি, আমাব নিজেব বেলাতে অন্য কাউকে যদিও তাই আমি বলতাম, তবু হজম কবতে পাবিনি।

জেগে থাকতে থাকতে প্রথমে কথা বলার ইচ্ছে কবছিল। কিন্তু চাবপাশেব লোকগুলোকে এমনি স্থবিব মনে হল যেন প্রাণপণ বেগে ঘা দিলেও এদেব একজনের ভেতর থেকে শব্দ বেরুবে না। ফাল্গুনেব বিদাযী শীতেব ঠান্ডা তো আছেই, তাছাড়া ক্লান্তিব স্তব্ধতা সাবাটা ঠাঁই জুড়ে। যেন কথা বলতে গেলেই যতটুকু উষ্ণতা জমিয়ে নিয়েছে বুকেব ভেতব এতক্ষণ ধবে, তাও শেষ হয়ে

যাবে। এরপর আমাদের জমে যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না। সেজন্যেই শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপটুকু এত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল এবং সেটুকুই উপভোগ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। পরস্পরের অজ্ঞাতেই আমরা একে অন্যকে অনুভব করছিলাম শুধু।

এ স্তব্ধতা যে শুধু ক্লান্তির তা নয়, — আতঙ্কেরও। আমি ঢাকা থেকে আসছি, সেজন্য এ অনুভূতিটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। পরস্পরের প্রীতির ওপরেই যেমন সামাজিক সুস্থতার নির্ভর, তেমনি পরস্পরের আক্রোশের ভেতরেই সবচেয়ে বড় অশান্তি। এ অশান্তি যে কি, আমি জেনেছি ঢাকার দাঙ্গায়, কোলকাতার পরেই যা শুরু হয়েছিল। এমন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার অনুভূতিতে কোনদিন ক্লান্ত হইনি। এই চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও জানিনি। ঢাকায় গিয়েছিলুম মেয়েকে দেখতে, জামাই রেলওয়ে কলোনীর বাসিন্দা, সেখানেই ছিলাম। এই এলাকা দাঙ্গাকে রোধ করেছিল। সেই হয়েছে এক মুশকিল আমার জন্যে। খুন-উন্মত্তদের ভেতর থেকে যদি আমারও সারা শরীর তেতে উঠত, যদি চিন্তা বুদ্ধি উবে যেত ধুঁয়োর মত আগুনের হলকায়, তাহলেও হয়ত এক সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু যে পরিবেশে আমি ছিলাম সেখান থেকে এই পাশবিকতাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। যে সুস্থ প্রতিরোধের ভেতর আমি ছিলাম, সেখানে থেকে এই হিংস্রতার ভয়াবহ পরিণতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি না করে পারিনি। এই ঘৃণা যে একবার অনুভব করেছে তার অস্বস্তি যে কি আমি জানি।

জরুরী কাজ ছিল বটে, বাড়ি ফিরতে পারিনি। মাঘ-শেষের পড়ন্ত শীতের দিন, অথচ এমনি হিম বাতাস ঝাপটা দিচ্ছিল যে, আমার মনে হয়েছিল অন্ততঃ আমার জীবনের এতগুলো বছরের অভিজ্ঞতায় এমনটি আর কখনও দেখিনি। আকাশে প্রান্তরে ছিল শীত, মানুষের মুখে মুখে ছিল স্তব্ধতা আর আতঙ্ক। অন্যদিকে শান্তিকামী কলোনীর সারা ঠাঁই জুড়ে প্রাণপাত প্রতিরোধ। দাঙ্গাকে রুখতে শয়তান ঈশ্বরকে পাশাপাশি দেখেছিলাম যেন। তাই অনেক বড় দেখায় আমার চোখ ভরে আছে। মনুষ্যত্বের এই শেষ রশ্মিটুকু যদি না দেখতাম তবে হয়ত পাগলই হয়ে যেতাম।

এখন ফিরছি বাড়ি। না জানি সেখানে কি হয়েছে। যমুনাপারের দুর্দান্ত মানুষগুলো যে হুজুগে মাতে, আমি তো তা জানি, আপন ভাইকেও মানাতে পারিনে। এখন অবশ্য আবহাওয়া শান্ত হয়েছে অনেকটা। মানুষের স্বভাব, শুভবুদ্ধি ও চেতনার জন্যেই এ অবস্থা অবশেষে স্থায়ী হয় না। গুণ্ডা-বদমায়েশের অত্যাচার একেবারে শেষ হয়নি, তবুও শান্তির আশাবাদ দেখা দিয়েছে এবং এই সুযোগেই যে এই হিন্দু ভদ্রলোকটা সঙ্গে আর দু'জনকে নিয়ে, অনেকের মত নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছেন তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলুম।

লোকটি উঠেই একটিমাত্র কাজ করল শুধু ; জড়িয়ে বাঁধা বিছানাটা, হয়ত ওর ভেতর অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসই আছে যাতে বেশ মোটাসোটা দেখাচ্ছে, মেঝেতে সমান করে রাখল, তার ওপর হাত ধরে বসিয়ে দিল মেয়েলোকটাকে সযত্নে। যেন পবিত্র কিছু রাখছে, এমনি সম্ভ্রমশীল, স্পর্শকেও যেন পবিত্র করে নিয়েছে। ছোট্ট মেয়েটি ওঁর শরীর ঘেঁষে বসল বাকী জায়গাটায়। এরপর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কোন দিকে না চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওদের পাশেই। এমন মনে হল যেন কোনদিন কিছু যেন দেখবেন না, কোন কিছু দেখতেও চাইবেন না। আর কিছু দেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

লোকটাকে দেখেই প্রথম অবধি আমার কেমন ঠেকছিল। অনুভূতিটা ঠিক যে কি বুঝতে পারিনি। অথচ একটা স্পষ্ট আকর্ষণ ছিল মনে, চোখই ফেরাতে পারছিলাম না।

ভয় আর আতঙ্কে মুখটা তার চুপসে গেছে, ফ্যাকাশেও হয়েছে, বেশ একটু দূরে বসেও আমার নজরে পড়ল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, আর একটু বড় হলেই মৌলবাদীদের মুখের মত হয়ে উঠবে। কিন্তু লোকটা পরে এসেছে ধুতি। তিনটি মানুষের ভেতর কারুরই — ওরা যে হিন্দু এই ইঙ্গিতটি লুকিয়ে ঢেকে রাখবার এতটুকুও চেষ্টা নেই। অথচ ট্রেনটা নিরাপদ, এমন মনে করার কোন কারণ আছে বলে ভাবা যায় না। ট্রেনেও খুনখারাবী হচ্ছে। একজন হিন্দুর পক্ষে বিপদটা এখানেও কম নয়। লোকটা একথা জানে বলেই মনে হল। উটপাখি যেমন বালুতে মুখ লুকিয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের কারো দিকে একবার পর্যন্ত না তাকিয়ে ভয় আর আশঙ্কা থেকে রেহাই

পাওয়ার জন্যে প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছে মনে হল। সেজন্যেই আমার সহযাত্রীদের মুখের দিকে একবার করে চেয়ে চেয়ে না দেখে পারলাম না। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে আছে, দু'চার জন যারা জেগে, তাদের চেহারাটিই কেমন স্তিমিত। চাইছে যখন, ভেজা আর নিরীহ চোখে কি ম্লান দৃষ্টি! ওদের সবাই এদেরকে লক্ষ্য করছে সহজেই বোঝা যায়। লোকগুলোর দৃষ্টি আর কয়েকটা দীর্ঘ শ্রান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে এই প্রমাণ করছিল যে, এই তিনজনের এমন দুরবস্থার জন্যে ওরা নিজেরাও কম অনুশোচনা ভোগ করছে না। কম অস্বস্তি ওদেরও নয়।

সব মিলিয়ে কেমন একটা ক্লান্ত গুমোট ভাব।

আমি বহু স্থানে যাতায়াত করেছি। রাজধানী ঢাকায় প্রায়ই তো আসতে হয়। কিন্তু এমন দুর্বিষহ মুহূর্তের স্পর্শ কোনদিন পাইনি। আমার মনে হচ্ছে, এটা দাঙ্গার আতঙ্কেরই ফল। চারদিকের অমানুষিকতাই মানুষের মনগুলো এমন করে থুবড়ে-ছেঁচড়ে দিয়েছে। এ বিষণ্ণতা অপরাধবোধের।

লোকটা যমুনার গাঢ় জলের মত ঘোলা, দৃষ্টিহীন চোখ মেলে আছে। আর আমি উৎকণ্ঠিত।

সারাটা কামরার কেউ কি ওঁর সঙ্গে একটি কথাও বলবে না? সংকোচই কাটাতে পারছে না কেউ। না এর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনই সবার মিটে গেছে হঠাৎ? যেন এ এখন এক আলাদা জাতের মানুষ। এর সঙ্গে আবার সহজ হতে ভিন্ন এক অনুভূতির প্রয়োজন। কি যে এক আত্মমন্থন থেকে তা আসবে ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়।

এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হল যে, লোকটা অত্যন্ত সরল। জীবনের ভয় আছে, ফাঁকিঝুঁকি নেই। অথচ এমনি প্রাণের তাগিদে বেরিয়ে আসতে হয়েছে যে, এই রাত্রিবেলা ট্রেনকেও নিরাপদ না মেনে পারেনি।

ভাবলাম, একবার ডাক দিই। ভাবলাম একবার কাছে এনে বসাই। পরমুহূর্তেই সমস্ত কামরাটার দিকে চেয়ে গলা দিয়ে আর শব্দই বেরিয়ে আসতে চাইল না। মনে হল এখন যদি একটিমাত্র কথাও বলি, তবে তা ভারী কাচ ভেঙে চুরমার হওয়ার শব্দে খানখান করে বেজে উঠবে। বুঝিবা খুন বেরিয়ে আসবে এই দুঃসহ নিস্তব্ধতার বুক থেকে! সেই আওয়াজ অনন্তকাল ধরে কুরে কুরে বাজতেই থাকবে, কোনদিন থামবে না। সেই রক্ত গড়াতেই থাকবে, কোনদিন বন্ধ হবে না। আর সেই তিনটি মানুষও ভয়াবহ আতঙ্কে ও শঙ্কায় শুধু কাঁপবেই, কাঁপতেই থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিবর্ণ নীল হয়ে মরে যায়।

যমুনার সেই উত্তাল ঢেউগুলো যেন খল খল করে উঠল বুকের ভেতর। কেমন একটা ভয়ে চুপ করে গেলাম।

মানুষের বন্য আক্রোশ ওদের তাড়া করে ফিরছে।

মুখটি ঘুরিয়ে ঘাড় গুঁজে রইলাম কতক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে। তারপর লাইটের চারদিকে ঘূর্ণ্যমান পতঙ্গগুলোর অস্ফুট পাখা ঝাপটানো দেখলাম। আমাদের কামরায় তিনটি সারি। আমি বসে ছিলাম জানালার কাছের এক সারিতে। মধ্যের লোকগুলোরই অসুবিধে বেশী। ওদের হেলান দেয়ার সুবিধে আমাদের মত নয়; তাছাড়া হাওয়াও পায় না গরমে। ঠিক যেন মাঝের জমি, নালার পানি পায় সবচেয়ে কম। একজনের লালা গড়িয়ে পড়ছিল চোয়াল বেয়ে। ঘুমকাতুরে আর একজনের দাড়ির অগ্রভাগটা গাড়ীর ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে লাগছিল আর একজনের ঘাড়ে। সে লোকটাও ঘুমে সুড়সুড়ি লাগা জায়গাটা বারবার চুলকিয়ে নিচ্ছিল ঘুমের ঘোরেই।

অন্যসময় হলে হাসতাম হয়ত। কিন্তু এখন কেমন মায়া লাগল তিনজনের ওপরেই। ঘাড়টা ফিরিয়ে আবার চাইলাম সেই হিন্দু লোকটার দিকে। লোকটা এখন আমার উল্টো দিকের থাকে রাখা বেডিংয়ে ঝোলানো একটা লোটার ওপরে চোখ রেখেছে। তৃষ্ণায় নিষ্প্রভ চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কয়েকবার শুকনো ঢোকও গিলল বলে মনে হল। মনের জড়তাকে এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে হাত নেড়ে হঠাৎ ডাকলাম তাকে। লোকটা অপ্রস্তুতের মতোই সামনে এসে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। আসবে কি আসবে না এই ইতস্ততাটুকু করবার সাহস পর্যন্ত নেই। ঠোঁট নেড়ে বললও যেন কি! কিছুক্ষণ অসাড় কণ্ঠে সাড়া জাগাতে চাইলাম আমি নিজেও। পরে সহসা পাশে অনেকটা

জায়গা করে দিয়ে বলে উঠলাম, বসেন। আমার পাশের লোকটাও সমর্থন করে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ বসেন। অন্ততঃ শরীরের গরমে আর একটু চাঙ্গা হওয়া যাবে—আমাদের শীতের কাপড় যা আছে তা তো হুঁ ...

এদিকে রাতও শেষ হয়ে আসছে। আমরা অনেকগুলো স্টেশন পার হয়ে এসেছি ইতিমধ্যে। লোকটা বসল। উপায়ান্তর নেই বলেই বোধ হয়। কিন্তু উসখুস করতে থাকল কেমন। বারবার তার সাথের অসুস্থা স্ত্রীলোকটার দিকেই তাকাতে লাগল। উৎকন্ঠায় একটা শিখার মত দপ্‌দপ্ করে উঠছে, আবার নেতিয়ে পড়ছে। ওর পাশ থেকে চলে আসার জন্যেই কি অস্বস্তিটা হঠাৎ বেড়ে গেছে ? ভাবলাম, হয়ত বা আমাদের সান্নিধ্যে এসে সে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

লোকটা গলা উঁচু করে বসে ছিল। কন্ঠনালীর বাঁকা জায়গাটায় আলোর চিক্‌চিকে ছাট এসে পড়েছে। হঠাৎ চোখ পড়ল আমার তার ওপর। ওই সামান্য জায়গাটুকু—জোরে টান দিলেই হয়ত, একটু ছুরির আঁচড় লাগলেই তো শেষ হয়ে যেতে পারে লোকটা। এত ক্ষীণ মানুষ, এত সংক্ষিপ্ত। একেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য কী বিভীষিকাময় পরিকল্পনা, এত হিংসা ! লোকটাকে যেন মুঠির ভেতর অনুভব করতে পারছি। সম্পূর্ণ আয়ত্তে আমার সে। এত ছোট, ভীরু কপোতের মত একটা মানুষ।

বুকটা শিরশির করে উঠল। লোকটাকে কি আমি মুচড়ে দিতে পারি ? এক্ষুণি ? বাহাদুরাবাদ ঘাটেই নামতে হবে আমাকে। বাড়ি সেখানেই। ইতিমধ্যে এই কামরার অধিকাংশ যাত্রীই নেমে গেছে। গুটিকয়েক যারা ছিলাম, খুব সম্ভব আমি বাদে সকলেই নদী পার হয়ে যাবে। এখন জেগে উঠছে। আয়েশের হাই তুলল কেউ জোরে জোরে। অস্ফুটকন্ঠে দু'একটা ঠুনকো কথাও বলল আলগোছে। [illegible] প্রসব-বেদনা-কাতর দীর্ঘপ্রাণ মহিলাটির গোঙানির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে নাকি ? এতক্ষণে জাগছে সব শ্লথ ভাবে। এখন কেমন করছে সে পায়খানা-ঘরটার ভেতর ? বিছানাপত্তর বাঁধতে লাগল অনেকে। বন্ধ জানালাগুলো নামিয়ে দিল। বাইরের আবছা আলোয় লাইটের দগদগে লাল মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। নিষ্প্রভ মুখ। সকালের হাওয়ায় অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। লোকটাও এবারে কিছু জোর পাবে মনে হয়ত।

অনেক সংকোচ কাটিয়েই দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, একবার দেখা যায় না, তাঁর কি হল···উচিত···

কিন্তু এ কথা শোনামাত্রই অকস্মাৎ লজ্জায় লোকটা এমনই বিমূঢ় হয়ে গেল যে, মনে হল, তার সমস্ত শরীরটাই আগুনের হলকার মত জ্বলে উঠেছে, শিরা-উপশিরা দপ্‌দপ্ করছে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। বুড়ো মানুষের এমন করে ঠোঁট কাঁপতে আর কখনও দেখিনি আমি। অন্ততঃ এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় যতদূর জানি—এই বয়সের মানুষ সাধারণতঃ ভেতরের দুর্বলতাটা কিছুতেই জানাতে চায় না। কিন্তু লোকটা সংযম হারাচ্ছে।

এত লজ্জা আর সংকোচই বা কিসের বুঝতে পারলাম না।

কিছু জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাব, লোকটা তেমন অবস্থায় আছে তাও মনে হল না। প্রায় এক ঘন্টারও ওপরে হয়ে গেল মেয়েটা সেই যে পায়খানার ভেতরে ঢুকেছে, কি যে হল তার ! এই লোকটার মতই আমার নিজেরও চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে ? ব্যাপারটা আমার আওতার বাইরে বলেই হয়ত এমন নিষ্ক্রিয়তা অসহ্য ঠেকছিল। সে জন্যেই, এক অদ্ভুত উষ্মায় মনটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছিল বারবার।

যা হচ্ছে, মোটেই কাম্য নয়। এখনি কিছু করতে হবে।

কিন্তু লোকটাকেই তাড়া দেব, না আমি নিজে কিছু করব, ব্যাপারটা আদতে কেন এমন হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করব, না অভিসম্পাত দেব বুড়োকে — কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। দপ্‌দপ্ করতে থাকল রগগুলো। অবশেষে আরো স্তব্ধ হয়ে অস্বস্তিকে শান্ত করতে চাইলাম।

কান পেতে রইলাম আকাঙ্ক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে—হয়ত নবজাত শিশুর কোমল কান্না এই ভয়াবহ ফসিলের মত স্তব্ধতা গুঁড়িয়ে দেবে। এক আর্ত নারীকন্ঠের তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রতিবাদ ছিন্নভিন্ন করে দেবে এই স্থবিরতা। এই প্রাণান্তকর গাম্ভীর্যের অবসান হবে নবজাত সৃষ্টির কলকন্ঠে। তাই হোক, তাই হোক।

কিন্তু কিছুই হল না।

দাঁতে দাঁত চেপে ফিরে তাকালাম লোকটার দিকে। এই শীতেও আমার কপালে জমে উঠেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঘৃণায়–বিরক্তিতে কাঁপছে ঘাড়ের রগ। কঠিন দৃষ্টিটা ফেরালাম উদ্ধত করে। কিন্তু সে শীর্ণ প্রৌঢ় মুখে তখন গড়িয়ে পড়ছে পানি কোটরাগত চোখ বেয়ে বেয়ে।

অবশেষে এক ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বুকটাকে শূন্য করতে চাইলাম।

ইতিমধ্যে ঘাটে এসে ঢুকল ট্রেন। দু'পাশে সার দেয়া কুলির ভেতরে থামল অবশেষে। যাত্রীরা সব হুড়মুড় করে নামতে লাগল। এতক্ষণের স্তব্ধ মানুষগুলো সহসা নতুন এক বেগ পেয়ে ছটফটিয়ে অসম্ভব ধৈর্যহীনতায় চারদিকে ভাঙতে থাকল। এও এক নতুন বিষণ্নতার গর্জন যেন। এ স্তব্ধতার আওয়াজ আছে, আরো ভয়ঙ্কর।

আবছা অন্ধকারে মানুষগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। কামরায় রইল না কেউ আর। মনে করলাম লোকটা এবার উঠবে। কিন্তু সে নড়লও না।

আমিও দাঁড়াতে পারছিলাম না কেন, জানিনে।

ঘুমকাতুরে ছোট মেয়েটা যাত্রীদের দাপাদাপিতে জেগে উঠেছিল। চোখ মুছল, হাই তুলল, তারপর আশেপাশে কোথাও কাকীমাকে না দেখে উদ্বিগ্ন হতে থাকল। অস্ফুটকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, কাকী–কাকীমা গো! বুড়ো লোকটার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে সে চিৎকার করল। কিন্তু সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করতে পারল না কিছুই। দুর্বোধ্য লোকটা তেমনি রইল–যেমন ছিল স্তব্ধ, নিথর, নিষ্প্রাণ।

সেখান থেকে কোন উত্তর আসবে না জেনে আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম প্রাণপণে। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলাম গলা থেকে আওয়াজই বেরুচ্ছে না এতটুকু, শুধু হাতটা নেড়ে নেড়ে ইশারা করছি মেয়েটাকে। তারপর শব্দ যখন বেরিয়ে আসলো নিজের কাছেই কেমন বেসুরো ঠেকল – ওই পায়খানাটায় দেখ, খুলে দেখ শীগগির…ওই, …ওইখানে…

মেয়েটা হতভম্বের মত দেখল আমাকে। ছুটে গেল সেদিকে। দরজা খুলল। তড়িতাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেতরে বিকট চিৎকার করে –কাকীমা গো! অনবরত সে চিৎকার করতে লাগল–জেঠামশাই গো, …আস না গো ….কি হল গো … কাকী‥

ততক্ষণে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। সমস্ত লোম সোজা হয়ে উঠেছে। শির শির করছে।

লোকটার দিকে তাকালাম। সে আরো স্থির হয়ে গেছে। এতক্ষণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল, বুক উঠছিল নামছিল– এখন তাও বন্ধ। তারপর পাগলের মত দু'হাতে ঝাঁকাতে লাগলাম তাকে।

পিতৃস্থানীয় জেঠামশাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর অমন বীভৎস মৃতদেহ দেখবেন না, বুঝতে পারলাম এতক্ষণে। ছোট মেয়েটা কাঁদতেই থাকবে কুরে কুরে। আমারও যে বলার কিছু নেই– তাও মনে হল। আমরা তিনটি প্রাণীর উৎকণ্ঠা যে কি, কে বুঝবে!

ভাবলাম, একবার দেখি, অবস্থাটা কি! কিন্তু যে আজন্ম সংস্কার আর নিরুপায় বিহ্বলতা সেই প্রৌঢ় লোকটাকে অমন করে ফেলেছে তা-ই আমাকেও স্থবির করল। অসহ্য নিষ্ক্রিয়তায় চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। তীব্রতম আবেগের মুহূর্তেই মানুষ বুঝি এমন করে বন্ধ্যা হয়ে যায়।

চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। সামনে নীরন্ধ্র অন্ধকার।

অন্ধকার, যেখানে সম্পূর্ণ একটি নারীদেহ ভেসে উঠেছে। রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে। পেট অত্যন্ত উঁচু। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়। একটি মা। একটি মাতৃত্ব-আকাঙ্ক্ষী নারী, জীবনের জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে। তার ফুলে ওঠা পেটের ভেতর আছে একটি শিশু, একটু আগেও জীবিত ছিল সে। জন্মাতে পারলে অনেক কিছুই হয়ত করতে পারত। সুখী আগামী পৃথিবীর বুকে শ্বাস নিতে পারত অন্ততঃ। এ জন্মকে কখন কে ?

তখুনি কি এক যন্ত্রণায় সারা বুকটা কুঁকড়ে উঠল আমার। আর কি ঘৃণা! ধ্বংসের জন্যে ঘৃণা। অসহ্য!

প্রৌঢ় লোকটার মুখ আমি মনে করতে পারিনে আর। কিন্তু তার নিরুপায় স্তব্ধতাটি এখনও আমার বুকের ভেতর জড়িয়ে আছে।

আবু ইসহাক

বনমানুষ

নতুন চাকরি পেয়ে কলকাতা এসেছি। সম্পূর্ণ অস্থায়ী চাকরি। যেকোন সময়ে, বিনা কারণে ও বিনা নোটিশে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়োগ-পত্রে শর্ত দেখেও ঘাবড়াইনি একটুও। বন-বিভাগে চাকরি করতাম ষাট টাকায়। এখানে পাব একশ' তিরিশ টাকা। ডবলেরও বেশি। এমন সুবর্ণ সুযোগ কোন নির্বোধ পায়ে ঠেলে দেয় বলে আমার মনে হয় না। আর যাই হোক, আমি দু'পায়ে হাঁটি। জঙ্গলে যারা চার পায়ে হাঁটে, তাদের প্রতিবেশে থেকে আমার বুদ্ধিটা লোপ পেয়ে যায়নি। সত্তর টাকা বেশি পাব– এ কি যেমন তেমন ব্যাপার! বিয়ে করেছি অল্পদিন। এখন ডবল টাকারই দরকার। তাছাড়া জঙ্গল ছেড়ে এসেছি শহরে, হিংস্রালয় ছেড়ে লোকালয়ে, আঁধার ছেড়ে আলোকে। এরকম সভ্য সমাজে আসাটাও একটা মস্ত লাভ।

চাকরিতে যোগ দিয়েছি গতকাল। আজ দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার। ন'টা না বাজতেই খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। মেসের খাওয়া। কি খেলাম বলব না। বলতে লজ্জা করে। তাছাড়া খাওয়াটা গৌণকর্ম, নেহায়েতই রান্নাঘরের ব্যাপার। যা মুখ্য তা হচ্ছে আমাদের পোশাক। সাজ-পোশাকই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি। কোন রকমে শাকভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও এ দেহকে দুরস্ত খোলসে ঢেকে ভদ্রলোক সাজাতেই হবে। তাছাড়া উপায় নেই ভদ্রসমাজে বের হওয়ার। আমাদের মত খুদে অফিসারদের ব্যাপার আরো জটিল। কোট-প্যান্ট পরে, টাই বেঁধে দুরস্ত হওয়া চাই, নয়তো ওপরওয়ালা সায়েবদের সুনজর হবে না কোনদিন। তাঁদের কথা, ঘোড়ায় চড়ে না হোক, গাধায় চড়েও কেন আমরা তাদের অনুসরণ করব না? অফিসে তাই অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগের হয়ে দাঁড়ায়।

মেসের এক সদস্যের সাহায্য নিয়ে গলগ্রন্থিটা কোনরকমে বেঁধে কোটটা গায়ে চড়িয়ে দিই। আয়নায় মুখ দেখে ভালো লাগে না। দাড়িগুলোর কালো মাথা দেখা যাচ্ছে। অথচ গতকালই দাড়ি কামিয়ে ছিলাম। তাড়াতাড়ি 'সেফটি রেজার' বের করে ঐ অবস্থায়ই কয়েক পোঁচ টেনে নিই। কিন্তু কোটের কলারটায় সাবানের ফেনা লেগে যায়। তোয়ালে দিয়ে সেটা মুছে চুলে চিরুনি চালাই আর একবার। তারপর জুতো জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে আর এক দফা আয়নায় মুখ দেখে বেরিয়ে পড়ি।

ন'টা বাজে। পথ সংক্ষেপ করতে গিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকি। গলি নয় ঠিক; দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। গা বাঁচিয়ে একজন যেতে পারে কোনমতে। মাঝ পথে গিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হয় আমাকে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক আসছিলেন ওদিক থেকে। দেহের আয়তন তার নিতান্ত ছোট নয়। তাই কোলাকুলিটা হয়ে যায় ভালোভাবেই। তারপর একজন, আরো একজন, আরো একজন। কোলাকুলিটা সেরে বেরিয়ে যান তারা। কোলাকুলিটা যদিও সকলের সাথে সমান জমে না, তবুও মনে হয় মানুষে মানুষে হানাহানির এ সময়টায় অজানা-অচেনায় এরকম কোলাকুলি বড় দুর্লভ।

আর মাত্র কয়েক কদম পার হলেই বড় রাস্তা। দেয়াল ছেড়ে সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি এক ভদ্রমহিলা গলিটায় ঢুকে পড়েছেন। আমার সামান্য কয়েক কদমের পথটুকু পার হবার সুযোগ না দিয়ে এগিয়েই আসছেন তিনি। এবার আর উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পিছু

হেঁটে শেষটায় উপায় করতে হয় আমাকেই।

দেয়ালে ঠেস্ দেয়ায় ছাতলা লেগেছিল কোটে। রুমাল বের করে ঝেড়ে আবার পথ দেখি আমি। এবাব আর সোজা পথে নয়। সোজা পথটাই দেখেছি কঠিন বেশি। বেনেপুকুর লেন ঘুরে, লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে ইলিযট বোডেব মোড়ে এসে দাঁড়াই।

ধর্মঘটের জন্যে ট্রাম বন্ধ। আমাকে যেতে হবে ৮ নম্বর বাসে। এক এক করে কযেকটা বাস চলে যায়। কতবার হাতল ধবতে গিয়ে পিছিয়ে যাই। সাহসে কুলোয় না। লোকসব বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। নিবাশ হবাব পাত্র আমি নই। দাঁড়িযে থাকি, দেখি অন্তত একটা পা রাখবার জায়গাও যদি মিলে যায়।

একটা বাস এসে থামে। পা বাখবাব জায়গা নেই। তবুও সব লোক ছুটোছুটি কবছে, কে কাব আগে উঠবে। চাকরি ঠিক বাখাব প্রাণান্ত চেষ্টা। একটা লোক নেমে যায় ড্রাইভাবেব কুঠরি থেকে। মহা সুযোগ ! পাশের কয়েকজনকে টেক্কা মেরে চট করে উঠে পড়ি আমি। চাকরি গেলে আমাব চলবে না। হঠাৎ আমাব বুকে ধাক্কা মেবে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'মানুষ, না জানোয়ার !'

লোকটা কি গণক নাকি ! গণকের মত ঠিকই তো বলেছে সে ! আমি জঙ্গলেই তো ছিলাম এদ্দিন !

লোকটাকে ধন্যবাদ দেয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাহস হয না। ঘাড়টা নুইয়ে গায়ে গাযে মেশামেশি হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মেশামেশিটা আগের কোলাকুলির মত প্রীতিকর হয় না। আমি শেষে ঢুকে অনেকের অসুবিধে করেছি। ঠেলা-ধাক্কাটা তাই আমার দিকেই আসছে বেশি করে। পাঁজরার হাড়গুলো চাপ খেয়ে ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে। আর দেবি নয়, পরেব স্টপে থামতেই আমি নেমে যাই।

এতক্ষণ দম বন্ধ হয়েছিল যেন। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসকে সজীব কবে নিই খোলা বাতাসে। স্যুটটার দিকে তাকিয়ে মায়া হয। ভেতবের ঘামে আর ওপবেব ঘষায ইস্ত্রি ভেঙে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। এবার পা দুটোকে সম্বল করেই ছুটব ঠিক কবলাম।

কলকাতা এসেছিলাম অনেকদিন আগে একবার। পথ-ঘাট ভালো মনে নেই। পথ চেয়ে পথ চলি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চেয়ে দেখতে হয় পথচারীদের পোশাকেব দিকে। এই পোশাক ছাড়া কার কি ধর্ম জানবার উপায নেই। কারণ ধর্মের গাযে কিছু লেখা থাকে না। সব ধর্মধারীদের চেহারাই মানুষের চেহারা। আমাব চেহাবা দেখে কিন্তু কারো বুঝবাব যো নেই আমার ধর্ম কি। কারণ আমার মানুষের শরীরটাকে আন্তঃধার্মিক পোশাকে ঢেকে নিযেছি। তাই বলে কি আমি নিরাপদ ? মোটেই না। আমার বিপদ বরং বেশি। আন্তঃধার্মিক পোশাকে মানুষের চেহারা হলেও যে কোন দিকের চাকু খাওযার ভয় আছে আমাব। মুসলমান আমাকে হিন্দু ঠাওরালে, আর হিন্দু মুসলমান ঠাওরালেই হল !

ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করে। মন ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। একশ' তিরিশ টাকার চাকরিটার ভার ছেড়ে দিই পা দুটোর ওপর। শুধু তাই নয় মনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেহেব ভারটাও।

এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াই। কাছাকাছি একটা প্রাণীও দেখছি না যে ! বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। সুমুখের একটা দোতলা বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কয়েকজন কি যেন দেখছে রাস্তার দিকে। ওপর থেকে নিচের দিকে চোখ নামাতেই চোখ ফিরে আসে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। গায়েব রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। চিনতে ভুল হয় না। মানুষ ! হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত মানুষ। রক্তেব রাঙা স্রোত ড্রেনে গিয়ে মিশেছে।

নিমেষে পেছন ঘুরে অন্য পথ ধরি। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও তাকাই না ফিরে। কিন্তু কে যেন গর্জে ওঠে, 'ঠায়রো।'

দু'জন সার্জেন্ট বিভলবাব হাতে এগিয়ে আসে। আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তারা। কিন্তু ফাঁসাতে পাবে না। নিয়োগপত্রটা পকেটেই ছিল। সেটা দেখিয়ে রেহাই পেয়ে যাই।

এবার আরেকটা রাস্তা ধবে হাঁটি। হাঁটি সুমুখে পেছনে চেয়ে। মারটা নাকি পেছন থেকেই আসে। এক একজন লোক চলে যায় পাশ কেটে, মনে হয় এক একটা ফাঁড়া কেটে যায় আমার। আমাব সতর্ক চোখ দুটো আড়চোখে তাকায় সবার দিকে। কিন্তু তারাও যে সতর্ক দৃষ্টি মেলে আমারই দিকে তাকায ! আমাকে আমাব হাত দুটোকেই বোধ হয় তাদের ভয়। তাদেব ভীত চাউনি দেখে অনুমান কবতে কষ্ট হয না। আমিও আমাব অনুগত হাত দুটো ছাড়া আব কারো হাতকে বিশ্বাস করতে পাবি না।

কিছুদূব আগে ডান দিকে একটা পাশগলি। গলিব মুখে তিনটে লোক। তাদের পোশাক দেখে চমকে উঠি। তাদেব ভাবগতিকও কেমন যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমাব বুকেব ভেতবটায টিপটিপ শুরু হয়েছে। আশেপাশে লোকজন নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখি এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণী উঁচু-গোড়ালি জুতো পাযে আসছে গট্‌গট্ কবে। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায। আমি পেছনে ফিবে দাঁড়িয়ে যাই। গলিব মুখের লোকগুলোকে বোঝাতে চাই, আমি তরুণীটির জন্যেই অপেক্ষা কবছি। তাবই সাথী আমি। কিন্তু তারা বুঝতে চাইলে হয। আমাব যে বকম গায়েব বঙ ! অবশ্য এ বকম বঙেব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেব অভাব নেই কলকাতা শহবে।

আমাব পোশাক দেখে লোকগুলো না হয আমাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিযান ঠাওরাল। কিন্তু তরুণীটিকে কি বোঝাব ? আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি মনে কববে সে ?

আমি উবু হযে বাঁ পাযে জুতো খুলি। জুতোব ভেতর কাঁকব ঢুকেছে এমনি ভান কবে জুতোটা উপুড় কবে ঝেড়ে নিই কযেকবাব। তারপব আবাব পাযে ঢুকাই। তরুণীটি আমার কাছে এসে গেছে। জুতোব ফিতে বাঁধা শেষ কবে এবাব তাব পাশাপাশি চলতে শুরু কবি। এখন ঠিক মনে হচ্ছে – বাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক অ্যাংলো- ইণ্ডিয়ান দম্পতি। অন্যেব কি মনে হচ্ছে জানি না। আমাব কিন্তু ওবকমই মনে হচ্ছে। একপা-দু'পা কবে গলিব মুখ পাব হয়ে যাই।

ফাঁড়া কেটে গেছে। আমাব নীবব সঙ্গিনী একবাব কটমট করে আমার দিকে তাকায়। তার চোখেব দিকে চেয়ে আমার মনটা মিইয়ে যায। কিন্তু তবুও তাব সঙ্গ ছাড়তে ভবসা পাইনে।

পাশাপাশি হেঁটে আবো কিছুদূব এগিযে যাই। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলে সে, 'আমার পিছু নিযেছ কেন ?'

'না-না- ।' আমি থতমত খেযে যাই।

'না মানে ! বহুক্ষণ ধবে আমি লক্ষ্য করছি। পুলিশ ডাকব ?'

'না-না, মানে — ইয়ে, মানে গুন্ডাব ভয়ে —'

'গুন্ডার ভযে !'

'হ্যাঁ, তাই-তাই আপনাব সাথে সাথে এলাম !'

'অবাক করলে ! এক জোযান পুরুষ, তাকে বক্ষা কববে মেযেমানুয ! আচ্ছা কাপুরুষ তো !' অবজ্ঞার হাসি তরুণীটিব মুখে।

কিছুদূর গিয়ে মহিলা বাঁ-দিকে এক গলিতে ঢুকে পড়ে। আমি মোড় নিই ডান দিকে।

পাশ থেকে একটা হাত এগিয়ে আসছে না আমার দিকে !

'উঃ মাগো' বলে লাফ দিয়ে সরে যাই কয়েক হাত। ফিরে দেখি একজন জটাধারী ফকির হাসছে আমার অবস্থা দেখে। এগিয়ে এসে সে বলে, 'ভয় পেলি নাকি ? দু'দিন খেতে পাইনি। দুটো পযসা দে।'

রীতিমত ঘাম দিয়েছে আমাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয না। তবু হাতে চাকু না থাকাব

জন্যে ফকিরটাকে ধন্যবাদ দিই মনে মনে আর পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে তার দিকে ছুঁড়ে মারি ।

চৌরঙ্গী এসে পড়েছি । একটা লোক হঠাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়ায় । বলে, 'ফটো তুলবেন ? আসুন । এক টাকায় তিন কপি !'

লোকটার কথার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই । কিন্তু ভুল হয়ে গেল। মানুষের ভয়ে ভীত মানুষের ফটোটা তুলে রাখা উচিত ছিল আমার ।

এক পয়সায় একটা 'পাসিং শো' সিগারেট কিনে রশির আগুনে ধরাতে যাব, হঠাৎ কার স্পর্শে শিউরে উঠি ।

চেয়ে দেখি, আমাদের সুভাষ মুচকি হাসছে । সহপাঠী বন্ধুর আলিঙ্গনে বুকের ভেতরটা যেন ভিজে ওঠে । কিন্তু ওর বুকটা শক্ত লাগল না ! জামার ওপর হাত রাখি তাই তো !

সুভাষ হেসে বলে, 'হাত দিয়ে দেখছিস কি ?'

'দেখছি, মানে –তোর বুকটা শক্ত লাগছে কেন রে ?'

'শক্ত লাগছে ? হুঁ হুঁ হুঁ ! এ জিনিস দেখিসনি কখনো । লোহার তারের গেঞ্জি। একেবারে নয়া আবিষ্কার !'

'নয়া আবিষ্কার !'

'হ্যাঁ, এ বর্ম ভেদ করবে চাকু ? উঁহু– !'

সুভাষের জামার ওপর হাত দিয়ে দিয়ে আঁচ করতে পারি, লোহার তার দিয়ে তৈরি হাতাকাটা গেঞ্জি । মন্দ জিনিস নয় । সহসা আঘাত করে কিছু করতে পারবে না ।

আমি হেসে বলি, 'কিরে চাকু-টাকু লুকোন নেই তো ?'

'নেই তো কি ! নিশ্চয়ই আছে । এক্ষুণি তোর বুকে বসিয়ে দেব । তোর রক্ত দিয়ে ফোঁটা-তিলক কেটে কালী পূজো করব ।'

'এখানে কি করিস ?'

'পড়ি আর্ট স্কুলে ।'

'আর্ট স্কুলে । ঠিক আছে । শোন্ , তোকে একটা ছবি আঁকতে হবে । মানুষের ভয়ে মানুষের চেহারা কেমন হয়, ফুটিয়ে তুলতে হবে সে ছবিতে । পারবি তো ?'

'তা দেখব চেষ্টা করে ।'

আরো দু'এক কথা বলে বিদেয় হই তাড়াতাড়ি । দশ বছর এক সাথে পড়েছি, খেলাধুলো করেছি । আজ দশটা মিনিটও কথা বলবার ফুরসুত নেই । গোলামি ঠিক রাখতেই হবে ।

হোয়াইটঅ্যাওয়ের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি । সাড়ে দশটা বাজে । আমারটা তা হ'লে বন্ধ হয়ে আছে । তাই তো ! এই রে চাকরি বুঝি গেল ! ডালহৌসী পর্যন্ত হেঁটে গেলে দেরি হয়ে যাবে অনেক । পকেট হাতড়ে আটখানা পয়সা পাওয়া যায় । বাসভাড়া ও টিফিনের পয়সা । রিক্সা ডেকে উঠে পড়ি । আট আনা টিফিন চুলোয় যাক ।

অফিসে পৌঁছে শুনি হাজিরা বই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘরে চলে গেছে। রোজ সোয়া দশটার সময় হাজিরা বই তাঁর ঘরে চলে যায় । যারা দেরিতে আসে, তাদের কৈফিয়ত আদায় করে হাজিরা বইয়ে সই করতে দেন তিনি ।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘরে ঢুকি । শ্বেতাঙ্গ সাহেব । কিছুক্ষণ আগে, অফিসের গেট পার হয়ে আসার সময় তাঁকে গাড়ি করে আসতে দেখেছি । আমাকে দেখে হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বলেন, 'এত দেরি করে এসেছ কেন ? এখন এগারোটা বাজে । এরকম দেরি করে এলে চলবে না, বুঝলে ?'

অফিসে নতুন ঢুকেছি, তাই বোধহয় বেশি কিছু শুনতে হয় না। কিন্তু আমার মেজাজটা ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছে হয়, 'আমার পায়ে তো আর চাকা লাগান নেই আপনার গাড়ির মত।'

হাজিরা বইয়ে নাম সই করতে যাব, ফাউন্টেন পেনটার জন্যে ওপরের পকেটে হাত দিই। কই, নেই তো! এ পকেটে ও পকেটে খুঁজি। কিন্তু পাওয়া যায় না আর। সায়েবের টেবিল থেকে কলম তুলে হাজিরা বইয়ে সই করে বেরিয়ে আসি। পকেটগুলো হাতড়ে দেখি আবার। মেসে রেখে আসিনি। পকেটে তুলেছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে। তা হলে? বাসের মধ্যে আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে জানোয়ার বলেছিল যে মানুষটা তারকর্ম নয়তো?

আমার পোস্টিং হবে কোন এক শাখা অফিসে। অফিসের বড় কর্তা কতগুলো ফাইল দিয়েছেন। পোস্টিং না হওয়া অবধি কাজকর্ম বুঝে নিতে হবে। ফাইলগুলো চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কলমটার বিচ্ছেদে মন বসে না। পাঁচ মাস বাড়িতে পাঁচ টাকা করে কম পাঠিয়ে পঁচিশ টাকায় কিনেছিলাম কলমটা। জোর করে কাজে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু বারবার কলমটার কথাই মনে পড়ে।

আমি কথা বলি কম। জঙ্গলে তাই এদ্দিন টিকতে পেরেছিলাম। কিন্তু লোকালয়ে অনেকেই আমাকে বোকা মনে করে। তার প্রমাণ অফিসের মাঝেও আজ পেলাম। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশের মধ্যে ফাইল খুলে পড়ছি চুপচাপ। এমন সময় মিষ্টার জাফর আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'এ যোগগুলো করে দিন তো। দেখবেন, ভুল হয় না যেন।'

লম্বা লম্বা যোগ। মনোযোগ দিয়ে না করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। একমনে যোগ করছিলাম। হঠাৎ মিহি হাসির শব্দে আমার মনোযোগ টুটে যায়। মাথা তুলে দেখি-মিস ঘোষের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ গল্প জমিয়েছেন মিঃ জাফর। বারে বাঃ! যোগ করে মরছি আমি, আর যোগাযোগ করছেন উনি। আচ্ছা লোক তো!

অনেকক্ষণ গল্প করে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'মিঃ জাফর। কদ্দূর করলেন? হয়েছে?'

অফিসে চুপচাপ বসে থাকলেও এর মধ্যে অনেককেই আমি চিনে নিয়েছি। মিঃ জাফরকে চিনি না, এমনি ভাব দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলি, 'না স্যার, এখনো হয়নি। যোগাযোগের কাজে আমি খুবই কাঁচা। আর একটা কথা স্যার, মাফ করবেন! আপনার সাথে এখনো আলাপ হয়নি। আপনি কি চীফ অফিসার?'

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখখানা হাঁড়ির মত করে চলে যান মিঃ জাফর। আমি জানি, জাফর আলী ষাট টাকার কেরানি। হেড অফিসের লোক কিনা, তাই সুযোগমত শাখা অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর ওপরও ছড়ি ঘোড়াতে চান।

পাঁচটা প্রায় বাজে। ফাইলপত্র আলমারিতে রেখে বেরিয়ে যাব, এমন সময় মিস ঘোষ ডাকেন, 'শুনুন তো।'

মিস্ ঘোষ ষাট টাকা মাইনের টাইপিস্ট। কাছে যেতে একটা ফাইল দেখিয়ে বলেন, 'এটার মধ্যে কতগুলো টাইপ-করা কাগজ আছে। মিঃ জাফরকে নিয়ে এগুলো কম্পেয়ার করে রাখবেন। কাল আমার আসতে দেরি হবে।'

অনুরোধ নয়, একেবারে আদেশ। আমার রাগ ধরে। এরা পেয়েছে কি? আমি নিরীহ বলেই কি এভাবে ফ্যাগ খাটতে হবে? কিন্তু নিরীহ হলেও সাপের মন্তর জানি আমি। বলি, 'মাফ করবেন, ম্যাডাম। আপনার সাথে এখনও পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। আপনি নিশ্চয় অফিস সুপারিনটেনডেন্ট।'

মিস ঘোষ ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি,

মন্তরটা একটু কড়া হয়ে গেছে। কিন্তু কি করা যাবে ? হুকুম দেয়ার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল তাঁর।

অফিস থেকে বার হই। আবার সেই বাস, লোকজন, ভিড়। সেই পথ, পথচারীর ভীত চাউনি। মনটা দমে যায়।

হেঁটে হেঁটে চৌবঙ্গী পর্যন্ত আসি। কিন্তু পা আর চলে না। চলবার কোন হেতু নেই যে ! ভোবে যা খেয়েছি, আব এ পর্যন্ত এক পেযালা চা-ও না। কার্জন পার্কে বসে পড়ি। হেঁটে যাওযা অসম্ভব। ভিড় কমলে, বাসেই যাব।

সাড়ে ছ'টাব সময় বাসে একটু জায়গা পাওযা যায়। পঁ-পঁ করতে কবতে বাস ছুটছে। এত ভিড়, বাইবেব কিছুই দেখা যায না। বুঝতে পারছি না, কোন্ বাস্তা ধরে চলছে গাড়ি।

বুম্—ম্—

আবার বুম্— ম্—

ভীষণ শব্দ। কানে তালা লেগে গেছে। শুনতে পাই না কিছু। শেয়ালের ভয়ে খাঁচার মোরগের মত কবছি আমরা।

তারপর কোন্ দিক দিয়ে কেমন কবে বাসখানা চলে এল, অত খেয়াল নেই। কযেকজনের মুখে শুনলাম, বাসেব পা-দানিব ওপব থেকে দু'জনকে দু'পেযে শেযালে টেনে নিয়ে গেছে। আব অনেকেব হাত-মুখ, নাক-কান ছিঁড়ে গেছে বোমাব আঘাতে।

ঘরেব কাছে এসেও আব একবাব শিউরে উঠি। অক্ষত দেহে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছি আমি।

সন্ধ্যা হযে গেছে। শিথিল শবীবটাকে টেনে এনে বিছানায ঢেলে দিই। মানুষেব মাঝে একদিন চলেই মুষড়ে পড়েছি আমি। সমস্ত বাগ ঘৃণা আজ মানুষের ওপব।

চোখ বুজে ভাবছি — প্রত্যাহাব কবাব এখনো হয়তো সময আছে। আমার জন্যে বন-বিভাগের চাকরিটাই ভালো। মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে শহবে থাক। আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হব।

বশীর আল্‌হেলাল

আত্মহত্যার গাছ

হাবিল গিয়েছিল আম চুরি করতে। জীবনে সে অনেক অবাক অবাক কাণ্ড দেখেছে। কিন্তু এবার যা দেখলো তার তুলনা হয় না।

আজকের চুরিটা একেবারে ছোট। এটাকে চুরি না-ও বলা যায়। মানুষের গাছের কাঁচা আম চাইলেও পাওয়া যায়। সব সময়ে পাওয়া অবশ্য যায় না। কিন্তু সে চেয়েচিন্তে খাওয়া পছন্দ করে না। কারণ চাইলে পাওয়া যেতে পারে, না-ও যেতে পারে। তার চেয়ে চুরি করা ভালো। আজ তাই এই নেহাত ছোট চুরিতে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে একেবারে ছোট চোর নয়। খুব বড় চোরও নয়। সে প্রধানত রাত্রিবেলা মানুষের ঘরে ঢুকে, দরকার হলে সিঁদ কেটে চুরি করে। ওইসব চুরি একা করে না, ছোট একটা দল আছে তার। দলের সে সর্দার।

গাঁয়ের মধ্যেও সে সাধারণত চুরি করে না। সেটা যে তার কোনো নৈতিক চেতনার ফল তা অবশ্য নয়। চোরের আবার নৈতিক চেতনা কী? প্রথম প্রথম সে গ্রামেই চুরি করতো। অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবন গড়তে হয়। যখন প্রতিষ্ঠিত চোর হিসেবে স্বীকৃতি পায় তখন একদিন তাকে নিয়ে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভা হয়। তাকে সামান্য একটু শাস্তি দেওয়া হয়। দশ ঘা জুতা আর বিশ হাত নাকখত। বলা হয়—দেখ, মাথা মুড়াইয়া মুখে চুনকালি দিয়া গলায় জুতার মালা পরাইয়া ঢোল-সোহরত দিয়া তোমারে অপদস্থ করলাম না। যতই হোক, তুমি আমাদের গেরামের পোলা। খুব সামান্য একটা শর্ত। স্বগ্‌গেরামে চুরি করতে পারবা না।

সে অনেক কাল আগের কথা। গ্রামে কয়েক বার চুরির পর ধরা পড়ে যায়। যার মাল চুরি করেছিল তাকে ফেরত দিয়ে দেয় এবং ওনারা বিচার করবেন কী, সে তার আগেই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল, গ্রামে আর চুরি করবে না। বিশ্বভুবন রয়েছে পড়ে সম্মুখে। ডানা মেলতে হবে। কাজেই, তার দল যে একেবারে ছোট তা নয়। আজ যে রকম চুরিতে বেরোচ্ছে, এরকম ছিঁচকে চুরি ছাড়া অন্য কোনো চুরি সে আর গ্রামের মধ্যে করেনি। রাত্রে কারো পুকুরে দু-একটা মাছ ধরা, একজোড়া গাই-বাছুর আছে, অসময়ে কারো পালা থেকে তার জন্য খড়-বিচালি ক'মুঠা নিয়ে যাওয়া, রবি-ফসলের মরশুমে সর্ষে-শাক, মটর-শুঁটি, মিষ্টি-আলু এইসব ক্ষেত থেকে তোলা। এগুলিকে ঠিক চুরিও বলা যায় না। কী করবে, ওই যে চেয়ে নেওয়ার তার অভ্যেস নাই। যারা ভীতু-মার্কা গেরস্থ তাদের কেউ কেউ তাকে ডেকে ওইসব জিনিস দেয়, বলে—লাগলে চাইয়া ল'স। যদি সে কিছু চায়, আপন গ্রামের ভালোবাসা চায়। কিন্তু ওই জিনিস তো চেয়ে পাওয়া যায় না।

এখন সে চলেছে সদানন্দবাবুর বাগানে আম চুরি করতে। তাও এই এত রাতে। বৈশাখ মাস শেষ হতে দিন দুই বাকি। ক'দিন আর ঝড়-বৃষ্টি হয়নি, তাই বেজায় গরম। লোকে ঘুমোয় দেরি করে। সেটা একটা কারণ। না হলে ক'টা কাঁচা আম চুরি করতে এত রাত করার দরকার হয় না। কিন্তু রাত্রিবেলা চুরি করতে বেরিয়ে এমন বিভীষিকা সে আগে কখনো দেখেনি।

ফিকে ফিকে জ্যোৎস্না, আকাশে আধখানা মতো চাঁদ উঠেছে। পশ্চিমে গাছের লম্বা লম্বা ছায়া। যে গাছের আম পাড়বে বলে স্থির করে রেখেছে ওই গাছেই এই কাণ্ড। বাগানটা

তো বেশ বড়, উত্তব-দক্ষিণ লম্বা। দক্ষিণ প্রান্তেব পূর্ব কোণে পুকুরের ধাবেব প্রথম গাছটিতে মস্ত মস্ত আম, ফজলির জাত, লম্বা লম্বা বোঁটায় ঝুলছে, হাত দিয়েই পাড়া যায়। দু-তিনটে হলেই যথেষ্ট। বেশি নিলে বৌ মুখ-ঝামটা দেবে। উনি আবাব সতীলক্ষ্মী ধবণেব মেয়ে। বলবে, এতগুলি নষ্ট কবলা ক্যান্ ? যদি একটু বেশি করে আচার দেওয়াব কথা বলে, বলবে — আম না হয় গাছের ফল, গুড়ও কি গাছে ধবে নাকি ?

বাগানেব মাটি এই কোণে বহুকালেব বৃষ্টিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। তাই গাছটা কোনো এক ঝড়ে টাল খেয়ে হেলে পড়ে আছে। আমগুলি পাকলে মিষ্টি, খুব বসালো, কাঁচায় বিষম টক। বৌ আচাব দেবে মিষ্টি টক দু'বকম। তাই যা বলে বলুক, দু'হালি তো সে ছিঁড়বেই। হাত তুলে একটা আম পাকড়ে সে মাথা নামিয়েছিল। আমেব কষ খাবাপ, চোখে পড়লে অন্ধ হয়ে যায়। চোখ নামিয়ে বাঁয়ে তাকিয়েছিল। বুক ধক্ কবে ওঠে। ডান হাত নামাতেও পাবে না এমন অবশ হয়ে যায়। খুব উঁচু গলায় নয়, কিন্তু অকাবণ জিজ্ঞেস কবে, কেডা ? নিথব অন্ধকাবে তার প্রতিধ্বনি বাজে, কিন্তু কেউ জবাব দেয না। কতক্ষণ অনড় দাঁড়িয়ে ছিল জানে না, পুরাতন অভিজ্ঞ চোবেব বুদ্ধি ফিবে আসে। বাঁ হাত তুলে নাভিব পাশে একটি চিমটি দেয়। না, ব্যথা লাগে। তখন ডান হাতটা আম ছাড়াই নামায়। একটা মানুষ ঝুলছে। মনে হয় মেয়েছেলে। সামনেই। তিন হাতেব বেশি দূবে নয়।

প্রথমে ভেবেছিল দাঁড়িয়ে আছে, মাটিব ওপবেই। কিন্তু মানুষ তো অত লম্বা হয় না, ভূত হলে হতে পাবে। কিন্তু ভূতে সে বিশ্বাস কবে না। তাব এত বড় নিশি-অভিসাবেব জীবনে সে কত কিছু দেখেছে, কিন্তু ভূত দেখেনি। তাই নিমেষে তাব বুদ্ধি ফিবে আসে। কিন্তু সেই বুদ্ধি আবাব বলে, ওখানে যদি কেউ ঝুলছে তাহলে এখানে আব দাঁড়ানো উচিত নয়। এমন কি যদি ফেবার পথে তাব ওপব কাবো চোখ পড়ে যায় তাহলেও ঝামেলা আছে। গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

ওটাব ওপব চোখ আটকে রেখেই এক পা দু'পা করে সবে আসে। হ্যাঁ, যে ডালটা হেলে পড়ে আছে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে, ওটাতে দড়ি বেঁধেই ও ঝুলে পড়েছে। ওখানে দড়ি বাঁধা বেশ সহজ হয়েছে। গাছেব গুঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়নি, মেয়েদেব পক্ষে সেটা কঠিন বটে। কাছেই আর একটা ডাল আছে হাত-খানেক দূরে, নিচে। ওখানে উঠে সুন্দব দড়ি বেঁধেছে ওই ডালটায়। মেয়েছেলেই বটে, আব সন্দেহ থাকে না। মাঁ ছোট বাচ্চাকে কোলে নেওয়ার জন্যে যেমন হেঁট হয়, গাছ সেইভাবে যেন ওকে কোলে তুলে নিয়ে এখন দোল দিচ্ছে। হাবিল চোব চোখ সরাতে পাবে না। না সবিয়ে পা ফেলে ফেলে সবে আসে। ভূতে বিশ্বাস না করুক, তবু চোখ সবালে মনে হবে পেছন থেকে এসে জাপটে ধবলো বুঝি। কিন্তু ওটা আড়াল হলেও সে যে জোবে পা চালিয়ে সবে পড়বে তা পারে না। থমকে দাঁড়ায়। কী ব্যাপার, থামলি ক্যান্ ? থামলাম ক্যান্ ? এখন আমাব মধ্যে সবচেয়ে বড় চোবটা জেগে উঠেছে। আম-চোব সেই ছিঁচকে চোবটা না, বড় চোব, হযতো এটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় চুবি।

তাব হালকা টাক ঘিবে ঝাঁকড়া চুল আছে। দু'হাতেব আঙ্গুল দিয়ে সে-গুলোকে আঁচড়াতে গিয়ে দেখে চুল ভিজে সপসপ কবছে। চারদিকে তাকিয়ে নেয়। এখন সবচেয়ে বেশি আঁধার আছে, আব জ্যোৎস্না আছে, আব পোকা ডাকছে। আর কিছু নাই। তবু এখানে একমুহূর্ত নিরাপদ নয়। যে মাগী এখানে এসে ঝুলছে তার খোঁজে লোকজন ছুটে আসতে পারে। তবু সে এক পা এক পা কবে আবাব যায়। সে একটা জিনিস দেখেছে। চোবেব চোখ যা না দেখে পারে না। ছোট ডালটা হেঁট হয়ে পেবিয়ে একেবারে যে ঝুলছে তাব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এই দিকেই মুখ। মাথা তুলে একবার মুখ দেখাব চেষ্টাও করে, কিন্তু ওখানে অন্ধকার, কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু জিনিসটা যেখানে সেখানে সামান্য একখণ্ড জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে। ডান হাতে একখানা বালা, সোনাব তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হাতটাকে ভালো কবে না ধবে তো বালা খোলা যাবে না। মবা মেয়েছেলেব হাত ধবতে তাব ইচ্ছা কবে না। তবু ধরে। যত ঠাণ্ডা হবে মনে কবেছিল তত ঠাণ্ডা নয়। নবম পুষ্ট হাত। কিন্তু বালাটা খুলে নেওয়া সহজ নয়। চেষ্টা করে, পাবে না। তখন হঠাৎ তাব একটা

কথা মনে হয়। আর একটা বালা এর বাঁ হাতেও ছিল। একটা বালা তো মেয়েরা পরে না। হয়তো আরো চুড়ি ছিল দু'হাতে-কাচের চুড়ি, সোনার চুড়িও থেকে থাকতে পারে। এখানে আসার আগে সেগুলো খুলে রেখে এসেছে। এই বালাটা, চেষ্টা করেছে, খুলতে পারেনি। অগত্যা এটাকে নিয়েই চলে এসেছে। কারণ সময় বয়ে যায়। হাবিল চোর একটা গাল দেয় তাকে। হারামজাদি, যাদের ওপর শোধ তুলতে এখানে আইয়া ঝুইলা পড়ছস্ সেইগুলি তাদেরকেই দিয়া আইছস্ ? ক্যান্, গায়ে রেবাকটি থাকলে কী হইত ? দু'কানে আর গলায় হাত দিয়েও দেখে কিছু নাই।

কিন্তু এটা হাবিল কিছুতে খুলতে পারে না। আরো ঘেমে যায়। তখন ছুরিটার কথা মনে পড়ে। কোমর থেকে বের করে খুলে বালাটার গায়ে ঘষতে লেগে যায়। অর্ধেক কাটা হলে ভেঙ্গে ফেলতে অসুবিধা হয় না। ভেতরে গালা ভরা ছিল। বেচারির হাতে বুঝি আঁচড়-টাচড় লাগলো। শামলা রংয়ের বেশ হাতটি!

আমগাছের মায়াবী কোল থেকে বেরিয়ে এবার সে জোরেই হাঁটতে লাগে। কিন্তু আবার থমকে দাঁড়ায়। আবার যায়। ও কি এখনো বেঁচে থাকতে পারে ? হাত কেন এখনো ঠাণ্ডা হয়নি ? তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েটাকে কি সে চেনে ? নিচের ডালে উঠে সে ওপরের ডালটা ধরে। বুকে কান লাগিয়ে শুনবে প্রাণের কোনো সাড়া আছে কিনা। চোরের জীবনে ওই রকমের সাধ তো তার আগে কখনো হয়নি। কিন্তু ওর চোখেই আটকে যায় মেয়ের চোখ দুটো। চোখে অন্ধকার সয়ে গেলে তখন ওর সুন্দর মুখের ভয়ানক রাগ দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তুই তো মরে গেছিস মাগী, এখন হাতের বালা খুলে নিলে তোর কী ?

সে নেমে চলে যাচ্ছিলো, আবার দাঁড়ায়। হাবিল চোরের এইভাবে একটু একটু করে সাহস বাড়ে। এই সাহস লোভ। সে আবার গিয়ে টপাটপ গুটি পাঁচ আম ছিঁড়ে গামছায় বেঁধে পুকুর-পাড়ের গাছের ছায়ায় ছায়ায় দ্রুত হেঁটে বাড়ি পৌঁছে যায়।

সকালবেলা, তখন বেশ বেলা, বৌ বিষম নাড়া দিয়ে জাগায়। এই, শুনছেন– খবর শুনছেন ? তার ফিসফিসানির সঙ্গে বাসি মুখের গন্ধ আর থুতুর ছিটে বেরোয়।

হাবিল বলে, কী ?

বৌ বলে, আগে কন কার গাছের আম আনছেন ?

হাবিল হতভম্ব হয়ে বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না। বৌ বলে, সদানন্দবাবুর বাগানে গেছিলেন ?

হ, ক্যান্—কী হইছে ?

কাল রাইতে একজনে ওই বাগানে গলায় ফাঁস দিছে। আপনার চোখে পড়ছে নাকি ?

আপনার চোখে পড়ছে নাকি! হাবিল মুখ ভেংচায়। বাগানে গাছ একটা নাকি ? চোখে পড়বো ? কেডায় ফাঁস দিছে গলায় ?

নাদের মিয়া ?হ্যার বড় মাইয়া। বাপের বাড়ি আইছিল তিনদিন হয়।

গলায় ফাঁস দিল ক্যা ? হাবিল জিজ্ঞেস করে।

বৌ বলে, ঠিকমতো কেউ কইতে পারে না। শউরবাড়ি থন্ আইলে নাকি বাপে বকা দিছিল। দামানের নাকি খাসলত ভালো না।

বাদ দে। বাপের খাসলত কোনকালে ভালো আছিল ?

হাবিল উঠে বসে। বালিশের তলা থেকে বিড়ি বের করে। দেশলাই পায় না। বলে, ম্যাচ পাকঘরে নিছস ?

বৌ ছুটে গিয়ে দেশলাই নিয়ে এলে হাবিল বলে, চা আছে ?

ও মা, এখন চা খাইবেন ? দ্যাখতে যাবেন না ? লাশ এখনো নামায় নাই। গাছে

ঝুলতেছে। থানা থন্ পুলিশ আইব তবে নামাইব।

আমি দেখছি —হাবিল বলে ফেলে। কেউরে কইবি না।

বৌয়েব চোখ দুটো বড় বড় হযে যায। রাতেব খেপ মেবে এসে স্বামী তাকে প্রায়ই নানা আজব খবর শোনায়। তাতে তাব আর এখন চোখ বড় বড় হয় না। আজ হয়। কিন্তু আরো আজব কথা শোনা তখনো তার বাকি ছিল। হাবিল বলে, যেই গাছের আম আনছি ছেড়ি হেই গাছেই গলায় ফাঁস দিছিল। কেউবে কবি না।

বৌ হতভম্ব হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখে আর কথা সরে না। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে যায়। ঘরের পেছনের ডোবার জলে কিছু পড়ার শব্দ শুনে হাবিল বুঝতে পারে বৌ আমগুলি ফেলে দিল। সে বেরিয়ে এসে তাজা টক গন্ধটা পায়। আর কী কবে, মজা দেখতে সদানন্দবাবুব বাগানের দিকে যায়।

সদানন্দবাবু অনেক খবচ কবে বাগান কবেছিলেন। বাগান উঁচু করতে পুকুব কাটিয়েছিলেন। আমের কলম এনেছিলেন বাজশাহী, মালদা, ইস্তক মুর্শিদাবাদ থেকে। তাঁর ছেলে চিদানন্দবাবু ১৯৪৭-এর পর এই বাগান আব অন্যান্য জায়দাদ বিক্রি কবে সেই মুর্শিদাবাদে গিয়েই আমবাগান-সহ জাযগা-জমি ঘরবাড়ি কিনে বসত গাড়েন। হিন্দু ছিল তাই চলে গেল। হাবিলেব বেশ মজা লাগে। তাঁর এই বাগান আব এত জায়গা তো আর একজনে কিনতে পাবেনি। বাগান কিনেছেন রহমতুল্লা খান। ওই যে নাদের মিয়া, তিনি বাড়ি কেনেন। আবো কাবা কাবা কীসব কেনেন। চিদানন্দবাবুকে দেখেছে এমন লোক এখনো এ গ্রামে আছে, বেশ ক'জনই আছে, তবে হাবিল তাঁকে বা তাঁব পবিবারেব কাউকে দেখেনি। ভদ্রলোক হিন্দু যাঁবা ছিলেন তাঁরা সবাই চলে গেছেন ইণ্ডিযা। নিম্নবর্ণেব হিন্দু ক'ঘব আছে গ্রামে। তাদেব একজন নিতাই, হাবিলের চুরিব দলে আছে।

হাবিল গিয়ে দেখে এই গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামেব বহু লোক এসে সেই তাব নিশি-রাতেব আমগাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আব সেই মেযেব লাশ এখনো গাছেব ডালে ঝুলছে। হাবিলের গা শিউবে ওঠে। গত রাতে ওই লাশের হাত কান, গলা, নেড়েচেড়ে সে দেখেছে, কিন্তু তখন তার কিছু হযনি।

রহমতুল্লা খান লাশ নামাতে দিচ্ছেন না। পুলিশ আসবে, সুরতহাল দেখবে, তাবপর পুলিশের কথামতো কাজ হবে। লাশ থানায গেলে যাবে, সেখান থেকে জেলা সদবে গেলে যাবে, ময়না তদন্ত হলে হবে। নাদের মিয়া চেয়েছিলেন মেযেব লাশ নামিযে তাড়াতাড়ি গোসল দিয়ে কাফন-দাফন সেবে ফেলতে। বহমতুল্লা খানেব হাত ধরে অনুনয় কবেন, কিন্তু তিনি রাজী হন না। গাঁয়ে এখন রহমতুল্লা খানের তেজ বেশি। আর নাদের মিযাব সঙ্গে সম্পর্কটা যে এত দূব খারাপ হযেছে তাও বেশি লোকে জানতো না।

যাই হোক, অমন সুন্দব মেয়েটা, কোন দুঃখে নিজেব জান নিয়ে নিল সে-ই জানে। বাপকে মেযে অপদস্থ যা করাব কবে গেল। কিন্তু আসল সমস্যা দেখা দিল ওই 'আমগাছটাকে নিয়ে। যেদিকে সূর্যোদয় হয় সেই দিকে হেলে পড়া সুন্দব গাছটা। ওর তলায গ্রীষ্মে বর্ষায় সারাদিনই ছায়া থাকে। কর্মক্লান্ত ক্ষেত খামারেব মানুষ কিংবা পথচলতি ভিনগাঁয়ের মুসাফির গ্রীষ্মে ওরই ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, বর্ষায় মাথা বাঁচায়। কাত হয়ে পড়া নিচু ডালগুলির জন্যে ছেলেরা ওই গাছে খেলতো। ফলও ছিল বড় বড়, খেতে ভালো। বাগানের অন্যান্য গাছের আম পেড়ে চালান হয়ে গেল, কিন্তু এ গাছের আম যেমন ছিল তেমনি থেকে গেল। রহমতুল্লা খান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যার খুশি পেড়ে খাক। কিন্তু কেউ খায় না। গাছেব নিচে একদিন তিনি মৌলবি ডেকে মিলাদ পড়িয়ে দেন। তাতে অনেকেই শবিক হয়, জিলিপি খায়। কিন্তু ওই আমে কেউ হাত দেয় না। কাক আব বুলবুলিতে কিছু কিছু খায়। বেশির ভাগ পেকে পড়ে থাকে।

হাবিল একদিন দু'টি আম খেয়ে ফেলে। দিনের বেলাই কম্মটা করে, কিন্তু কেউ দেখতে পায় না। পড়ে ছিল, সুৎ কবে কুড়িয়ে নিয়ে বাগানেব ওই পিঠে নির্জনে

বসে খায, খোসাগুলি জংলা জলে ফেলে দেয । কিন্তু হাবিল চোরেব কিছুই হয় না, একটু বদহজমও না । কিন্তু কতগুলো আম যে বৌযেব জন্যে বাড়ি নিয়ে যাবে, তাব উপায় নাই । সেদিন কাঁচা আমগুলো পুকুবে ফেলে দিল।

বৌটা তাব ভালো । চোবেব বেটা চোব, এই কথা জেনেই সে তাব ঘবে এসেছিল। মেয়েদেব যে বড় দোষ, পেটে কথা বাখতে পাবে না, এই বৌযেব ওই দোষটি নাই । চুবিব দু'চাবটা জিনিস, পযসা-কড়ি যেমন সামলে সুমলে বাখে, বাত্রে খেপ সেবে ফিরলে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি সে বৌকে যদি বলে, সেই আমনতও বৌ কখনো খেয়ানত কবে না । বৌযেব মাথায হাত দিয়ে হাবিলকে একদিন কেবল একটা কসম খেতে হয়েছিল, কোনো মেয়ের গায়ে কখনো হাত দেবে না । সে কসম সে বক্ষা করেছে । ওই এক বাতিক আছে, স্বজাতির অর্থাৎ নাবীজাতির বড় ভক্ত, বড় টান । আমগুলো ও ডোবায ফেলে দিল । তাই হাবিল সতর্ক হয়ে যায । বালাটাব কথা আব বলে না । জ্যান্ত মেযেব গাযে তো সে হাত দেয় নাই । কিন্তু যুক্তিটা হযতো মাগী বুঝবে না । হাবিল চোবের ওই বৌটাই কেবল আছে, আর কিছু নাই । দুটো ছেলেও তাব আছে । কিন্তু থেকেও নাই । একটা আঠাবো, একটা বুঝি ষোল । শহবে কাবখানায় কাজ করে । বাড়ি আসে না বললেই হয় । একালেব ছেলে, 'চোবেব লগে হ্যাগো কোনো কাম নাই ।'

কিন্তু ওই আম খেতে সে নিতাইকেও বাজী কবাতে পাবেনি । কী বকম কাণ্ড ! চুরি-চামাবি না । 'গাছে আম ঝুলতেছে, মাটিতে পইড়া বইছে । মালিকে কইতে আছে, যত খুশি খাও, যত ইচ্ছা নিয়া যাও,' তবু আম খাওযা যায না, নেওয়া যায না । নিতাইকে বলে – চ নিতাই, আজ বাইতে আম খাই গিয়া পেট ভইবা ।

নিতাই বলে, আম পাইলা কই ?

আবে, জানস না—সদানন্দবাবুব বাগানে ওই যে মেয়াটা গলায ফাঁস লাগাইল, ওই গাছেব আম । খাইতে দেখলে লোকে নিন্দা কবব ।

নিতাই বলে – সর্দাব, তুই একটা পেটুক হইছস ।

তো পেট ছাড়া আব আমাদেব কী আছে ? হাবিল বলে । দুইটা আম পবশু খাইছি, বুঝছস ? জবব খাসা আম । কই, আমাব তো কিছু হয নাই । হজম হইয়া গেছে ।

নিতাই বলে – না বে ভাই, কাম নাই । তোমাব হইল গিয়া মোসলমানেব পেট। মামদো ভুতে তোমাব কিছু কবত না ।

মামদো ভূত আবাব কী বে নিতাই ?

মোসলমানেব ভূতবে কয মামদো ভূত, জান না ? আমি হিন্দুব পোলা । আমার তিনি ঘাড় মটকাইয়া দিতে পাবে ।

হাবিল গাল দেয়, যা ব্যাটা কাপুরুষ । হিন্দুব বক্তে কি এই টু নুন-ঝাল বেশি নাকি যে তোর ঘাড়টাই মটকাইব ।

নিতাইকে রাজী কবানো যাযনি ।

ওদিকে বহমতুল্লা খান একটা হিসাব কবে বেখেছিলেন । গ্রীষ্ম-বর্ষার একটা মরশুম ঝড়-তুফান বৃষ্টি-বাদল হয়ে গেলে সব পবিষ্কার পাক-সাফ হয়ে যাবে, কোনো বালা-মসিবত কুফল কুদৃষ্টি আর থাকবে না । নতুন মাটিব ওপব নতুন জগৎপ্রকৃতি হাসবে ।

নতুন জগৎ প্রকৃতি ঠিকই হাসে । হেমন্তের গোড়ায় শিউলি ফুলে মাটি ঢেকে যেতে থাকে । তাবপব শীত শেষ হতে না হতে সদানন্দবাবুব আম বাগান আমের মুকুলে ছেয়ে যায় । পূর্ব-দক্ষিণ কোণেব সেই গাছটিও বাদ যায না । মুকুলিত বিম্বিত দেহ আভূমি নত কবে যেন ডাক দেয ঃ আয আয আয । কাকে ডাকে ? যাকে ডাকে সে ঠিকই জানে । চৈত্র মাসের গোড়ায ওই গাছে সেই ডালে আব এক মেয়েকে ঝুলতে দেখা

যায়। আদম-ব্যাপারি একজন ছিল গ্রামে, তার নাম শা-নওয়াজ, তাব বড় মেয়ে। এরও বিয়ে হয়েছিল।

বছর-দুইয়েব বেশি হয় নাই। বাপ ঢাকায় থাকে বেশি। মেয়ে যৌতুকেব বলি, লোকে তাই বলে। জামাই নাকি মনে কবতো, মেয়ের পাছায় যত লাথি মারা যাবে তত টাকা বেবিয়ে আসবে।

রহমতুল্লা খান তখন করাতি ডাকেন। গাছ কাইটা নিয়া যাও। কী দিবা কও।

কিন্তু ওই গাছের গায়ে কেউ হাত দিতে বাজী হয না। বলে অন্য কবাতি দেখেন আমাদেব সাহস হয না।

মাস চার পরে ওই গাছে ওই ডালে যখন আর এক মেয়ে গলায দড়ি দেয় তখন রহমতুল্লা খান বলেন, যার ইচ্ছা গাছ কাইটা নিয়া যাও। বিক্রি কর, চাই লাকড়ি বানাও, যা ইচ্ছা, আমারে এক পয়সা দেওন লাগত না। কিন্তু গাছটাবে কাট তোমরা, ধরাশায়ী কর।

কিন্তু কেউ হাতে একটা কুড়াল নিযে এগিয়ে আসে না। একজন যদি আসতো, নিশ্চয় আর একজন সাহস করে এগিয়ে যেত। কিন্তু আত্মহত্যার বেলায় নাদেব মিযাব মেয়েটাকে যেমন পাওয়া গিয়েছিল অগ্রণীর ভূমিকায়, গাছ কাটাব বেলায তেমন কোনো অগ্রণীকে পাওয়া যায না। কেউ বলে, গাছেব গোড়ায় কোপ মারবি, প্রথম কোপই তো তোব নিজের পাযে পড়ব। কেউ বলে, কোপ মাইরা দেখ্, গাছ থেকা গল্‌গল্ রক্ত বাব হইব। এই বকমেব সব কথা। কেউ বলে, গলায় ফাঁস দেওয়া মেয়েগুলি একলগে ঝাঁপাইয়া পড়ব তোব ঘাড়ে।

ইতোমধ্যে মোট ক'টা মেয়ে ওই গাছে গলায ফাঁস দিয়েছিল তাব সংখ্যা আব কেউ ঠিক কবে বলতে পারে না। কেউ বলে বিশ, কেউ পনেবো, কেউ দশ। কেউ বলে সাত। সাত যে বলে সেই ঠিক বলে। মোট সাতজন ওই গাছে আত্মাহুতি দিয়েছিল। একজন ঠিক আত্মাহুতি দেয নাই বলে গুজব। সে আবাব এই গাঁযেব মেযেও না। তাকে গলা টিপে মেরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এনে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল। যাবা রেখে গিয়েছিল তারাই আবাব নিযে গিয়েছিল। সাতজনের মধ্যে এক পুরুষমানুষও ছিল। ষাট বছবেব বুড়ো গোলাম নবি মাতুব্বব। কিন্তু তার কথা বলতে গেলে আর এক গল্প হয়ে যাবে। বাকি সব মেয়ে। ছ'জনেব গড় বয়স পঁচিশ। আসলে হোত কুড়ির মতো। কিন্তু একজনেব বয়স বেশি, পঁযতাল্লিশেব এদিক-ওদিক। তার কথা পরে বলছি।

যেন এই গাছটা ছিল বলে আত্মহত্যাগুলো হচ্ছিলো। তাই এই গ্রাম চৌদিকে খুব বিখ্যাত হয়ে যায়। গ্রামের চেয়ে গাছটাব নাম বেশি ছড়ায়। রূপময়ী নমনীয বিনীতা সেই গাছ। রহস্যময়ী আওয়াজে ডাকে, আয় আয আয। যে সাড়া দেওয়াব সে ঠিকই সাড়া দেয়। একটা মেয়ে তো দিনের বেলাই, ভর দুপুববেলা গিয়ে ঝুলে পড়েছিল। তাতে আশ্চর্য হওয়াব কিছু নাই। কাবণ আজকাল প্রায় দিনরাত সমান। দিনের বেলাও ওর পাশ দিয়ে কেউ হাঁটে না। ক্ষতি হয়ে গেছে রহমতুল্লা মিয়ার। তাঁর বাগানেব পুরা এক বছবের ফলন তিনি বিক্রি করতে পাবেননি। কেউ বাগানে গিয়ে ওই গাছের তো কথাই নাই, অন্য কোনো গাছেবও আম পাড়তে রাজী হয়নি। বাগানে এখন পাখি বেজি গুই-সাপ পোকামাকড় ছাড়া আব কেউ যায় না। কেউ গরু ছাগল যেতে দেয় না। যদি কোনো বেয়াড়া গরু দিয়ে ঢুকে পড়ে তাকে কোনো রাখাল আনতে যায় না। যদি নিজে থেকে এল তো ভালো। না হলে দু-তিনটি গরুর নাকি পাত্তা পাওয়া যায়নি।

তবে বেয়াড়া গরুর মতো বেয়াড়া মানুষেরও অভাব নাই। তার চেয়ে বড় কথা, ওই গাছ বিখ্যাত হয়ে যায়। সত্য মিথ্যা দুইই তার জন্য দায়ী বটে, কিন্তু এই খ্যাতির অন্যতম কারণটাকে মনে রাখা দরকার। অনেক মেয়ে আছে তাদেব মন দুর্বল। মনটাকে জলদি জলদি শক্ত করতে পারে না। সিদ্ধান্ত কবতে দেবি করে। খালি বসে বসে নাকের পানি ঝবায়। কিছু মেয়ে আছে তাবা কেবল তাঁতেব মাকুর মতো স্বামীর-বাড়ি বাপেব-বাড়ি করে। হয়তো কখনো কাঁখে-কোলে একটি-দু'টি বাচ্চা থাকে। বাচ্চা যদি থাকলো তো আরো ল্যাঠা। সে

হয়তো আর পথ খুঁজে পাবে না। ওই রূপময়ী গাছযেদিকে সূর্যের উদয় হয় সেদিকে বিনীত, হেঁট হয়ে 'আয় আয় আয় ' বলে ডাক দিতে শুরু করেছিল বলে না ওইসব গাধা মেয়ে পথ খুঁজে পায় ! তখন ছুটে যায় ।

বেয়াড়া মানুষের কথা বলা হচ্ছিলো। কিন্তু বেয়াড়া মানুষের বেয়াড়া গরুর মতো সাহস কোথায়। একা একা মানুষ গিয়ে ওই গাছ দেখবে এমন সাহস নাই। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে ছোট-বড় দল করে দেখতে আসে। কম-বয়েসিদের সাহস আর একটু বেশি। তাদের কেউ কেউ দলের কথা না শুনে সেই ডালের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ওটাকে মুখ হাঁ করে দেখে। ওই ডালে এতগুলো মানুষের গলার দড়ির কিংবা প্যাঁচানো শাড়ির দাগ কি কেউ দেখতে পেয়েছে ? না। তবে কেউ কেউ বলে, নাকে একরকমের গন্ধ পেয়েছে। কেমন গন্ধ ? অনেকটা লোবানের গন্ধেরই মতো ।

না হলে এখন লোকে দূর থেকে ওই গাছ দেখে। হাত দিয়ে দেখায়, ও-ই যে দেখ মিয়া, ওই গাছ। যেখান থেকে দেখা যায় না, কিংবা হয়তো মগডালের একটুখানি দেখা যায়, সেখান থেকেও একজন আর একজনকে দেখায়, ও-ই যে দেখেন, ওই গাছ ।

হাবিল চোরের আবার এর মধ্যে একদিন একটু ঝামেলা গেছে। গ্রামে পুলিশকে তো প্রায় আসা-যাওয়া করতে হয়। একদিন পুলিশ হাবিলকে দিয়ে গাছ থেকে লাশ নামিয়েছে। লাশ, তার ওপর মেয়েমানুষের লাশ। সাধারণত যাদের লাশ বাধ্য হয়ে তারাই নামায়। মুসলমান মেয়ের লাশ বেগানা পুরুষের ছোঁয়াও নিষেধ। কখনো কখনো আপন লোকেও লাশ ছুঁতে গাঁই-গুঁই করে। তখন পুলিশে ধমক মারে। সেবার যে মেয়েটা ঝুলছিল তার পরিবারের লোক আপাতত কাউকে পাওয়া যাচ্ছিলো না, যদিও বহু লোকের ভিড়। পুলিশ হঠাৎ হাবিলকে দেখতে পায়। হাবিল চোরকে কে না চেনে! বলে – এই, লাশ নামা দেখি ।

কী করে, মজা দেখতে এসে ধরা পড়ে গেছে। পুলিশে একটা হাঁকড়ানি দিলে ভিড় খানিকটা সরে যায়। হাবিল ভিড়টাকে গালাগাল করে অত্যন্ত মুখ খারাপ করে। ভেড়ার জাতের এই রকম বিনা পয়সায় মজা দেখার লোভ তার সহ্য হয় না। চৌকিদার নিচের ডালটায় উঠে হাত বাড়িয়ে ছুরি চালিয়ে দড়ি কেটে দিলে হাবিল জাপটে ধরে নামায়। কী একটা বাজে কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয় তাকে। এখন কোন সায়রে স্নান করবে তারই যেন খোঁজ করতে সে সটকে পড়ে ।

এই সায়রের সন্ধান হাবিল চোর সারা জীবন করলো। অনেক সময়ে মনে হোত বৌটার মধ্যে, হ্যাঁ, আছে সেই সায়রের ধারা, কিন্তু হয়তো তার পরই মনে হোত – না, তা আছে অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। বৌটার সঙ্গে মনের মিল হয়েছিল। যেন খাপে-খাপ। রুজি-রোজগার যা করে এনেছে, কখনো অশ্রদ্ধা করেনি ।

জেল খাটতে গেছে, এক বছর দু'বছর। তখনো দুই বাচ্চা নিয়ে ভাঙ্গা ঘরে কাটিয়ে দিয়েছে দিনগুলি। ঝগড়া বাধলে পাড়া-প্রতিবেশী বলেছে 'চোরের মাগ', মুখ বুজে সয়েছে। কিন্তু সদানন্দবাবুর বাগানের সুন্দর কাঁচা আমগুলি ঘরের পেছনের ডোবায় ফেলে দিয়েছিল। সেই প্রথম তার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছিল ।

আর একটা দুঃখ তার মনের মধ্যে ছিল – খুব নীরব, খুব গভীর, সে জানে। ছেলে দু'টোর অশ্রদ্ধা। কিন্তু স্বামী বাদ দিয়ে বৌ ছেলে দু'টোকে আশকারা দেয়নি ।

সেই যে গাছের চুরি-করা আমগুলিকে অশ্রদ্ধা করেছিল তাই এতদিন হাবিল চুপচাপ ছিল। তারপর একজোড়া সোনার চুড়ি এনে বলে – ল। হাতে দে। কতবার দিছি, কতবার নিয়া নিছি, তাই না ? এইটি নিমু না। পইরা থাকো।

বৌ মুখ ফাঁক করে গাল ফুলিয়ে একরকম শব্দ করে। বলে, কত দেখছি !

ক'দিন যায় হঠাৎ সেদিন বৌ বলে, এমন ঝকঝকা চুড়ি কই পাইলা ? মনে হয়, নতুন, একেবে স্বর্ণকারের দোকান থন আনছ ?

হ, আনছি তো। হাবিল বলে। বানাইয়া আনছি।

বানাইয়া আনছ। স্বর্ণ পাইলা কই ?

হাবিল বলে—ক্যান, তোমারে কই নাই ? সেই যে বাইতে আম আনতে গেছিলাম সদানন্দবাবুর বাগানে ? যেই গাছে আম পাড়মু দেইখা গেছি সেই গাছেই সেই যে নাদের মিয়ার মেয়া গলায় ফাঁস দিয়া ঝুলতে আছিল। তার একহাতে ছিল সোনাব বালা, অন্য হাতে কিছু নাই। ইস বে, বাম হাতেরটা খুইলা রাইখা আইছিল। নাইলে তোব আজ চারগাছা চুড়ি হইত। হইত কিনা ক ?

এই রকমের লাবে কাহিনী বলতে বসলে, হাবিলের স্বভাব, সে সোঁত সোঁত করে মুখে বস টানে। কিন্তু বৌ অবাক হয়ে যায়। যেন-বা হতবাক হয়ে যায়। বলে, নাদের মিয়াব মেয়ার হাতে সোনাব বালা আছিল ?

হ।

সেই বালা ভাঙ্গাইয়া আপনে এই চুড়ি বানাইছেন ?

হ।

সেই চুড়ি আমারে পরাইলেন ?

তো কী হইছে ?

হাবিল বোঝে, এই এক ফ্যাকড়া বাধলো অকাবণ। বৌ চুড়ি দুটো এক এক কবে খোলে। মেঝেয বাখে। হাবিল বলে, সেই যে আমগুলি ডোবায ফালাইছিলা, মনে আছে ?

বৌ বলে মনে থাকব না ক্যান্ ?

এই দুইটাও ডোবায় ফালাইবা নাকি ?

ডোবায় ফালামু ক্যা ? বৌ বলে।

তো খুলে রাখলা যে ?

যার জিনিস তারে দিমু।

তাবে পাবা কই ? হাবিল বলে।

বৌ কোন কথার জবাব দেয় না।

তোবে দিছি, অখন যা খুশি তোব কব। বলে হাবিল উঠে চলে যায়।

রাত যায়। পরদিন হাবিল বৌয়েব হাতে সোনার চুড়ি জোড়া দেখে না। চুড়ি জোড়া ডোবায সত্যি ফেলে দিল কিনা কে জানে। বৌয়েব তাব চিবকাল একটু পাগলি-পাগলি ভাব। ডোবায় ফালাইয়া দিলে কি নাদেব মিয়ার মাইযায সেই চুড়ি পাইব ?

যাকগে। রাত্রে খেপ ছিল। নিতাই আর আরো দুই শাগরেদ এসেছিল। পঞ্চমীব ভাঙ্গা চাঁদ ডুবে গেলে ওবা মেলা দেয। ফিরতে আজ সাবা বাত কাবার হয় না। তখন তিন প্রহবেব শিয়াল ডাকে। তাব ঘরেব দরজা কখনো ভেতরে বন্ধ থাকে, কখনো খোলা থাকে। খোলা দবজা ঠেলতে ক্যাঁক্ শব্দ হয়। তাতে মনে হয় ঘুমেব মধ্যেই বৌ একটু নড়ে। টিমটিম কুপি জ্বলছিল। হাতের ঝাপটায় নিভিয়ে দিয়ে হাবিল শুয়ে পড়ে।

খেপ মেরে ফিরে এলে ঘুম হয় জবব। কাবা সব দড়বড় করে ছুটে আসছে শুনতে পায়। কেউ কেউ যেন 'হাবিল-চাচা হাবিল চাচা' বলে ডাক দেয। তারা দাওয়ায় এসে ওঠে। তারপর টিনেব দরজায় থাবড়ার আওয়াজ শোনে। তখন হটাং কবে দবজাটা খুলে যায। ঐ চাচা ! ওঠ !

হাবিল চোখ মেলে, কিন্তু যেন দেখে না।

চাচা ওঠ। চাচি কই ?

হাবিল উঠে বসে। দেখে, পাশে বৌ নাই।

আহ, ঘবের বাব হও। দেখবা কী কাণ্ড হইয়া বইছে ?

তখন বেশ বেলা। হাবিলকে নিয়ে যখন ওবা যাচ্ছে, কে একজন বলে – চাচা, বুক শক্ত কব।

হাবিলেব বুক সব সময়ে শক্ত। গিয়ে দেখে, আমগাছেব সেই ডালে বৌ ঝুলছে। একেবাবে গাইয়েব দিগ্‌দড়া দেওয়াব দড়িটা এনে বেঁধেছে।

চাচা, কী হইছিল ? ও হাবিল্যা, কী হইছিল ? এইসব প্রশ্ন কবছিল লোকে। সামান্য একটু জিভেব ডগা বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু চোখ দুটি ছিল নত। তাই দু'জনেব চোখাচোখি হয না। 'কী হইছিল .... কী হইছিল ?' কবতে কবতে লোকে তাকে সবিয়ে নিয়ে যায়। দুই হাতে দুইটা সবুজ বংয়ের প্লাস্টিকেব বালা আছে। দুই-তিনটা করে লাল কাচেব চুড়ি আছে। তাব সঙ্গে জ্বলজ্বল কবছে দুই হাতে দুই ঝকঝকা নতুন সোনার চুড়ি। কিন্তু হাবিল আশ্চর্য হয়ে গেছে যাব জন্যে, চুড়ি জোড়া কেউ খুলে নেয়নি।

পুলিশেব সঙ্গে হুজ্জত-হাঙ্গামায কাটলো দুটো দিন।

তাব পবদিনই, তখনো ভালো কবে সূর্য ওঠেনি, লোকে সেই শব্দগুলি শোনে! কেউ কেউ ভয়ে সংশয়ে রোমাঞ্চে দূবে দূবে দাঁড়িযে দেখে, হাবিল তাব কুড়াল চালাচ্ছে সেই আম গাছেব গোড়ায। আমগাছেব ডালপাতাগুলি কোনো কোনো ঘাযে থবথর কবে কেঁপে উঠছিল।

গাছ তো এমন কোনো বিবাট মোটা ছিল না, ঘন্টা-খানেকের মধ্যেই মড়মড় শব্দ করে পড়ে গেল। গাছ যেন হাত-পা উর্দ্ধে কবে চিতপটাং পড়ে রইলো। কিন্তু ততঃ কিম্ ? কেউ জানে না। সবাই কেবল হাসছে। এই বকম গাছ পড়লে ছেলেমেযেবা এসে তার ডালপালায় চড়ে দাপাদাপি শুরু কবে দেয। কিন্তু কেউ আসে না।

হাবিল বসে একটু একটু হাঁপাচ্ছিল, গামছা দিয়ে কপালেব আব বুকেব ঘাম মুছছিল। দূবে দূবে দাঁড়িযে লোকে তাব শক্ত পুবনো পেশিগুলো দেখছিল। তাদেব মুখে হাসির ভাব। কখন বহমতুল্লা খান গুটিগুটি পাযে হাবিলেব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাব ঘর্মাক্ত কাঁধে হাতের তিনটি আঙ্গুল রেখে বলেন, হাবিল্যা বে, আজ দুপুবে আমাব বাড়ি খানা খাস। বুঝছস্ ?

হাবিল হ্যাঁ না কিছু বলে না। তিনি চলে গেলে উঠে দাঁড়ায়। কোমব থেকে বিড়ি বের কবে দেশলাই ঠুকে ধবায। কযেক টান দিয়ে দেখে নিতাই দাঁড়িযে আছে। বিড়িটা তাকে দেয। দিয়ে কুড়াল তুলে নিয়ে গাছেব হাতপাগুলি কোপাতে লেগে যায়। আবো ঘন্টা খানেক ওই কাজ কবে। রূপময়ী আমগাছ কুরূপা হয়ে যায। ববং তাব আব কোনো রূপই থাকে না। বাগানেব কোণাটা একটুখানি ফাঁকা হয়ে যায। ন্যাংটা ন্যাংটা লাগে। কিন্তু হাবিলেব মনে শান্তি লাগে না। বাগানে এখনো কত গাছ, এখনো কত গাছ!

নিতাইকে কুড়াল দেয। তোর ঘরে বাখিস। গাইটা আর বাছুবটা এট্টু দেখিস। নদীর ঘাটে যাই। টাউনে যাওন লাগে।

টাউনে কী কাম ? নেতাই জানতে চায।

পোলা দুইটারে খবব দেওন লাগে না ? হ্যাগো মাযেব খবর ? চলি।

চিবুকেব কযটা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে হাবিল চোর নদীর ঘাটেব দিকে চলে যায়। গামছা দিয়ে এলোমেলো বুক বগল কনুই মুছতে দেখা যায় তাকে। মাথার চাঁদি, কপাল মুছতে দেখা যায। গামছা কপাল থেকে চোখে নামে কিনা পেছন থেকে ভালো বোঝা যায় না।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

যে তোমায় ছাড়ে

প্রায়ান্ধকাব করবীগাছ ফুলে ঢাকা এখন একথা কেউই বলবে না। কিন্তু যে জানে সে ঐ লাল-হলুদ করবীব রাশি মাড়িয়ে ছোট মাঠটুকু পেরুতে দেখবে ঘাসেব ডগায় হালকা হিমেব ছায়া। যদি নরম করবীর স্পর্শ সে হাতে-না লাগাবে তাহলে রাস্তায় নেমে বাঁয়ে ঘুবলেই দেখবে শবতেব প্রথম শিউলী ঐ অন্ধকাবেও জ্যোৎস্নার চূর্ণ ছড়িয়ে বেখেছে।

শিউলীর কাছেই বেলগাছটি বাঁকানো, সদব দবজাব কাছে যেন তোবণেব মতো। এমন বাড়ির সামনে ছাতিমই বা কে ভালোবেসেছিল, সাদা ভালো-লাগা না-লাগা সুবাস কাকে আকুল করেছিল কেউ জানে না, কিন্তু তাব নীচে সিমেন্টেব আসনটি বানিয়েছিলেন যিনি তিনি নিশ্চয়ই দু'হাতে ছাতিমের কুঁড়ি, ফুল সবিয়ে বেঞ্চটিকে পরিষ্কার করে বসতেন। দেখতেন বুঝি মল্লিকার ঝোপ বরাবর তাঁর যে সীমানা, গাঢ় সবুজেব মাঝে দেখা যায় শ্বেত মল্লিকাব দল যেখানে, সেখানে কে দাঁড়ায় ঐ প্রত্যূষেই।

পরিষ্কার পীচঢালা রাস্তাব কিনারায় গেলেই শিশিরের কণা ছুঁয়ে যাবে পায়ের আঙ্গুল, কি নিঃশব্দে দ্রুত ঝরে পড়বে কালো চামড়াব জুতোয়। এমনি করে আবো খানিক এগুলেই দেখবে বড়তবফেব বারমহলে জবরদখলি সবকাবি অফিস। দালানেব ঠিক প্রান্ত থেকেই শুরু লোহার খুঁটি আর টানা তারের বেড়ায় পৌরভবনেব আঙ্গিনা। সামনে, পেছনে, খোলা মাঠে দাঁড়ানো হালকা হলুদ রঙের পৌরভবন। তাবেব বেড়াব পাশে পাশে কয়েক হাত পব পব সোজা মাথা তুলে দিয়েছে দেবদারুবীথি। রাস্তাব ওপারে স্বাস্থ্য বিভাগেব কর্মকর্তাব বাসস্থানেব দেয়াল। এই পথ শেষ হবে বড় রাস্তায়। ডাইনে ঘুরলে পৌরভবনের সীমানা অনেক দূব এগিয়ে নিয়ে যাবে সান্যাল পাড়ার মোড়ে মিউনিসিপ্যালিটির বাতি দাঁড়ানো যেখানে। তিনকোণা ঘাসেব জাজিমে আর এক রাস্তাও এসে মিশেছে সেখানে, ডাক বিভাগের বড় কর্তাব বাসও ঐ মোড় পেরুলে বড় দালানেই। সোজা গেলে রাজবাড়ি, বাঁয়ে ঘুরলে হাসপাতাল, জেলখানার শেষ সীমানাব পরে ক্ষীণ স্রোতস্বিনী।

পীচেব রাস্তাটি ধরে এসে বাঁয়ে ঘুরলে দেখা যাবে জেলখানার পূর্ব সীমা। শুরু হবে মহীরুহ বট কি অশ্বত্থেব সারি, কি ঘোড়ানিম, মাঝে সুবিশাল জামগাছটি। আদালতপাড়া ঢেকে আছে যেন বট আব পাকুড়েব পাতা আব ফলে। মাথা উঁচু করে না তাকালেও শোনা যাবে ডালে ঝুলে থাকা সহস্র নিশাচরেব ডানার শব্দ, তাবাও এখুনি ফিবে আসছে আস্তানায়।

না ঘুরে সোজা গেলে, মোক্তারখানা পেরিয়ে এগুলে দেখা যাবে শানবাঁধানো ঘাট ধাপে ধাপে নেমে গেছে নদীর বুকে। কূলছাপানো বর্ষায় দু'টি সিঁড়িও নামতে হয়না কখনো। ঘাটেব ওপরে তিন দিকে শানের হেলান দেয়া আসন, প্রত্যূষে স্বাস্থ্যান্বেষীর জন্যে, দ্বিপ্রহবে স্নানার্থীব শুষ্ক পরিধেয়, বা বিচারপ্রার্থী গ্রামবাসীর বিশ্রামের জন্যেও।

আদালত ভবনের শেষমাথায় সন্ত্রীব গুমটিতে প্রতিঘন্টাব ঘোষণা সারা শহরেই যেন শোনা যায়। ঐ গুমটিব সামনে দিয়েও পথ চলে যাচ্ছে।

এমনি ঈষৎ আলোর প্রভাতে, কি রৌদ্রকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে, ক্ষীণ অন্ধকারের সন্ধ্যায়, এই দেবদারুবীথির নীচে, পথ অশ্বত্থ-বট-পাকুড়-আম-জামের মেলা ফেলে চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে শন্ শন্ হাওয়ায় ঝাউয়ের বনের দিকে, যাচ্ছে অশোক শিরীষ-কৃষ্ণচূড়ার হাত ধরে, সার্কিট হাউসের বেড়া ঘেঁষে, নবাববাড়ির প্রাচীর ছুঁয়ে, তারপরে যাচ্ছে খেলার মাঠ, সরকারি স্কুল, বেসরকারি স্কুল, শহরের সব রাস্তার মোহনার দিকে। আবো এগুলে মেহগনি আর অর্জুন, শিমূল আর সেগুনের বাগিচার বুক বেয়ে রেলেরমাঠ পেরিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যাচ্ছে সে।

মানুষও যাচ্ছে। অনন্ত মজুমদারই প্রথম যান। এজন্যে নয় যে তাঁর ওকালতির পেশাটি জমেনি। বরং তাঁর দপ্তরখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে যে প্রকাণ্ড লিচুগাছটি, টিনের চাল ফুটো করে ওপরে উঠেছে যার মাথা, তার নীচে মাদুর পাতা থাকে সর্বদাই। বেঞ্চে তো বসবার জায়গা থাকেই না। এমনও হয়েছে যে রাস্তায় ঝড়বৃষ্টিতে ধরা পড়ে যখন খবিরউদ্দিন কি হারাধনের বলদজোড়া গাড়ি টানতে চায়নি, মাথা ঢাকতে হয়েছিল তাদের কাচপুরের জংলী গাছের ছায়ায়, তখন তারা কোনমতেই শেষ বেলার আগে এসে ওকালতনামায় টিপসই দিতে পারেনি। এমন অবস্থায় ঐ লিচু গাছের নীচেই রাত কাটাতে হয়নি অনেককে, দপ্তরখানার বারান্দার ওপরেই, একথা বলা যাবে না।

অনন্ত সরকারি উকিল ছিলেন এবং এ-কারণেই আদালতের মাথার নিশানটি বদলে যাওয়ায় কয়েক বছর পরে তাঁকে ঐ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলেও তাঁর নামডাক কমেনি। সরকারের হাঁড়ির খবর তাঁর জানা মনে করে মক্কেল তাঁর বারান্দায় সারা দিন বসে থাকার ক্লেশকেও গ্রাহ্য করতো না। তবুও অনন্ত মজুমদার বড়ো ক্ষুব্ধ ছিলেন। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বা যত্ন কোন কিছুর অভাব ছিলনা বলেই এটি মেনে নেয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। ব্যাডক্লিফ সাহেবের সীমানা যেখান দিয়েই টানা হোক না কেন, এই শহর, এই বিভাগ কোন্ দিকে যাবে তাতে সন্দেহ ছিল না। ছেলেটি মতোবড়ো তুখোড় খেলোয়াড়, সাহেবরাও তার বল ব্যাটে ছোঁয়াতে পারে না যখন জেলা স্কুলের মাঠে খেলা হয়, ঐ ছেলেকেও তাই তিনি স্কুলের শেষেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মামাবাড়ি। সাতপুরুষের মাটি এবং পাকা দালান ছেড়ে অনন্তর সম্বন্ধী যখন স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেলেন এবং সেখানেও পাকা বাড়িতেই উঠলেন গিয়ে, তখন ছেলেটিকে পাঠাতে তাঁর দ্বিধা হয়নি এবং একই কারণে আত্মীয়ের মুখাপেক্ষী হবো না বললেও গৃহিনীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমতই হয়েছিলেন এবং কিছুকাল পরে তিনি আত্মীয়সকাশেই চলে গেলেন।

অনন্তর অধিকাংশ মক্কেলই ঐ লিচুগাছের ছায়ার জন্যেই হোক, বা যে-কারণেই হোক, মাখন মজুমদারকে মেনে নিল। মাখনের গৃহিনী কোন জমিদার পরিবারের কন্যা নয় এই কারণেই মাখনও সাগ্রহে অনন্তর দপ্তরখানাতে এসে বসেছিল। এমনকি মুহুরি ক্ষিতীশ ও নরহরিকেও তাড়ায়নি সে। বড়ভাইয়ের কোঠাবাড়ি, দপ্তর সবই তার তো হতেই পারে।

কিন্তু এমন কথা বলা যাবে না অখিল তরফদার সম্পর্কে। চোখের সামনে অনন্তের দপ্তরে মাছির মতো লোক ভন্‌ভন্ করতে দেখেছে সে, এবং রাস্তায় গিয়ে কোন কোন মক্কেলের হাত ধরে টেনেও এনেছে তার কাছে মুহুরি। তার শামলার কালো রং জ্বলে গেছে কতকাল আগে কেউ জানে না। নটার সময়ে দপ্তর ছেড়ে ভিতরে যাবার সময় প্রায়ই তার বারান্দার চৌকিতে কেউই অপেক্ষায় থাকতো না। কিন্তু এমন অখিল বউয়ের বারোমাস নমাস জেনেও, দূরের স্টেশনে ট্রেনলাইনের পাশে রক্তগঙ্গা বইছে শুনে একদিনও অপেক্ষা করেনি। বেলেঘাটার বস্তি না-হলেও, উল্টোডিঙ্গির চুনবালিখসা দালানের দুটি ঘর তার এই টিনের চারচালার চাইতে এমন কিছু লোভনীয় ছিল একথা ও কেউ বলবে না।

যোগেন চৌধুরির নামডাক কেবল তাঁর শহরেই নয় অন্য জেলাতেও ছিল। কখনো শক্ত রোগের পরামর্শের জন্যে ট্রেনে করে অন্য শহরের সিভিল সার্জনের অফিসেও তাঁকে যেতে দেখেছে সবাই। যোগেন চৌধুরীর চশমার কাচটি পুরু। গলার স্বর ভারি। এককালের কংগ্রেসী

বলেই তাঁর রোগী দেখবার ঘরে গড়গড়াটিও টানা যেতো না। তাঁর পাঁচটি ছেলের দু'টি কলকাতার মাঠে বড় খেলোয়াড়, একটি কলেজের ছাত্র, একটি রাজবন্দী, ও অন্যটি তাঁরই ডিস্‌পেনসারির কম্পাউন্ডার হলেও কারো কোন সাড়া পাওয়া যেত না। যোগেন চৌধুরী রোগীর বুক-পেট টেপবার ফাঁকে ফাঁকে যখন রাস্তার দিকে চাইতেন, বা প্রাতভ্রমণকালে যখন দেখতেন ট্রাংকস্যুটকেশে বোঝাই রিক্সা বা টমটম চলে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে, চোখ নামিয়ে নিতেন। গাছপালায় ঘেরা উঁচু রেলিংয়ের ভেতরে তাঁর বাড়িটি চুপচাপই ছিল। বরং কিছুকাল পরে এক খেলোয়াড়কে বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হয়েছিল বাড়িতে।

হৃষীকেশ ভট্টাচার্যের স্ত্রীও ছিলেন স্বর্ণপ্রসবিনী। তিনটি সাবালক পুত্রের মধ্যে অন্তত দুজন প্রায় সারাবছরই দেশের এই জেলে না-হয় ঐ জেলে কাটাতো। কোন কারণে তাদের কখনো জেল বদল করানোর খবর পেলে ভদ্রমহিলা ভাবতেন বুঝি এই শহরের জেলেই পাঠাবে তাদের কাউকে না কাউকে। আশাভঙ্গের জন্যেই তার চাপাকান্না কিনা কে জানে, হৃষীকেশ শান্তমনে খদ্দরের ধুতি পরে স্নানাহার সেরে প্যান্ট ট্রাউজারে কোর্টে চলে যেতেন। আরও দুটি নাবালক আছে। বিবাহযোগ্য কন্যাও আছে আরো দুটি, তাঁর মধ্যে একটি মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর চাকরিও পেয়েছে, এ-সব কিছুই যেন তাঁর মনে থাকতো না। যে বাড়িটিতে তাঁরা থাকতেন, শরিকের বাড়ি, তারা বিক্রি করে চলে যেতে চাইলে তিনি বাধা দেননি। পাড়ার মধ্যেই অন্য এক বাড়ির ভাড়াটে হয়ে উঠে যান। হৃষীকেশও এ-জন্যে স্টেশনে যাননি।

কিন্তু গেছেন কেশব সেন। মোক্তারির পয়সায় টিনের ঘর ভেঙ্গে দালান না বানালেও কন্যাদের জন্যে এসরাজের মাষ্টার রেখে দিয়েছিলেন কেশব। মনিকার ছড়ের মিঠে টানই কেবল নয়, খোলা চুলও এবং স্কুলে যাওয়া-আসার পথে হালকা বাসন্তী রঙের শাড়ি, কতজনকে উন্মনা করেছিল তার হিসেব কেশব সেন রাখেন নি, তবুও অমন তড়িঘড়ি করে খুড়শ্বশুরের সাতমহলায় সপরিবারে তাঁরও ঠাঁই হবে ভেবে স্টেশনের দিকে চলে যাওয়া তাঁর ঠিক হয়নি। এবং এ-কথা কমলা ব্রাহ্মণীও বোঝাতে পারেনি তাঁর স্বামী নারায়ন চক্রবর্তীকে। তাঁর যুক্তি দেখিয়েই নারায়ন বলেছিলেন, যেখানেই যাই পূজোআর্চা থাকবেই, যজমানও বেরিয়ে যাবে। এখানে যারা আজও আছে কাল যে থাকবে তার ঠিক কি। সারদা মজুমদারের তবলার আওয়াজও সারা পাড়ায় শোনা যেতো। গরমের দুপুরে রেয়াজের সময় তাঁর গা দিয়ে যেন ঘামের স্রোত বইতো। সতীসাধ্বী রমণী তাঁর স্ত্রী বিরাট এক তালপাখা দিয়ে স্বামীর শরীর থেকে স্বেদ দূর করবার প্রয়াস করতেন। স্কাউটমাষ্টার হবার জন্যেই সারদাকে অনেক জায়গায় যেতে হতো, তাই স্টেশনের দিকে যাবেন এমন স্থির করবার পরপরই তাঁর একটি চাকরি জুটে যায়। ফলে তাঁকে কোন চিন্তা করতে হয়নি রিকসায় ওঠার আগে। এবং সতীসাধ্বী রমণী যতোই বলুক না কেন, অন্যখানে যাই হোক আমাদের শহরে তো কোনদিন কিছু হয়নি আমরা কেন যাবো, সারদা কানেও তোলেন নি। এই শহরই সারা দেশ নয়, কেবল সতীত্বের জোরেই এই যুক্তি খন্ডন করা যায় না।

স্বদেশী আমলে ললিত সান্যাল এক লোন কোম্পানী খুলেছিলেন, শোনা যায় যুদ্ধের সময়ে চালানী ব্যবসাও ছিল তাঁর। এই দুইয়ে মিলে, বিশেষত লোন কোম্পানীটি ফেল করিয়ে দেবার পরে, মনে হয় শহরের এই অঞ্চলের সব দাগেই জমি কিনে বাড়ি বানাতে শুরু করেন তিনি। ছাদশুদ্ধ পাকা বাড়িটি দিয়েছিলেন মধ্যম সন্তানটিকে, তার উপার্জনের ঠিকঠিকানা ছিল না, মতিও স্থির ছিল না, না-হলে স্ত্রী অবিশ্বাসিনী এই সন্দেহেই কেবল অমন শিশুপুত্রকে কোল থেকে নামিয়ে রাত্রির অন্ধকারে কেউ ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয়? কোঠাবাড়ির অংশ ভাড়া দিয়ে পুত্রটিকে মানুষ করার চেষ্টায় ছিল সুনীতি। তার কোথায়ও যাবার কথা ছিল না। আটচালা, শানের ভিত, পাকা মেঝের ঘরটি, যেটি একসময়ে ললিত সান্যালের কাছাড়িবাড়ি ছিল, সেটি নতুন সরকার ভাড়া নেয় ললিত সান্যালের কাছ থেকে রেজিস্ট্রি অফিসের জন্যে। ঐ ঘরের পেছনে এবং বাঁয়ে পরপর দুটি ঘর ললিত নিজের জন্যেই রেখেছিলেন। মেজছেলে ফণী পেয়েছিল উত্তরের তিনটি ঘর, উঠোনের চারপাশে, বিশ্বনাথ পেয়েছিল আঙ্গিনাশুদ্ধ দুটি বাড়ি, কালিদাস পেয়েছিল একেবারে পূর্বসীমায় সবচেয়ে কেতাদুরস্ত লাল ইঁটের নতুন বাড়িটি, এবং জ্যোতিবিন্দ্র বড় ছেলে হবার সুবাদেই হোক বা ব্যাংকের চাকরিটি পেয়েছিল

বলেই হোক, উত্তর-পূর্বের পাঁচঘরের মহলটি ছিল তাব। ললিত সান্যালের অধিকারের সীমা তাই পাড়ার অর্ধেক জুড়ে ছিল মনে হয় যেন, এবং এ-কারণেই কালিদাস, বিশ্বনাথ, ফণী নিজ নিজ অংশ বিক্রী করে স্টেশনেব দিকে যেতে চাইলে ললিত খুবই মুশকিলে পড়েছিলেন। বিধবা সুনীতি এক সীমায আব অন্য সীমায় জ্যোতিরিন্দ্র — মাঝখানে উঠোন, আঙ্গিনা, বাগান, গাছপালা, ঢেউটিনের আটচালায় ঘেরা চারচারটি বাড়িতে কাবা আসবে এইসব ভেবেই বুঝি এক সকালে ললিত আব ঘুম থেকে উঠলেন না। তাতে সুবিধেই হলো। মহা ধূমধামে শ্রাদ্ধশান্তির পবে দ্রুত স্টেশনেব দিকে চলে গেলো যাবা যেতে চাইছিলো। সবকাবেবও সুবিধে হলো — নতুন পাশ করা আইনে অ্যাকোয়ার্ড স্টেট হিসেবে বেজিস্ট্রাবেব অফিসটির জন্যে নামমাত্র ভাড়াটিও আব কাউকে দিতে হতো না।

ভিন্নমুখী টানে এই শহরে আসা তাঁব। যেমন সকলে ভাবে, প্রাণ বাঁচানোই কেবল নয়, ভবিষ্যতের কথাও, পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনও তাঁর চিন্তায় ছিল। সবকারি চাকুবিব জন্যে এ-পাব ও-পার বেছে নেয়াব সুযোগ তাই তাঁব কাজে লেগেছিল। এবং আলতাফ হোসেন পুত্র আশবাফকে একটি নিশ্চিত সুন্দর জীবন দেবেন বলে বেজিস্ট্রি অফিসেব ঠিক উল্টোদিকেব বাসাটিই পছন্দ কবেন। ঘরের বাইবেই প্রায় রাস্তাব ওপাবেই অফিস, সামান্য আপত্তি করেছিলেন তাঁব স্ত্রী। জ্যোতিষ সবকার উকিলের মুহুরি হলেও বাড়িটি বানিয়েছিলেন যত্ন করে, সেই বাড়ির অংশ, ভাড়া দেয়া-না-দেয়ার ব্যাপারে জ্যোতিষের বলবার কিছু ছিল না, নতুন আইন। আলতাফের ইচ্ছে ছিল আশরাফ মিলবে সকলেব সঙ্গে। সান্যাল বাড়িব কথা শুনেছিলেন। শুনেছিলেন দীনেন মৈত্রের কথা, অসাধাবণ মেধাবী পুত্র তাঁর, প্রেসিডেন্সিতে পডতো, ধবা পড়েছিলো খিদিবপুর বোমা বানানোর কাবখানায। শুনেছিলেন জ্যোতিবিন্দ্রের একশো মিটার ড্যাশে রেকর্ড করা পুত্রটিব কথা, আর শহবের সৌখিন নাটকেব দলে অভিনয় করা বালক তাঁর অন্য পুত্রটিব কথাও। তাব মতো কেউ নয, এই ধাবনার জন্যে হয়তো নয় তবুও বাইরে খেলার চাইতে মায়েব পাশে বসে কুবশি কাঁটায মোজা বা সোয়েটার বোনা শেখাতেই আগ্রহ ছিল বেশি আশবাফেব। 'অবাঞ্ছিত' এই চিন্তা যে আলতাফকেও পীড়িত করেনি এমন নয, তবে নতুন সময, নতুন সমাজ, ব্যবস্থা তো পাল্টাবেই এই ভাবনায আশরাফকে বাইবে পাঠিয়ে দিতে বলতেন স্ত্রীকে। মিশুক সে মানুষেব সঙ্গে।

একদিন খেলাব মাঠ থেকে ঘবে ফিবে মাকে বড অসুস্থ দেখেছিল আশবাফ। আলতাফ হোসেন ছুটে এসেছিলেন বাস্তাব ওপাবেব অফিস থেকে। যোগেন চৌধুরীকে ডেকে আনবার জন্যে ছুটেছিল তাঁর পেশকার। এবং বেজিস্ট্রাব সাহেবেব স্ত্রী চিকিৎসাব সমস্ত সরঞ্জাম, ওষুধ নিযে দ্রুত পৌঁছেও যোগেন চৌধুবী তাঁকে ধরে রাখতে পারেননি।

আলতাফ নিঃশব্দে বারান্দাব চেয়ারটিতে বসেছিলেন প্রায় সাতদিন। এই জন্যেই কি পুকলিয়াব লালমাটিব পথ থেকে পা তুলে নেযা? নাকি অবাঞ্ছিত জন যে সে ঠাঁই পাবে না কিছুতেই?

নীরু হরুব বাবা সনাতনের বাজাবে মনোহাবি দোকান ছিল। দোকানটি বিক্রি কবতে তাব যেমন অসুবিধা ছিল না, তেমনি তাব বসত বাড়িটি কে কিনে নিচ্ছে তাতে তার কোন ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তার যাওয়া খুব সহজ ছিল। সাধুখাঁদেব বাড়িটি খালি পড়েছিল অনেকদিন। ঘন গাছপালাব ছায়ায মূল দালানটিকে প্রায় দেখাই যেতো না, কেবল সদব দরজার ইঁটের পিলারে বসানো ছিল শ্বেতপাথরেব ফলক, 'মাতৃভবন।' যাওয়া-আসার পথে একদিন দেখা গেলো শ্বেতপাথবের ফলকে ভিন্ন নাম 'শবাফত মঞ্জিল'। কাপড দিয়ে ঢাকা রিক্সা মাঝে মাঝে ঐ দরজা খুলে ঢুকে যেতো।

আমিনুর কেবল সেবা স্কাউটই নয়, ফুটবলেব মাঠে তাব মতো রাইট-উইং পেলে

হারতো খুব কম দলই। বাবাকে অনেকবাব বলেছিল সে, "এই বাড়িতে তো আমরা ভালোই আছি, থাকুক না ওরা ওদেব বাড়িতে যতোদিন দরকাব।" মণীষাব কথা জানতেন না রইসউদ্দিন, তবুও বলেছিলেন, "আমি তো জোব করে বায়নানামায় সই কবাইনি ওঁকে।"

এ কথাব সামনে আমিনুরের আব কি বলাব ছিল।

ঘাসের ডগার শিশিরবিন্দু তাঁব পা ছুঁয়ে যাচ্ছে, তিনি বুঝতে পারেন। হেমন্তেব প্রায়ান্ধকাব প্রভাতে পায়ে গরম মোজার জন্যেই হয়তো, শীতল স্পর্শটুকু পাওয়া যাচ্ছে না। গায়ে বিঁধছে না শেষরাত্রিব বাতাস। মিনতি জোব করেই তাঁব গায়ে কোটটি চাপিয়ে দিয়েছিল। মণীষা বাব বাব করে বলেছিল, "এমন শবীবে যেয়োনা আব। কি-ই বা লাভ।" স্ত্রী শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন। বাক্স বিছানা বাঁধা হয়ে আছে। বেশি কিছু নেওয়া যাবে না শুনেও গুরুদেবের ছবি, ঠাকুরের সিংহাসনেব সঙ্গে, মীনা কবা লাডলো কোম্পানীব বাজনাব বাক্স মণীষার বড় সখের, এইসব কিছুতেই ফেলে যাওয়া যায় না। তিনি সেইসব দেখে সাবাবাত জেগে বসে থাকা স্ত্রী ও কন্যা দুটিব দিকেও তাকিয়েছিলেন, মিনতিব শূন্য সিঁথি, খালি হাতের দিকে চোখ মেলেছিলেন একবার, বুকেব সামান্য ব্যথাটি ঐ কষ্টেব জন্যই ভেবে দবজাব বাইবে পা দিয়েছিলেন। এই শেষবাব। তখন গাছ, দালানকোঠা, জেলখানাব প্রাচীব নিজেদেব অবযব ফিরিয়ে নিচ্ছে বাত্রির হাত থেকে। দেবদারুব ঝবঝব পাতার শব্দেব সঙ্গে মিশছে ঝাউযেব শন্‌শন্‌। এখন নদীব দিকে নয় লোকালযেব দিকে যাত্রা তাঁব। বিপিন সেনেব দবজা তখনও বন্ধ। সে এসে আজ আর তাঁব সঙ্গী হবে না, ভ্রমণেব শেষে বসবে না আর ছাতিমতলায়। খোকা তার দোকান খোলেনি, মুরারীও নয়। আকবব আলীব বাড়িব চাবপাশে নতুন প্রাচীব। প্রাতভ্রমণের স্বভাব তাঁব না থাকলেও প্রথম আলোতে খোলা বাবান্দায বসতে ভালো লাগে তাঁর, এবং রাস্তায় নেমে এসে কুশল বিনিময় করেন। রবি ডাক্তাবেব হোমিওস্টোরেব দবজাব সামনে ঘাস গজাচ্ছে মনে হয়। অনেকদিন না-খোলাব জন্যে।

রইসউদ্দিনকে কোন দোষ দেবেন না তিনি তাঁব স্ত্রী বা কন্যাবা যতোই বলুক না কেন। ঐ দামে বাড়িটি বিক্রি করতে তো কেউ তাঁকে বাধ্য কবেনি। আব সেজন্যই বায়নাপত্র হবার পরেও এতোদিন বেজিস্ট্রি না কবায় রইসউদ্দিন যদি অধৈর্য্য হয়ে তাগাদা দিতেই থাকেন তাতে দোষ কি। কন্যারাও সেটি বোঝেনি। ববং বায়নার টাকা ফিবিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু তুলে নেয়া পা আবাব মাটিতে ফেলা যাবে কি কবে, আর কেনইবা।

বেজিস্ট্রি হয়ে যাবার পবে রইসউদ্দিন বলেছিলেন বাঁধাছাঁদাব জন্যে যে সময় দবকাব হয় তা তিনি বোঝেন। তবুও কদিন পরেই আমিনুবকে দেখে আসতে বলেছিলেন যাত্রাব আয়োজন কতোদূব। আমিনুব মাথা নীচু কবে, তাব ভালো লাগছিলো না বলেই, মনীষাকে আব দেখতে পাবে না বলেই বুঝি বলেছিল, "থাকুক না ওবা ক্ষতি কিসেব।" বইসউদ্দিন জানতেন সে কিছু বোঝে না।

কালীবাড়িব চৌমাথায এসে দাঁড়ালেন তিনি। মাদলাব জমিদাবী সেবেস্তাব দাবোয়ানেব কাশিব শব্দ। বাবোযারি মন্ডপেব সব কটি দবজাই খোলা, ভেতবে ঢুকলে দু'একটি গরুছাগল বা আশ্রয়হীন সাবমেয় নিদ্রিত দেখতেন। কালীমন্দিরেব দরজায় একবাব কপাল ঠেকালেন, একটু বেশি সময়ই বোধহয়। বসাক বাড়িব ছাদ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, হেমেন বাযের ছবিব দোকানও। একবাব ওদিকে যাবেন ভেবে পা এগিয়ে ফিবিয়ে আনলেন। কি দরকার! অন্ধকাব তরল হচ্ছে। ঘুরে সান্যাল পাড়াব মধ্যে দিয়ে সুপাবিনটেন্ডেন্টেব বাসাব সামনে দিয়ে, মিউনিসিপ্যালিটির মাঠ পাব হয়ে, হেলথ্ অফিসাবেব বাসার সামনে পীচের রাস্তায এসে উঠলেন। দুটি রিক্সা শব্দ তুলে বড় বাস্তা থেকে মোড় নিল। ভোবের গাড়িব সওয়াব নিযে যাবে।

বুকেব ব্যথাটা আবো একবার এসে ফিবে গিয়েছিলো। এতো হাঁটাব জন্যেই নিশ্চয়ই; কপালে কিছু স্বেদবিন্দুও ফুটেছিলো। কোটটি খুলে ফেলবেন কিনা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যান

ফিকে অন্ধকারে মিশে থাকা রক্তকববীব দিকে। তাবপরে কি মনে হয়, ফিরে আবার হাঁটতে শুরু করেন, নদীর দিকে।

তখন ভোরের হাওয়া অশ্বত্থের পাতা কাঁপাচ্ছে। চাবপাশ জুড়ে ছড়ানো তাব শেকড়েব নীচে সিঁদুরে মোড়ানো শনিব মূর্তিটিও আছে নিশ্চয়। সে-সব আর দেখা যাচ্ছে না। নদীর সীমানা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। তাব তরল বুকে প্রথম আলো ফোটবাব চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ওপাবেব কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কেবল বৃক্ষরাজিই নয, ক্ষীণ বক্তিম আভায় আঁকা পাহাড়ও যেন। একটু থামলেন তিনি। সিঁড়িব মাথায় দাঁড়ালেন, ভবা বর্ষাব নদীতে এই সিঁড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল যে কিশোর তাকে বুঝি মুহূর্তে দেখলেন, বুঝি সেই যুবক নদীর ঘাটে যে বাঁশি বাজিয়েছিল তাবও পায়ের শব্দ শুনলেন, এবং সবদিনেব মতোই জবাকুসুম সঙ্কাশং বলবেন ভেবে চোখও বন্ধ কবেছিলেন, আসুক আলো আসুক চোখেব পাতায়, কিন্তু, না থাক, কেন কিসেব জন্যে ?

ফেবার পথে পা কাঁপছিলো সামান্য নিশ্চয়ই।

গাড়ি আসার তখনও দেবী ছিল। আসলে কত দেরী জানাবও উপায ছিল না। এমন দিনে কোন্ স্টেশন কতো সময নেবে কে জানে। কেবল যাত্রীব বাক্স নয়, বিছানা নয়, তার অন্তর্বাসের সেলাইও তো দেখা দবকাব। এ-জন্যে অনেক সময প্ল্যাটফর্মেই গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয।

বসবার কোনা জায়গা ছিল না। তবুও তাঁব শবীরেব কথা শুনে, চেহাবা দেখে ওবই মধ্যে বিছানায হেলান দিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসতে দিয়েছিলো কেউ কেউ। বসেই ছিলেন তিনি। দুটি রিক্সায় কত কষ্টে সব নিয়ে আসতে হযেছিল। এতো আগে বলা সত্ত্বেও, দশগুণ বেশি ভাড়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও রিক্সা সময় মতো আসেনি। আমিনুব সাইকেল নিয়ে কালীবাড়ির মোড় থেকে রিক্সা ধবে এনেছিল। চাবি নেযাব জন্যে আমিনুব আসেনি, কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল দবজা ভেজিযে বেখে গেলেও শূন্য ঘবে ঢুকবে কে ? তবুও ঐ প্রভাতে সে কেন এসেছিল সে-কথা কেউ জানবে না।

তল্লাসী বাহিনীর প্রধান তিনি। ছোট লাঠিটি হাতে তাঁব। ঘুবে ঘুবে নির্দেশ দিচ্ছেন। বালিশের ঢাকনাটি খুলে দেখাই যথেষ্ট নয। টিপে কিছু শক্ত মনে হলে সোজা ছুবির লম্বা টানে ভেতবে দেখা দরকাব কি আছে। দীর্ঘ যাত্রায় পথে খাবার জন্যেই হোক না কেন, মাটির পাত্রেব নীচে কি আছে তাও হাত ঢুকিয়ে দেখা প্রয়োজন।

সামনে দাঁড়ানো রক্ষী। বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মিনতি-বিছানা খুলে দিল তল্লাসীব জন্যে। দইয়ের হাঁড়িটির মধ্যে খোলা ছুবিব ফলা ঢুকিয়ে ভেতবে চাবপাশ দেখে নিচ্ছে সতর্ক প্রহবী। গুরুদেব তিনি যাবই হোন না কেন, বাঁধানো ছবিব পেছনে স্বচ্ছন্দে দু'প্রস্থ পুরু কাবেন্সি থাকতেই পারে ভেবে পেছনের কার্ডবোর্ড দু'আঙ্গুলে টেনে সামনে নিয়ে আসেন বাহিনীপ্রধান। ঐ চাপেই বুঝি, কাচেব বাঁধাই মুহূর্তে শব্দ কবে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেলো। মাযের ফ্যাকাশে মুখ দেখে দ্রুত মণীষা তাঁব দিকে এগোয। প্ল্যাটফর্মের শেষে লোহার গরাদেব ওপারে ছাউনী, রেলওয়ে স্টল, আমিনুর লোহাব গবাদ ঘেঁষে দাঁড়ানো, যাত্রী ছাড়া প্ল্যাটফর্মে আর কারো প্রবেশ নিষেধ, "মণীষা তোমার বাবাকে দেখো", বলে প্রায় চিৎকার কবে বেড়া টপকে চলে আসে আমিনুব, পতনোন্মুখ দেহটিকে ততোক্ষণে ধবে ফেলেছে মিনতি।

কাচভাঙ্গা ছবিটি, মাটির পাত্র, ছড়ানো বিছানা পড়ে বইলো। কিছুতে জ্ঞান ফিবলো না দেখে বাহিনীপ্রধান বিবক্ত হযেই ছাউনীব নীচে নিয়ে যেতে দেন প্রায় শীতল দেহটিকে, "ডাক্তারেব কাছে নিয়ে যান।"

"বাড়ি চলে যান মিনতিদি", আবো কযেকজন মিলে ওদের রিক্সায় তুলে দিযে সাইকেলের দিকে ছুটে যায আমিনুর, "আমি যোগেনবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি।"

স্টেশন থেকে শহরে ঢোকার আব একটি পথ আছে। পাকা রাস্তা নয়, সুড়কিব পথ। বেল কলোনীব মাঠ পেরুলেই মিশনপাড়াব সডক। সড়কের পূর্বে জজসাহেবের বাড়ি, হাই মাদ্রাসা, মালতিনগর মসজিদ, তিনআনিব পুকুর। বাঁযে মোড নিলে পড়বে 'সুহৃদ পাঠাগাব।' দ্রুত ঘরে ফেরার জন্যে এ-পথেও চলা যায। ছুটির দিনে ঘরে ফেরায় জন্যেই।

স্পষ্ট দিনেব আলোয় রাস্তায় তখন মানুষ নেমেছে। দেখা যাচ্ছে সোনা মিয়াকে। রিক্সাব শব্দ শুনে ফিবে তাকালো শম্ভু। দিনেব প্রথম হাসিটি তাব মুখে। আদালতেব সামনে তার পানের দোকানের দিকে যাচ্ছে সে। বেলাযেত সাহেব তাঁব জুতো থেকে ধুলো ঝেড়ে নিচ্ছেন বাড়িব দবজাব সামনে, রিক্সা দেখে হাত নাড়ালেন। এত বেলায় দোকান খুললেও নরেশ পোদ্দাবেব হাতে ধূপদানি, ধোঁয়া উড়ে আসছে রাস্তায়।

আম-কাঁঠালের ছায়া-আলোব নকসা মাড়িয়ে বিক্সা চলে যাচ্ছে কালীবাড়ির দিকে। কেশব সেনেব বৈঠকখানার দরজা খোলা, এসবাজেব মাষ্টাব সামনে বসা। প্রভাতী রাগটিই আজ বাজাবে মণিকা।

প্রাইমাবী স্কুল, জামরুল তলা পেবিয়ে রিক্সা তখন পাড়ায ঢুকে যাচ্ছে। দোকানেব দরজা খুলে বসে আছে মুবাবি, নতুন ছেলেটি ওজন ঠিকমতো কবে কিনা একবার দেখে নিচ্ছে। সাদত আলি নিজহাতে বাজাব কবাব জন্যে বাস্তায নেমেছেন। বড় শখ তাঁব। অনন্ত মজুমদারেব মুখে হাসিটি ধবা। মক্কেলে ভরা বাবান্দা। ম্লান অখিল আদালতেব পথে পা বাড়াচ্ছে, পরিচিতেব জন্যে তাব মুখেও হাসি। ছাতিম তলায কাউকে দেখা যায না। কেবল সাদা আলোয ছড়ানো লাল করবীব জাজিম।

বাড়িব সামনে এসে থামছে বিক্সা এবাবে। ঘবেব দবজা খোলা। কে এসে বুঝি দরজায দাঁড়াবে, সহাস্যে আনন্দে-অশ্রুতে বলবে এক্ষুণি, "এসেছো।"

সেলিনা হোসেন

আমিনা ও মদিনার গল্প

জোহরেব নামাজেব ওক্ত হয়েছে। মুয়াজ্জিন আল-আমিনেব দুই মেয়ে। আমিনা ও মদিনা বদনা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পিতাকে ওজুব পানি ঢেলে দেবে।

বৈশাখ মাস। কড়া বোদে চাবদিক খাঁ খাঁ কবছে। উঠোনে দুবাব ধুলোব ঘূর্ণন উঠেছে। মেয়েবা আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ ঢাকে। উঠোনেব পূর্ব কোণেব বুড়ো কাঁঠাল গাছ থেকে ঝরে যাওয়া শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ে ওদেব গায়ে। ওরা ভ্রুক্ষেপ কবে না। বাবাব ওজু না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু নিয়ে চঞ্চল হতে ওবা শিখেনি। একটু পবে কাঠেব খড়ম পায়ে ঠক্‌ঠক শব্দ কবতে কবতে মুযাজ্জিন এসে কাঠেব জলচোকিব ওপব ওজু কবতে বসে। টুপিটা খুলে মদিনাব হাতে দেয়। মদিনা বলে, আব্বা টুপিটা মযলা হযেছে ধুযে দেই ? মুযাজ্জিন স্নেহেব হাসি হাসে হ্যাঁ মা, দে। আজ না হয় আব একটা টুপি নিযে মসজিদে যাব।

— আব্বা জান আমি আপনার জন্য ক্রুশ দিযে টুপি বানাচ্ছি। বিকেলেব মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আপনি মাগরেবের নামাজ পডতে পারবেন সে টুপি দিযে।

মুযাজ্জিন খুশি হযে মাথা নেড়ে মেযেদের দিকে তাকায। ওবা মাথায কাপড় দিয়েছে, গাযে পুরো হাতে ব্লাউজ, দৃষ্টি নিচের দিকে। মেয়ে দুটো ভাবি লক্ষ্মী। নিযমিত নামাজ বোজা কবে। কোবান শবিফ খতম কবে। নম্র, ভদ্র। মুখে বা নেই। চোখ তুলে কথা বলে না। আল আমিন মনে মনে আল্লাহর কাছে সোকব জানিযে ওজু কবতে বসে। গাঁযেব লোক জানে এ গাঁযেব আমিনা ও মদিনাব মতো রূপবতী কেউ নয়। মেযেবা এতোই সংযত যে এখন পর্যন্ত কোনো দিন কোনো যুবকের দিকে চোখ তুলে তাকিযেছে বলে মুযাজ্জিন শোনেনি। ওদেব মা ওদের দিকে কড়া নজব রাখে। এখন মুযাজ্জিন ভালো পাত্রের অপেক্ষায আছে। পেলেই বিয়ে দেবে।

যুদ্ধ শুরু হওয়াব পব থেকে মুয়াজ্জিনেব স্ত্রী জোহবা বিবি মেয়েদের বিযেব জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। রাতদিন স্বামীকে তাগাদা দেয, একটা ব্যবস্থা করুন। বযস্ক মেযেদের এ সময ঘবে বাখা ঠিক নয। আপনি কালক্ষেপণ কববেন না।

স্ত্রীব আশঙ্কায মুযাজ্জিনও কেঁপে ওঠে, কিন্তু একই সঙ্গে গভীব নিঃশ্বাস ফেলে বলে, পছন্দমতো পাত্র পাচ্ছি না। জোয়ান ছেলেগুলো যুদ্ধ নিযে মেতে উঠেছে। একদল মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ভাবতের দালালি কবতে চলে গেছে। আব একদল বাজাকাব হযে পাকিস্তান বক্ষা কবছে। কেউই বিয়ের কথা ভাবছে না।

স্বামীব দীর্ঘশ্বাসে অভিভূত হয়ে জোহবা বিবি কপাল চাপড়ে আর্তনাদ কবে, হায় আল্লা আমার মেয়ে দুটোর কি হবে ?

ষোড়শী আমিনা ও মদিনা অন্য ঘবে বসে মাযেব বিলাপ শুনতে পায়। দুজনে শিউবে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়তাল কুরছি পড়ে নিজেদের বুকে ফুঁ দেয। পরক্ষণে পিতাব দবাজ কন্ঠ ভেসে আসে দুজনেব কানে, আল্লাহব ওপর ভবসা বাখো বিবি।

আমি জীবনে কোনোদিন ইমান নষ্ট করিনি, গুনাহর কাজ করিনি। মেয়েরাও কখনো বেশরম কাজ করেনি। ওদের নসীব মন্দ হবে না বিবি।

পিতার এমন নিশ্চিত নির্ভর কণ্ঠ শুনে দুবোনের স্বস্তি ফিরে আসে। ওরা অকারণে উদ্বিগ্ন চিন্তিত হতে চায় না। ওরা দেখছে এসব সময়ে ওদের চেহারার লাবণ্যে কালো ছায়া পড়ে। আয়না দেখতে ইচ্ছা হয় না।

আব্বাজান ?

দুজনে একই সঙ্গে পিতাকে ডাকে। ওরা বুঝতে পারে ওদের পিতা মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়েছে। খাঁটি মুসলমান ওজু করার সময় আনমনা হবে কেন ? মেয়েদের দরদমাখা কণ্ঠে মুয়াজ্জিন ওজু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে ডান হাতের কবজি তারপর বাম হাতের কবজি। তিনবার কুলকুচার পর নাসারন্ধ্র ধৌত করার সময় বাড়ির উঠোনে তিনজন মিলিটারি এসে দাঁড়ায়। ওরা প্রায় নিঃশব্দেই এসেছে বুটের তেমন শব্দ হয়নি কিংবা গুলি ছাড়তে ছাড়তেও এগিয়ে আসেনি ওদের দেখে আল আমিন মুয়াজ্জিন ওজু করা ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, আমিনার হাতের বদনা থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মুয়াজ্জিন ওজু শেষ না করেই জলচৌকির ওপর দাঁড়িয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে, আইয়ে হুজুর, আইয়ে।

পাকিস্তানি সেনা তিনজন মুয়াজ্জিনের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। আমিনা ও মদিনা জড়সড়ভাবে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে মুখ নিচু করে আছে। ওরা বুঝি সেই স্থান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথাও ভুলে গেছে। তিনজন পাকিস্তানি সেনার মধ্যে একজন দুপা এগিয়ে মদিনার থুতনি ধরে মুখ উঁচু করে বলে, বহুৎ খুব সুরত লেড়কি।

মুয়াজ্জিন আল আমিনের চোখের সামনে ভরদুপুর মুছে গিয়ে জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি জেগে ওঠে। এমন অলৌকিক দৃশ্যের মধ্যে ওর মগজে ঘূর্ণি বইতে থাকে এবং শুনতে পায় জোহরা বিবির তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। সে আর্তনাদ বেগে প্রবাহিত হতে থাকলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত। যেন চারদিকে কারবালার হাহাকার উত্থিত এবং পতিত হতে থাকে। মুয়াজ্জিন আল আমিন হুড়মুড়িয়ে জলচৌকি থেকে নেমে একজনের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে, হুজুর আপ-ভি মুসলমান, হাম-ভি মুসলমান। হাম-মসজিদ কা - মুয়াজ্জিন হ্যায়। আযান দিতা হুঁ !

— বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা ! হামলোক সমাজ গিয়া তুম সাচ্চা মুসলমান হ্যায়। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা।

— হ্যাঁ, হুজুর, হামলোক সাচ্চা মুসলমান। মেরা দোন লাড়কি নামাজ পড়তা, রোজা রাখতা, কোরআন তেলাওয়াৎ করতা জানতি হায়।

—হামলোক সমাজ গিয়া তোমহারা দোনো লাড়কি বহুৎ আচ্ছি মাল হ্যায়। গান্দা নেহি।

মুয়াজ্জিনের মাথার ভিতর ঘূর্ণি প্রবল হয়ে ওঠে। তিনজন পাকিস্তানি আর্মির উল্লাসের হা-হা হাসি বয়ে যায় বৈশাখ মাসের ঘূর্ণির মতো।

সে হাসি শুনে মুয়াজ্জিন ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ায়। দুবোনের সামনে দাঁড়াবার আগেই একজন ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। জলচৌকির কোনায় মাথা ঠুকে গিয়ে ফুলে ওঠে কপাল এবং চোখের কোনা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। আলআমিন মুয়াজ্জিন এতোকিছু ভ্রুক্ষেপ না করে আবার ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ায় ? ততোক্ষণে পাকসেনা তিনজন আমিনা ও মদিনাকে ঘিরে ধরেছে। ওরা দুবোন কারো দিকেই তাকায়নি, দুজনের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ, একবার পিতাকে টেনেতোলার জন্য নড়ে উঠেছিল। কিন্তু ততোক্ষণে তিনজন মানুষ ওদের আড়াল করে ফেলেছে। পুরুষ মানুষের শরীরের অভিজ্ঞতা ওদের নেই। কিন্তু এতো কাছাকাছি তিনজন মানুষের উপস্থিতিতে ওরা অনুভব করে লোমশ হস্তের স্পর্শের একরকম উদ্ভুট গন্ধ আছে, সে গন্ধ ওদের শারীরিকভাবে শিথিল করে দেয়। প্রবল কম্পনে ওদের হাত থেকে বদনা এবং টুপি পড়ে যায়। পিতার টুপিটা মদিনার পায়ের কাছে পড়ে গেলে এক ধরণের

অপরাধী চেতনায় ওর দৃষ্টি ঘোলাটে হতে থাকে। ও ক্ষিপ্র হাতে টুপিটা তোলার সময় পায় না। একজন ওর হাত চেপে ধরে টান দেয়। টুপিটা পায়ে মাড়িয়ে ও পাকসেনাব বুকের কাছাকাছি চলে আসে। আর একজন পায়ের কাছে গড়াতে থাকা বদনাটা লাথথি দিয়ে দূরে সরিয়ে আমিনার কাঁধে হাত রাখে। এদেব গদগদ কন্ঠ থেকে থুথু-লালা ফিনাসহ বাববার উচ্চারিত হতে থাকে। বহুত খুব সুরত, বহুত খুব সুবত।

অল্প সময়ের মাঝে ঘটে যাওয়া এতকিছুব মাঝে বিলাপ কবতে কবতে ছুটে আসে জোহবা বিবি।

—হুজুর আপনাবা আমাদের বাপ-মা, হুজুব, হুজুব, হুজুব, হু…

—হট যাও।

বুটের লাথিতে জোহরা বিবির মাথা ফেটে রক্ত ছোটে। মুয়াজ্জিন আলআমিন কোনো একটা কিছু বলা বা কবার উপক্রম করতেই ওবা তাব পিঠে রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মারে। উঠোনে চিৎ হয়ে পড়ে যায় মুয়াজ্জিন। আর উঠতে পারে না।

আমিনা ও মদিনাকে নিয়ে চলে যায় আর্মি। ওবা চিৎকাব কবতে পাবেনা, কারণ ওবা চিৎকাব কবতে শিখেনি। ওরা জোরে কাঁদতে পারে না, পরপুরুষে কন্ঠ শুনবে বলে ওরা কখনো চিৎকাব কবে কাঁদে নি। ওবা জানে বিপদে আয়তাল কুবছি পড়তে হয়, তিনবাব দরদ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে হয়। ওরা সেটাও কবতে পারে না, ভয়ে ওদেব বুক শুকিয়ে গেছে, জিহ্বা আড়ষ্ট। ভবদুপুর, চারদিকে খোলা মাঠ, সবুজ ধানের মাথা দুলছে, মেঠো পথে হেঁটে যেতে-যেতে ওবা ভাবে, কতোদূব যেতে হবে? এ পথের কি শেষ আছে? পাশাপাশি হাঁটছে বলে দুজনে শক্ত কবে নিজেদের হাত চেপে ধবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজনেব ভাবনাগুলো সমান্তবাল হয়ে যায়। এখন ওদের মাথায় ঘোমটা নেই। পাকসেনাবা বারবাব মুখ দেখবে বলে ওদের ঘোমটা নিজেবাই ফেলে দিয়েছে। ওদেব চুল বাতাসে উড়ছে। ওদেব বিস্ফোবিত দৃষ্টির সামনে গ্রাম, নিজেদেব এ গ্রাম ওবা কখনো এভাবে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। এভাবে দেখতে ওদেব খুব খারাপ লাগছে, দুবোনেরই মনে হয় গ্রামটা উদোম, পুবো উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। তিনজন সেনা কিছুক্ষণ পরপব ওদেব মুখেব ওপব মুখ আনে আব বলে, বহুত খুব সুরত লাড়কি। মাস আল্লাহ। কথা বলার সময় ওদেব মুখ থেকে থুথু ছিটকে আসে। দুবোনের বিস্ফোরিত দৃষ্টি বিস্তৃত হতে থাকে। ওরা চোখেব পাতা বন্ধ করতে পাবে না। দুজনেই ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হতে হতে ভাবে, এ চোখ দিয়ে ন্যাংটো গ্রাম শুধু নয়, দোজখও দেখতে হবে। ওদের চোখেব পাতা আব কোনোদিন বন্ধ হবে না। খাঁ খাঁ ভবদুপুবের মেঠো পথে লোক চলাচল নেই। ওদের চোখেব সামনে থেকে বোদ মুছে গিয়ে ভেসে ওঠে এক অদ্ভুত জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় তিনজন সৈনিকেব মুখ পিতাব কাছ থেকে শোনা ইবলিশেব মতো প্রতিভাত হতে থাকে। যেহেতু ওরা চোখের পাতা আব বন্ধ কবতে পারে না, সেহেতু ইবলিশেব মুখ ওদের বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তবিত হতে থাকে। ওবা দেখতে পায অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়া সৈনিক তিনজন দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন আলোচনা কবছে। ওবা বুঝে যায ভাষা কোনো ব্যাপার নয়, সৈনিকবা কি করবে তা ওদের কাছে স্পষ্ট। অদ্ভুত জ্যোৎস্নায় ন্যাংটো গাঁয়েব বালিমাটিতে নিজেদেব ন্যাংটো শুয়ে থাকতে দেখতে পেয়ে ওরা দুবোন হাউমাউ কবে কেঁদে ওঠে। নিস্তব্ধ চরাচবে এমন আকস্মিক শব্দে চমকে ওঠে তিনজন সৈনিক।

বিকৃত কন্ঠে বলে, বোতা কিঁউ?

পরহেজগার মুয়াজ্জিন পিতা-মাতার আদরের সন্তান আমিনা ও মদিনা কান্নাব দমকে ফুলে উঠলে তিনজন সৈনিক টান দিয়ে খুলে ফেলে শাড়ি-খুলে যায় পেটিকোট, ব্লাউজ। ওদের অনাবৃত শরীব তছনছ হতে থাকে—ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে থাকে, ভা[illegible]লেশহীন দুবোন চিৎ হয়ে পড়ে থাকে—কেউ কাবো দিকে তাকায় না। ওদেব পিতা-মাতা কতো যত্নে বক্ষা কবেছিল ওদের যৌবন—কতো সতর্ক পাহাবা ছিল, কতো আড়াল-আবডালের অন্তবালে বেড়ে উঠেলো ওরা — তা কি এভাবে শুরু হওয়ার জন্য?

মুযাজ্জিন আলআমিন কতোক্ষণ উঠোনে পড়েছিল মনে করতে পাবে না। দুবার মাথা তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ধরে বাখতে পাবেনি- সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা আবাব লুটিয়ে পড়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে সংজ্ঞাহীন জোহবা বিবিকে পেয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে আবার চোখ খুললে আলআমিনের চোখের সামনে ভবদুপুব মুছে গিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি জেগে ওঠে এবং একই সঙ্গে রূপবতী যমজ কন্যা দুটিব জন্মের সময়টা মনে কবতে পাবে। ও মেয়েদেব জন্মেব তারিখ, বার, সময় এবং বৎসর যত্ন কবে একটা কাগজে লিখে বাঁধিয়ে বেখেছে। মেয়েদেব বয়স বাঁধিয়ে বাখাব ব্যাপারটি জোহবা বিবির পছন্দ হয়নি। কারণ যতো বয়স হবে ততোই তো বয়স কমাতে হবে। বাঁধিয়ে বেখে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লাভ কি ? মুয়াজ্জিন আবেগে গদগদ হয়ে বলে, কেন বাঁধিয়ে বেখেছি সে তুমি বুঝবে না। মেয়ে দুটি যখন জন্মালো তখন অলৌকিক আলো খেলা করছিল আমাব ঘরেব চালে। আহা কি সুন্দর, কি রূপবতী আলো।

মুয়াজ্জিনেব চোখ বুঁজে যায়, কথা বলতে বলতে গলাব স্বর খাদে নেমে আসে। স্বামীব এই অবস্থা দেখলে জোহ্বা বিবিব ভয় করে। লোকটা পাগল নাতো ? না তা হতে পারে না, আলআমিন ঈমানদার মুসলমান। নামাজ ক্বাজা করে না, বোজা রাখতে ভুল করে না। তাহাজ্জতের নামাজ পড়ে। এতো কিছুর পর তো একটি লোক পাগল হতে পাবে না। কিন্তু তারপরও জোহরা বিবিকে মুয়াজ্জিন স্বামীর একটি গল্প শুনতে হয় – আমিনা ও মদিনাব জন্মেব সময়ের গল্প। লোকটি তখন কেমন যে কবে। জোহরা বিবিব বুক ধড়ফড় কবে। মনে হয় পরহেজগাব স্বামী মুয়াজ্জিনেব কণ্ঠ সেটা নয়। তবু শুনতে হয় সে কণ্ঠ ; ঘরেব ভিতবে সেদিন তুমি প্রসব বেদনায় কাতবাচ্ছিলে, আমি উঠোনে বসে সে গোঙানি শুনে ভাবছিলাম বুঝি চৌচির হয়ে যায় মাটি। ঘরের দবজা আগলে বসেছিল দাই বুড়ি, হাত-পা ছড়িয়ে পিঠটা হেলান দিয়ে বসে থাকা, যেন কোথাও কোনো শব্দ নাই কিংবা প্রবল শব্দ থাকলেও ওব কিছু যায় আসে না। ওর অপেক্ষা শুধু শিশুব ক্রন্দনেব জন্য। আমার অন্ধ মা দাওযায বসে বলেছিল, তোর ঘরের চালে চাঁদ উঠেছে নাকি আলআমিন ? আমি দৌড়ে মায়েব কাছে আসি। মা দেখতে পায় না কিন্তু মায়ের চোখে আলো ভব করেছে - এই আনন্দে আমাব বাঁশি বাজাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু শরমে পারিনি। মুযাজ্জিন হয়ে বাঁশি বাজালে লোকে যদি, এইটুকু বলে লাজুক হাসে মুয়াজ্জিন, ওর নূরানী চেহারায় নূব খেলে যায়। জোহ্রা বিবি সে সময় মনে মনে বলে, আহা কি অপরূপ দৃশ্য ! কিন্তু সামনাসামনি বলে, বাজালেই পারতেন, না বাজিয়ে ঠিক কবেননি।

– বাজাইনি ভযে। বাঁশি বাজালে গাঁযেব লোকে যদি মসজিদে ঢুকতে না দেয, সেজন্য আমি নিজেব ইচ্ছার কাছে নিজেই জবাই হযে গেছি বিবি।

– আপনি তো ছোটবেলায় বাঁশি শিখতে চেয়েছিলেন।

– চুপ চুপ এই কথা কাউকে বলবে না। সেদিন ঘবেব চালে আলো দেখে আমি উঠোনে ছুটাছুটি করে দোয়া-দরুদ পড়েছিলাম। শেষরাতের দিকে তোমাব কাতবানি বন্ধ হয়ে গেলো, শুনতে পেলাম শিশুর কান্না।

আমাব মা হাসতে হাসতে বললো, মনে হয় তোর দুটো সন্তান হযেছে আলআমিন।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। আল্লাব কাছে শোকব গোজারি করে ভাবলাম, মা এসব বলে কি !

– ও মা তুমি পাগল হলে ?

– পাগল হইনি রে বাবা দাই বুড়ি খবব নিযে এলো বলে।

আমি তো নিজেকে ধবে রাখতে পারি না। ঘরের দরজার কাছে ছুটে গিয়ে দাই বুড়িকে ডাকি। বুড়ি চেঁচিয়ে বলে, চাঁদেব মতন দুইডা মাইয়া অইছে তুমাব।

আমি মায়ের পা ধরে সালাম কবি, মা তোমার কথাই ঠিক। ওদের নাম রাখলাম আমিনা আর মদিনা। মা হেসে বললো, বড়ো পবিত্র নাম।.

পরদিন দুই নাতনীব গা-ছুঁযে তবতাজা স্বাস্থ্য নিযে মরে গেলো আমাব মা।

এই পর্যায়ে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ ধরে আসে। কিন্তু সে সারাজীবনে সেই অলৌকিক আলোর কথা ভুলতে পারেনি। তবে মানুষটাকে নিয়ে ঘর করে জোহরা বিবি সুখে আছে। দুই রূপবতী কন্যার জন্ম দিয়ে জোহরা বিবি আর সন্তান ধারণ করেনি। মনে মনে একটি ছেলের আকাঙ্খা থাকলেও মুয়াজ্জিনের আক্ষেপ নেই। আল্লাহ তাকে যা দিয়েছে তা নিয়েই সে সুখী।

ছোটবেলা থেকেই আপন মনে সুখী হতে শিখেছে মুয়াজ্জিন। শৈশবে ও গাঁয়েরই বয়াতীর গান শুনে শুনে গলা ছেড়ে গান গাইতে শিখেছিল ও। বাবা একদিন কষে ধমক লাগালেন। বললেন, হারামজাদা মুসলমানের ছেলে গান গায়? আর যেন কখনো গান গাইতে না দেখি। আলআমিন মুহূর্ত দেরি না করে বাপের নির্দেশ পালন করে। ছেলে বিপথে যাবে ভেবে বাপ ওকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়। মাদ্রাসা বন্ধ থাকলে ও লুকিয়ে লুকিয়ে পাশের গাঁয়ের আশীষ মণ্ডলের কাছে বাঁশি শিখতো। আশীষ বলতো, বড়ো মিষ্টি তোর সুর! তোকে দিয়ে হবে রে আলআমিন। তুই বড়ো শিল্পী হবি।

কিছুদিন পর বাপে টের পেয়ে এমন মার দিলো যে, দুদিন জ্ঞান ফিরলো না। মায়ের কান্নাকাটিতে বাড়িতে ডাক্তার এলো। সুস্থ হয়ে মাদ্রাসায় ফিরে গেলো ও। বাপ বললেন, হুজুর ছেলেটার কুপথের দিকে নজর। আপনি ওকে মানুষ করুন। ওর পেছনে হুজুরের কষ্ট করতে হয়নি। ও নিজে নিজেই সুখী হতে জানে। এমন মন দিয়ে পড়ালেখা করে যে বাঁশির কথা ভুলেও মনে হয় না। যখন কোরআন তেলাওয়াৎ করে তখন মুগ্ধ হয়ে শোনে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, এই মাদ্রাসা থেকে পঁচিশ বছরে যতো ছেলে বেরিয়েছে আলআমিনের মতো কেউ না।

আলআমিন মনে মনে খুশি। ভাবে, আমপারার সুরের মধ্যেই বাঁশি আছে। সুর যেখান থেকেই উঠুক না কেন, মানুষের মনটাই সত্যি। মন ঠিক থাকলে সবকিছু থেকেই সুর ওঠে। ওর কোনো আক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই। হুজুর যা তালিম দেয় তা মনপ্রাণ ঢেলে শেখে। হুজুর বলেন, তোকে আমরা মুয়াজ্জিন বানাবো। তোর আযান শুনে মানুষ মসজিদে ছুটে আসবে নামাজ পড়তে। আলআমিন মাথা নেড়ে সায় দেয়। সেই থেকে কতো বছর পেরিয়ে গেছে তার হিসাব ওর আর মনে নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মুয়াজ্জিনের দৃষ্টি আকাশের দিকে স্থির হয়ে থাকে। ও আতিপাতি খুঁজতে থাকে মেয়েদের জন্মের সময় ফুটে থাকা সেই অলৌকিক আলো। এক সময়ে মুয়াজ্জিনের দৃষ্টি নেতিয়ে পড়ে।

কিন্তু নেতিয়ে পড়ে না আমিনা ও মদিনার দৃষ্টি। ওরা দুহাঁটু বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। প্রচণ্ড ব্যথায় দুমড়ে যাচ্ছে শরীর। সেটাও দেখতে পায় ওরা। সারা শরীরে আঁচড়ের ফলে আঁকাবাঁকা রেখা ফুটে উঠেছে। সে রেখার ওপরে বিন্দু বিন্দু রক্ত। শরীরের জায়গায় জায়গায় শুকনো ঘাস এবং ধুলো লেপে নকশীকাঁথায় তোলা ফুলের মতো কিছু একটা হয়েছে। কেমন অদ্ভুত হয়ে গেছে নিজেদের শরীর! সৈনিক তিনজন ওদের হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শাড়ি, ব্লাউজ দিয়ে পরতে বলে। একজন আঙ্গুল উঁচিয়ে খেঁকিয়ে বলে, কলেমা জানতা?

দুবোন মাথা নাড়ে।

পড়ো।

দুবোন গড়গড়িয়ে বলে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদের রাসুলুল্লাহ।

সাবাস!

ওরা উল্লাসে আকাশের দিকে গুলি ছোঁড়ে। আমিনা ও মদিনা পলকহীন দৃষ্টিতে তিনজন সৈনিকের মুখে ধর্ষণের আনন্দ দেখতে পায়। ওরা জোরে জোরে কলেমা পড়তে থাকে — — ওরা ভুলে যায় ওদের রক্তক্ষরণের কথা এবং ভুলে যায় ওজুবিহীন অবস্থার কথা। ওদের পরহেজগার পিতা কতো যত্নে ওদের কতো কিছু যে শিখিয়েছিল। ওরা মনেপ্রাণে

সেসব কিছু আঁকড়ে ধরে । ওরা কোনোকিছু ভুলতে চায় না । এক সময় ওরা দেখতে পায় ওরা হাঁটতে পারছে না — ওদের হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে । তখন তিনজন সৈনিক ওদের পিঠে করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে । বহুত খুব সুরত লাড়কি, বলতে বলতে হর্ষধ্বনিতে মেতে ওঠে অন্য সৈনিকরা ।

মুয়াজ্জিন আলআমিন কিভাবে ইমামের কাছে ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে ধরেছে বলতে পারবে না । তার বুকফাটা আর্তনাদ তীব্র হয়ে ওঠে দুটো শব্দে, হুজুর আমার —।

— খামোস । অধৈর্য হবেন না । আমি সব শুনেছি । এসব ঈমানের পরীক্ষা।

— হুজুর ।

— আপনি ধর্মের দোহাই দেবেন না । এই দেশে এখন ইসলাম বিপন্ন । এটা রক্ষা করা সবার দায়িত্ব । আপনি তো শুধু মেয়ে দিয়েছেন । এরপর জীবনও দিতে হবে। যান, বাড়ি যান ।

মুয়াজ্জিন বাড়ি ফিরতে পারে না । ইমাম ওকে আঙুল তুলে শাসিয়ে দিয়েছে। সাদা চুল-দাড়িতে ভরা এতোদিনকার মানুষটি, যাকে ও নূরানী চেহারার মানুষ বলে চিনতো, ওর কাছে খাটাশে রূপান্তরিত হলো — মুয়াজ্জিন এই প্রথম রাজনীতিতে ধর্মের এমন বিকৃত ব্যবহার উপলব্ধি করে অসহায়ভাবে কাঁদতে থাকে। ওকে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কাঁদতে দেখে কোনো কোনো নিরীহ মানুষ এগিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরে, কাঁইদেন না হুজুর, কাঁইদেন না । দেইখবেন দুশমনদের উপর আল্লাহর গজব পড়বো। আল্লাহ এই অন্যায়ের বিচার করবো । আর একজন বলে, চলেন চেয়ারম্যানের কাছে যাই, কমান্ডারের লগে চেয়ারম্যানের খাতির আছে। কমান্ডার ইচ্ছা করলে আপনার মাইয়াগোরে ফিরত পাড়াইতে পারে ।

সবাই মিলে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে যায় । তিনি মৃদু হেসে শান্ত স্বরে বলেন, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান । এমন দুর্যোগ আর দেখি নাই । আমাদের সবার উচিত ঝাঁপিয়ে পড়ে এই দুর্যোগের মোকাবিলা করা । বাবা ঘরে যাও । আল্লাহর কাছে শোকর করো । তোমার মেয়েরা পাকিস্তান রক্ষা করেছে । মুয়াজ্জিনের কন্ঠ দিয়ে শব্দ বের হতে কষ্ট হয় । তবু কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার মেয়েদের ইজ্জত —

— ইজ্জত দিয়ে কি হবে বাবা ? আগে ধর্ম, আগে দেশ ।

— এটা কেমন ধর্ম ?

চেয়ারম্যান কথা বাড়াতে দেয় না । ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় মুয়াজ্জিনকে । কড়া গলায় বলে, এতো চিন্তা কিসের । মেয়ে গেলে আরো মেয়ে হবে ।

— হুজুর দুই জমজ মেয়ের পর আমার বিবির আর সন্তান হয়নি । চেয়ারম্যানের কন্ঠ তরল হয়ে যায় । হাসতে হাসতে বলে, আবার নিকাহ করবে । দুসরা বিবি হবে। খুব সুরত লাড়কি হবে।

মুয়াজ্জিন আলআমিন কোনো কথা না বলে ক্ষিপ্রগতিতে আর একটি খাটাশের সামনে থেকে চলে আসে । ও বুঝে যায় ওর আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই । ওর সামনে আকাশ-পাতাল একাকার হয়ে যায় । বুঝতে পারে ওর মাথার ভিতর, অলৌকিক আলোর ঘূর্ণি উঠেছে। মুয়াজ্জিন পাগলের মতো মাঠের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দুহাত উপরে তুলে নৃত্য করতে থাকে। ওর সঙ্গী, গ্রামের সরল লোকেরা এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলে । ওরা অনেক কষ্টে মুয়াজ্জিনকে বাড়িতে নিয়ে আসে । পরদিন সকালবেলা দেখা যায়, মুয়াজ্জিন আলআমিন লোক চিনতে পারছে না । জোহরা বিবি হায় হায় করে বারান্দার ওপরে আছড়ে পড়ে ।

মিলিটারির জীপে চড়ে আমিনা ও মদিনা ক্যাম্প থেকে কোনো এক বাংকারে যেতে থাকে । দুবোন দুচোখ মেলে দেশটাকে দেখে । এভাবে তো জীপে করে বড়ো সড়ক দিয়ে

ওরা কোথাও যায়নি, যেখানে দৃশ্যগুলো গাড়ির সঙ্গে ছুটতে থাকে। গাড়ির ছোটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসে বিপরীতমুখী বাতা – কেমন এক আশ্চর্য স্পর্শ, ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে বুক-ভার করে দেয়, উজাড় করে দেয়, স্তব্ধ করে দেয়। দুজনে দুজনের হাত চেপে ধরে। কথা বলে না, যেন উভয়ের শোনিতে প্রবাহিত হয় এক বিবল ভাবনা। যৌবনের সন্ধিক্ষণেব সব তছনছ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলো ফিরে পাওয়াব হাহাকার। কাব জন্য এমন করে সর্বস্ব দিতে হলো ওদের ? কিন্তু বেশিক্ষণ ওরা নিজেব ভিতব থাকতে পারে না — বেবিয়ে আসতে হয়। কেননা কিছুক্ষণ পবপব দৃশ্যগুলো অন্যবকম হয়। পথেব বাঁক বদলে যায় — বিশাল গাছগুলো অদ্ভুত আকাবে দাঁড়িয়ে থাকে, কোথাও বাঁশেব ঝাঁড়েব একটা ভঙ্গি ফুটে থাকে, কোথাও ক্ষেতেব আল দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষেব শবীর বিচ্ছুবিত হতে থাকে, আলুক্ষেতে উপুড় হয়ে বসে থাকা মানুষের ঘাড় নুয়ে গেলে সেটা মসজিদের চূড়ার মতো গোলাকার হয়ে যায়। পুরো আকাশটা কেমন নুয়ে থাকে, ওটা আর ঘন নীল নয়–ধূসব কালচে এবং পিতাজানেব সুললিত কণ্ঠের মতো আচ্ছন্ন করে দেওয়া বঙ গাড়িব গতির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে উধাও হয়ে যায়। কি সুন্দর, কি সুন্দব ! দুবোনেব অন্তব হাহাকার কবে ওঠে। পিতাজান বলেছেন, এই দেশটাকে শেখমুজিব ভারতের কাছে বিক্রি করতে চায। এজন্যই পাকিস্তান আর্মি মরণপণ লড়াই কবছে। কিন্তু পিতাজান এটাওতো বলেছিলেন যে, ওরা সাচ্চা মুসলমান। আমবাও মুসলমান। ওরা কোন গুনাহব কাজ কববে না। কিন্তু এখন ? দু বোন আচলে চোখ ঢাকে। কেমন মুসলমান ধর্ষণের পব কলেমা পড়তে বলে ? ওদেব চোখের পানি ফুবোয না। কাঁদতে কাঁদতে চোখের পাতা ফুলে যায়। একদিন আমিনাব গালে ঠোনা মেবে বলে, বোঁতা কিউ ? মাত বঁও।

দুবোন চুপ-চাপ থাকে। ওবা কিছু বোঝে না। ওবা ভেবে পায না যে, কেন বুঝতে পাবে না। মুসলমানেব ভাষা তো ওদেব বোঝা উচিত। দুজনেরই মনে হয ছোটবেলা থেকে কিছু না বুঝে মুখস্থ কবা আমপাবাব ভাষায় বুঝি ওবা কথা বলছে। পিতাজান যদি শুধু মুখস্থ না কবিয়ে ভাষাটার মানে বুঝিয়ে দিতেন ? তাহলে দুবোন কি তীক্ষ্ণকণ্ঠে ওদের সঙ্গে ঝগড়া কবতো ? পিতাজানেব কাছ থেকে শোনা মুসলমানেব বর্ণনার সঙ্গে এদেবকে কিছুতেই মেলাতে পাবে না ওবা। বাববাব ভেসে আসে সেই সুললিত কণ্ঠ, মনে রাখবে তোমরা মুসলমান। পবিত্র নাম বেখেছি তোমাদেব। আমি চাই তোমবা তাপসী বাবেযা হবে। দুবোনেব অন্তবাত্মা হাহাকাব কবে ওঠে, আব্বাজান আমাদের বলেছেন, তাপসী রাবেয়া হতে, কেমন কবে তাপসী রাবেযা হবো আমবা ? ওবা নাপাক শবীবে প্রাণ খুলে দবদ পড়তে পাবে না। বাংকাবেব অন্ধকাবে দু বোন মানসিক শক্তির জন্য কোনোকিছু স্মবণ কবতে চাইলে অপৰূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো ওদের সামনে ভেসে ওঠে। ঘুমেব মধ্যে কঁকিয়ে ওঠে মদিনা, আমবা এমন মেয়ে হতে চাইনি। আমবা পবিত্র কোবানেব আযাত প্রাণভবে মুখস্থ বলে যেতে চাই।

আমিনা ওব গলা জড়িয়ে ধবে বলে, আমরা পাবি না। আমাদের শরীব পাক নয়।

– আমাদের কাপড় নাই। ওরা আমাদের ন্যাংটা করে রেখেছে। অন্ধকারে দু বোনের ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে প্রবল বিবমিষায দুবোনের শবীব থরথব কবে কাঁপে। একটু পর টেব পায় লোমশ হাত ওদের টেনে নিচ্ছে – জন্তুর মতো মানুষ উঠে আসছে শরীবের উপর – ঘ্রাণ নিচ্ছে–অন্ধকাব, অন্ধকার। বাংকারের ভিতবে শুরু হয় এমনই সন্ধ্যা- শেষ হয় এমনই ভোব। এখানে ওরা দশজন সৈনিক। ওদেব জন্য মাত্র দুটি মেয়ে। রাতেদিনে কতোবার যে চিৎ হয়ে শুয়ে বাংকারের ছাদের দিকে ভাবলেশহীন অবস্থায় তাকিয়ে থাকতে হয় ওবা তার হিসাব রাখে না। শুধু ওদের কাঁদতে দেখলে ওবা খেঁকিয়ে উঠে চিৎকার কবে, রোঁতা কিউ ? তুম মুসলমান, হাম মুসলমান। তুম ভি কলেমা জানতা, হাম ভি কলেমা জানতা। বোলো, কলেমা বলো।

বোজই ওরা গড়গড় করে কলেমা বলে যায। একদিন আমিনা কি ভেবে চুপ করেছিল। হিংস্র দানবটি চুলেব মুঠি ধরে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওকে। শরীবেব ব্যথায দুদিন বিছানা

থেকে উঠতে পারেনি আমিনা। মদিনা মৃদু ধমক দিয়ে বলেছিল, কেন এমন করতে গেলি ? আমিনা কঠিন কণ্ঠে বলেছিল ধর্ষণ আর কলেমা কি একসঙ্গে হয় ? মদিনা এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, চুপ, এভাবে বলবি না। আব্বাজান শুনতে পাবেন।

দুজনে দুজনের পিঠে হাত বুলোলে টের পেয়েছিল, মসৃণ পিঠ অমসৃণ হয়ে গেছে। অসংখ্য ছোটবড়ো ক্ষতের চিহ্ন। আমিনা কণ্ঠের একই ভঙ্গি বজায় রেখে বলেছিল, আমাদের শরীরটা আর আমাদের নেই। হিহি করে হেসে উঠেছিল মদিনা। হাসতে হাসতে বলে, আমরা যে পাকিস্তান রক্ষা করছি।

আমিনা বলতে পারেনি, চুপ হাসিস না। আব্বাজান শুনতে পাবেন।

বাংকারের ভিতর দুবোন এভাবে ওদের আব্বাজানকে কষ্ট থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। কতো দিন, মাস গড়িয়েছে ওরা জানে না। নাকি বছর পেরিয়ে গেলো ? বোশেখ মাসের কথা ওদের খুব মনে আছে এখন কার্তিক হতে পারে। হালকা শীত পড়েছে। দুদিন ধরে সৈনিকগুলো উদ্বিগ্ন। সারাক্ষণ কি জানি বলাবলি করে। বাংকারে পাহারা জোরদার হয়েছে। দুবোন ফিসফিসিয়ে বলে, লড়াই কি শুরু হয়ে গেলো ?

মদিনার শুকনো মুখে আর্তনাদ, আমরা কি এই গর্তের ভিতর মরে যাবো ? আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা হবে না ?

– বেঁচেও তো যেতে পারি। যুদ্ধে এই শয়তানগুলো সব খতম হবে।

– ঠিক বলেছিস, মুক্তিযোদ্ধারা এসে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ওরাতো আমাদের দেশের মানুষ।

– কিন্তু ওদের সামনে আমরা কেমন করে যাবো ?

দুবোন দুহাতে মুখ ঢাকে।

দুদিন পর প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় দুবোনের। সৈনিকরা চেঁচামেচি করে লড়াই শুরু হো গিয়া। মুকুত আ গিয়া।

পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে ওরা। গাঁয়ের মেয়েদের মুখে স্বাধীনতার কথা শুনেছে ওরা। ওরা জানে না স্বাধীনতা কি, আব্বাজান ওদের বুঝিয়ে দেননি। কিন্তু নিজেদের দিকে তাকিয়ে ওরা স্বাধীনতার একটা অর্থ দাঁড় করাতে চায়। একজন মদিনার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, বাঙালি গাদ্দার। শুয়োরকা বাচ্চা। সে মুহূর্তে আমিনার দাঁতে ঘর্ষণ হলে কিড়মিড় শব্দ ওঠে।

অনেক রাতে দুবোন বুঝতে পারে গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধারা কি বীরদর্পে এগিয়ে আসছে ? আনন্দে দুবোনের চোখ চিকচিক করে ওঠে। ওরা বাংকারের কোনায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। ছাদের ভেতরও ওদের ঘুম আসছে। এতো দিনে আজ ওরা পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়েছে। ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অল্পক্ষণে দুজনে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলে ফেলে আসা ভরদুপুরের মেঠোপথ দেখতে পায়। ওদের পিতার মুখে অসংখ্যবার শুনেছে ওদের জন্মের সময় ঘরের চালে অলৌকিক আলো দেখা গিয়েছিল। সে আলো ভর করেছিল ওদের অন্ধ দাদির চোখে। সেই একই আলো ওদের স্বপ্নের ভিতর ফুটতে থাকে। যে পথে মিলিটারিরা ওদের ধরে এনেছিল সেই পথ অলৌকিক আলোয় ফুটে উঠতে থাকে। কোথাও কেউ নেই। শুধু একজন মানুষ সোনালি চাদর গায়ে দিয়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছে। দুবোন উদগ্রীব হয়ে থাকে, কে তিনি ? ওরা দেখতে পায় মানুষটির হাতে রাইফেল - সেটা কখনো চাদরের নিচে চলে যায়, কখনো চাদরের আড়াল থেকে নলটা বেরিয়ে এসে তাক করে শূন্যে। ছুটে যায় গুলি। দুবোন বাংকারের দরজায় মাথা তোলে। তিনি এগিয়ে আসেন। বলেন, বেরিয়ে আসুন। ওরা লজ্জা পায়। দুহাতে নিজেদের শরীর

ঢাকে। সেই যোদ্ধা মানুষটি সোনালি চাদর খুলে ওদের দিকে বাড়িয়ে দেন। বলেন, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিন। আপনাদেব কোনো লজ্জা নেই। সব লজ্জা আমাদেব। আসুন, বেবিয়ে আসুন। দেখুন চাবদিকে কেমন অপূর্ব আলো।

একই সঙ্গে দু বোনেব ঘুম ভেঙ্গে যায। পবস্পবেব দিকে তাকায। আমিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি মদিনা।

আমিও দেখেছি। মদিনার কন্ঠ উচ্ছ্বাসে খানখান হয়ে যায।

দুবোন জেগে থেকেও স্বপ্নেব ভেতব ডুবে যায। সুপুরুষ এক যোদ্ধা ওদেব করোটির ঘন কুযাশাব ভেতব দিয়ে হেঁটে আসছে সব লজ্জা আড়াল কবে দেওযাব জন্য। দু বোনেব শবীরে অদ্ভুত শিহবণ – এমন আনন্দ ওদেব ষোল বছবের জীবনে এই প্রথম।

আমিনার হাত জড়িযে ধবে মদিনা বলে, আমি এমন মানুষকে ভালোবাসতে চাই।

মদিনা অপলক দৃষ্টিতে ওব দিকে তাকিযে বলে, আমিও।

রশীদ হায়দার

উৎসব

স্কুলেব শতবর্ষ প্রতিষ্ঠা-দিবস ও পুরনো ছাত্রদেব পুনর্মিলন উৎসবে গিয়ে প্যান্ডেলেব কাছে দাঁড়াতেই চৌদ্দ পনরো বছরের একটি ছেলে সুদৃশ্য একটি স্মবণিকা আমার দিকে এগিয়ে দেয়। প্রচ্ছদে স্কুলের মূল ভবনের ছবি। দ্রুত পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ে প্রতিষ্ঠাতাব ছবি, কৃতী ছাত্রদের ছবি। এখনকার শিক্ষকবৃন্দ ও পরিচালনা কমিটির ছবিও রয়েছে, কিন্তু সেগুলো একেবাবে পেছনে। সুমুদ্রিত স্মরণিকাটি হাতে নিয়ে মন ভবে গেল।

ছেলেটি তখনো আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে। পাতলা গোঁফেব বেখা সবে কালো হয়ে উঠছে, মুখের কোমল বেখাগুলো এমন স্পষ্ট যে তাকে 'ছুটি' গল্পেব ফটিক বলে ডাক দিলে জবাব দিয়ে বসবে। জিগগ্যেস করলাম, নাম কি ?

সন্তোষ। সন্তোষ কুমার দত্ত।

কোন্ ক্লাসে পড়ো ?

নাইনে।

ভালো। ভালো করে লেখাপড়া কববে।

ছেলেটি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ কববো' জবাব দেবাব পর আমার সহসা হাসি পায়। এই বয়স আমাবও একদিন ছিলো আটাশ ঊনত্রিশ বছব আগে, এই বয়সেই গুরুজনবা সুযোগ পেলেই দুটো উপদেশ দিয়ে বসেন, আমিও অনেকবার পেয়েছি। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসি চেপে আবার সন্তোষের দিকে তাকিয়ে দেখি সে অন্য একজন প্রাক্তন ছাত্রেব দিকে স্মরণিকাটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে আর পেছন থেকে ডাকিনি।

আমাদেব নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে ভালোভাবে স্মবণিকাটি দেখার জন্যে ধীবে ধীবে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কৃতী ছাত্রদেব তালিকায় এসে চোখ আটকে যায়। অনেক নামী দামী ছাত্র বেরিয়েছেন এই স্কুল থেকে। মন্ত্রী হয়েছেন, ডাক্তার হয়েছেন, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়াব, লেখক, খেলোয়াড়, এমনকি ভূপর্যটকও আছেন। আমি কোথাও নেই। থাকাব কথাও নয়। অতি সাধারণ ছাত্র, দুই দফায় ম্যাট্রিক পাশ কবে বাব কয়েক ঘষেমেজে বি.এ.-টা পাশ কবাব পব একটা সবকারী বদলিব চাকরি পেয়ে গেলে সিলেট খুলনা দিনাজপুর চট্টগ্রাম ঘুবে এখন ঢাকায় রয়ে গেছি, আর বদলির সম্ভাবনা নেই। ঢাকায় মুগদাপাড়ায় একটা ছোটখাটো বাড়ি করে দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বেশ আছি বলে দেশে বড় একটা যাওয়া হয না, দরকারও পড়ে না। দবকাব ফুরিয়েছে বলে দেশেব অনেক কিছুই মন থেকে মুছে গেছে, অস্পষ্ট হয়ে গেছে স্কুল, স্কুলেব লাগামহীন শেষ দিনগুলো। সেই ম্যাট্রিকেব বেজাল্ট বেবোনোব পব একবারই হেড মাষ্টারের প্রশংসাপত্র নিতে গিয়েছিলাম। ছাত্র ভালো নই তাই হেড মাষ্টাবও আধা ঘন্টা বাইবে দাঁড় করিয়ে রেখে কাগজটি হাতে ধবিয়ে দেবার সময় শুধু বললেন, লেখাপড়া শেষ না কলেজে পড়বি ?

ইচ্ছে আছে কলেজে পড়বো।

হেডমাষ্টার হাসলেন কিনা বোঝা গেল না। বাশভারি হেড মাষ্টার বাবু অবণীমোহন সান্যাল বাজে ছাত্রদের সব সময় আপদ জ্ঞান কবে ঘোড়াগাড়িব কোচোয়ান, দাবোযান, দলিল

লিখক ইত্যাদি নামে অভিহিত করতেন বলে কোনোদিনও তাঁর ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়নি, আমরা বাজে ছাত্ররা প্রয়োজনও বোধ করিনি। ভালো ছাত্ররা বৃত্তি পাচ্ছে, স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মিহি গলায় 'আজি এ প্রভাতে রবির কর' আবৃত্তি করে শ্রোতা দর্শকদের হাততালি লাভ করছে, 'খরা বায়ু বয় বেগে' গাওয়ার সময় যেভাবে হেঁইও হেঁইও করছে তাতে আমাদের শুধু হাততালি দেবার দলের কয়েকজনের মনে হয়েছিলো এরা নৌকার মাঝি হলে খুব একটা খারাপ করতো না।

আমাদের সেই দলে ছিলো সরোজ দত্ত। কেউ ওকে নাম জিগগেস করলেই সঙ্গে সঙ্গে বুক টান করে সোজা দাঁড়িয়ে জবাব দেয় শ্রী সরোজ কুমার দত্ত। ওর বুক টান করে দাঁড়ানো দেখে আমরা ওকে ডাকতাম মিলিটারি। আস্তে আস্তে স্কুলে ওর ভালো নামটা নাম ডাকার খাতা ছাড়া আর সব জায়গায় ফিকে হয়ে যেতে যেতে এক সময় সহসা শহরের লোকের মুখে মুখে মিলিটারির সাথে আসল নামটাও ছড়িয়ে পড়ে, সরোজ রাতারাতি সহানুভূতি ও উৎকণ্ঠায় সবার ঠোঁটে-ঠোঁটে ফিরতে থাকে। সারা শহরে খবরটা ছড়াতে দশটা সাড়ে দশটা বাজে। যারা শুনছে তারাই বলছে মণিকান্ত বিদ্যাপিঠের ওই রাইট আউট ছেলেটি? কী দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়রে বাবা, ওর পায়ে বল পড়া মানে ব্যাক গোল কীপারের বুক কাঁপাকাঁপি অবস্থা, সেই ছেলে খুন হলো? সবাই দলে দলে লাশকাটা ঘরে সরোজকে দেখতে আসে।

স্মরণিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে স্মৃতিচারণের পাতায় এসে এখন বিলেতবাসী ডাক্তার আবু নঈম চৌধুরীর লেখার শিরোনামাতেই লাশকাটা ঘরের কথা দেখে আমার আটাশ উনতিরিশ বছর মুহূর্তে ওলট পালট হয়ে যায়, ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে বাঁধের ধারে লাশকাটা ঘরটা দেখে আসি, আমার ছেলেবেলাটা দেখে আসি, সরোজকে দেখে আসি। আমরা স্কুলে এসে পৌঁছনোর আগেই বড় রাস্তা থেকে চোখে পড়ে হেড স্যার, অংক স্যার, ড্রিল স্যার, কেরানী সাহেব, হেড স্যারের খাস পিয়ন অনিল স্কুল ছেড়ে বাঁধের দিকে হেঁটেই দৌড়ুচ্ছেন, দেখে আমাদের হাঁটা থেমে যায়, তখনও জানিনে তাঁরা বাঁধের ধারে লাশকাটা ঘরে যাচ্ছেন, সেখানে ছুরিতে ক্ষত-বিক্ষত মিলিটারী শ্রীসরোজ কুমার দত্ত টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। একেবারে নগ্ন। ছুরির আঘাতের জায়গাগুলোতে তুলো গোঁজা, ডাক্তারের ছুরিতে কাটা বুক পেট রগ দিয়ে সেলাই করা।

লাশকাটা ঘর ঘিরে লোকের হাট বসেছে। স্কুলে পা রেখে খবরটা শুনেই ক্লাসে না গিয়ে দৌঁড়ে বাঁধের ওপর উঠে দেখি এ ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে নেট ঘেরা লাশকাটা ঘরের ভেতর উঁকি দিতে চেষ্টা করছে, পুলিশ হাত দিয়ে লাঠির গুতো দিয়ে ভিড় সরানোর চেষ্টা করছে, একটা উদ্বেল জন সমুদ্র একবার সামনে এগোয় আবার পিছিয়ে আসে। এটা সরোজের প্রতি মানুষের ভালোবাসা না একটা খুন হয়ে যাওয়া মানুষকে দেখার উৎসাহ বোঝার মতো বোধ তখন আমাদের নেই বলে আমরাও এর ওর পা মাড়িয়ে ধাক্কা খেয়ে পা গলে নেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ পড়ে সরোজের মুখটা ঘোরানো আমাদের দিকেই, বিস্ফারিত চোখে আমাকেই জিগগেস করছে 'কি বললি? কলেজিয়েট স্কুলের কাছে আমরা হেরে যাবো?' আমার মাথা ঘুরে যায়। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভিড় ঠেলে দলের বন্ধুদের ছেড়ে দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে মনে হয় সরোজ আমারই পেছনে ওই বিস্ফারিত চোখ নিয়ে পিছু ধাওয়া করতে করতে বলছে, 'কী, কি বললি?'

চারপাঁচদিন বাড়ি ছেড়ে বেরোতে সাহস পাইনে। বাড়ির আঙ্গিনা ছেড়ে বেরোলেই মনে হয় রাস্তায় সরোজকে সাইকেলের সিটে বসেই মাটিতে পা ঠেকিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে দেখতে পাবো, বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়বে। রাতে বাইরে বেরোলে লোক না নিয়ে বেরোই না, বাবা সব শোনার পর প্রথমে রাস্তা থেকে পেয়াজের খোসার মতো ফিনফিনে কাগজে জাফরানি রংয়ে ক্ষুদেকুনি হরফে ছাপানো দোয়া কিনে এনে ও পরে বড় মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে দোয়া লিখিয়ে তাবিজ বানিয়ে ডান হাতের কব্জিতে বেঁধে দেয়ার পরও মনে হয় সরোজ আমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি চোখে চোখে রেখেছে। মৃত মানুষের দেখার শক্তি যে এতো প্রখর হয় তা ওই বয়সে সরোজই শিখিয়েছিলো।

সরোজ শিখিয়েছিলো অনেক কিছু। সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলো, শিখিয়েছিলো বিড়ি টান দেয়া, মেয়েদেব চোখ মাবা, গোসল কবে উঠে বগলে রসুন রেখে জ্বর আনিয়ে স্কুলে না যাওয়ার কৌশল, মনে আছে শহরেব অন্ধকার গলির ছোট ছোট বাড়ির দরজায় কিভাবে সুরুৎ কবে ঢুকে যেতে হয় তারও কায়দা। ভালো ছাত্রবা এসব কথা শুনলে আঁতকে উঠে হয়তো ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, কিন্তু আমবা হেড স্যারের ঘোড়াব কোচোয়ানবা এসব বিদ্যা শিখতাম হাসতে হাসতে আর এসবেব গুরু আমাদের মিলিটারী দুর্ধর্ষ রাইট আউট শ্রীসবোজ কুমাব দত্ত।

সেই সরোজ অপঘাতে মরে গেল। আমি শ্মশানে যাইনি, পরে যারা গিয়েছিলো তাদের কাবো কারো মুখে শুনেছি কোনো নেতাব শব-যাত্রাযও নাকি এতো লোক হয না, হিন্দু মুসলমানে কোনো বাদ বিচার ছিলো না, পোড়ানো শুরু হলে চামড়া পোড়া ও ধোঁয়াব গন্ধের সাথে মানুষের চাপা কান্নায় চারদিক ভারি হয়ে গিয়েছিলো। কতোটা জনপ্রিয় ছিলো সবোজ তা পবিমাপ কবার মতো ক্ষমতা আমার তখন নেই, কিন্তু এখন মনে হয খেলায মাতিয়ে দিয়ে বাজে ছাত্র সরোজ মাষ্টারদের না হোক মানুষের মন ঠিকই জয় কবতে পেরেছিলো।

শহরে এখন একটাই আলোচনাব বিষয সবোজকে খুন কবলো কে, কেনই বা কবলো। খুন হওযার মতো দুর্বৃত্ত সে ছিলো না, খেলাব মাঠে কাবো সাথে কোনোদিন এমন কোনো মাবামারি হযনি বা বাজে পাড়ায় এমন কিছুই ঘটেনি যাব জন্যে তাকে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হলো। বাজে পাড়ায় কথাটা আমাদের মতো বাজে ছেলেদেব মাথায় একবাব খেলে গেলেও আমরা কেউই অনুমান করতে পারিনি তাবই জেব খুন পর্যন্ত গড়াবে, তাও আব কোথাও নয়, মধ্যরাতে তাদেব বাড়িতে, তাবই পাশেব ঘবে। তাব পাশেব ঘবে থাকে তাব একমাত্র বোন সরমা আর খুড়তুতো এক বিধবা পিসী। সে পিসী প্রায় সাবা রাতই খকব খকব করে কাশে।

আমাব আগে আব কে কে সবোজেব বাবা মাব সাথে দেখা কবে গেছে জানিনে, আমি গেলাম সপ্তাহখানেক পব। আগে যতোবাবই গেছি দবজা খোলা পেলে সোজা বাড়িব মধ্যে 'সরো আছিস' বলে ঢুকে যাই, সরোজেব মা দেখলে 'হেলাল এসেছিস ?' বলে একগাল হাসেন, সরমা ধারে কাছে থাকলে 'ও দাদা, কখন এলেন ?' বলে হয বেণী দুলিযে খেলতে চলে যায় না হয় সবোজকে ডাকে, 'দাদা, হেলালদা এসেছে।' কিন্তু আজ আমাব কোনো ডাকই মুখে জোগায় না, খোলা দরজার বাড়ি পেয়েও হুটহাট ঢুকে সরমা বা কাকীমা বা কাকা কাউকে ডাকার শক্তি কে যেন হবণ করে নেয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি বলতে পারবো না, খুন হবাব এতোদিন পর আসার জন্যে কতোখানি অপরাধ হয়েছে সে বিবেচনাও লোপ পেযে গেছে। সেই সময় দেখি দরজা বন্ধ কবার জন্যে কাকীমা বাইবে এসে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িযে গেলেন, দরজায় বালা ও শাঁখার একটা হাত দবজাতেই আটকে থাকে।

ধীবে ধীরে বাড়িব মধ্যে গেলাম, কেউ কিছু জিগগেস কবে না, কেউ বাধা দেয় না, এমন কি সরোজেব শূন্য ঘরও আমাকে আগেব মতো গ্রহণ বা বর্জন কোনোটাই কবে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় বুঝতে পাবি আমাব পেছনে তিনটি মানুষ নিঃশব্দে ফুঁপিযে চলেছে। আমার তখন বেঁচে ওঠাব জন্যে কিছু শব্দের প্রয়োজন। দ্রুত ঘাড় ঘুবিয়ে কাকার দিকে চোখ পড়তেই তিনি পাগলেব মতো কি সব বললেন আমাব মাথায় ঢোকে না, কেবল একটা কথা মনে সহসা গেঁথে যায়, 'আমরা সন্দেহ করছি কে খুন করেছে।'

কে ?

হিজবুল মৌলবীব ছেলে নজরুল।

আমার কান মাথা ঘুরে যায। কাকাব হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাতব হযে জিগগেস করি, মানে আমাদেব নজরুল ?

হ্যাঁ বাবা, ও ছাড়া আর মানুষ দেখিনে।

তখন আমাকে নতুন ধাঁধায় পেয়ে বসে। সরোজদেরই উকিল পাড়াব মৌলবী হিজবুল

ইসলামের বড় ছেলে নজরুল ইসলাম আমাদের চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড় হলেও এক এক ক্লাসে দুই একবার থেকে থেকে এখন আমাদের সাথেই পড়ে, হেড স্যার ওকে অনেকদিন আগেই 'খামোখা বাপের অতো কষ্টের পয়সা নষ্ট না করে বাপের মৌলবীর ব্যবসাটা ধরে ফেল' উপদেশ দিয়ে দিয়ে এখন আর কিছুই বলেন না, সেই শান্তশিষ্ট গোবেচারা নজরুল খুন করার মতো দুঃসাহসিক কাজ করে ফেললো ভাবতেই আমার সারা শরীর অবশ হয়ে আসতে থাকে, আমি ধপাস করে সরোজের চৌকির ওপরেই বসে পড়ি।

কান্নার আবেগ থামিয়ে কাকা জিগগেস করেন,

নজরুল ইশকুলে যায় না ?

জানিনে।

কেন, তুমি যাওনা ?

তখন কেন গত সপ্তাহখানেক যেতে পারিনি তার সব কথা হড়হড় করে বেরিয়ে আসতে চায়, বলতে চাই কাকাবাবু আপনার ছেলে গেছে কিন্তু আমাদের যে বন্ধু গেছে সে আমাদের কোনোদিন ভালো ছাত্র হওয়ার পাঠ দিতে পারেনি, কিন্তু সে যা দিয়েছে তাতে ওই নাইন টেন পড়া বয়সেই অজস্র মানুষ চিনেছি, এমন কিছু চরিত্র চিনেছি যা আপনার দীর্ঘ ওকালতি জীবনেও হয়তো চেনা সম্ভব হয়নি। কাকাবাবু, সরো ছাত্র ভালো ছিলো না ঠিকই কিন্তু ও আমাদের হিংসুটে ফার্স্ট সেকেন্ড ছাত্রদের চেয়ে ছেলে হিসেবে অনেক ভালো ছিলো। হেডমাস্টার স্কুলের টীমে ভালো খেললে পিঠ চাপড়ে দিতেন, ব্যাস ওই পর্যন্তই, কিন্তু কোনোদিন কাছে ডেকে জিগগেস করেন না 'কি রে পড়াশুনা কেমন করছিস ?', বরং উল্টে বলতেন 'যারা কোচোয়ান হবার তারা তাই হয় তারা কোনোদিন সি আর দাস হয় না।' অনেক পরে মনে হয়েছিলো আমার আসলে এতো কথা বলার ছিলো যে কোনোটাই গুছিয়ে বলা হয়নি, বলা হয়নি সরোজ ওই লাশকাটা ঘরে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো, সে দৃষ্টি সহ্য করার মতো শক্তি আমার ছিলো না।

সরোজদের বাড়ি থেকে কতক্ষণ পর বেরিয়ে আসি জানিনে, কেবল চলে আসার সময় সরমার মৃদু একটা ডাক শুনি, দাদা।

ঘাড় ঘুরিয়ে সরমার মুখের দিকে তাকালে চোখে পড়ে উদগত কান্না চেপে রাখার জন্যে চোখের পাতা ও দুই ঠোঁট বারবার কেঁপে যাচ্ছে, নাক টানছে বারবার সরমা।

কিছু বলবে ?

আপনি মাঝে মাঝে আসবেন, নইলে বাবা মাকে রাখা যাবে না।

মাথা নীচু করে বলি, আসবো, নিশ্চয় আসবো।

এরপরই কান্নায় ভেঙে দরজার ওপরেই লুটিয়ে পড়ে সরমা বিলাপ করে ওঠে, আমার জন্যেই, দাদা আমার জন্যেই চলে গেল।

তখন আরেকটা নতুন ধাঁধায় পড়ে যাই। কেন সরমার জন্যেই সরোজকে প্রাণ দিতে হলো সে কথা জানার জন্যে আবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে কাকা কাকীমাকে জিগগেস করার মতো শক্তি তখন আমার পায়ে অবশিষ্ট নেই। আচ্ছন্নের মতো বাড়ি ফিরে আমার ঘরে শুয়ে থাকি, আব্বা সরোজের প্রেতাত্মা থেকে আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে রোজ এশা ও ফজরের নামাজ-শেষে সাতবার আলহামদু সাতবার কুল ও সাতবার দরুদ পড়ে আমার বুকে ফুঁ দিয়ে যান।

এখন মনে পড়ে টেস্টের আগে স্কুল কামাই করে ঘরে একটানা শুয়ে থাকার শেষ নেই দেখে আব্বার গালাগালের চোটে আমার সরোজের ভয় কমে আসে। ঝাড়া তেরদিন পর স্কুলে গিয়ে দেখলাম এতোদিন পর ক্লাসে যাওয়ার জন্যে কোনো শিক্ষকই কিছু জিগগেস করলেন না, ভালো ছাত্রদের এদিকে মনোযোগ দেবার সময় নেই বলে তারা, সারাদিনই প্রতিযোগিতা করে অংক আর ট্র্যানস্লেশন করে গেল, কেবল আমাদের কোচোয়ানরা আমাকে ঘিরে জানতে চায়, নজরুলের খবর জানিস ?

না। ও স্কুলে আসে না ?

না। ও তো পালিয়েছে।

পালিয়েছে !

হ্যাঁ ! ও-ই সরোকে খুন করেছে।

বিস্ময়ে আমাব মুখে কথা সবে না। এতো নিশ্চিত হয়ে বলে যে যেন খুন করার সময় ওরা নজরুলেব সাথেই ছিলো। থেমে থেমে জানতে চাই, তোরা জানলি কিভাবে ?

হা হা করে হাসে ওবা। আবে শালা, দুনিযাব সবাইতো জানে। নজরুল খুন করে পালিয়েছে। সরোজ খুন হওয়ার দিন থেকে ও আর স্কুলে আসেনি, বাড়িতেও নেই। সবোজের বাবার এজাহারের ওপর খোঁজ নিতে গিয়ে পুলিশ দেখে নজরুল হাওযা। পুলিশ ওকে এখন গরু খোঁজা খুঁজছে।

আমার ঠিক তক্ষুণি সরমাব 'আমাব জন্যেই দাদা চলে গেল' বিলাপ শত সহস্র শব্দে কানে আঘাত করতে শুরু করে। কিন্তু সে কথা এখানে বললে ওরা যদি আবাব দ্বিগুণ শব্দে হাসে মনে হতেই ভেতরে ভেতরে মজা পাওয়া চেহারাগুলো দেখতে পাই। সবাব মুখেব দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি সবোজ এখন আব কোনো খবর নয়, কষ্ট নিয়ে গভীব আলোচনার বিষয় নয়।

এক সময় আমার মন থেকেও সবোজ ফিকে হয়ে যায়। টেস্টে টেনেটুনে অ্যালাউ হই, কিন্তু প্রথমবারে স্কুল পার হতে পারিনে। দ্বিতীয়বারেও টেস্ট কষ্টে সৃষ্টে উৎরে গিয়ে ফাইনালে তৃতীয় বিভাগ পেলে আমার নিজেরই অবাক লাগে, আমি তো এটা পাওযাবও যোগ্য নই। গত বছরেব জুনিয়ব ছেলেবা এবারে সহপাঠী হয়ে অনেকেই ফার্স্ট ডিভিশন, বিভাগীয় ও জেলা বৃত্তি পেয়ে পাশ করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, আমাব খারাপ লাগে না। ভালো ছাত্র হওযাব স্বাদ জীবনে কোনোদিন হবে না, ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মন খারাপ করে সময় নষ্ট কবার মতো সময় আমাব নেই। তাব চেয়ে কোচোয়ান বন্ধুবা আমাব অনেক বেশি আপন।

উৎসবে প্রধান অতিথি আসাব পর দেখলাম স্মরণিকার সেই ছেলে সন্তোষ দত্ত তাঁব সামনে গিয়ে স্যালুট কবে হাতে একটা স্মরণিকা তুলে দিলো। প্রধান অতিথি তাঁব মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু একটা জিগগেস কবলে সে হেসে মাথা নেড়ে জবাব দিযে ধীর পাযে মঞ্চ থেকে নেমে আসে। বুঝতে পাবি ক্লাস নাইনে পড়লেও ভালো ছাত্র বা ছেলে হিসেবে সে এই স্কুলের একটা গর্ব বলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কাছাকাছি এলে ইশাবায় ডাক দিলাম, সন্তোষ শোনো।

আমাকে ডাকছেন ?

মনে হচ্ছে তুমি খুব ভালো ছাত্র।

মিটমিট করে হাসে সন্তোষ।

বলো ঠিক বলেছি কি না ?

মাথা নিচু করে জবাব দেয় সন্তোষ, আমি ঢাকায সারা বাংলাদেশে ডিবেটে ফার্স্ট হয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট আমাকে মেডেল দিয়েছেন।

তুমি কোথায় থাকো ?

উকিল পাড়ায়।

আমার মাথা ঘুরতে শুরু কবে। উকিল পাড়া, যে-পাড়ায় আমার বন্ধু সরোজ থাকতো, এই ছেলের নামের সাথেও দত্ত রয়েছে, হাতটা জড়িয়ে ধরে জিগ্গেস করি, তুমি ওই পাড়ার সরোজ দত্ত বলে কারো নাম শুনেছো ?

চোখ নামিয়ে সন্তোষ জবাব দেয়, উনি আমার মামা হতেন। মারা গেছেন।

আমার আর কিছু শোনার মতো মানসিকতা থাকে না। হাত ছেড়ে দিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালে সন্তোষ অবাক হয়ে জিগগেস করে, আপনি চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

প্যান্ডেল ভর্তি লোক, চার পাশে অজস্র লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে আসতে আসতে শুনি প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের নাম বলা হচ্ছে, বলছে টেলিভিশনী কায়দায় এই স্কুলেরই আরেক প্রাক্তন ছাত্র, এখন নামী টেলিভিশন নাট্যশিল্পী, লোকজন তার কথা শোনার চেয়ে তাকেই দেখছে হা করে। আমি কোনোদিন এ দলে নেই, প্রিয় স্কুলের জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো বলে বৌ বাচ্চা ঘর সংসার চাকরি রেখে একটা দিনের জন্যে ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু এসে দেখলাম আমার কোনো প্রয়োজন নেই, জনতা থেকে একজন কমে গেলে কারো বা কোনো কিছুব ক্ষতি হয় না। মনে হচ্ছিলো এতো সাজানো স্কুল, মঞ্চ, প্যান্ডেল ছেড়ে বাইবে গিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবো।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হলে ভালো হতো।

দক্ষিণ দিককার ভিড় পার হয়ে কয়েক পা এগুতেই পেছন থেকে কে যেন ডাক দেয়, হেলাল !

ঘাড় ফিরিয়ে ডাকার মতো চেনা কাউকে চোখে পড়ে না। দেখি দাড়ি গোঁফ বাবরি চুলেব বাউল গোছের এক লোক চোখে হাসি খেলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে মনে হয় দীর্ঘ আটাশ উনতিরিশ বছব এই স্কুল ছেড়ে গেলেও এ-রকম কোনো চেহারার লোক আমার পরিচিত ছিলো মনে পড়ে না। লোকটি একেবারে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, চিনতে পারিস ?

ঘোর তখনও কাটে না। বললাম, না, মনে পড়ছে না।

স্বাভাবিক। কতোদিন পর দেখা। আমি নজরুল।

সন্তোষেব সঙ্গে একটু আগেই কথা না হলে আমার নজরুলকে আবিস্কার করতেও কষ্ট হতো, কিন্তু এখন নতুন কবে আবাব সব কিছু এলোমেলো হতে থাকলে নজরুলই কাঁধে হাত বেখে আমাকে সুস্থির করে বলে, চলে যাচ্ছিস কেন ?

থাকতে ইচ্ছে করছে না।

তোকে ভিড় ঠেলে বেবিয়ে আসতে দেখেই চিনেছিলাম। তোর কিন্তু খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

চুলতো অর্ধেক শাদা।

ও কিছু না।

নজরুল আর কিছু বলে না। দু'জনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কখন যে রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছি জানিনে। নজরুল আবার বলে, এই উৎসবে থাকবি বলে ঢাকা থেকে এসেছিস, অথচ শেষ না করেই চলে যাচ্ছিস ?

আমার বেশ কান্না পায়। দুই যুগের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকলেও কারো না কারো জন্যে মানুষের কোথাও না কোথাও কিছু কান্না জমা থাকে, মনে হয় সরোজের জন্যে আমার কান্নার কিছু সঞ্চয় ছিলো। বললাম, এ-উৎসব নামী দামী ছাত্রদের জন্যে। আমরা ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলো। কিন্তু আমি ভাবি আমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, খেলোয়াড় হিসেবে সরোজ তো অনেকবার স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে, ওর নামটা কৃতী ছাত্রদের তালিকায় নেই কেন ?

জবাব দেয় না নজরুল। আবার দুজন নীরবে হাঁটতে হাঁটতে বাঁধের ধারে লাশকাটা ঘরের কাছে আসতেই নজরুল থেমে যায়। বলে এখানে লাশকাটা ঘরটা ছিলো মনে পড়ে ?

ঠিক তখনই দেখি ওটা ওখানে নেই। অবাক হয়ে বলি, পড়ে। কিন্তু ওটা এখন কোথায় ?

শ্মশানেব কাছে।

বুঝতে পারি আমাদের লাশকাটা ঘর শহর ছেড়ে আরো চার মাইল উত্তরে চলে গেছে। ওখানে সবোজের কোনো স্মৃতি নেই। হঠাৎ নজরুল আমাব হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কচলাতে থাকে।

জানিস হেলাল, সবোজকে এই লাশকাটা ঘরে দেখার জন্য আমিও এসেছিলাম। তখনো আমি যে খুন করেছি কেউ জানতে পারেনি, কিন্তু বিশ্বাস কব টেবিলে সরোজের চোখ দেখেই মনে হলো ও সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে, এই, এই সেই নজরুল, এই সেই খুনী। আমি আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াতে পারিনি। পাগলেব মতো টলতে টলতে ভিড় ঠেলে বাইরে এসে একটা রিক্সা নিয়ে সোজা বাসস্ট্যান্ড, ওখান থেকে ঈশ্বরদী স্টেশন, তাবপব রাজশাহী খুলনা চিটাগাং ঘুরে ঘুরে শেষে ঢাকায় এসে ধবা পড়ে যাই। তোরা জানিস কিনা জানিনে, জজ কোর্টে আমাব ফাঁসিব হুকুম হয়। পরে আব্বা সমস্ত জমি-জমা বিক্রি করে হাইকোর্টে আপীল করলে ফাঁসিটা মাফ হয়ে যাবজ্জীবন হয়ে গেল।

নজরুলেব কি হলো জানাব চেয়ে সবোজ কেন খুন হলো জানার আগ্রহ প্রবল হযে উঠলে নজরুল ব্যাপারটা অন্তর্যামীর মতো টের পায়। মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরের দায়িত্ব পালন করে বলে আমি অবাক হযে নজরুলের মুখের দিকে তাকাই। ম্লান হাসে নজরুল, বলবো, সব বলবো। বিশ্বাস কব হেলাল, সরোজকে আমি খুন করতে যাবো কেন ? তোদের চেয়ে বয়সে বেশ বড় হলেও তোরাই তো আমাব সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিলি। আব সরোজ আমার পাড়ার ছেলে, ওকে ন্যাংটা কাল থেকে দেখছি, ওকে খুন করবো আমি ? কিন্তু কি ভাবে যে হয়ে গেল !

জেল থেকে ছাড়া পেলে কবে ?

ছাড়া ঠিক পাইনি। পালিয়েছিলাম। একাত্তবেব মার্চে। ঢাকা জেল থেকে বেশ কিছু কয়েদী পালিয়েছিলো মনে পড়ে ?

হ্যাঁ মনে পড়ছে।

কয়েকদিন পবেই তো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, মনে আছে ?

থাকবে না কেন নজরুল, যুদ্ধের কথা মনে থাকবে না ?

হেলাল, অনিচ্ছায় এতো বড় একটা পাপ কবাব পব মনে হযেছিলো। মবতে যদি হযই দেশের জন্যে যুদ্ধ কবে মবি। যুদ্ধে গিয়েছিলাম, কিন্তু এ কপালে মবণ হলো না।

নজরুলের গলাটা ধরে আসে। ওব মৃত্যু কামনায় কোনো ফাঁকি নেই বুঝে আবার মুখেব দিকে তাকিয়ে দেখি চোখের কোণায় কোণায় কান্নার সাথে জীবিত থাকাব দুঃখও জমা হয়ে আছে। বললাম, খুন কেন করলে ?

হয়ে গেল। সবমা, ওই সরমা আমাকে পাগল করেছিলো। ভেবেছিলাম রাজী না হলে ছুরির ভয় দেখিয়ে বের করে আনবো, ওই রাতেই কাজীর ওখানে গিয়ে বিয়ে করবো। কিন্তু ধস্তাধস্তিতে পাশের ঘরে সরোজ টের পেয়ে গেলে ছুটে এসে আমাকে জাপ্টে গলাটা এমনভাবে টিপে ধরে যে আব একটু হলে ও-ই খুনের দায়ে পড়তো। আমি বাঁচার জন্যে ছুরিটা একবার চালাতেই সরোজ চিৎকার করে বসে পড়লো, তখনো বুঝিনি প্রথম ছুরিটাই হৃৎপিন্ডে গিয়ে লেগেছে। হেলাল বিশ্বাস কর, আমি তখন মরিয়া। এলোপাতাড়ি আরো কয়েকটা মেরে পালিয়ে আসি। তারপরে তোরা তো সবই জানিস।

বলতে চাই, না নজরুল, তারপরে সব জানিনে। জানার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিলো। সরোজের মৃত্যুর পর ওদের বাড়িতে আবাব বান্নার চুলো জ্বলেছে, ওর বাবা আবার গাউন চাপিয়ে

কোর্টে গেছে, সরমা বেণী বেঁধে স্কুলে গেছে, ওর মা চকচকে কাঁসার কলস নিয়ে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে জল আনতে গেছে, আমরা স্কুলে গেছি, পরীক্ষা দিয়েছি, হেডমাষ্টার কোচোয়ান বলে বকাবকি করে গেছেন, কিছুই থেমে থাকেনি, কেবল তুমি ছিলে আমাদের আড়ালে, সরোজ ছিলো জীবনের। জানার চেষ্টা করিনি কে কোথায় কেমন আছে।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে নজরুলের। ভাঙা গলায় বলে, জেলে বসেও আমি সরমাদের খোঁজ রাখার চেষ্টা করতাম। জেলে বসেই জানলাম সরমার বিয়ে হয়ে গেল, কাকাবাবু কাকীমা মারা গেল, সরমার স্বামী দিনেশ এখন ওই বাড়ির রাজা। বড়ো হিংসে হতো এক সময়। পরে সেটাও মরে গেল।

তোমার ছেলে মেয়ের খবর হলো।

হেসে ফেলে নজরুল। ওটা আর হলো না।

মানে!

বিয়ে-থা আর করিনি। এতো বড় পাপ নিয়ে আরেকটা মেয়েকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ? যুদ্ধ করেছিলাম বলে সরকার জেলে আর পাঠায়নি, এখন মনে হয় পাঠালেই ভালো করতো।

প্রশ্ন না করে নজরুলের দিকে তাকালে ও স্কুলের দিকে পা বাড়ায়। দুই তিন পা গিয়ে জিগগেস করে, স্কুলে যাবি?

না! ওটা আমাদের উৎসব না। ভালো ছেলেদের, কৃতী ছাত্রদের।

মাথা নিচু করে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে নজরুল বললো, যে-ছেলেটির সঙ্গে তুই কথা বললি ওটা সরমার ছেলে।

বুঝতে পেরেছি। বলেছিলো সরোজ ওর মামা।

চট করে ঘুরে দাঁড়ায় নজরুল, তুই না যাস আমি যাবো।

হেসে ফেলি। হাসতে হাসতেই বলি, কৃতী ছাত্র হিসেবে?

হাসে নজরুলও। সেও জবাব দেয়, ওখানে ওর মা মানে সরমাও এসেছে। যাবি?

আমার পা ওঠে না।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

সুন্দর মানুষ

মানুষেব এক জীবনেও জন্মান্তর হয়। আবার কল্পান্তরেও হতে পাবে। সুন্দর দীর্ঘ দশ বছর ভিক্ষু-জীবন যাপন কবে একদিন গেরুয়া পোশাক ছেড়ে বেরিয়ে এল। তার দীর্ঘ সাধনাপূর্ণ ভিক্ষু-জীবনে এমন কিছু অসঙ্গতি কারও নজরে পড়ে নি যে, সে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবে!

সবাই জানল যে, সুন্দরের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। মস্তিষ্কের কোথায়ও গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আবার কেউ কেউ ভাবল, অল্প বয়সে কঠোর সাধনার জীবন শুরুই বুঝি এই গুরুতর বিপর্যয়ের কারণ।

ধর্মসাধনায় সে প্রতিটি ব্রত নিয়ম-কানুন নিষ্ঠাব সঙ্গে মেনে চলত। শুদ্ধ জীবনযাপন কবত। অবিবাম ধর্ম-সাধনা, কঠোর নিয়ম, সংযম ও ভিক্ষুদের আচরণীয় পথ অনুসবণ করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিল। তাব এই পবিণতিতে সবাই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বৈকি!

বসন্তের এক সকালে সুন্দরকে বিহারের ঘাসভরা উঠোনে পায়চারী করতে দেখা গেল। সেখান থেকে অস্থিব হয়ে এক সময় গেরুয়া পোশাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সবাই তার এই পরিণতি দেখে নানা কথা বলাবলি শুরু কবে। গ্রামের বৃদ্ধরা তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস কবে কুশলাদি জানতে চায়। কিন্তু চুপচাপ সে। কাউকে কিছু বলে না। কারো প্রতি কোনো অনুযোগ নেই; বাগ-দ্বেষহীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশ কেটে চলে যায় সে। কোথাও এক জায়গায় স্থির বসে থাকে না, লোকজন দেখলে আস্তে আস্তে একদিকে চলে যায়। কখনো কখনো নির্জন নদী তীরে কখনো বা মাঠের পাশে, বড়োজোব পথের ওপব বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ঋজু শির-দাঁড়া হয়ে পদ্মাসনে বসে দূবেব পাহাড় কিংবা নদীব দিকে তাকিয়ে থাকে। খিদে পেলে তিন-চার দিন পর কাবো বাড়িতে গিয়ে আসন নিয়ে বসে থাকে। তখন গৃহস্থ বুঝতে পারে তাকে খেতে দেওয়া দবকার।

এভাবে তিন-চাব দিন পর পর খাওয়া তার অভ্যেসে পরিণত হয়। বিবাহে, নিমন্ত্রণে, মৃত ব্যক্তিব সৎকাবে সে ববাহুত চলে যায়। চুপচাপ খেয়ে বেরিয়ে আসে। রাতে বিহারের গোল বারান্দায় ঘুমিয়ে কাটায়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নদীর ধারে বা মাঠের নির্জনতায় মিশে যায়।

গ্রামের লোকজন করুণাবশত ডেকে ভাত খেতে দিত প্রথম প্রথম। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চুরি করে খাওয়া কিংবা কারণে-অকারণে কাউকে আক্রমণ করার স্বভাবও দেখা যায় না। মানুষের সমাজে সবসময় বাস করেও সে অসহায় একা রয়ে গেল। বিহারের গোল বারান্দা, নদীর ধার, বড়োজের পাশটা তার কাছে অভয়কেন্দ্র। মানুষের জীবনপ্রবাহ দেখে সে নিজের হতভাগ্য জীবনের কথাও ভাবে। মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে পূর্বজন্মের কোনো স্মৃতি···কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

২.

এভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়। সুন্দর একদিন কথা বলতে শুরু করে। ধর্মের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজের মতো করে দিতে শুরু করে। তার সেই মতামত এত একান্ত এবং কখনো কখনো এত যুক্তিপূর্ণ যে, কেউ তার যুক্তি খণ্ডাবার ভাষা খুঁজে পেত না। তাছাড়া

ধর্মের কিছু কিছু বিষয়ে, যেখানে কোনো যুক্তি চলে না, কিংবা স্পর্শ-কাতর এমন বিষয়ের অবতারণা সে করে বলে কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ কবার সাহস পায় না। সুন্দর ভিক্ষু জীবনে বার্মা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি নানা দেশে ও নানা জায়গায় ঘুবে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিল, এজন্য সাধারণের পক্ষে তার বিরুদ্ধতা করার যুক্তি ও উপায় ছিল না।

এভাবে কথা বলতে শুরু কবার পর গ্রামের লোকজন সুন্দবকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। বয়স্করা তাকে এড়িয়ে চলে, তরুণরা তাকে ঘিবে ধবে। ফলে এক ধবনের অহংবোধ তার মধ্যে জন্ম নিতে শুরু করে। ঠিক অহংবোধ কিনা বলা মুশকিল। তবে সে এক রকম হঠকারী হয়ে ওঠে আর লোকজনও তাই তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু কবে।

মাঝে মাঝে সে তরুণদের কাছে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ কবে প্রভাবিত করে তোলে, আবাব এক সময় চুপচাপ ধ্যানমগ্ন হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তখন সবাই তাকে নদীর ধারে, মাঠেব পারে ছেড়ে ফিবে যায়।

এরই মধ্যে তাব স্বভাবে আর এক পরিবর্তন এল। সে নিজেব মনে বিড়বিড় কথা বলতে শুরু কবে সারাক্ষণ। খাওয়া-দাওয়া ভুলে যায়। ছয়-সাত দিনেব আগে সে বলতে গেলে কিছুই খায় না।

দিনের পরে দিন কেটে যায়। বেবিয়ে পড়ে গ্রামান্তবে, মানুষেব সঙ্গে কথা বলে। নিজের মতো কবে বলে যায় মনুষ্য-জন্ম ও কল্পকল্পান্তবেব কথা। কোনো নিমন্ত্রণে গিয়ে পৌঁছলে সপের মাথায় বসে উদাস হয়ে যায়। কেউ কুশল প্রশ্ন কবলে অমলিন হাসিতে উত্তব দেয়। সেই হাসি দেখে অনেকেই ভাবে সুন্দব এ-পৃথিবীব বাসিন্দা নয়। কবে সে এখানে এসেছে, কবে থেকে বসবাস শুরু করেছে, কেউ জানে না – সুন্দর নিজেও জানে না।

মাঝে মাঝে সে সকাল-সন্ধে বিলের পর বিল পাড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকে। লোকজন নেই, জনবসতি নেই। শুধু চাষীদেব হাল-বলদ, তবমুজ আব ফুটির খেত, মরিচ অড়হর কলাই খেত পেরিয়ে চলছে তো চলছেই। আস্তে আস্তে বিল পেরিয়ে, খেত পেবিয়ে, নদীব ধার দিয়ে হাঁটতে থাকে। মাঝে মাঝে কাক কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে পব পর কয়েকটি টানে সাবাড় কবে মুহূর্তের জন্য নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে হুঁকোটা নিয়ে টানতেই বেশি পছন্দ করে আব এক সময বিলেব মাঝে ছায়াদার কোনো গাছেব তলায় চিৎপাত শুয়ে চোখ বুজে থাকে। হয়তো ঘুমোয়, হয়তো দিবাস্বপ্নে ভূতগ্রস্ত হয। কখনো কখনো দোকানের তক্তাপোষে বা বেঞ্চিতেও ঘুমোয।

৩.

একদিন ভোব থেকে তাকে আর দেখা গেল না। কোথায় উধাও হল, কী হল কেউ জানে না। খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন কেউ অনুভব করল না। তবে সবাই জানে সে আসবে, দু-চাবদিন পর ঠিক ফিবে আসবে। এতে কারু কোনো কাজ আটকে থাকবে না।

তৃতীয় দিন সুন্দব ফিবে এল একটি বাচ্চা কুকুব সঙ্গে নিয়ে। বাচ্চাটি সাবাক্ষণ তার পিছু লেগেই আছে। কখনো কোলে নিযে বাচ্চা ছেলেদেব পিছু নেওযা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সে মাথা উঁচু করে গ্রামেব পথে হেঁটে চলে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায, ঘুরে দাঁড়াতেই ছেলের দলও দাঁড়িয়ে যায়। মুখে কিছু না বলে, গালাগাল না করে নীববে প্রতিবাদ করে দাঁড়ায়, অথবা কুকুবছানাব মতো তাদেব প্রতিও মমত্ববোধে অন্ধ হয়ে যায়।

কুকুরছানা সঙ্গী হওয়ার পব থেকে তাকে দুপুরে একবার বিহারে উপস্থিত থাকতে হয়। দুপুব বারোটার মধ্যে ভিক্ষুদের খাওয়া শেষ। তাঁদের এঁটোকাঁটা সংগ্রহ করে বাচ্চাটিকে খাওয়ায় সে। সেই ফাঁকে নিজেবও খাবার জুটে যায। কিছু না জুটলে পুকুরে নেমে জল খেযে নেয়। কারু কাছ থেকে এক গ্লাস জলও ভিক্ষে না চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড়োজেব পাশে বড় আমগাছের তলায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে সারা বাত ঘুমুতে পাবে না। যন্ত্রণাদাযক ঘায়ের মতো অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে, নিজেব অসহায়ত্বের যাতনা অনুভব কবে। তখন খিদেও বেড়ে

যায়, তাড়িয়ে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে — কতদিন আর জীবন !

সুন্দর নিজের মতো দিনে এক বেলা থেকে সপ্তাহে তিন-চার দিন, তারপর সপ্তাহান্তে একবার খাওয়ায় অভ্যস্ত করে তোলে বাচ্চাটিকেও । মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই কুকুরছানাটি এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । কেউ আর কাউকে দোষ দেয় না, ছাড়াছাড়ি হওয়াব চিন্তাও করে না ।

আরেক বসন্তের মাদার ফুল ফোটা শেষ হলে বাচ্চাটি জোয়ান কুকুর হয়ে ওঠে। সপ্তাহে এক একদিন আর ভালো লাগে না । একা একা লাফ দিতে পছন্দ করে বলে বেরিয়ে যাওযাব জন্য চিৎকাব জুড়ে দেয় । সুন্দরেরও আর ভালো লাগে না । কুকুরও এক ছুটে বাজাবে গিয়ে তার কুকুর সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হৈ চৈ করে আসে । তাব কুকুর জীবনও তো ফেলনা কিছু নয় । বাজারে গেলে কিছু না কিছু খাবার জোটে । চাইকি কুকুর সমাজ নিয়ে ছোটোখাটো একটা দলও গড়ে তুলতে পারে । কাজেই সে-ও অবুঝ হয়ে ওঠে । তবুও রাতে সুন্দরের পাশাপাশি শোয়, শীতের রাতে একই বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে । বর্ষার দাপট কমে আসতে না আসতেই দেহটা চনমন করে ওঠে। কিন্তু এ পর্যন্ত সুন্দরও যেমন নারী সংসর্গ বর্জিত কুকুরও তাই । হয়তো ছয়দিন ধবে ভাতের মুখ দেখতে না পেয়ে এক ধরেনের গোঁযার্তুমিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে সুন্দর ও কুকুর। বসন্তের ফুবফুবে হাওয়ায় ওরা আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে ।

এসময় সুন্দরকে লোকে কাজে ডাকে । তরমুজ-ফুটি পাকবার সময় তো, রাতে পাহারা দরকাব । শেয়াল ও খাটাস নেমে তছনছ করে দেয় খেত ।

খাওয়া-দাওয়ার বিনিময়ে সুন্দর পাহাবাদার হয় । রাতে শেয়ালগুলো প্রথমে দূবে থেকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু করে । তারপর নিঃশব্দে তরমুজ খেতে নেমে আসে। মাঝে মাঝে দূরে নদীর বাঁক থেকে ওরা যেন ডাক দেয় — সুন্দর চলে এসো । তখন সে হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়ে । ভয় জাগে মনে । কুকুরটাকে তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নেয়। সারা মাঠ তখন নিবিড় এক শূন্যতায়, এক রকম প্রশান্তিতে ঝমঝম ঝমঝম বাজতে থাকে। ঠিক বাজনার শব্দ নয়, তবুও সুন্দরের মধ্যে সবকিছু কেন জানি এলোমেলো হয়ে যায়। তারপর কুকুরটাকে পাঠায় শেয়াল ও খাটাস তাড়াতে । কুকুরও এক দুই চক্কর দিয়ে প্রভুর কাছে এসে শুকনো খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ে । ভোর রাতের দিকে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে । ঘুম থেকে উঠে ফুটি খায় পেট পুরে, তখন নদীর হাওয়া তেতে ওঠে, জুম পোড়া ছাই উড়তে থাকে আকাশ ভরে ।

বিকেল হতেই হাওয়া বঙ্গোপসাগবেব গন্ধ নিয়ে চারদিক জুড়িয়ে দেয় । বসন্তের সেই ঠাণ্ডা হাওয়া আবাব হাসি দিয়ে ডাক দেয — আমাকে মনে পড়ে ? আবেক জন্মে আমি তোমার কি ছিলাম — ভেবে দ্যাখো তো !

৪.

সেই রাতে গরমে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়ল । সুন্দর গরমে ঘামে নেয়ে উঠেছে। নদীর দিক থেকে ঝুপ করে হাওয়া দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল । কুকুরটাও নেতিয়ে পড়েছে। সারাক্ষণ জিব বের করে ফ্যা ফ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে । সারারাত শেয়ালের উৎপাত, মাঝে মাঝে শেয়ালগুলো মানুষের মতো কথা বলে ওঠে, অথচ সুন্দর কিছুই বুঝতে পারে না । কুকুরের তাড়া খেয়ে তারা কী যেন বলাবলি করে চলে গেল ! আহা সে যদি ঠিক সময়ে বুঝতে পারত তাহলে রমিজের দুধের ছেলেটি এভাবে মারা যেত না। দু-চারটা হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি । শেয়ালগুলো খুব উৎসব করে খেয়েছিল ।

শেষে সে চুপচাপ বিছানায় ফিরে এল । খেয়ে যাক শেয়াল । সে পদ্মাসন হয়ে বসে মুহূর্তের মধ্যে চলে যায় অচেনা এক দেশে । কোনো এক জন্মে সে শেয়াল হয়ে জন্মেছিল। তখন অন্যান্য শেয়ালদের সঙ্গে শ্মশান, আখখেত, গৃহস্থ বাড়ির আঙিনা থেকে চুরি করে খেত। শেয়ালজন্মে সে বুঝতে পারত কোথায় ভালো ফসল হয়েছে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে সুন্দর জেগে ওঠে। ছুটে যায় খেতের দিকে। ইতিমধ্যে শেয়ালেরা

অনেক তরমুজ ও ফুটিতে দাঁত বসিয়ে পয়মাল করেছে। শেয়ালরা পানসে তরমুজ ও ফুটি খায় না। দু-এক কামড় দিয়ে ফেলে রাখে। এভাবে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। ঠিক তখনই জেলেপাড়া থেকে নেমে আসে চোর। চারদিক তখন শান্ত। টিন পিটিয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ থেমে গেছে, সব পাহারাদার চোখ বুজে স্বপ্নে ও ঘুমে আচ্ছন্ন। একটি মেয়ে জেলেপাড়া থেকে নেমে এল।

সুন্দরের ঘাসের বিছানার পাশে নুয়ে পড়েছে মেয়েটি। কুকুরটাও ঘুমিয়েছে কি কোথায় গেছে কে জানে? মেয়েটি তার কাছে মিনতি করে চাইল ফুটি ও তরমুজ।

দুদিন ধরে কিছু খেতে পায় নি। সুন্দর এই উপকারটুকু না করলে সে আর প্রাণে বাঁচবে না।

সুন্দরের মায়া হল। কিন্তু পরের জিনিস সে দেবে কি করে? গৃহস্থকে না বলে কিছু দেওয়াতো অন্যায়। মেয়েটি আবার অনুনয় করল, শেয়ালে খাওয়া হলেও চলবে। দাও গো!

ফুটি দিয়েই সুন্দরের মধ্যে অপরাধবোধ ক্রিয়াশীল হল। পরের রাতেও একই ঘটনায় পুনরাবৃত্তি হল। তার শরীর ও মন খিঁচিয়ে উঠল। কেন মেয়েটি তার কাছে আসে! শুধু তরমুজ নাকি আরো কিছু চায়। দেওয়ার মতো কিছুই তো নেই। মাত্র গত রাতেই মেয়েটির সঙ্গে এভাবে পরিচয়। তার মনুষ্যজন্ম থেকে শেয়ালজন্ম ভালো ছিল কিনা সেই তর্কে সে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি। তার ওপর অভিমোহন জেলের বউ এসে তার কাছে সাহায্য চাইছে। মেছুনির শ্যামল যৌবনশ্রীও তাকে তেমন সন্তুষ্ট করতে পারে না। এভাবে পর পর কয়েক রাত কাছে এসে পেট পুরে খাওয়া ভিক্ষে চাইছে। এক জন্মের মধ্যে আরেক জন্ম এসে ভীড় করেছে। কুকুরটি নেতিয়ে পড়েছে। অসুখ-বিসুখ করেছে হয়তো। প্রতিদিন খাওয়া কি সহ্য হয়? এতদিন সপ্তাহান্তে খাবার জুটত, এখন দিনে দু-তিন বেলা খাওয়া সহ্য হয় না। সুন্দর ও কুকুর উভয়েই এ নিয়ে আলাপ করে। মাঝে মাঝে শুয়ে শুয়ে ডাক দেয়, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, টং-এর বাইরে কথা বলতে বলতে ঝিমোয়, আগুনও জ্বলতে থাকে। দূরে পাহারা দেয় কামাল, পুষ্প, কাশেম ও পুতু। আরও দূরে কে কে আছে কে জানে। সীমান্ত পাহারা দেয় সৈন্যরা, তবু চোরা কারবার হয়, আবার ধরা পড়ে জেল হয়। ওরা নিজেরাই পাহারা দেয়, নিজেরাই চুরি করে, আবার চোরও ধরে — ওদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে।

সুন্দর তিন বেলা খেতে পারে না। পেটের নাড়িভুঁড়িরা সহ্য করতে পারে না। কুকুরটা তো পারে না বলে নেতিয়ে পড়েই আছে। শেষে সুন্দর ঠিক করল, আর নয়, — পালিয়ে যাই।

রাত শেষ হওয়ার আগেই সে খড়ের বিছানা থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু শরীর চলতে চায় না। বাতাসে নুয়ে পড়া তরমুজ লতার মতো এলিয়ে পড়ে। সেই মেয়েটি আবার এল। গোটা দুই তরমুজ দাও না গো? সুন্দর প্রথমে চিৎকার করে প্রতিবাদ করবে ভাবে। চিৎকার করে বলবে বুঝি, ভাগ ভাগ! যেন শেয়াল তাড়াচ্ছে আর কি!

জেলে মেয়ে হরসুন্দরী নাছোড়বান্দা। দে না দুটো, বাঁচিয়ে রাখ আমারে। আমিও তোকে বাঁচাব।

হরসুন্দরী ফুটি চাইতে চাইতে ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়ে। তার গায়ে মাছ মাছ গন্ধ। নদীতে মাছ নেই। জাল নেই জেলের, পানিও নেই নদীতে। হাওয়ায় হাওয়ায় যেন বাষ্প হয়ে গেছে খালবিলের জল। পুঁজি নেই যে শুঁটকির ব্যবসা করবে। দে না দু-চারটি ফুটি, তোর কথা জীবন জীবন মনে থাকবে। আরেক জীবনে হলেও তোর ঋণ শোধ করব।

সুন্দর চুপচাপ বসে বসে শোনে। হরসুন্দরী তাঁর কানের কাছে গিয়ে আবার বলে আর সে বধিরের মতো কিছুই শুনতে পায় না। বসন্তের হাওয়ার মতো তো গন্ধ সে বয়ে বেড়াতে পারে না। সূর্যের তেজ নিয়ে চাঁদের মতো মিষ্টি আলো বিকিরণও করতে পারে না। সে যেন শুধু দুর্গন্ধের পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে পড়ে। তার অতীত জীবন একবার উঠে আসে, আবার নানা স্মৃতি ভেসে বেড়ায়।

পরদিন থেকে সুন্দর ভালো মতোই অসুখে পড়ল। কুকুরটাও পড়েছে নেতিয়ে। সুন্দর শুয়ে থাকে তরমুজ খেতের টঙের মাচায়। কুকুরটাও। খেতের মালিকের লোক ভাত নিয়ে আসে। সে চুপচাপ পড়ে থাকে। খেতের মালিক পাকা ফুটি তুলে বাজারে নিয়ে যায়, যাওয়ার সময় বলে যায় সব দেখে-শুনে ঠিকঠাক রাখতে। সে আচ্ছন্নের মতো ফুটির লতাগুল্মের গলা জড়িয়ে ধরে আশ্রয় খোঁজে।

পরদিন আর শক্তি থাকে না পাহাবা দেওয়ার। বসন্তের হাওয়া ভেসে যায় খেতেব ওপর দিয়ে। জুমপোড়া ছাই উড়ে যায়। দাঁড় বেয়ে নৌকো চলে উজান দিকে, জোয়ার আসে হাওয়া নিয়ে। সুন্দর পড়ে থাকে। কুকুরটাও শুয়ে শুয়ে বসন্তের দিন গোনে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে সুন্দর, কষ্ট করে উঠে ভাত খেতে বসে, কিন্তু এক গ্রাসও মুখে তুলতে পারে না। পেটটা যেন দম মেরে আছে। কুকুরও খায় না। সেই রাতে পাহাবা দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। কুকুরটা লেংচাতে লেংচাতে শেয়াল তাড়িয়ে আসে।

সুন্দর খোলা আকাশের নিচে শুকনো খড়ের শয্যায় পড়ে থাকে। কোনো এক জন্মে সে হয়তো মানুষরূপে জন্মেছিল, মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছিল, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছিল — আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করছে। হয়তো কুড়োল হাতে পাছপাদপ কেটেছিল, উপকারী গাছের ডালপালা কেটে ন্যাড়া ও উলঙ্গ কবেছিল। বিকেলের আকাশ ডাক দেয়, সে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে। সুন্দব অনড় পড়ে থাকে তবুও।

রাত বাড়তে থাকে। শেয়াল এসে খেতের ফসল খেয়ে যায়। কুকুরটার ডাকও শোনা যায় না। সুন্দর খড়ের বিছানায় পড়ে থাকে। তবুও তার একরকম ভালো লাগে। শরীবে চটচটে উষ্ণতা অনুভব করে, জ্বর আসে। শেয়াল এসে তার গা চেটেপুটে দেয়? অথবা তার কুকুর বন্ধু অথবা হরসুন্দরী কিনা কে জানে! হয়তো জ্বরের ঘোরে হরসুন্দরী এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, ডেকে নিয়ে যেতে চেয়েছে নিজের ঘরে। হয়তো কুকুরটা খেঁকিয়ে উঠেছে হরসুন্দরীর প্রতি, অথবা কী কী ঘটেছে মনে করতে পারে না কিছুই। তেষ্টায় জল দিয়েছে যেন কে? আর কিছুই মনে পড়ে না। বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম।

৫.

কয়েকদিন পব সুন্দব পাড়াব দোকানের গুদাম ঘরে আশ্রয় নেয়। দু-একজন এসে তাকে দেখে। হরসুন্দরী মাছ বেচতে এসে খবর নিয়ে যায়। বৃষ্টি হয়ে গেছে কযেকদিন। মাছেবা ডিম ছাড়তে নদীর উজানে ছোটে। হাতজাল নিয়ে লোকজন নদী ও খালে ছোটাছুটি করে। সে প্রলাপ বকতে থাকে বিড়বিড় কবে। প্রলাপের একটি কথাই শুধু বোঝা যায়, মানুষ মানুষ। আর কেউ দেখে না সুন্দরকে। সে অসুস্থ হয়েও কাউকে কিছু বলে না, সাহায্যও চায় না। মাঝে মাঝে কুকুরটাকে ডাকে, কোনো মতে উঠে পানি খাওয়ায়, নিজেও খায়। হরসুন্দরী এলে তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয় সে। জীবনে তার একটি পাপ খেত মালিককে না বলে হবসুন্দরীকে ফুটি দেওয়া, তবুও তার সান্ত্বনা শেয়ালের উচ্ছিষ্ট দিয়ে সে হরসুন্দরীকে বাঁচিয়েছে। নইলে হয়তো হরসুন্দরী চুবি করত, অথবা খেতে না পেযে মরতে বসত।

কিন্তু দোকানেব গুদামে তো এভাবে থাকা যায় না। দোকানদার মঝু একজন রুগ্ণ লোককে ওখানে রাখতে চায না। এক সময় সে দোকান পাহারা দিত মঝুর সঙ্গে। সেই সুবাদে আর কদিন সহ্য করবে মঝু। সুন্দর দিনের পর দিন তার পুবোনো দিনের স্মৃতি ফিরে পায়। সবকিছু মনে পড়ে যায়। মা-বাবাকে হারিয়ে খুব ছোটোকাল থেকে অসহায় অকূলে পড়েছিল। মামাব বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও একদিন বেরিয়ে পড়ল। এক সময় শুরু হল শ্রমণ জীবন। সে একাগ্র হয়ে সাধকের জীবন খুঁজল। কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে সে-জীবন থেকেও সে প্রতারিত হয়। তার মস্তিষ্কে গোলযোগ শুরু হল। এখন সে পড়ে আছে একটি গুদাম ঘরে, তাকে দেখাব কেউ নেই, মঝু বিরক্ত হচ্ছে, হরসুন্দরী তাকে করুণা কবছে।

আস্তে আস্তে ক্ষুধা তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল। খুব ইচ্ছে করছে থালাভর্তি ভাত নিয়ে বসে। পিড়ি পেতে শাক-সবজী ও ডাল-মাছ দিয়ে খায়। ডালে একটু ফোড়ন,

গরমভাতে একটু ঘি, পুদিনা পাতার চাটনি, শুঁটকির ঝাল — কতদিন সে পেট ভরে খেতে পায় না, কেউ মমতা ভরে খেতে ডাকে না, এটা খাও ওটা খাও বলে কৃত্রিম রাগে শাসন করে না কেউ। খিদেয় ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, গা গুলিয়ে বমি আসে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে আসে। মঝু দূব থেকে দেখে যায়, গজগজ করে, কুকুরটা নেতিয়ে আছে। আপদটাকে প্রথমে ঘরে ঢুকতে দেয় নি মঝু। পরে করুণাবশত হোক কিংবা পাহারাদারের সঙ্গী ভেবে হোক রেহাই দিয়েছে। পিট পিট তাকিয়েও দেখে না আর, অনেকক্ষণ আগে বাইরে নিয়ে পানি খাইয়ে এনেছিল সুন্দর, সেই থেকে পড়ে থেকে এ-কাত ও-কাত হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সুন্দর ভাবে এক জায়গায় ঠায় পড়ে বেদম ঘুমাচ্ছে না কি তার মতো মটকা মেরে পড়ে আছে কে জানে! আরেক জীবনে কুকুরটি তার বন্ধু ছিল হয়তো, হয়তো মনে পড়ে যায় কুকুর জন্মেব মতো এক জীবনের কথা।

অনেক কষ্টে উঠল সে। শরীর চলে না, দুলছে। কুকুবটাকে ডেকে তুলল, বেরিয়ে গেল মঝুর সামনে দিয়ে। মঝু একবার আড়চোখে তাকাল শুধু, কিছু বলল না। ভাবল আবার তো আসবে, যাবে আব কোথায়! বিহারে গিয়ে লাভ নেই, রাতে সেখানে খাবার মিলবে না। কার বাড়িতে যাবে? সত্যিই যাবেই বা কোথায়? যখন সে শ্রমণ ছিল গ্রামের সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতো। পাত্র ভরে অন্ন দিত, বড়-ছোট সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত, উৎকৃষ্ট খাবাব দিত সকাল ও দুপুরে। রাতে তো কিছু খাওয়াব নিয়ম ছিল না — সাধনা কবলে তার দবকাবও পড়ে না।

আজ কতদিন ধরে ভাত খায় না সে। কতদিন তাও মনে পড়ে না। শরীর গুলিয়ে পিত্তি বেরিয়ে আসে। পেট আব পিঠের চামড়া এক হয়ে গেছে, পেটেব ভেতবে কিছু চালান কবতে না পাবলে সেই চামড়া খুলবে না। খাওয়ার জন্য সে হন্যে হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে শুরু কবল। মুখ ফুটে বলতেও পারে না। এখন তাব মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল, তাব গত এবং উদভ্রান্ত জীবনেব সবকিছু ভাসছে চোখেব সামনে। তাব শ্রমণ জীবনেব শুদ্ধাচাব, মস্তিষ্ক-বিকৃতিব জন্য শ্রমণ জীবন ত্যাগ — সবই মনে পড়ে। জীবনকুমাবের বাড়িতে গেল সুন্দব। বাড়িব সবাই খেযে নিয়েছে। কাজেই তাব সঙ্গে দু-চাবটা কথা বলে তাকে বিদায় কবে দিল। সোনাদের বাড়িতে গেলে প্রথমে তাবা হুঁকোটা বাড়িযে দেয় তার হাতে। খালি পেটে তামাক খেলে একটা কেলেঙ্কাবি কাণ্ড ঘটে যাবে সে জানে। কিন্তু লোভ সামলানো মুশকিল। বসন্তেব বাড়িতে সোজা না করেছিল। এভাবে আরও কয়েক বাড়িতে গিযে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

চরে তরমুজ-ফুটিও নেই যে গিযে হাত পাতবে। বোশেখ শেষ, জষ্ঠির ঝড়-বাদলা শুরু হয়েছে বর্ষাব মতো। যাদের বাড়িতে সে কাজ কবেছিল তারাও তাব দিকে তাকায় না, ভাবে আপদটা গেলে বাঁচি। তাছাড়া এখন তো সে সম্পূর্ণ সুস্থ, সবকিছু মনে কবতে পারে। কুকুবটাও তাকে বুঝতে শিখেছে, লেংচাতে লেংচাতেও পিছু পিছু হাঁটছে, পাড়াব লোকজন যে তাব দিকে নজব দিচ্ছে না তা বুঝে নিতে তার কষ্ট হয় না।

অনেক ভাবল সে। হরসুন্দবী একদিন না খেয়ে মবার কথা বলে সাহায্য চেয়েছিল বলে সহ্য কবতে পারে নি। আর একদিন এসে জীবনেব কথা শুনিয়েছিল, অন্যদিন যৌবন-ধর্মের শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। অনেক ভাবল সে। অনেক ভেবে বিহারে পৌঁছল গভীর বাতে। খিদেয় তখন তার বোধ-বুদ্ধি ও সংজ্ঞা নেই। কুকুরটাও আগেভাগে গিয়ে উঠেছে বাবান্দায়।

সিঁড়ির গোড়া বেয়ে মালতীলতাব ঝাড় উঠেছে। কামিনী ও অশোক গাছের সাবি দাঁড়িযে আছে বারান্দা ধরে। বিহাবের দেয়ালের গাযে গৌতমের জন্ম ও জীবন-কাহিনী ফ্রেসকো করা। বুদ্ধের পাঁজর-সর্বস্ব গান্ধারার মূর্তিটির দিকে নিজের অজান্তে মনে মনে সে এগিয়ে গেল। সেই আড়াই হাজাব বছর আগে বুদ্ধেব একান্ত প্রিয় সহচর ছিলেন ভিক্ষু আনন্দ। আর এই জন্মে তার নাম কেন সুন্দর হল? কুকুরটা কেন তার কাছ ছাড়া হয় না?

আস্তে আস্তে সে বিহারের গোলবাবান্দায় উঠে দাঁড়াল। গোলবারান্দার পেছনে চলে গেল। দেয়ালের গায়ের ফ্রেসকোর গল্প তাকে পেয়ে বসল। চণ্ডালিকা জলদান কবছে তৃষ্ণার্ত

ভিক্ষু আনন্দকে। গণ্ডুষ ভরে পান করলেন তিনি। সেই চণ্ডালিকা ভুল বুঝল, মোহ এসে গ্রাস করল চণ্ডালিকাকে, ভাবল সেই বুঝি ভালোবাসা!

সুন্দর শুয়ে পড়ল সেখানে। কুকুরটা কোথায় কে জানে! জ্বরে তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়। ওঠার শক্তি নেই — হরসুন্দরীর কথা মনে পড়ে। এপাশ ওপাশ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেয়ালের গায়ের কাহিনীর ভগ্নাংশ — কুকুরজাতক, জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী — কল্পান্ত শুরু হয়ে যায়। হরসুন্দরী ছুটে আসে বুঝি তাকে দেখতে!

রাত কেটে যায়। সকাল হতেই ঘুম আসে চোখে। সারাদিন আর হুঁশ নেই। লোকজন বিহারে এসে তাকে দেখে যায়। সে বেহুঁশ পড়ে থাকে। দিনের পর দিন কেটে যায়, আবার রাত নামে। সে স্বপ্নে দেখে — কে যেন তাকে গণ্ডুষ ভরে জলদান করছে। তার সমস্ত শরীর শীতল স্পর্শে জুড়িয়ে যায়। কে যেন আদর করে ডাল-ভাত তুলে ধরে মুখের কাছে। তৃপ্তি ভরে সে খায়। দু মুঠো গরম ভাত, ডাল শাক মাছ — জীবনে এত তৃপ্তি ভরে সে কোনোদিন খায় নি। ঘোমটা মাথায় হরসুন্দরী তাকে খেতে দিয়েছে। এত মমতা কেউ তাকে কখনো দেখায় নি, এত ক্ষুধা কোনোদিন অনুভব করে নি, তৃপ্তিও পায় নি কোনোদিন। হরসুন্দরী ডাকল, আর কি খেতে ইচ্ছা করে বলো। পেট ভরেছে তো!

এই অবস্থায় এক রাতে ওষুধ-পথ্য কিছু না পেয়ে পাঁচ দিন থাকার পর সুন্দরের মৃত্যু হল। একই সময়ে কুকুরটিও গেল। ভোরে বিহারে আগত সবাই সে-দৃশ্য দেখল — কুকুরকে জড়িয়ে ধরে সুন্দরের মৃতদেহ পড়ে আছে।

হারুণ হাবীব

তাহাদের কথা

ওর ভাষা হিন্দি নয় কিন্তু আমাদের সবার সাথে হিন্দি ভাষাই ব্যবহার করতো গুরবখ সিং। প্রথম প্রথম মাত্র দু-চারটে শব্দই কেবল বুঝতে পারতাম। তাও আবার যেগুলো বাংলার সাথে মোটামুটি খাপ খায়। পরে অবশ্য গুরবখ সিং যা বলতো - তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমরা বুঝতাম। তাছাড়া ও নিজে পাঞ্জাবী বলে হিন্দির সাথে যখন-তখন ওর কিছু আঞ্চলিক শব্দ, এমনকি বাক্য পর্যন্ত বলে ফেলতো, যা উদ্ধার করা আমাদের অনেকের পক্ষেই রীতিমতো অসম্ভব ছিলো।

কম করেও ছয় ফুটের দীর্ঘ শরীর গুরবখ সিংয়ের। পেঁচানো পাগড়িতে অবরুদ্ধ মাথা আর চুলদাড়ি। পৃথিবীর তাবৎ মানুষের মধ্যে সে কারণেই হয়তো শিখদের আলাদা করে দেখবার সুযোগ আছে।

গুরবখ সিং ছিলেন আমাদের ট্রেনিং ইনস্ট্রাকটর। অর্থাৎ প্রশিক্ষক। ওকে সবাই আমরা ওস্তাদজী বলে সম্বোধন করতাম। এই ওস্তাদজীর কাছেই যুদ্ধাস্ত্র চালনার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলাম আমরা অনেকে। অবশ্য দেশি ইনস্ট্রাক্টরও পেয়েছিলাম পরের দিকে। সে কারণে সিংজী ছিলেন আমাদের মনে রাখার মতো ব্যক্তি।

ওস্তাদজীর জন্মস্থান পাঞ্জাবের কথা মনে হতেই ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা মনে পড়ে আমার। তেমন বড়সড় হয়ে উঠিনি তখনো। তবুও একেবারে যে ছোট ছিলাম-তাও নয়। এর পরও স্বীকার করতে বাধ্য যে অন্ততঃ পাঞ্জাব সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা ছিলো না তখন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম কলেজের ছাত্র, সবেমাত্র মাধ্যমিক পাশ দিয়ে কলেজ স্টুডেন্ট। তাই ওই বয়সে এবং ওই সময়ে ইতিহাস আর পররাষ্ট্রনীতির খোঁজ না রাখলেও চলতো আমাদের।

একদিন হঠাৎ শুনলাম, পাকিস্তানিরা আর হিন্দুস্থানিরা লড়াই শুরু করেছে পাঞ্জাবের খেমকারান সেক্টরে। প্রতিদিন বিকেলে তখন সিরাজ মিয়ার দোকানে বসে ইত্তেফাক আর আজাদ পত্রিকা পড়তাম ক'জনে মিলে। কী ভীষণ উৎকণ্ঠা আমাদের! জীবনে সেই প্রথম যুদ্ধের খবর পড়ার অভিজ্ঞতা।

ঢাকা থেকে আসা পত্রিকাগুলি পড়ে মোটামুটি যা ধারণা হতো, তা হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা হিন্দুস্থানি সৈন্যদের হটিয়ে প্রতিদিন অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব খবর পড়তে গিয়ে আমার রীতিমতো ধারণা হয়েছিলো—যুদ্ধে এভাবে সাফল্য অর্জিত হতে থাকলে দিল্লী কব্জা করে নেয়াটা আর অসুবিধে কোথায়! ইচ্ছে করলেই তো বিজয়ীর বেশে আমরা দিল্লির লাল কেল্লা পর্যন্ত চলে যেতে পারি। ভিনদেশি মোঘল আর বেনীয়া ইংরেজ যেভাবে দিল্লি দখল করেছিলো, ইচ্ছে করলে আমরা পাকিস্তানিরাও আধুনিক যুগের দিল্লী দখলদার হতে পারি।

রেডিও পাকিস্তান থেকেও সে সময় ক্রমাগত বিজয়ের খবর প্রচার করা হচ্ছিলো। হতে পারে, আমি তখন যুদ্ধের 'প্রপাগাণ্ডা' ব্যাপারটা বুঝতাম না। কিন্তু দেশ আমার পাকিস্তান। হলোই বা পূর্ব আর পশ্চিমের বিস্তর ফারাক, হ'লামই বা আমরা বাঙালিরা শোষিত আর ওরা

শোষক। তবু-তো আমরা পাকিস্তানি বটে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে দেখতাম নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করছেন। রীতিমতো চোখের পানি ফেলছেন। আল্লাহ হিন্দুস্থানের পরাজয় দাও, পাকিস্তানের বিজয় দাও। হে আল্লাহ, হে রাহমানুর রহিম, বিধর্মীদের দোজখে পাঠাও। ভদ্রলোককে একদিন আমি এমন আকুল হয়ে কাঁদতে দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে বাধ্য হ'লাম, - 'চাচা, আপনি চাইলেই কি এসব ঘটবে বলে আপনার বিশ্বাস ?'

সদ্য তিনি জায়নামাজ থেকে উঠেছেন। চোখগুলো বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,— 'একজন মুসলমান খাস দিলে যা চায় খোদাতালা তা দান করেন। জেনে রেখ, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। বাবাজী, দেশপ্রেমিক না হলে ঈমানদার হওয়া যায় না।'

খোঁজ নিয়ে দেখেছি অনেক গোড়া হিন্দুও ঠিক একই রকমের প্রার্থনায় লুটিয়ে পড়েছেন মন্দিরের দেবী প্রতিমার পায়ে। সবাই এরা বিধর্মীদের পরাজয় চায়। অথচ নফল নামাজ, মোনাজাত কিম্বা পূজাঅর্চনা করে যুদ্ধে জেতা সম্ভব বলে আমার একদম বিশ্বাস হতে চায়নি সে সময়। এই বয়সে সে বিশ্বাস তো নেই-ই।

যদ্দুর মনে পড়ে, রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে বারবার প্রচার করা হচ্ছিলো : ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান, পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্ট, জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক ভাষণ রাখবেন। সে ভাষণের গোটাটা আমি এবং আমার বন্ধুরা আব্দুস সাত্তারের বইয়ের দোকানে বসে পুরনো এক মার্ফি রেডিওতে শুনেছি। রেডিওটা পুরনো হলে কি হবে — আওয়াজটা গমগমে। দুর্দান্ত প্রতাপশালী মিলিটারি প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সম্ভাবনার জমিনে সেনাবাহিনীর বুল ডজার চালাবার প্রথম ঐতিহাসিক ইঞ্জিনিয়ার। মাত্র বছর কয়েক আগেই ইস্কান্দার মীর্জাকে হটিয়ে রাজধানীর কর্তৃত্ব দখল করেছেন বন্দুকের জোরে।

দীর্ঘক্ষণ ভাষণ রাখলেন প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে। উর্দু এবং যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজি বয়ানে যা তিনি বল্লেন তার সবকিছু মনে নেই এখন। প্রায়-অন্ধকার আকাশ ফেটে প্রচন্ড বাজ পড়ছিলো সেদিন। কোনটা যে আইয়ুব খানের বাজখাই গলার আর কোনটা যে আসমানের — তা বুঝে নিতে রীতিমতো কষ্ট হয়েছিলো আমাদের। তবে ভাষণের একটি ইংরেজি বাক্য আমার মনে ধরা আছে। 'উই আর এ্যাট ওয়ার', অর্থাৎ আমরা বা আমাদের পাকিস্তান এখন যুদ্ধে। আর এ যুদ্ধ হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে জেহাদ। সুতরাং মার এবং মর। দুষমন খতম কর।

একদিকে ফিল্ড মার্শালের জ্বালাময়ী ভাষণ অন্যদিকে মুসলিম লিগের নেতা আর রাজনৈতিক মোল্লাদের প্রচারণায় প্রাণ আমাদের ওষ্ঠাগত তখন। এ ধরনের প্রচারণাগুলো আমাদের ভয়ংকর ভয়েরও কারণ হয়েছিলো। মোল্লারা আর মুসলিম লিগাররা বলতে থাকলো, আর দেরি নেই, এইতো এলো হিন্দু বিধর্মীরা। হিন্দুস্থানি জেট ফাইটারগুলি পাগলা মোষের মতো গোঁ গোঁ করে এ্যাডভান্স করছে ঢাকার দিকে। মাথার ওপর বোমা পড়তে আর দেরি নেই। কেউ আবার বললো, শুধু আকাশ পথে নয়-স্থলপথেও এ্যাডভান্স করছে শিখ আর গূর্খা বাহিনী। পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত পেরিয়ে ইন্ডিয়ান ট্যাংক বহর এখন রাজধানী ঢাকার পথে। বাঁচার উপায় নেই। একমাত্র উপায় এখন রাহমানের রাহীম—যিনি বিশ্বাসীদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সত্যি বলতে কি, আমি এবং আমার কলেজের বন্ধুরা সেদিন অসম্ভব অসহায়ত্ব বোধ করতে শুরু করেছিলাম। নিজেদের কাছেই নিজেরা একটার পর একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম। সত্যি সত্যি যদি পাঞ্জাব ফ্রন্টে শক্ত বাধার সম্মুখীন হয়ে ভারতীয়রা কৌশল পরিবর্তন করে বেঙ্গল ফ্রন্টে অগ্রসর হয়-তাহলে কি হবে ? পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে হাতে গনা মাত্র কয়েকজন বাঙালি। ট্যাংক, যুদ্ধবিমান আর সৈন্যসামন্ত যা আছে—সবাই ওই পাকিস্তানে। বাঙালি 'মার্শাল ন্যাশন' নয় — এই অপবাদে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে পর্যন্ত আমাদের পরিত্যক্ত করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পূর্বপাকিস্তানের মানুষ আজ অরক্ষিত। শত্রু ইচ্ছে করলেই দখল করে নিতে পারে।

তা ছাড়া, ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে পাঞ্জাবী, বালুচ কিম্বা সিন্ধিরা জান দিতে যাবে কোন দুঃখে ? এই বঙ্গভূমির জন্য মরতে পারে কেবল তো বাঙালি। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারে কেবলই মাটির সন্তান ।

তবে আমার বা আমার বন্ধুদের সংকট দূর হয়েছিলো ক'দিনেই । ভারতীয় বাহিনী শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল ফ্রন্টে আক্রমণ করেনি । লাহোর আর অমৃতসরেই গোলাগুলি যা হবার হয়েছে। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে পূর্ব আব পশ্চিম পাঞ্জাবেব মাটি । মানুষ মরেছে, যে মানুষের মৃত্যুর উপলক্ষ্য হয়েছে তার ধর্মের পরিচয় । কেউ হিন্দু কেউ বা মুসলমান। কোনো সামরিক শাসক মরেনি, কোনো রাজনৈতিক নেতা মরেনি । যুদ্ধে কেউ ওদের নিহত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, হয় সাধারণ মানুষ ।

গুরবখ সিংকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিনই হঠাৎ মনে পড়ে পাঁচ বছর আগেকার ভাবত-পাকিস্তানের যুদ্ধটার কথা । যুদ্ধ মানেই ধ্বংস আর বক্তপাত । যুদ্ধ মানেই রাষ্ট্র নায়কদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার চেহারা দেখবাব সুযোগ । অথচ যুদ্ধ মানেই এই পৃথিবীর স্বাধীনতা । যুদ্ধ নিয়ে তাই আমাব নিজেবও সংকট কম ছিলো না । যে আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি সেই আমিই আজ ভিনদেশি মাটিতে এসে ওস্তাদ গুরবখ সিংযের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখছি । এ ছিলো আমার কাছে এক অসহনীয় সংকট — যা এখনও অমীমাংসিত । তবে আমার যুদ্ধ যে সাধারণ এক যুদ্ধ ছিলো না — সে আমি বুঝতাম । এরপরও সংকট কাটেনি । কারণ ধ্বংস আর মৃত্যুকে বাদ দিয়ে আমার যুদ্ধও হয়নি । আমি যুদ্ধ চাইনি, তবু যুদ্ধ করেছি, কারণ আমি স্বাধীনতা চেয়েছি !

ক্যাম্পের তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে গভীর রাতেও ঘুম হতো না কখনো কখনো । শুধু আমি নই আমাদের অনেকেবই । পলাশের, মুজিবের, কামালুদ্দিনের, এমনকি আমাদের অন্যতম প্রশিক্ষক এবং দুর্দান্ত কমান্ডার আকরাম ভাইয়েরও । ঘুমহীন সেই রাতগুলিতে কম্বল পেঁচিয়ে মুখ ঢেকে ত্রিপুরাব জঙ্গলে শুয়ে শুয়ে আমরা সীমান্তের ওপারে অবরুদ্ধ স্বদেশভূমি দেখতাম। দেখতাম আমাদের বাবা-মা, বোনভাই, কারও বা স্ত্রী সন্তান, প্রেমিকার মুখেব ছবি । মাত্র ক'দিনেই কি মানুষ এতোটা নষ্টালজিক হয় ? হয় যে তা আমরা নিজেবাই বুঝছিলাম । বোধকরি এব বড় কারণ ছিলো যুদ্ধ — যা অরণ্য পুড়িয়ে আগাছা পরিস্কার করার মতো যুক্তিতে সমৃদ্ধ — অথচ নিঃসন্দেহে তা ধ্বংসযজ্ঞ ।

আকরাম ভাই ইপিআর-এ চাকরি করতেন । একজন জোয়ান থেকে প্রমোশন পেয়ে লেন্স লায়েক পর্যন্ত হয়েছিলেন । পনের পছরের চাকরি শেষে প্রাক-অবসর ছুটি কাটিয়ে ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন তিনি । কিন্তু দ্রুতযান ট্রেনটা কমলাপুব স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতেই রাত এগারোটাব মতো হয়ে গেল । বাতে পিলখানায় পৌঁছতে পারবেন না তিনি । ঢাকার সড়ক তখন যানবাহনশূন্য । পিলখানাব গেটগুলিতে ইদানীং বাঙালিদের ডিউটি দেওয়া হচ্ছে না। চারদিকে চলছে জ্বালাও পোড়াও । মিলিটারিবা গুলি করছে ছাত্রদের মিছিলে ।

কাজেই স্টেশনে রাতটা কাটিয়ে ভোবে পিলখানায় গিয়ে রিপোর্ট করাই সঠিক হবে — এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি । কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাকে সে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো । রাত বারোটার দিকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক আর মেশিনগান দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা একযোগে আক্রমণ করে বসলো রাজারবাগের পুলিশ লাইন আর ইপিআরের পিলখানা । স্টেশন থেকে পূবদিকে, উত্তর দিকে যে যেদিকে পারলো জীবন বাঁচাতে ছুটে চললো যাত্রিরা । এমন গোলার শব্দ ঢাকা শহরে কখনো হয়নি । কান ফেটে যায়, বুক ভেঙ্গে যায় ।

আকরাম ভাই পিলখানায় আর ফিরে যেতে পারেন নি । নিরাপদও মনে করেন নি। ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞের কিছুটা চিত্র তিনি নিজের চোখে দেখেছেন । একজন বাঙালি বলেই উত্তেজনায় তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন সে রাতে । আজ যদি একটা রাইফেল হাতে থাকতো ? একজন দস্যুকে খতম করে মনের জ্বালা অন্ততঃ মেটাতে পারতো সে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি তার । রংপুরের বাড়িতেও আর ফিরে যাওয়া হয়নি ।

সামনাসামনি লড়াই শুরু হলো মার্চ মাসের শেষ দিকে । ওর স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান জন্ম

দেওয়াব দিনক্ষণ ছিলো নভেম্বর কি ডিসেম্বরে। আকরাম ভাই এমন কঠিন মানুষ যে তার মেয়েটির নাম পর্যন্ত সে আমাদের কোনোদিন বলতে চায়নি। আমার নিজের মধ্যে বোধকবি এক ধবনের অন্তর্দৃষ্টি জন্ম নিয়েছিলো তখন। কারণ আমাদের অন্যতম প্রশিক্ষক এবং দুঃসাহসী কমান্ডার আকরাম ভাইয়ের চোখ দেখেই কেন যেন আমি বলে দিতে পারতাম ভেতরে ভেতবে সে ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেন সে তার নিজের কথা বলতে চাইতো না — তা আমি বুঝতে পারতাম। এই ভয়ংকর দিনে আকরাম ভাই নিজেকে দুর্বল করতে চাইতো না। তার পরিবারের খবর জানতে চেষ্টা করতো সে যথেষ্ট গোপনে, মনের দুর্বলতা বোঝাতে চাইতো না কাউকেই।

একদিন রসিকতা করে বলেছিলাম, — 'আপনাব যদি ছেলে হয় তাহলে নাম বাখবেন বিজয়, আর মেয়ে হলে বিজয়া।'

এমন একটি কথাতেও আকরাম ভাই নিরব থেকেছিলেন। শুধু বলেছিলেন, 'ইউসুফ, তোর এখন ঘুমানো উচিত। ভোরে উঠতে হবে।'

বিশালগড়ের পাহাড় কাটা ক্যাম্পগুলিতে বেশ কয়েকদিন ধরেই আলো জ্বালানো হচ্ছে না। মিলিটারি ভাষায় একে বলে 'ব্ল্যাক আউট'। শত্রুপক্ষ যেন আমাদের অবস্থান বুঝতে না পারে — তারই কৌশল। সে রাতেও 'ব্ল্যাক আউট' ছিলো। দিনেব বেলাতে কসবা-আখাউড়াব দিক থেকে পাকিস্তানি সৈন্যবা প্রচুব কামান দেগেছিলো। সন্ধ্যার দিকে মাইল বিশেক দূরেব ক্যাম্পে বসে প্রাথমিক খবর পেয়েছি ; বেশ কয়েকটি গোলা এসে পড়েছে আগবতলা এয়ারপোর্টে, বাকিগুলো বর্ডার এলাকাব কিছু ঘববাড়িতে। কতজন হতাহত হলো তার সঠিক তথ্য জানা হয়নি, তবে ওদের বেশির ভাগ দেশত্যাগী শরণার্থী। বাকিরা ত্রিপুরাবাসী। বুঝতেই পাচ্ছিলাম, পাকিস্তানিরা শুধু স্বদেশী নয়-ভিনদেশিদের ওপরও আঘাত হানতে শুরু কবেছে। কারণ ওদেব ভয় শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গেব কলোনিটা বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়।

এ সব নিয়ে গল্প করতে করতে এক সময় সবাই আমবা চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। কাবো মুখে কোনো কথা ছিলো না। কখনো কখনো এভাবেই নিবব হয়ে যেতাম আমবা। কেন যে যেতাম তা আজ আব বলতে পারবো না। হঠাৎ তাঁবুর এক কোনায় শোযা আকবাম ভাই বলে ওঠলেন, — 'কি বে ইউসুফ — এখনো ঘুমাস নি ?'

আমি একদম ঘুমাইনি। বার কয়েক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঘুম আসছিলো না। বললাম, 'না আকরাম ভাই, ঘুম আসছে না। চেষ্টা কবছি।'

'ঘুম না ধরলে একশ'বার জয়বাংলা গুনতে থাক। ঠিক ঘুম পাবে।'

বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। বুঝতে পারলাম না তিনি নিজে ঘুমালেন না জেগে রইলেন। আমি আমার কমান্ডাবের নির্দেশ মতো এক-দুই-তিন-চার করে জয়বাংলা উচ্চারণ করতে থাকলাম। কিন্তু গনাটা কিছুতেই এক সাথে ষাট-সত্তরেব ওপরে নিতে পাচ্ছিলাম না। হিসেবে বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছিলো। মনে পড়লো, ঘুম না পেলে একশ' পর্যন্ত এক-দুই-তিন-চার করে নামতা পড়তে বলতেন মা। অনেক পর মা'র চালাকিটা অবশ্য ধরে ফেলেছিলাম। কলেজ হোস্টেল থেকে সোজা চলে এসেছি আমি সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরার পাহাড়ে। মা'র মুখটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে হঠাৎ।

আমাদের তাঁবুর আশপাশ থেকে জংলি পোকাগুলো বিশালগড়ের ক্যাম্পটিকে লক্ষ্য কবে ওদের ভাষায় অনর্গল কি সব বলে যাচ্ছিলো তখন। এর আগে আমি কোনোদিন কীটপতঙ্গের ভাষা বুঝতে পারার দাবি করিনি। কিন্তু, সে-রাতে মনে হলো, আকরাম ভাইয়ের নির্দেশ মতো এক-নাগারে একশ' বার জয়বাংলা গুনে শেষ করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ত্রিপুরার শাল বনের এই কীট পতঙ্গগুলিও আমাকে সাহায্য করতে চাইছে। রাত যত গভীর হতে থাকলো, এবং যদ্দুর পর্যন্ত ঘুমে আমার শরীরটাকে অবশ না করে দিল, ততক্ষণ আমি সেই গুঞ্জণ শুনলাম। ত্রিপুরার পাহাড়গুলি সে কারণেই আমার মতো মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির জমিন।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় 'ফল ইন' হয আমাদেব। নায়েক সুবেদার গুরবখ সিং প্রথমে

আমাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে যুদ্ধের প্রাথমিক কলাকৌশল বুঝিয়ে দেন । এবপর স্টেন, থ্রি.নট.থ্রি. আর.এস.এল.আর. যুদ্ধাস্ত্রগুলির অঙ্গপ্রতঙ্গ খুলে বুঝিয়ে দেন — এর কোনটার কি কাজ। কোনটা ম্যাগজিন, কোনটা বাট, কোনটা ট্রিগার, কার্তুজ কি করে ভরতে হয় ইত্যাদি। অন্যদিকে আকরাম ভাই তালিম দেন চায়নিজ বাইফেল আর মর্টারের। এ সব শিক্ষা চলছে সপ্তাহ খানেক ধরেই । গুলি ছোঁড়া রপ্ত করা, লক্ষ্যবিন্দুতে বিদ্ধ করা, আঘাত হানা এবং তৎক্ষণাৎ পালিয়ে আসা ইত্যাদি কতকিছুর বিদ্যা জানা হয়ে গেল আমাদের সামান্য ক'দিনেই। সেই সাথে গ্রেনেডের পিন খোলা । নির্দিষ্ট দূরত্বে নিক্ষেপ কবা ।

গুরবখ সিংহের শরীররটা এমন বলশালী ছিলো যে আমার কাছে একেকবার মনে হতো, আমাদের ওস্তাদজী যেন সিলেটের চা বাগানের প্রাচীন কোনো শীল কড়ই গাছ। আঘাত করে কিছুই করা যাবে না । সিংজী ছিলেন ভাবতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীব এক নায়েক সুবেদাব । পদবিটা মোটেও বড় কিছু নয় । কিন্তু আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পেব হবু মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সিংজী ছিলেন অনন্যসাধাবণ এক ব্যক্তিত্ব । প্রশিক্ষক হিসেবে শুধু নয় — ওকে আমবা ভালবাসতে শুরু কবেছিলাম ওর ব্যাক্তিত্ব আর অমাযিক ব্যবহাবের জন্যেও ।

গেল তিন সপ্তাহে বন পবিস্কাব করে ভারতীয সীমান্ত বক্ষী বি.এস.এফ আর স্থানীয প্রশাসন আমাদের জন্যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছে । শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সবকার আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সাহায্য করবে । ব্যাপারটা অনেকটা বোঝাই যাচ্ছিল ।

ক্যাম্পটার দুই পাশে প্রায পঞ্চাশটাব মতো তাঁবু—যাতে আমরা বাত কাটাই, কখনো বিশ্রাম নেই । তাঁবু গুলি চল্লিশ পাউন্ডের । এসবেব হিসেব আগে কখনোই জানতাম না ; কারণ তাঁবুর জীবনে কখনোই আগে অভ্যস্ত হইনি । তবু এই তাঁবুই আমাদের সম্বল হযেছে ভারত সীমান্তের এই পাহাড়ে । সূর্য উঠতেই তাঁবুগুলির ফাঁক দিযে কড়া আলো ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধিযে দেয । বাতে পাহাড়ি জীবজন্তু আর কীটপতঙ্গরা ফাঁকফোঁকর দিয়ে ঢুকে আচমকা ঘুম ভাঙ্গায় । কখনো হঠাৎ আতংকগ্রস্ত করে। তবু মন্দ কাটেনি সময়টা । অনেকটা বনভোজনে আনন্দকষ্টেব যৌথ আবহে সময কাটানোব মতো ।

আমাদের ক্যাম্পটার মাঝখানে লম্বা বাঁশের আগায় বাংলাদেশের একটি পতাকা উড়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত । ওই আমাদের প্রাণেব পতাকা - যাকে চিরদিন উড়তে দেখতে চাই আমরা মাতৃভূমিতে । বামগড়, সাব্রুম আর কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বেঙ্গল বেজিমেন্টের দেশপ্রেমীক সৈন্যবা ধর্মনগর, কৈলাসহর, সোনামুড়া, তেলিযামুড়া, বিলোনিয়াতে শিবিব করে সীমান্তেব উল্টোদিকে পাকিস্তানিদেব প্রতিরোধ কবতে শুরু করেছে । মেজর খালেদ মোশাবরফ তার সেক্টারের হেড কোযার্টার্স বসিযেছে মেলাঘবে। সেখানে দিনেবাতে ট্রেনিং হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের । বিলোনিয়া, শ্রীমন্তপুর, মতিনগর, অমবপুর এমনকি আগরতলা পর্যন্ত হয়ে উঠেছে আমাদেব স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব ভালবাসার আঙ্গিনা । আমাদেব ক্যাম্পটিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে সাধাবণ ছাত্র গেবিলাদেব — যারা কেবল প্রাথমিক প্রশিক্ষণেব পর বিভিন্ন সেক্টবেব আওতাভুক্ত হবে । ভারতেব ডেল্টা হেডকোয়ার্টার্স গোটা অঞ্চলেব যুদ্ধ কর্মকাণ্ডই পর্যবেক্ষণ কবছে ।

এই অঞ্চলের পাহাড়ে তখন জাঁকালো ঠাণ্ডা । কম্বলেব নিচ থেকে কুয়াশা ঘেবা ভোবে লাফিয়ে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্যান্ট আব বুট পবি আমবা । চামড়া ভেদ কবা শীতেব ছুবি প্রথম দিকে বেশ কাবু করে ফেলেছিলো । অবশ্য তখনই প্রথম বুঝতে শিখেছি, এই পৃথিবীতে সব কষ্টই বিশেষ এক সময়ের পর তার যন্ত্রনার তেজ হারিযে ফেলে । দুঃখ বা শোক যদি প্রাত্যহিক হয়—তা তেমন যন্ত্রণাব হয় না । ত্রিপুবার শালবনের শীতও তাই আমাদের কাবু করতে পারেনি । পরাজিত তো নয়-ই ।

ভোরে লাইনে এসে দাঁড়াতাম । নির্ধারিত সময়েব লেফ্‌ট বাইটের পব শুরু হতো থ্রি.নট.থ্রি., মার্ক ফোর, এস.এল.আর. আর স্টেনগান চালাবার প্রশিক্ষণ । একস্প্লুসিভ বা বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রশিক্ষণে ওস্তাদজী ছিলেন আরেকজন । ওর সাথে অবশ্য আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠেনি । কিন্তু ওস্তাদ গুরবখ সিংয়ের সাথে আমার অনেক কথাই হয়েছে। বয়সে বেশ

ছোট হলেও ওর সাথে এক ধরনের বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিলো আমার। বন্ধুত্বের সেই সূত্রেই ওর জীবনের কিছু গোপন কথাও জানা হয়েছিলো।

সে প্রায়ই আমার নাম ভুলে যেত। মনে করতে ব্যর্থ হয়ে হেসে ফেলতো। বলতো, 'তোমাদের সবাইকে আমার এক নামে ডাকতে ইচ্ছে করে। কি করি বলতো !'

'ইচ্ছে হলে ডাক, কিন্তু লাভ কি ? একেকজন মানুষের একেকটি নাম থাকে। সেই নাম ধরে না ডাকলে কেউ কি সাড়া দেয় ?'

'তা দেয় না, কিন্তু তোমাদের প্রতিটি মুখকেই আমার কেন যেন এক রকম মনে হয়। যেন তোমরা সকলেই শহীদ ভগৎ সিং। তোমাদেব সবাইকে আমি ভালবাসি। তোমাদের সবাইকে আমি শ্রদ্ধা করি। এই ধর, আমি কে, মাত্র একজন নায়েক সুবেদার বৈ তো নয়। গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়ার অতি সামান্য এক কর্মচারি। না ট্রাক চালাতে জানি, না কৃষি কাজ। বাধ্য হয়ে চাকরি করছি। কিন্তু তোমরা ? তোমরা একেকজন ভগৎ সিং। তোমরা প্রতিটি মানুষ এক একজন ফ্রিডম ফাইটার। আমি যে আজ তোমাদেব জন্য কিছু কাজ কবতে পাবছি —এতেই আমি ধন্য।'

ওর তাঁবুতে বসেই গল্প হচ্ছিল। কোনো কোনো রাতে এমন গল্প হতো আমাদের। সন্ধ্যে বেলায় সীমান্তের ওপার থেকে আবারও কামান দেগেছে পাকিস্তানিরা। হতাহত যা হয়েছে তার সবাই আমাদের দেশত্যাগী মানুষ, রিফ্যুজি। হাজাবে হাজারে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে তখনো ঢুকছে ত্রিপুরা রাজ্যে। রাজ্যের পনের লক্ষ অধিবাসীর প্রায় প্রতিটি ঘর, প্রতিটি বিদ্যালয়, প্রতিটি দোকানপাটে গিজগিজ করছে পড়শি দেশের বিপন্ন মানুষ, যে মানুষ ভাগ হয়ে গিয়েছিলো উনিশশ' সাতচল্লিশে। এ-ছাড়াও ইয়ুথ ক্যাম্পগুলিতে আছে হাজার হাজার বাঙালি তরুণ — যাদেব প্রতি মুহূর্তের কামনা একটি রাইফেল কিংবা একটি গ্রেনেড। স্বাধীনতার আকুতি যে কত প্রলয়ংকরি হয় — তা শিখিয়ে দিয়েছিলো আমাদের একাত্তর।

ত্রিপুরা হয়ে উঠেছিলো সেদিন আরেক বাংলাদেশ। কি বাঙালি কি পাহাড়ি-সবাই ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী, বন্ধু, এবং তাদের মন থেকে — তাদের হৃদয় থেকে।

ইতিহাসের জ্ঞান তখন আমার সীমিত। কিন্তু আমি শহীদ ভগৎ সিংয়ের নাম জানতাম। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের নায়ক কুখ্যাত ইংরেজ জেনাবেল ডায়ারকে যে বীব ভারতবাসী হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছিলো খোদ লন্ডনে গিয়ে—তাঁরই নাম ভগৎ সিং। এ ছাড়া পাঞ্জাব হত্যাকান্ডের পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন।

গুরবখ সিং যখন বাঙালি তরুণদের ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে তুলনা করছিলো, তখন গর্বে সত্যি সত্যি আমার বুক ফুলে উঠছিলো। একই সঙ্গে ওস্তাদজীর ওপর শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিলো। ওকে আমার সে কারণে পেশাদার সৈনিক মনে হয়নি। নায়েক সুবেদার গুরবখ সিং — আমরা যে স্বাধীনতার আরাধনা করছি — তার অকৃত্রিম এক বন্ধু।

'ওস্তাদজী, তুমি তো পাঞ্জাবের লোক। ভগৎ সিংয়ের পরিবারের কেউ কি আছে। তুমি চেন ওদের ?'

নিতান্ত বালকসুলভ প্রশ্ন রাখি আমি গুরবখ সিংকে। অবশ্য ব্যপারটা নিয়ে কিছুই জানতাম না বলেই হয়তো প্রশ্নটা অস্বাভাবিকও ছিলো না।

ওস্তাদজী বলেছিলেন, 'আমি সত্যি সত্যি ভগৎ সিংয়ের ফ্যামেলির কাউকে চিনিনে। আমি যে জেলায় জন্মেছি তা থেকে অনেক দূরে ভগৎ সিংয়ের বাড়ি। ওদের ফ্যামেলির কেউ বেঁচে আছে কিনা — তাও বলতে পারবো না। কিন্তু আমি গর্ববোধ করি ভগৎ সিং আমাব স্বজাতি বলে। গর্ববোধ করি, আমি সেই ভগৎ সিংয়ের বংশধর যে ভগৎ সিং ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজের জান কুরবান করেছে।'

আমাদের বাঙালিদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে যে কত অসংখ্য ভগৎ সিং আছে—তার হিসেব গুরবখ সিংয়ের হয়তো জানা নেই। বললাম, 'ওস্তাদজী, এই উপমহাদেশে ইংরেজদের

বিরুদ্ধে মূল লড়াই হয়েছে কোন কোন অঞ্চলে — তা তুমি জান ?'

'কেন বেঙ্গল আর পাঞ্জাব ? আর সে-জন্যেই তো ভাগ করে দিয়েছে শালারা এই দুই মাটিকে। ঈশ্বর, ভগবান আর আল্লাহর দোহাই দিয়ে লাখ লাখ মানুষ পর্যন্ত মারা হয়েছে এই দুই ভূখন্ডে।'

'তুমি বেঙ্গলের সেই ফ্রিডম ফাইটারদের কথা জান ওস্তাদজী ?'

সিংজী যে এতো বেশি খোঁজখবর রাখে না — তা বোঝা গেল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে, গ্লাসে আরেক পেগ 'রাম' ঢেলে বললো, 'আমি নেতাজী সুভাষের নাম জানি।'

অনেকক্ষণ ধরেই সে মদ ঢালছিলো গলায়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর প্রতি রাতেই সে মদ খেতো। ওর ফ্যাভারিট ছিলো 'ট্রিপল এক্স' রাম। বোতলটার চেহারা এখনো আমার মনে পড়ে। গোলগাল অথচ দারুণ দরেজ আর সুদর্শন। এক-দু'বার সিংজী আমাকেও সেধেছে এক পেগ খেতে। ও বয়সে মদ ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ এক ভীতি ছিলো আমার। এক-দুটো চারমিনার সিগারেট কখনো-সখনো টান দিয়েছি বটে, কিন্তু এক ঢোক মদও গিলিনি। ভয়ে। পাছে কি না কি হয়ে যায়!

আমাদের ওস্তাদজী, যার হাতে আমাদের অস্ত্রদীক্ষা হয়েছে, তাকে ইংরেজ বিরোধী বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের নামগুলি শুনিয়ে দেয়ার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারিনি সেদিন। শহীদ ভগৎ সিংয়ের জন্যে গুররখ সিংয়ের যেমন গর্ব তেমনি গর্ব, আমাদের প্রজন্মকে দিয়েছে বাঙালির পূর্বপুরুষেরা। বললাম —

'সিংজী, নেতাজী সুভাষকে শুধু চেন, কারণ ওর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিলো আজাদ হিন্দ ফৌজ—যাতে যোগ দিয়েছিলো হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টানসহ সেদিনের অবিভক্ত ভারতের প্রতিটি ধর্মাবলম্বি। আমি নিজেও নেতাজীকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তারও আগে যারা আত্মাহুতি দিয়েছে এই বঙ্গভূমিতে — তার খোঁজ কি রাখ ?'

কথার ফাঁকে ওস্তাদজী কি একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলেন। আমি যা বলছিলাম, বন্ধ করলাম। পাহাড় কাটা মাটির রাস্তায় অস্পষ্ট আলো জ্বালিয়ে সন্তর্পনে তিনটি ট্রাক এসে পৌঁছলো তখন ক্যাম্পে। গভীর রাত। ট্রাকগুলি থামার সাথে সাথে ছোটখাটো কিছু বাংলা শব্দ কানে এলো। বুঝলাম, ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে বাছাই করে আনা আরও কিছু যুবক এসে যোগ দিল শিবিরে। সপ্তাহ দুয়েক আগে আমরাও এভাবে এসেছিলাম।

সীমান্তের খুব কাছাকাছি বলে পর্যাপ্ত সতর্কতা নেয়া হয়েছে শিবিরটির প্রতি। অবস্থান জানাজানি হয়ে গেলে কুমিল্লার কসবা থেকে পাকিস্তানিদের কামানের গোলা এসে পড়া বিচিত্র কিছু নয়। বিমান হামলাও হতে পারে।

কিছুটা সময় পর আমিই মুখ খুললাম, 'ওস্তাদজী, কি যেন বলতে চাইছিলেন তখন ?'

'নেতাজীর কথা। আমি নেতাজীকে বহুত ভালোবাসি। যদি সেদিন বড়সড় থাকতাম— এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—নির্ঘাৎ আমি ফ্রন্টে যেতাম। ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি হৃদয় থেকে। জাত-গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে আমাদের সবাইকে পরাধীনতার শেকল ভাঙ্গতে শিখিয়েছিলেন একমাত্র সুভাষই। অমন আর একজনকে দেখাও দেখি ?'

নেতাজী সুভাষ বসুকে ভালবাসেনা এমন বাঙালি কি আছে ? ওঁর 'তরুণের স্বপ্ন' এবং মান্দালয় জেল থেকে লেখা চিঠিগুলি বেশ আগেই পড়া হয়েছিলো আমার। আমার নাটক পাগল চিরকুমার ছোট চাচার সংগ্রহ থেকে নেতাজীর জীবনের অনেক কথাই জেনে নিয়েছি আমি। কিন্তু গুররখ সিংকে যা বলতে চেয়েছিলাম, তা থেকে আমি সরে গেলাম না।

'ওস্তাদজী, তোমার জানার জন্যই বলি, আমরা যারা আজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে জাতীয় স্বাধীনতার মুক্তিসংগ্রামী হয়েছি, তারাই বাঙালির প্রথম মুক্তিযোদ্ধা নই। বাঙালির মাস্টারদা সূর্য সেন আছে, বাঙালির আছে প্রীতিলতা, বিনয়-বাদল-দীনেশ-ক্ষুদিরাম। বলতে পার—আমরা কেবল তাদেরই উত্তরসূরী। আমি বলবো, আজ আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের

সেবাযত্নে যথেষ্ট নিরাপদে তোমাদের ট্রেনিং পাচ্ছি, গোলাবারুদ পাচ্ছি, আশ্রয়-খাবার পাচ্ছি। কিন্তু, একবার ভেবে দেখ, কতটা নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে বাঙালির সেই পূর্ব-পুরুষদেরকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো তখন! ওদের আত্মত্যাগ অনেক অনেক বেশি।'

সে রাতে গুরবখ সিংয়ের সাথে আরও অনেকক্ষণ কথা হয়েছিলো। মাঝে শুধু একবার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখে নিয়েছিলাম নতুন যারা এলো তাদের কেউ আমার চেনাজানার মধ্যে পড়ে কিনা। নবাগতদের বেশির ভাগই যার যার তাঁবুতে ঢুকেছে। পরদিন ভোর থেকে ট্রেনিং। জীবনের প্রথম অস্ত্র ছোঁয়ার মধ্যে কী যে এক উন্মাদনা, আর সে অস্ত্র যদি হয় স্বাধীনতা যোদ্ধার! ওরা মুক্তিসংগ্রামের বলিদানে পাগল। এরপর আছে স্বদেশ ফেলে আসার জ্বালা। সেই জ্বালা আর উন্মাদনার অংশীদার বলে আমি নিজেই বুঝি সেটা কত ভয়ংকর সুখ আর শোকের।

সে রাতে 'পাস ওয়ার্ড' জেনে নেইনি আমি। ক্যাম্পের বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই বলে ওটা জানবারও প্রয়োজন পড়েনি। অথচ যুদ্ধকালীন শিবিরগুলিতে প্রতিটি সৈনিককে 'পাস ওয়ার্ড' জানতে হয়। ক্যাম্প থেকে বাইরে গেলে উপযুক্ত সংকেত শব্দটি না জানা থাকলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। প্রহরী নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে রাইফেলের নল উঁচিয়ে বলে উঠবে, 'হল্ট'। সে যেই-ই হোক তাকে সে জায়গাতেই দাঁড়াতে হবে। প্রহরী আবারও প্রশ্ন করবে, 'পাস ওয়ার্ড ?' তৎক্ষণাৎ বলতে হবে নির্ধারিত সেই 'পাস ওয়ার্ড', অর্থাৎ প্রবেশের অনুমোতি সংকেত—যা প্রতিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে।

তবে আমার তেমন সংকট হয় নি। ওস্তাদজীকে সমস্যাটার কথা বলতেই তিনি প্রথমে ধমকে দিলেন, তারপর বল্লেন, 'সেভেন্টি ওয়ান।'

গুরবখ সিংয়ের তাঁবু থেকে বেরিয়ে ধীরে পা ফেলে আমি দক্ষিণ পাশে নতুন তাঁবুগুলির দিকে এগুলাম। প্রায় প্রতিটিতে হারিক্যান জ্বালানো। অপূর্ব লাগে পাহাড় ঘেরা নিকষ অন্ধকার রাতে হারিক্যানের এই আলোগুলিকে। মনে হয় অগণিত মঙ্গল প্রদীপ আমাদের শিবিরটিকে আলোকিত করার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে।

নবাগতদের মধ্যে এক দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন শিবিরের আকাশ আর চারপাশের শালবন দেখছে। মশাও মারছে কেউ কেউ জোরে শব্দ তুলে। আমি ধীরে হাঁটছি। দেখি পরিচিত কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বেশ পেছন থেকে পরিচিত কন্ঠের হঠাৎ একটা ডাক শুনলাম,— 'ইউসুফ ?'

পা থেমে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম বেশ পেছনে তাঁবুর ঠিক দরজায় প্রায় চেনা একটি মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সজারুর মতো উৎকন্ঠা মাখা চোখে সে আমাকে দেখছে। তাঁবুর ভিতর থেকে হারিক্যানের আলো এসে ওর মুখের একপাশ আলোকিত করে দিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারিনি। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই বুঝে ফেলছি, ও কে। আমাদের কলেজের বন্ধু, যাকে আমরা সবাই কবি বলে ডাকি , সেই দীদারুল আলম। দৌড়ে গিয়ে ওকে আমি জাপটে ধরলাম। যুদ্ধের মাঠে বন্ধু খুঁজে পাওয়ার সুখটাই এমন যে আনন্দাশ্রু নির্গত না হওয়া পর্যন্ত যেন রেহাই দেয় না।

'করে বর্ডার পার হয়েছিস ?'

'দিন সাতেক। তুই ?'

'মাস খানেক বিফ্যুজি ক্যাম্পে। তারপর এখানে। তাও বেশিদিন না।'

'শালা মরিসনি তাহলে! যেখানে-সেখানে মরলে তোর কবরে একটা কবিতা লিখে দিয়ে আসার ইচ্ছেটা অপূর্ণ থাকতো। যাক, শালা বাঁচিয়েছিস। বল, তোর তাঁবু কোনটা ?'

আমার তাঁবুটা হাত উঁচিয়ে ওকে দেখিয়ে দিলাম। ওরটার খুব কাছে নয়—কিন্তু অবস্থানটা এরকম যে পর্দা ঠেলে বের করলেই দু'জনেই দু'জনের মুখ দেখতে পাব। বল্লাম,

'ঘুম না পেলে চল ওস্তাদজীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। ভীষণ ভাল মানুষ। ভাল লাগবে তোর।'

গুরবখ্শ সিংয়ের তাঁবুর সামনে পৌঁছাতেই বুঝতে পারলাম ওস্তাদজী খাটিয়ায় যাননি তখনো। কিম্বা গেলেও ঘুমিয়ে পড়েননি। হারিক্যানটার আলো দেখে জংলি পোকাগুলো ভীষণ চেষ্টা করছে তাঁবুর ভিতরে ঢুকতে। কাছে গিয়ে আস্তে করে বললাম, 'ওস্তাদজী, আমি ইউসুফ। আসতে পারি? সাথে আরও একজন ভগৎ সিং আছে। এই মাত্র এল। শহীদ হবার খুব ইচ্ছে।'

আট-নয় পেগ টেনেছেন সিংজী। গলার স্বরটা জড়িয়ে আসছে। বল্লেন, 'ভেতরে ঢুকো। ভগৎ সিংদের জন্য গুরবখ্শ সিংয়ের তাঁবুতে ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না।'

আমাদের প্রিয় ওস্তাদজী সম্পর্কে ইতোমধ্যেই যদ্দুর পেরেছি জানিয়ে দিয়েছি আমি কবি ও যোদ্ধা দীদারুল আলমকে। কথায় কথায় মুখে মুখে সে কবিতা বানাতে পারতো। সে এক অসাধারণ প্রতিভা ছিলো ওর। জন্মই যাকে কবি বানিয়ে দেয় দীদারুল আলমও তাই।

তাঁবুতেও ঢুকেই সে হাত মিলালো সিংজীর সাথে। তারপর ছন্দ মিলিয়ে নাটকীয় ঢঙে বললো —

'সালাম নমস্তে প্রণাম গুরুদেব

ধন্য আমি

কৃতজ্ঞ আমি অসীম অহংকারে

যার অংশিদার তুমিও

শহীদ ভগৎ সিংয়ের বিশ্বাসের মানুষ যে আমিও।'

আমি হেসে উঠলাম ওর কাব্য চরণ শুনে। গুরবখ্শ সিং বেশি কিছু বুঝলেন না, তবে আমাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে বাংলা শব্দের অনেকগুলিই তার জানা হয়ে গেছে। বলতেও পারেন যৎসামান্য। আমরা যেমন ওর হিন্দি বুঝতে পারি, সিংজীও কমবেশি আমাদের বাংলা বুঝে নিতে পারেন।

খাটিয়া থেকে উঠে ওস্তাদজী বুকে জড়িয়ে ধরলেন দিদারকে। বললেন, 'তোমার এবং তোমাদের স্বাধীনতার জন্য আমি প্রার্থনা করি।'

আসলে সিংজীর জন্যে আমার দুঃখ ছিলো অন্য একটি কারণে। অনেকেই ব্যাপারটা জানতো না। কিন্তু আমি জানতাম। ২৫শে মার্চ ঢাকায় যেদিন পাকিস্তানিরা ট্যাংক নামিয়ে বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, ঠিক সেদিন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পেলো সে গ্রামের বাড়ি থেকে। ওর বড় ছেলে অজয়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোগের নাম লেখা নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। ওর তখন পোস্টিং সিলং-এ। টেলিগ্রামটি নিয়ে গুরবখ্শ সিং তার বড় অফিসারের কাছে ছুটে গিয়েছিলো। ছুটির দরখাস্ত পেশ করেছিলো। কিন্তু ছুটি মিলেনি। অফিসার বুঝিয়ে বলেছিলেন, ইস্ট-পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভাল নয়। এক দু'দিন অপেক্ষা কর। দেখা যাক।

ঠিক তিনদিনের মাথায় ওদের কোম্পানীকে বদলি করা হলো ত্রিপুরার সীমান্তে। দলে দলে প্রাণ বাঁচাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী ঢুকছে তখন ত্রিপুরায়। পায়ে হেঁটে, শতে শতে, হাজারে হাজারে। সীমান্ত খুলে দেয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ নিজে গেছেন দিল্লীতে। ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝিয়েছেন, সীমান্ত খুলে না দিলে পাকিস্তানি সৈন্যরা হাজার হাজার নারীপুরুষ হত্যা করবে। মানবতার খাতিরেই এইটুকু বদান্যতা দেখানো উচিত।

গুরবখ্শ সিং তখন খুব ছোট। পুরনো পাঞ্জাবের দাঙ্গার স্মৃতি তার কিছুটা মনে আছে। হিন্দু-শিখ মিলে মারছে মুসলমানদের আর মুসলমান মারছে হিন্দু-শিখদের। সে এক ভয়ংকর স্মৃতি। শত বছরের ভিটেবাটি, গাছপালা, গরুছাগল, লাউগাছ, আমলিচুর বাগান ফেলে সীমান্তের

এপার থেকে ওপারে আর ওপার থেকে এপারে ছুটছে মানুষ। পথে কতল না হলে ভিন মাটিতে গিয়ে রিফুজীর খাতায় নাম লেখাতে হচ্ছে, অন্যথায় নাম উঠছে ঈশ্বর কিম্বা খোদাতালার নথিতে।

গুরবখের বাবা জীবন সিং সামান্য চাষাবাদ করতো। ছেলে আর বউকে পাঁজা কোলা করে নিজের গ্রাম থেকে ত্রিশ মাইল দূরে নিরাপদ এক গ্রামে স'রে গিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিলো। এসবের কমবেশি এখনো মনে আছে তার। আজ চব্বিশ বছর পর গুরবখ সিং যখন পরিণত বয়সের, তখন দেখতে হচ্ছে তাকে ধর্মের রাজনীতির আরেক মহাপ্রলয়। ধর্ম নয় ধর্মের রাজনীতিই মানুষকে পশুতে পরিণত করে। অতএব নিজের ছেলেকে হাসপাতালে রেখেও তাকে চাকরি করতে হাজার মাইল দূরে পড়ে থাকতে হলো।

একদিন আমি আর দীদার সন্ধ্যার পর যথারীতি ওর তাঁবুতে ঢুকেছি। মনটা একদম ভাল নেই। বিকেল বেলাতেই আমাদের ন'জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। ছোট্ট এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে তিন-চার ব্যাচ ইতিমধ্যেই গেরিলা অপারেশনে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। যখনই কোনো দল ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যায়, সিংজী নিজে তাদের সাথে হাত মেলান, বুকে চেপে ধরেন, আধো বাংলায় বলেন, – 'আবার দেখা হবে।' তারপর তাঁবুতে গিয়ে প্রার্থনা করেন গুরুজীর দরবারে। লোকটা যে একজন সৈনিক তা যেন মনেই হতো না।

গুরবখ সিংয়ের ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধারা লড়াইয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ইপিআরের অফিসারেরা গেরিলাদের কোন দল কখন কোনদিন কোথায় আঘাত করবে – তা ঠিক করে দিচ্ছে। পাকিস্তানের পূর্ব অংশের মানুষেরা আর ভারতীয়রা এক সাথে মিশে গেছে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের প্রবাসী সরকার গোটা দেশটাকে এগারোটি যুদ্ধ সেক্টরে ভাগ করেছে। আমাদের এলাকাটি পড়েছে দুই নম্বর সেক্টরের মধ্যে। এই এলাকা থেকে ঢাকা আক্রমণ সহজ বলে ক্যাপ্টেন হায়দারের নেতৃত্বে বিরাট এক গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছে মেলাঘরে।

এদিকে বৈঠক করে স্থির করা হয়েছে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন আর ভৈরবের ব্রিজের পাকিস্তানিদের শায়েস্তা করতে একটা অপারেশন দরকার। পাকিস্তানিদের ঘাটিটা যেন পাকাপোক্ত না হয় — তার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিকল্পনাও একটা হয়েছিলো। প্রথম দিকে ছোট্ট একটি দল যাবে। দশ পনের জনের মতো। বলেই দেয়া ছিলো, বেশি রিস্কে যেন না যায়। দূর থেকে যৎসামান্য গুলি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আনন্দে লাফাতে লাফাতে গোলাবারুদ নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেছে।

খবর এসেছে মাত্র ঘন্টাখানেক আগে। ওদের মধ্যে দুইজন শহীদ। কয়েকজন আহত, নাকি ধরা পড়েছে–ঠিক নেই। সামান্যই কেবল ফিরে আসতে পেরেছে। কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক সেদিক চলে গেছে। ধরা না পড়ে থাকলে হয়তো ফিরে আসবে।

ওস্তাদ গুরবখ সিংয়ের ট্রেনিং পাওয়া গেরিলাদের মধ্যে শহীদের তালিকায় এই প্রথম নাম।

আমরা দুজন তাঁবুতে ঢুকতেই দেখলাম ওস্তাদজী অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। আমাদের দিকে একবার তাকালেন, তারপর বল্লেন, 'বস।'

কোনো কথা না বলে আমরা বসলাম। সে সময়টা এমন যে আমরা কেউ-ই কিছু বলতে পাচ্ছিলাম না। সবকিছুই অসহ্য-নির্দয় মনে হচ্ছিল। দীদারই সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো। বললো, 'ওস্তাদজী, এবার আমাদের ব্যাচ থেকেই মূল অপারেশনের কাজটা করতে হবে। আপনি এবং আকরাম ভাই সাথে থাকবেন। ইউসুফ আমি–সবাই যাব। ওই একই জায়গায় যাব, যেখানে আমাদের বন্ধুরা শহীদ হয়েছে। আমরা প্রতিশোধ নেব।'

দীদারের মত মানুষকে আমি কখনোই এতোটা উত্তেজিত হতে দেখিনি। ওর স্বভাবের মধ্যে বাঙলার বসন্ত ঋতুর স্বাভাবিক এক উদারতা ছিলো–যা মৃদুমন্দ বাতাসের মতো শরীর ছুঁয়ে যেত, কখনো মসৃণ শিহরণ তুলতো, কিন্তু যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠতো না। কিন্তু সহযোদ্ধাদের মৃত্যুর খবর ওর চরিত্র আজ পাল্টে দিয়েছে। আমার গায়ে তখন জ্বর। কয়েক রাত মশারি

না টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মশারি জিনিসটা একদম পছন্দ নয় আমার। খুব ছোট্ট স্বাভাবিক একটা বন্দিত্ব, কিন্তু তাকেও সইতে পারতাম না আমি। দেশে থাকতে মা টাঙিয়ে দিতেন, এখানে কে দেবে? ক্যাম্পের ডাক্তারের অসুদ খাচ্ছি। তবু জ্বরটা ভালোই কাবু করেছে। এর পরও বল্লাম, 'ওস্তাদজী, আমিও যাব। এক-দু-দিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হোক।'

তিন থেকে চারদিনের মধ্যে পঁয়ত্রিশজনকে বাছাই করা হলো অভিযানের জন্যে। সাথে রইলেন ওস্তাদজী স্বয়ং এবং আমাদের আরেক প্রিয় ব্যক্তিত্ব আকরাম ভাই। ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে কেউ তখনো আমাদের সাথে যুদ্ধে নামেনি। ডেল্টা সেক্টরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিংকে একবার দেখেছিলাম। ক্যাম্প ভিসিট করতে এসেছিলেন। তবে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের সহযোগিতা যথেষ্টই ছিলো। আমাদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত আগ্রহের ফলেই গুরবখ সিং অনুমতিও আদায় করে নিলেন ওর বড় কর্তার কাছ থেকে। এ অঞ্চলের সীমান্ত পেরিয়ে বেশ খানিকটা ভিতরে এবারেই প্রথম যাচ্ছে একজন বি এস এফ কর্মকর্তা।

দীদার, আমি, ফজলু, করিম, দীলু ও নবারুণ-সহ আরও অনেক বন্ধুপরিচিতজন একসাথে। আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রথম একটি বড় 'অপারেশন'। যারা যাচ্ছি তাদের প্রত্যেকের জন্যে যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা। এর পরেও ভাল লাগছিলো। ভীষণ এক রোমাঞ্চ অনুভব করতে থাকলাম আমরা। একে-তো আকরাম ভাই আর ওস্তাদজী আছেন, অন্যদিকে খালি পায়ে, স্বদেশের উদাম মাটি পেরিয়ে, ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেতের আল বেয়ে, রেল লাইনের ধার দিয়ে হেঁটে-দৌঁড়ে যাবো আমরা আশুগঞ্জে।

সন্ধ্যা থেকেই প্রস্তুতি। যার যার হাতিয়ারগুলো একে একে পরীক্ষা করে নিচ্ছিলাম। গ্রেনেডগুলো সারি সারি থরে থরে সাজানো। যাবার আগে শুধু হাতে তুলে নেব। এতো ভয়ংকর বিস্ফোরক, অথচ কী অসম্ভব রকম সুন্দর! ওগুলিকে দেখে মনে পড়ছিলো মা'র হাতে তৈরি এক ধরনের পিঠার কথা। নামটা ভুলে গেছি। চিটাগুড় আর চালের ধুলো দিয়ে তৈরি। ভিতরে নারকেলের কুড়ানি। স্টেনগানগুলিকে মনে হচ্ছিলো প্রেমিকার কাছে প্রথম চিঠি লেখার কলম।

সাতটা কি সাড়ে সাতটার দিকে দীদার এসে তাঁবুতে ঢুকে বললো, 'বেডা? জ্বর কমলো, নাকি শালা ভয়ে টেমপারেচার বাড়িয়ে ফেলেছিস?' বলেই ওর ডান হাতের তালু দিয়ে আমার কপালটা ছুঁয়ে দেখলো। তারপর বললো, 'আরে শালা, তুইতো দেখি দারুণ জিনিস! বিশ্বাস কর, একদম জিরো টেমপারেচার। ভয়ে না দেশপ্রেমে?'

সেই সন্ধ্যায় অপূর্ব লাগছিলো দেখতে ওকে। কী প্রাণবন্ত মানুষ। কথায় কথায় জীবনের সব কষ্টকে যে মানুষ হাসিতামাসায় উড়িয়ে দিতে পারে তাকে আমার ক্ষণজন্মা বলেই মনে হয়। এ জীবনে সে অসংখ্য পদ্যচরণ রচনা করেছে। অসংখ্য মানুষকে সে তার কাব্য প্রতিভায় বিস্মৃত করেছে। কিন্তু একটি কবিতাও তার কোনো সাহিত্যের কাগজে প্রকাশিত হয়নি। জিজ্ঞেস করলে বলতো, 'আমি নিজে কবি নই, কবি যে সে আমার অন্তরে, ক্ষণিকের জন্য মাত্র বসতি। ওর অনুমতি ছাড়া কি করে ছাপতে দেই, বল?'

আমি আর দীদার একসময় হাঁটতে হাঁটতে ওস্তাদজীর তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছলাম। লুঙ্গি পরে প্রস্তুত হয়ে আছে গুরবখ সিং। আমাদের এক সঙ্গে দেখে বললো, 'তোমরা তৈরি তো?'

'ইয়েস স্যার।'

আচমকা মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করে বসলো কবি ও যোদ্ধা দীদারুল আলম। ওর ব্যবহারে হেসে ফেললেন গুরবখ সিং। বল্লেন, 'দেখ, তোমাদের লুঙ্গি পরতে কি ঝামেলা। আমি কখনো বিদেশের মাটি ছুঁয়ে দেখিনি। এই প্রথম স্বদেশের বাইরে যাত্রা। কিন্তু লুঙ্গি না হয় পরলামই, পাগড়িটা ঢাকি কি করে বলতো?'

'কুছ্ পরোয়া নেই। ওস্তাদজী, তুমি আমার এই গামছাটা মাথায় পেঁচিয়ে নাও। কোনো শালাও তোমাকে চিনতে পারবে না। আর যে শালারা উৎপাত করবে তাদেরকেই যমদূতের কাছে পাঠিয়ে দেব। চিন্তা করো না। তুমি আমাদের বন্ধু, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মিত্র। যা তা ব্যাপার নয়?'

দীদারের কথায় গুরবখ সিং হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। ভাবলাম সে হয়তো গুরুর কাছে প্রার্থনা করছে। কিন্তু না। দীদারকে উদ্দেশ্য করে একটু পর সে বলে উঠলো, 'তোমাদের একটা কথা বলি। আমি একজন ভারতীয় সৈনিক—গভর্মেন্ট সারভেন্ট। ঘটনাচক্রে তোমাদের মিত্র হয়েছি। তোমাদের আমি খুব ভালবাসি—কারণ তোমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য মরতে রাজি হয়েছো। একটা কথা মনে রেখ—মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ বানাতে পারেনা। ওরা জন্ম নেয় যার যার মাটিতে—যেমন তোমরা জন্ম নিয়েছো বাংলাদেশে।

দীদারের রসিকতা আর ওস্তাদজীর গুরুগম্ভীর মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যুদ্ধযাত্রার সুখ আর বেদনা দুটোই সমভাবে অনুভব করে নিলাম। দীদারের দেয়া গামছাটা তৎক্ষণাৎ মাথায় পেঁচিয়ে একজন সাধারণ বাঙালি কৃষক সেজে নিলেন ওস্তাদজী। তারপর আমাদের বসতে বল্লেন খাটিয়ায়। বসতেই তিনি তার বালিসের নিচ থেকে একটা কাগজ খুঁজে বের করে বললেন, 'একটু আগেই আমার ছেলে অজয়ের কাছে একটা চিঠি লিখেছি। ওকে লিখেছি, বলি তোমাদের ... । না, থাক, এখন নয়। পরে শুনাবো। আগে কাজ সেরে আসি।' আমরা বেশ জেদ করলাম, কিন্তু গুরবখ সিং কিছুতেই আর চিঠি পড়ে শুনালেন না।

চিঠিটাকে তারপর তিনি খাটিয়ার কম্বলটার নিচে গুঁজে রাখলেন। আমরা দেখলাম, এক মুহূর্তের জন্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। চোখ দুটো বন্ধ করে অজানা কারোর উদ্দেশে হয় প্রার্থনা করতে লাগলেন নয়তো নিজের মনের মতো করে স্মৃতিতর্পণ করতে থাকলেন। বল্লেন, 'রাত ন'টায় আমরা ট্রাকে চাপবো। কসবা সীমান্ত পর্যন্ত ট্রাকে। এরপর তোমাদের বাংলাদেশ।'

সেদিনের অনেকের মাঝে আজো আমি বেঁচে আছি বলে ওস্তাদ গুরবখ সিং, আকরাম ভাই, কবি ও যোদ্ধা দীদারুল আলম আর আমার রণাঙ্গনের সাথীদের স্মৃতিতর্পণ করতে পাচ্ছি। এ আমার জন্যে একদিকে গর্বের অন্যদিকে কষ্টেরও।

•

ট্রাকে চেপে উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে ভারতীয় সীমান্ত রেখার বেশ খানিকটা দূরে এসে নামলাম আমরা। এরপর বর্ডার পার হয়ে কসবার রেল লাইন ধরে আখাউড়ার দিকে হাঁটতে থাকলাম। আকরাম ভাই, দীদার, আমি এবং আমাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই তখন জন্মভূমির এক মুষ্টি করে মাটি। আকরাম ভাই মাটিগুলোকে গায়ে মেখে নিলেন। দীদার মাখলো ওর মুখে, চুলে আর বুকে। অদ্ভুত সেই ব্যাপারগুলো করতে করতেই সে গলা কাঁপিয়ে গান ধরলো, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।' আকরাম ভাই নিষেধ করলেন। বল্লেন,—'চুপ। কোনো কথা নয়।'

গেরিলা অভিযানের নিয়ম অনুযায়ী আগে-পিছে এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। রাখছিলামও আমরা। সেদিন রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ আর উৎকন্ঠার সেই অভিযাত্রাতেও জীবনকে উপভোগ করতে শিখিয়েছিলো বন্ধু দীদারুল আলম। গ্রেনেডের বস্তাটিকে আমার কাঁধে চাপিয়ে সে বললো, 'যদি মরি তুই কি করবি রে?'

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম, 'তোর লাশটাকে কি করবো, শোন, বাংলাদেশের পতাকায় আচ্ছাদিত করে পুঁতে রাখবো।'

'কোথায়?'

'যেখানে সম্ভব।'

'না, আমাকে কবর দিবি তুই নিজের হাতে। এই মাটির কোথাও। কাজটা তোকে করতে হবে। লাশ নিয়ে যেন সীমান্তের ওপারে যাসনে। খবরদার। — আর আমাদের ওস্তাদজী যদি মরে ? ও বেটা তো আবার বিদেশি ?'

'দেখ দোস্ত, মরার পর শরীর কোথায় থাকলো আর থাকলো না — থোরাই কেয়ার করি আমি।'

'না, দোস্ত, ওস্তাদজী বাঙালি নয়। ভারতবাসী, হতে পারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু। ওর লাশটাকে তুই সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাবি।'

আমি ভীষণ বিরক্ত হচ্ছিলাম দীদারের ওল্টাপাল্টা কথাবার্তায়। এমনতো হতে পারে আমি নিজেই মরবো আর ওরা সবাই বেঁচে যাবে। আমার লাশ কোথায় থাকবে বা দাফন হবে — এতে আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই। তবে আমি নিশ্চিত আমার আত্মা বাংলাদেশের বাতাসে ঘুরতে থাকবে যদ্দিন দেশ থাকবে। আসলে এসব ছিলো আমার বা আমাদের বিলাসী কল্পনা, এক ধরনের আশাবাদ, যা আমাদের শক্তি যোগাতো।

নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া আছে অপারেশনের। 'রেকী' টিম আগেই জানিয়েছে, রাত দু'টো থেকে তিনটের মধ্যে এ্যাটাক চলবে। গোটা পঞ্চাশেক পাকিস্তানি সৈন্য এবং সমপরিমাণেরও কিছু বেশি বঙ্গদেশীয় সহযোগী সাথে আছে শত্রুদের। ওদের নাম রাজাকার। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রতিমাসে ওদের বেতন দেয়া হয় দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার উপঢৌকন হিসেবে। পাকিস্তানিদের এবং তাদের রাজাকার সহযোগীদের দায়িত্ব হচ্ছে ভৈরব ব্রীজ দিয়ে কিম্বা নিচের মেঘনা নদী দিয়ে একটি মুক্তিফৌজও যেন পারাপার হতে না পারে।

কবিরা কি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয় ? আমি কবিতা ভালবাসি, পড়ি, কিন্তু কবি নই। তাই হয়তো বুঝিনি কবি দীদারুল আলম কি করে সে

দিন বুঝেছিলো আশুগঞ্জ আর ভৈরব ব্রীজের সেই যুদ্ধে কি পরিণতি হতে পারে আমাদের ?

দুই ঘন্টার মতো গুলি বিনিময়ের পর ভৈরবের ব্রীজ ধরে ছুটতে ছুটতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। দীদারের গ্রেনেড চার্জে একের পর এক পাকিস্তানি আর রাজাকারদের বাংকারগুলো উড়ে গেছে। আকরাম ভাই যে কত দুঃসাহসী মানুষ-এই প্রথম দেখবার সুযোগ হলো। এলএমজিটাকে সে এমনভাবে চালালো যাতে হানাদার সৈন্যরা গুলি ছোঁড়ারও সুযোগ পর্যন্ত পেলো না। নদীর এপারওপার থেকে মেঘনার জলছোঁয়া হয়ে আজানের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। অবশ্য আজানের সময় হয়েছে বলে মনে হলোনা আমার। কি আশ্চর্য, এই বিস্ময়কর সময়েও মেঘনায় নোঙ্গর করা কোনো কোনো নৌকা থেকে জয়বাংলা বলে চিৎকার কানে এলো। কে ওরা ? ভয়ংকর এই যুদ্ধেও কে তার আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে ?

সূর্য উঠতে তখনো বাকি। শত্রুদের লাশ ফেলে ছুটছি আমরা সামনের দিকে। ওস্তাদজী, আকরাম ভাই আর দীদার এ্যাডভান্স পার্টিতে। বুঝতে পাচ্ছি, আমাদের অগ্রগতিকে রোধ করার মতো শক্তি শত্রুদের শেষ হয়েছে। অনেকেই ওদের গুলি খেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রেললাইনের স্লিপারগুলি একের পর লাফিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছি আমরা বিজয়ের মহানন্দে। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের বিদ্যুৎ বাতিগুলি জ্বল জ্বল করে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধজয়ের আনন্দ যে কত উন্মাদনার হয়, সেদিনই প্রথম বুঝতে শিখেছিলাম।

কিন্তু এরপর যা ঘটবার তাই ঘটলো। হঠাৎ কোনদিক থেকে জানিনে, পাকিস্তানিদের পাতা কয়েকটি মাইনে পা পড়তেই ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো বিশাল দেহী ভৈরবের ব্রীজ। ছিটকে টুকরো টুকরো হয়ে নিচের পানিতে পড়তে দেখলাম সামনে কয়েকজনকে। আমরাও পড়ে যাচ্ছিলাম সেই ধকল সামলাতে না পেরে। শেষ পর্যন্ত সামলে নিলাম। নিচে

অন্ধকার। তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঝপঝপ একটানা ক্ষণস্থায়ী কিছু শব্দ ছাড়া কিছুই আর অনুভব করতে পারলাম না।

পরিস্থিতি বুঝে নিতে সময় লাগলো। না, কোথাও কোনো শব্দ নেই। কোনো প্রতিরোধ নেই। হঠাৎ সব নিশ্চুপ, বোবা, আমরা যেন সব বুঝতে পারি, কিন্তু কিছুই বলতে পারিনে।

সেই পরিস্থিতিতে আমার কাছে হাতিয়ারের চাইতেও বড় যে মারণাস্ত্রটি ছিলো, তা একটি শ্লোগান, যা আমাকে স্বাধীন দেশে ফিরে যেতে দেশ ছাড়া করেছিলো একদিন। আমার বিশ্বাস, সেই কণ্ঠস্বর আমাকে ভীতিমুক্ত করতে পারে, ভয়ংকর প্রতিরোধশক্তি যোগাতে পারে। এ আমার আগের অভিজ্ঞতা। তাই আমি 'জয়বাংলা' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে, আমার মনে হলো, ব্রীজটির প্রতিটি লোহার খন্ড, প্রতিটি স্লিপার, প্রতিটি পাথর, প্রতিটি নাটবল্টু – এমন কি মেঘনার জল আর চারপাশের বাতাস পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত করলো সেই শ্লোগান–'জয়বাংলা'। চোখে পানি এলো। ও পানিকে আমি সম্বরণ করতে পারলাম না।

হাতে তখন একদম সময় নেই। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই শিখেছিলাম গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল। 'হিট এ্যান্ড রান'। আঘাত পূর্ণ হয়েছে এবার আরেক আঘাতের পথ প্রশস্ত করতে এখান থেকে সরে যেতে হবে। পূব দিকে আকাশ লাল করে সূর্যটা সবে উঠতে শুরু করেছে। মেঘনার পানিতে যতোটা সম্ভব আমরা চোখ রাখলাম। না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একমাত্র ভোরের ঝিরঝিরে বাতাসে জলের উপরিভাগের চিকচিক করে ওঠা কাঁপন। আমাদের বা ওদের কতজন মরলো সেটা বড় নয়। শত্রুদের আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই, আমরা আছি, স্বাধীনতা আমাদের প্রাপ্য, হে অপরাধী, স্বাধীনতার ঘৃণিত শত্রুরা, স্বাধীনতাকামীদের আঘাত নিতে প্রস্তুত হও। একবার নয়, দুবার নয়, দশ বার নয়, শতশত বার। এ আঘাত চলবে। যতোদিন স্বাধীনতা আসবে না।

বিশালগড়ের ক্যাম্পটায় যখন ফিরে এলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমাদের মধ্য থেকে আর কোনোদিন ফিরে আসেনি যাঁরা –তাদের একজন ওস্তাদ গুরবখ সিং, একজন আমাদের প্রিয় আকরাম ভাই, অন্যজন আমার প্রিয় বন্ধু কবি ও যোদ্ধা দীদারুল আলম। ভয়ংকর সেই শোক তাড়িত করেছে বহুদিন। শোক যে কতোটা নিদারুণ যন্ত্রণার হয় জীবনে সেই প্রথম বুঝেছি।

রাতে ঘুম হয়নি। পাশের খাটিয়াটা খালি। ওটা আকরাম ভাইয়ের। ওর শার্ট, বুট, ছোট্ট একটা সুটকেস–সব পড়ে আছে। সে রাতের 'পাস ওয়ার্ড' টিও জেনে নেয়া হয়নি। এরপরও ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেছি আমি ওস্তাদজীর তাঁবুটার কাছে। মনে হয়েছে, প্রতি রাতে যেভাবে ডাকতাম সেভাবে আর একবার ডাকি। বলি, 'ওস্তাদজী, আমি ইউসুফ। আসতে পারি ?'

খাটিয়ায় ক্লান্ত শরীরটা মেলে ধরবার আগে শার্টটাকে খুলে রাখছিলাম। রণাঙ্গনের শার্টটিও যে কত প্রিয় হয় একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে–তা আমি সে রাতেই প্রথম বুঝেছিলাম। কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই। রক্ত যা তা সব হৃদয়ে। ওই শার্টের সুতোর প্রতিটি গাঁথুনিতে আমাদের স্বাধীনতার আকুতি, বর্ণহীন চিহ্নহীন অজস্র মুক্তির ঘ্রাণ।

হঠাৎ খসে পড়লো একটি কাগজ। দীদার কোনদিন কখন যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, একদম টের পাইনি। এমনও হতে পারে, গেল রাতেই, কি যেন লিখছিলো ও। এসব পাগলামো ও বরাবর করতো। হাতে তুলে দেখি, একটি চিরকুট। না, চিরকুট ঠিক নয়, কবিতা হয়তো সম্পূর্ণ নয়। মাঝেমধ্যে যা মনে আসতো তা-ই ও লিখতো। তারপর ফেলে দিতো। কখনো বইয়ের ফাঁকে, কখনো বালিসের নিচে, কখনো আবার ঘরের মেঝেতে।

ওটা এ রকম :

'আমাদের বৃক্ষে, কবুতরের পাখায়, শালিকের ঠোঁটে,
লাঙ্গলের ফালে, বেল গাড়ির চাকায,
রিক্সার প্যাডেলে, নৌকায়, ধানের শীর্ষে এবং বর্ণমালায এক
আজন্ম লালিত ক্রোধ ; ছুঁড়ে ফেল ইতিহাসের শিকল।
হে যুদ্ধাস্ত্র, আমার প্রেম, স্বাধীনতাকে
আরও গভীর করে ভালবাসতে দাও।'

কবিতাটি আজও রাখি। ওটা আমার সম্পদ। কিন্তু ওস্তাদজী গ্রবখ সিংয়ের সেই চিঠিটা—যা তিনি তার অসুস্থ পুত্রের কাছে লিখেছিলেন—তা তো আর কোনোদিন আমার পড়া হলো না।'

মনিরা কায়েস

মাটিপুরাণ পালা

ঠিক এভাবেই তার গতি ফিরে এসেছিল।

যদিও সে ঠিক জানে না, তার এই দুশ্চিন্তার পাথর মাথায় নিয়ে দৌড়ে যাওয়াকে গতি ফিরে পাওয়া বলে কিনা। তাছাড়া দৌড়ুনোরও তো একটা পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। বিশেষত সেটি যদি এরকম জনমানবহীন, যানশূন্য মধ্যরাত হয়। অবশ্যি আজ তাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে আরশাদ স্বয়ং। একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল তার বাসায়। পানাহারের কমতি ছিল না বলে সবাই মোটামুটি স্ফূর্তিতে ডানা মেলেছিল। কাস্টমসের এই প্রিয় বন্ধুটি তাদের প্রায়ই এরকম ডানা মেলবার সুযোগ করে দেয়। যদিও সাবিহা এটাকে কোনদিনই সুনজরে দ্যাখে না। তবু আরশাদের আহ্বান কখনও সে অস্বীকার করতে পারে না। যত কাজই থাকুক না কেন, সে ঠিকঠাক হাজির হয়ে যায় উপশহরে. আরশাদের স্ত্রীর সুডৌল বাহু, অনাবৃত পিঠের আভা কি সফিস্টিকেটেড হাসির সঙ্গে পানপাত্রের চুমুক এক অনাস্বাদিত অনুভবের জন্ম দেয় তার ভিতর। তখন সে আর ব্যাংক কর্মীর ছোট গণ্ডিবদ্ধ মানুষটি নয়, হয়ে ওঠে বড় কিছু, কাঁধের পিছনে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে দু'টো বিশালকায় ডানা। বৈঠকখানায় কি বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপস্থিত লোকেরা হাততালি দেয় তাকে, তার ডানার প্রশংসা করে। কিন্তু সে সময় সে একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, এতো বিশালাকায় ডানা থাকা সত্ত্বেও সে কেন উড়তে পারে না। ক্রিস্টালের ঝাড়বাতির হীরকদ্যুতি স্পর্শ করা কিংবা একটু উড়েই না হয় চুপিসারে সে গেল আরশাদের স্ত্রীর ড্রেসিংরুমে, যেখানে শাড়ির বাহুল্য খুলে খুঁজে নিচ্ছে তার পলকা শরীর একপ্রস্থ নাইটির পাপড়ি। কিন্তু না, সে উড়তে পারে না। বদলে প্রতিবারের মতোই ডানার ভারে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কার্পেটের নরম ঘাসে। বিবমিষায় ভরে যায় আশপাশ। আরশাদের বেয়ারারা অতঃপর তাকে কোলকুঁজো করে নিয়ে যায় জলের তলায়। আর তার ডানা দুটো সেই জলের তোড়ে ভেসে যায় এক সময়, স্নাত শরীরে সে ভারমুক্ত হয়, তখন তার মনেও থাকে না মুনমুন ভাবীর চৌম্বক চাউনির কথা। বরং একথা ভেবেই সে উৎকন্ঠিত হয়, বাড়ি ফেরার বাস কি আর পাওয়া যাবে! অবশ্যি আজ একটু বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় আরশাদ নিজেই তাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। পথিমধ্যে নেমে গেল বুলবুল, ইসাহাক আর অম্লান। শহরের প্রায় শেষপ্রান্তে তার বাসা। ড্রাইভার গজগজ করছিল বেশ। আর গজগজ করবেই বা না কেন, রাত তো কম হয়নি! তার ওপর গাড়ির আরোহীরা যদি বেসামাল হয়, তাজা এ্যালকোহলের গন্ধে শালার ড্রাইভারের গলা তো খুসখুস করতেই পারে। তো কাটাখালী বাস স্টপেজের ডানহাতি গলির ভেতর ঢুকে ব্যাটা বলে কিনা আর যাওয়া যাবে না। আপনি এখানেই নেমে পড়ুন।

খোলা হাওয়ায় একটু তন্দ্রামতন এসেছিল। সেটার চটকাটা ভেঙ্গে গেলে সে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়। আর কিছুটা গেলেই তার বাসা। অবশ্যি এ গলির অপ্রশস্ত শীর্ণ অবস্থাতে আরশাদের মেদবহুল গাড়ি ঠিক মানানসই নয় একথা সে মনে মনে স্বীকার করে নেয়, তার ওপর গাড়ি ঘোরানোর মতো তেমন কোন জায়গাও নেই বলে বিনাবাক্যে সে নেমে আসে অন্ধকারে। এদিকটা মিউনিসিপ্যালিটির আওতাভুক্ত নয় বলে কোন বাতিটাতির ব্যবস্থা নেই পথের আকাশে। বাড়িওয়ালাগুলোও হাভাতে, পোর্টিকো কিংবা বাড়ির কোনাকুনিতে একটু আলোর হলুদ ছুঁইয়ে

রাখবে তার কোন বালাই নেই। সুতরাং নিজের চোখের আলোয় ঠাহর করে পথ চলা আর কি। যদিও চতুর্দিকে মহাজাগতিক একটা আলো অবশ্যি ছিল। চন্দ্রশূন্যহলেও নক্ষত্রশূন্য নয় তো মহাশূন্য। তাই দিব্যি সে পেরিয়ে এলো খানাখন্দ, বাবলা ঝোপের কালো, মিনহাজ সাহেবের গরুর খাটাল, আয়নুদ্দীর মনোহারী দোকান। সে সাবিহাকে বরাবর বলে রেখেছে যে, বারান্দার লাইটটা যেন জ্বালানো থাকে, কিন্তু আজও বন্ধ। অথচ তারা নীচতলার বাসিন্দা, বাড়িঅলাই বরং দোতলায় থাকেন, কোলাপসিবল গেটও ওই দোতলাতেই। সে একটু রাগত পায়েই শব্দ তুলে কলিংবেলে হাত রাখলো। এরা পেয়েছে কি, তার কথার কি কোন দাম নেই! আজ সিওর একচোট হয়ে যাবে। একে তো একটু নেশায় পেয়েছে তার, তার ওপর মুনমুন ভাবীর শঙ্খের মতো সাদা গলার নীচের গিরিখাত এতো উৎকটভাবে নির্দেশিত ছিল যে তাদের সব বন্ধুরই অবস্থা হয়েছিল মথপোকার মতো। তারা সবাই ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছিল সেই আলোকবর্তিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। কিন্তু আহ্লাদ তো তাদেরই একজন, সে কি আর জানে না কখন কাকে সরিয়ে নিতে হয়। আর তাই অবদমিত সেই নেশাটা পুনরায় সংক্রমিত হলো তার শরীরে। নাঃ সাবিহার সঙ্গে আজ ঠিক একচোট হয়ে যাবে। সেই কবে থেকে তার শরীর পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। অনাবাদী মাটির মতো রুক্ষ। সাবিহার ক্রমোর্ধমান পেট এখন এমনই ভরভরন্ত যে, সে চাইলেও আর সম্পর্কিত হতে পারে না তার সাথে। সামনেই ডেট, সাবিহার মা-বাবার নিয়ে যাবার কথা এর মধ্যে, কেননা এখান থেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অনেক দূর, তার ওপর টেলিফোনও নেই। যোগাযোগ বলতে বাস না হয় ঢিমে তালের রিক্সা। তবে মাঝে মধ্যে বেবিট্যাক্সি যে পাওয়া যায় না তা কিন্তু নয়। টেলিফোনও আছে কাটাখালী বাস স্টপেজের পাশের ডাক্তারখানায়। আর সবচে যেটা সুবিধা তা হচ্ছে তাদের বাড়িঅলা মানুষটি বেশ ভালো রকমের বলা যায়। তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে যে কোন সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে আছে সব সময়। এবং এই জন্যই রাত বিরাতে ফিরতে তার তেমন উৎকন্ঠা থাকে না বাসার জন্য। কিন্তু কলিংবেলের চড়ুই পাখিটি কি আজ যথেষ্ট সোচ্চার নয় নাকি ব্যাটারি ক্ষয়ে গেছে বলে কোন প্রত্যুত্তর নেই ভিতর থেকে। সে এবার কড়ায় হাত দিলো। আর তখুনি সে বুঝতে পারলো তার ভুলটা। কড়ায় তালা। তার মানে সাবিহার কিছু হয়েছে। কিন্তু তার ডেট তো সামনের মাসে, ডাক্তার নিজে তাকে বলেছেন কোন চিন্তার কারণ নেই। সাবিহার শরীর বেশ ভালো আছে, তেমন পানিটানি জমেনি। বাচ্চার নড়াচড়াও স্বাভাবিক। সুতরাং হাসপাতালে তার ভর্তির কথা ডেটের আগেভাগে, তাহলে ? সে সিঁড়ির কোলাপসিবলে ঝাঁকুনি দেবার আগেই বাড়িঅলার বড় ছেলে নেমে এলো। এসেছেন তাহলে ? বলে বাতি জ্বালিয়ে একেবারে মুখোমুখি। কোথায় ছিলেন ? আপাকে রাত সোয়া ন'টায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আম্মা সেখানেই থেকে গেছেন। ইলাও। আপনার শ্বশুরবাড়িতেও খবর দেয়া হয়েছে। নাগাড়ে কথা বলে হাঁফ ছাড়ে ছেলেটা। আর সে নিজে তখন উদভ্রান্ত কিছুটা। সাবিহা কেমন আছে ? অফিসে যাবার সময় অসুস্থতার বিন্দুমাত্র তার চোখে পড়েনি। বরং রোজকার মতো তার হাতে রুমাল, মানিব্যাগ ধরিয়ে দিয়েছিল। সে একলাফে গাড়িবারান্দা ক্রস করলে বাড়িঅলার ছেলে বললো, আপনি এতো রাতে কোথায় যাচ্ছেন ? আম্মারা তো ওখানে আছেনই। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। আপনি বরং সকালেই যান।

সে কোন কথা শুনলো না। মদ্যপানের একটা আনন্দিত প্রভাব দুশ্চিন্তার আক্রমণে উধাও আপাতত। তাই তার পা দুটো আর উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতায় নেই বরং মাটিতেই স্থির। কিন্তু তাকে তো হাঁটলে চলবে না। দৌড়ুতে হবে। মধ্যরাত এখন প্রায় অতিক্রান্ত। সাবিহা না জানি কেমন আছে। কিছুদিন আগে আলট্রাসনোগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। মনোয়ার ভাই বলেছিলেন, কি হে তারিক, জানতে চাও নাকি ছেলে না মেয়ে ? সে বলেছিল, না। যে সন্তান এখনও গর্ভের অন্ধকারে, সে শুধু সন্তানই, তারপর পৃথিবীর আলোয় এসে সে নিজেই না হয় তার পরিচয় ব্যক্ত করুক যে, সে ছেলে না মেয়ে। যদিও সাবিহা খুব উন্মুখ ছিল জানবার জন্য। কেননা তার বদ্ধমূল ধারণা সে পুত্রসন্তানের জননী হবে। অথচ তারিকের নিজের যদি

মনোবাসনা বলো তো কন্যাসন্তানই তার চাই। যে তার একাধারে মা হবে, বোন হবে। আহা মেয়েই যেন হয় ঈশ্বর।

সামনেই কাটাখালী বাস স্টপেজ। সে কি ভেবে তার স্পীড কমালো। একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে না ? স্ট্যান্ডের চাতালে দেখি জুয়ার আড্ডা বসেছে। গোটা সাতেক জুয়াড়ির মুখ খিস্তি আর তাস-টাকার ভাগবাটোয়ার উষ্ণতা জায়গাটাকে সরগরম করে তুলেছে। সে লাল লন্ঠনের আলোয় নিজেকে দাঁড় করালো। এই রিক্সা কার ? বলে দামদস্তুর করতে খুব বেশি কসরত করতে হলো না তার। এক ক্ষয়াটে লোক তাকে তার রিক্সায় ওঠাতে তৎক্ষনাৎ রাজি হওয়ায় সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এখন ঘন্টা দেড়েক রিক্সার দুলুনিতে নিজেকে ছেড়ে দেয়া আর কি।

এই রোড সোজা সাহেব বাজার গিয়ে মিলেছে। তার আগে অবশ্যি তালাইমারীর ডান হাত বরাবর এর একটা শাখারাস্তা সেরিকালচার হয়ে মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে সখ্য করার পাঁয়তারা করছে। তারিক অনেকবার ও রাস্তায় গেছে। পাশে রেললাইনের দীর্ঘ পথ। মাঝে মধ্যে ট্রেনের সঙ্গে হুটহাট দেখা। ছাঁটা মাথা তুত গাছের বিহুল চাউনি ইমারত চৌধুরীর সেই ছাইরঙা দালান। ভালোই লাগে। তবে এখন তার মাথায় জটিল সব প্রশ্ন অকারণে হল্লা করছে বলে কোন পার্শ্বছবি তাকে আর নাড়া দেয় না। নইলে রিক্সা যেভাবে টিমেতালে ভার্সিটির অলিন্দ ছুঁয়ে এগোচ্ছে তাতে তো তার অনেক কিছুই মনে পড়বার কথা। কিন্তু না। পারিবর্তে একধরনের অপরাধবোধ সে অনুভব করে এই নির্জন অন্ধকারে পিঠ ঠেকিয়ে। আজ সে না গেলেও পারতো আরশাদের বাসায়। তাদের এই বিত্তশালী বন্ধুটি কেবল তো ওইটুকুই খাওয়ায় যতোটা তাদের স্বল্পবিত্ত পেটে ধরে। এর বেশি কিছু তো নয়। নইলে মুনমুন ভাবীর আশ্চর্য শাদা হাতের স্পর্শ সে কখনও পায় না কেন, কেনই বা আরশাদের রাক্ষসসদৃশ এ্যালশেসিয়ানটা পথ পাহারায় থাকে। আসলে আমাদের দেখাও না ? দেখাও যে কতো আছে তোমাদের। গলায় টার্কিস সোনার মোটা শেকল পরো, পকেটে ছোট্ট টেলিফোনের অভিজাত্য ফোটাও, আসরে সুন্দরী বউয়ের গিরিখাত দেখিয়ে একটু ঈর্ষাজনিত লালা ঝরাও আমাদের শুকনো জিভে। আহা, কতো আছে তোমাদের, না ?

সে ভিতরে ভিতরে এভাবেই নড়েচড়ে ওঠে। শ্রেণীবিভেদের সেই চিরাযত সংজ্ঞা ঝুলতে থাকে তার বোধের ওপর। কেননা তারা যা পারছে না, আরশাদ তা অবলীলাক্রমেই পেরিয়ে যাচ্ছে। মুশকিলটা হয়েছে আসলে এখানে। নয়তো প্রতি মাসান্তে প্রায় রাজকীয় স্টাইলে পেট ভরে মদ্যপান করার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে! বিশেষত যদি তারা হয় নিতান্তই ছাপোষা গোছের কেউ। শহরতলিতে থেকে বাড়িভাড়া বাঁচানো, বাসে ঝুলে নিত্য আসা-যাওয়া যাদের ভবিতব্য। এর থেকে পরিত্রাণের আর কোন পথ নেই বলেই তারা আসলে শ্রেণী বৈষম্যের ধুয়ো তুলে নিজেদের সান্ত্বনা দেয় নাহয় মনে মনে বন্ধুপত্নীর নগ্ন শরীরে হামলে পড়ে। অথচ ছাত্রাবস্থায় চে' গুয়েভারা তাদের আদর্শ ছিল। লোরকার কবিতা পড়তে পড়তে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় জয়ন্ত খেদোক্তি করতো, দেশের জন্য কিছু করতে পারলাম নারে। আর আরশাদ তার স্বভাবজাত দরাজ গলায় যখন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান ধরতো তখন দেশ এবং জননীর ভিতর কোন প্রভেদ তারা অনুভব করতো না। কিন্তু এখন দেশের প্রতি টান বলতে নিজের রুজি নিজেকে যোগাড় করার স্পৃহাকে বোঝে। আর জননী তো অতীতকাল, ঝাপসা স্মৃতি বই কিছু নয়। তারিকের মাথায় এই মুহূর্তে 'জননী' শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ সাবিহার ভাবনা এসে সংযুক্ত হয়। সাবিহা ভালো আছে তো ? মনে হতেই প্রিন্স চার্লসের সেই হাস্যদীপ্ত চেহারা উদ্ভাসিত হয়। চার্লস ডায়নার প্রসবকালীন সমস্ত যন্ত্রণা চাক্ষুষ অনুভব করেছিলেন গভীর নৈকট্যে; কিন্তু এতে কি নৈকট্য সম্পর্কের খুব বাহাদুরি ফলানো গেছে পরবর্তীকালে। কিংবা আমার বাবার কথাই ধরো। তার মাস্টারী জীবনে সর্বমোট ১০জন পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে যথানিয়মে। রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট্ট ঘর ছিল, যাকে শহুরে ভাষায় তোমরা স্টোররুম বলতে পারো, সেটাই ছিল মাত্র অস্থায়ী আঁতুড় ঘর। প্রসবের সময়কাল এসে গেলেই একটা ভারী পর্দা ঝোলানো হতো এসময়। মায়ের নিকটাত্মীয়রা কেউ কেউ এসে থাকতো সাহায্যের জন্য। স্কুল থেকে ফিরে

বাবা উৎকন্ঠিত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করতেন, কি হয়েছে ? ব্যাটা না বেটি ?

আমি হয়তো বলতাম, ভাই হয়্যাছে বাবা। খুব সোন্দর।

বাবা বলতেন, অ। বলে গম্ভীরমুখে অজু করতে বসতেন। পুত্রসন্তান হলে আজান দেবার নিয়ম কিন্তু তাঁর অসুখী মুখ দেখে আমরা ঠিকই অনুমান করতে পারতাম যে, তিনি আসলে কি চান। আর তাঁর এই চাওয়াটা ফুলফিল করতে না পাবার দোষ আমার ক্ষীণাঙ্গী মায়ের ওপর বর্তাতো। প্রতিবছর তাই কন্যাসন্তান কামনায় তাঁর গর্ভ কখনও শূন্য হতো না। সাবিহা মাঝে মধ্যে একথা শুনে শিহরিত হয়। ক্রমোজমের xy বিষয়টি সে ভালো জানে বলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলতে দ্বিধা করে না। তারিকের নিজের কোন ট্যাবু নেই কিন্তু তার জিন যা বহন করছে অর্থাৎ তিনপুরুষের সেই কন্যাকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষাকে তো অস্বীকার করতে পারে না, ফলে তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখে একটি কন্যাসন্তান। যদিও কিছুক্ষণ পরে বিক্সা যখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে পৌঁছায় তখন তার আচ্ছন্নতাটা আর থাকে না। লেবার রুমের ভিতর থেকে পীড়িত সাবিহার অস্ফুট কাতরোক্তি তাকে এমনভাবে বিদ্ধ করে যে সে তার শাশুড়ির পরামর্শদাতা আযাতুল কুরশী মনে মনে পড়তে পারে না। বরং ঈশ্বরের কাছে শাদা বাংলায় সে নত হয়ে এই বলে, সাবিহা যেন সত্বর এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। তার আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা নেই আপাতত।

লেবার রুমের উল্টোদিকে সাত নম্বর ওয়ার্ড। বারান্দায় তার শ্বশুর মশাই অস্থিরভাবে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। বাড়িঅলী খালাম্মা এরই মধ্যে কোত্থেকে এক জায়নামাজ যোগাড় করে তসবী নিয়ে বসে গেছেন। ইলাই কেবল ব্যতিক্রম। বারান্দার রেলিঙে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখছে যেন এই যন্ত্রণার অস্ফুট ধ্বনি থেকে সেও উপশম চাচ্ছে। সে একটু এগিয়ে গেলে চাপা স্বরে বলে, আপা খালি আপনার কথা বলছিল। এখানে এসেও, জানেন!

ঃ কি বলছিল ?

ঃ বলছিল আপনার খাওয়া দাওয়ার কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারিক ম্লান হাসলো। সাবিহা জানে না যে সে যখন হাসপাতালে তারিক তখন আরশাদের পানপাত্রে আটকে আছে। মুনমুন ভাবীর শরীরী গন্ধে একেবারে অন্ধ আকুল। আর সাবিহা জানলেই বা কি, তারিক কি এই ক'মাস সাফার করছে না তার জন্য! তাছাড়া মহাত্মা গান্ধীর কথা তো এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হতে পারে, বলো পারে না কি ? তো ইলা বলতে থাকে ফ্লানেলের ছোট ছোট জামার কথা, ত্রিকোণ ন্যাপির কথা, ডিসপোজিবল ডায়াপারের কথা। কিন্তু কাঁথাও তৈরি হয়ে আছে মহিলা কল্যাণ সমিতির কল্যাণে। তাছাড়া সরষেদানার নরম বালিশের কথা তারিক নিজেও ভেবেছিল একদা। তাদের ভাইদের মাথার গড়ন মন্দ না। কিন্তু সাবিহা এটাকে অনুমোদন করেনি। কাজল লতাও তার তালিকাবহির্ভূত। অথচ শিশুর চোখে কাজল থাকবে না এমনটি তারিক মানতে নারাজ। তার মা সলতে পাকিয়ে খাঁটি ঘি দিয়ে কাজল বানাতেন। ধোঁয়া ধোঁয়া পোড়াটে গন্ধ থাকতো তাতে। আর কপালের একপাশে কালো নজর টিপ তো তারা বেশ বড় হয়েও পরেছে।

তো ইলা আকাশগঙ্গার বালিগুলোর দিকে তাকিয়ে এও বলতে থাকে যে, সাবিহা তার কাছে মাফ চেয়ে গেছে।

ঃ মাফ ! কেন ?

ঃ বাবে যদি কিছু হয়ে যায়। বলা তো যায় না।

যদি কিছু হয়ে যায় মানে! সাবিহার শরীর ভাল বলেই জানে সে, বাচ্চার অবস্থানও খারাপ নয়। আর এখানে ডাক্তার সাহেবরা না থাকলেও যাদের হাতে ডেলিভারি হবে তারা তার খালাতো শালার ক্লাসমেট সব। খোকন নিজেও আছে সঙ্গে। তারপরেও সাহিবার মাফ চাওয়ার বিষয়টি তাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। সাবিহা সব সামাল দিতে পারবে তো ?

বোধহয় একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করেছিল সে। কেননা, সাবিহা ঠিকই প্রাকৃতিক নিয়মে

সন্তান ভূমিষ্ঠ করেছে বলে জানা গেল একটু বাদেই। এবং তারিকের পারিবারিক ঐতিহ্য স্বভাবতই বজায় থাকলো পুত্রসন্তান জন্ম নেয়ায়। খবর পেয়ে তার শ্বশুর সাহেব বারান্দার খোলা আলোয় 'সহজ নামাজ শিক্ষা' বইটি খুলে আজান দেবার নিয়মকানুন দেখতে থাকলেন। যদিও হাসপাতালে আজান দেয়াটা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা অবশ্যি কেউ বলতে পারলো না। আর শালা দৌড়ুলো মিষ্টির ব্যবস্থা করতে।

ঃ দেখুন দুলাভাই, কি সুন্দর বাবু।

সাত নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর বেডের পাশে বেবিকটে শুইয়ে রাখা হয়েছে নবজাতককে। আপাতত এখানেই অবস্থান তাদের। তারপর বিকালে কেবিনের ব্যবস্থা হবে। সে গোলাপী মাংসের দলাটাকে দেখবার আগেই সাবিহার খোঁজ করলো। সাবিহা তখনও ফেরেনি। তার স্টীচ চলছে। বাড়িঅলী খালাম্মা লেবার রুমের দরজার সামনে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, এখনও ফুল পড়েনি এ কেমন কথা ? ফুল মানে গর্ভফুলের কথা বলছেন বোধহয়। অর্থাৎ প্লাসেনটা। জননী আর সন্তানের মধ্যের যোগসূত্র। অথবা একে জন্মনাড়িও বলা যেতে পারে। লেবার রুম থেকে একজন আয়া বের হয়ে এলে তার শাশুড়ি এবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ফুল পড়েছে ?

ঃ হ্যাঁ। বলে ব্যস্ততা দেখালে সে তাকে সামনে থেকে আটকায়।

ঃ ওটা পুঁতে ফেলতে হয় না ?

ঃ হ্যাঁ। পয়সা দিলে আমরাই পুঁতে ফেলি।

ঃ কোথায় ?

ঃ কোথায় আবার, ওই বাগানে .... বলে পাতাবাহারের ঝোপের বাঁধন দেয়া উঠোনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে। অথচ তারিকের নিজের ভাইদের নাড়ি পোঁতা আছে তাদের বাড়ির নিজস্ব উঠোনে। আঁতুড় ঘরের পাশে একটা মেহগনি গাছ ছিল, তারই নীচে তাদের জীবিত ৬ ভাই এবং মৃত ৪ জনের নাড়ি পোঁতা আছে সযত্নে। আর তার সন্তানের নাড়ি কিনা এভাবে পড়ে থাকবে অনাদরে, অবহেলায়! কিন্তু সেই বা কি করবে যখন তার শাশুড়ি নিজেও খুব একটা গরজ করছেন না বিষয়টি নিয়ে।

ঃ হাসপাতালে নাড়ি পোঁতা !

পাশ থেকে বাড়িঅলী খালাম্মা স্বগতোক্তি করলে সে এবার নড়ে ওঠে। অচেনা অজানা বাগানভূমিতে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার রাজসাক্ষী ঐ গর্ভফুল, ঐ টানসূত্রের নাড়ি কিভাবে একাকী রোপিত থাকবে, কিভাবেই বা 'নাড়ির টান' শব্দ দু'টির ব্যবহারিক অর্থ বহন করবে তার উত্তরাধিকারী ? অথচ এখানে তার নিজস্ব কোন বাড়ি নেই, নেই এক চিলতে রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা উঠোন, উঠোনের লম্বা মেহগনি গাছ, গাছের নীচের ছায়া। তাহলে কোথায় নিদ্রিত হবে এই টানসূত্রের দলা ? তার কি তাহলে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া উচিত নয় ?

যদিও সে তেমন সংস্কারাচ্ছন্ন নয়, তবু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ভোরের প্রথম বাসটি ধরতে তার ভালই লেগেছিল। এখন মুচকুন্দপুর যেতে আর ট্রেনের পা ধরতে হয় না। নবাবগঞ্জ বাস টার্মিনাল থেকে ননস্টপ বিআরটিসি কোচ আছে, একটানা চলে যাওয়া যায়। অথচ আগের কথা একবার মনে করো দেখি। সেই রাজশাহী স্টেশন ছুঁয়ে তারপর আমনুরা জংশন। সেখানে গাড়ি বদলে রহমপুরগামী ট্রেনে ওঠা। বরেন্দ্রভূমির লালমাটি, আদিগন্ত ফসলের টানা বিস্তার শেষে ট্রেন যখন রহনপুর পৌঁছুতো তখন অলরেডি যাত্রীদলের বারোটা বেজে যেতো। তো বিআরটিসি'র বাসটিও যে ধোয়া তুলসীপাতা নয় তা বেশ বোঝা গেছে এর মধ্যেই। চৈত্রের খররৌদ্রে কখনও থামছে, লোক উঠাচ্ছে মাথার ওপর। সে অবশ্যি কিছু মনে করছে না। কেননা এটাইতো নিয়ম। নয়তো এ বাস যদি কেবলমাত্র তার সিটের যাত্রী নিয়ে যাত্রা করতো, কোথাও মুখ ফেরাতো না তাহলে তার ট্রাডিশন রক্ষা হতো কি করে। এই যে সে যেমন একটা মাটির ভাঁড় হাতে ঝুলিয়ে যাত্রা করেছে বছর সাতেক বাদে, এও কি প্রথা রক্ষার কারণে

নয় ! লেবাব রুমে উপস্থিত নার্স দু'জন, খোকন এবং খোকনের ক্লাসমেট—এবা সবাই নিঃসন্দেহে তার ওপর নাখোশ, সাবিহাও খুশি নয় তার বাড়াবাড়িব মাত্রায়, ছয় ছয়টি সেলাইয়েব ধকল সামলেছে সে ঠিকই কিন্তু তা বলে তারিক এরকম সামান্য বিষয় নিয়ে এমনই খেপে উঠবে যে, নিজেব সন্তানকেও তেমনভাবে দর্শন কববে না ' ববং নতুন ভাঁড় কোথায় পাওয়া যাবে সে চিন্তায় অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করবে সারা হাসপাতাল ? লোকটা কি মানুষ নাকি মানসিক বৈকল্যেব শিকার ' কিন্তু সেটিও বলা যাচ্ছে না । আবশাদ ভাইয়ের বাসায় সামান্য একটু পান কবতে যাওয়া ছাড়া আব কোন ক্রটি সে হাতড়ালেও পাবে না । সেও তো মাসে একবার। অগত্যা সাবিহা তারিকেব উড়োখুড়ো মুখেব ওপব থেকে দৃষ্টি সবিয়ে ছেলের দিকে নিবদ্ধ করে। তাবিকেব আবাধ্য ছিল কন্যাসন্তান । সে কি আসলে এই বেদনায় গর্ভফুলেব ছুতোয দূবে সবে যাবাব চেষ্টা কবছে না !

এ কথা মধ্য পথে অনেকবাব ভেবেছে সে নিজেও । কিন্তু এ ধাবণার পিঠে কোন যুক্তি নেই । ববং তাদের ভিটামাটিব ভিতব তাব নাড়ি প্রোথিত হবে এটাই চূড়ান্ত বিষয় । এব বেশি কিছু নয় । কেননা গ্রামেব বাড়িতে সে যায না প্রায ৭/৮ বছব হযে গেছে । আগে বাবা-মার মৃত্যুবার্ষিকীগুলো তাবা সব ভাই মিলে গ্রামেই উদ্যাপন কবতো । কিন্তু পববর্তীতে সবাই যে যাব জীবনযাপনেব ফ্রেমে আটকে পডায আব তাবা একত্রিত হতে পারে না । এমনকি সে নিজে যে এতো কাছে থাকে, বাস কিংবা ট্রেনে উঠে পড়লেই হয এক সকালে — সেও হয না । সাবিহা অবশ্যি তাব শ্বশুবালয়ের সম্পত্তি-টম্পত্তি আছে কিনা তাব একটা হিসাব নিকাশ কববাব চেষ্টা চালিয়েছিল বিয়েব পবপব। তাবিক তাকে নিবাশই করেছিল বলা যায ।

তাদের ৬ ভাইযেব শিক্ষাজীবন, হোস্টেলে থাকা ইত্যাদিব খবচাপাতিব সবই এসেছে জমিজমা বিক্রিব টাকা থেকে । আমাব দাদা ১০০ বিঘা চাষেব জমি বাবাব জীবিতকালেই নিশ্চিহ্ন কবে দিযে গেছেন । বাকি ছিল ভিটা সংলগ্ন ১০ কাঠা জমি। সেটিতে হাত দেবাব পূর্বেই তিনি গত হন । আব মাতো তাঁব আগেই গেছেন । সুতবাং বাবাব মৃত্যুব পব দেশেব বাড়িব আকর্ষণশক্তি আব থাকলো না । মাঝে একবাব কথা উঠেছিল ভিটামাটিব বন্দোবস্ত নিয়ে। বাবেকটা একটু খবিশ টাইপেব, সে চেযেছিল বিক্রিবাটা কবে কিছু টাকা হাতিযে নেবে। কিন্তু তাবিক এবং তাব অন্যভাইবা এ ব্যাপাবে মত দেয়নি । শামসু কুযেত থেকে খবব পাঠিয়েছিল, শিগগিব সে দেশে ফিবে তাদেব ভিটামাটিব ওপব বাবাব নামে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা কববে । তাদেব অন্য ভাইদেবও এই মত । কিন্তু শামসু 'আসব' 'আসব' কবে কত বছব পাব কবে দিলো, এখনও সেই সুবাহা আর হলো না । গত তিন বছব চান মিযাও আব আসে না। আগে তবু ক্ষিরসাপাত, ল্যাংড়া আমেব ভাগটা সে দিয়ে যেতো, দিনাজপুবী বামুন লিচুগাছ ছিল দুটো, সেটাব ফল না দিলেও খাজা কাঁঠালেব চালান দিতে ভুল হতো না তাব । কিন্তু এই তিন বছব কিছুই আসেনি । ভাইদেব সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয, তাদেবও একই অভিযোগ। কিন্তু ও পর্যন্তই । কেউই আব আসল খবব জানে না ।

বাসেব ঝাঁকুনিতে একটু তন্দ্রামতন এসে দাঁড়ালে সে হঠাৎ চমকিত হয় । সাবিহা এই অসুস্থ শরীবে কেন নেমে এসেছে । তাব হাতেই বা কি ওটা ? সে কাছে এগিযে গেলে দেখতে পায় সাবিহাব কোলে কোন শিশুটিশু নেই । যা আছে তা হলো সব নাডিভুঁড়িব স্তূপীকৃত বর্জ্য মাত্র । সাবিহা তাকে বললো, কোনটা আসল বলো তো ?

তাব কানে বাজতে থাকল 'কোনটা', 'কোনটা' ' কিন্তু সে ঠাহব কবতে পাবল না সাবিহা আসলে কি জানতে চাইছে । গতবাতে মুনমুন ভাবীব শাদা কাঁধ দেখে সে কাতব হযেছিল সত্য তবে একেবাবে ভেঙ্গে তো পড়েনি । আর সাবিহাব তো সেকথা জানবাব কথা নয় । তাহলে ? সাবিহা এবাব শূন্য থেকে তাব মাথাব ওপব ছুঁড়ে মাবলো সেই বর্জ্যগুলো। তাবিক তা এড়ানোর চেষ্টা করেও পাবলো না । একে তো দাঁড়ি কামানো নেই, স্নান নেই, 'কাপড় পাল্টানো নেই' — তাব ওপব সাবিহার ছুঁড়ে দেয়া বর্জ্যপদার্থ মাথাব চাবপাশে স্প্যাগেটির মতো ঝুলতে লাগলো । আঁশটে এক অসহনীয় দুর্গন্ধে ভবে উঠলো তাব শরীব ।

সাবিহা সাবিহা সাবিহা এগুলো সবাও প্লিজ ।

সে বিড়বিড় করে ডাকে সাবিহাকে।

সাবিহা তখন উধাও বাসের সশব্দে ব্রেক কষার ধাক্কায়। গাড়ি এখন দাঁড়িয়ে আছে সন্তোষপুরের এক বিরান এলাকায়। টায়ার পাংচার। বদলাতে সময় নেবে। এই ফাঁকে যে ছায়ার শীতলপাটিতে তারা জিরিয়ে নেবে সেরকম কোন ছায়াবতী বৃক্ষ নেই আশেপাশে। সবুজও প্রায় বিরল। তবে একটু মেহনত করে হেঁটে যেতে পারলে আধা মাইলটাক উত্তরেই গ্রামটার নাগাল পাওয়া যাবে। পুরনো কাছারিঘর ছিল গ্রামের মুখে। তার পাশেই বয়েদা খালার বাড়ি। জাঁদরেলের জোড়া গাছ, ছোট ইটের গাঁথুনি দেয়া বিশাল ইঁদারা, গ্রীষ্মের টানের সময়েও সেই ইঁদারা শুকোয় না কখনো। তারিক কি যাবে সেখানে? একটু চা পেলে মন্দ হতো না! ভোরে শাশুড়ির কল্যাণে ভরপেট নাশতা করা হয়েছে। এখন দুটো বিস্কিট এক কাপ চা পেলেই চলতো। কিন্তু সেটির আয়োজন কে করবে? হাড়কেপ্পন বলে কি আমাদের সবাইকে উপমিত করা হয় না। এখানকার মানুষ খালি জানে মাষকলাই ডাল আর বেগুনভর্তা খেতে। অথচ এমন সোনাফলা ধানী জমি, আমের মধুর মরশুম — এগুলো থেকে টাকা কম আসে না। তবু তারিক লক্ষ্য করেছে, মানসিকভাবে এরা খুবই অর্থগৃধ্নু কেবল জমায়; খরচ করে না। যদিও তার নিজের বাবাকে এই কাতারে বন্দি করা যায় না। বাবার বেশ খরুচে হাত ছিল, ১০০ বিঘা ধানী জমির সবটা নয়তো এভাবে হাতছাড়া হয়ে যেত না।

চৈত্রের খররোদে ঝলসে যাচ্ছে সন্তোষপুরের মাটি। টায়ার বদলাতে বদলাতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারিকের পাশের ভদ্রলোক এক টুকরো রুটি আর একজোড়া সবরিকলা দিয়েছিলেন বলে খিদে ছিল না। কিন্তু গরমে সে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। শালা সরকারী জিনিসের নিকুচি করেছি। একটা সামান্য চাকা পাল্টাবি তাও তোদের টুলবক্স নেই, এর জন্য আবার ঘন্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হয়। তারপর গদাই লস্করি চালে এক প্রাইভেট বাস আসে, তার কাছ থেকে টুলবক্স ধার করে অতঃপর বাসের বসে যাওয়া নিতম্ব ঠিক হয়। তারপরও যে বাস তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাবে তা সম্ভব হয় না। কেননা তখন অনেক যাত্রীই এদিক-ওদিক ছড়ানো। তাদেরকে একত্রিত করবার হ্যামিলনের বংশীবাদক কই? বাসের ফ্যাশফেশে কণ্ঠস্বর তো কেবল নিজেকেই শোনালো যেন। সুতরাং এখানেও দেরী কম নয়। পাশের ভদ্রলোক বললেন, সমস্ত উত্তরবঙ্গে এই অবস্থা। রাস্তা চালু থাকলে বাস চলে না। আর বাস চললে রাস্তা বন্ধ। এই করেই মরলো এদিককার মানুষ।

আর তারিক তখন ভাবছে অন্য কথা। সাবিহা কিংবা সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে ফেলে আচমকা এই আবেগঘন সিদ্ধান্ত নেয়া কি ঠিক হয়েছে তার? আজ সাপ্তাহিক ছুটি বলে দেরি হলেও অসুবিধা হচ্ছে না, তবে কাল প্রথমার্ধে ফিরতেই হবে। কিন্তু তখনও যদি টায়ার ফেঁসে যায় অথবা রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে! পাশের ভদ্রলোক আবার বললেন, যেন ঢাকা থেকে ফিরছি। টাইমিংটা এমনই মনে হচ্ছে। সেই ভোরে ওঠা। মাঝে ফেরির ব্যবস্থাটা হলো সন্তোষপুরে। এখন পাবনা। তারপর নাটোর। পুঠিয়া। এরপর রাজশাহী। সুতরাং সন্ধ্যা আজ অবধারিত দেখবেন।

তারিক হেসে ফেললো। ট্রেনে অবশ্য এমনিতেই সন্ধ্যা হয়ে যায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে। আর এত ধুলাবালিও খেতে হয় না। তাছাড়া ননস্টপ বাস বলে ভাড়াটাও তুলনামূলকভাবে বেশি। তারপরও যদি ঢাকার জার্নির মতো এমন ক্লান্তিকর সময় ক্ষেপণ ঘটে তাহলে তো রেগে উঠবারই কথা। কিন্তু আমবাগানের গাঢ় ছায়া লম্বা সারি এখন পথের দু'পাশে বলে কেউ আর কথা বলছে না। খোলা জানালা দিয়ে হামলে পড়া ধুলার গন্ধের সঙ্গে আমের বোলের মধুগন্ধ মিশে এক অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি করেছে। আহা, কতদিন পর এমন গন্ধ পাচ্ছে সে, কতদিন পর এমন টান অনুভব করছে। এরকম নিভে যাওয়া সন্ধ্যায় কি সে বাড়ি ফিরে আসতো না! উঠোনে খড়ের পালা, সন্ধ্যামালতীর ঝোপে গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকার জোট বাঁধতে থাকতো নিঃশব্দে, লণ্ঠনের ম্লান আলোর সাধ্য কি সেই অন্ধকার তাড়ায়। আমরা ৫ ভাই বারান্দায় সার বেঁধে পড়তে বসতাম আর সবচে' ছোটটিকে কোলে নিয়ে মা তখন ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে বসতেন। লণ্ঠনের লাল আলোয় মায়ের চোখের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসতো। স্পষ্টই

মনে পড়ে আমার, মা আসলে সেই গানের গুনগুন সুরধ্বনিব মধ্য দিয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে চাইতেন। তাঁর নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠতো। ভিতবে ভিতবে তিনি বোধহয় কাঁদতেনও, নাকি স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়তেন আমের মুকুলের গন্ধ ভারাক্রান্ত সেইসব অন্ধকার সন্ধ্যায় কে জানে! অথচ সাবিহার কথা ধরো। সে কিনা শহরের ছাঁচে তৈরি বলে আবেগেব মাত্রা কম। দুর্দান্তভাবে টাকাপয়সার হিসাব বোঝে। বাবার ছিল ১০০ বিঘা জমি আব আমাব এক কাঠাও নেই বলে সাবিহা ডিপিএস বোঝে, ডাকঘর সঞ্চয়পত্র বোঝে। আর বোঝে বলেই আমার হতশ্রী মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর আসলে কিছুই ছিল না। তাঁর 'ছিল' বলতে ঐ একটিই ছিল 'মাতৃজঠর' যার নাম — যার ভিতর একদঙ্গল পুত্রসন্তানের এক একজন পুবো ১০ মাস ১০দিন আশ্রয় গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়তো পৃথিবীর পথে, কিন্তু পিছনে ফিরে দেখতো না তাদের সেই অভয়াশ্রয়কে।

সাইফুদ্দিনের কাঠগোলার কাছেই নেমেছিল সে।

এখান থেকে বাস চলে গেল সোজা পশ্চিমে, রামচন্দ্রপুরে এ স্টপেজে তারিকই একমাত্র যাত্রী। কাঠগোলা বন্ধ। পাশের চায়ের স্টলটি নতুন। ভারেণ্ডা গাছেব নীচে দুটো বেঞ্চি খাঁ খাঁ করছে। রিক্সা লাগবে নাকি স্যার ? টুং টুং কবে একটি রিক্সা এসে হাজিব এমন সময় যাত্রীর গন্ধ পেয়ে।

ঃ বুধপাড়া যাবে নাকি ?

'ওঠেন' বলে প্যাডেলে পা রাখলে তার একটু অস্বস্তি হয়। এ রাস্তা পাকা হয়েছে বলে দু'পাশের আমগাছগুলো আর নেই। গরুর গাড়ির বহর চলতো একদা এ রাস্তায়, এখন রিক্সা চলছে। রংচঙে কিছু দোকানপাটও দাঁড়িয়ে গেছে এর মধ্যে। কারেন্ট এসেছে অবশ্যি আরও আগে। তবে ধ্বনা পর্যন্তই এর দৌড়। তারপর অন্ধকার। সে যেতে যেতে ভাবছিলো তার সহপাঠীদের কথা। পরিচিত প্রাঙ্গণের কথা। এ অঞ্চল আসলে তাদের প্রকৃত অর্থে দেশের বাড়ি নয়। তার প্রপিতামহ ছিলেন মালদহের লোক, তিনি দশবিভাগেব সময় একাই পাড়ি দেন এপারে, বসতি স্থাপন করেন কানসাটে। আর সেখান থেকে তার পিতামহ মহানন্দা পার হয়ে এই মুচকুন্দপুরে থিতু হন। বলতে পার প্রায় একাই তিনি এখানে তার শেকড় প্রোথিত করেন। তারপর বাবাও থেকে গেলেন এখানে। কিন্তু এরপর ? তাদের ৬ ভাই ছ'জায়গায়। বুধপাড়ার বাড়িটা এখন চান মিয়াই দেখাশোনা করে। সেই চান মিয়ারও পাত্তা নেই আজ দু'বছর হলো। তারিক যখন যাচ্ছেই - তখন সবকিছুর হিসাবপত্র সে ঠিকঠাক দেখে নেবে।

ঃ তা কুন বাড়িতে যাবেন জি ?

ঃ মন্ডল বাড়িতে।

তারিক অস্পষ্ট আলোয় চোখে গেঁথে নিচ্ছিল সব। এই ৭ বছরে কম পরিবর্তন হয়নি মুচকুন্দপুরের। গাছপালা কমেছে। বেড়েছে নতুন দালানকোঠা। কিছু কিছু জায়গাতো একেবারে নতুন, অচেনা মনে হচ্ছে। নাকি রিক্সাঅলা অন্য পথ দিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। না হাইস্কুলের শাদা দেয়াল ঐ যে, ওটা টার্ন নিলেই মুচকুন্দপুরের বিল, বিলের উত্তরে বুধপাড়া। তো বিল এখন প্রায় আধামরা। জলের নোনা বাতাস এসে একবারও স্পর্শ করলো না তাব শরীর। সামনে আরও কিছুটা যাবার পর সে অকস্মাৎ রিকশা থামালো। রহমত মৃধার বাড়ি ছাড়িয়ে এসেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। কিন্তু তারপরের ঠিকানা তো ঠিক মিলছে না। অঘোর মণ্ডলের বাড়িটা থাকবার কথা ডানদিকে, তারপর বাঁশবাগান। বাগানের পর তাদের বাড়ি। অথচ সে দেখতে পারছে কিছুই নেই। অঘোর মণ্ডলের ভিটেটা কেবল দাঁত বের করে পড়ে আছে। তার চারপাশ শূন্য। কোন আব্রু নেই, একেবারে গাছপালাহীন ন্যাংটা। বাঁশবাগানও অদৃশ্য তার পাশে। দু'তিনটে বাঁশের শেকড়-বাকড় গোড়ালি এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে বলে সে নিজের বাঁশভূমির জায়গাটা সনাক্ত করতে পারে কিছুটা। কিন্তু তাদের ভিটেটা কই ? কই তাদের সেই মেহগনি গাছ, ফল-পাক্কুরের ছায়ার বুনট দেয়া বাড়ি ! চান মিয়া কি তাহলে সব বেঁচেবুচে চলে গেছে কোথাও। কিন্তু সে তো এমন হবার নয়। তাহলে কি বারেক একাজটা করল ? অনেকদিন সে ফোনটোন করে না চারঘাট থেকে। তারমানে আর সব ভাইয়েব সঙ্গে সে বেঈমানি

করল নির্দ্বিধায়, তার হাত কি একটুও কাঁপল না ! কিন্তু তাদের ছয় ভাইয়ের সর্বকনিষ্ঠ ঐ ভাইটি একটু অর্থকষ্টে থাকে বলে তাকেই বা সে কেন অপরাধী সাব্যস্ত করছে । চান মিয়ারও তো যোগসাজশ থাকতে পারে । কিন্তু রিক্সাঅলা তাকে জানালো যে এটা মণ্ডল বাড়িরই জমি এবং এটা বিক্রি হয় নি কেননা এবাড়ির সব ছেলে থাকে শহরে । তাহলে বাড়িটা ?

আমাদের সেই ফলের বাগান, মেহগনি গাছ, রাংচিতার ঘের দেয়া উঠোন ? রিক্সাঅলা এর উত্তর দিতে না পেরে পিছিয়ে গেল । তবে সে পিছিয়ে গেলনা । ১০ কাঠা জমির নিজস্ব পরিমণ্ডলের কি কিছুই অবশিষ্ট নেই ! সে এগিয়ে গেল সামনে। ভিটামাটির শরীর থেকে সমস্ত কাঠামো খুবলে নেওয়া হয়েছে । একদা আধার করে রাখত যেসব গাছ তাদের কোন অস্তিত্বই নেই কোথাও । কেবল কবরগুলোকে পাওয়া গেল নিঃসঙ্গ অবস্থায় । ঐ দিকে বাবার কবর, তারপাশে মা, ৪ নবজাতক ভাই, দাদা-দাদি । ঘাসের দঙ্গল তাদের সীমানা খেয়ে ফেলেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে সব। সে হাহাকার বুকে তাকালো আবার । এই কবর স্থানের কমপক্ষে ৫০ গজ দূরে ছিল যজ্ঞি ডুমুরের গাছ । তাকে পেচিয়ে রাংচিতার বেড়া ঘুরে গিয়েছিল রান্নাঘরের পাশের আঁতুড় ঘরের দিকে। আর তার পরেই ছিল মেহগনি গাছ । গাছের নীচে ছায়াশীতল মাটি । সেখানে নিদ্রিত তাদের জীবিত ছয় ভাই এবং মৃত চার ভাইয়ের নাড়ি । সুতরাং যা করার এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

বিলের পিছনে তখন সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে । এদিকটায় খুব একটা আলো নেই আর । মাথার উপর ঈশ্বরের বাতিঘর থেকে কেউ যে একটু আলোর পথ ইশারা করে পথ দেখিয়ে দেবে তেমন কোন সম্ভাবনাও নেই । অথচ নাড়িটা পোঁতা দরকার । ৫০ গজ এগিয়ে যাওয়া দরকার । কিন্তু অন্ধকার ক্রমশঃ গড়িয়ে আসছে কাছে। ঠিক এমন এক সময় বৃক্ষহীন প্রান্তরের ধূ ধূ শূন্যতার উপর দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ অনুভব করে যে. সে আসলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটি কোন ভিটা মাটি নয় ববং বলা যেতে পারে সে যেন পুনঃস্থাপিত হয়েছে তার নিজেরই মায়ের গর্ভে ।

সে গর্ভ প্রাচীন, অন্ধকার, রক্তগন্ধে কিছুটা পিচ্ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে পরম আকাঙ্ক্ষিতও। সুতরাং তাবিক আর অপেক্ষা করে না । কেননা এই মুহূর্তে তার ক্লান্ত, জং ধরা পায়ে পুনরায় গতি ফিরে এসেছে এবং এ মাটিতে তার শিশুর নাড়ি রোপণ করে সেই গর্ভবাড়ির দখল নেবার জন্য সে এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ।

মনি হায়দার

এক পয়মন্ত পাখি

কুলসুম তার সাবা জীবনেব বিস্ময নিয়ে বাড়িটাব দিকে তাকায ।

মাগো ! এতো বড় বাড়ি । এসব বাড়িব গল্প ছেলেবেলায দাদিব মুখে কতবাব শুনেছে। —বাজা, বাণী, রাজকুমার, বাজকন্যারা থাকে এসব প্রাসাদে । প্রাসাদ ঘিরে মন্ত্রী, সান্ত্রী, সৈন্যসামন্ত, পাইকপেয়াদা, আবো কতশত লোকের ভিড় ।

বেবী ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে মোনাব্বার মোল্লা । ঘোরলাগা কুলসুমকে তাড়া লাগায । হাঁ করে দেখছিস কি ? ভেতবে আয ।

তার মানে ! এবাড়িতে ঢুকবো নাকি আমবা ? এবার মহা বিস্ময়ের পালা কুলসুমের।

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? এবাড়িতেই তো এসেছি আমবা ।

এবাড়িতে !

ততক্ষণে বাড়িটাব কারুকাজ কবা বিশাল গেটটাব সামনে এসে গেছে ওরা । ওদেব দেখতে পেযে একজন খাকি পোশাক পবা লোক একটা অদ্ভুত হাসি উপহার দিয়ে গেট খুলে দেয — যেন সিংহেব হা-করা মুখ—এমনটাই মনে হলো কুলসুমের। মোনাব্বার মোল্লা জড়সড় কুলসুমের হাত ধরে বলে – আয ।

কুলসুম মোল্লার পিছু পিছু ঢোকে । অজানা ভযে শবীরে কাঁপুনি ওঠে । কেমন ভয ভয লাগছে কুলসুমের । গেট পাব হযে ভিতবে ঢোকে ওবা । সামনে বিরাট বাগান। নানা বাহারি ফুল । এপাশে দু'জন লোক দুটো বিবাট কুকুবকে খাবাব দিচ্ছে । কুলসুম ঘব-ঘব শব্দ শুনে পিছনে তাকায । লোহাব গেট বন্ধ হযে গেলো । কুলসুমেব বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি । ওব যেন মনে হলো – দবোজাটা চিবকালেব জন্যই বন্ধ হযে গেল । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুলসুমেব মনে পড়ে যায – ভয কি, মোনাব্বার মামা আছে না ?

তারা লন পাব হযে বাড়িব সামনে দবজায় দাঁড়ায । দরজা খুলে যায় । জমকালো বিশাল কাঠের দরজা দেখে কুলসুমের আবার অবাক হওয়াব পালা—এতোবড দবজা হয় !

সামনে মোনাব্বার মোল্লা । পিছনে কুলসুম বেগম । ঘরের ভিতরে ঢুকে কুলসুম টের পায় – এটা, এই বাড়িটা একটা আলাদা পৃথিবী । একটাও জানালা নেই এবং ঘরটা কি অদ্ভুত ঠাণ্ডা । দারুণ আরামদায়ক । রুমেব চারপাশে ততোধিক আরামদায়ক রকমারি সোফা ও চেয়ার। সামনেই স্বাস্থ্যবান, তাগড়া একজন লোক ।

জেনারেল আছেন ? লোকটাকে জিজ্ঞেস কবে মোনাব্বার মোল্লা ।

না । উনি বাইরে গেছেন ।

আমার জন্য কোনো খবব ?

আপনার নাম ?

মোনাব্বার মোল্লা ।

হ্যাঁ, আপনার জন্যে খবর আছে । আপনি উপরে যান । মেয়েটির জন্য উপরে আলাদা ব্যবস্থা করা আছে ।

আচ্ছা ।

মোনাব্বার মোল্লা সামনের সিঁড়ির দিকে এগোয় । পিছনে কুলসুম । ওর মনের অবস্থা ভালো নয় । এ বাড়িটায় মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয় — কেন যেন এ রকম একটা ধারণার জন্ম হয় কুলসুমের । সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক এসে সামনে দাঁড়ায় । কোনো কথা ব্যয় না করে নিঃশব্দে একজন কুলসুম অন্যজন মোনাব্বার মোল্লাকে নিয়ে দু'দিকে চলে যায় ঘটনাটা ঘটতে খুব বেশি সময় লাগে না । যেনো আপনা আপনিই ঘটে যায় । সামনে যেতে যেতে কুলসুম পিছনে ফিরে ডাক দেয় — মামা ।

মোনাব্বার হাত ইশারায় তাকে যেতে বলে নিজে সামনে পা বাড়ায় ।

সারিবদ্ধ অনেকগুলো ঘর পার হয়ে কুলসুম এবং লোকটি অবশেষে একটি ঘরের সামনে দাঁড়ায় । লোকটি দরজার তালা খোলে । কুলসুম যেন একটি কলের পুতুল—ওকে মেশিনের বোতামের দম দিয়ে কেউ যেন ছেড়ে দিয়েছে । খোলার পর দু'জনে ভিতরে ঢোকে । চমৎকার সাজানো গোছানো দামী কাঠের আসবারপত্রে ঠাসা ।

আপনি এই রুমে থাকবেন । ওপাশে বাথরুম আছে । গোসল করে নেবেন । ওই পাশের দেয়ালে আলমারীতে জামা-কাপড় আছে । পরে নেবেন । আর এই যে বোতামটা দেয়ালে দেখতে পাচ্ছেন, আমাকে প্রয়োজন হলে এটাকে টিপ দেবেন । আমি চলে আসবো ।

কুলসুম সবকিছু দ্যাখে আর শোনে, কোনো কথা বলে না । বিস্ময় নিয়ে সে কেবল তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে ।

কিছু বলবেন ?

আমি একা থাকবো ?

হাসলো লোকটা —একা কেনো ? আমরা আছি না ! আমার নাম করিম । আমি আপনার আশেপাশেই আছি । বললাম না, প্রয়োজন হলে বোতাম টিপে দেবেন । আমি চলে আসবো । এখন আপনি গোসলটা সেরে ফেলুন । আমি আপনার খাবার নিয়ে আসছি ।

আমার মামা কোথায় ?

সেও আছে এই বাড়িতে ।

আমাকে মামার কাছে নিয়ে যান ।

অর্থপূর্ণ হাসি উপহার দিয়ে লোকটি বললো — এবাড়িতে দু'জনের এক ঘরে থাকার হুকুম নেই ।

বলেই আর বাক্য ব্যয় না করে করিম চলে যায় । কুলসুম বেগম একা বিশাল ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে কি করবে, কোথায় যাবে বুঝতে পারে না । হঠাৎ রূপকথার গল্পের মতো তার জীবনটা পাল্টে গেলো বুঝিবা । কুলসুম জানেনা — তার জীবনে এই যে বিস্ময়কর এক পরিবর্তন এলো, এর শেষ কোথায় ? মামা মোনাব্বার মোল্লা এ কোথায় তাকে নিয়ে এলো ? সে মেঝেতে বসে ভাবতে থাকে । ঘুম পায় । দু'চোখে যখন ঘুমের আয়োজন তখন পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে প্রচণ্ড ক্ষিদে । কুলসুম আর ঘুমুতে পারে না । সে গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে । তারপর যন্ত্রবৎ বোতামে টিপ দেয় । করিম খাবার নিয়ে আসে । এরকম আদরযত্ন কেবল রাজরাণীরাই পেয়ে থাকে — সে এক ঘুটে কুড়ুনী অথচ তার কপালেও এমন আছে — কে জানতো ? নানা রকম সুস্বাদু খাবার । খাবার থেকে যে ঘ্রাণ আসে এরকম ঘ্রাণের স্বাদ সারাজীবনে সে পায়নি । কুলসুম বিহ্বল চেতনায় ক্ষুধার তাড়নায় গোগ্রাসে খাবার গেলে । খাওয়া শেষ হলে করিম এঁটো নিয়ে যায় । বিকেলে কুলসুম বারান্দায় বের হয়ে আসে । কক্ষের লাগোয়া

ছোট অথচ পরিপাটি একটা বারান্দা। সেখানে ফুলের টব। টবে তার মুগ্ধ চোখ আটকে যায়।

পাখি—

একটা সুরেলা আধো শব্দে কুলসুম চমকে ওঠে। কে ডাকে ?

পাখি—

শব্দের উৎস অনুসরণ করে মাথার উপর তাকায়। একটা খাঁচায় নাম-না-জানা চমৎকার এক পাখি। ঠোঁট দুটো টকটকে লাল, একেবারে শিমুল ফুলের মতো পালকের রং, সোনালী সবুজে মেশানো। এমন অদ্ভুত সুন্দর পাখির কথা কুলসুম গল্পেই শুনেছে। বিস্ময়ের পালা যেন শেষ হয় না কুলসুমের – সে কি বাস্তব গল্পের কোনো চরিত্র ? তা না হলে রূপকথার সমস্ত প্রেক্ষাপট তাকে ঘিরে ঘটছে কেনো ? বিভ্রান্তির মায়াজালে আটকে পড়া এক অসহায় মানুষ সে। সহজ সরল স্বাভাবিক জীবনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মোনাব্বার মামা তার জীবনে একি যাদু বাস্তবতার পাখা জুড়ে দিলো ?

পাখিটি আবার ডাকে—পাখি— !

চরম বিভ্রান্তির মায়ায় নিপাতিত কুলসুম। পাখিটা কাকে পাখি বলে ডাকছে ! কুলসুমকে ? পাখিটাকে কথা বলতে কে শেখালো ? পাখিটি কি সব কথা, সব ধরণের কথা বলতে পারে ? সে শুনেছে একরকম পাখি নাকি আছে যারা মানুষের মতো অবিকল কথা বলতে পারে। মানুষের আদি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাপঞ্জী জানায়। এটা কি সেরকম কোনো পাখি ?

তোমার বাড়ি কোথায় ? পাখিটি যে তাকেই জিজ্ঞেস করছে। একথা বুঝতে আর কষ্ট হয় না কুলসুমের। ওর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। তার চারপাশে, তাকে ঘিরে এ কি সব ঘটছে।

তোমার বাড়ি কোথায় ? আবার জানতে চায় পাখিটা। পাখিটা কথা বলছে স্পষ্ট উচ্চারণে নয়, বোঝা যায় – তবে কানে বাজে। এবং একটা সুরেলা ধ্বনির রেশ থাকে। শুনতে বেশ মিষ্টি।

কুসুমপুর। তোমার বাড়ি কোথায় ?

পাখিটা হঠাৎ নিশ্চুপ। অবাক চোখে তাকায় কুলসুমের দিকে। খাঁচার লোহার শিকের সঙ্গে ঠোঁট ঘষে। অজানা বিষণ্ণতার ছায়া ওর চোখে।

পাখিটা নিজের কথা বলবে না।

একটা গমগমে কণ্ঠ ভেসে আসে। চমকে তাকায় কুলসুম। সামনে একজন মানুষ সৌম্যদর্শন। গলায় বড় সোনার চেন ঝুলছে। ব্যাকব্রাশ চুল। দোহারা গড়ন, শরীরের রং টকটকে লাল। চোখ জোড়ায় ক্লান্তি, তারপরও দৃষ্টিটায় কি যেন আবিষ্কার করে কুলসুমের বুকের ভিতর ঝড়ে তাণ্ডব বয়ে যায়। থরথর কাঁপে। অসহায় চোখে লোকটাকে দেখে। লোকটার মুখে আলো ও অন্ধকার মেশানো অদ্ভুত একটা হাসি ছুরির মতো ঝুলছে।

লোকটা আলতো পায়ে কুলসুমের পাশে দাঁড়ায় যেনো সে এ বাড়ির রাজা –এমন একটা ভাব; গরিমা তার অবয়ব ও চালচলনে প্রকাশ পাচ্ছে। লোকটা কুলসুমকে যেনো অনেকদিন ধরে চেনে সেভাবেই বললো – পাখিটার নাম জানি না আমিও, তবে ওকে ভালোবাসি খুব ভালোবাসি। পাখিদের মধ্যে এই একটামাত্র পাখিকেই আমি পছন্দ করি। বছর সাতেক আগে যখন টেকনাফে গিয়েছিলাম অন্যরকম কিছু পাখি চালান দিতে, তখন এক সন্ধ্যায় এই পাখিটি আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে। সাধারণত পাখি শিকার করে আমি দারুণ আনন্দ পাই। পৃথিবীতে আমি আনন্দ ছাড়া আর কিছু চাই না। আছড়ে পড়া পাখিটাকে তুলে দেখলাম একটা ডানা ভাঙা। বাড়ি নিয়ে এসে পাখিটার যত্ন করলাম, সকালে স্থানীয় একজন ডাক্তারকে দেখালাম। ডাক্তার ওষুধ দিলো। কয়েকদিনের মধ্যে পাখিটা ভালো হয়ে গেলো। আর ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালও খুলে গেলো। ও আসার পর আমি আমার ব্যবসায় কখনো

ক্ষতির মুখোমুখি হইনি। পাখিটা আসলে দারুণ পয়মন্ত।

লোকটা কথা বলছিলো এতোক্ষণ আকাশেব দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মুখ ফেরালো খাঁচাব দিকে, বললো – পাখিটা বড় অদ্ভুত। যেদিন আমার কাছে এলো সেদিন থেকেই টুকটাক কথা বলতে আবস্ত করলো। আব একবার যা শোনে তা ভোলে না। নতুন যেসব পাখি এখানে আসে তাদের সঙ্গে অন্তবঙ্গভাবে কথা বলে। কিন্তু নিজেব কথা কিছুই বলে না। আচ্ছা, পাখিটাকে তোমাব কেমন লাগছে, পাখি ?' লোকটা এবার ফিবলো কুলসুমের দিকে।

কুলসুমের এতক্ষণে কিছুটা সাহস ফিরে এসেছে। এতক্ষণে বুঝতে আর কষ্ট হয় না এই লোকটাই রাজপ্রসাদের বাজা।

আমি তো পাখি না। কুলসুমের ছোট উত্তর।

লোকটা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসলো নিঃশব্দে–আমাব কাছে যাবা আসে তাবা সবাই পাখি। আমি শিকাব কবতে দারুণ পছন্দ কবি – আগেই বলেছি। খাঁচায় বদ্ধ পাখিটা জন্মগতভাবেই পাখি আব তুমি কুলসুম–আমাব কাছে পাখিই।

আমার নাম জানলেন কি কবে ?

তোমাকে আমি অনেক টাকায কিনবো আব তোমার নাম জানবো না ?

কিনবেন মানে ?

কুলসুম চোখেব সামনে যেন রূপকথাব রাক্ষসকে দেখতে পায় – যাদেব বিকট দাঁত, বিরাট লোলুপ জিভ, লোহাব মতো নখ, মুখে তাজা টাটকা বক্তের প্রবাহ আর চোখেব দৃষ্টিতে লোভের তীক্ষ্ণ ফণা –সব যেন মিলে যায়।

তোমাব মোনাব্বাব মামা আমার কাছে তোমাকে বিক্রি কবতে এনেছে।

না। একটা অবিশ্বাসের ঢেউ খেলে যায় কুলসুমেব কণ্ঠে-না, মোনাব্বাব মামা আমাকে চাকরি দেয়ার কথা বলে এনেছে।

আমাব কাছে থাকাটাই তোমাব চাকবি। তোমার জীবনের সব সাধ ও স্বাদ আমিই পূর্ণ করবো। আর তুমি পূর্ণ কববে আমাব–

ডুকরে কেঁদে ওঠে কুলসুম – আমি মবে যাবো। আমি আত্মহত্যা কববো।

লোকটা আবার হাসলো –সেই আকর্ণ বিস্তৃত নিঃশব্দ ভয়ংকব হাসি – এখানে মবার কোনো উপকরণ থাকে না।

কুলসুম লোকটার নির্লিপ্ত চোখের দিকে তাকায়।

আমি যে টাকায তোমায কিনবো, তাব দাম, দামেব দাম অর্থাৎ লাভ না কবে আমি কোনো পাখিকে পালাতে দিই না, মরতে তো দিইই না। বেশি কথা বলতে চাই না পাখি হিসেবে তোমাকে আমাব দারুণ পছন্দ হয়েছে। মোনাব্বার মোল্লার সঙ্গে দবদাম ঠিক কবে, পাকাপাকিভাবে কিনে তারপব আবার আসবো। এখন যাই–আব হ্যাঁ, পাখিটার দিকে নজব রেখো। যত্ন করো।

লোকটা চলে যায়।

কুলসুম বুঝতে পারে তাব চাকবিটা কি ? আগামী দিনগুলো কেমন যাবে তাও বুঝতে পারে। দূরে বহু দূবে ধূসর মসৃণ একটা বং একটানা অনববত বয়ে যায়। আসলে তাব চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা।

কি ভাবছো ? খাঁচার পাখিটা ডানা ঝাপটায়।

কুলসুম খাঁচার দিকে তাকায়। পাখিটাও কুলসুমের দিকেই চেয়ে আছে। দূরেব আকাশে সন্ধ্যা নামছে।

পাখিটা আবাব বলে–বড় খাবাপ জায়গায় এসেছো। বড় খারাপ জাযগা। যে একবাব

ঢোকে সে আব কখনো মুক্তি পায না ।

পরের দু'দিন কুলসুম করিম এবং পাখি ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় প্রাণীর দেখা পায় না । পাখির সঙ্গে কথা বলেই তার সময় কাটে । ঘুমায কাঁদে আব জানালায় দাঁড়িয়ে বাইবেব জগৎটাকে দেখে । করিম যেনো মানুষ নয–জন্তুও নয়, অন্যরকম প্রাণী, যার কোনো নিজস্ব অভিব্যক্তি নেই । কুলসুম কতোবাব কতো কথা জিজ্ঞেস করেছে –সে কোনো উত্তর দেয় না। তার একটাই কথা –আমাব অপ্রয়োজনীয কথা বলা বাবণ ।

যে বাড়িটায় আছে কুলসুম লক্ষ্য করেছে তার আশেপাশে তেমন কোনো মানুষের বসতি নেই । বাড়িটাব চারপাশে বিরাট দেয়াল । তাও অনেক দূরে । তাকালে বোঝা যায়–মানুষের আনাগোনা বেশ দূবে । প্রাণপন চেষ্টায় ডাকলেও কেউ সাড়া দেবে না। কাবণ ডাকাব শব্দটাই কানে যাবে না কাবও ।

কুলসুমেব কেন যেন মনে হয এই বিশাল বাড়িতে সে একা নয় । এবকম আবো অনেক 'পাখি' আছে, অনেক ঘব । ওদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবা যায না ? তাবা কি সবাই তাবই মতো চাকবিব আশায ছুটে এসে ঢুকেছে আলোময এই অন্ধকাব নবকে ?

কবিমকে একবাব জিজ্ঞেস কবেছিল–ঘরেব ভেতব হাঁপিযে উঠেছি – একবাব বাইবে যাওযা যায় না ?

না, জেনাবেলেব হুকুম ছাড়া এই ঘবেব বাইবে যেতে পাববেন না ।

জেনাবেলটি কে ?

এই বাড়ির মালিক, যিনি আমাদেবও মালিক ।

জেনাবেল কাবো নাম হয ?

এটা দেমাকী নাম । আসল নাম আবদুল মান্নান । এই লাইনে যাবা আছে তাবা সবাই আমাদেব মালিককে জেনাবেল বলেই ডাকে ।

আচ্ছা অন্যান্য ঘরে যাবা আছে, তাদেব নাম জানো ?

এসব জানাব অধিকাব আমাদেব নেই । আপনি আর কথা বলবেন না । ইতিমধ্যেই অনেক কথা বলে ফেলেছেন ।

কবিম একবকম মেজাজ দেখিয়েই চলে যায ।

মোনাব্বাব ?

বলুন জেনাবেল–

পাখিটি আমাব খুব পছন্দ হযেছে ।

আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম । বিনযে কুকুব মোনাব্বাব মোল্লা –অনেক কষ্টে পাখিটি আপনার জন্য শিকাব কবেছি । যেমন রূপসী তেমন বুদ্ধিমতী মেট্রিক পাশ, ভালো বেজাল্ট কবেছিলো । ফার্স্ট ডিভিশন । টাকা পযসার অভাবে আব লেখাপডা কবতে পাবে নি ।

নিঃশব্দে হাসলো আবদুল মান্নান । বললো–টাকা পযসা থাকলেতো পাখিটি আব আমার খাঁচায় আসতো না । যাই হোক কতো দাম চাও ?

হাত কচলায মোনাব্বাব মোল্লা । দামেব কথা কি বলবো ! মেযেটিকে নিয়ে এসেছি ঠিকই, কিন্তু গ্রামে আব থাকতে পাববো না ।

কেনো পাববে না ?

সুন্দরী হলে পঙ্গপালের অভাব হয নাকি ! এলাকাব অনেক পোলাপান মেয়েটিকে কামনা কবেছিলো । বিয়ে কবাব জন্য এক পাযে দাঁড়ানো কযেকজন ছেলে আছে ওই গ্রামে ।

হাসলো জেনারেল। সেই অমোঘ নিঃশব্দ হাসি।

মোনাব্বার বললো—হাসছেন কেনো ?

তোমার দাম বাড়ানোর পুরোনো কৌশল দেখে হাসি আসছে আমার মোনাব্বার।

বিশ্বাস করুন স্যার, জেনারেল। এই মেয়ে কুলসুম সম্পর্কে আমি সত্যি কথাই বলছি। আর আপনি নিজেই তো বলেছেন পাখিটি আপনাব পছন্দ হয়েছে।

তা ঠিক। বলো, কতো চাও তুমি।

আপনি জানেন এ যাবৎ যতো পাখি আপনাকে উপহার দিয়েছি, আমি নিজে থেকে তাদের দাম চাই নি।

সেসব ছিলো স্বাভাবিক পাখি, তোমার এবারের কুলসুম পাখি একটু অন্যরকম। তাই তোমাকে দাম জিজ্ঞেস করছি।

স্যার, আপনি নিজেই যখন বলছেন সবকিছু তখন আমার কোনো কথা বলা একদম মানায় না স্যার।

ঠিক আছে আমার উপর যখন সব সিদ্ধান্ত চাপাচ্ছো তখন শোনো—অন্যান্যদের বেলায় পেতে পনেরো হাজার টাকা আর কুলসুমের জন্য পাবে তিরিশ হাজার টাকা। অর্থাৎ ডাবল। রাজি ?

জী স্যার, রাজি। মোনাব্বাব মোল্লা ঘাড় কাৎ কবে।

নগদ টাকা না চেক ?

চেক বহন কবা সুবিধাজনক স্যাব।

জেনারেল প্যাকেট থেকে চেক বের করে খস খস শব্দে তিরিশ হাজার টাকার চেকটি কেটে মোনাব্বাব মোল্লাকে দেয়, বলে, মোনাব্বার তুমি নিজেই দেখতে পেলে, নরম, খাসা আর সুন্দবী পাখি পেলে আমি ভালো দাম দিতে কার্পণ্য কবি না। আগামীতেও এইবকম পাখি আনলে খুশি হবো। কারণ আমার খাওয়া হয়ে গেলে আমাকে পাখিগুলো মিডিল ইস্টে পাঠাতে হয়। সেখানে ফিলিপিনো, শ্রীলংকা ও ভারতীয় পাখিব বিরুদ্ধে ভালো পাখি না পাঠালে ব্যবসা টিকবে কিভাবে ? আমাব ব্যবসা টিকলে না তোমরা লাভবান হবে—

জী স্যার, আমি খেয়াল বাখবো।

ঠিক আছে, যাও।

মোনাব্বার মোল্লা চলে যায়।

জেনাবেল ঢোকে কুলসুমেব ঘবে।

নতুন সুন্দবী পাখি শিকার করা তার বড় খায়েশ। ভীরু হবিণীব মতো মেয়েগুলো ঘবের মধ্যে ছুটোছুটি করে। অসহায় আর্তনাদে ঘরেব দামী আসবাবগুলো পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে। কিন্তু জেনারেল আবদুল মান্নানের চোখেমুখে হাসি ছাড়া আর কিছুর দেখা মেলে না। পাখির ডানা ঝাপটানো নরম তুলতুলে দেহটাকে যখন সাবলীল হায়েনার মতো বিছানায় তুলে আনে, তখন সে আনন্দে উল্লাসে ছটফট করে। পৃথিবীব সমস্ত সুখ ও শক্তি মান্নানেব দেহেব উপব স্থির হয—মান্নান তখন পৃথিবীর পাখিকুলেব সম্রাট বনে যায় তাব পছন্দের শিকাবকে সে ততদিন পর্যন্ত অবলীলায় ভোগ কবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আব একটি আবো আবেদনময়ী পাখি না আসে। আসা মাত্র এই পাখিকে বিদেশে চালান কবে দেয়াব ব্যবস্থা নেয়।

কেমন আছো ?

আবদুল মান্নানের জিজ্ঞাসায় কুলসুম কোনো জবাব দেয় না। কিংবা তার জবাব দিতে ইচ্ছে করে না। মান্নান আযেশ করে বিছানায় বসে। সিগাবেট ধরায়। কুলসুমকে কাছে ডাকে।

ভয় পেয়ো না। আমিতো মানুষ। মানুষকে ভয় পাবে কেনো ?

আমাকে যেতে দিন। ডুকরে কাঁদে কুলসুম।

মান্নান তাকে ধরে নিজের কাছে বসায়। কুলসুমেব মগজ কোনো কাজ করে না। কবতে পারে না। যাদুবাস্তবতার জালে আক্রান্ত সে।

শোনো কুলসুম পাখি, সে সাইবেরিযার হোক আর এদেশেবই হোক, যখন খাঁচায় বন্দী হয়ে যায়, তারপরে আর তার কোনো স্বাধীন ইচ্ছে থাকে না। অবশ্য পরিবেশবাদীরা নানা রকম কথা বলে থাকে। পাখি শিকাব কবলে নাকি পবিবেশেব ভারসাম্য নষ্ট হয়, পৃথিবী নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে–ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দেখো–আমিতো অনেক পাখি শিকার করলাম, কৈ পরিবেশেব তো কিছু হচ্ছে না।' বলেই হাঃ হাঃ কবে হাসিতে ফেটে পড়ে মান্নান পৈশাচিক খুনীদেব মতো। তারপর যোগ করে–অবশ্য শীতের সীজনে বেড়াতে আসা পাখি, কিংবা এদেশের পাখি আর তোমার মতো সুন্দবী মানবী পাখিদের মধ্যে পার্থক্য আছে না ?

কুলসুম থরথর কাঁপছে।

অবশ্য দু'ধরনের পাখির প্রতি আমার সমান লোভ। ব্যবহাবে ভিন্ন আকাশের পাখিদের মাংস খাই আর তোমাদের মতো পাখিদের মাংস আমি উপভোগ কবি। এসো –

কোনোকিছু অনুভব কবার আগেই কুলসুমকে ক্ষিপ্র চিতার গতিতে বিবস্ত্র কবে ফেলে আবদুল মান্নান। লালসাব অজস্র জীহ্বা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কুলসুমেব দেহের ওপর। কৌমার্যেব সোপান যখন গলে গলে নিঃশেষ হযে যায, তখন কুলসুমের চোখের সামনে এসে দেখা দেয একটি সবুজ বঙে ছোপানো গ্রাম, তাব পাশে একটি নদী, জীর্ণ একটা কুটিব, নিকনো উঠোন, উঠোনেব মুরগী, গোয়ালঘরের গরু, বাছুরেব দুধ খাওয়া, বিছানায় কাতব কংকালসার বৃদ্ধ বাবা, তাকে ঘিরে কয়েকটা ছোট মুখ, প্রতিটি মুখে কি না অধিরতা, এক নিমিষে কুলসুম যখন এসব দৃশ্য অবলোকন কবছে, ততক্ষণে তাব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লুঠ হয়ে গেছে।

তাবপব নিযমিত পালা করে আবদুল মান্নান আসে কুলসুমের ঘবে।

মাসখানেক পাব হওয়াব পব একদিন একজন ফটোগ্রাফাব আসে কুলসুমেব ছবি তোলার জন্যে। কাবণ তাব পাসপোর্ট হবে, ভিসা হবে পাখি যে সে–উড়ে যাবে মিডিল ইস্টে।

পাসপোর্ট, ভিসা শেষ। আগামীকাল উড়ে যাবে সে পেট্রোডলারের দেশে। সারাজীবনেব জন্য খাঁচায় বন্দী হতে। বিকেলে শেষবারেব মতো কুলসুমেব ঘরে আসে আবদুল মান্নান।

দেখে খাঁচায় পাখিটা নেই। খাঁচার দরজা খোলা।

পাখি কোথায় ?

ছেড়ে দিয়েছি। কুলসুমেব স্বাভাবিক উত্তব।

রেগে চিৎকাব কবে ওঠে আবদুল মান্নান–কেনো ছেড়ে দিয়েছো ?

বারে, আমি আকাশে উড়বো আর ও থাকবে খাঁচায়। তাই ও যখন আমার কাছে আকাশ দেখাব বায়না ধবলে আমি না করতে পারলাম না। এই সঙ্গে ও যদি আমাদের দুর্ভাগ্যের সংবাদটা সবাইকে জানিয়ে দেয় ভালই তো।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

ছুরি

ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িটা এমন দ্রুতগতিতে বাইরের রাস্তা অতিক্রম করে গেলো যে, ভেতরকার দশ-বারোজন লোক প্রায় একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে রইল, চোখের স্থির চাউনিতে জিজ্ঞাসা নিয়ে। গাড়ির ছুটন্ত চাকার তোড়ে মোমের শিখা কাঁপল, এমন কি দেয়ালে প্রতিফলিত মানবদেহের ছায়াগুলিও। কিছুক্ষণ কথা এলো না কারো মুখে। আলোর সামনে মুখ বাড়িয়ে একজন নীরবতা ভাঙলো, 'আগুন দিয়েছে কোথা!'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

ওরা এমন চাপাস্বরে কথা বলছিলো যে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে যে-কেউ মনে করতে পারে, চটের আওতা দিয়ে কামরা-মতো-করা রেলওয়ে কলোনীর একটি বারান্দায় মোমের আলোর সামনে ঝুঁকে বসে লোকগুলো কোন ভয়ঙ্কর ডাকাতির প্রোগ্রাম নিচ্ছে কিংবা ফিসফিসিয়ে এমন কিছু আলোচনা করছে যার সঙ্গে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই।

মনসুর বসেছে মোমবাতির সামনে। শরীরের চেয়ে মাথাটা অনাবশ্যক রকম বড়ো; তেলহারা লম্বা চুল কপালে আর কানের আশেপাশে ওড়ানো, কালো কোটের ভাঁজ ভেঙে ঘাড়ের ওপর খরগোসের কানের মতো খাড়া, প্রথম যৌবনের অনাদৃত খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর কিছুই ভালো-না-লাগা উদাসীন দৃষ্টি দেখলে তাকে সায়েন্সের সেরা ছাত্রের চেয়ে হতাশ-প্রেমিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মডার্ন ফিজিকস্ ও বায়োলজির অন্তস্থলে যুক্তি আর বুদ্ধির তীর চালিয়ে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে একটা নাস্তিক ধারণা ওর মনে ক্রমশই কাঁটার মতো গজিয়ে উঠেছে কতকটা এজন্য, আর কতকটা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্য ওর চেহারায় একটা উজ্জ্বল সারল্য ফুটে উঠেছে। বৈজ্ঞানিকের গুণ ওর মধ্যে যতটুকু নেই, শিল্পীর গুণ তার চেয়ে অনেক বেশি, সেজন্য অনেকটা আবেগপ্রবণও। স্বভাবসুলভ নিষ্প্রভ হাসিটা ঠোঁটের কোণায় টেনে ও সহজ গলায় বলে চলল, 'আমাদের একতা যে টেস্টটিউবের কাচের মতো ঠুনকো নয়, স্টিলের মতো শক্ত, দু'একজনের প্রাণ দিয়ে হলেও প্রমাণ করতে আমরা কসুর করবো না। কলোনীতে কড়া ব্যবস্থা ছাড়াও বাইরে আমাদের কাজ করতে হবে, পুরনো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার নতুন প্রয়োগের মুখোশ সাধারণের সামনে খুলে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে এ দাঙ্গা বুকে ছুরি মেরে বিপ্লবকে বসিয়ে দেবার অপকৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা য়্যুনিভারসিটির ছাত্ররা মিলে একটা শান্তি-মিছিল বার করবো আগামীকাল। শান্তি-মিছিল বার করাও নিরাপদ নয়, কলকাতায় গুলি চলেছে শোভাযাত্রার ওপর এ আমরা জানি। তবু আমাদের পিছিয়ে পড়লে চলবে না।'

ধরা-বাঁধা বুলির মতো এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো মনসুর। ডান হাতের ঝর্নাকলমের নীচে রাফ-কাগজটা ততক্ষণে কাটাকুটিতে ভরে গেছে। চারপাশে উপবিষ্ট লোকগুলি কথা গিলতে গিলতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। জগদীশটা কেবল হাবাগোবা গোছের নয়, পরিচিত সবাই তাকে পয়লা নম্বরের বোকা বলেই জানে; ওয়ার্কশপে লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে অনুভূতিগুলো লোহার পাতের মতোই মোটা মোটা হয়ে জাগে মনে। গালে হাত দিয়ে সে বসে ছিলো বাতির কাছেই, বিষণ্ন মুখ। কলকাতায় নিরীহ নারী ও শিশুর ওপর নির্যাতনের শোনা কথাগুলো, পূর্ব-

রাজধানীর প্রকাশ্য স্টেশনে বড়ো ভা'য়ের চোখের সামনে ছোট ভাইকে কেমন করে মারা হয়েছে তার গল্প, শহরের বুড়ো রাস্তায় বেপরোয়া লুঠের দৃশ্য, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চীৎকারের শব্দ, বুড়ো পানবিড়ি দোকানদারের হত্যার কথা মনে পড়ায় নিজের অজান্তেই শব্দ করে উঠলো, 'ইস।'

'কী ?' তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো মেহেবালি।

সে নিজেকে সামলে নিলো, 'ও কিছুই না। এমনি।'

এক দমকা ঠান্ডা বাতাস বাতির শিখাটাকে গেলো কাঁপিয়ে। কলমটা পকেটে গুঁজে মনসুর বললো, 'এখন আসি। রাত হয়েছে।'

'তাহলে এই কথা রইল,' বসির মিয়া কথাটা বললো পাকা ব্যবসায়ীর মতো।

'হুঁ, তাই।'

'কিন্তু যাবেন কেমনে ? বাইরে যে কারফিউ।'

'তা জানি,' ও হাসবার চেষ্টা করে বললো। 'এদিকে হাঙ্গামা নেই। পাহারা এতো কড়া নয়। মিলিটারি লরী আসতে আসতে ফাঁক বুঝে বাসায় যাওয়া কঠিন হবে না। পথ তো আর বেশি নয়।'

আর একটুও দেরি না করে বেরিয়ে গেলো।

ঘুরে ঘুরে বারবার এক কথাই মনে জাগে, কেমন যেন হয়ে গেছে দুনিয়াটা। মানুষে মানুষে বিশ্বাস নেই, প্রেম নেই। শ্রদ্ধা নেই। কোনো একটা মধুর সকালে আদিম মানুষ যেদিন তার লোমশ হাতের পাথরে হাতিয়ারগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিলো গুহার এক কোণায়, সেদিন সে শুধু নতুন যুগেই পা বাড়ায়নি, অপেক্ষাকৃত মার্জিত আর সমর্থ ধাতব হাতিয়ারের প্রেরণায় তার আদিম প্রবৃত্তিগুলোও শানিত হয়ে উঠেছিলো, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। খেয়ালী প্রকৃতির উদাসীন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেমন, বন্য জীব হত্যা করে আহার সংগ্রহের বেলায়ও কেবল হিংস্র উত্তেজনাই অনুভব করেনি, আনন্দও পেয়েছে। অস্ত্রের উন্নতিতে এসেছে আত্মবিশ্বাস, আহার্যের প্রাচুর্যে এসেছে শান্তি ; তাই সে শুধু ঘর বেঁধে ক্ষান্ত হয়নি, রেখায় রেখায় অপরিণত ভাষায় খোদাই দিয়ে ভরে দিয়েছে কালো শিলার বুক; পর্বতগাত্রে, নির্জন গুহায় মনকে রূপ দিয়েছে। চামড়ার পোশাকের আড়ালে কোমরবন্ধে ছুরি আমানত রেখে গাছের কোটরে, পাহাড়ের গুহায় আদিম নারীর সঙ্গে প্রেম করেছে আদিম পুরুষ, উষ্ণ নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়েছে প্রেয়সীর কানের পরিধিতে, সৃষ্টির সহজ নিয়মে পরস্পর অনুভব করেছে সমগ্র সত্তার, তবু এখানেই শেষ নয় ; কোটরের বাইরে, গুহার বাইরে অহরহ সজাগ দৃষ্টি উঁচিয়ে রেখেছে বর্শার মতো, হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে প্রেয়সীকে বাঁচাবার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য ছুরির বাটটা ঘুমোতে গিয়েও ধরে রেখেছে কঠিন হাতে। পাথরের ধারে শানানো ঝকঝকে ধাতব অস্ত্র মানুষের নির্মম মুঠোয় নিজের ব্যক্তিত্বকে যখন চিনেছে, তখন তার সাধনার পরিধি কেবল আশ্রয় দেয়ার মহান ব্রতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে শত শত রাজ্যের ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের উপকথাও রচেছে।

কিন্তু সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের সাদা চামড়া বৃহত্তর উপনিবেশে তার রথচক্রকে নির্বিবাদে চালিয়ে নেবার জন্য সেই আদিম অস্ত্রের যে নবজন্ম দিলো, তার তুলনা কোন দেশের ইতিহাসের পাতায় নেই। শিকার-খোঁজা সিংহের মতো এদেশবাসীর মিলিত ইচ্ছার দুর্বার ঠেলায় রাজকীয় সিংহের অনড় আসন যখনই নড়ে উঠেছে তখনই সে মরিয়া হয়ে শান দিয়েছে তার অব্যর্থ অস্ত্রে ; এমন কি বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসেও ঝকঝকে ধাতব পাতটা এদেশের শহরে-বন্দরে-জনপদে বিকট অট্টহাসি দিয়ে ফিরছে। ও জানে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, এই যে আড়াই বছর আগে এতো হৈ চৈ হয়ে গেছে, তা স্বাধীনতার উৎসব নয়, চামড়া-বদলের নাটকীয় প্রহসন মাত্র। চামড়ার নিচেকার শ্বেত পদার্থ ঠিকই আছে। এতে শাদা চামড়াদের আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই, পঞ্চাশে জাগ্রত জনপদ আর ভুল করবে না। মনসুর

কাঁধটাকে ঝাঁকানি দিলো।

রাস্তায় একটা বেড়ালও নেই। বাঙলার প্রচলিত লোককথা, নারীর শোভা অলঙ্কার, পথের শোভা পথিক, এর হাতে-কলমে প্রমান চোখের সামনেই। অভিজাত কৃষ্ণচূড়ার থোকা থোকা পাতা আর ল্যাম্পপোষ্টের ঋজু ছায়ায়, হাওয়ায় মৃদু আমেজ বুলিয়ে একটা কালো আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে; গা ছমছম করে, সামনে চলতে বারবার পেছনে তাকিয়ে দেখতে হয়। এক ঝাঁক অভিশপ্ত শব্দ, মানুষের কলজের খুনে ভেজা, তকতকে শীতল, যেন কানাকানি করে ভেসে চলেছে নিস্তব্ধ বাড়িগুলোর বদ্ধ দুয়ার ছুঁয়ে ছুঁয়ে, জানালার আশেপাশে, দালানের চতুষ্কোণ কার্নিশের ধার ঘেঁষে পৌষসকালের ইতস্তত শিশির কণার মতো। চোখ-কান বুজে দ্রুত পায়ে বড়ো রাস্তাটা পেরিয়ে একটা গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল মনসুর।

ঘরের ভেতর বেদনামিশ্রিত, চাপা অথচ ক্রুদ্ধস্বর শোনা গেলো, কান খাড়া করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে, পরে দুয়ার ঠেলে ঘরে ঢুকতেই ও থমকে গেল। তার ঠোঁট থেকে যেন আলগোছে ছেড়ে দিলো কথাটা, 'চাচাজান।'

'হু! তুমি এসেছো!'

আনোয়ার সাহেবের কন্ঠস্বর কেমন যেন ব্যঙ্গমিশ্রিত, তার উচ্চারণে তিরস্কারের ঝাঁঝও গোপন করার মতো নয়। ঝাঁঝটা আরেকটু চড়িয়ে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়? দুর্গতদের প্রতি দয়া দেখাতে বুঝি! তা মন্দ নয়, কিন্তু ওদিকে কী হয়েছে তা যদি নিজের চোখে দেখতে তাহলে নিছক সেন্টিমেন্টে মহান হয়ে উঠবার বাসনা একটুও থাকতো না!'

'কেনো, কি হয়েছে,' ও অপ্রস্তুত।

'কি হয়নি তাই বলো!' পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে গড়গড়িয়ে বলে চললেন, 'আমাদেরকে এখানে যে আজ সশরীরে দেখতে পাচ্ছো তার একমাত্র কারণ ধুতি। ভাগ্যিস পরিতোষ বাবু এ দয়াটুকু করেছিলেন, না হলে আরো দশজনের মতো আমাদেরও স্থান হতো নর্দমায়। একটা সাদা ধুতি একজন মানুষকে রাখতে পারে, শেষ করতে পারে তা আগে কে জানতো! পরিতোষ বাবুর দয়া জীবনে ভুলবো না। তবু সবাই কি আর আসতে পেরেছি?'

আনোয়ার সাহেব চুপ হয়ে গেলেন হঠাৎ।

'সবাই আসতে পারেননি!'

'জীবনের কাছে দোকানপাট, বাড়িঘর কি? হাতে শ' পাঁচেক টাকা না থাকলে ওখানের ক্যাম্পেই মরতে হতো পচে। বাড়িঘর, দোকানপাট পুড়েছে তাতে দুঃখ নেই। তবু যদি— সবাই—

'বাবা এসেছেন? মা? চাচি-আম্মা?'

'হ্যাঁ! তারা ভেতরে।'

'কে আসেনি? চাচাজান, দেরি করবেন না, বলুন!', মনসুরের কন্ঠস্বরে একসঙ্গে আতঙ্ক ও কাতরতা ফুটে উঠলো, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আনোয়ার সাহেবের বিষণ্ন কালো মুখটার দিকে, ভুরু কুঁচকিয়ে।

গভীর বেদনায় উচ্চারণ করলেন, 'কি আর বলবো!'

'বলুন! দেরি করবেন না!', ও প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

'মুনু!'

'মুনু! তাকে খুন করেছে!'

'হাসিন!' দু' ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে।

'হাসিন!', মনসুর আর্তনাদ করে উঠলো। অনুভব করলো সমস্ত পৃথিবী তার মগজের

ভেতর শরশর শব্দের ঝড় তুলে লাটিমের মতো ঘুরছে, লাফাচ্ছে কপালের দু'পাশের রগগুলো। পায়ে কাঁপুনি, থরথরে। ও লুটিয়ে পড়লো বিছানা আঁকড়ে ।

শব্দ, শব্দ, শব্দ। মানুষের তাজা খুনে ভেজা শীতল শব্দ, একঘেয়ে সুর তুলে বাজতে থাকে কানে, ভাঙা-ভাঙা, কাটা কাটা, একটানা, লোহার তালের মতো ভারি, শক্ত। শ্রবণ আচ্ছন্ন করে, চাপা উচ্ছ্বাসে, কান্নার সুরে শব্দের ঘূর্ণি চলে, বেপরোয়া। ডুবে যায় হৃদয়, মন, আত্মা, সকল স্মৃতি আর অনুভূতি।

ঘড়ির পেন্ডুলাম একটানা চালে দুলতেই থাকে। বিছানা আঁকড়ে ঠিক কতক্ষণ পড়ে রইলো তা ও নিজেই জানে না, হঠাৎ কিসের একটা শব্দে যখন চোখ খুলে চাইলো তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চিমনিতে কাগজ-আঁটা হারিকেনের সলতে কমানো, তবু পাতলা চড়চড়ে কাগজটা উজ্জ্বল আভায় আলোকিত। কামরাটা বেশ ঠাসা, খাটিয়ার শিয়রে একখানা ছোট্ট টেবিল, বেপরোয়াভাবে খাতা-কলম সাজানো ; দেয়ালে খোদিত আলমিরার থাক দেশী-বিদেশী বইয়ে ভরতি, অধিকাংশ বিজ্ঞানের বই হলেও গল্প-উপন্যাস-কবিতা একেবারে নেই একথা বলা যায় না, বাজার চলতি মাসিকীর অস্তিত্বও বিরল নয়। দেয়ালে-আঁটা আলনার হুক থেকে যে-কয়টি কাপড় ঝুলছে, সেগুলোতে বিলাসিতার ছাপের চাইতে শালীন্যই বেশি। মনসুর হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ, ঘন্টা তিনেক আগে কী হয়ে গেছে তা স্মরণ করতে চেষ্টা করলো।

সব কথা মনে পড়তে লাগলো ধীরে ধীরে।

'মুনু !'

মগজের তারগুলো এক সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী বললেও অমন তন্ময় হয়ে শুনতো যে, সময় সময় ও তার এতো আদুরে কুকুরের বাচ্চাটাকে ভাত দিতে ভুলে যেতো ; ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো স্থির, শান্ত, দুষ্টুমির আঁশও নেই। অথচ অন্য সব কিছুর বেলায় ওর ধাতটাই এমন নয় ; এতো গম্ভীর বাপ, এতো কড়া মা থেকে শুরু করে ছেলে-বুড়ো সবাই তার চাঞ্চল্যে ব্যতিব্যস্ত, ঠিক কোন কথাটা হঠাৎ তার মনে লেগে বসবে আর চায়ের কাপ, গেলাস ভেঙ্গে প্রলয়কান্ড বাঁধিয়ে তুলবে তার কোন নিশ্চয়তা থাকতো না, এজন্য সবাই একটু সমীহ করেই চলতো, পারতপক্ষে ঘাটাতো না। কিন্তু যার চেহারা দেখলে ও স্কুলের ফার্স্ট বয়ের মতো শান্ত হয়ে যেতো, সে হলো তার বড়ো ভাই, মনসুর। তার ছোট্ট জগতে এই একটিমাত্র লোককে ও মেনে চলতো, না ভয় করতো। ঢাকায় বাসা নেয়া হয়েছে এ যখন ও জানলো, কুকুর-পঙ্গুবসমেত তার যাবতীয় ধনসম্পত্তি নিয়ে সেও একেবারে তৈরি, মনসুরের পেছনে পেছনে চলতে শুরু করলো, 'আমি আসি, আম্মা !'

'কোথা যাসরে !' মায়ের চোখ উঠল কপালে।

'কেন, জানেন না ? ঢাকায় যাচ্ছি, ঢাকায়।'

'বলছিস কি তুই !,' মা কড়া হয়ে উঠলেন, 'আয়, এদিকে আয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ও বললো, 'না। আমি যাবো।'

মা জানতেন শত রাগ দেখালেও কোন কাজ হবে না। মনসুর ফিরে চাইতেই কী ইঙ্গিত করলেন চোখ টিপে, সুটকেস দুলিয়ে ও পেছনে ফিরে এলো। মুনুর কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বললো, 'তুমি এতো বোকা আগে তো আমার জানা ছিল না। ও বাসার মিনুকে ডেকে জানিয়ে দেবো ?'

'না আমি যাবো,' ও ঠোঁট রাখলো ফুলিয়ে।

'এই আবার এক কথা ! একথা তো মিনুও বোঝে যে আমি ঢাকা যাচ্ছি বাসা ঠিকঠাক করতে, বাসা তো নেওয়া হয়েছে, পুরনো বাসা। কত ময়লা আবর্জনা, বিশ্রী কান্ড। আমি

গিয়ে ওটা সাফটাফ করাবো, তারপর তোমরা সবাই যাবে। ওহো একসঙ্গে গেলে কেমন মজা হবে তোমাদের ! পদ্মার ঢেউ, কতো চর, ইলিশ মাছের বেড়জাল ! আর এখন ? এখন দেখবার মতো কিছু নেই,' মুনুর মুখ নিরীক্ষণ করে ও বলে উঠল। 'আরে ! আরেক কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম ! আমি ওখানে গিয়েই চিঠি দেবো, ঠিক চিঠি দেবো তোমার নামে। আর কারো নামে নয় কিন্তু। সব চেয়ে মজা, সে চিঠিতে একটা গল্প থাকবে, কেমন করে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতত্ত্ব আবিস্কার করলেন, অতোবড়ো বৈজ্ঞানিক তবু, কেমন মজার লোক ! জানো না, অদ্ভুত বেহালা বাজান ভদ্রলোক ! ও কী মজাই না হবে !'

মনসুর মজাটা যেন পুরোপুরিই উপভোগ করলো।

মুনু খুশি হয়ে উঠল এবারে।

'ঠিক বলেছেন, লিখবেন ?'

'নির্ঘাত লিখবো' মনসুর বেরিয়ে এলো।—

মনসুর চোখ উঁচু করে চাইলো দেয়ালের দিকে, চলে আসার পর মুনু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো। তারই শীতল শব্দ যেনো এখনো কানে বাজছে, স্মৃতিতে ভেসে উঠছে ওর চেহারা, কী এক যন্ত্রনায় ললাট কুঞ্চিত। ওকে মেরে ফেলেছে ? যদি না মেরে থাকে তাহলে এখন ও কোথায় ? ছুরি মেরেছিলো কি একেবারে ওর বুকের মাঝখানটিতেই ? ও ভয়ানক চীৎকার করে উঠেছিলো, না ? মনসুর ক্লান্তিতে মাথা এলিয়ে দিলো বালিশের ওপর।

'হাসিন !'

'হাসি !' ওর মর্মমূল থেকে পরিচিত ডাকটা গলা ইস্তক ঠেলে উঠে থেমে যায়। প্রথমে ছিলো হোসনে আরা, বাবা সংক্ষেপ করে ডাকতেন, হাসিন। আর মনসুর কবিত্ব হাঁকিয়ে বলতো, হাসি। সত্যি সবটুকু মিলিয়ে ও যেন এক টুকরো নিটোল হাসির মতোই।

চাচা-চাচির সাধনার ধন, একমাত্র মেয়ে। ও যখন শাড়ি পরতে শিখলো, এক বাসায় থাকলেও পারতপক্ষে মনসুরের সামনে আসতে চাইতো না, তার কারণ এ নয় যে, ও স্বভাবত লাজুক। অন্য কারণ আছে । ও জন্মাবার হপ্তা খানেক পর, মনসুরের আম্মা ছোট-জাকে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'বোন, মেয়ে কিন্তু আমার !'

'সে মন্দ হয় না,' কথাটা বুঝতে পেরে হাসিনের মা শান্ত হাসিতে জওয়াব দিয়েছিলো।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকেনি। বিভিন্ন সময়ে রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃত বিষয়টা যখন উঁকি মেরে যেতো তখন ওরা দু'জনে চোখ টিপে টিপে হাসতো, এরপর হাসিন দৌড়ে পালাতো, খিল এঁটে পড়ে থাকতো টেবিলে মাথা এলিয়ে, যতক্ষণ না বড়ো আম্মা মৃদু স্নেহ-কঠিন স্বরে ডাক দিতেন। মনসুর ফাঁক পেলে, নিজের আদর্শে দীক্ষিত করার জন্য, ওর অপরিপক্ক মস্তিষ্ক লক্ষ্য করে বক্তৃতা ঝাড়তে কসুর করেনি ; কন্ঠে আবেগ ঢেলে ও বলে চলতো বিজ্ঞানের নতুন নতুন জয়যাত্রার কথা, আণবিক শক্তির অসীম সম্ভাবনার কথা ; ইঙ্গ-মার্কিন ধনিক শ্রেণী কেমন করে মানব সমাজের ধ্বংসকার্যে ব্যবহার করতে চাচ্ছে আণবিক শক্তিকে, এ প্রসঙ্গে যখন আসতো তার মুখের রেখাগুলো ঘৃণায় ও ব্যক্তিত্বে কুঞ্চিত হয়ে উঠতো ; সে বলতো, বুর্জোয়া সমাজে বিজ্ঞানের দানগুলো ব্যবহৃত হয় শোষণ ও শাসনের অস্ত্র হিসেবে, মানুষের মঙ্গলের জন্য নয় ; বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কীভাবে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে তা হাতে-কলমে প্রমাণ করছে সোভিয়েত দেশ ; যে-সব উপত্যকা ও মালভূমি ছিলো কাঁকর-ভরা, অনুর্বর, সেখানে আজ উত্তরী বাতাসে মাথা দোলায় সোনালী ফসল ; পাহাড় উড়িয়ে দিয়ে, খাল কেটে আবাদ করা হয়েছে রুক্ষ মাটি। আজকের পৃথিবীতে এই একটি মাত্র দেশ আছে যেখানে বেকার সমস্যা নেই, যেখানে খেতে না পেয়ে মানুষ মরে না হাটে-মাঠে রাস্তায়, যেখানে কর্ম আর আনন্দ, জীবন। এবং এ সবকিছু হতে পেরেছে, কারণ তারা নিপাত করতে পেরেছে রক্ত শোষকের দলকে, ওদের ধ্বংসস্তূপের ওপর, কবরের ওপর তারা স্থাপন করেছে এক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। এসব কথা বলতে মনসুরের আবেগের অন্ত ছিলো না, হাসিনও চুপটি করে

শুনতো ভেজা বেড়ালের মতো বসে।

হাসিনের হস্তাক্ষর খুব বেশি সুন্দর না হলেও শিল্পীজনোচিত। বিশেষ করে কমাল আর পাখায় তার সূচীকর্ম সত্যি অনিন্দ্য। অন্তত মনসুর তো তার প্রশংসায় অস্থির। ঢাকায় আসার একদিন আগে, হাসিন যখন তার ছোট্ট কামরায় ভালো ছাত্রীর মতো পড়াশোনায় ব্যস্ত, মনসুর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'কাল যাচ্ছি।'

হাসিন নীরব।

'আমাকে তোমার একটা জিনিস দিতে হবে।'

'কি ?,' ও নিজের স্বর হয়তো নিজেই শুনতে পায়নি।

'তোমার আঁকা।'

ও টেবিলের ওপর পেন্সিলটা অনর্থকই ঘষলো কতক্ষণ, তারপর একটু ঝুঁকে না বলার ভঙ্গিতে অবশেষে বলেই ফেললো, 'নিন।'

মনসুর ভেবেছিলো চলে আসার দিন হয়তো ও কিছু বলবে, না-কাঁদুক অন্তত মুখখানা ভার করে থাকবে, কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। তার সেই শান্ত হাসি লেগেই আছে। ঘর থেকে চলে আসার সময় একদৃষ্টে চেয়ে ছিলো শুধু।

মনসুর দূর থেকে ডেকে বলেছিলো, 'চিঠি দিও।'

সাড়া হয়তো হাসিন দিয়েছিলো, কিন্তু এতো মৃদু যে ও শুনতে পায়নি।

আরো কতক্ষণ এভাবে ডুবে থাকতো জানা নেই, হঠাৎ একবার খুটখাট আওয়াজে ওপর চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো। ম্লান হয়ে এসেছে আলো, টেবিলের ওপর এখনো পড়ে আছে তার খাবার, সেই সন্ধ্যায় মামা এনে রেখেছিলো, তার খবরই নেই। রাত একটা উৎরেছে।

চোখ খুলে আশেপাশে চেয়ে দেখলো কেউ আছে কি না, শব্দটা কোত্থেকে এসেছে তা ঠাহর করবার চেষ্টা করলো; কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না, হয়তো ইঁদুর এসে খাবারের পাত্রটা নাড়া দিয়ে পালিয়েছে। আগাগোড়া ব্যাপারটাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সহ্য করে নেয়ার জন্য চোখ কচলিয়ে আঙুল বুলোতে লাগলো মাথার চুলে। ভেতরে হয়তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এতো রাত জেগে থাকা অযৌক্তিক, বিশেষত কলকাতা থেকে পরিশ্রান্ত ও পঙ্গু হয়ে ফিরেছে তারা।

ভাতের থালা চোখের সামনে সাজানো থাকলেও খাবার রুচি কিংবা প্রবৃত্তি কোনটাই ওর ছিলো না, একটা অস্বাভাবিক ক্লান্তিতে দেহ-মন একেবারে এলিয়ে পড়েছে। কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে তার মন ডুবে যায় ভাবনার অতলতায়, ও জানতেও পারে না।

মনসুর ভাবলো। কিন্তু যতই ভাবে সুতোর গুটির মতো ভাবনার পরত খোলেই শুধু, সান্ত্বনার লেশমাত্রও জাগে না মনে, বরং একটা জমাট ক্রোধ, অদম্য প্রতিশোধের ইচ্ছা, অসহ্য ঘৃণা কন্ঠ ঠেলে উঠে যুক্তি-বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দেয়। হাসিনকেও তারা মারতে পেরেছে ? এতো বড়ো পশু ?

উত্তেজনায় ও মাথার চুল ছেঁড়ে।

একটা মুখ ভেসে ওঠে। তার পরিচিত প্রিয়তমো মুখ, দুনিয়াতে যার জুড়ি নেই। একজোড়া শ্রান্ত অশ্রুসজল চোখ, কতো রাত কাটিয়ে দিয়েছে ও চোখের স্বপ্নে। ভেসে ওঠে একটা পরিপূর্ণ নধর দেহ, ভেনাসের ভাস্কর্যের মতো সুন্দর। ওর কী, চোখে-মুখে, সারা দেহে লাল রক্তের ছিট !

বুকে ছুরি !

'ছুরি !' মনসুর তার অজ্ঞাতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হলো তার—না, চারদিকে কিছুই তো নেই !

ও, ওটা মনের কল্পনা।

হারিকেন বাতির ছায়া দেয়ালে কাঁপছে।

জানালা খোলাই ছিলো, ঝিরঝিরে হিমেল বাতাসের আমেজে ঘরটা স্তব্ধ হয়ে আছে, এতটুকু শব্দ কোথাও নেই, চলতে চলতে কালের স্রোত যেন হঠাৎ কার জন্য পেছনে দাঁড়িয়েছে থমকে। পোষ-না-মানা হিংস্র নেকড়ের পালের মতো অনুভূতিগুলো ভেতরে ভেতরে ফোঁসাচ্ছে, সমগ্র চৈতন্য যেন থাবা উচিয়ে একটা দুষ্ট সঙ্কল্পে শিকার খুঁজে ফিরছে। এ পাড়ার হিন্দু বাড়িগুলো সাঁ করে তার মগজে ভেসে উঠলো, হলদে আলোর লণ্ঠন উচিয়ে যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে। আর, আর সেসব বাড়ির আনাচে-কানাচে, দেয়ালের কার্নিশে, থোকা থোকা অন্ধকারে, আলো-ছায়ার খেলায়, মৃদুমন্দ স্রোতে যেন বয়ে চলেছে সেই একটানা শীতল শব্দ। ওর চোখ জ্বলে উঠলো হিংস্রতায়। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, একটা মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার কাছাকাছি।

'কে ?,' ও উঠে বসলো বিছানায়, 'আব্বা !'

'হু।'

'এতোরাত্রে ! ঘুমোন নি ?'

'না।'

চেহারার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ও হতভম্ব। অমন ভয়ঙ্কর তো ছিলেন না ? চেনাই যায় না। মানুষের মতো দেহের গঠন হলেই যে মানুষ হয় না, তার সঙ্গে কতকগুলো গুণেরও সমন্বয় দরকার, ওর পিতার চেহারা তার চাক্ষুষ প্রমাণ। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রেম ইত্যাকার যতগুলো জাগতিক গুণ বণি-আদমের দেহ ও মনকে সদা সতর্ক পাহারায় পূর্ণ করে তোলে তার সবগুলো এক সঙ্গে মুছে গেলেই শুধু এরকম হয় না, সেগুলোব বদলে ক্রোধ-জিঘাংসা-ঘৃণা -উত্তেজনা-ঈর্ষা মূর্তিমান হয়ে উঠলেই এ অবস্থা সম্ভব।

চেহারা দেখে ও শিউরে উঠলো।

কোটের পকেট থেকে ডান হাতটা বার করে দিলেন বাড়িয়ে।

'কি ?' মনসুর এমন হকচকিয়ে চাইলো যে, কেউ যেন তাকে আক্রমণ করতে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিলো। হাত বাড়িয়ে পিতার হাত থেকে টেনে নিলো ধারালো ছুরিটা।

'চলো', হারিকেনের আলো দিলেন নিবিয়ে।

এখন অন্ধকার। কুঠুরিটা নিরেট অন্ধকারের পাথর দিয়ে ঠাসা। বাইরে কিছুটা ফরসা স্বচ্ছ আকাশের সার-বাঁধা তারার আভায়, তবু আবছায়া দুয়ার-দেয়াল, কামিনীগাছের থোকা থোকা পত্রগুচ্ছ সবই যেন আতঙ্কে শ্বাসরোধ করে আছে। অতি সন্তর্পণে দুয়ারের শব্দ এড়িয়ে দু'জন বেরিয়ে এলো ঘরের পেছন দুয়ার দিয়ে। মনসুর আগে আগে চললো পথ দেখিয়ে, ওর বুকটা যেন পাথর হয়ে গেছে। কিছুই আসছে না অনুভূতির সীমায় !

পাশাপাশি বাড়ি। বুক-উঁচু ইঁটের দেয়াল অনায়াসেই গেলো টপকে। প্রফেসরের সখের বাগান। হাস্নাহেনার গাছে বোধ হয় ফুল ফুটেছে, বাতাসে ছড়ানো একটা নিবিড় মন-মাতানো গন্ধ। বাড়ি একতলা, যেন ওত পেতে আছে, সুযোগ পেলে মরিয়া হয়ে লাফিয়ে পড়বে কারো ঘাড়ের ওপর। ঘরে প্রবেশ-পথের ওপরে কার্নিশটায় মোটা মোটা সিমেন্টের হরফে কী উৎকীর্ণ, সবুজ কিম্বা সরোজ একটা কিছু হবে, ছায়ায় অস্পষ্ট। সূর্যমুখীর ডাল দুলছে মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঝোপ, ফুলের গাছ, কাঁটাতার, আর মাটির টবের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে নিয়ে দু'জন উঠলো বারান্দায়, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে নিলো ইচ্ছে করেই। দুটো ছায়ামূর্তি।

ওর বুক কাঁপছে, ধুকধুক করে, হাতুড়ি পেটার মতো। পা কাঁপছে। সুমুখে এগোতে পারছে না, পেছন থেকে টেনে ধরে রেখেছে কে যেন। এরপর তার মনের চাপা ক্রোধ আর উত্তেজনা দ্বিগুণ হয়ে আগুনের শিখার মতো ছড়িয়ে পড়লো শিরায় শিরায়, মস্তিষ্কের কোষে

কোষে, সারা চেতনায়। এতক্ষণে ছুরিটা যেন প্রাণ পেয়েছে, ছিটকে পড়বার জন্য ছটফট করছে হাতের মুঠোয়, একটু ছুঁতো পেলেই যেন ঝনঝন করে চেঁচিয়ে উঠবে প্রাণপণে। জাগিয়ে দেবে সারা পৃথিবীকে। ছুরির বাট শক্ত করে মুঠোয় চেপে ও এগিয়ে গেলো, বারান্দার থামগুলো ছাড়িয়ে, বাড়ির পেছন দুয়ারের সিঁড়িতে। পিতা তাকে অনুসরণ করলো ভয়ঙ্কর যমের মতো।

'আপনি দাঁড়ান।'

'হু!'

'আমি আগে দেখে আসি।'

প্রথম কুঠুরির দুয়ার খোলাই ছিলো, ভেতরে একটা খাটিয়া, টেবিল ও কতকগুলো বই ছাড়া চোখে পড়বার মতো কিছু নেই। যে দুয়ার দিয়ে প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয় কুঠুরির সংযোগ, তা বন্ধ, আঁটো-সাটো, ফাঁকা নেই। দুয়ারের কাছে গিয়ে উত্তেজিত হাতে কড়া নাড়তে গিয়েই ও প্রথমটায় থেমে গেলো, তার মনে উঁকি দিয়ে গেলো কী একটা অস্পষ্ট অনুভূতি। নতুন করে তার মনে পড়লো, কার বাড়িতে এসেছে, এ বাড়ির মানুষগুলো কেমন, কী রকম তাদের চেহারা, আর কীভাবে কথাবার্তা বলে তারা। ও বুঝতে পারলো, এ দুর্বলতার লক্ষণ। ও রকম ভাব কিছুক্ষণ স্থায়ী হলে শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পটাই নেতিয়ে পড়তে পারে ভেবে ছুরি-সমেত ডান হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো, আর বাঁ হাতটা কড়ার দিকে দিলো এগিয়ে।

প্রতিশোধ নিতে হবে।

খট্ খট্ খট্। ভেতরে সাড়া শব্দ নেই কোনো।

কড়ায় আরো দু'তিনটে নাড়া দিলো গায়ের জোরে। সে আওয়াজ, হয়তো পাশাপাশি বাড়ির কারো কারো কানেও বেজেছে, দেয়াল ডিঙিয়ে চলে গেছে এমন কি বড়ো রাস্তায়। তবু এদিকে ওর খেয়ালই ছিলো না, একটা পাশবিক উত্তেজনা ছাড়া কিছু নেই। কড়া নাড়া থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলো।

'কে?'

ভেতর থেকে একটা উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন। শরীর ঝাড়া দিয়ে, ঢোক গিলে ও যথাসম্ভব সহজ গলায় জওয়াব দিলো, 'আমি'।

'ও, মনসুর? এসো বাবা, এসো,' যেন হাতে আশমান পেলেন।

দুয়ার খুলে দিলেন হিরন্ময়ী। বাইরে থেকে অনুভব করার যো নেই, ঘরে কোনো জনপ্রাণী আছে; আলো থাকার কথা তো অবাস্তব; তবু ঘরের ভেতর আলো ছিলো, হারিকেন বাতি, সলতে কমানো না হলেও বই-এর আড়াল করা। সব জানালা, এমনকি ফোকরগুলি, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ভেতর থেকে। ঘুমোচ্ছে একেবারে কোলের মেয়েটা, তার বড়ো কৃষ্ণা ঢুলছে বসে বসে, আর শিপ্রা হয়তো কেবল তার মায়ের শাসানিতেই জেগে আছে। মনসুর ঘরে ঢুকতেই ও একেবারে দৌড়ে এসে কোট ধরে দাঁড়ালো।

ডাকলো, 'মনদা।'

ও জওয়াব দিতে পারলো না।

দুয়ারে খিল এঁটে, আলোটা চড়িয়ে সামনে এসে, শান্ত বিষণ্নস্বরে হিরন্ময়ী বলতে লাগলেন, 'আমি ঠিক ভেবেছিলাম তুমি আসবেই, না এসেই পারো না!'

ও নীরব রইলো।

'দিনের বেলায় একবারও আসোনি দেখে ভাবলাম, হয়তো বাইরে তোমার অনেক কাজ। পরে আমার অনুমান ঠিক হলো। ও বাড়ির রুপুর কাছে জানতে পারলাম, তোমরা নাকি শান্তি মিছিল বার করছো। এ সময় তোমরাই তো একমাত্র মানুষ যারা সত্যিকারের কাজ করতে পারে।' কী ভেবে থামলেন একটু, পরে বলতে লাগলেন, 'মনে হতে পারে আতঙ্কিত হয়ে আমি তোয়াজ করছি। তা নয়, বাবা। তোয়াজ আমি করছি না। এখনও কেনো দাঙ্গা হয় তার কারণ একমাত্র

তোমরাই জানো, আর তার বিরুদ্ধে কেমন করে রুখে দাঁড়াতে হয় তার কৌশলও তোমাদেব জানা আছে। এ সময় একমাত্র তোমরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষের চোখে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারো। —আরে, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছো ? বসো, বাবা বসো !'

মনসুর বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে বইলো ।

'যাক সে কথা। এখন আমি ভাবনায় পড়েছি, গতকাল প্রফেসর যে ইউনিভার্সিটিতে গেল আর ফেরেনি। কী জানি কি বিপদে পড়েছে। কোন বন্ধুর বাসায় যদি উঠে থাকে তাহলে নিরাপদেই আছে বুঝতে হবে আর তা যদি না হয় ?' এবাবে বেশ কতক্ষণ নীরব রইলেন। তাবপর বলতে লাগলেন, 'তা না হলে আর কি হবে ? এজন্যই বেশি করে তোমাকে খুঁজছিলাম। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে আসতে। আচ্ছা বাবা, তুমি আজ ক্লাস কবতে যাও নি ?'

'না,' ও ঠোঁট নাড়লো।

'তাহলে তো তোমার জানবার কথা নয়। এদিকে ঘরে চাল-ডাল নেই, গতকালই রেশন ফুরিয়েছে। আনাবাবও সময় হয়নি। তবু রক্ষা, ঘরে এক টিন জমানো দুধ ছিলো, না হলে খুকীটা কেঁদেই মরতো। এমন বিপদ, কী যে কববো মাথা ঘুলিয়ে গেছে।'

নিজেব অজান্তেই মনসুবেব চেহাবায় স্বাভাবিকতা ফিরে আসছিলো।

'একটা কথা বলবো, বাবা !' হিবণ্ময়ীর কণ্ঠে মিনতি।

'কি ?'

'জানি একথা তোমার মনে বাজতে পাবে। এত দিনেব আত্মীয়তাব পবও তোমাকে অবিশ্বাস করছি। অবিশ্বাস নয় বাবা, মৃত্যু সামনাসামনি হলে মানুষেব মনে বাঁচবার জন্য যে দুর্বলতা জাগে, এ হয়তো সেই। তাই আমাবও বলতে লজ্জা নেই।' মনে মনে প্রস্তুত হয়ে তিনি বললেন, 'অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে শুনছি। এখানে আব পড়ে থাকবো কোন্ ভবসায়। বাবা, তুমি যদি চাও, বাড়িটা নিয়ে যাও, আব তাব বদলে আমাদেরকে অন্তত বিফ্যুজি ক্যাম্পে পৌঁছে দাও। বাড়িতে আব কিছু না থাকুক, একটা লাইব্রেরি আছে। দিনে দিনে অনেক কষ্টে প্রফেসর বই সংগ্রহ করেছে! বিশেষ করে দর্শনেব বই-এর অমন কালেক্‌শন হয়তো দ্বিতীয়টি নেই। তুমি তো বই ভালবাসো। এ তোমাব কাজে লাগবে। পাববে, বাবা, এ দয়াটুকু করতে ?' তিনি থামলেন। আর কোনো সময় হলে হয়তো মনসুব চেঁচিয়ে উঠতো কিন্তু এখন কথা শুনতে শুনতে ও যেন ধীরে ধীবে পাথর হয়ে গেলো। দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো সারা কামবায়, অকস্মাৎ হু-হু করে উঠলো তাব মন, অনুশোচনার তীব্র বেদনায়। নতুন করে চোখের সামনে মূর্তিমান হয়ে উঠলো তাব এতোদিনকাব জীবনাদর্শ, তার যুক্তি-বিচাব, তাব স্বপ্ন। কোটের পকেটে ছুরির বাটটা তখনো তার হাতে ধবা, আঙুলগুলো ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছে। ঝরঝর করে দু'চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

'মনদা !' ডাক দিলো শিপ্রা।

'কিরে ?'

'আমাদের বাঁচাবেন না ?'

এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আরো অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারতো, দুয়ারে সঙ্কেতমূলক করাঘাতে ওর চৈতন্য হলো, হিবণ্ময়ী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে নীবব হয়ে রইলেন। অবশেষে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই যেন জিজ্ঞেস করে উঠলেন, 'কে ?'

'চুপ !' মনসুরের ভঙ্গি সন্দেহজনক।

'কি হয়েছে ?' ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন হিরণ্ময়ী ?

মনসুর ফিসফিসিয়ে বললো, 'আরেকটি শব্দও নয়। ওই দুয়ার দিয়ে আপনি বাইরে চলে যান ওদের নিয়ে। চলে যান, দেরি করবেন না। আমি আসছি !'

ও দুয়ার খুলে প্রায় জোর করে বার করে দিলো ওদের। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় কেঁদে উঠতে চাইছিলো কৃষ্ণা, মা তার মুখ চেপে ধরলেন। আতঙ্কে সবাই কাঁপছে।

বেরিয়ে যাওয়ার পর মনসুর ভেতর থেকে খিল এঁটে দিলো।

সামনের দুয়ারে আবার মৃদু করাঘাত। খট্ খট্ খট্।

ও শক্ত হয়ে দাঁড়ালো খিল খুলে দিয়ে।

'মানুষ কোথায় ?'

'নেই।'

'নেই ! কার সঙ্গে চালাকি করছো, জানো ?'

'জানি, আপনি আমার পিতা।'

'লজ্জা করে না একথা মুখে আনতে ! ভাইকে খুন করেছে, বোনকে মেরেছে, বাড়িঘর পুড়িয়েছে, দোকানপাট লুঠ করেছে, আর ইনি হাতে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছেন ! হায়রে আমার মহাপুরুষ। পথ ছাড়ো, আমি খুঁজে বার করবো।'

মনসুর কঠিন স্বরে বলল, 'এদিকে আসবেন না, আমার অনুরোধ।'

'অনুরোধ !' ব্যঙ্গাত্মক বিকট হাসি।

'হ্যাঁ, অনুরোধ। আপনি আমার পিতা। শ্রদ্ধা করি। সে জন্যই বলছি, কোন অসঙ্গত কাজ করতে আমায় বাধ্য করবেন না। জেনে রাখুন, আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকবো—'

পিতার বিকট হাসির ঝাপটায় ওর কথা ডুবে গেলো। ঘরের ভেতরটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো সে-হাসির দমকে। সর্বাঙ্গে ভীষণতা উঠলো ফুটে।

বিপরীত দুয়ারটা আগলে দাঁড়ালো মনসুর।

পিতা দৌড়ে এলেন উন্মত্তের মতো।

'আব্বা', প্রথম আঘাতটা ও ফিরিয়ে দিলো।

'তুই আমার ছেলে নোস। মীরজাফর !'

আর্তনাদ করে ওঠার আগেই ছুরিটা বসে গেলো কাঁধে, গলার কাছে। ও বুঝতে পারলো, তাকে বাঁচতেই হবে। না হলে জীবন যাবে আরো কয়েকজনের। চৈতন্য জাগিয়ে রেখে, সাবধানী ব্যক্তিত্বে ও হিংস্র হয়ে উঠলো মুহূর্তেই। ভাববার সময় নেই। পাগলা ষাঁড়ের মতো ফোঁস ফোঁস করে লাথি-ঘুষি সমানে চালালো পিতার চোখে-মুখে, পেটে-বুকে। কেবল ভাঙা-ভাঙা, ধপাস ধপাস শব্দ।

দেয়ালে তার প্রতিধ্বনি। আর কিছু নেই।

কতক্ষণ আত্মরক্ষা করে, শেষমেষ একটা ভীষণ ঘুষির তোড় সামলাতে না পেরে, পিতা পড়ে গেলেন খাটিয়ার পাশে মেঝেয়। গুটিয়ে উঠলেন। 'আমি বাঁচতে চাই না ! মেরে ফেল, আমায় মেরে ফেল !' চেঁচিয়ে উঠে ছুরিটা ছুঁড়ে দিলেন মনসুরের দিকে। মেঝের ওপর পড়ে ঝন ঝন করে উঠলো। কাঁধের জখম থেকে রক্ত ছিটকে উঠছে পিচকারির রঙের মতো। গড়িয়ে পড়ছে কোর্টের তলা দিয়ে।

ছুরিটা কম বসেনি, তবু এদিকে খেয়াল দেয়ার সময় নেই। যেখান দিয়ে পিতা ঢুকেছিলেন, কাঁধ চেপে ধরে বিদ্যুৎ গতিতে ও বেরিয়ে গেলো সেই একই দুয়ার দিয়ে।

ওরা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো।

'জলদি !'

'কে'—

'কোন কথা নয়।'

ফটক পেরিয়ে ওরা বেরিয়ে গেলো রাস্তায়।

অনেক অন্ধকার। অনেক আলো-ছায়া, চাপা স্বর। অস্পষ্ট শব্দ, ফিসফিস উচ্চারণ, প্রশ্নোত্তর ঘিরে আছে কলোনীর কুঠুরি, প্রাঙ্গণ।

ঈষৎ হিমেল বাতাস। রাত বারোটা নাগাদ কাছাকাছি পাড়া থেকে কয়েকটি পরিবার দৌড়াতে দৌড়াতে কিংবা কাঁপতে কাঁপতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, চোখে আতঙ্ক, বুকে ধড়ফড়ানি। তখন থেকে কলোনী বাসিন্দাদের অনেকের চোখেই ঘুম নেই, যারা চোখ বোজার কসরতে একটু কাত হবার ফিকির করছিলো বিছানায়, রাত দেড়টার পর একে একে উঠে পড়লো তারাও। রাত সাড়ে এগারোটার সময় কয়েকটা গুণ্ডা কলোনীতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন দেখলো, পথ আগলে দাঁড়ানো, গতিক সুবিধের নয় ভেবে দুর্বোধ্য ভাষায় বকাবকি করতে করতে চলে গেছে। শহরের আবহাওয়া গরম।

মনসুরকে দেখে ওরা আশ্চর্য হলো না।

ওদের পৌঁছে দিয়ে ও বারান্দায় বসে পড়লো লেপটে। কাঁধে ভয়ানক যন্ত্রণা। ও অনুভব করলো, রক্তের শীতল ধারা এখনো বুকের ওপর দিয়ে বেয়ে পড়ছে। শিপ্রা তখনো কাঁপছিলো। ওকে লক্ষ্য করে বললো, 'এখানে আর ভয় নেই।'

যন্ত্রনায় ওর মুখ কোঁচকানো।

নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও হিরন্ময়ী লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা।

'কি বাবা, অমন করছো কেনো ?'

'ও কিছু না।'

কন্ঠির কাছে হাত দিতেই ও শিউরে উঠলো, এখনো রক্ত বেরোচ্ছে গলগলিয়ে। কয়েকটা রগ হয়তো একেবারেই কেটে গেছে। মাথা ধরে এসেছে, শরীর উঠেছে বিষিয়ে। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে ইচ্ছাশক্তি, হাতে-পায়ে অপরিসীম ক্লান্তি। এ ক্লান্তির যেন শেষ নেই, ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে, কোন নিশ্চিত পরিণতির দিকে, চরম ক্লান্তির পর্যায়ে। পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিলো।

'মা !', একেবারে মর্মমূল থেকে ডাকটা বেরিয়ে এলো।

'কি বাবা, কি হয়েছে ?'

'কিছুই হয়নি মা, কিছুই হয়নি।'

কিন্তু হিরন্ময়ীর চোখে ধূলো দেয়া শক্ত। ওর গলার কাছে, মুখের ওপর রক্তের ছিটে, ফ্যাকাশে ঠোঁট দেখেই আগাগোড়া ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো তার চোখে, বাড়ির কামরার ভেতরকার অসংলগ্ন শব্দ, গোঙানির কথাও পড়লো মনে।

'রক্ত !'

'হ্যাঁ। কিছু ভাববেন না। সেরে যাবে।'

ইতিমধ্যে জগদীশের বউ, আরো কয়েকজন মজুর-মেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাতি উঠিয়ে ধরেছে একজন। জগদীশের বউ স্বভাবত ভীতু নয়, তব নিজের চোখে রক্ত দেখে ও স্থির থাকতে পারলো না। সন্ত্রস্তপদে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চ ফিসফিসে স্বরে জানিয়ে দিল সবাইকে, যারা ছিল ঘরে, উঠোন কিংবা পাহারায়। যারা পাহারা দিচ্ছিল, সে-কয়েকজন ছাড়া সবাই এসে জড়ো হল নিমেষে।

'কি হয়েছে ?'

'কি ?', সবার মুখেই উৎকন্ঠিত প্রশ্ন।

হিরন্ময়ীর নির্দেশে ওকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল একটা কোঠায়।

মনসুব অতি কষ্টে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমবা চিন্তা কবো না। বিশেষ কিছুই নয়। ও সেবে যাবে।'

'কেমন কবে এমন হল ?'

'কে কবেছে ?'

'কে ?'

দূবে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। হয়তো গোলমাল চলছে কোথাও। হয়তো আগুন দিয়েছে কোনো বাড়িতে কিংবা হামলা কবেছে গুন্ডাবা। বাত্রিব নিস্তব্ধতায় একটুখানি শব্দই বিবাট হয়ে বাজে। সাবা আকাশ উজ্জ্বল তাবায় ভবা, যেন কৌতূহলী দেখছে —শুনছে পৃথিবীব মানুষের কান্ড-কাবখানা।

'কে কবেছে এমন ?'

মনসুব হাসল। বলল, 'চাবদিকে যখন মানুষকে মানুষ খুন কবছে তখন এ সওয়াল হাস্যকব নয় কি ? কে মেবেছে তা জেনে লাভ নেই। তবে এতটুকু শুনে বাখো মেরেছে যে সেও মানুষ। মানুষই মেবেছে।'

সাদা তেনা না পেয়ে হিবণ্ময়ী শাড়িব আঁচল ছিঁড়লেন।

'সকাল হওয়াব আগে হাসপাতালেও পাঠানো যাবে না। কাবো ঘবে আয়োডিন আছে, আয়োডিন ?'

'আয়োডিন!'

'আয়োডিন কোথা পাব ?'

ওব দেহটা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে শবেব মতো, উশকোখুশকো চুল এক গোছা কপালেব ওপব, ম্লান আলোব যতগুলি বশ্মি ছড়িয়ে পড়তে পেবেছে তাতে মুখে যাতনার চিহ্ন স্পষ্ট, কুঞ্চিত বেখা, ক্রমশ অবশ হয়ে আসা চেতনাব পবিপূর্ণ ছাপ ধূসব ঠোঁটে, অচঞ্চল চোখেব তাবায় এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনটা যেন এসে ছায়া ফেলেছে। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল নির্বাক। কে যেন তাদেব মুখগুলো দু'হাতে চেপে ধবেছে, কথা বলতে দিচ্ছে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবে ব্যাপাবটা ঠাহব কববার চেষ্টা কবলেও কোন্খানে, কোন্ ঘটনায়, এমন অবস্থা ওব হয়েছে তাব কিনাবা কবতে পাবল না। ছেঁড়া কাপড়ের টুকবো ভাঁজ কবে জখমটা বেঁধে দিলেন হিবন্ময়ী কম্পিত হাতে। কতকটা অপ্রস্তুত, শঙ্কিতও। বিশেষত তাদেব বাঁচাতে গিয়েই ওব যখন এ দশা, যখন ভাবলেন, মনে মনে পীড়া অনুভব কবলেন; তাব স্নিগ্ধ শান্ত মুখে সমবেদনা, স্নেহ, শ্রদ্ধা কাতবতা। বিছানাব পাশে বসে কপালে হাত বুলোতে লাগলেন, মাথা নীচু কবে, কোন কথা না বলে, ধীবে ধীবে।

হঠাৎ দু'চোখ বিস্ফাবিত কবে চাইল।

'আমি একটা কথা বলবো।'

'কি বাবা ?'

অমন বোধশক্তি অবশ হয়ে এলেও একটা অনুশোচনাব বেদনা ওর সারা অন্তবে গুমবে মরছিল, দুবন্ত বাতাসেব মতো, যাব শেষ নেই, অন্ত নেই। তাব নির্মম বিবেক সমস্ত দেহ ও মনকে যেন কেটে কেটে দিচ্ছিল ক্ষুবেব ধাব দিয়ে।

'আপনি আবো কাছে এসে বসুন।'

'বলো বাবা।'

'বলবো! হ্যাঁ আমি বলবো, না বলে আমার শান্তি নেই, নিস্তাব নেই,' বুকভাঙ্গা কাতব স্বরে ও বলতে লাগল। 'আপনি জানেন না, আমি গিয়েছিলাম আপনাদেবকে খুন কবতে। হাঁ খুন কবতে। বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দেখুন তাব প্রমাণ!'

ও ছুরিটা বের করে ধরল ।

'এখন বিশ্বাস হচ্ছে ? এখন না হয়েই পাবে না । আমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি সইতে পারিনি, ঘৃণা জেগেছিল আমার মনে, প্রতিশোধ নেয়ার পাশবিক প্রবৃত্তি, তখন আমি জানতে পারিনি, আমি চলেছি নিজের বুকে ছুরি মারতে, ছুরি মারতে জীবনের বুকে,' ছুরিটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা স্বরে বলে উঠল । 'কিন্তু আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন। এখন আর এর ভার আমি সইতে পারছিনে । আমি সইতে পারছিনে । এটা আমার কাছ থেকে আপনি নিন, আমায় মুক্তি দিন । মুক্তি !'

চোখ মুছতে মুছতে ছুরিটা নিলেন হিরণ্ময়ী ।

'উহ্ কী শান্তি । এখন আর আমার কোন অনুশোচনা নেই । জ্বালা নেই । আমায় মুক্তি দিয়েছেন একটা কঠিন ভার থেকে । আমি মুক্ত, আমি শান্ত । এখন আমার মরতেও দুঃখ নেই । আমি বিজয়ী ।'

হাসিতে ওর চোখ-মুখ ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল । কয়েকজন পাহারা থেকে এসে দাঁড়িয়েছিল নতমুখে, কটাল চোখ, ছেঁড়া কোট আর রুক্ষ চেহারায় বিষণ্নতা চুপসে আছে। আরো অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল, কাউকে লক্ষ্য না করে আপন মনেই ও বলল, 'কালকের শান্তি মিছিল যেন সফল হয় ।'

হাত দুটো নিস্তেজ হয়ে দু'পাশে পড়ল এলিয়ে । হয়তো ও ঘুমিয়ে পড়েছে, হয়তোবা ঘুমোয়নি, হয়তো চৈতন্য হারিয়েছে, হয়তোবা হারায়নি । হয়তো গভীর বিস্মৃতির কুয়াশা ঢেকে ফেলেছে তার মন, হয়তো-বা ঢাকেনি, হয়তো সবকিছুই মনে আছে, হয়তো-বা মনে নেই; দাঁড়িয়ে ছিল ওরা খাটিয়ার চারপাশ ঘিরে নির্বাক, নিস্পন্দ, সবার চোখে ছায়া ফেলে গেল অদৃশ্য সন্দেহ, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল । ওর মুখের রেখাগুলি কাঁপছে বাতির ম্লান আলোয় । বাইরে কলোনীর সামনে দিয়ে লাঠি হাতে সার বেঁধে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লোহার পাঁচিলের মতো, সামনে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দাঁড়িয়েছে জোয়ানেরা, এখন এখানে শান্তি ! এখানে তন্দ্রা আর ঘুমের প্রবেশ নিষেধ । শুকতারা নেমে এসেছে পূর্ব-আকাশের সীমান্তে, গাছের পাতা নড়িয়ে বইছে প্রভাতী হাওয়া, মৃদুমন্দ। বাতাসের মধুর কোমল ছোঁয়া পেয়ে আদুরে পাখি-শিশুটার ঘুম গেছে ভেঙে ।

হাসান আজিজুল হক

মা-মেয়ের সংসার

মা-মেয়েব সংসাব । দুজনেই খুব সুন্দবী । কাব গবজে তারা অত সুন্দবী কে জানে । আপনমনে থাকে তাবা, কোথাও যায় না । কেউ আসেও না তাদেব কাছে । এখানকাব নদীখালগুলি জিলিপির প্যাঁচের মতো । কেবলই ঘুবে ঘুবে বেড়ায়, মাটি কাটে, গাছ কাটে, বাড়ি কাটে । ওদেব ঘুবে বেড়ানোটাই আসল । জমি যা বাঁচে তাদের ক্ষিধে মিটিযে, তাব উপবেই লোকজনেব ঘববাড়ি, চাষাবাদেব জায়গা । তাতেও স্বস্তি নেই । জলেবা খালগুলির ভিতবে ঢুকে কেবলই তাদেব উস্কাতে থাকে — চল্ না একটু ঘুরে আসি, দুটো ঘর একটা উঠোন হলেও চলে । জলেদের সুবিধাও অনেক, ছ ঘন্টা পব পর চাব-পাঁচ হাত উঁচু হযে ফুলে ওঠে । তখন কেবলই ছোঁ মেবে ঘর দুয়োব চাটতে যায । জিভ দিযে চেটেও দেয মাঝে মাঝে ।

মা-মেয়ে জলেব নাগাল থেকে অবশ্য একটু দূবেই আছে । খাল-পাড় ধবে কালো নোনা কাদা পেবিয়ে হেঁতাল গোলপাতাব জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে, বনবেড়ালেব দাঁত আর থাবার মতো বেতবনেব আঁকশি-কাটাগুলো বাঁচিযে অনেকটা গেলে একটু উঁচুমতো জাযগায় ওদেব কুঁড়েটা পাওযা যায । ভিজে সোঁতা আ-চোটা জমির উপব পাটিকাঠিব দেযাল দিযে ঘেবা । চালটা ছনেব । ঘবেব মেঝেয মাটিব শানকি, জলেব কলস, টিনেব গ্লাস, এতটুকু একটা উনুন, আব একপাশে চ্যাটাইযের উপব মযলা চিটচিটে কাঁথা-বালিশেব বিছানা । মা-মেযে এক বিছানায থাকে । তাদেব আব কিছু দবকাব নেই ।

ঘরেব পেছনেই বেনাঝোপে শিয়াল থাকে । একটা মুবগি পোষাব উপায় নেই, ওঁৎ পেতে থাকে চব্বিশ ঘন্টাই, মুবগি পেলেই হলো, ঝপ্ কবে মুখে তুলে নেবে । ছ মাস আগে সন্ধের একটু পরে মেযে বেবিয়েছিলো ঘবের বাইবে । একটু দরকার ছিল, সেটুকু সেবে ফিবে এসে মায়েব সঙ্গে ভাত খাবে । মায়েব চোখে একটু নিদের ঘোব এসেছিল । শব্দ শুনে ঘুমেব ঘোরে ভাবল, কি জানি. মুবগি তো নেই বাড়িতে । ওদিকে চার শেয়াল বসেছিল, তাদেব একটা এসে ঝটিতি মেয়েটাকে তুলে নিল মুখে । আর একটা শেয়াল এসে ছেঁড়া ঝুবিঝাবা একটা গামছা গুঁজে দিল মুখে । মেযে এখন শুধু হাত-পা নাড়তে পারে আর গলা থেকে একটু গোঙানিমতো বার করতে পারে । হাত-পা নাড়াব তো শব্দ নেই আর গোঙানিটুকু মা শুনেও শুনলো না, একবাব শুধু ভাবল, না, মুরগি তো একটিও নেই । গোলপাতার বনে একরকম কাদার মধ্যেই ওরা চিৎ করে শুইয়ে দিলো মেয়েকে । একজন গেল পেচ্ছাপ করতে । কাদার উপর দাঁড়িয়ে সে তলপেট খালি করে খলখল শব্দে পেচ্ছাপ করলো, অন্য তিনজনের একজন মেয়েকে মাটিতে চেপে ধরে রাখলো, একজন তার মুখে গামছাটা আর একটু গুঁজে দিয়ে ধরে রইল আর তৃতীয়জন তৈরি হতে লাগলো । মা-মেয়ে এমনি একা যে মেয়ে জ্ঞান হয়ে অব্দি ভালো করে পুরুষমানুষ প্রায় দেখেইনি । কি করে কি হয় সে জানে না, মা-ও কোনোদিন তাকে বলেনি । চোখদুটি তার খোলা ছিল, আবছা আঁধারে পুরোদস্তুর ন্যাংটো একটা পুরুষমানুষ সে এই প্রথম দেখলো । আতঙ্কে হয়তো তখুনি অক্কা পেত । তবে এটা বাঘ-বাঘিনীর এলাকা । ত্রাসে দম আটকে এলেও সে চেয়ে রইলো, ছোরা বেঁধানোর তীব্র যন্ত্রণায় একবার ককিয়ে উঠলো মেয়ে । গলার প্রায় ভিতর পর্যন্ত কাপড় গোঁজা থাকায় আওয়াজটা গোঙানির বেশি কিছু হলো না । চারজনে চারবার দখল করল তাকে । চারজনের শেষ হয়ে যাবার পর প্রথমজন আর একবার । মেয়ের তাতে কিছুই যায় আসে না, তার জ্ঞান ছিলো না । লাল রক্তমাখা ঢলঢলে কালো কাদার বিছানায় সে শুয়ে রইল ।

খানিক পরে মা-ও নিজেদেব ঘবে মেয়েব মতোই জ্ঞানহাবা হয়ে পড়ে রইল । দুজনের ভাত

চারজনে ভাগ করে খেয়ে শেয়াল চারটে এইবার হুক্কা-হুয়া আওয়াজ তুলে চলে গেল ।

ছয় মাস পরে । মেয়ে এখন একটু একটু খেতে পারে । এতদিন সে খেয়েছে শুধু মাটি । শুকনো কালো মাটি । উঠোনের এককোণে উঁচু মাটির ঢিপিটা সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছিল । সকাল-বিকাল-সন্ধেয় ওখান থেকে খাবলা খাবলা মাটি নিয়ে মুখে পুরতো আর খাল পেরিয়ে চলে যেত জঙ্গলে । মায়ের বারণ সে শুনতো না । বাঘে নিলি নেবে, তুই অমন করিস কেন মা ?

আমার তুই আছিস, তুই মরলি আমি আছি ।

আমারো ত কেবল তুই আছিস, তুই মরলি আমি আছি ।

আর আমরা দুজনে মরলি আমাদের কেউ নেই ।

আমাদের আল্লাও নেই ।

কেউ না থাকলি আল্লা থাকপে কোযান থে । আমাদের দোজখ-ও নেই, ব্যাহেস্ত-ও নেই ।

থাকলিও আমাদের সেখেনে নেচ্ছে কেডা, আমাদের তো আল্লা নেই । যাগো আছে তাগো নেবে ।

তবে আমারে আটকাস ক্যানো, বাঘের পেটে গেলি যাবো, সাপে কাট্‌লি কাটবে, আট্‌কাস ক্যানো মা ?

আমার যে কেবল তুই আছিস । যাগো আল্লা আছে, তারা আল্লা ছাড়ে না । আমি তোরে ছাড়বো কেন ? তবে তুই মরলি ভালো, আমিও তালি মরতি পারি ।

এইভাবে কথাবার্তার পর ওরা পরস্পরকে খুব ভালোভাবে বুঝে নিল । উনুনটার পিঠ পেট থেকে চাকলা চাকলা মাটি উঠে গেল। একদিন মা বলল, উনুনটা ভাঙে আবার তৈরি করতে হবেনে । মাটি তো সব খায়ে ফালাইলি ।

খালের ওদিকে একটা বড়ো তেঁতুল গাছ । চল্লিশটা বাঁদরের একটা দল সেখানে থাকে । তারা টক টক তেঁতুলের পাতা ছিঁড়ে নিচে ফেলে দেয়, কাঁচা তেঁতুলও ফেলে । মেয়ে খালের এপারে, তেঁতুলতলা থেকে পাতা আর ফল সংগ্রহ করে । কখনো কখনো খাল পেরিয়ে ওপারে সুন্দরী, গেঁউয়া, গরান, ক্যাওড়া, হোগলা, গোলপাতা, বেত আর হাড়গোঁজকাঁটার জঙ্গলে ঢোকে । কাদার মধ্যে বাঘ আর হরিণের পায়ের ছাপ দেখতে পায় কিন্তু কপালে তার বাঘ জোটে না ।

ছয় মাসের আগে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না । কিন্তু তিন মাসের ভিতরেই মেয়ের অরুচি, বমি আর তারপর থেকে সে মাটি আর টক খেতে শুরু করার পর মা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল । কিন্তু মেয়ে কিছুই বোঝে না মায়ের ব্যাপার । মা-মেয়ে দুজনকেই লম্বা লম্বা উপোস দিতে হতো । কিন্তু মায়ের অরুচি বা বমি বা মাটি খাওয়া এসব কিছুই ছিল না । একদিন মেয়ে বলে, অমা, পেটের মধ্যে কি জানি নড়তেছে ।

কাছে আয় দেখি ।

সে কাছে এলে মা মেয়ের ময়লা ছেঁড়া শাড়ির কসিটা আলগা করে তার পুরো তলপেটটা উদোম করে ফেলে । অত বড়ো তলপেট দেখে চমকে ওঠে মা । পেটে কি দানো বাড়ছে ? তাই তো হবে । দানোয় ধরেছিল যখন তখন দানোই জন্মাবে । মেয়ের তলপেটের উপর হাত রাখে মা, ধীরে ধীরে পুরো তলপেটে হাত ঘুরিয়ে আনে, মাঝে মাঝে থেমে কি যেন টের পেতে চায় । শেষে এই সকালবেলায় বাসি-বিছানাতেই মেয়েকে ময়লা কাঁথার উপর শুইয়ে দেয় । তারপর নিজেও তার পাশে শুয়ে পড়ে একটানে নিজের শাড়িটাকে আলগা করে মেয়ের হাতটা নিয়ে নিজের তলপেটের উপর রাখে । মায়ের গর্ভ কি বিশাল । মেয়ে তো কোনোদিন দেখে নি । কি লুকোতে পারে তার মা, বাপ রে বাপ । অনেকক্ষণ পরে মেয়ে আস্তে আস্তে বলে, মা, আয় দুজনাই মরি । ক্লান্তিতে মা চোখ দুটো খুলে রাখতে পারে না । চোখের পাতা বন্ধ করে একটু যেন আরাম পেয়ে মা বলে, দুইজন কচ্ছিস কেন ? চারজন ক । মেয়ে সে কথার জবাব না করে বলে, আয় মরি ।

আমাদের আল্লাও নেই, আজরাইল-ও নেই, জান কবচ করবে কেডা ?

তোর যতো কথা, আজরাইল লাগতিছে কি জন্যি । চল, গলায় কলসি বাঁধে ডুবে মরি । কামট্ হাঙরেই সাবাড় করে দেবেনে । নাহলি, চল্ জোঙ্গলে যাই রাত্তিরে রাত্তিরে । একটা হাড়ি নেবানে, আমি বাঘ ডাকতে পারি ।

কি যে কথা কস — শ্যাষে বাঘের গু হতি হবে ।

মা-মেয়ে দুজনে দুজনের তলপেটে হাত দিয়ে শুয়ে থাকে । দুজনের দুটি দানো তাদের হাতের মধ্যে খেলা করে, খুদে পায়ে লাথি মারে, কখনো মাথা দিয়ে গোঁত্তা দেয়, চিমটি কাটে, খামচা মারে ।

মা, তবে মরবি না — মেয়ে শুধোয় ।

না ।

তাহলি কি হবে মা ?

সময় হলি দেহিস ক্যানো কি হয় ।

রাতে বাঘের গর্জন শোনা গেল । আওয়াজ শুনেই মেয়ে বুঝতে পারে বাঘ বাঘিনীকে ডাকছে । খালের ওপারেই জঙ্গল — সুন্দরী, ক্যাওড়া, গরান, পশর, বেইন, গোলপাতা, কেয়া, কানড়, হাড়গোঁজকাঁটা আর বেতের এক-একটা খচ্চর অন্ধকার জায়গা, নরম কাদায় থিক-থিক করছে। পায়ের পাতা পুরো ডুবে যায় । বল্লমের মতো শুলোয় ভরা । গাছগুলোর গোড়ায় কাদামাটির চিহ্ন । জোয়ারের জল গাছের গায়ে কাদার রেখা এঁকে দিয়েছে । এর মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঘ বাঘিনীকে ডাকে ।

সকালে উঠেই মেয়ে জঙ্গলে যায় । অনেক দেরি হয়ে গেছে । বাঘের পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায় । ইচ্ছে করলেই সে খাল পার হয়ে লোকালয়ে আসতে পারতো । কিন্তু মানুষ গোরু বা ছাগলের চেয়ে তার বাঘিনীকে দরকার বেশি । মেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে । কাঁদায় আটকে তার ছেঁড়া শাড়ি পরন থেকে খুলে গেলে সে ফিরেও তাকায় না । অনেকটা ভিতরে গেলে বনের ভীষণ ঁ্যাছায়া, তার মধ্যে মেয়ে সারাদিন বাঘ খুঁজে বেড়ায় । সন্ধের আগে আগে সে বাড়িতে আসে, সারা শরীরে রক্ত, পরনে শুধু ছিন্ন ধুবধুবে শায়া, ডাকিনীর মতো লালচে চুল খোলা । মা এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ।

কনে গিয়িছিলি মা আমার ?

বাঘডারে পালাম না মা ।

উঠোনে তখনো একটু আলো আছে । সেই আলোটুকু থাকতে থাকতেই গাঁয়ের কিছু লোক মা-মেয়ের বাড়িতে আসে ।

এসব কি হতিছে — ওদের একজন প্রথমে মায়ের পেটের দিকে, তারপর আধন্যাংটো মেয়ের ফুলে ওঠা তলপেটের দিকে দেখায় । মায়ের চোখ দুটো হঠাৎ কপিশ হয়ে যায়, তুই একটু ভিতরে যা তো মা ।

মেয়ে ভীষণ ভারি গর্ভ টানতে টানতে ঘরে ঢোকে । সে ভিতরে গেলে মা গাঁয়ের লোকদের দিকে তাকায় ।

তোমার পোলার নাম মহম্মদ না ? যে প্রশ্ন করেছিল তার দিকে ফিরে শুধোয় মা ।

তোমার পোলার নাম আশেকালি না, তোমার পোলার নাম কামাল না, আর তোমার পোলার নাম চেরাগালি না ? মা আর তিনজনের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে ।

আমাদের পোলার নাম শুনে তুমি করবা কি ? যা কই জবাব দাও । হাঁড়ি খাইয়ে চলে গেলি বেড়াল চেনবা ?

কি করতি হবে তাই শুনি — মা শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে ।

ওসব ফালায়ে দাও পেটের থে, না হলি সোমাজে থাকতি পারবা না। জেনা করলি সোমাজে থাকা যায় না ।

জেনা কেডা করিছে ?

তোমরা, তোমরা মা-বেটি ।

কার সাথে করিছি ?

তার আমরা কি জানি ? করিছ তাই জানি । এতদিন লুকায়ে রাখিছিলে, এখন তো পেট বারোয়ে পড়িছে । আগে কি আইচি কোনোদিন বলতি ? এখন দেহিচি, এখন আইছি । আল্লার আইন মানতি হবে সগ্গলের ।

আল্লার সঙ্গে তোমাগে কথা হয় ?

হ্যাঁ, হয় ।

সে বিটা কি কয় ?

খবরদার ছিনাল মাগী, মুখ সামলে কথা কাব। সে বিটা কি কয় জানা নেই না! কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতি পাথর ছুঁড়ে খতম করতি হবে তোদের।

সেই বেবস্থাই কর গে তোমবা। তোমাদেব পোলাগুলাবেও নিযি আসবা। ওদের মাটিতে পোঁতবা মাথা থিকে কোমর ইস্তক। আল্লা নেই, তাই আল্লার কথা কচ্ছো। থাকলি এতক্ষণে ঠাঠায পুড়ে কেলাযা থাকতা।

সোমাজে থাকতি পাববা না কলাম।

সোমাজে নেই আমরা, খালডাব ওপাবেই জোঙ্গল।

বলতে বলতেই মা জং-ধবা দাখানা হাতে তুলে নিল। এখন আব উঠোনে দিনেব আলো নেই। জয়ঢাকের মতো মায়েব বিশাল পেট, বর্তুলাকাব কঠিন দুটি স্তন, অপার্থিব মুখশ্রী। দা হাতে উঠোনে নাচতে থাকে মা। মুখেব কোণ দিযে গেঁজলা উঠে যায।

আর একটু রাত হলে মা মেয়ে পেট পুবে জল খেযে শুয়ে পড়ে। পেটের মধ্যে জল খলখল আওয়াজ করছে। মেযে আইঢাই কবতে কবতে উঠে পড়ে। পা ছড়িযে পাটকাঠির দেওয়ালে হেলান দিযে বসে। সামনে তাব পর্বতউঁচু গর্ভ, কিছুই দেখা যায না। মা-ও উঠে বসে তাব পাশে। ঘরে তেমন অন্ধকার নেই, চাঁদেব আলো আসছে। দুজনে দুজনের পেটে হাত রাখে, দূবে বাঘ ডাকে, বাঘিনীকে খুঁজে পায় নি বোঝা যায়, চাবপাশে কট কট করে ব্যাঙ ডাকে, পোকামাকড় শব্দ কবে, ঝিঁঝিরা ডানা ঘষে। প্যাঁচা ডাকে, ফেউ ডাকে। চারিদিক থেকে এত শব্দ আসে, মা-মেযে অত শব্দের মধ্যে কালা হয়ে বসে থাকে।

মা, আমবা তো খাইনি কিছু, এক পেট পানি খাইছি, ওবা কি খায?

ওবা তোরে খায়, আমারে খায।

আমাদেব খাইয়ে কি পাবে? বক্ত নেই যে খাবে।

যতোক্ষণ হাড়-মাস আছে, তাই খাবে জানতিও পারবি নে।

তোব পেটে ছেলাম যখন, তখন হাড়-মাস খাইচি তোব মা?

মা মেয়েব পেটেব উপব থেকে হাত সবিযে মাথায বাখে। মেযে কাঁদতে শুরু কববে, তখন, যন্ত্রণায তাব গলা আটকে যায। পেটের মধ্যে দানোটা কষে নেংটি এঁটে নোনা সমুদ্রে ঝাঁপিযে পড়াব জন্যে তৈবী হচ্ছে। অনেক পথ সাঁতরাতে হবে তাকে। কূলহীন দবিয়া, অগুনতি নোনা নীল ঢেউ ছাড়া আব কিছু নেই। মাথা উঁচু বেখে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরাতে আবস্ত কবেছে দানোর বাচ্চা। মেযেব পেটের মধ্যে পানসে রক্ত ফেঁপে ফুলে কলকল ছলছল ডাক ছাড়ে। বাতাসে নৌকোব পালেব মতো ফুলে ওঠে। সমুদ্রেব মধ্যে দ্বীপই বটে! গাছপালা, মাটি, ঘাস, মিষ্টি জল, হালকা লাল বঙেব আকাশ — কোনো কিছুবই অভাব নেই। দ্বীপেব মধ্যে থেকেই বাক্ষুসে খোকা হাত-পা ছুঁড়ে নোনা সমুদ্রে সাঁতার কাটে। কনুই আর মাথার ধাক্কায় মেয়ের পেট মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে ওঠে, দাঁতে দাঁতে চেপে সহ্য করে মেয়ে। এখুনি যেন সে নাড়ি ছিঁড়ে বেবিযে আসবে।

কেন নষ্ট করলি নে, কেন নষ্ট করলি নে — মেয়ে এক হাতে নিজের পেট চেপে, আব এক হাতে মায়ের চুল খামচে ধরে — নিজিরডাও রাখলি, আমারডাও রাখলি, ও রাক্ষুসী দোজখের সেপাই রাহিছিস?

মা শান্ত গলায় ছনের চালের ফুটো দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে বলে, আল্লা নেই, দোজখ নেই, ব্যাহেস্ত নেই, কি জনি্য চিল্লাচ্ছিস?

মা ঘরেই বসে থাকে, মেয়ে ধামা পেট নিয়ে খাল পার হয়ে জঙ্গলে যায় — হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি বাগিয়ে ধরে — শুলোর ফাঁকে ফাঁকে কাদায় পায়ের পাতা ডুবিয়ে ঘুরে বেড়ায় — বাঘ বাঘিনীর খোঁজে দূরে সরে যায়, সর সর শব্দে চিত্র-বিচিত্র মহাসর্প মাথা নামিয়ে আড়ালে চলে যায়। লতায় পাতায় কাঁটায় জড়িয়ে গিয়ে মেয়ে সন্ধে পর্যন্ত আটকে থাকে একদিন। উরু থেকে, বুক থেকে, ঘাড় থেকে অনেকটা করে মাংস যায় তার, দেহ থেকে রক্ত নামার অনেকগুলো মুখ তৈরী হয়। কাদায় জলে রক্তের ছড়া দিতে দিতে, মেয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিবে দেখে মা ঘরের এক কোণে আঁধারের মধে শুয়ে আছে।

মা, কি হয়্যাছে, শুয়ে আছিস কেন? কুপিডা জ্বালাসনি কেন? মেয়ে ভাঙা গলায় কথা বলতে বলতে মায়েব কাছে আসে। অন্ধকাবে হাতড়াতে হাতড়াতে মায়ের গায়ে হাত পড়তেই সে

মা, কি হয়্যাছে, শুয়ে আছিস কেন ? কুপিডা জ্বালাসনি কেন ? মেয়ে ভাঙা গলায় কথা বলতে বলতে মায়ের কাছে আসে। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মায়ের গায়ে হাত পড়তেই সে চমকে ওঠে। এ যে সাপের গা। মা তার চিরকালই ঠাণ্ডা। জ্বরের কপালে ঠাণ্ডা হাত এমনিই মায়ের গা কিন্তু সে তো বাঁচা-ঠাণ্ডা, আর এ ঠাণ্ডা যে মরা। মেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচায় — মা কনে গেলি, অ মা !

আরো মরা-ঠাণ্ডা গলায় মা সাড়া দেয়, ভয় পাস নি, আমি বাঁচে আছি, কুপিতি এট্টু তেল এহনো আছে, জ্বালা দিহিনি। মেয়ে বহু কষ্টে অনেকটা সময় নিয়ে কুপিটা জ্বালায়। মা রক্তে ভেসে যাচ্ছে ; কি আক্রোশে শাড়ি খুলে ফেলেছে, মা তার ন্যাংটো, কুপি নিয়ে কাছে গেলে মা বলে, দানোটা প্যাটে থাকলনি, বারোয়ে আইছে।

যা দেখার এখুনি দেখে নিতে হবে। কুপিটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, একটু পরেই নিভে যাবে। মেয়ে দেখতে পায় মায়ের পাশে রক্ত আর জলের মধ্যে একটা খোকা শুয়ে আছে। একবার দেখে আর একবার দেখতে গেলে কুপিটা দপ্ করে জ্বলে উঠেই জবাব দেয়। হাতের আন্দাজে মেয়ে ভেজা চপচপে শাড়িটা দিয়ে মাকে ঢাকে। তারপরে আছাড়ি-পিছাড়ি করে মেয়ে, চোখ তার কপাল থেকে বেরিয়ে আসে, সে গড়াগড়ি দেয়, শ্বাস নেবার জন্যে গলা থেকে তার কঠিন আঙুল সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, মা এহন আমরা কি করি ! এই বলে মেয়েও মার পাশে শুয়ে পড়ে।

অনেক রাতে চাঁদ পুরোপুরি ঘরে ঢুকে গেলে মা আস্তে আস্তে মেয়েকে জাগায়। এইবার ওঠ্ মা, দানোটারে বাইরে শিয়ালের মুহে দিয়ে আয়। ও বাঁচে থাকলি কাল আমি জাউরা পুরুষজাতটারে দেহাতাম আমরা পারি ফুল ফোটাতি। গু-মুতের মদ্যি যারা গলা পর্যন্ত ডুবোয়ে বসে থাকে, গু-মুতের স্বপ্ন দ্যাখে, তাদের দ্যাহাতাম ! যা মা, ওঠ, ওডারে ফেলে দিয়ে আয়, মাটির শরীল, আর এট্টু বাদে গন্দা ছড়াবে, মাটিতে দিয়ে আয়।

জ্যোৎস্নার মধ্যে মেয়ে উঠে দাঁড়ায়, চাঁদে পাওয়া নিশির ঘোরে সে খোকাটাকে দু'হাতের উপর শুইয়ে একটু একটু দোলায়। তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে জ্যোৎস্নার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে আকাশপ্রমাণ মেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু পরেই দেখা যায় সে হোগলার ঝোপের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে বনবেড়ালের মতো মাটি আঁচড়াচ্ছে। যতবার সে মাটি চাপা দেয়, খোকাটা হি-হি হাসতে হাসতে একবার হাত বার করে মাটির উপরে, একবার পা বার করে — এক-একবার টুঁ মেরে মাটি সরিয়ে মাথা বার করে চাঁদের দিকে চেয়ে ফিকফিকে হাসি হাসে। মেয়ে চোপ চোপ বলে তার হাত বা পা বা মাথা থাবড়ে-থুবড়ে মাটিতে ঢেকে দেয় আর এইসব নখরা চলতে চলতে সকাল হয়ে আসে। মেয়ে এবার খেয়াল করে, সত্যিই মরেছে বটে পিথিমি, চিৎ হয়ে মরে আছে, তা না হলে বাতাসের শব্দ নেই কেন, গোলপাতার জিরিজিরি পাতা দোলে না কেন, বলেশ্বরে ঢেউয়ের শব্দ নেই কেন, হরিণঘাটার যেখান থেকে সমুদ্রের গর্জন ওঠে, শাদা ফেনা আকাশ ছুঁতে যায়, রূপোলি ধোঁয়ায় বন নদী আকাশ ঢাকা পড়ে — সেসব কিছুই শোনা যায় না, দেখা যায় না কেন।

মেয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখতে পায় মা তার মরণ-ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। দুই ঠোঁটে বজ্র আঁটুনি, মাঝখানে কালো রক্তের সুতো ; পিঁপড়েরা মুখে খাবার নিয়ে সুতো পেরিয়ে মায়ের মাথার উপর দিয়ে সিঁথি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। এইরকম বোজা চোখ আর খুলবে কি ? নাকের দু'পাশের জলের দাগের খাঁড়ি দুটি আর কখনো বোজানো যাবে কি ? মেয়ে মায়ের দিকে ঝুঁকে আসে, মা, তুই কি আমারে ছাড়ে গেলি, তুই যে আমারে ছাড়বিনে কয়েছিলি ? বার দুয়েক নিজের মনে কথাগুলি বলে গলা ফাটিয়ে বাতাস ছিঁড়ে চেঁচাবার তোড়জোড় করছিল মেয়ে, এমন সময় চোখ মেলে মা মেয়েকে দেখতে পায়। দেখতে দেখতে মায়ের চোখের মণি দুটি বড়ো হতে থাকে, কালো মণির মধ্যে দুই বিন্দু আলোর কণা, তার তাপে মণি দুটি গলতে থাকে। নাকের দুপাশের পুরনো খাঁড়ি দুটি বেয়ে দুটি ধারায় জীবন্ত অশ্রু এগিয়ে আসে।

যে বাতাসে পৃথিবীর বসবাস উঠে যায় একদিন সেই বাতাস বইতে শুরু হলে মা মেয়েকে আর কিছুতেই জঙ্গলে যেতে দেয় না, তুই জঙ্গলে গেলি আমি ডুবে মরবানে ?

বাঘের গর্জন আর শুনতে পায় না মেয়ে। একদিন শুনেছিল বাঘিনীর আওয়াজ। ততদিনে বাঘ সেখান থেকে চলে গেছে। মেয়েকে সামনে বসিয়ে মা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে। মেয়ের

হাত-পা সরু হয়ে আসে, কপালের দুপাশ বসে যায়, ডাগর চোখ দুটি ছলছল জ্বলজ্বল করে, চামড়া হলুদ হয়ে আসে আর অন্যদিকে তার গর্ভ দিন দিন প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে থাকে । পাছা আর বুক ভারি হয়, স্তনের বোঁটার নিচে খয়েরি বৃত্ত দুটি বড়ো হয়ে যায় । খয়েরি রঙ ঘন খয়েরি হতে থাকে । মা প্রহরের পর প্রহর ধরে এইসব লক্ষ্য করে । ওদিকে যে বাতাস বইতে শুরু করেছিল, তার জোর বাড়তে থাকে, মুহূর্তগুলিকে আগে-পিছে করে দেয়, বুনো শুয়োরের রোখে মাটি ঘেঁসে জঙ্গলের দিকে যায় । দীর্ঘ ঘাসের বন নদীর স্রোতের মতো টানা বইতে থাকে, গরান ক্যাওড়া সুন্দরী হুটোপাটি করে দোলে, পাখির দঙ্গল গাছের ডালে বাড়ি খেয়ে হলুদ পাতার মতো নিচে পড়ে, বাতাস জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সাঁই-সাঁই করে মা-মেয়ের কুঁড়ের দিকে এগিয়ে আসে, আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন বাতাসের ঘূর্ণির মধ্যে ঢুকে তীব্র বেগে ঘুরপাক খেতে খেতে গলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

এই বাতাসের কি শেষ নেই — মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মা ভাবে, এত বাতাস কোথা জোমা আছে, শ্যাষ হয় না কেন ! খালের জল আকুল হয়ে বাতাস ধরার জন্যে ফুলে ওঠে ; বাতাস আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়ায়, উল্টো ডিগবাজি খেয়ে জলকে জড়িয়ে ধরে । বলেশ্বরের লক্ষ লক্ষ ছোটো ছোটো ঢেউয়ের প্রত্যেকটিতে একটি করে চোখের মতো শাদা আলো জ্বলে । তারপর হঠাৎ বাতাস থেমে যায় । একদিন বিকেলবেলায় ঘন কালো মেঘ করে আসে আকাশে । কি আশ্চর্য, এমন করে বাতাস থেমে যায় কেন ? তার এত রোষের শোঁসানি আর শোনা যায় না । জলের শব্দ থামে, ঢেউয়ের শব্দ থামে, শুধু পাওয়া যায় বিপুল জলের সমুদ্রে নেমে যাওয়ার আওয়াজ । কালো মেঘ নিচে নেমে আসে । সন্ধের অনেকটা আগে কালো মেঘ, কালো জল আর কালো অরণ্য একসঙ্গে মিশে যায়, তবু বাতাস থেমে থাকে । দূরে বাঘ ডাকে । সেই ডাক শুনে মা-মেয়ে চমকে ওঠে। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ।

সন্ধ্যের একটু পরে সমস্ত কালো আস্তে আস্তে লাল হতে থাকে । মা-মেয়ে কালোর মধ্যেই বসে ছিল, তাদের আজ আলো নেই, তেল নেই, খাবার নেই । মা মেয়ের খুব কাছে এগিয়ে এসে তার বিরাট গর্ভে হাত রেখে আঁধার ফুঁড়ে একদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিতে তাকিয়ে থাকে । সে তার সমস্ত পৃথিবী মেয়ের মুখে দেখতে পায় — কী বিষণ্ন মাটি এই পৃথিবীর, আহা, মাটির কী বিষণ্ন রঙ, মাটিতে কী চমৎকার চোখ, জোড়া-জোড়া, ভাসা-ভাসা, কী অসংখ্য নদী-নালা, কী নি:শব্দে হাঁটে তারা, কী ধীরে কাটে মাটি । মা এইবার বলে, আর কোনোদিন দেখতি পাব না মা তোকে । কি গজব, কি গর্কি আসতিছে আমি জানি । তুই কোন্‌দিকি যাবি, আমি কোন্‌দিকি যাবো, আমরা জানিনে মা । কেউ জানে না । এই নদীতি, আঁধারে, সমুদ্দুরে, জোঙ্গলে মিশে যাব, জানবো না আমার এমন একটা মেয়ে ছিল ।

মা, আমাদের আল্লা নেই ?

না, মা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ওদের আছে, মওলানা মৌলবীগো, বড়লোক, ধনীগো আছে ; মাতাল, বজ্জাত, জাউরা, পুরুষগো আছে, ওগো সব আছে, তারপরে আবার আল্লাও আছে ।

মা, অতো রাগিস ক্যানো ?

কেডা কইছে রাগিছি । আল্লা ওগো কত কাজ করে দেয় দেহিস নি । তা না হলি সিদিন কি ঠাঠা নামত না ?

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই সমস্ত আকাশ টকটকে লাল হয়ে ওঠে । বনজঙ্গল মাঠ নদী ফেলে রেখে অন্ধকার গনগনে লাল আগুনের রঙ নিয়ে আকাশে উঠে যায় । কিছুক্ষণ পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ আসে । মা-মেয়ে চেয়ে দেখে বিস্ফোরণে আগুনে-লাল আকাশ চৌচির হয়ে গিয়ে খণ্ডে খণ্ডে নেমে আসছে । পাহাড়-প্রমাণ সব আগুনের গোলা । তখন দ্বিতীয় একটি বিস্ফোরণে পৃথিবীর মাটি ফেটে যায়, রক্ত রঙিন জল আকাশে উঠে যায়, প্রচণ্ড গরম জলের স্তম্ভ তৈরী করে । একটির পর একটি স্তম্ভ, যেদিকে চোখ যায়, রক্তাক্ত জলস্তম্ভ । সমুদ্র ফুলে ওঠে, হরিণঘাটার মোহনা মাথা-শিং ঝাঁকি দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় । মা-মেয়ে এতক্ষণ মুখোমুখি বসে ছিল, এখন মা উঠে মেয়ের পাশে বসে প্রাণপণ শক্তিতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে, বার বার চুমু খায় তার গালে, আমি তবে যাই মা, তুই-ও যা — বলতে বলতে মা শুনতে পায় সমুদ্রের ভিতর থেকে বাতাস এসে পৌছে গেল, মুষলধারায় বৃষ্টিও নেমে গেল । ফোস্কা পড়ে যায় এমন গরম বৃষ্টি ! তারপর আর আগে নয়, এখন নয়, তখন নয়,

সন্ধ্যেয নয়, সকালে নয — সময়ের সীমানা চুরমার করে দিয়ে স্থির জলস্তম্ভগুলি সচল হয়ে ওঠে। মা-মেয়ে দুজনেই চকিতে দেখতে পায আকাশপ্রমাণ উঁচু জলস্তম্ভগুলি এগিয়ে আসছে, তাদের মাথায কালচে রক্তের আবরণ, হাজার হাজার ঝিকমিকে চোখ, একটু নিচে সুন্দরী, ক্যাওরা, গেউয়া, গরান গাছের চলন্ত জঙ্গল আর দেখা যাচ্ছে বলেশ্বরের তীর ঘেঁষে বাঁধা কালো নৌকোগুলি — জলস্তম্ভগুলির ভিতরে নাগরদোলার মতো দুলছে। মা-মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আবার দেখতে পায় বলেশ্বরের তীরের তালগাছগুলি শুকনো ঘাসের মতো উঠছে নামছে — আস্তো নৌকাগুলিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারই মধ্যে একটি জলস্তম্ভ ভেঙে দুহাত উঁচিয়ে বেরিয়ে আসে কঠিন ধাতব এক অতিকায প্রাণী। কুঁড়েঘর সুদ্ধু মা-মেয়েকে সে আকাশে তুলে ধরে। তখন তারা চেতনা হারায়।

সকাল হলে মা-মেয়ের জ্ঞান ফেরে বা তাদের ঘুম ভাঙে। মা-উঠে বসছে, মেয়ের পাশে শুয়ে শুযোর-ছানার মতো চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছে দু-নম্বর খোকাটা। হরিণঘাটার মোহনায জলের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে আরক্তিম সূর্য, প্রচণ্ড শব্দে জল নেমে যাচ্ছে বলেশ্বরে। বলেশ্বর সেইসব জল সংগ্রহ করে টেনে নিয়ে ফেলছে হরিণঘাটার মোহনায়। আকাশে উঠতে কত সময় নিচ্ছে সূর্য, মোহনা ফুলে উঠে দিগন্ত ঢেকে দিচ্ছে, সূর্যকে চেপে ধরছে জলের নিচে।

মা দুই হাঁটুতে কনুই রেখে গাল চেপে ধরে জল সরে যাওয়া দেখছে। কাৎ হয়ে শুয়েছে মেয়ে। খোকাটার চিৎকারে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, দুই চোখ আধখোলা রেখে হলুদ এই মেয়েও দেখছে জল সরে যাওয়া ; সবুজ ডালপালা নিয়ে বিশাল বিশাল গরান, গেউয়া, সুন্দরী, বেইন তীব্রবেগে নিচে বঙ্গোপসাগরের দিকে নেমে যাচ্ছে। কোথাও আটকে গেলে মুহূর্তের জন্যে থেমে দুটো পাক খেয়ে গিট খুলে বা ছিঁড়ে আবার নামছে নিচে। বলেশ্বরের গা মাথা দেহ এখন দেখা যায না। সরু বুকচাপা খালগুলিও না, জলের নিচে কতসব মারাত্মক গলিঘুঁজি, বিচিত্র সব আঁকশি। তাতে আটকে যায ভাঙা নৌকোর টুকরো, জলশয্যায শোয়া তালগাছ, ছেঁড়া ডালপালা লতাগুল্ম। মেয়ে দেখতে পায এত উঁচুতে তার কাছে ভাসতে ভাসতে চলে এলো একটা ডোরাকাটা পুরুষ বাঘ। মেয়ের সব মনে পড়ে যায। বাঘিনীকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছিল সে, এখন চার হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্তে নেমে যাচ্ছে।

মেয়ে মাকে ডেকে দেখাতে চায এই ছবি, তখনই আসে প্রথম মৃতদেহটি। অনেক দূর দিয়ে সেটা চলে যায। তারপর আর একটি, তারপর আর একটি, তারপরে একটির পর একটি, হাজারে হাজারে তারা আসে, ইলিশের ঝাঁকের মতো, মা-মেয়ের থেকে অনেক তফাৎ দিয়ে তারা চলে যায়, অনেকটা নেচে নেচে মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে, পৃথিবীর পাথরের সঙ্গে, মোটা মোটা ডালে থুতনি আটকে কখনো একটু থামে তারা। তারপর ঝাঁক থেকে আলাদা হয়ে যায এক লাশ, একটু আসছি বলে, ডুবতে ডুবতে, ভাসতে ভাসতে, পাক খেতে খেতে সে এগিয়ে আসছে মা-মেয়ের কুঁড়ের চালের দিকে। কাছাকাছি এসে লম্বা একটা ডুবসাঁতার দিয়ে সে কুঁড়েঘরের চালাটির একটি প্রান্ত স্পর্শ করে থামে। মা-মেয়ের এক রাতের কথা মনে পড়ে। উদোম, ছোরা ওঁচানো, হিংস্র ডোরাকাটার মতো এক পশু। একটা মুহূর্তই শুধু — লাশ আবার বলেশ্বরের পথ ধরে নিচে নেমে যায।

বঙ্গোপসাগরের হাঙরেরা অপেক্ষায় থাকে। মা-মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোয। দানোর বাচ্চাটি চিল-চেঁচিয়ে সারা হয়।

সৈয়দ শামসুল হক

আনন্দের মৃত্যু

রোজকার মতো সেদিনও সন্ধের সময় দুই বন্ধু এই পানশালায় আসে। এসে বসে তাদের বাধা টেবিলে। আর সেই একই অর্ডার পৌঁছায় বেয়ারার কাছে। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে আব দিনেব মতো। কখনো তার এই ক্ষিপ্রতা বকশিসের অঙ্ক স্ফিত করতে সাহায্য কবে থাকে।

ঘড়িতে তখন সাতটা বাজতে পনেবো মিনিট বাকী। ওরা যেখানে বসে, সেটা পানশালাব পাশে এক টুকরো ঘেরা ঘাস-জমি, অন্ধকাব সেখানে সজ্জার একটি অংশ।

দূরে দূবে কিছু টেবিলে কেউ কেউ বসে আছে। কিছু টেবিল তখনো শূন্য।

গেলাস এসে পৌঁছুলে ওরা দুজন পরস্পরের গেলাস ঠোকাঠুকি করে, এবকম ওরা করতে দেখেছে, এবং পরমুহূর্তে পবম পিপাসার্তেব মতো মুখ নাবিয়ে আনে গেলাসে। চুমুক দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত দৃশ্যেব পবিবর্তন ঘটে ওদের চোখের সমুখে।

দূবে কাউন্টাবে, যে আলো জ্বলছিল তা যেন আবো স্তিমিত হযে আসতে থাকে, আশেপাশে ঘনীভূত অন্ধকাবে সাজানো টেবিল আর টেবিলেব চাবপাশে বসে থাকা মানুষগুলোব যেন বাস্তবতাব ওপারে যাত্রা শুরু হয়ে যায়; বাস্তা থেকে ভেসে আসা বিচিত্র শব্দ সমূহ যেন পবস্পবের আবো নিকটে আসতে থাকে। ওরা হেসে ওঠে।

তেবো বছবেব বন্ধুত্ব। কিন্তু একটি বিষয় ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গে ওদেব মতেব মিল হয় না। যখন একজন আবেকজনকে বলে, না, জীবনে আব স্ফূর্তি নেই, কেবল তখনি আবেকজন কিছু বলে না, প্রতিবাদ কবে না; একটি নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে, প্রতিধ্বনিব মতো কণ্ঠস্বব কবে বলে — না, জীবনে আব স্ফূর্তি নেই।

শুধু ওই একটি বিষয় ছাড়া আর কিছুতে ওদের মতামত এক হযে ওঠে না। অথচ কেবল বন্ধুত্বই তো নয়, ব্যবসাতেও ওরা অংশীদাব। ব্যবসা কি কবে চলে সেটা ঈশ্বব জানেন। কিন্তু ভালো চলে তার প্রমাণ আয়ের অঙ্কটা নিতান্ত কম নয়। সেই আযে — দুজনেব মধ্যে যে হাফসার্ট-পাযজামা পরে থাকে, যাব শবীব একটু মোটা, সর্বক্ষণ হাতে থাকে ব্রাউন বঙের পোর্টফোলিও ব্যাগ, তার মরহুম বাবাব ভঙ্গিতে বলা চলে — সেই আয়ে জনা পঞ্চাশেক ছেলেকে ঘি-ভাতে ম্যাট্রিক পড়ানো যেতে পাবে।

আজ ওদের মন ছিল বেশ ফুরফুবে। কাবণ আজ দুপুবেই ওরা একটা মস্ত বড় কাজ করেছে, পশ্চিম পাকিস্তানে পান চালানেব লাইসেন্সটা বাগিয়ে নিতে পেবেছে।

ওবা এখন হাসতে থাকে। একে আরেকজনকে বলতে থাকে — দ্যাখো, এই এক চমৎকাব ব্যাপার। পান জন্মাই আমবা, পান খেতে জানে ওরা। আল্লা তার বান্দার রুজিব জন্যে কি তাজা ব্যবস্থাই না কবে বেখেছেন। ওদেব মধ্যে যে বুশ-সার্ট, ট্রাউজার পবে, চিবুকের গোড়ায় যার দাড়িব আভাস দেখা যায়, সে প্রতিবাদ করে। আল্লাহব বিচিত্র ব্যবস্থা সম্পর্কে তার ধারণা অপরের মতো স্পষ্ট নয়। অনুনাসিক স্বরে সে বলে, মদের টেবিলে আল্লাহকে ডেকে আনাব কোনো মানে হয় না। প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে তৎক্ষণাৎ।

গেলাস শেষ হয়ে যায়। একজন বেয়াবাকে ডাকে। আরেকজন তখন হাতঘড়ি দেখে রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলে ওঠে,

লোকটার আসার সময় হয়েছে।

বাজে কটা?

সাতটা দশ।

লোকটা রোজ সোয়া সাতটা নাগাদ এসে যায়। তাব একটা নির্দিষ্ট টেবিলে বসে যায়। তার একটা নির্দিষ্ট টেবিল আছে। সে একা আসে। ওবা সে টেবিলটাব দিকে তাকায়।

বেয়ারা এসে দাঁড়ালে হাফ সার্ট-পাজামা বলে, শূন্য গেলাস দুটো দেখিয়ে, নিয়ে এস। সঙ্গে কিছু —

বেয়ারা হাসে। অন্ধকারে তার শাদা দাঁতগুলো একসারি বোতামের মতো ঝকঝক কবে ওঠে। তাব জানা আছে, ওরা কি পছন্দ কবে, ওদেব কখন কি দিতে হবে। সে জানে, কখন ওদের গেলাস দুটো ভরে দিতে হবে, আর সেই সঙ্গে আনতে হবে দুপ্লেট মুবগীব কাবাব।

লোকটাকে দেখা গেল। অন্ধকার সুরকীব পথ ভেঙে শ্লথ পায়ে এগিয়ে আসছে। কোনোদিকে তার চোখ নেই। কিন্তু সে চোখ তার নিজেব পায়েব দিকেও নয়। সে চোখ সমুখেব দিকে, কিন্তু সমুখে দেখছে না। আজ একটু বাতাস দিযেছে। সেই বাতাসে তার রেশমী পাঞ্জাবী নৌকোর পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। যখন বাতাস পডে যাচ্ছে তখন তাব বিশাল ভুড়িব গোল আকাবটি যেন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

দুই বন্ধু চকচকে চোখে তাকিযে থাকে তাব দিকে।

লোকটা তাদেব পাশ দিয়ে হেঁটে তাব নিজের টেবিলে গিযে বসে। প্রথমে হাত বাখে টেবিলে, তাবপব আস্তে আস্তে চেয়ারে বসে এবং আরো আস্তে আস্তে তুলে দেয় আরেকখানা হাত টেবিলে। একজন বেযাবা এগিয়ে এলে একটা আঙুল তুলে দেখায়।

ওবা জানে লোকটা এক বোতল বিয়ারেব জন্যে বলেছে। বিয়ার ছাড়া আব কিছু কোনোদিন তাকে স্পর্শ করতে দেখেনি ওবা। প্রতি সন্ধ্যায় লোকটা আসে, একাকী আসে, একটি বোতল বিযাব অনেক দীর্ঘ সময় ধবে পান কবে, একসময তাব ওঠবাব সময হয়। ব্যাপাবটি প্রথম লক্ষ্য করেছিল বুশ-সার্ট পবা বন্ধুটি। সে দেখেছিল, কিন্তু ঘটনাটি এত সংক্ষিপ্ত সমযেব মধ্যে ঘটেছিল যে, প্রথম দিন সে তাব বন্ধুকে দেখাতে পারেনি। সে দেখেছিল, লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এক পা এগুতেই একটা টাল খেযেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা সামলে নিয়ে একেবাবে সবলবেখায হেঁটে বেবিয়ে গেছে। তাব সেই টাল খেযে পড়তে নিজেকে সামলে নেযাব ভঙ্গিটা ভাবী আমোদেব সৃষ্টি কবেছিল। অপর বন্ধুটি তা দেখেনি বলে তাব আপশোষের সীমা ছিল না।

পবদিন লোকটাকে ওবা লক্ষ কবেছে। কি অবাক কাণ্ড! পবদিনও লোকটা উঠে দাঁড়িযে এক পা এগুতেই একটা টাল খেতে খেতে সামলে নিল নিজেকে। হো হো কবে হেসে উঠেছিল ওবা কোবাসে। লোকটা তাবপব সবলবেখায হেঁটে বেবিযে গিয়েছিল।

তৃতীয দিন ওবা লোকটাব জন্যে প্রথম অপেক্ষা কবতে শুরু কবেছিল। ঠিক কি কারণে ওরা জানে না, খুব উৎফুল্ল হযে উঠেছিল ভেতবটা। ওত পেতে বসেছিল, কখন লোকটা উঠবে, উঠে একটা টাল খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিয়ে সবলবেখায হেঁটে চলে যাবে। সেদিনও সেই একই ঘটনা ঘটেছিল। ওবা অত্যন্ত উপভোগ কবেছিল দৃশ্যটা এবং সম্ভবত এরকম আমোদ আর হযনি এই বিবেচনায় আরেক গেলাস কবে চড়িয়েছিল।

সেই থেকে এই একটি ছোট্ট ঘটনা ওদেব সমস্ত সন্ধ্যাকে নিয়ন্ত্রিত কবতে থাকে; সেই লোকটা তার অজান্তে এই দুজনেব সন্ধ্যার আনন্দকে নিযমিত প্রতিদিন চূড়ান্তে পৌছে দিযে যেতে থাকে।

লোকটার গেলাস যখন শেষ হয়, তখন থেকেই ওবা স্থিব চোখে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় — এই উঠল, এই উঠবে। কিন্তু ওঠে না। অনেকক্ষণ সে বসে থাকে, একাকী, চুপচাপ, সিগাবেট টানে, এবং যখন ওদেব মনে হয় লোকটা উঠতে আরো কমপক্ষে আধঘন্টা লাগিয়ে দেবে, তখনি হযতো সে উঠে দাঁড়ায়। ওরা নিশ্বাস বন্ধ করে নির্বাক হয়ে চোখে চোখে তাকে অনুসবণ কবে। লোকটা টাল খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিয়ে সবলরেখায় চলতে শুরু করলেই ওবা হা হা করে হেসে ওঠে।

একদিন সে হাসিটা বন্ধ হয়ে যায়। তখন এরকম হয় যে, লোকটা এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভেতরে যেন কি একটা জড় হতে হতে বিপুলাকাব হয়ে ওঠে। লোকটাব গেলাস শূন্য হয়ে

যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুভূতিটা কণ্ঠরোধ করে তাদেব । তাবা নি:শব্দে অপেক্ষা কবে । লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে এক পা ফেলেই প্রতিদিনের মতো টাল খেয়ে সামলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেব ভেতরটা এক মুহূর্তে হালকা হযে যায় – যেন একটা বন্দী পাখি অকস্মাৎ খাঁচাব দবজা খোলা পেয়ে তীরেব মতো উড়ে যায নীল আকাশে ।

সন্ধ্যাব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন লোকটি যেন তাদেব ডাকে, এই পানশালায় তাদেব টেনে আনে । লোকটি যখন বাড়ি ফিবে যায় তখন তারা উঠে আসে । তখন তাদেব মনের মধ্যে আনন্দ, সুখ ভবে ওঠে । এবকম আশ্চর্য আমোদ তাবা আব কখনো বোধ কবেনি, এরকম নির্ভাব আব কখনো মনে হয়নি । এবং তাবা বলাবলি করে — এই পানশালাব সুবা সর্বোৎকৃষ্ট ।

কখনো কখনো এরকম হয় কোনো কাজে ওবা আসতে পারে না । কিংবা অন্যত্র বসতে হ্য । তখন আব সে রকম মনে হ্য না । মনে হ্য, কিসেব একটা অভাব বোধ হচ্ছে, চঞ্চল চোখে অজান্তে চাবদিক অন্বেষণ কবে । পথে বমণী দেখে নিষিদ্ধ উত্তাপ বোধ কবে । মাথার মধ্যে ব্যবসার নানাবকম সমস্যা দীর্ঘকাল স্থায়ী হযে থাকে, কিছুতেই যেন তাদের হাত থেকে নিস্তাব পাওয়া যায না । কিছুই তাবা বুঝে উঠতে পাবে না । তাবা বলাবলি কবে – তাদেব জীবনটাই এবকম । বলাবলি কবে – আজকাল সে সততা নেই । ইঞ্জেকশনেব সুই দিযে বোতলে পানি মেশায এবা, তাই সুরায কোনো কাজ করে না ।

পরদিনই এই পুবনো পানশালায আবাব তাবা ফিবে আসে । এখানে এলেই যেন কাজ শুরু হয়ে যায মাথাব ভেতবে । কেমন একটা স্ফূর্তিব ঘোব লাগে । একটু পরে দেখা যায লোকটাকে । সে হযতো আগেই এসেছে সেদিন । তাকে দেখামাত্র তারা বলে ওঠে, ওই যে । তাব কথা তারা ভুলেই গিয়েছিল । লোকটা মন্থব গতিতে দীর্ঘ সময় নিয়ে এক বোতল বিয়াব নি:শেষ কবতে থাকে ।

তারপর সে উঠে দাঁড়ায় । ওবা নিশ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে । একটা টাল খেতে খেতে লোকটা সামলে নিয়ে সরলরেখায ফিবতি পথ ধরে । ওদেব মুখ এক মুহূর্তে উজ্জ্বল হযে ওঠে । স্ফূর্তির ভীষণ ঘোব লাগে । ওরাও গলাগলি ধবে উঠে দাঁড়ায় । সমুখে না ভবিষ্যৎ ভয দেখায, পেছনে না কোনো অতীত দংশন কবতে থাকে ।

একেকদিন লোকটা উঠতে বড় দেবি কবে । গেলাস শেষ হযে গেছে অনেকক্ষণ । হযতো ঘন্টা দুঘন্টা হবে । তবু ওঠে না । অপেক্ষা কবতে কবতে ওদের স্নায়ুগুলো অসাড় হযে যেতে বসে । চোখে বর্ণালী দেখে । অসহিষ্ণু হযে ওঠে মেজাজ । বেযাবাকে ডেকে বলে,

ব্যাটাডারে উঠতে কওনা মিয়া । একটা টাপলা খাউক, দেইখা বাড়ি যাই । জলদী কবো । বেযারা বোঝে সাযেবদেব নেশা ধরেছে । তাই আকর্ণ হাসতে তাব আব দ্বিধা হয় না । বলে, কেমনে কই । হে-ও কাস্টোমাব, আপনেবাও কাস্টোমাব ।

বুশশার্ট ধমক দিয়ে ওঠে ।

হাইসো না, যা কই তাই কবো । কও গিযা, রাইত অইছে, বাড়িতে বিবিসাব বইযা আছে, এখন যান গিযা ।

কি বোঝে কে জানে, বেয়াবাও মজা পেয়ে যায় । এ দুজন তার বাধা সাহেব, নেশায বলুক আর যাতেই বলুক, কথা না-শোনাটা নেমকহাবামি মনে হয় । সে হয়তো লোকটাকে গিয়ে তাই বলে ।

কিন্তু লোকটা ভ্রূক্ষেপও কবে না । হাতেব একটা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দেয় বেয়াবাকে । বেয়ারা এসে নিবেদন করে,

হুনল না কথা ।

বলে সে হাসতে থাকে মুখ টিপে । ওদের মেজাজ খারাপ হযে যায় দপ করে । লোকটা কি এক অজ্ঞান বেদনায় তন্ময় হয়ে থাকে । আনমনে নতুন একটি সিগারেট ধরায় । পায়েব কাছে মুরগীর হাড় নিয়ে বেড়াল বসে চিবুতে থাকে । রাত বাড়ে ।

একসময়ে সে উঠে দাঁড়ায় ।

একজন আবেকজনকে বলে,

এইবার টাপ্লা খাইবো দেখিছ । –

খাইছে ।

জ্বলে উঠে মেজাজের রং পান্টায় মুহূর্তে। মাথাব ভেতরে নেশার মৌমাছিরা এতক্ষণ যেন ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ তারা জেগে উঠে প্রবল গুঞ্জন করতে থাকে। উৎফুল্ল দুই বন্ধুরও বেরুবার সময় হয়। বেয়ারাকে সেদিন দুটাকা বকশিস করে ফেলে। তুচ্ছ কথাতেও হাসির ঝড় ওঠে। রাত একটা হয়।

আজ ওদের মন ছিল ফুরফুরে। দীর্ঘদিন তদ্বির করবার পর আজই ওরা ওদেব পানেব লাইসেন্সের অঙ্কটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। আজ যখন সেই নি:সঙ্গ লোকটা এসে তার নির্দিষ্ট টেবিলে বসল তখন ওরা আর আর দিনের চেয়ে অনেক বেশি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দুই বন্ধু গল্প করতে থাকে, যেন দুই প্রবল স্রোত অবিরাম সঙ্গমে পৌছুচ্ছে, আর তাদের চোখে চোখে বাঁধা পড়ে থাকে লোকটা। তাব বোতল এসে গেছে; সে ধীরে ধীরে ঢালছে; আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে; নতুন সিগারেটের প্যাকেটের মোড়ক খুলে চকচকে কাগজটাকে ডলে ডলে মার্বেল বানাচ্ছে; মার্বেলটা টুপ করে ছুঁড়ে দেয়; একটা সিগাবেট ধরায়। রাত বাড়তে থাকে। বাত এগাবটা হয়।

একে একে টেবিলগুলো শূন্য হয়ে যেতে থাকে। ভিড় কমে যায়। রান্নাঘর থেকে গাঁদা ফুলের ঝোপের ওপর দিয়ে ভেসে আসা মুরগী কাবাব তৈরীর তীব্র ঘ্রাণ আসে। জ্বলন্ত উনোন নিভিয়ে দেয় বাবুর্চিরা। লোকটার গেলাস শেষ হয়ে গেছে; সে বসে থাকে; কি এক অজ্ঞাত ভাবনার সমুদ্রে ডুবো মাছের মতো মনে হয় তাকে।

তাকে ভালো করে দেখা যায় না। আকাশে আজ চাঁদ নেই। অন্ধকারটা তাই গাঢ়। লোকটাকে মনে হয় চেয়ারে শরীরেব সমস্ত ভার অর্পণ করে মাথা বুকের ওপব ঝুঁকিয়ে দিয়ে অনন্তকাল থেকে ভাবছে।

বন্ধু দুজন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তাদেব আঙ্গুলেব ডগা চঞ্চল হয়ে ওঠে। টেবিলে তবলা বাজাতে থাকে তারা। অপেক্ষা করে নিশ্বাস ঘন কবে, কখন লোকটা উঠবে, উঠে এক পা ফেলতেই টাল খাবে; টাল খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিয়ে সরলরেখায় বেরিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে ওদেব কথার স্রোত মরে যায়। সমস্ত ভাবনার ইতি পড়ে। ওবা বেড়ালেব মতো ওত পেতে বসে থাকে। এই উঠবে, এই সে উঠল, মনে মনে তারা বাজি ধবে। লোকটা ওঠে না। বেয়ারা ওদের গেলাস নিতে এলে আবাব ভবে দিতে বলে। বেয়ারা ভরে দিয়ে যায়। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে রাজি নয় ওরা। দুজনেই নীরবে ভাবে, কখন লোকটা উঠে যাবে কোন ফাঁকে, তার টাল খাওয়া দেখতে পাবে না। বেয়ারা গেলাস ভবে এনে দিলে মুহূর্তে তা নি:শ্বেষ করে ওবা বসে থাকে। বসে বসে লোকটাকে দেখে। লোকটার অতি কাছে একজন বেয়াবা গিয়ে দাঁড়ায়। এই বোধহয় বেয়ারা তাকে ডাকবে, তার চমক ভাঙ্গবে, মনে পড়বে বাড়ি ফেরার কথা, উঠে দাঁড়াবে আর সেই তীব্র প্রত্যাশিত দৃশ্যের পুনবাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু না, বেয়াবা তাকে কিছুই বলে না, তাব পায়ের কাছে শূন্য বোতলটা নিয়ে সে চলে যায়। ওদেব মনের মধ্যে তখন হতাশার এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়।

ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

সে ক্রোধ কার ওপর তা তারা নিজেরা জানে না। একজন আরেকজনকে হঠাৎ দোষারোপ করে।

তুমি মিয়া আইজ বড় বেকুবের মতো কাম কইবা ফালাইছো। দুই হাজাবে কাম অইতো। তোমার তর সইল না। সাড়ে তিন হাজারে কবুল কইরা বইসলা। ট্যাকা গাছের গোটা?

অপর পক্ষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে দপ কবে। বলে, বেশি ঘ্যান ঘ্যান কইবো না, বুঝলা।

ক্যান করুম না? একশোবাব করুম।

না করবাব পারবা না।

ইস্‌সিরে আমার চান।

মুখ ঘুরিয়ে নেয় পাজামা-হাফশার্ট, একটা শেষ ভঙ্গির আভাস আসে তার পোর্টফোলিও ব্যাগটা তুলে নেয়াতে। সেটা আরেকজনের কাছে চূড়ান্ত অপমানকর মনে হয়। সে চিড়বিড় করতে থাকে। গালি দেয়।

মা—বাপ তুইল না কইলাম। ঘুষ দেওনের বেলায় হাত কাঁপে, আমারে পাঠাইছিলা ক্যান মরদ? সে সম কই আছিলা? দুই হাজারে অইতো?

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অপর পক্ষ। একটা হাতাহাতিই হয়ে যেত। তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে, একটা আর্ত চীৎকার শোনা যায়। ওরা চকিতে মুখ ফেরায়। দেখে একটা বেয়ারা দৌড়ে কাউন্টারের দিকে যাচ্ছে। আর কিছু বোঝা যায় না। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় বোকার মতো।

সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাটা ফিরে আসে, সঙ্গে ম্যানেজার আরো কজন বেয়ারা। ছোটখাট দলটা দ্রুত এগিয়ে যায় লোকটার দিকে। তার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। আর কিছু দেখা যায় না। একজন বেয়ারার ভয়ার্ত স্বর শোনা যায়,

সাবের কাছে বিল আনতে গিয়া দেখি, সাবের এই অবস্থা। আমি কিছু জানি না।

লোকটা আর কোনোদিন চেয়ার ছেড়ে উঠবে না, টাল খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিয়ে সরলরেখায় হেঁটে যাবে না। বাড়ি যাবে না।

অ্যাম্বুলেন্স আসে। লোকটা স্ট্রেচারে শুয়ে লাশকাটা ঘরে যায়।

পুলিশ তাদেব আটকে রেখেছিল। না, তারা কিছুই জানে না। হ্যাঁ, তারা এখানে লোকটাকে কখনো কখনো দেখেছে। না, তারা কোনো অদ্ভুত কাণ্ড লক্ষ্য করেনি। হ্যাঁ, তারা সাক্ষী হিসেবে সই দেবে।

বেবিযে এসে অনেকক্ষণ তারা বুঝতে পাবল না তাদেব গন্তব্য কোথায। পবপর দুটো স্কুটার এসে থামল ভাড়ার প্রত্যাশায়। তারা ফিরিয়ে দিল। মোড়েব দোকান থেকে মুখভরতি মিষ্টি পান খেল তারা। এবং দুজন গা ঘেঁষাঘেষি করে বহুক্ষণ ধরে, এই বলাবলি কবল যে, কিছুই কিছু না, আর সেই যে কিছু, না তাও কিছু না।

মঞ্জু সরকার

আনন্দ যাত্রা

আমগাছতলায় দুর্বা ঘাসেব ওপর হঠাৎ একটি বাস এমনিতেই চোখ কাড়ে। তার ওপর বাসখানা বেশ বড় ও রঙচঙে। বংপুর-ঢাকা মহাসড়কেব কালো কঠিন বুকে ঘন্টায় ৫০মাইল বেগে ছুটলে যাকে বেশ মানায়। সে জিনিস এখন গাঁয়েব এক মাঝারি গেরস্তবাড়ির খুলিতে দাঁড়ানো। একদিকে পোয়াল খড়ের পুঞ্জ, অন্যদিকে ঘাসেব ওপর বাঁধা একটি গক, মাঝখানে ঝকঝক বাসখানার বডিতে বহু রঙের কাকুকাজ। লালের ওপর সাদা লেখা ম্যারাডোনা পরিবহণ। গাঁয়ের কাঁচা রাস্তা ধরে ম্যারাডোনা যে এই বাড়ির খুলি পর্যন্ত এসে চক্কর দিয়ে আবার রাস্তামুখো হয়েছে, মাটিতে এবং এক দলা গোবরে চাকার সদ্য দাগ দেখেও বোঝা যায়। ঝড় বৃষ্টি না হলে এই দাগ অনায়াসে ম্যারাডোনার স্মৃতি দু'চারদিন ধরে রাখবে। আগমনকালে ম্যারাডোনার শব্দ, গতি ও গন্ধ আকৃষ্ট কবেছে গ্রামবাসীদের, সেই আকর্ষণ এখনও কমেনি। বাসটিকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। রাস্তার পাশে বাঁধা গরুটি ম্যাবাডোনাকে আসতে দেখে, তাকে ভয়ঙ্কর আজব জন্তু ভেবেই হয়তো, দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চেয়েছিল, এখন সে সামলে উঠেছে; পাশে নীরব ম্যাবাডোনাকে ঘিরে সরব ভিড় অগ্রাহ্য কবে তার ঘাস কামড়ানো দেখে বোঝা যায়। পাশেই আম গাছের ডালে বসা একটি উদাসীন কাক। কে জানে কী আছে তার মনে।

বাসটিকে ঘিরে ভিড়ের মধ্যে সম্ভাব্য যাত্রী ও চ্যাংড়াদের সংখ্যা বেশি। ম্যাবাডোনাকে সাজানো নিয়ে হুল্লোড় চলছে। বঙিন কাগজ কেটে ফুল, পাতা, শিকল বানানো হয়েছে। শিকলটা মালার মতো ম্যারাডোনার কণ্ঠে পরাতে চায় ছেলেবা। ড্রাইভাব আপত্তি কবে, 'না, না, গ্লাসে আব বডিতে এইসব লাগাইয়েন না। লাগাইলেও বাতাসে থাকব না।' ছেলেদেব আবেগ উদ্যম তাতে কমে না। এ যেন একান্তে পাওয়া প্রিয়াকে নতুন প্রেমিকেব আদব-সোহাগ জানানো। বাইবে গা-গতর টিপে অনেকে ভিতরে ঢুকে পড়ে, বাসেব ভিতরটাও সাজানো হয়।

ইতিমধ্যে সাজগোজ করা কিছু অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে আসন নিয়ে বসেছে। সিট দখল নিয়ে দুটি বালকেব ঝগড়ায় শাণিত যুক্তি ওঠে, 'মোর নিজের মামুব বিয়া। মুই সামনে না বসলে তুই বসপু ? যা শালা পাছত বস গিয়া।'

বাসটাকে ঘিরে বাইরে যেমন, বাড়ির ভিতরেও তেমনি মেয়েদের সাজ সাজ রব। একটি মাত্র জঙধবা টিনের ঘর, খড়ো চালের রান্না ও গোয়ালঘর নিয়ে বাড়িটার মধ্যে অবশ্য নতুনত্ব কিছু নেই। পুবাতন শ্রী-ছাঁদ দেখে বোঝারও উপায নেই, এই বাড়িতে ঘটা কবে আজ একটি অচেনা মেয়ে বউ সেজে আসছে। কিন্তু ঘরের ভিতরের চেহারা অন্যরকম। ইতিমধ্যে বাসরশয্যা সাজানো হয়েছে। শয্যায় বসে বর বেশে কফিলও প্রস্তুত। পরনে আনকোরা নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি। বরকে সাজানো কেন্দ্র করে ঘরে যেসব মেয়ে, বরের সঙ্গে বাসে ওঠার জন্যে তারাও বেশ ঘটা করে সেজেছে। বব সাজানো তো আব কনে সাজানোর মতো কঠিন ও জটিল কোনো কাজ নয়। মাথায় টোপর পরিয়ে দিতেই বর তৈরি। কিন্তু বরেব ভাবী, বোন, মামী ইত্যাদি সম্পর্কের মহিলারা নিজেরে সাজ-পোষাকের খুঁত ঢাকতে ব্যস্ত। হাত-আয়না নিয়ে কাড়াকাড়ি, কপালেব টিপ, গালে ও ঠোঁটেব রঙ, চুলের খোপা, শাড়ির কুঁচি ইত্যাদি, নানা খুঁটিনাটি কাজে মেয়েরা বড় বেশি সময় নিচ্ছে। এই অবসরে বর শেষবারের মতো কল্পনায় দেখছে তাকে, যে আজ রাত বারটার পরে কফিলের এতোদিনের স্বপ্ন-কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য বাসর শয্যায় এসে হাজির হবে। কিন্তু বরযাত্রীদের যে রকম-সকম, তাতে বরের এ মানসিক হিসাব এবং বাসঅলাদের সঙ্গে চুক্তির কেউ ধার ধারে বলে মনে হয় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বর এবার নিজেই তাড়া দেয়। 'কী হইল, তাড়াতাড়ি করেন। সন্ধ্যা তো হইল

পেরায় ।’

একজন রসিক ভাবী খোঁচা দেয়, ‘ক্যান, আর টান সয় না ?’

বরকে মৃদু লজ্জা পেতে দেখে রুমাল এগিয়ে দেয় আরেক ভাবী, ‘নাও উবমাল খান দিয়া মুখ চিপি ধরো । ববেব এলায যেমন শরম, নয়া শাওড়িকে দেখি না জানি কি করে ।’

কফিল কমালখানা হাতে নেয়, কিন্তু লজ্জা ঢাকার জন্যে মুখে কমাল চাপে না । আবার শুভযাত্রায় প্রস্তুত হয়ে ভাবীদের রঙ্গ-রসিকতায় জবাবে সহজ হতেও পারে না । ফলে কফিলের মুখে যে লজ্জা, খুশি ও টেনশনের আলোছায়া, তা দেখে সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব যে আজকের দিনটা কফিলের জীবনের স্মরণীয় দিন বটে । এটা অবশ্য সবচেয়ে বেশি অনুভব করে কফিল নিজে । এই সব একান্ত অনুভবকে কথার খোঁচায় অন্তরের থলে থেকে টেনে তুলে ভাবীরা যখন হাসাহাসি করে, কফিল বেশ লজ্জা পায় ।

গায়ে হলুদের সময়ে ভাবী সম্পর্কের মহিলারা আর গীতঅলি বুড়ি তাকে বেশ লজ্জা দিয়েছে । গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেয়ার সময় মুখরা ভাবীটি যেন ইচ্ছে কবে তার গায়ে চিমটি কেটেছিল । কাতুকুতু লাগছিল কফিলের, তবু সে হাসেনি কিংবা ভাবীদের রঙ-তামাসার পাল্টা জবাব দেয়নি । আজ যে তার জীবনের অন্য রকম একটা দিন, পিঁড়িতে বসে এই সত্যটা কেবল অনুভব করছিল । গ্রামের রীতি অনুযায়ী মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল । কুলা ও বাঁশের চালানিতে কলা, দূর্বা, ধান, পান-সুপারি এবং আরো কি সব উপাচার । পাড়াব বউ-ঝি অনেকেই জুটেছিল, তপুর দাদী গীত ধরলে গলা মিলিয়েছিল অনেকেই । নাচ ও গীতের ভিতর দিয়ে বরের শ্বশুব-শাশুড়ি ও বধূকে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছে ।

কইনার বাপের ছাগল দাড়ি
তাতে নাগান মোটা দাড়ি ।
কইনার মায়ের পেটত ছাওয়া
জামাইক ডাকাইছে দুধ ধারি...

এবকম স্থূল বসেব গীত শুনে সবাই মজা পেলেও কফিলেব লজ্জা ও অস্বস্তি হয়েছিল । বংশের মধ্যে সেই প্রথম বি. এ ফেল পর্যন্ত পড়েছে । ৩০ হাজাব টাকা ঘুষ দিয়ে প্রাইমারী স্কুলে সরকাবী চাকবি যোগাড় করেছে । আর বিয়ে করতে যাচ্ছে নিজের চেয়েও বংশ-বুনিযাদে বড় ফেমিলির ম্যাট্রিক পাশ মেয়েকে । কফিলেব বিয়েতে এ ধরণেব পুরনো গীত-নাচ কি মানায় ?

ময়লা শাড়ির দীঘল ঘোমটায় মাথা মুখ আড়াল করে হঠাৎ কন্যাকে বাসব শয্যায দিকে আসতে দেখে ঘরেব মধ্যে পড়ে যায । এক চাচাতো ভাবী চেঁচিয়ে ওঠে, ‘ঐ তোমার কইনা আইল।’

কফিলের বুঝতে দেবি হয় না, ঘোমটার ছদ্মবেশী আসলে তপুর দাদী, সম্পর্কে তাবও প্রতিবেশী দাদী । দু’বেলা নিয়মিত আহার জোটে না, পরনের শাড়িতে ফকিরনীর দশা, বুড়িব রঙ্গ-রসের মেজাজ তবু মরে না । গাঁয়ে কাবো বিয়ে শাদি লাগলে গীত গাওয়ার জন্য বুড়ি হাজিব হবেই । গায়ে হলুদের সময় নেচে গেয়ে কফিলেব বিয়ের আনন্দোৎসব মাতিয়ে তুললে, কৃতজ্ঞতা বশে তাকে একখানা শাড়ি দেবার কথা ভেবেছিল কফিল । কিন্তু যাত্রাকালে বুড়ির তামাসা দেখে সে খুব বিবক্ত বোধ করে । এবং মাকে খোঁজে । উঠে দাঁড়ায, ‘মা কই ? মা।’

যেতে হবে দশ মাইল পথ । তারপর বিয়ে হবে, খাওয়া-দাওয়া হবে, সামাজিকতা ও হৈ চৈ হবে, এবং তারপর নতুন বউকে নিয়ে রাতে ফিরতে হবে । এতো সব ঝক্কি-ঝামেলার পর নিরিবিলি বাসররাতের জন্য আব কতটুকুই বা রাত বাকি থাকবে ? তবু সেইটুকু অবশিষ্ট রাতে দ্রুত পৌছে যাবার অস্থিরতা কফিল ম্যারাডোনার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয় ।

‘ঘন্টা হিসাবে বাস ভাড়া নেওয়া হইছে । বাস আর কত দেরি করবে ?’

‘তোমার মাও যে কাঁদিবার লাগছে।’

‘ক্যানে, মাও কান্দে ক্যানে ?’

বরযাত্রীদের সঙ্গে মা শরিক হতে চায়নি । ছেলের বিয়েতে মায়েরা যায় না সচরাচর । কফিলই জোর করে রাজি করিয়েছে । বাবা বেঁচে নেই । মা কতো কষ্টে ঘর-গেরস্থালি সামলে মানুষ করেছে কফিলকে । চাকরি বাবদে ঘুষ দেবার জন্য জমি বেচে ৩০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছে ছেলের হাতে । আজ গাঁয়ের একজন নামীদামী বর হিসেবে কফিল বিয়ে করতে যাচ্ছে । চেয়ারম্যানের ছেলের

পর এ গাঁয়ের আর কেউ বিয়েতে এমন বাস ভাড়া করেনি। গ্রামবাসী সবাই জেনে গেছে, ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে আর ডিমাণ্ড ছাড়াই কফিল নগদ বিশ হাজার টাকা পণ পাবে। বাস দেখাব জন্যে বাড়িতে কতো লোক জড়ো হয়েছে। এমন আনন্দের দিনে জীবনে প্রথমবাবের মতো বাসে ওঠার সুযোগ পেয়েও মা কাঁদে কেন ? সাধারণত মেয়ের বিয়েতে মায়েরা কান্নাকাটি কবে। কিন্তু ছেলের বিয়েতে কাঁদা কেন ? কফিল বিরক্ত বোধ করে।

তপুর দাদী বরের মাকে সান্ত্বনা দেয়। 'কান্দিস না বউ, মোটরে চড়িয়ে বেটার বিয়া দিতে যাবার লাগছিস, তোর কতো বড়ো কপাল। বউকে হাতত তুলি দেওয়ার আগে বেয়াইর কাছ থাকি বিশ হাজার টাকা গনিয়া আচলে বাঁধবু। বাকীর কাম কিন্তু ফাঁকি।'

কালোপেড়ে সাদা শাড়ির আঁচলে চোখ নাক মোছে কফিলের মা। কাজের মানুষকে মাংসের হাঁড়ি গরম করে রাখার নির্দেশ দেয়। ছেলেকে বলে সবাইকে সালাম করতে। যারা ববযাত্রী হিসেবে যাবে না অথচ স্বজন পরিচিত, কফিল এমন মুরুব্বিদের পা ছুঁযে কদমবুচি কবে, সকলের কাছে দোয়া চায়।

কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে বরযাত্রী ১০০ জনের বেশি হবে না। কিন্তু সবাই বাসে ওঠার পর গুণে দেখলে সংখ্যাটা বেশি ছাড়া কম নয়। সবগুলি সিটে চাপাচাপি কবে বসার পরেও অনেককে দাঁড়াতে হয়। তারপরও বাসে ওঠার সুযোগ কিংবা অধিকার থেকে বঞ্চিত পরিচিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। তাবা এসেছে দোয়া করতে কিংবা শুধুই দেখতে। এদের একজন ডাইভারকে পরামর্শ দেয়, সাবধানে চালান ডেরাইভার সাব। সেবাব চেযাবম্যানের বেটার বিয়ার গাড়ি অল্পের জন্যে পাগাবে উল্টে পড়ে নাই।

গ্রামের অনভ্যস্ত কাঁচা রাস্তায় হেলেদুলে বাসের শব্দময় চলনখানা ব্যাণ্ড পার্টির কাজ দেয়। পথচাবী ও বাস্তা সংলগ্ন বাড়িঘবেব বউ-ঝিরাও কাণ্ড দেখতে বাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। যারা জানত না, তারাও অচিরে জেনে যায়, অমুকের ছেলে তমুক বিয়ে করতে যাচ্ছে বাহে। এরকম জানান দিয়ে বিয়ে কবতে যাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ তা ববকে দেখে এখন বোঝার উপায় নেই। সামনের দিকে একটা সিটে ভগ্নিপতি ও বন্ধুব মাঝখানে বযেছে সে। হাতেব রুমালে নাক-মুখ চাপা। যেন তার তন্ময় একাগ্রতা কেবল কন্যার কাছে পৌছে যাওযাব জন্যেই।

কিন্তু ববযাত্রীদের কেউ ববেব মতো বোবা কালা হযে থাকাব মানুষ নয়। ববের মতো তাবা গোমড়া হযে থাকবেই না কেন ? বিয়ে খাওযাব মজার সঙ্গে বাড়তি ভ্রমণেব আনন্দ, তাছাড়া প্রত্যেকেই পবস্পরেব পরিচিত আপনজন, তাছাড়া বাসে ওঠাব সুযোগ অনেকের জীবনে এই প্রথম। কাজেই বাসের শব্দময় গতিছন্দ বরযাত্রীদেব মনেব আনন্দ কতটুকু বা তাব প্রকাশ কবতে পারে। দাঁড়িযে থাকা একটি বালক চেঁচিয়ে প্রথম তার আনন্দ বিস্ময জানান দেয়, 'আরে! বাসখান এতো ঢোলে আর কাঁপে কেনবা!'

লোকজন বালকের প্রশ্ন শুনে হাসে, বয়স্ক ব্যক্তির জবাব শুনেও হাসে। পেছন দিক থেকে এক মহিলা নাকে আঁচল চাপাব আগে কণ্ঠে স্বগত বিস্ময়, 'ছি বাসের ভিতর এমন পোড়ানী গোনধো!' 'প্যাট্রোলের গন্ধ বাহে।' 'আবে ম্যাবাডোনা পাদ মারতেছে।' এভাবে কথাব পিঠে কথা হয়, আর যাত্রী সকল হেসে ওঠে। হাসির কথা না হলেও হাসে, প্রসন্ন মেজাজ প্রকাশেব জন্যে সরস কথা বানাতে পারে না যারা, তারা অন্যের হাসি দেখেও হাসে। বরের মামাতো ভাই জামাল কণ্ডাকটার সাজলে হাসির হুল্লোড় আরো বেড়ে যায়। কয়েকটি টাকা লম্বালম্বি ভাঁজ কবে আঙুলের ফাঁকে নিয়ে জামাল চাচা-সম্পর্কের মানুষটিকে বলে, 'দ্যান তো ভাই, ভাড়াটা, বাইর করেন।'

'দূর হ শয়তান।'

'না না, মাগনা যাইবেন তা হবার নয়। দ্যান তো ভাবী, ভাড়া দেন।'

'তোর নিজের বিয়ের সময় এমন বাসের চড়াইলে ডবল ভাড়া দেমো।'

'বাসের কণ্ডাক্টর—এর বাস ভাড়া করার মুরাদ আছে ?'

'কন কী তোমরা! মোর দাদার বিযা হইছে পাল্কিতে চড়ি, বাপের বিযা হইছে গরুর গাড়িতে, ভাই বিয়া করতে যায় বাসে, আর মুই বিয়া করতে যাইমু রকেটত চড়ি।'

'রকেট না খালি চাঁদত যায় ?'

'হয় হয়, চাঁদের বুড়ি-নাতনীকে বিয়া করিম মুই।'

বাসের ভিতর এ ধরণের রঙ্গ-রসের হুল্লোড় বরকে মোটেও স্পর্শ করে না। মনে মনে বরং সে বিরক্ত বোধ করে। ড্রাইভার হেলপারও ভাববে হয়তো, এই লোকগুলি বাসে ওঠেনি কখনও। কন্যার দেশে পৌছে বাসখানা বরের যোগ্যতার জয়ঢাক হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বরের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ? কয়েকজন শিক্ষিত বন্ধুবান্ধব আছে বটে কিন্তু বরের ঘনিষ্ঠ স্বজনরা এরকম বাসে ওঠার মানুষ নয়। বরের পাশে বসেছে তার বড় ভগ্নিপতি। লোকটা খাঁটি চাষা। অনেক ধরাধরির পর লুঙ্গির বদলে আজ শ্যালকের পাজামা পরেছে। কিন্তু ঘাড়ের গামছাখানা সঙ্গে নিয়েছে তবু। আয়েস করে বিড়ি টানছে এখন। সে কারণে হয়তো বিড়ির গন্ধেব সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনকেও অসহ্য লাগে। ভিড়ের হৈ-হুল্লুড় ও সামাজিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে, তার বরং নববধূব কথা ভাবতেই ভাল লাগে। ফেরার সময় কনে বসবে বরের পাশে, ভিড়ের মধ্যে দুজনার কথাবার্তা দূরে থাক, চোখাচোখিও হবে না হয়তো। তবে গোপনে কফিল একটা চিমটি কাটতে পারে অন্তত, যে চিমটির কথা সারাজীবন মনে রাখবে তার বউ।

'হায় হায়! বরের মা যে বমি কবতে করতে মরে।'

হাসি-মস্করা থামে। সামনে যারা বসেছিল, ঘাড় ঘুরিয়ে তারা পেছন পানে তাকায়। বরের মতো এতোক্ষণ বরের মা-ও মহিলাদের মাঝে চুপচাপ বিষন্ন বসেছিল। তার নাভিমূল থেকে উঠে আসা ওয়াক ওয়া বমির শব্দ কানে আসে, বমিব গন্ধও নাকে লাগে, আর দৃশ্যটা দেখে গা ঘুলিয়ে যায় অনেকেব। বর বেশে কফিল ছুটে যায় মায়েব কাছে, বিড়ি হাতে তাব ভগ্নিপতিও।

'কী হইছে মা তোমাব ?'

মায়ের তখন কথা বলার তাগদ নাই। পাকস্থলিতে যা ছিল তা এখন পরনের শাড়ি ও ছোঁটেব কোণে লেগে রয়েছে। পার্শ্ববর্তী মহিলাটি না পারে সরে যেতে, না পাবে ববেব মাকে ধাক্কা দিযে সবিয়ে দিতে।

শাশুড়িকে নিরীক্ষণ করে, বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে জামাই আশ্বস্ত করে সবাইকে, 'আম্মাজানের বাসে চড়ার অভ্যাস নেই তো। নয়া নয়া বাসে চড়লে অনেকে বমি করে। চিন্তাব কোনো কারণ নাই।'

কণ্ডাক্টাব বেশে জামাল বাসে হাস্য-রসাত্মক পবিবেশটা জিইযে বাখাব চেষ্টা কবে, 'আরে ফুফু হামার বুদ্ধিমতী! পেট খালি করে নিতেছে। নয়া বেয়াইয়েব বাড়ি গিয়া টিকিয়া গোস্ত খাইবে এলায়।'

কেউ কেউ হাসে বটে, ববেব মাযেব কাহিল অবস্থা তাতে কমে না। আর বরের মুখে উদ্বেগের ঘনছায়া নামে। যাত্রাকালে মা কেঁদেছে। বাসে উঠে বমি কবছে। এসবেব মানে কী ? কফিলের মনে হয় তাব বিবাহ যাত্রায় আনন্দের সঙ্গে কি এক গভীব বিষাদ, সুখ-স্বপ্নের সঙ্গে কি যেন হারাবাব বেদনাও সওয়ার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোনটা বেশি সত্যি হযে উঠবে কে জানে। মায়েব দিকে ঝুঁকে পড়ে কফিল। ধরাধরি করে তাকে বাসের দরজার কাছে বসানো হয। বাতাস খেয়ে মায়ের মাথাধবা ও বমি যদি একটু কমে।

পাকা রাস্তায় উঠে ম্যারাডোনাব ছোটার গতি অনেক বেড়ে যায। বাইরে সন্ধ্যার আঁধাব ঘন হয়ে উঠছে। ড্রাইভার বাসের ভেতর হালকা রঙিন আলো জ্বালিয়ে হিন্দী গানেব ক্যাসেট চালিয়ে দেয়। তিনটি সাউণ্ড বক্স থেকে চুইয়ে পড়া প্রবল সুর প্রপাত বরযাত্রীদের যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

কন্যাব দেশে পৌছার জন্য আবার কাঁচা রাস্তার ধকল, আরো প্রায় মাইল চারেক পথ। এ বকম পথে ম্যারাডোনা কষ্ট কবে ছুটবে বলে ভাড়াও নিয়েছে অনেক বেশি। হেডলাইটের তীব্র আলোয় আঁকাবাঁকা মাটির রাস্তা, রাস্তা সংলগ্ন ধানখেত, বাঁশঝাড়, গাছপালা, বাড়িঘর চিবে অবশেষে যেখানে এসে ম্যাবাডোনা থামে, ড্রাইভার ইঞ্জিন ও হেডলাইট অফ করে, সেটাই যে কন্যার বাড়ি, বরযাত্রীরা বাসের ভিতর থেকেই তা বুঝতে পাবে।

বরের বাড়িতে ম্যারাডোনাকে দেখাব জন্যে যে ভিড় তৈরী হয়েছিল কনের বাড়িতে সে ভিড়টা আরো বড়। ম্যাবাডোনা, বর ও বরযাত্রীদেব দেখার কৌতূহলী মানুষজন ছাড়াও রয়েছে অভ্যর্থনাকারী একদল ছেলেমেযে। বাড়ির সামনে বাস্তায় দু'পাশে কলাগাছ পুঁতে সুদৃশ্য তোরণ বানানো হয়েছে। রঙিন কাগজের নকশার মাঝে গেটের মাঝখানে লেখা 'শুভ বিবাহ' এবং ভুল বানানে 'শাগতম'। দু'পাশে দুটি হাবিকেন জ্বলছে। গেটখানাকে বাঘের মতো ভয় পেয়ে বরের ভগ্নি

পতি প্রথমে আঁতকে ওঠে, 'খাইছে হামাক। ও ডেরাইভার ভাই, গেটখান পার করায় না দিলে হামরা নামতো না।'

'আইছেন বিয়া খাইতে, আর আমারে কন মানুষ মারতে ?'

অগত্যা বরযাত্রীরা একে একে নামতে থাকে। বর বাস থেকে নেমে কারো দিকে না তাকিয়ে উপস্থিত কন্যা পক্ষের উদ্দেশ্যে সালাম দেয়। কিন্তু বরের অতিশয় বিনীত 'আসসালামো আলায়কুম' কেউ যেন শুনতে পায় না। শুনলেও 'ওয়ালেকু সালাম' বলে না কেউ। কে একজন টর্চের আলো ফোকাস করে বরের মুখে। লাজুক বর মাথা নিচু করে আছে। ওদিকে বাসের ভিতরের ভিড়-গরম-গন্ধ এবং শরীরের ভিতরে পেট মোচড়ানো জিউ-মতলানো মাথাধরা ইত্যাদি উপসর্গ ও নানা ভয়-ভাবনার ভারে বরের মা এতো কাহিল হয়ে পড়েছে যে, তাকে ধরাধরি করে নামাতে হয়। বাস থেকে নেমে সে রাস্তার ঘাসের ওপর বসে পড়ে।

বরকে ঘিরে তার ভগ্নিপতি, বন্ধু ও ভ্রাতৃস্থানীয়রা গেটের সামনে কন্যাপক্ষের মুখোমুখি হয়। পথ রোধ করে গেট আগলে দাঁড়িয়ে আছে একদল তরুণ ও কিশোরী। দাবী তাদের মাত্র ১০০০ টাকা। বরের ভগ্নিপতি কাতর স্বরে বলে, 'শোনেন ভাই, বরের মা মানে আমার শাশুড়ি বাস জার্নি করে খুবই অসুস্থ। মানে মরো মরো অবস্থা তার। আপনারা তাড়াতাড়ি গেট ছাড়ি দেন, গেটের দাম যা হয় বিবাহের আগে মিটায় দেব।'

ভগ্নিপতিদের এরকম চালাকি গেটপ্রহরীদের অনেক দেখা আছে। তারা হেসে বলে, 'আহারে সখ কতো। গেটের মাশুল না দিয়ে বাড়ি ঢোকা সহজ না।' কন্যাপক্ষের ছেলেরা হঠাৎ বরযাত্রীদের রঙ ছিটিয়ে দেয়।

অনুনয় বিনয়ে কাজ না হওয়ায় বরযাত্রীদের নেতা কন্যাপক্ষকে দুর্বল করার জন্য হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে, 'বরের মায়ের সিরিয়াস অবস্থা আর এরা রঙ ছিটায়। ঠিক আছে আম্মাজানকে নিয়া হামরা বাসে আবার ফিরিয়া যাই। থাকো তোমরা গেট ধরিয়া।'

বাসে শাশুড়িকে বমি করতে দেখেও যে জামাই অভয় দিয়ে বলেছিল চিন্তার কারণ নেই, এখন টাকার বদলে সেই অসুস্থ শাশুড়িকে পুঁজি করে তার গেট খোলার কৌশল কন্যাপক্ষ ভণ্ডুল করে দেয়। বরের অসুস্থ মাতাসহ বয়োজ্যেষ্ঠ অনেককে কন্যাপক্ষের লোকজন গেটের ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে ঘোরাপথে বাড়িতে নিয়ে যায়। ওদিকে ঘুরে উপযুক্ত স্থানে দাঁড়াবার জন্যে ম্যারাডোনাও পিছাতে শুরু করেছে। বাস ঘোরানোর এই সংক্ষিপ্ত সময়টাতেও বাস ভ্রমণের স্বাদ পাওয়ার জন্যে কন্যার দেশের কিছু ছেলেমেয়ে হৈ চৈ করে বাসে উঠতে থাকে।

শালার বিয়েতে আসার জ্বালায় বিরক্ত হয়ে ভগ্নিপতি এবার পাঞ্জাবির পকেট থেকে ১০০ টাকার নোট বের করে একটি। কিন্তু গেটপ্রহরীর দল সে টাকা ছুঁয়েও দেখে না। 'আমরা কি ফকির ? এক হাজার দেন। এক পয়সা কম মানব না।'

'দস্যু ডাকাইতের মতো কথা ! এই গেটের দাম এক হাজার?'উভয় পক্ষের মধ্যে গেটের মূল্য নিয়ে দর কষাকষি চলতে থাকে। যুক্তি-তর্কের মধ্যে উত্তেজনার ছোঁয়া। বর শুধু নীরব, অসহায় দর্শক। কথায় আছে, একশত এক কথা খরচা না হলে বিবাহ-শাদির কাজ সম্পন্ন হয় না। ঘটকালি, কনে দেখা, ছেলে দেখা, দেনা-পাওনা নির্ধারণ ইত্যাদিতে অন্তত নিরানব্বই প্রকার কথা ইতোমধ্যেই খরচা হয়েছে। অবশেষে বর যখন কনের বাড়ির দোরগোড়ায়, কনের বাড়ির আঙিনায় হ্যাজাকের আলো, কন্যাও সেজেগুজে ঘর আলো করে বরের জন্যে অপেক্ষা করছে, তারপরও উভয়ের মিলন ঘটতে আরো কতো কথার সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে কে জানে। শুভদিনে টাকা পয়সার ব্যাপার নিয়ে এতো খেঁচাখেচি ভাল লাগে না। সন্দেহ হয়, মেয়ের বাবা বিয়ের দিনে বিশ হাজার টাকা গুণে দিতে রাজি হয়েছে, সে জন্যেই কি গেটের দাম এক হাজার টাকা খসিয়ে নেয়ার ফন্দি ?

বরযাত্রীরা যখন দু'শো টাকায় ওঠে এবং গেটঅলারা আটশ' টাকায় নামে, দুর্ঘটনার খবরটি সহসাই কানে আসে সবার। ড্রাইভার বাস ঘোরানোর সময় বাসের চাকা বালুর মধ্যে ডুবে গেছে। এখন বরযাত্রীদের বাস উঠতে পারে না, নড়তে পারে না, এমন কি ইঞ্জিনও আর গর্জে ওঠে না। ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখার জন্যে ভিড়ের অনেকেই ছুটতে থাকে। ২০০ টাকা বুঝে নিয়ে গেট ছেড়ে দেয় গেটের প্রহরীরা। অবশেষে বর যখন কন্যার বাড়িতে গিয়ে ওঠে, বিবাহ মজলিশের অনেকেই

তখন ছুটে যাচ্ছে দুর্ঘটনা কবলিত বাসখানা দেখার জন্য।

বিয়েবাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে রাস্তা যেখানে মরা তিস্তার চবে নেমে হারিয়ে গেছে, সেখানে বিরাট এক বাঁশ ঝাড়, আর একদিকে রাস্তা সংলগ্ন একটি ফাঁকা মাঠ। মাঠের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ম্যারাডোনা। সামনের চাকা দুটি বেলেমাটিতে অনেকটা ডেবে গেছে। জলমগ্ন মানুষের মতো সে যে শরীরে প্রাণ থাকা পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য অনেক দাপাদাপি করেছে, ফাঁকা খেতটায় চাকার গভীর দাগ ও গর্ত দেখেও বোঝা যায়। বিয়েবাড়ির উঠোনে যেমন হ্যাজাক জ্বলছে, ম্যারাডোনার পেছনের দিকেও তেমনি পরিষ্কার আকাশে একাদশীর চাঁদ জ্বলে আছে। চাঁদের আলোয় কন্যার দেশটাকে বড় মনোহর লাগে। সামনে তিস্তার বিস্তীর্ণ পুরনো চরে ধান খেত, কোথাও বা কাশবন আর খড়োচালার গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ি। চবের ওপারে নদী এখন বহুদূরে। আর এপাবে কায়েমী গ্রামখানার বাড়ি ঘিবে যতো বকম বৃক্ষ, কলাঝোপ, বাঁশঝাঁড়, ধানখেত সবকিছুই আজ বাতাস ছাড়া, স্থির। প্রকৃতির এই গুমোট গরম, যেন রোদের মতো তা জ্যোৎস্নার শরীর থেকে উঠে আসছে।

জ্যোৎস্নালোকিত গরমের রাতে বরযাত্রীদের বাস দুর্ঘটনার খবরটি বাতাসের চেয়েও দ্রুতবেগে কন্যার দেশে ছড়িয়ে পড়ে। খবরদাতা কিংবা রটনাকারীদের আবেগরসে ভিজে বাসের চাকা ডুবে যাওয়ার তথ্যটি কোথাওবা বাস উল্টে চিৎপটাং হয। চাকা ছিটকে চবে গিয়ে পড়ে, বরযাত্রীদের মাথা ফাটে, হাত-পা ভাঙে, চোখ কানা হয এবং বরের মা মৃত্যুবরণ কবে। বিয়েবাড়ির গেট, হ্যাজাক, পোলাও মাংসের গন্ধ এবং হৈ চৈ যা পাবেনি, একা ম্যারাডোনা তার চেয়ে বেশি কন্যার দেশটাকে জাগিয়ে দেয়। লোকজন স্বচক্ষে দেখার জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে আসতে থাকে।

যে মাঠটায় কিছুদিন আগে পেঁযাজের খেত ছিল, দিনে গরু-বাছুব চরে, এখন সেখানে ফকফকে জ্যোৎস্নার ভেতর বাসখানা মাথা গুঁজে পড়ে আছে হাতির মতো, কারো মতে মবা বাঘের মতো, কেউ বলে আজদাহা এক সাপ কিংবা ভাঙা জাহাজের মতো। বরযাত্রীদের আভিজাত্য ও বিয়েবাড়িব আনন্দের প্রতীক বাসখানা অপরিচিত খেতের মধ্যে সহসা মাথা গুঁজে যেন আরো বেশি আনন্দের খোরাক হয়েছে। বিয়েবাড়িতে যেসব দরিদ্র গ্রামবাসী দাওয়াত পায়নি, তাবা সবাই এই আনন্দভোজে শরিক হযেছে। অচল বাস, বিয়ে বাড়ি ও বরযাত্রীদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও গল্প-গুজবে জমে উঠেছে মানুষগুলি। ড্রাইভার সমবেত লোকজনের কাছে কাতর কণ্ঠে আর্জি জানায, 'সবায় মিঁইল্যা আব একবাব ঠেলা লাগান ভাই'

'কোনো লাভ হবে না, ডেবাইভার সাব। বাসের ওপব জ্বিনের আঁচড় পড়ছে। ঐ যে বড় পাইকব গাছটা, দেখছেন, সে গাছে থাকে এক জ্বিন। সেই জ্বিনে আপনাব বাসেব কল্লা টিপি ধবছে।'

অজানা রহস্যময় মাঠে দু:স্বপ্নের মতো অচল ম্যারাডোনাকে দেখতে আসা অচেনা গাঁয়ের লোকজনেব প্রতি বিরক্ত হলেও, জ্বিনেব ব্যাপারটা ড্রাইভার উড়িয়ে দিতে পারে না। নির্ধারিত রুটে পাকা রাস্তা ধরে ছোটার সময় পীর বুজরগদের যতো মজার ও দরগা শবীফ আছে, সবখানে গাড়ি থামায় সে, হেলপার ছুটে গিয়ে দানবাক্সে টাকা ফেলে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও বিজলি বিহীন অচেনা দেশটায় কোথায় কি লুকিয়ে আছে, তার জানার কথা নয়।

যে ছেলেটি তাকে এ মাঠে গাড়ি ঘোরানোর পরামর্শ দিয়েছিল, আশ্চর্য যে, ড্রাইভার তাকে ভিড়ের মধ্যে আর খুঁজে পায় না। সন্দেহ হয় জ্বিনই তবে মানুষেব বেশে তার এ সর্বনাশটা করেছে? এরকম ভূতুড়ে স্থানে ম্যাবাডোনা এভাবে বিকল হয়ে পড়ে থাকবে, স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

গরমের রাতে ঘরে স্বস্তি না পেয়ে নাঙা শরীরে বা গামছা ঘাড়ে বা বিড়ি হাতে যেসব লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হয়েছে, বরযাত্রীদের বাসখানা তাদের কাছে যাত্রাগান বা সার্কাস যেন। মাঠের ঘাসে খাতির জমিয়ে বসেছে তারা, হাসি-মস্করায় মজে গেছে, ওঠার আর নাম নেই। চন্দ্রালোকে ক্ষেতের মধ্যে বাসখানা মাথা গুঁজে পড়ে থাকার স্বপক্ষে তারা আরো যুক্তি দেখায়।

'জ্বিনের আঁচড় লাগার কারণ আছে। ডিমাণ্ডের বিশ হাজার টাকা না পায়া কইনার বাপকে তারা হতনাস্তা অপমান করেছে।'

'ছেলের মা নাকি টাকা না পায়া, বউ ছাড়িয়া গরুগাড়ি ভাড়া নিয়া চলি গেল।'

'আরে বরের দেশের মানুষগুলাক হামার জানা আছে। একদম চামাড়। দেখলেন না

চ্যাংড়াগুলো কতো আশা করি গ্যাট সাজাইছে, পুটি মাছের ভাগার মতো দামাদামি করি দিছে মাত্র ২০০ টাকা।'

'সেই জন্যে তো এই অবস্থা। কইনার নানাব কাছে পা ধবি মাফ না চাইলে এই বাস আর উঠবে না।'

কনের নানার সঙ্গে জিনের সম্পর্ক বোঝাতে আবার শুরু হয় জিনের গল্প। চাঁদনীর মতো সাদা পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে জিন কবে প্রথম তিস্তার চরে এল, কনের নানা ফজু মুন্সীর সাথে কোথায় দেখা হলো, কী কী কথা হলো, তারপর মসজিদে কিভাবে তারা নামাজ পড়ল — এইসব বৃত্তান্ত বলা ও শোনাব কাজে মশগুল হয়ে ওঠে ভিড়েব মানুষগুলি। কিন্তু ববযাত্রীদের অবস্থা ভিন্ন। কনের দেশের এ ভিড়কে তাদের শত্রুপক্ষ মনে হয়। বিয়ের আগে পর্যন্ত বর ছিল তাদের হাতের পুতুল, একই সঙ্গে কন্যাপক্ষের সঙ্গে লড়ার জন্য প্রধান অস্ত্র। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানেব পর বর এখন শালা-শালীদের মাঝে জামাই আদর উপভোগ করছে। তার অসুস্থ মা গোঁ ধরায় গকব গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় আমন্ত্রিতরা খাওয়া-দাওয়া শেষে ফিবে গেছে যে যার বাড়ি, কিংবা বিয়েবাড়ির আনন্দভোগের পর ম্যারাডোনাকে ঘিরে মধ্যরাতেব এ আনন্দোৎসবে যোগ দিয়েছে তারাও। কিন্তু বেচারা বরযাত্রীরা করে কী ? মেয়ের বাড়িতে এতো ঘর ও বিছানাপত্র নেই যে সকলের ঘুমানোর ব্যবস্থা করবে। ছোটা বাচ্চারা মায়েদের কোলে কিংবা যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে কাদা। মহিলারা নতুন বউ আগলে কতক্ষণ আর জেগে থাকবে ? ওদিকে সাজানো বাসরঘর শুধু নয়, বরযাত্রীদের প্রত্যেকের আরামে ঘুমানোর জায়গাটুকু শূন্য পড়ে আছে। ফেরার অস্থিরতা এখন সবার মধ্যে। বরযাত্রী পুরুষেরা অচল বাসটির কাছে জড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু না পারে স্থানীয় ভিড়ের আনন্দে একাত্ম হতে, না পারে দলভারী অচেনা গ্রামবাসীদেব সঙ্গে ঝগড়া করতে।

বরের ভগ্নিপতি ঝাঁঝালো কণ্ঠে ড্রাইভারের কাছে জানতে চায়, 'ও ডেরাইভার সাব, আপনে কি সারা বাইত এ গ্রামের মানুষকে ম্যারাডোনার ম্যাজিক দেখাইবেন ? আমবা এ বাস ফিরতে পারব কিনা ফাইনাল বলেন।'

ড্রাইভাবের পাল্টা মেজাজ আরো মারমুখো-'আপনাগো বিয়াতে আইসা তো এই অবস্থা। সকালে ঢাকা যাওযাব জন্য এই বাসের টিকেট যাবা কাইটা রাখছে, ভোরের আগে বাস লইয়া বংপুব ফিবতে না পাবলে তাদেব অবস্থা কী হইব ? মহাজনে চাকবি বাখব আমার ?'

'ঠিক আছে, আপনি স্টার্ট লাগান, আমবাই ঠেলা দিতেছি। আগে জানলে কোন শালা এই চুতিযা জায়গায় আত্মীয়তা কবতে আইসে।'

ড্রাইভাব তাব আসনে গিযে বসলে বরযাত্রীবা সবাই পেছন থেকে ম্যারাডোনাকে ঠেলতে থাকে। বিযে খাওয়াব সবটুকু শক্তি, কন্যাপক্ষেব ওপব সবটুকু আক্রোশ ও অভিমান নিয়ে ঠেলে, কন্যাপক্ষেরও ঘনিষ্ঠ দু'চারজন হাত লাগায়, কিন্তু ম্যাবাডোনা একচুলও নড়ে না।

খোশগল্পেব আসরে বসে থেকেই ববযাত্রীদেব উদ্দেশ্য চেঁচিয়ে ওঠে একজন। 'কোনো লাভ হবার নয় ভাই। আগে কইনার নানার পাও ধরি মাফ চান, তাব কাছে পানিপড়া নিয়া আসেন।'

বাসখানা সচল করতে না পাবাব ব্যর্থতা ববযাত্রীরা আব নীরবে হজম করতে পাবে না। সরাসরি পাল্টা জবাব দেয়।

'এ দেশের মানুষের মনে যে এতো হিংসা — সে কথা আগে বুঝি নাই ভাই।'

'তার মানে ?'

'তার মানে এ গ্রামের মানুষেব একতা নাই, দেহে শক্তি নাই, মনে খালি হিংসা।'

'কী এতো বড়ো কথা !'

'বড় কথা তো এতক্ষণ ধরিয়া আপনারাই কইতেছেন ভাই।'

'তাছাড়া বাসে চড়া দূরে থাউক, এমন বাস তো মনে হয় জীবনেও দেখেন নাই। সারা রাইত নয়ন ভরিয়া দেখেন, আমরা হাঁটিয়া রওনা দিতেছি।'

'হামাক এমন খোঁচা মারা কথা কন না ভাই, বেপদে পড়বেন আরো।'

বিপদের ভয়ে কিংবা কন্যাপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করার সাহসের অভাবেই হয়তো বরযাত্রীরা চন্দ্রালোকে ম্যারাডোনাকে ফেলে রেখে চলে যেতে থাকে। পেছন থেকে চেঁচিয়ে একজন জানতে চায়,

'বর-কইন্যাকে কী ফেলায় থুইয়া যাইবেন ?'

'আমাদের বর তো বাসে চড়িয়া শ্বশুববাড়ি আসছে। আপনাদের মেয়ের যখন বাসে চড়ার কপাল নাই, হাঁটায় নিয়া যাবো তাকে।'

বরযাত্রীরা যে নিছক ঠাট্টা করছে না, বাস ফেলে রেখে তাদের ফেরার তোড়জোড় দেখেও বোঝা যায়। বরযাত্রীরা চলে গেলে নিষ্প্রাণ ম্যারাডোনাকে ঘিরে মজা করার মেজাজটাও যেন তাদের বিগড়ে যায়। অপমানিত বোধ করে স্থানীয় লোকগুলি। অপমানের প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে জঙ্গীরূপ ধারণ করে যে লোকটার মধ্যে, সে ছুটে গিয়ে বরযাত্রীদের পথবোধ করে দাঁড়ায়।

'খবরদার, হামার গেরামের মেয়েকে হাঁটায় নিয়া যাইতে পারবেন না।'

বরযাত্রীরা ভড়কে যায়। নরম কণ্ঠে জবাব দেয় একজন, 'কী কবব ভাই ? আপনাদের জ্বিন আমাদের বাসের কল্লা টিপে ধরছে।'

'জ্বিনের আঁচড় কাটার মন্ত্র জানা আছে হামার। খাড়া হন সবায়। তোমার বাস হামরা পাল্কির মতো ঘাড়ত করি তুলি দিতেছি।'

এতক্ষণে উদ্ধার অভিযানে যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঘটে যেন। খালি গায়ের ঢ্যাঙা লোকটা লুঙ্গিতে মালকোচা মারে। তার উত্তেজিত চিৎকার ও আদেশ নির্দেশে সাড়া পড়ে যায় ভিড়ের মধ্যে। অলস আড্ডাবাজ মানুষগুলি দূর গাঁয়ের বরযাত্রীদের কাছে দেখাবার মতো একটু উপযুক্ত কাজ পেয়ে যায় এতক্ষণে। হৈ চৈ ও চিৎকারের ভেতর দিয়ে একজন ছুটে যায় ফজু মুন্সীব কাছে পানিপড়া আনতে, অন্যরা যায় কোদাল-দড়ি-বাঁশ-তকতা ইত্যাদি যোগাড় করতে।

মধ্যরাতের স্তব্ধতা চিরে সমবেত কণ্ঠের হাঁকডাক ম্যারাডোনাকে ঘিরে নতুন উৎসবের আয়োজন যেন। যারা ঘুমাতে গিয়েছিল, ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তারাও আবার ছুটে আসে। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাকা জাগানো হয়, কাঠ বিছিয়ে দেয়া হয় বালু মাটির উপর। পানিপড়া ছিটানো হয় ম্যারাডোনার গায়ে। মোটা রশিতে বাসেব মাথার দিকটা বেঁধে বলদের জোয়াল টানাব মতো ঢ্যাঙা মানুষটা সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চিৎকার করে ববযাত্রীদের বাস ছুঁতে নিষেধ কবে সে। উপস্থিত গ্রামবাসী সকলের জোড়া হাত এখন বাসেব ওপর। সামনে থেকে লোকটা গলা ফাটিয়ে চিৎকাব করে, আলী আলী বলো সবে ; অবশিষ্ট লোকগুলি একসঙ্গে সাড়া দেয় — হেঁইও।

বদর বদর বলো সবে
হেঁইও।
জ্বিন ঠেলে মানুষ ঠেলে
হেঁইও।
জোব ঠেলো আরো জোবে
হেঁইও।
কইন্যা যাবে বাসর ঘরে
হেঁইও।
বর ঠেলে কেমন করে
হেঁইও .....

সম্মিলিত কণ্ঠের ছন্দময় নিনাদ ধ্বনি অবশেষে ম্যাবাডোনারও ঘুম ভাঙায়। খানিকটা গড়িয়ে যেতেই ইঞ্জিন আবার গর্জে ওঠে। তারপর নিমেষেই মাঠ ছেড়ে পথে, পথ ধরে কন্যাব বাড়িব কাছে এসে থামে, কিন্তু ড্রাইভার ইঞ্জিন আর অচল করে না। ববযাত্রীদের তাড়া দেয়, বাসে ফিরতে চাইলে এক্ষুণি সবাই উঠে বসুক। তাড়াহুড়াতে বিদায় পর্বের আনুষ্ঠানিকতাও ঠিকমতো সম্পন্ন হয় না। বর কনেকে রেখেই বরযাত্রীরা অনেকে আগেভাগে বাসে গিয়ে ওঠে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছে অনেকে। বাকীরা বিজয় গর্বে ম্যারাডোনাকে কিল চড় মেরে বিদায় দিয়ে যে যার ঘরে চলে যায়। বরের ভগ্নিপতি ও বন্ধুরা বর ও বধূকে সকল গুরুজনের পা ছুঁয়ে সালাম কবাবও সময়ে দেয় না, কন্যাপক্ষের লোকজনেব কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে এনে বর-কনেকে বাসে তোলা হয়। ইতিমধ্যে হৈ চৈ ভরা বিয়েবাড়িকে গ্রাস করে নিয়েছে শেষরাতের স্তব্ধতা। উৎসব ভেঙে যাওয়ার পরও কনের বাড়ির নেড়ি কুকুরটি উচ্ছিষ্ট হাড় চিবোয়, আর শূন্য গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কনের মা কাঁদে। দূবে, বাসেব শব্দ-গন্ধ বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও কনেব মায়ের কান্না করুণ সুরে বেজে ওঠে, 'না জানি মোর ময়নার কপালে কী আছে বে!'

সুশান্ত মজুমদার

সাধারণ হাত

এটা তাঁব পছন্দ নয। বাড়িয়ে দেওয়া হাত গ্রহণ না করে প্রত্যাখান কবেন বা কি কবে। মন-পালিত দ্বিধা চাপা দিয়ে হৃষ্টভাব দেখাতে হয়। অন্তরঙ্গতাব যে উচ্ছ্বাস ভেতরে থাকে এবং ঝলমলে স্বত:স্ফূর্ততা তাঁর আসে না। যথাবীতি ভেতর থাকে খটখটে শুকনো। এই গুপ্ত সমাচার কেউ-ই হৃদয়সংবাদী নয় বলে জানে না — একমাত্র তিনি বোঝেন কিছুতেই কিছু পারছেন না। পাবা না পাবা নিযে তিনি ভেবেছেনও — সমাধানেব নাগাল পাননি। পবিষদেব সঙ্গে এ নিযে শলা-পরামর্শ করা চলে না যেহেতু বিষয সম্পূর্ণ তাঁর — একান্ত। তাঁরা তো ইতিমধ্যে ধবে নিযেছে ক'দিনে জনসংযোগে তিনি তুখোড় হয়ে উঠেছেন — চমৎকার বিরল গুণ। এতদিনে সাধাবণ্যে যান নি, সাধাবণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল না, অথচ দ্রুত সে সংকট যেন মোচন করতে পেরেছেন। সঙ্গীরা মুখোমুখি তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে বিশেষণ সহযোগে অনেক কথা পেশ কবেছে — তিনি মুখ মুখের মতো রেখে উদাসীন। এ-প্রসঙ্গেও অনুগতদেব ধারণা তিনি প্রশংসা অনাযাসে হজম কবতে পারেন। বিশেষ যে ক্ষমতায় পাবা যায় তা তাঁর আয়ত্তে। অথচ কেউ-ই জানে না এটা তিনি পারেন না। যা তাব হচ্ছে না তা তিনি পাবছেন — এই প্রচাবণা স্রেফ বানোযাট — কেউ জানে না একমাত্র তিনি ছাড়া। তবে চূড়ান্ত সত্য তিনি এসেছেন এবং নিজেব আবির্ভাব টেকসই করতে নীল নক্শা মোতাবেক সক্রিয়। তাই যদি হয এখন কবাব পব আবাব কবা নিযে ভাবনা কী — অহেতুক মনোব্যাধিব জন্য দেওয়া কেন। তবু হয়, সমস্ত স্বস্তি একপাশে সরিযে বোঝাপড়া চলে। নি:শব্দ এই বোঝাপড়া মানে নিজের বিবেচনা তছনছ কবে বুঝে নেওয়া। একবাব যখন এসে পড়েছেন, মানুষ জেনে গেছে, অনেকে এসে দেখাও কবে গেছে — তখন আর সবে দাঁড়াবার উপায নেই। যাবা এসেছিল তাদের বেশিবভাগ নাম আগে শোনেন নি, কাবো নাম মনে থাকতে পারে — অনেক আগে শোনা, কাউকে আগে দেখেও থাকতে পারেন, তবে নাম ও চেহারা এমন সামনাসামনি শোনেন নি, দেখেনও নি। তাঁকে ঘিরে এবা — তিনিই মধ্যমণি। তাঁকে সমর্থন নিযে কী উচ্ছ্বাস — তিনি এতদিনেব খাঁটি, তাঁব মতো কেউ আসে নি। তাঁর নির্দেশে এরা সবাই বাস্তা-ঘাট ঝাড়ু দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। এমন অনুকূল আবহাওয়াব মধ্যে ভযঙ্কব ঝড়ো কথা — তিনি উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন — কী সর্বনেশে, এটা স্তব্ধ করে দেবার উপায় কী। প্রকৃত সমস্যা তাহলে থেকে যাচ্ছে অন্তত: নিজেব ন্যায্যতা প্রমাণ — এটা তার অহর্নিশি অস্বস্তির কারণ, এ নিয়ে কী করা!

কাল রাতে ঘুমে গোলমাল গেছে। তন্দ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝিতে যেন ভেসে ছিলেন। চিন্তা তার ঘুমকে প্রহার করেছে বলে উত্তেজনা ঘুম খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। কেবলমাত্র শেষ রাতের হাল্কা ঠাণ্ডায় স্নায়ু শিথিল হলে ঘুম নিবিড় হয। তিনি যখন জেগে ওঠেন বাইবে তখন চড়া স্বর আর কোলাহল। পিঠের নীচে বালিশ বিছিয়ে বিছানায় বসে থাকেন চুপচাপ। যারা বাইরে পাহারায় তাদের পাণ্ডাকে ডেকে বলে দেন কেউ যেন ডিস্টার্ব না কবে। এ কথায় কাজ হয় এবং বাইরে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। এবাব তিনি জানালা দিয়ে বাইবের শান্ত প্রকৃতি — পরিচ্ছন্ন গাছপালা দেখেন। সকালের রোদ এসে বসেছে কাছের বেটে নাবকেল পাতায়। হাল্কা হাওয়ায় পাতাগুলো তিরতির কাঁপছে। ক্ষমতা কী চিজ! এই প্রশ্ন উদয় হলে নিজেব সঙ্গে নিজে সংলাপ বিনিময় করেন — কেন ক্ষমতায় ছিলেন। ছিলেন কি আছেন। অতবড় বাহিনীর মতো কর্মচারী — দপ্তবে ও ঘরে কর্তা — আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই তো সবাই এ্যাটেনসন — বাধ্যগত সালাম — তিনি দেখেন না, কিছুই দেখেন না মানে সব দেখছেন – এই প্রাপ্তি তো ক্ষমতাব কারণে। ক্ষমতাকে মানুষ কদব করে — প্রত্যাশাও করে। তবে কি ওই ক্ষমতায় তিনি অতৃপ্ত ছিলেন? মানুষের ভেতর প্রভু থাকে, সেই প্রভু আরো প্রভুত্ব চায় — আবো আরো। প্রভুত্ব মানে আবো ব্যাপকের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা কবা। এই

দার্শনিক ভাবনার উত্থান মুহূর্তে বাতিল করে দিয়ে নিজেদের মন সাফ করে — একবার যখন এসে পড়েছেন তখন ভালোমানুষির প্রয়োজন নেই। তিনি এসেছেন এটাই সত্য। উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন বলে এ কথা যারা রটাচ্ছে তাঁরা তাঁকে মেনে নিতে নাবাজ অর্থাৎ তাঁব ক্ষমতাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করছে । এই বিবোধীতা কি উপেক্ষার ? সহনশীলতা তো প্রভুত্বকে খর্ব করে আর এতে প্রভুত্ব দুর্বল হয়। ভাঙ্গো এবং নিপাত ঘটাও — এই শিক্ষাই প্রভুত্বেব মর্মার্থ। গাছের পাতা আবার তিরতির কেঁপে ওঠে। তিনি চোয়াল শক্ত করলেন — না, তিনি যাবেন না। তিনি এসেছেন এটাই সত্য। এই সত্য টেকসই করা এবং প্রতিপক্ষের মোকাবেলা কবাই সঙ্গত।

প্রথম দিকে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি আসছেন — এই সংবাদ কি কবে অনেকে জেনেছিল তার তৎপবতাই অনেকেব অনুমানকে অনুমোদন কবে। পরে সঙ্গী নিয়ে বেশ আয়েশ কবে এলেন। পথে কোনো বাধা-বিঘ্ন ছিল না। যারা সাধারণ তাঁবা এটা আচমকা ও অবাক আগমন মনে করে নিজেরও যুগপৎ শংকা ও সংকোচ ছিল তাঁর আগমন যদি সংবর্ধিত না হয়। এখন সব ধীরে ধীবে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তাকে ঘিবে পক্ষ-প্রতিপক্ষ দুই শিবির। পক্ষের ওজন অবশ্য ইতিমধ্যে টের পেয়ে গেছেন। এরা সবাই দলছুট। কেউ মাত্র একা — আওয়াজে যেন একাই এক শ'। করণীয় হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা প্রথম থেকে একেবারে গোড়া থেকে যাকে বলে গ্রাসরুট থেকে শুরু করতে হবে। তাই যদি হয় নিজেকে দাখিল কবতে অচিরেই একটা সমাবেশ দবকাব। তা সমাবেশ আগে না নিজেব জন্য একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন আগে ? এ প্রসঙ্গে কারো সঙ্গে পবামর্শেব প্রয়োজনীয়তা তিনি উড়িয়ে দিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁব অভিমত অবিভাজ্য এবং অখণ্ড — সার্বভৌমত্বের মতো সম্পূর্ণ যা আদৌ হস্তান্তরযোগ্য নয়। এই যে কেউ কেউ বলছে তিনিই খাঁটি এত ভেজাল, নকল ও ভণ্ডের মধ্যে তিনি আবির্ভূত পরিত্রাতা — এটাই প্রকৃত সমাচাব। এটা প্রচারযোগ্য করে চারপাশে বিস্তার এবং তা জনমনে আস্থার কারণ তোলা দরকার। এইসব কিছু নিয়ে একটা কর্মসূচী প্রণয়ন করা যার মধ্যে থাকবে জনকল্যাণেব বিধি উদ্যোগ অথচ তা কাগুজে। এই কর্মসূচী দপ্তরে বসে ঘোষণা আকারে দেয়াব চেয়ে সমাবেশে দেযাই শ্রেয। তার যে হয় না সেটা হওযাতে হবে — তিনি যা যানেন, তা জানতে হবে। পারাব কৌশল তো তাঁব অজানা নয়। সেই ছেলেবেলা থেকে তার যে ক্রমাগত — হ্যাঁ, সহসা ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলে ফুটবল টিমের দলনায়ক। নায়ক পদে সর্বাংশে অযোগ্য তবু নাযক। প্রতিদ্বন্দী যারা ছিল কৌশলে আউট কবে তাদেব মাথাব জাগবণ স্তব্ধ করে দেন। এও এক খেলা। এই খেলা খেলে ওই বযসে পাকা খেলুড়ে হযে ওঠেন। সবাও এবং জায়গা নাও — ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, সেই ছেলেবেলা থেকে প্রিয় কাজ হয। শুধু লেখাপড়ায় সামনের সারিতে ছিলেন না — সামনেব সাবিতে যাওযাব কৌশল এই ক্ষেত্রে ছিল অজানা। মনে আক্ষেপ ছিল। এই শূন্যতা পূবণে মেধাবীদের পেয়াব করতে চাইতেন। তাঁদের সঙ্গ লাভে ছিলেন কাঙাল। তবু তাঁদের দুয়াব দিয়ে প্রবেশেব ছাড়পত্র পেলেন না। তখন তিনি একটা মেরিট প্রদর্শনে মনোযোগী হন — পুরো ব্যাপারটা ছিল প্রদর্শনের, যোগ্যতাব নয়। এব ফল হয নিয়মিত ছাত্রদের থেকে বচিত ব্যবধানে তাঁর নাম ও চেহারা কালক্রমে মুছে যায়। এখন অনুগতদেব জড়ো করে তাঁব দরবারে সৃজনশীলতা প্রদর্শনে প্রায়শই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি জানেন ক্ষমতাব পাশাপাশি (তিনি সুদর্শন নন বলে) এক্সট্রা মেরিট ক্ষমতার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিতে সহায হয়। হ্যাঁ, রপ্তকৃত চালাকি তাঁকে চাকুবীব নিচু পদ থেকে শনৈ শনৈ উপরে তুলে দেয়- শুধু ধাও শুধু ধাও উদ্দাম উধাও। এতে কাজ হয় — স্তাবকতা কি, ক্ষমতা কি, উপরেব সিঁড়িতে ওঠার পদক্ষেপ বা কি তাব আগাপাছতলা জেনে যান। উপরে উঠতে উঠতে সাধারণের সঙ্গে তার যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ: ছিঁড়ে যেতে থাকে এবং এক সময় তাঁর আশপাশে আর সাধারণ কেউ থাকে না — কেবল তিনি অসাধারণ হয়ে বিরাজ করেন। নজর আর নিচে যায় না, যেতে চায় না — ঘাড় উঁচু উঁচু আর উঁচু থাকে। এতদিনে ওই উঁচু নজর আর উঁচু ঘাড়সহ নিচে সাধারণের মধ্যে তাকে যেতে হচ্ছে। অথচ এই সাধারণ তাঁর পছন্দ নয় — তিনি এসেছেন বলে এখন সরে দাঁড়াবার উপায়ও নেই। ক'জনকে, বেশ বাছাই করে তাঁদের আহ্বান করেন তিনি। এই দপ্তর তাঁর নিজস্ব নয়। এটা কোনো দপ্তরই নয় — এখানে একটা দপ্তর করবেন বটে চামড়ার কার্পেট দিয়ে যা তিনি মাড়াবেন। উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন — এই রটনাব প্রশ্রয় ওই চামড়া দিয়ে তিনি চাপা দেবেন।

—'আপনারা জানেন, আমি সহসা চলে যাওয়ার জন্য আসি নি। যাদের নিয়ে থাকতে হবে

তাদের সামনে দাঁড়াতে চাই ?' এই তো বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছেন এমতো খুশিতে তিনি উপস্থিত জনদের একে একে মুখ পড়ে তাদের মনেব পৃষ্ঠা ধরতে থাকেন । বাঁ দিকে পাঞ্জাবি পরনে, ঘটি সাইজের ভুড়ি, ব্যাকব্রাশ চুলওয়ালার দিকে তীব্র চাউনি দিলেন । এতে ভদ্রলোক (জলো কথাবার্তা বলায় তিনি পাবঙ্গম) যেন কৃতার্থ — হাত কচলে গলে যান — 'জী' আমাদেব ওপর আস্থা মানে সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক ।'—'না' তিনি দৃঢ় কণ্ঠে নিজের স্বরের জায়গা কবে নেন । — 'আমি সরাসরি তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই।' বলে এবাব উকিল ভদ্রলোকেব (একাধিক দল করার অভিজ্ঞতা আছে) দিকে ভ্রু নাচালেন । এই গবমের মধ্যে উকিল বা এ্যাডভোকেট (কেউ কেউ তাকে এক পকেট বলে) শাদা জামার ওপর কালো কোট পরেছেন । গোল মুখ দাড়ি কামানো । তিনি মুখ খুললেন — 'আমি বলি কি, যাদেব কাছে আপনি যেতে চাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে থেকে তো আপনি আসেন নি, তাঁদের কাছে যাওয়াব দরকাব কী । আপনি এসেছেন এটাই সত্য ।' '—হ্যাঁ, এই সত্যর ন্যায্যতা আমি প্রমাণ করতে চাই।' উকিলের মুখেব ওপর যেন জজের রাগ বোষিত হয — 'আপনারা একটা সমাবেশের আয়োজন করেন।' সবাইকে বিদায় দিয়ে প্রচ্ছন্ন হাসিমুখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকান । ওপাশে একটা নিচু ফিতা সাইজ পথ । সটান কি সব গাছপালা তার নাম অনেক আগে স্মৃতি থেকে গায়েব হয়ে গেছে । তিনি মনে কবার চেষ্টাও করলেন না । এই জীবনের সাবেক আঁশ তিনি তুলে ফেলেছেন — সেই প্রেক্ষিতে নিজেকে রুয়ে দিতে পারবেন না । ভাবতে ভাবতে তাঁর নিক্ষিপ্ত নজরে আসে একটা নাড়ার চাউনি -- চালের খাবলা খাবলা খসে গেছে । উঁচু মাটির বারান্দা থেকে একটা কঙ্কাল যেন নেমে শ্লো মোশনে লতা-জঙ্গলের দিকে হারিয়ে যায় । সহসা তাঁর বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা জেগে ওঠে । তিনি বুক চেপে ধবেন । না, এটা আসল ব্যথা নয়, তাব এই ব্যথার জায়গা দেওয়ার কোনো মানে নেই । শুধু — তিনি এসেছেন, এই সত্য দিনেব আলোর মতো স্বচ্ছ করে তুলতে চান — গোটা ইউনিয়ন, ইউনিয়ন থেকে উপজেলা — সর্বত্র নিজেকে বিকেন্দ্রীকরণ করবেন । ফিরে যাবেন না, ছেড়ে যাবেন না — সরে দাঁড়ানো মানে পরাজয়, ক্ষমতাব পরাজয় । হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন — যাবেন তিনি । বাইবে নেমে এলে কমাণ্ডো কায়দায় তিন জন তাব পাশে এসে দাঁড়ায় । তিনি এখন আর একা নন । যাত্রাব নিবাপত্তা নিশ্চিত কবতে সঙ্গী আছে । তবে কি তাব নিজস্বতা বলে কিছু নেই ? তিনি একা কি গাড়ী ড্রাইভ কবেন নি ? এই প্রশ্ন জাগবিত হলে তিনি তাঁদের সঙ্গ ত্যাগেব নির্দেশ দেন । এতে ব্যাপক বিস্ময়ে তাঁরা থমকে যায় — এও কি সম্ভব ! তাঁব চাউনিতে সম্ভবত রূঢ়তা ছিলো তা দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত সরে যায় । তিনি ঘুরপথে ওই নিচু শুকনো শাদা পথ ধরে এগিয়ে চলেন । কেবল কদম ঠিকমতো ছড়ায না । হাঁটাই কি ভুলে গেছেন ? অনভ্যাসে পদযুগল জখম বোধ হয়, শুকনো একটা মাটির ঢেলা শ্লিপারেব (বেখেয়ালে এটাই তিনি পায়ে দিয়ে ফেলেছেন) নিচে পড়ে শক্ত চাপের যোগান দিলে মাথার তালু অব্দি বি রি করে ওঠে । তিনি দাঁড়িয়ে যান — নি:শব্দ পথে এ কী নাজেহাল । তার কর্তৃত্ব কি ঘায়েল হতে যাচ্ছে ? না, তিনি যাবেন ।

—'কেডা, কেডা ও ?' এক প্রৌঢ় ঘোলা পানসে চোখে, প্রাচীন শেওলা যেন সর্বাঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসেন । কে তিনি — নিজেব কী পরিচয় এই প্রৌঢ়ের কাছে তিনি দাখিল করবেন ভেবে না পেযে নিজেকে দারুণ তুচ্ছ বিবেচনা করেন । ঘাড়েব মাংসপেশী শিথিল হয়ে আসে । পীড়িতবোধে পাশ ফিবলে দ্যাখেন — খালি গা, বুক-পাঁজরে শুধু পাতলা চামড়ার পরত, পবনে ময়লা লুঙ্গি, হাঁটুব উপরে গুটানো, দু'পায়ে শুকনো কাদা — মানুষ বলে ভ্রম হয় । তুমুল কোনো আনন্দে তাঁর হলদেটে দাঁত বেরিয়ে আছে । দেখে তিনি চমকে যান — এই হাসির আড়ালে কি ব্যঙ্গ আছে, না তাঁকে উপাদেয় খাদ্য ভেবে এখন সাবাড় করার ফূর্তিতে ফাজিল হয়েছে ?

— ও আপনি আইছেন ? বাজান তুমি চিনতি পারবা না নে । ভোডে দাঁড়াতি আইছেন।' এ কথায় প্রৌঢ় তাঁর স্রেফ কাঠ-আঙ্গুলগুলো নিজের চোপসানো পেটের ওপর ঘষতে থাকেন — আপনারে দেহি নি তো কোনোদিন । শুনিছি আপনার কথা । বলে, প্রৌঢ় তাঁর হিম প্রেত ডান হাত, যে হাত দীর্ঘ দিন ঠাণ্ডা তা বাড়িয়ে দেন । বা হাত নিজের পেটে স্থাপন করে যথারীতি বুলিয়ে যেতে থাকেন । এই হাত তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না । এই হাত তাঁর ভেতর ত্রাস এনে দেয় । হাত গ্রহণ করতেই সর্বাঙ্গ তাঁর শিউরে যায় । পরমুহূর্তে মধ্যপেটে কোলাহল জেগে ওঠে — সমস্ত স্নায়ুতে টান পড়ে — নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ যেন দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছে । প্রায় দৌড় চালে তিনি ফিরতে থাকেন । 'সাবান, কুইক সাবান' — গোটা পরিপ্রেক্ষিত কাঁপিয়ে চূড়ান্ত স্বরে আদেশ জারী হয় । এখন সাধারণের হাত ধুয়ে ফেলতে তিনি মরিয়া ।

ভাস্কর চৌধুরী

জামশিদের মৃত্যু দর্শন

জামশিদদের উপর যুদ্ধ এসেছিলো ভয়ানক প্রমত্ত গতিতে ।

নদী দিয়ে ঘেরা নবাবগঞ্জ শহর । সে নদীর নাম বড় মধুব । মহানন্দা । কিন্তু জামশিদ এ্যাতো মধুর জীবন পায় না । বালি মাটির মানুষ । নদী ভাংলে বুকে কাঁপন ধরে । এই বুঝি বাপেব বেখে যাওয়া বিশ বিঘা ফসলের জমিন সহ পোড়াগাঁ ভাংলো । কিন্তু শেষ অবধি ভাংগেনি । ভাংগেনি সত্য । কিন্তু এমনই গ্রাম যে, এ গ্রামে কোনদিন বিজলীবাতি জ্বলবে, মোটর গাড়ী চলবে এমন আশা একশো ভাগই বৃথা । এ ব্যাপারে দিয়াড়ার মানুষ জানে । যেমন জ্বলবে না বিজলীবাতি । তেমনি দিয়াড়ায় সিনেমাটকি আসবে না, এ গ্রামকে গ্রাস করবে না শহুরে মানুষ । এটাও জামশিদ জানে । খুব বেশী হলে তার এলাকায় ছেলেরা যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে শহরবাসি হবে তারা । মাঝে বউ বাচ্চা নিয়ে দিয়াড়ায় ফিরবে এটুকুই আশা করা যায় ।

যুদ্ধ যখন বাধে এক তরফভাবেই বাধে । পকিস্তানি সৈন্য যখন শহরগুলো গুড়িয়ে দিয়ে শহরগুলো দখল করে তখন প্রথমে সমস্ত দোকানপাট খুলে দিয়ে লুটপাট করায় । লুটপাটে অংশ নেয় স্থানীয় অবাঙ্গালী আর তার চোর শ্রেণীর বাঙ্গালীবা । তখন পাকিস্তানী সৈন্য ওদেব ছবি তোলে । বাইশ কোপেরও ছবি তোলে তারা । শহর দখল হলে যখন তারা নিজেদের অবস্থান ফিটফাট কবে ফ্যালে তখন আশপাশেব গ্রামে হানা দিয়ে মুবগী, পাঁঠা এবং কচি মেয়ে ধবে আনে । এসব গল্প জামশিদ শুনেছে । আর দেখেছে দূরে থেকে আগুনের শিখা । ডর লেগেছে তার । পবে শুনেছে, গ্রামে আগুন দিয়ে আগে লোক বাইবে আনে বাতে । আর মানুষ বাইরে এলে ব্রাশ ফাযাব কবে । বেছে বেছে কচি মেয়েদের মুরগী ভেবে শেয়ালের মত তুলে নিয়ে যায় । তখন জামশিদ বলেছিলো, হামাব দিযাড়ায আর্মির বাপও আসিবে না । আসিবে ক্যামনে ? নদী আর বান, এছাড়া হামার দিয়াড়ায় আছেটা কী ?

'৭১-এব আগষ্ট মাসে বন্যাটা চরমরূপ ধারণ করে । সমগ্র দিয়াড়া আর নবাবগঞ্জ বন্যায় ভাসে । নদীর জল দিয়াড়া আর নবাবগঞ্জ শহরকে এক বাঁধনে বাঁধে । বান দেখে পাঞ্জাবী ডরায় । বলে গ্রামের লোক । পাকিস্তানীরা নিজেদেব বাঙ্কারে ঢুকে পড়ে । আর তখন নৌকায় মুক্তি যোদ্ধাবা তাদের অভিযান জোরদার করে । মারা পড়ে পাকিস্তানীরা ব্যাপকভাবে । আর ফেরার পথে মুক্তি যোদ্ধারা জামশিদদের বাড়িসহ আশেপাশের গ্রামে খাবার খায় । তারপর আরেকটা আক্রমণের অপেক্ষা কবতে থাকে । এই অপেক্ষার মাঝে মাঝে তারা স্থানীয় লোকদের বোঝায়, পাকিস্তানী আর্মি কিভাবে নাবী ধর্ষণ করে, তারপর ধর্ষিত নারী গর্ভবতী হলে তাকে গুলী করে মারে কুকুর-বিড়ালেব মত । কিভাবে গ্রামকে গ্রাম তারা পুড়িয়ে দেয় সে সব বর্ণনা করে । তখন মসজিদের ঈমাম বলে, বাবারা তোমাদের বর্ণনা সঠিক । ওদের মাইরো । তবু পাকিস্তানটা যেনো টিকে । বড় কষ্টে পাকিস্তানখানা পাইছিলো বটে মুসলমানেরা । জিন্নাহ সাবে বানাইছিলো । ছেলেরা বলে হুজুর পাকিস্তানের পক্ষে ৩৫ সালে ভোট বাঙ্গালিই দিয়েছিল । আপনার সাধের পাকিস্তানিরা দেয় নাই । খবর লইয়েন । এখন শেখ মুজিবের হাতে ভুট্টো সাহেব তার পশ্চিম পাকিস্তানকে তুলে দিবে না বলেছে ।

: বলেছে নাকি হারামির পয়দিস্ ?

এসব কথা মুক্তিযোদ্ধারা বলেছিলো জামশিদের বৈঠকখানায় বসে । আমরা হুজুর বাঙ্গালী । যুদ্ধ করছি স্বাধীনতার জন্যে । এখন ওরা হারলে পাকিস্তান আর বাংলা এক সাথে টিকে ক্যামনে ? আপনার কী স্বাধীনতায় ভালো লাগে না ?

লাগে, বাবা লাগে । অস্ত্রের দিকে চেয়ে বলে, মৌলভী সাহেব, স্বাধীনতা বড় সুখের

জিনিস । জিন্নাহ একবার আনিলো । বড় শাস্তি লাগিলো । হিন্দুর হাত হইতে বাঁচিলাম ।

: কি কন মৌলভী সাব, বৃটিশ থাইকা বাঁচিলেন তো উল্টা কথা কন্ ।

: বারাইয়া গেলো বাবা । মাফ কইরো, বুড়ো মানুষ । *পুরানা লোক । হারামির পয়দিস্ ইয়াহিয়া* কি কামটা করিলো, আল্লা-মাবুদ জানে, এমন ফ্যাকড়া ফ্যাসাদ লাগাইয়া দিলো আল্লা মাফ করুক, হারামিটা নামি মাইয়া মদে ডুইবা ঈমান হারাইছে বটে, তো বাবারা যুদ্ধটা কর ।

: দোয়াটা ঠিক রাইখেন আমাদের দিকে ।

: করিবো বাবা ধনেরা । এদিকে কদাপি পকিস্তানি সৈন্য আসিবে না । বাবা এগর নাম রামদিয়াড়া ।

ভুল ঐ একখানা করেছিলো মৌলভী সাব ।

বন্যা নেমে গেলে জামশিদ যখন ভোব রাতে কলাই ক্ষেতে মাসকলাই বুনতে থাকে তখন দুমদুম শব্দে কেঁপে ওঠে দিয়াড়াব জমিন । সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে । নারায়ণপুর আর পোড়াগাঁ গ্রামে । একটানা এক ঘন্টা ।

জামশিদ দৌড়ে যায় । আগুনেব লেলিহান শিখার ভেতব থেকে কেবল বেরিয়ে আসতে পারে তার ভাই আমিব আর ছেলে আলাউদ্দিন । জামশিদেব বৌ ছিলো আট মাসের পোয়াতি । সামনের বাড়ি ছিলো বন্ধু সুলাইমান গায়েনের । আব পাশেব বাড়ি ছিলো গোপাল নাপিতের ।

যখন সব কিছু পোড়া শেষ হয় তখন আগুন পোড়া মৃতদেহগুলো বেঁচে থাকা গ্রামবাসী একসঙ্গে কবে । তখন আব কেউ বুঝে উঠতে পারে না । কোনটা গোপালের বৌ-বাচ্চা আব কোনটা সোলাইমানেব বউ-বাচ্চা । জামশিদের এক মেয়ে, স্ত্রী, আর এক ছেলে, পোড়ার ভেতব জমা হয । একাকাব হয সব । পেটের বাচ্চাটিকে এখন মাংসপিণ্ড মনে হয । গ্রামেব জামে মসজিদের মৌলভী বলে, কে হিন্দু আর কে মুসলমান যখন বুঝা গেলো না, সকলেই শহীদ । ঢালা কবর দিও । সন্ধা পাব হলে জামশিদ যখন মাটি খুঁড়ে সকল লাশ একটা ডোবায ফেলে মাটি চাপা দেয গ্রামবাসীর সঙ্গে তখন চোখে শুকনা বাষ্প তাব ।

স্ত্রী, কন্যা, পুত্র সোলাইমানেব পবিবাবসহ গ্রামেব মানুষ আব ঘরবাড়ি হারিয়ে জামশিদ যখন গ্রামে ফেবে তখন গ্রামের নিজের ভিটে চিনতে পাবে না সে । পাশে আমিব ছিলো । বলে, ভাইজান শান্ত হন । সব পাওযা যাইবে ।

: যাইবে নাবে । আব কেহ ফিবিবে না ।

এই আর্তনাদ দিযাড়াকে বিদীর্ণ করে ।

পোড়াভিটায টিনগুলো তুলে ফের জামশেদ ঘব বাঁধে । আমিবকে বলে, যা যুদ্ধে যা । সুলাইমানকে দেখলে কইস, বাঁইচ্যা আছি । সে যেনো তার কাজ করে ।

: তুমি যাবা না ?

: না । হামাব যাওয়া হবে না । হামি যুদ্ধের শেষখান দেখিবো ।

সেপ্টেম্বর মাসেব প্রথমদিকে যুদ্ধটা প্রচণ্ড গতি পায় । বাড়ি পোড়ার পরের দিন নদী পেবিয়ে সৈন্য এসেছিলো । তাবা পোড়াগাযের শেষ মাথায় নারায়ণপুরের ক্যাম্প বাঁধে । তারা আসার পরের দিন গ্রাম থেকে তরুণদেব ক্যাম্পে ডাক পড়ে । তাদেব দিযে তিনদিন ধরে ক্যাম্পের চারদিকে বাঙ্কার কাঁটে পাকিস্তানি সৈন্য ।

মাঝে মাঝে মৌলভী সাহেব গ্রামে খবর দেয়, ফেবেশতার দল আইসছে বটে । ম্যালা কেতাব ফেরাশতার বর্ণনাব সাথে মিলে যায । হাযবে তাক্‌ত । আল্লা দিযাছে বটে । হামাদের ছেলে গুলানকে হেন্দুদেব গরুগুলান জবাই দিযা খাওয়াইলো ।

: আপনি খাইলেন হুজুব ?

: তা খাইতে হইল বটে । জিয়াফাৎ খাইতেই হইবে ।

: কিছু পুছাইলো ?

: তমন নয । এই মুক্তিরা কুনঠে থকিতো কে কে গেছে গাঁ থাইকা এইসব আর কী ।

: কইলেন ?

: মিথ্যা বলা গুন্‌হা বাবারা । মিথ্যা কইতে পারিনি ।

: তো সব কইলেন ?

: মিথ্যা কইনি ।

নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় জামশিদের ডাক পড়ে মসজিদে । জামশিদ এই কয়দিনে বুড়ো হয়ে গেছে । কুঁজো হয়ে হাঁটে ।

: আজ কাল নামাজে আসো না জামশিদ ? ইবাদত কি বাদ দিলা ? মৌলভী আরম্ভ করে ।

: শরীলে বল পাই না হুজুর ।

: বল হইবে । বল হইবে । অপেক্ষা কর একটু । মাগরিগখানা পইড়া লও জামাতে ।

জামশিদ জামাতে নামাজ শেষ করলে, মৌলভী বলে, বইসো জামশিদ । কথা আছে ।

জামশিদ বসে থাকে ।

: দুনিয়াটা কি আজব কওতো বাবা জামশিদ ।

জামশিদ তাকায় মৌলভীর দিকে ।

: দ্যাখ হাজার মাইল থাইকা আইসা বনে বাদাড়ে দ্যাখো, পাকিস্তানেব লোকে দেশ রক্ষা করতে আইলো । হা হামরা তাদের মারি ।

জামশিদ কিছু বলে না ।

: কিছু কচ্ছো না যে ?

: হুজুর, ঐ সৈন্যগুলান যাদের দিয়া খাল কাটাইলো, তাদের নদীর পারে রাইতে লাইন দিয়া মারিলো । এটা কুন ধরণের মরণ হুজুর । শহীদের দরজাখান পাইবে না ?

: এটা হামাদের পাপের ফল । দেশ ভাংলে কি মানুষ বাঁচার দাম আছেরে বাবা ? তখন দু'জন সৈন্য আসে ।

: জামশিদ হ্যায় কি নেহি মৌলভী সাব ?

: হ্যায় হুজুর ?

মৌলভী বলে ইসকো লে যাইয়ে ।

তখন জামশিদকে দু'দিক থেকে দুই হাত শক্ত করে ধবে দুই সৈন্য নিয়ে যায়, মৌলভী বলে, যাও জামশিদ, কোন ভয় নাই, খারাপ কিছু হবে না । এরা ভালো মানুষ । রোজ রোজ মুরগী খাওয়ায় হামাকে । তুমিও খাইবা ।

: নেহি নেহি কুচ বরি বাত নেহি । হামারা ক্যাপ্টেন সাব বহুত আচ্ছা আদমি ।

রাতে চোখে পট্টি বাঁধে জামশিদের । তারপব গরুব গাড়িতে তোলে । জামশিদ নদী পাব হয় । তারপর একটা মোটর গাড়িতে উঠতে হয় তাকে ।

প্রায় এক ঘন্টা চলে গাড়িটা । চারদিকে রাত ঝুমঝুম করছে । কোথাও মানুষের শব্দ নেই । শুধু জীপে একজন বাংলা ভাষায় বলে, জামশিদ মিঞা, হুজুর সাব কিছু জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক উত্তব দিও । উপকার হবে তোমার ।

মোটর গাড়ী থামে ।

একজন কেউ শক্ত জুতোর লাথি দিয়ে জামশিদকে গাড়ি থেকে ফ্যালে । জামশিদ পড়ে পাকা শানে । সেখানে তাকে একজন উঠায় ।

: সামনে যাও ।

খাঁটি বাংলা শোনে জামশিদ ।

: কুনঠে ?

: আরি, আরি, নাক বরাবর যা বাবা ।

বাংলা শুনে আশ্বস্ত হয় জামশিদ । বাঁধা চোখে অন্ধকার । হেঁটে একটু আগে গেলেই ধাক্কা খায় দেয়ালে ।

: শালা ঘর চিনে না । পর চিনে খুব । এই শুনে একটা লাথি খেয়ে সোজা ঘরের ভেতর পড়ে সে ।

: তোল্ । আহ । এতো জোরে মারতে তো বলিনি । বুড়া মানুষ । ব্যথা পেয়েছে ।

তোল, তোল্ ।

তোলে তাকে ।

এবার অপেক্ষার পালা । শব্দগুলো দূরে সবে যায় । নি:ঝুম অন্ধকার । নি:ঝুম হয়ে ওঠে সব । পাশ থেকে স্পষ্ট শেয়ালের ডাক শোনা যায় । সঙ্গে সঙ্গে কুকুব ডেকে ওঠে । সে শব্দেব প্রতিক্ষায় থাকে ।

এক সময় জীপের ঘর্ঘর শব্দ এগিয়ে আসে । জীপ থামাব শব্দ আসে । খটাখট্ পা শানেব উপর পা ঠোকার শব্দ অন্ধকার আর নৈ:শব্দকে চিরে দেয । বুটেব শব্দ ধীবে ধীরে তাব পাশ দিযে যায় । ফের বুটের শব্দ ধীরে ধীরে তার সামনে ফিরে আসে । সে শব্দ ফেব দূবে যায় । ফের ধীবে ধীরে শব্দটা তার সামনে এসে থামে ।

: ঐ কৌন কিয়া । আঁখ খোল দো ।

জামশিদের চোখের পট্টি খুলে যায় । ভীষণ কড়া আলো চাবদিক থেকে তাব চোখে লাগে । জামশিদ চোখ কচ্‌লায় ।

: মেরা নাম কর্ণেল জারওয়ারী । আপ কা নাম জামশিদ হ্যায কি নাহি ? আপকা নাম ?

: জামশিদ হুজুর ।

: আপতো আচ্ছা আদমি হ্যায় । ডর বুরা আদমি কেলিযে । আপকা ডাব লাগে গা ?

জামশিদ চুপ থাকে ।

: তোমাকে হুজুর বলছেন তুমি ভালো মানুষ । মন্দ মানুষ ডব কবে । তোমাব কি ভয কবে ।

ফের উর্দুতে কর্ণেল কিছু বলে ।

পাশের জওয়ান লোকটা বলে, হুজুর বলছেন, কিছু খেযেছো ? মাথা নাড়ে জামশিদ ।

: খাওনি ?

: দ্যায়নি ?

: না হুজুব।

: কুচ্ নাহি দিয়া ? হারামজাদে ? কুত্তাকা বাচ্চে, খানা লাও কর্ণেল গর্জে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে খানা হাজির হয় । কর্ণেল খাদ্য বহনকাবীর পাছায একটা বেত মাবে, হাবামজাদে, উসকো খানা নাহি দিযা ?

: হুজুব বলছেন, কেনো তোমাকে খাবার দেযা হযনি । তাব জন্যে শাস্তি দিলো । এবাব খাও ।

আশ্বাস পেয়ে জামশিদ খাবারে হাত দেয । এতোক্ষণে প্রচণ্ড ক্ষুধাও যেন লকলকিযে ওঠে । সে রুটিখানা ডালে ভিজিয়ে মুখে তুলে । হাতটা ঠোঁট ছোঁটা মাত্র পাশ থেকে একজন জামশিদের হাতে মারে । খাবার ছিটকে পডে মাটিতে ।

এভাবে তিনবার ওবকম ঘটলে কর্ণেল সহেব গর্জে ওঠে, আপ লোক ভাগ যাও । জামশিদকো খানা আরামশে খানে দোও ।

এবার জামশিদ খাবারের হাত দেয় সঙ্গে সঙ্গে লাথি পড়ে হাতে । বোক্কো ।

কর্ণেল গর্জে ওঠে । কৌন শালে ইযে কিয়া উনকো পোঁন্দমে ডাণ্ডা ডালো । ইযে লোগ মেহেমান হ্যায় কি নেহি ?

: কর্ণেল সাহেব রেগে গেছেন, বলছেন তুমি ভালো মানুষ, আমাদেব মেহমান । ঐ শালা শয়তান বাঙ্গালী সৈন্য গুলান তোমাকে খেতে দিচ্ছে না । বলে বাঙ্গালী সঙ্গী ।

জামশিদের ক্ষুধা তৃষ্ণার সামনে খাদ্য দেখে বেড়ে চূড়ান্ত পর্যাযে ওঠে । তাড়াতাড়ি ফেব খাবার খেতে যায় জামশিদ । এবার থামার কর্ণেল নিজে । সামনে থেকে খাবাব থালা তুলে নিয়ে যায একজন ।

ক্ষুধা আর পিপাসা এক সঙ্গে লক্‌লকিয়ে ওঠে ।

: বলো জামসিদ, সুলাইমান তোমার কে ?

: আমার বন্ধু ।

: সে কোথায় ?

: জানি না হুজুর। সে গাঁয়ে নাই।
: তুমি জানো। কিন্তু বলছো না
: সে যুদ্ধে আছে।
: এইতো তুমি জানো।
: শুনেছি হুজুর।
: তুমি তাকে যেতে বলেছো ?
: সে নিজে গেছে
: তুমি জানতে সে যাবে।
তখন জামশিদ চুপ থাকে।
: চুপ কিঁউ ? শালে ই বাত তুমনে বুলা।
: জি হুজুর।
: সুলাইমান এখন কোথায় ?
: জানিনা হুজুর।

তখন একটা ড্রাম গড়াতে গড়াতে তার সামনে আসে। দু'জন পাকিস্তানী সৈন্য ড্রামটা উল্টে ধরে। একটা মানুষের দেহ তার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ে।

: এ লোকটা কৌন ? ইসকো পোহচেনতা আপ ?

ভালো করে তাকায় জামশিদ। সারা দেহে সিগারেটের ছ্যাঁকা। যোন্মা গলে গলে ঘা হয়েছে।

চোখে চোখ পড়ে। জ্বলজ্বলে সেই স্বপ্নময় চোখ।
: চুপ কেনো ? বল কে এটা ?
: চিনি না হুজুর।
: এটা সুলাইমান গায়েন না ?
: না হুজুব।
আবার পেছন থেকে লাথি পড়ে। উল্টে যায় বুড়ো জামশিদ।
: ইয়ে কাম কিয়া কৌন শালে, বুড্ডা কো মারা ?
কর্নেল গর্জে ওঠে।
: রোক্কো। কান ফাঁক কারকে শুনলো জামশিদ, ইয়ে সুলাইমান, তুমহারা দোস্ত হ্যায়।
: না হুজুর।

এবার কর্নেল আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে বলে, তো ই শালা কৌন হ্যায় ? মজনু হ্যায় ? পাগলা হ্যায় ? তো উসকো আগ্ মে ডাল দো। ডাল দো শালে পাগলা কুত্তেকো।

কুত্তে কিয়া কাঁহা ?
: ও বলেছে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে।
: আউর ?
: ও বলেছে সে অভয়া ব্রিজ ভেঙ্গেছে।
: আউর ?
: সে বলেছে, সময় পেলে সে আরো ভাঙবে।
এরপর বাঙ্গালী সঙ্গীর সঙ্গে কর্নেল জারওয়ানী কিছুক্ষণ কথা বলে।

তারপর জামশিদকে দু'জন সৈন্য হঠাৎ চ্যাংদোলা করে ড্রামের ভেতর ঢুকিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দ্যায়। তারপর দু'জন সৈন্য হাতুড়ি দিয়ে মাত্র এক মিনিটের জন্যে ড্রামটা পিটায়। বিকট শব্দে অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।

এবার ড্রামের ঢাকনা ওঠে। মাল ঢালার মত ঢেলে দেয়া হয় জামশিদকে। তখন জামশিদের কান ফেটে রক্ত ঝরছে। সে চোখে আলো দ্যাখে না। সবকিছু হলুদ রঙ্গ ধারণ করে। মাথা চেপে বসে থাকে জামশিদ। জামশিদকে কর্নেল বলে ফের, ইয়ে সুলাইমান হ্যায় কি নেহি ফাইনাল কাঁহো ?

তখন কর্নেলের নির্দেশে জামশিদের সামনে থেকে ভাঙ্গা চোরা দেহের সোলাইমানকে পায়ে

শেকল বেঁধে নিয়ে যায় ।

পরপর তিনটে চেয়ার । মাঝখানে কর্নেল । একপাশে বাঙ্গালী সঙ্গী । আর অন্যদিকে জামশিদকে এনে বসানো হয় । তার আগে পুবো এক ঘন্টা সম্পূর্ণ অন্ধকাবে একা পড়েছিলো জামশিদ । কোন শব্দও পায়নি । এতোক্ষণ ওরা কোথায় ছিলো । তাও সে ধবতে পারে না ।

এখন সামান্য হ্যারিকেনের আলোতে পায়ে শেকল বেঁধে সুলাইমানকে আনা হয় । খুব সহজেই চারজন সৈন্য সুলাইমানকে শূন্যে তুলে একখানা পা চেইন দিয়ে সামনে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় । পাশে রাখে হ্যারিকেন । চার্দ্দিকে ঝিমঝিম করছে অন্ধকাব । শেয়ালের চিৎকার মাঝে মাঝে ভেসে আসে । চারজন সৈন্য বিভিন্ন রকম অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে ।

বাঙ্গালী লোকটা একটা কাগজ বের করে পড়ে ।

অভিযোগ : (১) সুলাইমান গায়েন অভয়ার ব্রিজ ভেঙ্গেছে । তাতে মানুষের চলাচল বন্ধ ।

কর্নেল বলে, পা কাট দো ।

সঙ্গে সঙ্গে সুলাইমানের একটা পা কাটা পড়ে । এখন জীবন্ত সুলাইমান গাছের ডালে ঝুলতে থাকে ।

ব্রিজ দো-ফাঁক হো গায়া । ইস বার পাকিস্তান ভাগ কারনেকা ফযসালা হোগা । ইসকা ছাল ছিলকার নিমক লাগাদো ।

অন্ধকারে তাকে তোলে ক'জন সৈন্য । জামশিদ গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে ।

জামশিদ জী। দোস্তকো কবর মে ডাল দো ইয়ে বড়া সোওয়াব কা কাম হ্যায় ।

জামশিদ তাকায় । তখন চামড়াহীন একটা দেহ ঝুলতে দ্যাখে সে । মাথা নাই । শক্ত হয় জামশিদ । ধীরে ধীরে ওঠে । কোদাল হাতে তুলে গর্ত করে । তাবপর নিজ বন্ধু সুলাইমান গায়েনের মাটিতে পড়ে থাকা চামড়া ছাড়ানো দেহ মাথাসহ কবরে ফ্যালে । তারপর ধীরে ধীরে যত্ন করে মাটি চাপা দেয় । মাটি চাপা দিতে দিতে সে নিজে এক সময় ডানদিকে ঢলে পড়ে ।

কায়েস আহমেদ

লাশকাটা ঘর

মানুষটা কালীনাথ বড় চুপচাপ।

তবে কাজের লোক। ছোট-বড় যে কোন কাজ বড় মনোযোগের সঙ্গে করে। বড় কাজ করার সুযোগ অবশ্য তার জীবনে আসেনি কখনো।

'চিন্তাহরণ মেডিকেল স্টোর'-এ ওষুধ বেচে আর মিকশ্চার তৈরী করেই তার তিরিশ বছর কেটে গেলো, ২৫ বছর বয়েসে ঢুকেছিলো এখানে, এখন চুল দাড়ি পেকেছে, চামড়া কুঁচকেছে, গাল মুখ ভেঙেছে, কপাল চওড়া করে টাক পড়েছে, মানুষটার স্বভাব বদলায়নি। আগে ধুতির ওপর হাতে-কাচা হাফ শার্ট পরতো, ৬৪'র দাঙ্গার পর ধুতি ছেড়েছে, এখন তার নিত্যদিনের পোশাক শার্ট পাজামা।

হাফ শার্ট পরা মানুষ বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। কালীনাথ আজো হাফ শার্ট পরে। এর দ্বারা অবশ্য তার বৈশিষ্ট্য সচেতনতা বোঝানো হচ্ছে না। অনেক কিছুর মতোই এটা তার স্রেফ অভ্যাস।

চিন্তাহরণ মেডিকেল স্টোরে তার চাকরী করাটাও যেনো অভ্যাস। রোজ সকালে টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে এসে দোকানে ঢোকে।

রাস্তাঘাটে কতো ধরনের বগড় হয়। না হোক, হাঁটতে হাঁটতে মানুষ এদিক ওদিক তাকায়ও তো। কালীনাথের ওসব নেই। বাড়ী থেকে মাথা হেঁট করে এই যে বেরুলো আর তোলবার নামটি নেই। একেবারে সোজা এসে দোকানে। যেনো দম দেওয়া পুতুল। মেকাররা যেমন তৈরী করে দিয়েছে ঠিক তেমনটি। খদ্দের এসে হয়তো বললো : 'লারগ্যাকটিল সিরাপ' আছে? যদি থাকে কোন কথা না বলে আলমারী থেকে ফাইলটি বার করে এনে কাউন্টারের ওপর রাখে। যদি না থাকে, বলবে : 'নাই।'

'নাই' শব্দটি শুধুই একটি ধ্বনি, চোখেমুখে কালীনাথের কোন অভিব্যক্তি ফোটে না। খদ্দের যদি বলে : 'কোথায় পাবো বলতে পারেন?'

কালীনাথ এবার আর মুখে বলবে না, মাথাটি খুব সংক্ষিপ্ত নাড়িয়ে জানিয়ে দেবে সে জানে না।

হয়তো কালীনাথ হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দেওয়া খুপরীটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিকশ্চার বানাচ্ছে দোকানের মালিক ললিতবাবু কোন ব্যাপারে হয়তো ডাকলেন।

কালীনাথ কোন জবাব না দিয়ে খুপরী থেকে বেরিয়ে এসে ললিতবাবুর মুখের দিকে তাকাবে। ললিতবাবু কোন কথা জিজ্ঞেস করলে অতি সংক্ষিপ্ত জবাব অথবা মস্তকের হাঁ বা না বাচক মুদ্রা দেখিয়ে আবার খুপরীর ভেতর ঢুকে গিয়ে আপন কাজে মগ্ন হয়ে যায়।

মিকশ্চার বানানোর কাজটা তার অবশ্য সারাদিন করতে হয় না। বিকেলবেলা ৫টা থেকে ৭টা এই দু'ঘন্টার জন্যে ডা: আব্দুল হান্নান এসে বসেন। (তার জন্যে একপাশে আর একটা খুপরী আছে।) তখন কালীনাথকে ইনজেকশন ফোঁড়া, মিকশ্চার বানানো — এইসব টুকটাক কম্পাউণ্ডারীর কাজটুকু করতে হয়।

এই সময়টা ললিতবাবু নিজেই খদ্দের সামলান। তবে মিকশ্চার টিকশ্চার আজকালকার ডাক্তাররা দেয় না বড় একটা। ইনজেকশন আর পেটেন্ট ওষুধই চালায়।

ইনজেকশন ফোঁড়ার জন্যে রুগী প্রতি দু'টাকা। এই টাকাটা কালীনাথের উপরি আয়। কাছাকাছি সিরিয়াস রুগী হলে অবশ্য বাড়ীতে গিয়ে ফুঁড়ে আসতে হয়। কাজটা কালীনাথের মোটেই

পছন্দ নয়, তবু বাধ্য হয়ে যেতে হয় অনেক সময়।

স্বামীর এই অপছন্দেব ব্যাপারটা গিরিবালার কাছে নিতান্তই অপরাধের। গিবিবালা বলে : বজ্জাতি।

'হাবাইত্তা মিনসা কি কম! মিটমিটা শযতান। কারুর সুখ চায় না। খালি নিজেরটা বোঝে। ক্যান, কি এমুন জমিদার খান অইছ যে মনুষের বারিত্ গিয়া ইন্‌জিশন দিলে মান হইয়া যাইবো? আহা মানঅলারে, গোয়ার নাই চাম রাধাকিষ্ট নাম হুঁ: !'

চ্যবনপ্রাস খেতে খেতে নিশিকান্ত বলে : 'মানুষটাবে একটু শান্তিতে থাকতে দিবো না, রাইত দিন' .... বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে পারে না, তার মুখের চামড়া দলামোচা কাগজের মতো কুঁচকে যায়, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, গলার রগ ফুলে ফেটে যেতে চায়। বিছানাব ওপর বসে বসে প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় টালমাটাল নিশিকান্ত নুয়ে নুয়ে পড়ে।

হৈমবতী স্বামীর পিঠে এক হাত বুকে এক হাত রেখে বুলোতে থাকে। পেটের ভিতর সাত মাসের সন্তান পিতার কাশির শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'কতো কই বালো দেইখ্যা এ্যালাপাথি ওষুধ খাও, ডাক্তাব দ্যাহাও, তা না কি ছাতার এক চব্বনপাস পাইছে' — রাগে দুঃখে মমতায় তাব কথা ভিজে চপচপে হয়ে জড়িয়ে যায়।

নিশিকান্ত'ব কি হয় কে জানে, তার কাশির ঝড় থেমে আসে, বিছানাব ওপর হাতে ভর দিয়ে একদিকে ঘাড়-মাথা হেলিয়ে সে মুখ হাঁ করে শ্বাস নেয, তার তোবড়ানো বুকটি বেগে ওঠানামা করে, আর সেখান থেকে একটানা ঘড়ঘড়ানি নিয়ে হোঁ .... হোঁ .... শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে নিশিকান্তব মুখ দিয়ে।

হৈমবতী ধীরে ধীরে স্বামীকে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করতে থাকে। বাতাস করতে কবতে সারি সারি ঘুমিয়ে থাকা ছেলেমেয়েদেব দিকে এক পলক তাকিয়ে দুর্জ্ঞেয কাবণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে মনোযোগী হয় আবাব।

এই সময হৈমবতী সাইকেলেব শব্দ পায। মনোতোষ মাস্টাব প্রাইভেট পড়িয়ে ফিবলো। পাবেও লোকটা। সকালবেলা বাজাব-হাট করে দিয়ে এক ঝাঁক ছেলে পড়িয়ে স্নান খাওয়া-দাওয়া ক'রেই স্কুলে ছোটে, দুপুরে একবার খেতে আসে, তাবপব এই রাত সাড়ে দশটায ফিবলো। এব মধ্যে আবাব রাজনীতিও কবে।

ঘবে বাইরে লোকজনকে মহা উৎসাহে তাব বাজনীতি বোঝায, কতো কি যে বলে, ও ছাইভস্ম বোঝেও না হৈমবতী শুনতেও চায় না।

নিশিকান্ত পার্টি-ফার্টির ধার কাছেও নেই, কিন্তু রাজনীতির আলোচনায বড় উৎসাহী। চাকরী করে সাধনা ঔষধালয়েব এক ব্রাঞ্চে। প্রত্যেকদিন দোকানে বসে খববেব কাগজটি তার পড়া চাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বলে :'হ:, হ্যারা কববো রাজনীতি! নেতা আছিলো দেশবন্ধু, নেতা আছিলো সুভাষ বোস, গান্ধী। খালি চিককুর পারলেই যদি নেতা হওন যাইতো' ... কাশির ধমকে মাঝপথেই থামতে হয তাকে।

একটু দম নিয়ে নিশিকান্ত স্ত্রীকে বোঝায় :'বুঝলানি, ওই মন্‌তোষ মাস্টাবেব সমাজতন্ত্র, ওইসব অইলো গিযা বুলি, এক হালারে বালো মনে কবো তুমি? সব খালি বোচকা মাবনের ফন্দি।'

হৈমবতী দেশবন্ধু, নেতাজী, গান্ধী কাউকেই চেনে না, বাজনীতির অতো ঘোবপ্যাঁচও বোঝে না, কিন্তু সে মনোতোষ মাস্টাবকে চেনে, হাসি খুসী মানুষটা, মনে কুনো কালি নাই, ঠ্যাকা বেঠ্যাকায দুই দশ টাকা পাওন যায়।

— 'মন্‌তোষ মাস্টারের কথাগুলো তো খারাপ না।'

— 'আহ্, খারাপ তোমারে কইতাছে কে, কিন্তু কবনের লোকটা দেহাও।'

— 'হ, তোমার লগে অহন আজাইরা প্যাচাল পারি। আমার খাইয়া কাম নাই' হৈমবতী ঘাড় টান করে সংসার সামলাতে উঠে যায়।

মনোতোষ মাস্টারের স্কুলের বেতন এবং ছেলে পড়িয়ে মাসিক আয় হাজার দুয়েক টাকার মতো। সংসারে মানুষ বলতে স্বামী-স্ত্রী আর ছোট দুটো ছেলে-মেয়ে। গ্রামেব বাড়ীতে বাপ আছে, ডাক্তারী করে, জায়গা জমি দেখাশোনা করে, মামলা মকদ্দমা সামলায়। সম্প্রতি বোনটি বিধবা হয়েছে, তাকে কিছু কিছু করে সাহায্য করতে হয় এই যা।

হৈমবতী মনোতোষের স্ত্রী জয়াকে বলে, 'তোমার চিন্তা কি, তোমার ছোট পরিবার সুখী পরিবার, আমাগো অইলো গিয়া হুয়োরের পাল।' হাসতে হাসতেই বলে হৈমবতী। কিন্তু জয়ার মুখ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে যায় : 'হ, মানুষ বাইর থেইক্যা ওইটাই দ্যাখে।'

হৈমবতী এতোটুকু হয়ে যায় : 'আমি কিন্তু কিছু ভাইব্যা কই নাই, মনে কষ্ট নিও না।' জয়ার মুখ-ভার তবু কাটে না। হৈমবতী সে দিকে তাকিয়ে বলে : 'না, কাম পইরা রইছে, উঠি।'

মনে মনে হৈমবতী জ্বলে : 'মাগীর গাও ভরা হিংসা। বিধবা ননদরে মাসে ছয় মাসে ৫০/১০০ দিতে অয়, তাতেই বুক ফাটে, স্বামী তো এদিকে শুনি ধইন্যা না শ্যামপুরে জমি রাখছে তিন কাঠা।'

রাতের বেলায় শুয়ে শুয়ে নিশিকান্ত বলে : 'বুঝলা শিবুর মা, এইসব ওইলো তোমার গিয়া বিজনেস, বুঝছো, মহাজনরা যেমুন চাইল ডাইল মজুত কইরা বাজারে দাম বারায়, সুযোগ বুইজ্যা চরা দামে মাল বেচে, এ-ও হেমুন! জাগা জমিনের দাম বারতাছে, অহন সস্তায় কিন্যা থুইলো, দুই তিন বছর থাউক না পইরা, আরবের পয়সা আইতাছে মানুষের আতে, দুই চার বছর পর ওই জমি মনতোষ ৮ গুণ দামে বেচবো — বুজলা অহন, সমাজতন্ত্র কারে কয়? হুঁ: !'

জয়া গিরিবালাকে বলে : 'কি কমু মাসীমা, কি যে পায় রাজনীতির মইদ্যে, আমার বালো লাগে না, পোলাপান বয়সে করছে করছে, অহন কি? থাকি হ্যাকেগো দ্যাশে, হ্যাগো মাথা গরম, কুনসুম কি অয় কওন যায়? আমরা অইলাম গিয়া ইন্দু মানুষ, আমাগো অতো মাথা ব্যথা ক্যান? হ্যাগো দ্যাশ হ্যারা যেম্‌নে মনে লয় চালাউক না, তোমার অতো রাজনীতির আউস ক্যান?'

কুয়োতলা থেকে সর্বানী জবাব দেয় : 'পুরুষ মান্‌ষের কতো রকমের আউস থাকে, তাই ধরলে কি আর চলে?'

সর্বানীর স্বামী বাসুদেব ফরাসগঞ্জের কোন আড়তে চাকরী করে। মদ গাঁজা খায়, জুয়া খেলে, বেপাড়ায় যায়, সর্বানীর মুখে 'পুরুষ মান্‌ষের কতো বকমের আউস থাকে' কথাটায় জয়া কোথায় যেন ঘা খেলো। কোথায় বাসুদেব, একটা অশিক্ষিত, মাতাল, যার সংসারে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না, যে বৌ পেটায়, তার সঙ্গে যেনো সর্বানী মনোতোষকে একই পাল্লায় তুলে দিচ্ছে। জয়াব ভেতরটা রি-রি করে।

'হ, আউস তো অনেক রকমেব, কেউ মদ গাঁঞ্জা খায়, জুয়া খেলে, বাজে পাড়ায় যায়, হেইটাও আউস, আর কেউ রাজনীতি করে হেইটাও আউস; কি কন মাসীমা, দুইটা কি এক অইলো?'

— 'কী!' সর্বানী সটান দাঁড়িয়ে পড়ে, তার আঁটসাঁট শরীরটা ফণা তোলা সাপের মতো দুলতে থাকে : 'আমার স্বামী মদ গাঁজা খায় নিজে কামাই কইরা খায়, জুয়া খেলে নিজেব পয়সায় খেলে তাতে কার কি' — হাত নেড়ে দু'চোখে আগুন নিয়ে সর্বানী চিৎকার করে বাতাস কাটতে থাকে : 'আমার স্বামী বাজে পাড়ায় যায়? ক্যান কারুর আত দইরা কুনদিন টান দিছে, না কাউরে নিয়া' ....

– 'চুপ করো।' গিরিবালা ধমক দিয়ে সর্বানীকে মাঝপথে থমিযে দিতে চায়। একটানা কথা বলে হাঁফ ধরে গিয়েছিলো, ছোট্ট করে শ্বাস টেনে সর্বানী আবার শুরু করে : 'না চুপ করুম ক্যান, বিচার করেন, কি খারাপ কথাটা কইছি আমি, হেয় আমার স্বামীর কথা কইবো? আমার স্বামী নি তারে নিয়ে কুনদিন' ...

— 'আহ্ চুপ করো না, তোমার স্বামীর নাম নিয়া তো কয় নাই।'

— 'ওইসব আমরা বুজি' ....

জয়া তেতো কথার খোঁচা যেমন দিতে পারে, ঝগড়া ততোটা গুছিয়ে করতে পারে না। তার জড়িয়ে জড়িয়ে যাওয়া কথা সর্বানীর চড়া গলার আওয়াজের নীচে চাপা পড়ে যেতে থাকে। এর মধ্যেই সে খুব একটা জুৎসই কথা বলে সর্বানীকে কাবু করতে পাবে অবশ্য, কিন্তু সামনে গিরিবালা, তাছাড়া বলে পরে সর্বানীকেই সামলাতে পারবে বলেও ভরসা পায় না।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, গিরিবালার বড় ছেলে সুকুমার, যে ইদানিং মাস্তান হয়ে উঠেছে, সেদিন রাত্রে বাসুদেব তখনো ফেরেনি, জয়া নিজের চোখে দেখেছে, সর্বানীকে সাপ্‌টে ধরে চুমু খাচ্ছে।

হৈমবতী শুয়েছিলো, তার শরীরটা ততো ভালো নয়, বিকেল শেষ হয়ে আসছে তবু তার

উঠতে ভালো লাগছিলো না, আর এমন সময় হঠাৎ এই ঝগড়া ; সে কোন কথা বললো না, তক্তাপোষের ওপর শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে না দেখার ভান করে ঝগড়া দেখতে লাগলো । কী যে ভালো লাগছে তার, মাগীর বড় দেমাক, বোঝ্ অহন কেমুন লাগে ! হেই দিনকা হাইস্যতামাসা কইরা একখানা কথা কইছিলাম, ওমা তাইতে মাগীর কি গোস্সা !

বাড়ীটা একতলা । সরু সরু নীচু দরজা, ফোকরের মতো জানালা, ঘরের ভেতর ঢুকলে প্রথমেই মনে হয় ঠেলা দিয়ে দেওয়ালগুলোকে সরিয়ে দিই ; এর ভেতরই তক্তাপোষ, বাক্স-প্যাটরা, সস্তাদামের আলমারী, আলনা, ছেঁড়া লেপের তুলো ভরা চটের বস্তা, চালের টিন, গমের টিন, হাজারো গণ্ডা জিনিসপত্র স্যাঁতস্যাঁতে ঘরকে আরো অন্ধকার করে রাখে ।

রাস্তার দিকে পিঠ করে দাঁড়ানো দুটি কামরার একটিতে থাকে কালীনাথ অপরটিতে নিশিকান্ত । কালীনাথের ঘরের গায়েই লাগানো সদর দরজা, সদর দরজার মাথাটি কালীনাথের ঘরের ছাদের সঙ্গে মিলে কার্নিশের শেষ সীমানা পর্যন্ত এসেছে : একদিকে বাড়ীর পাঁচিলের কাঁধে ভর অপরদিকে ঘরের কার্নিশে, ফলে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই মনে হয় একটা সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গটি পেরুলেই এক খামচা উঠোন, উঠোন এবং পাঁচিলের গা ঘেঁষে তুলসী মঞ্চ, একটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ, কয়েকটা সন্ধ্যামালতী, গোটা তিনেক কলাবতী, তার লাগোয়া ঘরটি মনোতোষ সরকারের । ওধারে, কল, কুয়োতলা এবং পায়খানার দিকে টিনের চালের ঘরটিতে থাকে বাসুদেব । বেড়ার দেওয়াল আর টিনের চালের রান্নাঘরগুলো যার যার ঘরের সামনে বা পাশে ।

এই বাড়ীতেই দীপালীর জন্ম, কিন্তু আজকাল তার দম বন্ধ হয়ে আসে । আগে তবু যা হোক সারাদিনটা স্কুলে তার বেশ কাটতো । আজ এক বছর তা-ও বন্ধ হয়েছে । এই ক'দিনে ফুলে-ফেঁপে কী বড়ই না হয়ে গেছে সে ! নিজেরই লজ্জা লাগে, মা তবু তাকে শাড়ী পরতে দেবে না ।

গিরিবালা যতোই চেষ্টা করুক, দীপালীর ভেতরে যে আর একটি দীপালী আছে গিরিবালার সাধ্য কি তাকে সেলাই করা কাপড়ে বেঁধে রাখে, সময় নেই অসময় নেই, দীপালী ঠেসে স্বপ্ন দেখে ! কিন্তু এই স্বল্পপরিসর ঘর থেকে, এই বাড়ীর চৌহদ্দি থেকে তার স্বপ্নকে কতোদূর আর নিয়ে যেতে পারে কালীনাথের মেয়ে ?

কালীনাথের ছেলে থালাটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় গর্জন ক রে ওঠে : 'এই দিয়া খাওন যায় ?' হ্যরিকেনের আলোয় তার ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কোঁকড়ানো চুলভরা মাথার ছায়া মেঝের ওপর ভল্লুকের মতো নড়ে ।

— 'হ হি রে নবাবপুত্তুর, খাওন যায় না । লজ্জা করে না কথা কইতে ? একখান ফুটা পয়সার মুরাদ নাই, আবার বর বর কথা –'এই দিয়া খাওন যায় ?' – মুখ বিকৃত করে মাথা দুলিয়ে গিরিবালা ভারী কুৎসিত একখানা ভঙ্গি করে । 'খাইতে তরে কয় কে ? যা না যে বন্দুগো লগে রাইত দিন আড্ডা দিয়া বেরাস হ্যাগো কাছে যা গিয়া, রাইত দুফুরে অহন আইছস মুখ নারতে ! এত বর জুয়ান গাব্বুর একখান, একটু যদি চিন্তা করে, একটু যদি ভাবে !'

থালাটা একটানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলে ঠিকঠাক মানানসই কাজটা হয় এখন । কিন্তু সুকুমার ওঠে না । ধারালো চোখমুখ, টান টান ঘাড় নিয়ে ম্যাচ-ম্যাচ ক'রে ভাত মাখতে থাকে মাথা নীচু করে । দেখলে মনে হয় সে ভাত মাখছে না আটা ছানছে ।

'বোইনটা বর অইতাছে তার বিয়া দিতে অইবো, ছোট ছোট ভাই বোনগুলার মানুষ করতে অইবো, এতো বর পোলা হেই চিন্তা নাই' ...

সুকুমার মুখ তোলে, তার চোখ মুখ থমথমে : 'ককমটা কি ? চাকরী আমার লেইগ্যা বহায়া থুইছে সব । ক্যান, বাবা' .....

গিরিবালা কথাটা চিলের মতো ছোঁ মেরে ধরে : 'ওই মেচিবিলাই তরে চাকরী দিবো ? কথা কইতে জানে মানষের লগে ? ভগোবান অর মুখ দিছে ? হ্যায় আছে সব কয়টিরে চিতায় তুইল্যা দিয়া পিণ্ডি দেওনের অপেক্ষায় । হ্যায় তরে দিবো চাকরী ঠিক কইরা !'

গিরিবালার তোপের মুখ কালীনাথের দিকে ঘুরে যায় : 'হারা জনম আমারে জ্বালাইয়া কয়লা করছে । হ্যায় কি একটা মানুষ ? পুরুষ মানুষ এমুন অয় ? বাপ-দাদার ভিটাখান রক্ষা করতে পারলো না, একদিন গিয়া খারাইলো না পর্যন্ত ! অখন মোসলমানেরা ভোগ করতাছে !'

সরু তক্তাপোষে এখন চিতা, তার ওপর কালীনাথের শব। গিরিবালা এবং সুকুমার ভারী চমৎকার ভাবে চিতা জ্বালাতে থাকে। মুখের দিক থেকে আগুন আস্তে আস্তে বুক পেট পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় সমস্ত চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কালীনাথকে আর আলাদা ক'রে চেনা যায় না। গোটা কালীনাথই এখন অগ্নিময় চিতা। ছোট্ট ঘরের ভেতর সেই প্রচণ্ড আগুনের উত্তাপ হা হা ক'রে ফিরতে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী রক্তাভ অগ্নিশিখা কড়ি বরগাতে গিয়ে ছোবল মারে। ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। মেঝের ওপর সার সার ঘুমন্ত ভাই-বোনের পাশে—পড়ে থাকা দীপালীর চোখে সেই ধোঁয়া এসে লাগে। দীপালীর চোখ জ্বালা করে। দু'চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে আসতে থাকে তার।

'দ্যাহ কুত্তার বাচ্চারা রাইত দুফুরে' ... নিশিকান্ত গিরিবালা সুকুমারকে বিড়বিড় করে গালাগালি করে একা একা। কিন্তু গালাগালিটা খুব জুৎসই করে করতে পারে না। মগজের সঙ্গে বাঁধা সুতোগুলোয় টান পড়ে। কপালের দু'পাশের রগ টানটান করে। চোখ মুখ কামড়ে নিশিকান্ত কাশি ঠেকায়।

হৈমবতীর ঘুম বড়ো বেশী, একবার যদি বিছানায় পিঠ দিলো তো গেলো। কিছুক্ষণ আগেও কোমরের কশি ঢিলে করে সে তার সাত মাসের গাভীন পেট মেলে চোখ বুঁজে চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে স্বামীর আদর নিচ্ছিলো: আর অহন দ্যাহ কেমুন নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। 'মাইয়া মানুষটার খালি আছে খাওন, ঘুমান আর' ... বাকী অনুপ্রাসটি কাশির জন্য উচ্চারণ করতে পারে না নিশিকান্ত, তাতে তার রাগ আর একটু বাড়ে।

রাগ মনোতোষেরও বাড়ে। তার পা থেকে আগুনের একটি হল্কা মাথার ভেতর গিয়ে ধাক্কা মারে। সেই আগুনের উত্তাপে মনোতোষের চোখমুখ ঝলসে যায়? জয়া গোঁজ হয়ে বসে আছে। টেবিলের ওপর খাতাটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে মুহূর্ত কয়েক কিছুই বলতে পারে না মনোতোষ, শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনে।

— 'তোমারে নিয়া আর পারা গেলো না!'

তার ক্রোধের তুলনায় বাক্যটি বড় বেমানান, কিন্তু মনোতোষের গলার আওয়াজে টের পাওয়া যায় কী অসীম চেষ্টায় সে নিজেকে সামলাচ্ছে। মনোতোষ দম নেয়। 'তোমার মনটা হইল এতটুকু, বুঝলা?'

মনোতোষ জয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে ডান হাতের পাঁচটি আঙুলকে একত্রিত ক'রে জয়ার মনের আয়তনটা দেখায়। জয়া চোখ তুলতে গিয়েও তোলে না। তুললে দেখতে পেতো রাগটা মনোতোষের হঠাৎ করে নয়। বহুদিন ধরে একটু একটু করে জমতে জমতে ক্রোধ যখন গরল হয়ে যায় কেবলমাত্র তখনই রাগের সময় মুখের চেহারা মানুষের এমন হয়ে থাকে।

— 'বাবায় আইতে চায় না ক্যান জানো? শুধু তোমার কারণে। তুমি' ..

জয়া ফোঁস ক'রে ওঠে: 'ক্যান আমি তারে কী কইছি?'

'কইতে হয় নাকি, মানুষের ব্যবহারেই বোঝন যায়।'

— 'তখন মনে আছিলো না? ভাল ব্যবহারের মানুষ আনলেই পারতা।'

— 'তখন কি আর এত বুঝছি। তখন তো তুমি রং ঢং দিয়া ভুলাইয়াছিলা।'

বিষের জ্বালায় জয়া ছটফট করে: 'কী, আমি রং ঢং দিয়া ভুলাইয়াছিলাম তোমারে? তুমি এই কথা কইলা?'

রাগের মাথায় কথাটা বড়ো খারাপ বলে ফেলেছে মনোতোষ। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে। জয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে।

মনোতোষ উঠে গিয়ে জয়াকে ধরে: 'আহ্ কি পাগলামি কর।' গলার স্বরকে মনোতোষ প্রাণপণ বদলে ফেলতে চায়।

— 'না, তুমি আমারে ধরবা না, ছার, তোমারে আমি চিনছি, আর মিঠা কথা কইতে অইবো না।'

চোখে জল এসে যায়। গালের জ্বলুনি মগজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু কোন কথা বলে না, দু'হাতে গাল ঢেকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথার চুল ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, আঁচল লুটোচ্ছে, এক দিকে স্তনচক্রের আভাস বাসুদেবকে আরো ক্ষিপ্ত করে: 'আমি বুঝি না, না? রাইত দিন ঠাকুর পো ঠাকুর পো। ক্যান, অতো মাখামাখি ক্যান' ... টলমল পায়ে বাসুদেব এগোয়, আত্মরক্ষার জন্যে সর্বাণী সামনে ঝোঁকে। বাসুদেব প্রহার করে না, আঁচল ধরে টান দেয়: 'আঁ?' এই 'আঁ' ধ্বনি

দিয়ে সে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করে । নিরুত্তর সর্বানী প্রতি মুহূর্তে চপেটাঘাতের আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠে বাসুদেব ক্ষিপ্র হাতে সর্বানীর বস্ত্র হরণ করে ।

মধ্যম পুত্রটির ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, ঘুম চোখে হারিকেনের আলোয় বাসুদেবের কংসমূর্তি, চাপা গর্জন এবং উলঙ্গ মাতৃ-দর্শনে ছিটিয়ে পড়ে থাকে সে ।

'তরে খুন কইরা ফালামু' — বাসুদেব ন্যাংটো সর্বানীকে হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে আসে । অত:পর রদ্দা মারলে সর্বানী তার শরীরে বাসুদেবের প্রত্যাশিত ভঙ্গিটি এনে ফেলে। বাসুদেব মেঝের ওপর সর্বানীকে কুকুরের মতো রমন করতে থাকে ।

কালীনাথ আস্তে আস্তে তক্তাপোষ থেকে নামে । পা টিপে টিপে দরজার কাছে যায় । নিশিকান্ত প্রবল বেগে শ্বাস টানছে । কালীনাথ নিঃশব্দে দরজার খিল খোলে । বাইরে এসে চারপাশে তাকায়, নিথর বাড়ীটায় শুধু নিশিকান্তর শ্বাস টানার শব্দ ।

কালীনাথ সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ায় । তার বিভ্রম আসে, মনে হয় আর একটু এগোলেই কঠিন কয়লার বিশাল চাঙটায় ঘা খেয়ে তার নাক মুখ থেঁতলে যাবে । কালীনাথ হাত বাড়ায়, তার হাত অন্ধকার শূন্যতায় কোথাও ঠাঁই পায় না । দু'পা এগিয়ে সে আবার থমকায়, মনে হয় এই অন্ধকারের ভেতর কালো লোমশ একটা জন্তু গুঁড়ি মেরে বসে বসে কপিস চোখে দেখছে তাকে । কালীনাথ হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনে । শব্দটি তার নিজের না জন্তুটির ? কালীনাথের আবার বিভ্রম আসে । হঠাৎ তার পায়ের ওপর দিয়ে কিচকিচ ক'রে ছুঁচো দৌড়োয় সামনের দিকে । কালীনাথ চমকে লাফিয়ে ওঠে । আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দটিকে স্পষ্ট করে চিনতে পারে এবার ।

এই শব্দ তার মস্তিষ্কে কি কাজ করে কে জানে, কালীনাথ অন্ধকারের ভেতর দু'হাত মেলে হাঁতড়ে হাঁতড়ে সদর দরজটা খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যেতে থাকে ।

মনে হয় সুড়ঙ্গ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, একবার মনে হয় ঐ তো সামনে খিল আঁটা বিশাল সদর দরজাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে । একটা মোহ ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে তাকে । কালীনাথ দরজার কাছে যাবার জন্যে অস্থির হয় । আর তখন ছাদের কার্নিশে প্যাঁচাটা ডেকে ওঠে ।

'রাইত দুপুরে আর ডং করন লাগবো না বুরা বয়সে ।' কালীনাথ একটি হাতের স্পর্শ পায় পিঠে : 'চল।'

হাতটি তাকে ঘুরিয়ে দেয় । সদর দরজা এখন কালীনাথের পেছন দিকে ।

অন্ধকারে অদৃশ্য গিরিবালা তাকে পেছন থেকে ঠেলে : 'মরতে চাইলে একাই মরণ লাগবো, বুঝছো, অখন আর সহমরণ নাই ।'

কালীনাথের পা শিথিল হয়ে আসে । প্যাঁচার ডাকটা তার মাথার ভেতরে ঢুকে গিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরে ।

গিরিবালাকে আর ধাক্কা দিতে হয় না, কালীনাথ নিজেই হাঁটতে থাকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

এতোক্ষণে কালীনাথ সঠিক কালীনাথে ফিরে আসে । কেননা এই ভঙ্গিটি তার একান্ত নিজস্ব।

ওয়াসি আহমেদ

ঢোকার মুখে কাচের দরজায় গোটা অক্ষরে : পেছনের দরজা ব্যবহার করুন । নিচে ইংরেজিতে : প্লীজ ইউজ রিয়ার ডোর । দরজার হাতল ডানদিকে অর্ধেকটা ঘুরিয়েছে, এমন সময় লেখাটা চোখে পড়তে হাত সরিয়ে নিল তপু । কী ব্যাপার, ঢুকতে মানা করছে কেনো ? হাতলে চাপা পড়ামাত্র দরজাটা খুলি খুলি করছিল, একটু হলে খুলে যেত । দরজার ওপারে আলো কম, কাচটাও টিন্টেড — ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না । এ অবস্থায় এখানে দাঁড়ানো অশোভন । পেছনের পথটা কোনদিকে ?

তপু সরে দাঁড়াল । বড় রাস্তায় ফিরে বাড়িটাকে ভাল করে খেয়াল করল । বাড়ি নয়, ভবন । মাঝারি উচ্চতায়, চোখে পড়ে এমন জায়গায় দুধসাদা মার্বেলে নামফলক : কর্মীসংঘ । ভবনের অন্য কোথাও সাদার চিহ্ন নেই ; মসৃণ কালো মার্বেল টাওয়ার খাড়া উঠে গেছে মহাশূন্যে । এক, দুই, তিন, পাঁচ করে আঠারো পর্যন্ত গুনল তপু । আর পারল না, গুলিয়ে ফেলল ।

শহরে কোলাহল থেকে দূরে ছিমছাম গাছপালায় সাজানো নিরিবিলি, প্রায় অবাস্তব ভবনটা তাকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল । কিন্তু পথ কোনদিকে ? আশেপাশে মানুষজন নেই যে জিজ্ঞেস করবে । বেলা সোয়া দশটায় জায়গাটা নি:সাড়, জনশূন্য । মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ির হুস্ হাস্, এই পর্যন্ত । আর কোনো শব্দ নেই, কলরোল নেই । এত বড় দৈত্যপুরী, প্রতি তলায় কাচবসানো ওগুলো কি জানালা ? জানালা হলে আটকানো কেনো ? লোকজন কোথায় ? জানালায় একটাও মুখ নেই কেনো ?

বুকপকেট থেকে খাম সমেত টাইপ করা চিঠিটা বের করে তপু । গত সন্ধ্যায় পেয়েছে এটা । এরই মধ্যে শ'খানেক বার পড়া হয়ে গেছে । নতুনত্ব কিছু নেই, তারপরও ভাঁজ খুলে চোখ বোলাতে রোমাঞ্চ হল । প্রিয় পদপ্রার্থী, জাতীয় কর্মীসংঘ এই মর্মে সন্তুষ্ট যে, একজন উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী, সৃষ্টিশীল, প্রাণচঞ্চল তরুণ হিসাবে আপনাকে সংঘের সুবিশাল কর্মযজ্ঞে যোগদানের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে । আগামী অমুক তারিখ তমুক জায়গায় আপনার পদার্পণকে স্বাগত জানানো হবে । নিচে স্বাক্ষর অস্পষ্ট, সীল স্পষ্ট, তা... । দামী অফসেট কাগজ, পেশীবহুল দুটো হাত আড়াআড়ি করে আঁকা মনোগ্রাম, ভেতরে একটুখানি ফাঁকা—তাতে 'কর্মই উৎস' ।

চিঠিটা যখন বাসায় পৌঁছে, তপু বাইরে ছিল । ছোট বোন মিনির হাতে পড়ে ওটা । মিনির হবি, কেবল হবি বললে পুরোটা বলা হয় না, ফেভারিট হবি হল অন্যের চিঠি পড়া—চেনা-অচেনা যে-কারো চিঠি । প্রেম-ভালবাসার চিঠি হতে হবে এমন কথা নেই । বিয়ের ঘটকালি, জায়গাজমির মামলা, পাওনাদারের গালাগালি, মৃত্যুসংবাদ যে কোন বিষয়ের চিঠিই তার কাছে সমান কৌতূহলের । এমনকি চিঠির গন্ধ শুঁকে বাজারের ঠোঙ্গা খুলে মর্ম উদ্ধারেও সে মহাআগ্রহী । তপু ফিরল সাতটা-সাড়ে সাতটার দিকে । এদিকে মিনি অবিশ্বাস্য চিঠির কথাটা ঘরে সবার কাছে ফাঁস করে দিয়ে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে বসে আছে । প্রিয় হবির জন্য এই প্রথম সে বকাঝকা খেল না । অনেক রাত পর্যন্ত বাসায় উৎসব ভাব বজায় থাকল । বাবা-মা, ছোট বোন মিনি, বড় বোন রিনি (বিয়ের মাত্র এক বছর পর স্বামীর ঘর ছেড়ে এ সংসারে যে এঁটো কাঁটা হয়ে এর ওর পায়ে বিঁধেই চলেছে), বড় ভাই রাজীব (বি-কম পাশ করে আট বছর চাকরির ধান্দা করতে করতে ইদানীং প্রায়-দার্শনিক একটা কথা বলে—চুরি ডাকাতিতেও যোগ্যতা লাগে ; কথা শুনে একদিন তপু-রাজীবের বাবা আহমদ হোসেন তেড়ে এসেছিলেন—কী মনে করো, লাগে না ? ন্যাকা !) সবাই যার যার মতো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল । আহমদ হোসেন বাড়াবাড়ি করলেন, রাত আটটায় বৃষ্টি ভেঙে কোথা থেকে খাসীর মাংস নিয়ে ফিরলেন । বৃষ্টি জবজব

ছাতা ভেঙে ঘরে ঢুকেই যেন লজ্জা পেলেন, মাংসের পুটলিটা বড় মেয়ের হাতে দিয়ে খুব আক্ষেপ করলেন — কী কাণ্ড দেখ্ তো, আগে জানলে সকালবেলা ফ্রেশ মাংস নিয়ে আসতাম ; বলেছে তো টাটকা, এদের কথা ! শোন, একটু বেশি করে পেঁয়াজ, রসুন দিবি ।

রাতের খাওয়া হয়ে গেছে এমন সময় রাজীব এসে বসল তপুর বিছানায় । এমনিতে দু'জনেব বড় একটা কথাবার্তা হয় না । মনে মনে রাজীবকে তপু ঘৃণাই করে । আট বছর বেকার থাকার ব্যর্থতা অন্য কারো ওপর চাপানো যায় না । রাজীব বলল—চিঠিটা একবার দেখতে দিবি ? কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল, দাদা এভাবে কথা বলছে কেনো ? অন্য সবার হাত ঘুরে ঘুরে চিঠিটা টেবিলের ওপরই ছিল । হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিতে রাজীব খুব আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়ল, খামের ঠিকানা পড়ল, আবার চিঠিটা উল্টোপাল্টে নেড়েচেড়ে বলল—বড় সাজগোজের চিঠি রে, ম্যালা মালকড়ি, না ? তপু বলল না কিছু, নিজেকে একটু অপরাধী ভাবল । চিঠিটা এরপর নাকের কাছে ধরে রাজীব বলল—গন্ধটা কী ডেলিশাস !

রিনির প্রতিক্রিয়া আলাদা । বিয়ের সময় কেন যেন তাকে একটা শেফার্স বল পেন উপহার দিয়েছিল । কলমটা সে কাছ-ছাড়া করত না । বিয়ের স্মৃতি হিসাবে কলমটাই হয়ত ছিল মূল্যবান । সকালবেলা তপু জামাকাপড় পরছে, রিনি কলমটা তার শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলল—তোকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, এটা নে ।

বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে তপু সকালবেলা নাস্তা খেয়েছে, জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়েছে । গত রাতটা অস্থিরতার ভেতর দিয়ে গেছে । বিছানায় একরকম ছটফট করে কাটিয়েছে । এমন অভাবনীয় সংবাদ অথচ রত্নার সঙ্গে দেখা হল, তখন কে জানত রত্নাকে দেবার মতো এমন একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করে আছে । রাতে তার খুব ইচ্ছে করছিল, যে করেই হোক রত্নাকে দিয়ে আসে । কিন্তু কাঁঠাল বাগান আর মীরপুরের দূরত্ব কম নয়, তারপরও বৃষ্টি । আজ সকালে রত্নাকে যখন খবরটা দিল, কয়েক মুহূর্তে রত্না শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল । তপু অপেক্ষা করে ছিল, রত্না কী করে । রত্নার প্রতিক্রিয়া একেবারে অন্যরকম । তার চোখ-মুখ খুশিতে নেচে উঠল না, বরং দু'চোখ বড় বড় টলমল ফোঁটায় ভরে উঠল । একসময় দু'হাতে মুখ আড়াল করল ।

ঘড়ি দেখে তপু চমকাল, এগারোটা বাজে প্রায় । চিঠিতে ঠিক এগারোটার কথা বলা আছে । তড়িঘড়ি করে চিঠিটা পকেটে ভবে বড় রাস্তা থেকে আবার ভবনের সামনে চলে এল । এবার আর দরজার মুখে না দাঁড়িয়ে সামনা বরাবর হাঁটতে লাগল । কেনো জানি ধারণা হল, ভবনের শেষ মাথায় ঘোরপথে ঢোকার রাস্তাটা হয়ত পেয়ে যেতে পারে । ধারণাটা যে এভাবে ফলে যাবে, তপু ভাবতে পারেনি । ঠিক যেখানে ভবনের সীমানা শেষ, তার ওপারে একটু দূরে খাড়া দেয়াল, মাঝখানে কংক্রিটের ঢালু সুবঙ্গ, অনেকটা বেসমেন্টে গাড়ি ওঠানামার পথের মতো । কী করবে, যাবে কী যাবে না ভাবছে, এমন সময় দেয়ালের গায়ে চোখ পড়ল— রিয়ার ডোর, পাশে তীর চিহ্ন । তপু ছুটতে শুরু করল ; একে ঢালু পথ, তারপরও দ্রুত পা ফেলায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতর । আধো অন্ধকাব, মিটমিটে হলুদ বাতি জ্বলছে দেযালেব গায়ে । পর পর দুটো বাঁক ঘুরল তপু, তারপর হঠাৎ করেই সুড়ঙ্গ পার হয়ে বিশাল হলঘরেব মতো জায়গায় এসে পড়ল । তারপাশে ঝলমলে আলো, এত আলো, তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল । তকতকে মেঝে, মসৃণ দেয়াল, ঘরময় মিহি শীতল সুবাস । তপু ঘড়ি দেখল, এগারোটা বাজতে মিনিটখানেক বাকি । সুড়ঙ্গ ধরে দৌড়ে নামায় তার বুক দ্রুত ওঠা নামা করছে, এদিকে ঘড়ির কাঁটা তাকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে । এতদূর এসে এবার কী করবে, তবু ভেবে পেল না । এমন সময় সে খেয়াল করল ঘরের ভেতর ছোট ছোট টেবিল জুড়ে অনেক মেয়ে-পুরুষ । তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না । সবচেয়ে কাছের টেবিলটা হাত পনের দূরে । বুক উঁচু টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে একটা মেয়ে । কাছে-দূরে আরো ক'টা টেবিল দেখতে পেল, প্রতি টেবিলে হয় কোনো ছেলের মুখ, নয় মেয়ের । তপু ছুটল । কাছের টেবিলের মেয়েটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে গত সন্ধ্যার চিঠিটা বাড়িয়ে ধরামাত্র অপরূপ সুরের মূর্ছনা তুলে গোটা হলঘর জুড়ে বেলা এগারোটার সময় সঙ্কেত বেজে উঠল । চিঠিতে এক নজর চোখ বুলিয়ে মেয়েটা পাশের র‍্যাক থেকে চারকোনা কার্ড তুলে কী সব লিখতে শুরু করল । তপু কথা বলতে চাইল, কিন্তু এই পরিবেশে কথা বলায় কোথায় যেন অলিখিত নিষেধের ব্যাপার আছে বলে মনে হল । কার্ডে মেয়েটা চটপট কী সব নম্বর বসাচ্ছে কলম চালানোর তালে খোলামেলা মসৃণ কাঁধে রেশম মিহি চুল দোল খাচ্ছে, উঁচু টেবিলে চাপ খেয়ে

ফরশা স্তন বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে।

মিনিট দুয়েকের ব্যাপার, লেখাজোখা শেষ করে সেটা তপুর হাতে দিয়ে মেয়েটা অন্য একটা টেবিলে যেতে ইঙ্গিত করল। এ টেবিলে যার মুখ, সে মেয়ে নয়, বছর তিরিশের গোমড়ামুখো যুবক কার্ডে কী একটা চিহ্ন বসিয়ে ঝটপট তাকে আবেক টেবিলে পাঠাল। এও একজন মেয়ে, অনেকটা প্রথম জনের মতো, তেমনি বেলুনস্তন। মুখ তুলে সে একটুখানি শুষ্ক অভ্যর্থনার ভঙ্গি করল। তপু মুখ খুলতে যাবে, তার আগেই কার্ডে একটা টিক মেরে তাকে পাঠিয়ে দিল উল্টো পাশের টেবিলে। আবার গোমড়া মুখ, গোমড়া মুখ থেকে বেলন, বেলুন থেকে গোমড়া, গোমড়া, বেলুন, বেলুন, গোমড়া।

কতক্ষণ এই করে কেটে গেছে, তপু বলতে পারবে না। এক সময় খেয়াল হল, সে এসে পৌছেছে হলঘবের শেষ মাথায়। এখানে একজন গোমড়ামুখো তাব সাথে ব্যতিক্রমী আচরণ করল। কার্ডে সাদা দাগ মেরে তপুর দিকে হাত বাড়িয়ে গমগমে গলায় বলল —আপনাকে স্বাগতম। গলায় আন্তরিকতার আঁভাস নেই, চেহারাটা এমনভাবে সেলাই করা, যাতে অন্য কোনো অভিব্যক্তি না ফোটে। ঠাণ্ডা হাতটা ছেড়ে তপু দেখল, ঠিক পাশেই কাচের দরজা, মাঝখানে লাল হরফে প্রবেশ : নিচে ইংরেজিতে : এন্ট্রি। লোকটা কি তাকে ভেতবে যেতে বলছে ? ভাবাভাবি বাদ দিয়ে তপু কেবল দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, লোকটার গলা শোনা গেল — আজ না, কাল এগারোটায়।

ফিরতি পথটা অতো দীর্ঘ মনে হল না। ঢোকার সময়ের মতো অনেক কিছুই সে খেয়াল করল না। বোধশক্তি কেমন ভোঁতা। বাইরে এসে দাঁড়াতে খেয়াল হল কপালে, গলার খাঁজে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘড়িতে বাবোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। মাত্র এইটুকু সময়, অথচ মনে হচ্ছিল কয়েক ঘন্টা।

হাঁটতে হাঁটতে কর্মীসংঘের ভবন ফেলে অনেকটা দূরে চলে আসতে কার্ডটাব কথা মনে পড়ল। চিঠিটা ওবা রেখে দিয়েছে তবে কার্ডটা যতদূর মনে পড়ে, যে লোকটা আপনাকে স্বাগত বলেছিল, সে দাগ মেরে ফেরত দিয়েছে। বুকপকেটে হাত ছোঁয়াতেই কার্ড পাওয়া গেল। বের কবে আনতে চিত্রবিচিত্র আঁকিবুকি। উপরে গোটা গোটা অক্ষরে তাব নাম, পাশে পর পর কয়েকটা নম্বর। এরপর কার্ডেব এপিঠ ওপিঠ জুড়ে নানা বঙেব বিদঘুটে চিহ্ন, আঁকিবুকি—কোনোটা পরিষ্কাব টিক মার্ক, কোনটা হিসাব মেলানোর পর ক্যাশের লোকেরা যেমন চিহ্ন দেয় সেবকম, কোনটা গোল্লা, হাফ-গোল্লা, চন্দ্রবিন্দু, আবাব শুধু বিন্দুও আছে। লাল, সবুজ, কালো কালির পাশাপাশি হলুদ, বেগুনি কালির দাগও বয়েছে।

বাসায় গেল না তপু, রত্নার কাছেও না। তার ঘোরের মতো লাগছে। চিঠি পাওয়াব সাথে চাকরির যোগসূত্র নিয়ে সন্দেহ হতে লাগল। সারা দিন এদিক সেদিক ঘুরে কাটাল। রত্নার মুখোমুখি বসে আলাপ করলে হয়ত হাল্কা লাগত, কিন্তু এ অবস্থায় রত্নার সামনে পড়তে ইচ্ছে হল না। বত্না শক্ত মেয়ে নয়, হয়ত ভেঙেই পড়বে। পাশ করে ভাইয়ের সংসারে রত্না বোঝার মতো বসে আছে। বাচ্চাদের স্কুলে-টুলেও একটা কাজ জোটাতে পারছে না। আজ সকালে তপুর চিঠি পাওয়ার খবর শুনে রত্নার কেঁদে ফেলাই প্রমাণ, সে কতটা অসহায়।

রাতে ঘরে ঢুকে শরীর খারাপের কথা বলে সবাইকে পাশ কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল তপু। ফল হল উল্টো, মা চেপে ধরলেন। হঠাৎ করে শবীর খারাপ কেনো ? মাথা ধরা, জ্বর, নাকি আর কিছু ? তপু রাগারাগি কবল, শরীর খাবাপ হলে এমনিতেই সে একটু বেশি হৈ চৈ করে। এত করেও বাবাকে এড়ানো গেল না। পোড়খাওয়া মানুষ, সৌজন্যের খতিরে একবার ছেলের কপালে হাত রেখে আসল কথাটা পাড়লেন—এপোয়েন্টম্যান্ট লেটারে তো সেলারি, এলাউন্স কিছু লিখল না, কত পাবি বল তো ? তপু এক কথায় পাব পেতে চাইল—সবে তো আজই গেলাম, কাল জানব। আহমদ হোসেন আকাশ থেকে পড়লেন —বলিস কি ! জয়েন করলি, বেতন জানিস না ? কোলিগদের কাছ থেকে জানতে পারলি না ! একাউন্টসে কথা বললেই তো জানতি।

রাতটা কাটল। ঘুমের ভেতর খাপছাড়াভাবে কয়েকবার হলঘরটা দেখল তপু, আর দেখল বেলুন-অসংখ্য, রঙবেবঙের বেলুন ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে।

পরদিন সুরঙ্গ পথে পা দিয়ে তপু তাড়াহুড়ো করল না, হাতে যথেষ্ট সময়। ঢালু বেয়ে নামতে চারপাশে তাকাল। গতকালের মতোই লাগছে, টিমটিম আলোয় আবছা পথ। ধীরেসুস্থে বাঁক দুটো পেরুল। তারপব হঠাৎ করেই সুড়ঙ্গেব শেষ, হলঘরের শুরু। আজ প্রস্তুতি থাকায় আলোর ঝাপটা

চোখে চাবুক মারল না। সার সার ছোট ছোট উঁচু টেবিল, টেবিলের ওপব টবে বসানো মুখ ; ছেলে মুখ, মেযে মুখ। মাঝখানে বিস্তর ফাঁকা জায়গা, একটা টেবিল থেকে অন্য টেবিলেব দূরত্ব কম হলেও দশ থেকে পনেরো হাত। তবু এগুতে এগুতে গতদিন যে টেবিল থেকে ফেবত এসেছিল, সেখানে গিযে দাঁড়াল। পাশেই সেই কাচের দবজা, দবজায গাযে প্রবেশ ও এন্ট্রি। পকেট থেকে কার্ডটা বের কবে টেবিলে রাখতে লোকটা চোখ তুলে তাকাল, তবে গতদিনেব মতো স্বাগতম টাগতম বলল না। কার্ডে চোখ বুলিয়ে টেবিলের ওপারে উঁচু টুল থেকে নেমে এল, তাবপব কাচের দবজাব নব ঘুরিযে পিছু পিছু আসতে ইঙ্গিত করল।

লম্বা কবিডোর, দু'পাশে ভেতব থেকে বন্ধ দবজা। কবিডোরে পা দিয়ে এই প্রথম তপু কযেকজন মেয়ে-পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে চলাচল কবতে দেখল। চলাব ভঙ্গিতে ব্যস্ততা থাকলেও স্বাভাবিক হাঁটাচলা তাকে আশ্বস্ত করল। তপু যাকে অনুসবণ করছে, সে একটা লিফটের দবজায় থামতে, তপুও থামল। পব পব কযেকটি লিফট, দবজা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে, লোকজন উঠছে নামছে, হলঘবেব একঘেযেমিব চেয়ে ভিন্ন চিত্র। আজকেব দিনটা গতকালেব মতো নয, তপু ভাবল।

দশ-বাই-বারো'ব ঘবটা কী ভীষণ ঠাণ্ডা! লিফটে কবে লোকটা তপুকে নিযে এসেছে বাইশ তলাব ওপব এই মাঝারি আয়তনের ঘবে। তপুকে বসিয়ে সে চলে গেল। তিনটা চেযাবেব মাঝেবটায় তপু বসে, দু'পাশে চেয়াব দুটো খালি, সামনে সাধাবণ মাপেব সেক্রেটাবিযেট টেবিল, টেবিলেব ওপর কাগজপত্র নেই, একটা মাত্র ইন্টাবকম, টেবিলেব ওপাশে প্রৌঢ় ভদ্রলোকেব হাতে ধবা তপুব কার্ড। প্রৌঢ় ড্রয়াব খুলে একটা ফোল্ডার বেব কবলেন, তারপব তপুকে চমকে দিয়ে স্বাভাবিক গলায বলে উঠলেন—তপন হায়দার, এজ টুযেন্টিসেভেন, ফাইভ ফিট নাইন এণ্ড হাফ, ব্ল্যাক মোল অন বাইট আর্ম, চেস্ট থারটিসেভেন, নন স্মোকিং, মাস্টার্স ইন সোসাল ওযেলফেযাব, আনম্যাবেড, বেডী টু আনডারটেক চ্যালেঞ্জিং এসাইনম্যান্ট, এক্সপেকটেড সেলাবি ফাইভ থাউজেণ্ড। ফাইভ থাউজেণ্ড?

ভদ্রলোক যা-যা বললেন, চাকবির দরখাস্তে তপু নিজ হাতে লিখে দিয়েছিল। চাকবিব বিজ্ঞাপনে দবখাস্ত হাতে লিখতে হবে, এমন শর্ত ছিল। ড্রযাব থেকে ভদ্রলোক যে ফোল্ডাবটা বেব কবলেন তাতে নিশ্চয দরখাস্তটা রযেছে।

– ফাইভ থাউজেণ্ড? পাঁচ হাজার?

তপু আমতা আমতা কবল। প্রথম চাকবি হিসেবে কি টাকাব অংকটা খুব বেশি হয়ে গেছে! কিন্তু এবকম অংকই যে তাব দবকার। মুহূর্তে বাবা, মা, বিনি, মিনি, বাজীবেব মুখগুলো ভেসে উঠল। বত্নাব মুখটা ভেসে ওঠার কিছু নেই, সারাক্ষণ বুকেব মধ্যে আছে। টাকাব কথায তপু গেল না, বলল – আমাব চাকবি খুব দরকাব, আই নিড দ্য জব বেডলি।

চাকবি বলছেন কেনো? আমবা এখানে কেউ চাকবি কবি না। উই আব কমিটেড টু আওযাবসেলভস, চাকবিতে কাবো কমিটম্যান্ট থাকে না। আমাদেব মনোগ্রাম দেখেননি—কর্মই উৎস, এখানে সবাই কর্মী, আমবা কাজ কবি, একটিভিটি জেনাবেট কবি। কেনো, আমাদেব নামটা খেযাল কবেননি – কর্মীসংঘ। উই আব অল পার্টনার্স ইন হিউজ একটিভিটি। তবে হ্যাঁ, কাজেব বিনিমযে আমবা বেম্যুনাবেশন পাই, হ্যাণ্ডসাম বেম্যুনাবেশন। ফাইভ থাউজেণ্ড ... দ্যাটস পিনাট!

তপু কথা বলতে পাবল না ; সে যা ভেবেছিল ঘটনা তাব উল্টো। দবখাস্তে টাকাব অংকটা বসাতে গিযে সে অনেক ভেবেছে। শেষমেস পাঁচ হাজাবেব অংকটা যখন সাহস কবে লেখা হয়ে গিযেছিল, ভেবেছিল বেশি চাইতে ক্ষতি কী! এখন? প্রৌঢ় তাব দিকে তাকিযে আছেন। চোখে ভাবি চশমা, টকটকে ফবসা গায়েব বঙ, কপালটা বড হতে হতে মাথাব আধাআধি গিযে ঠেকেছে। এই মানুষটাব পবিচয তপু জানে না। ঢোকার সময দবজায কোনো নেমপ্লেটও লক্ষ্য কবেনি। তবে যে ঢঙে আলাপ কবছেন তাতে সন্দেহ থাকে না, ইনি একজন কর্তাব্যক্তি।

– বাড়িতে কে কে আছেন?

– বাবা-মা আব ভাই-বোন।

– আব?

বত্নাব কথাটা বলা যায না, বত্না তো এখনো হিসেবে আসেনি। তপু মাথা নাড়ল।

– এই তাহলে, আব কেউ নেই?

– নাহ্।

– ঠিক আছে, উই উইল টেক গুড কেয়ার অব ইউ ! পাঁচ হাজার চেয়েছেন, সেটা আপনার হিসাব। আমাদের হিসাব আলাদা, সে হিসাব এর বেশি, অনেক বেশি। বেশিতে তো আপত্তি থাকার কথা না, কম হলে আপত্তি .....।

প্রৌঢ় হাসলেন, কিন্তু এ ধরণের কথায় হাসিটা যেমন খোলামেলা হওয়ার কথা, তেমন হল না বরং রঙহীন, বিবর্ণ হাসি। এত ফ্যাকাশে, রক্তহীন হাসি আর কাউকে হাসতে দেখেছে বলে তপুর মনে পড়ল না। হাসিটা বাংলা সিনেমার ভিলেনের মতো নয়, বজ্জাতির চিহ্নমাত্র নেই, 'আবার শত দু:খেও নলিনী চন্দ্রের হাসি পাইল' এমনও নয়। খোঁচা খাওয়া হাসি, মুখটা বেঁকেচুরে গেল।

ইন্টারকম তুলে কফি চাইলেন প্রৌঢ়। ঠাণ্ডা ঘরে উত্তেজনায় ভেতরটা লাফাচ্ছে তপুর। গত দিনের দ্বিধা, সংশয় কেটে গেছে। প্রৌঢ়কে অমায়িক বলতে হবে, বাড়ির কথা পর্যন্ত জানতে চাইলেন। এঁকে কি নিচের হলঘরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে ? ওরা মুখে খিল এঁটে বসে আছে কেনো ? কিংবা সামনের দরজার বদলে পেছনের দরজা ? কফি শেষ হতে ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন। তপু চট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা নিল। চমকে গেল সে, ঠাণ্ডা বরফশীলতল হাতটা তাকে কামড়ে দিল।

পাঁচ হাজার টাকার অংক শুনে আহমদ হোসেন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—বলিস কী ? যা চেয়েছিলি তাতেই রাজী, এমনও হয় !

তপু বলতে পারত, পাঁচ নয়, পাঁচের বেশি, হতে পারে পাঁচের দ্বিগুণ, কিন্তু এইটুকু শুনে বাবা যেভাবে লাফিয়ে উঠলেন, বাড়িয়ে বললে নির্ঘাৎ অবিশ্বাস করবেন। রিনি এসে বলল – বলেছিলাম না, তোর ভাগ্যে বেকারত্ব নেই, ওটা দাদার কপালে। দেখলি তো, কত বড় চাকরি জুটে গেল !

তপু মনে করতে পারল না, এমন ভবিষ্যদ্বাণী রিনি কবে করেছিল। তবু রিনির মুখে কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। তপু জানে, রিনির একটা খুব গোপন প্রেম আছে। ছেলেটা ব্যাংকে ছোটখাটো চাকরি করে। আগের বিয়েটা রিনির বড় দায়সারাভাবে সেরেছিলেন আহমদ হোসেন। বিয়েটা মোটেও বিয়ের মতো হয়নি। হয়ত এ কারণেই ওটা টিকল না। রিনির যদি আবার বিয়ে দেয়া যায়, সেই প্রেমিক ছেলেটার সাথে ! ব্যাপারটা অনেকক্ষণ চমৎকার স্বপ্নের মতো তাকে আচ্ছন্ন রাখল।

সারাটা সন্ধ্যা তপু কাটাল রত্নাকে নিয়ে রিকশায় ঘুরে ঘুরে। রত্নার চোখমুখ তৃপ্ত। হুড-তোলা রিকশায় রত্নার কোমর জড়িয়ে ধরে এ রাস্তা ও রাস্তা অনেক ঘুরল। ফেরার কথা বলে রত্না অন্যদিনের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল না। রাত আটটার দিকে রত্নাকে নামিয়ে দেয়ার সময় তপু অনেকক্ষণ ধরে তার ঘাড়ে, গলায় মুখ ঘষল। সুড়সুড়ি লাগলেও রত্না বাধা দিল না।

রাতে ঘুমোতে গিয়ে একটা হিমঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ তপু কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না।

পরদিন ঝুটঝামেলা ছাড়াই তপু কর্মীসংঘের একজন হয়ে গেল। কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর ব্যাপার মনে উঁকি দিলেও তপু গায়ে মাখল না। নতুন চাকরির উত্তেজনার চেয়ে তাড়নাটাই অনুভব করল বেশি। ঘরে আহমদ হোসেনের মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ তো আছেই, অন্যদের বেলাও সেটা কম কিছু নয় (কেবল রাজীবের প্রতিক্রিয়াটা সঙ্গত কারণেই কিছুটা প্যাঁচালো), অন্যদিকে রত্না তো একাই একশো। রত্না আর চাকরি, দুটো জিনিস যে জট পাকিয়ে একাকার হয়ে আছে, তপু আগে কখনো উপলব্ধি করতে পারেনি।

একদিন দুইদিন কেটে গেল। তপু বসে বসে হাই তুলে সময় পার করে দিল। তাকে কিছু করতে দেয়া হয়নি। কেবল দ্বিতীয় দিনে একটা কাগজে দস্তখত দিতে হল। আগে কখনো কাজ করেনি বলে অফিস-আদালতের কাগজপত্র তার অচেনা—তবে এটা যে বেতনের বিল জাতীয় কাগজ, পরিষ্কার বোঝা গেল। টাকার অংকটা তিনবার চারবার পড়ল। দশ হাজার ছাড়িয়ে শতক, দশক, এককের ঘরেও খুচরা অংক। ভয়াবহ ব্যাপার, কাগজটায় সে দস্তখত করল। এ দুই দিন আর কারো দেখা পেল না তপু। তৃতীয় দিন বুদ্ধি করে বাসা থেকে কিছু পত্রপত্রিকা এনে রেখে দিল ড্রয়ারে। একঘেয়েমি কিছুটা এতে কাটল, কিন্তু ঘন ঘন এত বেশি হাই উঠতে লাগল, তার ভয় হল, ঘুমিয়ে না পড়ে। আকাশছোঁয়া ভবনের বাইশ তলায় একটা মাঝারি আয়তনের ঘরে সময় কাটানোটাই মস্তো

বোঝার মতো মনে হল। দুপুরের দিকে পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কেনো জানি মনে হল, তার এই বেরিয়ে আসার সাথে গোপনীয়তার একটা যোগাযোগ রয়েছে। দু'পাশে ভেজানো দরজা, সামনে অন্তহীন করিডোর, কোথায় এর শেষ, তপু আন্দাজ করতে পারল না। একেকটা করিডোর কিছুদূর পর পর ডানে বাঁয়ে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে। কয়েকটা ভেজানো দরজা পার হল তপু। দু'পাশে দেয়ালের গায়ে নানা ধরণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, সঙ্কেতগুলো বুঝতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। একটা দরজার সামনে সে থামল। ভীষণ ঔৎসুক্য জাগল, যদি দেখা যেত ওপাশে কি রয়েছে? ভাবতে না ভাবতে সে কাজটা করে ফেলল। হাতলে মৃদু চাপ দিতে দরজাটা খুলে গেল। মস্তো ঘর, নিচের হলঘরের মতো, সার সার টেবিল, মাথা ঝুঁকিয়ে কাজে ব্যস্ত অগুনতি নারী-পুরুষ। আগন্তুকের উপস্থিতি ওরা লক্ষ্য করল না কিংবা গ্রাহ্য করল না। বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচিন নয়, দরজাটা ছেড়ে তপু এগোল। এবার উল্টোদিকের একটা দরজার হাতল ঘোরাল। মাথা বাড়িয়ে সে অবাক হল, এটা কি অফিস, না শাকসব্জি, ফলমূলের নার্সারি। চারপাশে কাচমোড়া বিশাল খামার, সবুজের সমারোহে দৃষ্টি অবশ হয়ে এল। গ্রীন হাউজ? দরজা ছেড়ে তপু হাঁটল। কিছুদূর গিয়ে আবার দরজার হাতলে হাত; যন্ত্রপাতিঠাসা ঘর, নানা বর্ণের আলো ঠিকরে যন্ত্রগুলোর চেহারা কি রকম মোহময়। একের পর এক দরজা তপু মেলে ধরছে, ফের বন্ধ করছে, কাজটা উচিত না অনুচিত, এ নিয়ে ভাবাভাবিতে যাচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে, এটাও একটা কাজ, সূক্ষ্ম নেশার অনুভূতিও যেন আছে। এত বিশাল কর্মযজ্ঞ, তপু খেই হারিয়ে ফেলল, মনে হল গোটা পৃথিবীটাই এখানে ঠাঁই পেয়েছে। হঠাৎ সে চমকে লক্ষ্য করল, কোথা থেকে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে, কর্মীসংঘের এই ভবনে যা কল্পনাতীত। কাছাকাছি একটা ভেজানো দরজা, শব্দটা কি দরজার ওপার থেকে আসছে? এক মুহূর্ত তপু অপেক্ষা করল, তারপর হাতলে চাপ দিয়ে দরজা খুলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অন্য ঘরগুলোর মতো এটাও বিশাল, টেবিল-চেয়ার নেই, তার বদলে সার সার খাট, হাসপাতলে যেমন ছোট ছোট লোহার খাট দেখেছে, সেরকম। খাটে সাদা চাদরে গা-ঢেকে শোয়া অনেকগুলো যন্ত্রণাকাতর মানুষ। দরজা খোলার সাথে সাথে সম্মিলিত গোঙানির আওয়াজ প্রকট হয়ে কানে ঝাপটা মারল।

মাত্র ক'টা মুহূর্ত, তপু দরজা ঠেলে সরে দাঁড়াল।

পরদিন প্রৌঢ়ের ঘরে ডাক পড়তে তপু ছুটল। মুখোমুখি বসামাত্র মনে হল অনেক ব্যাপারেই তার কথা বলা দরকার। কোনটা রেখে কোনটা বলে, ভাবতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলল। প্রৌঢ় চোখ তুলে তাকাতে সে বেফাঁস বলে উঠল—এখানে হাসপাতাল কেনো?

প্রৌঢ় কথাটা বুঝতে পারলেন না। ফ্যাকাশে চেহারায় শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠতে তবু প্রশ্নটা আবার ছুঁড়ল। পরমুহূর্তে তার মনে পড়ল, সে ওখানে পা টিপে চোরের মতো গিয়েছিল। এজন্যই কি তিনি তাকে আমল দিচ্ছেন না?

কিন্তু প্রৌঢ়ের হাবভাব তেমন মনে হল না। শূন্য দৃষ্টিটুকু তিনি তেমনি ধরে রাখলেন, তারপর স্বগতোক্তির গলায় বললেন – হাসপাতাল কেনো হবে? ওরা তো ফ্রেশ রিক্রুটস।

– ফ্রেশ রিক্রুটস!

প্রৌঢ় ঘাড় নাড়লেন।

– আমার মতো?

প্রৌঢ় আবার ঘাড় নাড়লেন।

– আমাকেও ওখানে যেতে হবে?

– সবাই যায়, আমাকেও যেতে হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত তপু কথা বলতে পারল না। চোখ তুলে সে মুখোমুখি তাকাল। ফ্যাকাশে চোখেমুখে বিষণ্নতা। এত বিষণ্ন, এত বিষণ্ন, তার মনে হল চিমটি কেটে বিষণ্নতা তুলে আনা যাবে।

– কিন্তু হাসপাতাল কেনো? তপু আবার আগের প্রশ্নে ফিরে গেল।

– হাসপাতাল কে বলল?

– ওরা কি অসুস্থ?

– ওরা সুস্থ, আরো সুস্থতার জন্য ওখানে রাখা হয়েছে।

– আমাকে ওখানে যেতে হবে – আমি অসুস্থ?

প্রৌঢ় চুপ করে থাকলেন, তার চেহারা কাঠ কাঠ, ভাবলেশহীন। তপু দেখল এ চেহারায় কোনো ভঙ্গি নেই ; অভিব্যক্তিহীন ঠোঁট, চোয়াল, চিবুক। ভারি কাচের আড়ালে পাথুরে চোখ। তাকিয়ে তার অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হল, সত্যিই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

পঞ্চম দিন তপুকে ডেকে নেয়া হল সাদামাটা একটা ঘরে। হাসপাতালের ব্যাপারটা মাথায় থাকায় সে অপেক্ষায় ছিল, যখন তখন ডাক আসবে। তবে এ ঘরে যখন তাকে এনে বসানো হল, সে ঠিক আন্দাজ করতে পারল না, কি ঘটবে, পরনে ঢিলেঢালা ডাক্তারি এপ্রোন নেই, তবু ডাক্তার ভদ্রলোককে তপু ঠিকই শনাক্ত করল। বুকে স্টেথো চেপে তিনি জোরে কাশতে বললেন। ডাক্তার এরপব নানা কায়দায় পরীক্ষা চালালেন। উলঙ্গ হতে বলায় তপু বিব্রত হল।

উঁচু, লম্বা টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে তপু নিজেকে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিল। উন্মুক্ত নিম্নাঙ্গে হাতের চাপ দিয়ে ডাক্তার বললেন – যৌন অভিজ্ঞতা আছে? প্রশ্নটা তপু খেয়াল করতে পারল না। তিনি তখন ভেঙে বললেন – এ্যানি এক্সপিরিয়েন্স অব ইন্টারকোর্স উইথ অপোজিট সেক্স? তপু মাথা নেড়ে 'না' জানাতে ডাক্তারের হাত থমকে গেল। কাটাছেড়ার কাজটা ডাক্তার খুব যত্নের সাথে করলেন। অপ্রাসঙ্গিক দুটো মাংসগোলক দক্ষতার সাথে বিচ্ছিন্ন করে নিপুণ হাতে সেলাই করলেন। তপু টের পেল না। কাস্ট্রেশন চেম্বারের ছিমছাম বিছানায় সাদা চাদবে গলা পর্যন্ত ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষরাতের দিকে ঘুম ভাঙতে গোঙানির আওয়াজ এল কানে। এপাশে ওপাশে সার সার খাট। এটা সেই হাসপাতাল, তপু নিশ্চিত হল। নিম্নাঙ্গ জুড়ে তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতিটা প্রথমেই মনে এল। হাতে ছুঁয়ে অনুভব করল চাদরের নিচে জামাকাপড়হীন উলঙ্গ শরীরে যন্ত্রণার ধারালো বোধটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। চিৎকাব কবতে চাইল তপু, আওয়াজটা নিজের মনে হল না, ঘড় ঘড় বিকৃত গোঙানিতে রূপ নিল। অবিকল সেই আওয়াজ, যা কয়েকদিন আগে তাকে দরজা খুলতে কৌতূহলী কবেছিল। যতই সে গলা চড়াতে চাইল, ক্ষোভে-দু:খে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইল, গলা বেয়ে একই গোঙানির আওয়াজ বেরুল। আওয়াজটা তার একক কন্ঠের থাকল না, আশপাশের সব ক'টা খাট থেকে একই আওয়াজ উঠে এল। সম্মিলিত কোলাহলে তপু নিজের কণ্ঠ হারিয়ে ফেলল।

হাসপাতালের মতো ঘরটায চারদিন কাটাল তপু। অধিকাংশ সময় ঘুমের ঘোব চোখে। জেগে উঠামাত্র অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণা শবীর জুড়ে পাক খেয়ে গলা দিয়ে সেই গোঙানির আওয়াজই সঞ্চার করল। এই চারদিন কয়েকটা বিষয তপু লক্ষ্য করল। অতীতের ঘটনা, স্মৃতি, ব্যর্থতা তাকে নাড়া দিচ্ছে না। বাবা-মা'ব কথা তেমন মনে পড়ছে না, রত্নার কথাও না। আর আশ্চর্য, এজন্য অনুতাপও হচ্ছে না।

বাসায় ফিরে তপু দেখল কারো ভেতরে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সবই আগেব মতো চলছে। আহমদ হোসেনেব বাড়াবাড়ি (যা এ কয়দিন আদিখ্যেতা ছাড়া কিছু মনে হল না), মা-বিনি-মিনির উচ্ছ্বাস, রাজীবের নিভৃতচারণ। কোথাও পরিবর্তনের আঁচড় পড়েনি। নিজের শরীরের সংগোপন পবিবর্তনটুকু নিরিবিলিতে দেখতে গিয়ে তপু বার বার হোঁচট খেল। ক্ষোভ কষ্ট যন্ত্রণার সমবেত অনুভূতি শরীর-মনে আন্দোলিত হল ; কিন্তু প্রক্রিয়া হিসেবে সেই বিচিত্র গোঙানির উপস্থিতিই কণ্ঠে স্থায়ী হয়ে থাকল।

প্রৌঢ় এই প্রথম নিজেকে অবারিত করলেন। গলায় কৈফিয়ৎ এর ঢঙ নেই ; স্বাভাবিক কণ্ঠে, ফ্যাকাশে চোখমুখে অভিব্যক্তির ছায়া না ফেলে বললেন—কাস্ট্রেশনের ব্যাপারটা প্রিমিটিভ, সব প্রিমিটিভ আচরণেব মতো এটাও ক্রুড। ষাঁড় কে বলদ, কিংবা পাঁটাকে খাসী করা হত মানুষের প্রয়োজনে— আজও করা হয, স্বার্থের প্রয়োজনে। কিন্তু আজকাল মানুষ নিজেকে কাস্টেট করছে প্রতিনিয়ত – অফিস, সংসার, ব্যবসা, রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস, সবখানে। উপায় নেই, মানুষ নিজের স্বার্থেই বন্দী হচ্ছে, বিশেষ করে এস্টাব্লিশমেন্টের। মেন্টেল কাস্ট্রেশন। আমরা এখানে ফিজিক্যালি কাজটা কবে ফেলি, এতে কমিটমেন্টে কোন ফাঁক থাকে না।

প্রৌঢ়ের বলাব ভঙ্গিতে আন্তরিকতা ছিল। তপু শুনল, শোনামাত্র হুহু হাওয়া ঝটপট করে উঠল ভেতরে। গলা দিয়ে গোঙানির ধ্বনিটা অজান্তেই বেরিয়ে এল।

ধীরে ধীরে তপু অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আয়নায় নিজের কাঠ কাঠ চেহারা (আগের চেহারাটা মনে পড়ে না), সকালবেলা দাঁত মাজার সময ঠোঁট চোয়াল চিবুকের যা কিছু ভাঙচুর, ঘুম বলতে নিখাদ ঘুম,

স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের জটাজালহীন মাথাটা খুব নির্ভার ।

রত্নার মুখটা অভিযোগঠাসা । তপুকে টানে না সে মুখ । বত্নাকে সে কী বলবে ! তাব ভয় হয়, কথার বদলে গলা দিয়ে সেই গোঙানিটা বেরিয়ে পড়বে । নিজেব অনিচ্ছুক, নিবাসক্ত হাত রত্নার কাঁধে বাখতে রত্না চমকে হাতটা সরিয়ে দেয় ; ববফঠাণ্ডা স্পর্শে তাব চোখে মুখে ভয়, ভয় ।

পেছনের দরজাব বিষয়ে তপুর কৌতূহল নেই । তার মনে হয় ঢোকাব পথ সামনে পেছনে যে কোনো দিকেই হতে পারে । বেলুন বমণীবা মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিতে ফেলে । একদিন সে জটও খোলে । আদতে ওগুলো বেলুনই, ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে পবতে হয়, বাতাস কমে গেলে যেই সেই, রবাবের বেলুন ।

বহু বছর কেটে গেছে । কর্মীসংঘেব ভবন তেমনি আছে । তপু নামটা এতদিনে বেমানান । তরুণ বয়স পেবিয়ে সে এখন রীতিমত প্রৌঢ় । বত্না তাব স্ত্রী হযেই আছে । নিবানন্দ কাটে বলে রত্নাকে দুটো বেলুন জোগাড় কবে দিতে হয়েছে । ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে যখন পবে, একটুখানি উদ্দীপনা জাগে । প্রৌঢ় বিদায় নিয়েছেন অনেকদিন । তাব জায়গায় দ্বিতীয় তৃতীয চতুর্থ অনেক প্রৌঢ় এসেছেন । তারপর তপু নিজেও যখন প্রৌঢ়, তার জায়গা হযেছে প্রথম প্রৌঢ়েব ঘবে । প্রথম-প্রৌঢ়েব কথা বেশ মনে পড়ে । আয়নায় তাকালে প্রথম প্রৌঢ়েব মুখটাই ভাসে । ভারী কাচেব আড়ালে চোখ দুটো পাথুরে, হাঁটার সময় ডান পা অল্প খুঁড়িযে হাঁটতে হয বলে অসমান কাঁধ জুড়ে মৃদু ওঠানামা ।

একদিন বছর ছাব্বিশ-সাতাশেব এক তরুণকে নিয়ে আসা হল । চোখেমুখে কৌতূহল । চেহাবার এই ভঙ্গিটা তপুব চেনা । ছেলেটা বসল । বসে সামনে একটা কার্ড বাড়িয়ে ধবল । এটি আরো বেশি চেনা । র‍্যাক থেকে একটা ফোল্ডাব খুলে তপু পড়তে শুরু কবল – তপন হায়দাব, এজ টুযেন্টিসেভেন ... । তপন হায়দার ? ফাইভ ফিট নাইন এণ্ড হাফ, ব্ল্যাক মোল অন বাইট আর্ম । তপু নিজেব ডান হাতের কনুইয়ের ওপর চোখ বাখল, জড়ুলটা এতদিনে রঙ মবে ফ্যাকাশে বাদামী । চেস্ট থাব্‌টিসেভেন, ননস্মোকিং, এক্সপেকটেড সেলাবি ... কিছু নেই । তপন হাযদাব ?

মুখোমুখি বসা তরুণ সলজ্জ হাসল । তপু চমকাল, বিশ-বাইশ বছব আগে আয়নায় দেখা মুখ । সেই চোখ, নাক, ঠোঁট । কেবল দৃষ্টিটা স্বচ্ছ, সংশয নেই ।

কথা বলতে গিয়ে তপু হোঁচট খেল । দীর্ঘদিন এমন অভিজ্ঞতা হযনি, কী রকম বিচলিত মনে হচ্ছে নিজেকে, যা তার বর্তমান শাবীবিক, মানসিক অবস্থায ঘোবতব বেমানান।

বিচলিত অবস্থা থেকে তরুণ রক্ষা কবল, বলল — আমার কোনো দোটানা নেই, পিছুটান নেই, আমি প্রস্তুত ।

এমন তো কেউ বলে না । প্রথম-তপুব খটকা লাগল, দ্বিতীয়-তপু নতুন কথা বলছে । যেন এক্ষুণি তৈরি, ছুবি-কাঁচিব নিচে ভাবমুক্ত হতে চায । যেন ব্যাপারটা কৌতুককব, আগ্রহেরও । কিন্তু বিশ-বাইশ বছব, হতে পারে তাবও আগে, আযনায দেখা মুখটাব দিকে তাকিয়ে প্রথম-তপুব অন্য কথা মনে হল — এমনও তো হতে পারে, বিশ-বাইশ বছব আগে খোয়া যাওযা সম্ভাবনাকে ফিরিয়ে নিতে চায় দ্বিতীয়-তপু, বানচাল কবতে চায সব । হতে পারে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, দুষ্কৃতী । বিশ-বাইশ বছর আগেকাব নিজের পরিস্থিতির সাথে এব কত তফাৎ !

– রত্না কোথায় ? প্রথম-তপু জিজ্ঞেস কবে ।

– রত্না ? বোঝা যায়, এ নামে কাউকে চেনে না দ্বিতীয়-তপু ।

– রাজীব ?

– ওহ্ দাদা – আত্মহত্যা কবেছে ।

– আর ?

– রিনি-মিনি আপাতত বেলুন পেয়ে খুশি ।

– আর ?

– আর ?

– আহমদ হোসেন, তসলিমা খাতুন ?

– আজকাল ঘ্যান্ ঘ্যান্ কম করে । আমাব সাফল্যে দু'জন খুশি ।

আত্মবিশ্বাসী তরুণকে নিয়ে তপু ঘর থেকে বেরোয় । বিশ-বাইশ বছর কিংবা আরো আগেব সেই পুরনো ছবি—সার সার ভেজানো দরজা, ডানে-বামে বাঁক খাওয়া করিডোবের গোলকধাঁধা ।

প্রথম-তপুর ভয় হয়, পেছন থেকে তরুণ তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে। তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখায়। ডানে-বামে অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে একটা দরজার মুখে প্রথম-তপু থামে পেছন পেছন দ্বিতীয়। সাদামাটা লিফটের দরজার মতো দরজা, কাচবসানো হলেও ভেতরে আলো নেই বলে অন্ধকার। তরুণকে তপু এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে। তরুণ এগোয়, দুই পা বাড়িয়ে দরজা খুলে ভেতরে ডান পা-টা বাড়ায়, তল পায় না, পা ডুবে যেতে থাকে, যেন পাঁকে গেঁথে যাচ্ছে শরীরটা খাড়া করতে, টেনে তুলতে চেষ্টা করে। যন্ত্রণা, কষ্ট, আর সেই সাথে দুর্মর সাহসের, শক্তির একটা গতিচঞ্চল ঘূর্ণি ঝক্‌মকিয়ে ওঠে। – এবং আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় শরীরটা সাপের মতো বাঁকিয়ে, মোচড়ে বাঁ পায়ের ওপর প্রায় খাড়া করার উপক্রম করে। আধখোলা দরজায় প্রথম-তপু হাত রাখে, একমুহূর্ত দ্বিধা করে, তারপর দরজাটা ধাক্কা মেরে বন্ধ করে দেয়। বন্ধ দরজার ওপারে, তলকুঠুরির ভেতর পতনের আওয়াজটা ভোঁতা আর সুদূর।

কত কাল হয়ে গেল! দোটানা-টা যাই যাই করে যাচ্ছে না।

রাহাত খান

আমাদের বিষবৃক্ষ

১৯৫০ সালের কথা।

আমাদের শহবে বর্ষা গিযে শরৎকাল এল। আমরা তিনবন্ধু মাখনলাল, রায়হান ও আমি বিকেল হলেই করবী গাছটার নীচে যেয়ে বসি। একটু দূবে বাঁধানো ঘাট সুমুখ দিয়ে ধীর-শান্ত ব্রহ্মপুত্র বয়ে যায়।

সেদিনও বিকেল বেলা যথাবীতি বসে আছি। নদীর ওপব তরলা বাঁশেব ভেলা ভাসছে। বেদে-বেদেনিদেব নৌকার বহর একটু একটু দুলছে ঢেউয়ে। কবিরাজ জ্ঞানমোহন চক্রবর্তীব বাড়ী আমাদের থেকে হাত বিশেক দূরে মাত্র, মাঝে কাঁটামেদির বেড়া। নীচে অজস্র দলকলস ফুটে আছে। বড় বড় ঘাসের চাপড় নেমে গেছে নদীর দিকে। ফুবফুরে বাতাসে তাজা উদ্ভিদের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। মাখনলাল বিড়ি ধরিযে ভোঁস করে নিঃশ্বাস টেনে বলে গাড্ডা মারলে, বুঝলি, আমি নাই। সোজা কাইটা পড়ুম কইলকাতায।

রায়হান জামার খুঁট দিয়ে চশমা মুছল। বহু দূবে তাকিযে আছে। চোখে মুখে খুব উদাস। বলল ঃ চিন্তা কবিস না। ফেল আমিই কবতাছি। অঙ্কে তো নির্ঘাৎ। আরে আনসারই দিলাম টুয়েন্টি এইটেব। আমাবে পাস কবায় কোন্ ব্যাটায ?

এই বলে চশমা পবল। মাখনলাল বলে ঃ মুশকিল।

আমবা তিনজনই ম্যাট্রিক পবীক্ষা দিযে বসে আছি। ফল বেকবে মাস খানেকের মধ্যে। দিনগুলি কাটছে ঘুবে ফিবে বেড়িযে আড্ডা দিযে বই পড়ে। কখনো যাই অর্চনাদি'ব গোলাপ বাগানেব বাড়ীতে। কিন্তু বেজাল্টেব কথা ভাবলেই মন খাবাপ হযে যায। মাখনলালেব ভযের কারণ নেই, আমবা ঠিক জানি ও পাস কববেই, ভাল ডিভিশনও পাবে। ওব স্বভাবটা আসলে ওবকম, পরীক্ষা দিয়ে সবসময় খুঁত খুঁত করে কিন্তু পবে দেখা যায় বেশ ভালভাবেই পাস কবেছে। মাখনলালের কোন চিন্তা নেই। ওর বাবা বড়বাজাবেব আড়তদাব, নামকবা ব্যবসাযী। প্রচুর টাকা-পয়সা। দেখতে শুনতেও মাখনলাল আমাদেব মধ্যে ফর্সা, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। মাথাযও খানিকটা বড়। আমবা জানি মাখনলাল কলকাতা ঠিকই যাবে। কিন্তু ভয আছে আমার ও বাযহানেব। আমবা কেউ ভাল পবীক্ষা দিইনি। মাখনলাল ফেলেব কথা বলে আমোদ পায় কিন্তু আমাদেব যখন ওকথা মনে হয় তখন বুকেব ভেতরটা খালি হয়ে যায।

বাযহান বলে ঃ একটু সাহস কইবা এগারোব উপপাদ্যটা যদি টুইকা আসতে পারতাম। উঃ গড! ছাক্কা তেবোটা নম্বব!

আমরা এইবকম কথাবার্তা বলছি আর তখন চাবদিকে আলো মৃদু হযে আসছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি জ্ঞান চক্রবর্তীব বাড়ীর ঘাটে ঝলমল কবছে শেষবেলাকাব বোদ। মনে হয় এক হাজার ফ্লাড লাইটেব আলো সেখানে কেউ জ্বালিয়ে বেখেছে। এই বাঙা ঝিলিমিলির মধ্যে ঘাটের সিঁড়ির ওপর বসেছিল জ্ঞান চক্রবর্তীর মেযে দীপালী। দীপু বোধহয আমাদের দেখছিল। আমরা তাকালাম দেখে উদাস হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

দীপুর পিঠে একরাশ চুল। সবুজ জামাব ওপব হলুদ ছোপ দেওয়া প্রিন্টেব শাড়ী পরেছে। দীপুর দিকে আজকাল তাকানো যায় না। কি বড়োসড়োই যে হযে গেছে ' শাড়ী পবা দীপুকে দেখে মনে হয় না এই মেয়ের সাথে দু'বছব আগে আমরা নদীতে স্নান কবেছি, ডুব দেওযা খেলা খেলেছি। ওর শরীরে কিরকম একটা অচেনা অজানা আলো ফুটে থাকে। হঠাৎ দেখে দীপুকে আজকাল চিনতে পারি না।

মাখনলাল দীপুব দিকে তাকায়। দীপুও তাকায়। আবাব মুখ ফিরিয়ে নেয। তখন মাখনলাল, মুশকিল বলে একটা বিড়ি ধরায়। তাকে অস্থির দেখাচ্ছিল। বলল : তোগরে একটা মজাব খেইল দেখাইব।

আমি বললাম : বি কেয়ারফুল। কেউ দেখলে কিন্তু বাবোটা বাজিযে দেবে।

রায়হান অবজ্ঞাব সাথে বলে ছা'তা করব।

রায়হান সমর্থন দিয়েছে দেখে একগাল হাসল মাখনলাল। আমাব উদ্দেশে বলল : পোলাপান তো জব্বর ভীতু। বাচ্চু মিযা কোন চিন্তা নাই। তুমি খালি খেইল দেখবা আর চুপ কইবা থাকবা।

এই বলে মাখনলাল নিবীহের মত বাঁ হাতটা কপালে ঘঁষতে থাকে। আশ্চর্য, তাকিয়ে দেখি দীপুও অন্যদিকে তাকিযে হাতটা কপালে তুললো। মাখনলাল নাক ঘষল। দীপুও নাক ঘষল। এবং সূর্যের দিকে মুখ কবে হেসে উঠল। আমরা দারুণ উৎসাহিত হযে উঠলাম। মাখনলাল তখন ঝুলা ছবির নায়ক অশোক কুমারের ভঙ্গিতে গাইছে : না জানি কিধার আজ মেরে নাও চলিরে। রায়হান ফিসফিস কবে মাখনলালকে পরামর্শ দেয় : এ্যাই মাউরা, চিঠি লিখতে ক। হাত দিয়া ইশারা কব। বায়হানেব কথামত মাখনলাল তাই করল। বামহাতেব তর্জনীটা কলমের মত চালাতে চালাতে হাসিমুখ কবে দীপুকে চিঠি লিখতে বলল। ঠিক এই মুহূর্তে পোলাপানগুলি তোমরা এইস্থানে বইসা কি কবতাছ বলে স্বয়ং কবিরাজ জ্ঞানমোহন চক্রবর্তী আমাদের পিছন দিক থেকে এসে আবির্ভূত হয।

চিন্তা করা যায় না! মাখনলাল ও বায়হান 'ওবে বাপবে' বলে বাঘের মত গর্জন কবে দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়ল, দৌড়ে পালাল। কবিরাজ মশাযের থাবার কাছে পড়ে গেলাম। তাকিযে দেখি মাথার ধবধবে সাদা চুলের নীচে জ্ঞান চক্রবর্তীর শিশুর মত সতেজ মুখখানা বাগে জ্বলছে।

আমাব তখন ভূমিকম্প হচ্ছে। না পাবছি পালাতে। না পাবছি দাঁড়াতে। তখন এগিযে এসে আমার বাঁ গালে একটা ডানগালে একটা থাপ্পড় বসিযে খুব শান্তশিষ্ট গলায় যেন পবম স্নেহে জ্ঞানচক্রবর্তী বলল, 'ভগ্নীর সমান মাইয়াদেব পিছনে আর লাগতে আইসো না, কেমন ? আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তোমার পিতাব সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করব।'

আশ্বিনের মাঝামাঝি শুরু হয় একনাগাড়ে, বৃষ্টি, তাব সাথে তুমুল বাতাস। থেকে থেকে একবাব আসে এই বাতাসেব ঝাপ্টা, বৃষ্টির সূচগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয চারদিকে, হুমহুম আওয়াজ হয। কি বিচ্ছিরি দিন, আকাশের দিকে তাকালে মন খারাপ হযে যায়।

ছোটন চাচা বলল, এই বৃষ্টি শীত নিয়ে আসবে দেখিস।

আমবা গোল হয়ে বসে সকালেব নাস্তা খাচ্ছি। বাবা, ছোটন চাচা, দুলি ও আমি। আমাদেব বাসার ঝি মোতিব মা বসে আছে পিঁড়ির ওপর একটু দূরে। ছোটন চাচাব কথা শুনে বাবা মাথা নাড়ে। আমাদেব নাস্তা শেষ হলে মোতির মা কাপ পিবিচ গুটিযে রাখে মিটসেফে। ছোটন চাচা একবাব আড়চোখে মোতিব মা-র দিকে তাকাল। বাবার মুখ দেখলাম গম্ভীর হযে উঠেছে। একটু পর একই ছাতায় বাবা ও ছোটন চাচা চলে যান দোকানে।

হাওয়ার বেগ একটু কম এসেছে। বাইবে টিপ টিপ বৃষ্টি। বসে আছি বাংলা ঘরের দাওয়ায়। নদীর দিকেব রাস্তা ধবে যাচ্ছে গরুর গাড়ী, তেরপাল দিয়ে ঢাকা গাড়ী বোঝাই নোনা ইলিশ। ঝাঁঝালো মসলার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। দুলি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল, বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিযে পড়েছে। 'দুলি, এই দুলি' বলে আমি বারকয় ডাকলাম, সাড়া পাওয়া গেল না। দুলি হা কবে ঘুমোচ্ছে। মা মারা যাওয়ার পর দুলি ঐরকম হয়ে গেছে যেখানে সেখানে চলে যায়। একদিন সানাউল হক সাহেবের গ্যারেজে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, অল্পের জন্য এ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। বাবা ম্যালা শাসন করে। কানমলা দেয়, চুল ধরে ধুপধাপ পিঠে বসায়, দুলিটা এমন অদ্ভুত, চেঁচিয়ে কাঁদেও না।

সুযোগ পেলেই বেরিয়ে যায়, কারো বাড়ীর গেটের কাছে গিয়ে কাঙালেব মত দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো গুটিসুটি মেরে শোয়, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ডাকাডাকির পরও দুলি উঠছে না দেখে মোতির মাকে ডাক দিই। মোতির মা শক্ত সমর্থ মেয়ে মানুষ, দুলিকে পাঁজাকোল করে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

বৃষ্টি থামল না সারাদিনও। পরদিন বৃষ্টি বাতাস কিছুই ছিল না, কিন্তু আকাশ ছিল খুব থমথমে। হাল্কা নীল রঙের কুয়াশা ভাসছিল এদিক সেদিক। বাইরে এসে দেখি নালার ধারে বড় বড়

ঘাসের ডগায় শিশিব জমেছে । হাঁটতে হাঁটতে গেলাম নদীব ধাবে । করবী গাছটার নীচে যেয়ে দাঁড়ালাম । মন খারাপ হয়ে যাওয়ার মত মেঘলা আকাশ । শম্ভুগঞ্জের ঘাটে বাঁধা আছে মহাজনী নৌকা । দু'একজন স্নানার্থী দেখা গেল ঘাটে । তাকালাম দীপুদেব ঘাটের দিকে । কেউ নেই, তীরের একগুচ্ছ নারকেল গাছ হেলে আছে পানির ওপব ।

আমি দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখছি নিসর্গ, দেখছি কুয়াশাব পাতলা ছায়া কেটে যেয়ে চরাচব উন্মুক্ত উদ্ভাসিত হচ্ছে, বহু দূরের চরায় উড়ছে ঝাঁক ঝাঁক বালিহাঁস । দেখছি ওপারে শম্ভুগঞ্জের প্রকাণ্ড কড়ই গাছগুলি নীল কালো ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে ঠিক প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না,—তখন পিছনে ক্রিং ক্রিং শব্দ । ফিবে তাকিয়ে দেখি মাখনলাল । দুই পা মাটিতে রেখে সাইকেলের ওপর বসে । হাসছে আব ঘন্টি বাজাচ্ছে । 'আয়, উইটা আয' মাখনলাল ডাকল ।

বললাম : কোথায় ?

মাখনলালেব চোখ মুখ গম্ভীর হয়ে যায় । বলে, অর্চনাদিব খুব বাড়াবাড়ি চলতাছে । চল, দেইখ্যা আসি ।

অর্চনাদিব বাসা জেলখানা রোডেব শেষ মাথায । উঁচু প্রাচীব দেওয়া বাড়ী । বাড়ী মানে ছোট, নীচু ছাদওয়ালা একটা দালান, তিনখানা মাত্র ঘর । বাড়ীব বাদবাকী অংশে গোলাপেব ঝাড় । নানা জাতেব নানা বঙের গোলাপ গাছ । যেদিকে তাকান যায় গলা সমান উঁচু ঝাড়, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, সবুজ পাতাব ফাঁকে ফাঁকে মসৃণ বেগুনি রঙেব ছোপ, দু'চাব পাঁচটা মরা বিবর্ণ পাতাব আর নীচে মাটিতে উইয়েব রঙিন পাখনাব মত অজস্র পাঁপড়ি । গোটা বাড়ীটাই গোলাপ বাগান, ছোট একটুখানি দালান একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে আছে । গেট খুলে ঢুকলেই থমকে দাঁড়াতে হয় । এ যেন একটি উৎসবের মেলা বসান হয়েছে, সেখানে ফুল, সবুজ পাতা ও উড়ন্ত প্রজাপতির প্রদর্শনী । অর্চনাদি এ বাড়ীতেই থাকে ।

এব আগে অর্চনাদি-র বাসায় গিয়েছি মাখনলালেব সাথে, তবে সাতসকালে এই প্রথম । আমাব খুব অস্বস্তি হচ্ছিল । অর্চনাদি ভীষণ সুন্দবী, ভীষণ মেজাজী । তাব বাড়ীতে আছে হৃষ্টপুষ্ট, বাঘেব মত ভয়ঙ্কব এক এ্যালসেসিযান, আব এক নেপালী ঝি, তাকে আমবা কথা বলতে শুনিনি, হাসতে দেখিনি । অর্চনাদি সব সময় সেজেগুজে বসে থাকে । আমি অর্চনাদিকে একদম বুঝতে পাবি নি । ভয় কবে আবাব ভালও লাগে । মাখনলাল একবকম জোর করেই আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, অর্চনাদিব বাসায । বলল, বিকালে ম্যালা ক্যাটকাল হয ঐ বাসায ; সকালেই ভাল । চল্ চল্, দিদি খুশী হইব ।

অর্চনাদি মস্ত এক জোড়া খাটে শুয়েছিল । তাব কি যে অসুখ কেউ জানে না । ডাক্তাবেব আসা-যাওয়া লেগেই আছে । আমি তো বুঝতেই পারি না এমন ফর্সা, সুন্দবী, তেজী কোন মহিলার অসুখ-বিসুখ থাকতে পাবে । শুধু বহুদিন থেকে শুনে আসছি অর্চনাদি অসুস্থ । তাব স্বামী গোমেজ বাবু কলকাতা থাকে, আসে-টাসে না, অনেকে বলে লোকটা আর আসবে না । অর্চনাদি আমাদেব দেখে খুব খুশী, উঠে বসে বলল আয । কুকুবটা তোবে দেখে নাই মাখন ?

: না ।

: ভাগ্যিস দেখে নাই । দেখলে চিল্লাচিল্লিব একশেষ কবত । বুঝলি, বাবু'ব খুব হিংসা । বিছানা ছেড়ে নীচে নামে অর্চনাদি । মেঘেব মত কালো চুল এলোখোঁপায বাঁধল । মুখ একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে । তবু মনে হয না অর্চনাদি অসুস্থ । মাখনেব 'খুব বাড়াবাড়ি চলতাছে' কথাটির অর্থ বুঝতে পারলাম না ।

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অর্চনাদি একটু সন্দিগ্ধ গলায় মাখনকে জিজ্ঞেস করে : কে জানি রে ?

মাখন বলে, চিনতে পারতাছ না, আতাউব ।

: ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আতাউর । নামটাম একদম মনে বাখতে পাবি না আমি । হ্যাঁ বে আতাউব, তুই তো দিদিবে খুব ভালবাসস, না ?

আমাব ফ্যাকাসে হয়ে পড়া মুখখানি দেখে মাখন কেন যেন একটু লজ্জা পায় । বলে, বল না আতাউব, দিদি জিগাইতেছে ।

অর্চনাদি বলল, আর জিগায়া কি হইব । এই ছেমড়া আমারে ভালবাসে না ।

বললাম, হ্যাঁ বাসি।

বললাম, তৎক্ষণাৎ মুখটা আপনাআপনি নীচে ঝুলে পড়ল। দেখে অর্চনাদি হাসতে লাগল। মাখনলাল হাসতে লাগল।

সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে মেঘের দল ছিন্নভিন্ন করে দিযে। আকাশের যেদিকে তাকানো যায় চোখে পড়ে মেঘের স্তূপ, ফাঁকে ফাঁকে খুব পরিষ্কার নীল রং, রোদ আর প্রতিহত হচ্ছে না, চারদিক ঝলমল করছে।

মাখনলালের খুব তাড়াহুড়া। আমাকে বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে ছুটতে চায়। বলল, বাবা নির্ঘাৎ খুঁজতাছে। আর দেরী করলে মার্ডার কইরা ফালাইব।

মাখনলালের কথা ওরকম। নিজকে সবসময কোণঠাসা করে রাখে। ওতে যে কি সুখ, সেই জানে। একবার টার্মিনেল পরীক্ষায় আমাদের বি সেকশানে হাইয়েষ্ট মার্ক পেয়েছিল, ক্লাসের ফার্ষ্টবয় অরুণ সে কথা তুলে মাখনের প্রশংসা করতে শুরু করলে মাখনলাল অম্লানবদনে বলেছিল : টুকলিফাই করলে পামু না হাইয়েষ্ট মার্ক। ফাইন্যালে দেখবা কতবড় একখান লাড্ডু পাই।

মাখনলাল নিজেকে শুধু নীচু করতে চায় না মেয়েদের ব্যাপারে। আমি যদি এক্ষুণি বলি 'অমুক মেয়ে তোকে পছন্দ করে' তাহলে কিছুমাত্র না ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে মাখনলাল বলবে 'সত্যি' মেয়েদের প্রসঙ্গ উঠলে মাখনলাল বদলে যায়, তীব্র হয়ে ওঠে ওর চোখ দু'টি, অস্থির হয়ে যায়। অনেক মেয়ে ওকে পছন্দ করে। আমাদের মধ্যে ও যেন রাজপুত্র। ফর্সা রং, কাটা কাটা চেহারা, লম্বা, সতেজ শরীর। আমি, রায়হান আর মাখনলাল রাস্তায় থাকলে দেখি স্কুল কলেজের মেয়েরা আড়চোখে মাখনলালের দিকেই তাকায়! 'শালা মাউবার যন্ত্রণায় আমাগো কপালে কিছু জুটব না,' এই রকম কথা তো প্রকাশ্যেই বলে রায়হান। মাখনলাল রাগ করে না বরং খুব উপভোগ করে আমাদের কথা, মুচকি মুচকি হাসে। মেয়েদের নিয়ে শুধু জিততে চায় মাখনলাল, এই সাবজেক্টে যেন হাইয়েষ্ট মার্ক পেতে চায়। আর সব ব্যাপারে খুব শীতল। খুব নিস্পৃহ। নিজেকে নিজে কোণঠাসা করে রাখে।

বললাম : কি করবি বাসায় গিযে ?

মাখনলাল বলে : ছাতা করুম। করুমটা আবার কি। দুর্গাপুর থাইকা আসছেন বাবার গুরুদেব। দশাসই চেহারা। শরীরে কম কইরা হইলেও দুই কম্বল লোম। ইয়া লম্বা দাড়ি। দেখলে ডরাবি। আর খাওনের সময় মাংস যা মারে না, উ:, ডেঞ্জারাস! গুরুদেবের সেবা করতে হইব। তিনি নাকি ভাল পাসের মাদুলি দিবেন।

'ভাল পাসের মাদুলি দেবেন' শুনে আমারও বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল ? খুব ইচ্ছা হল বলি, আমাকে একটা মাদুলি নিয়ে দিবি ? কিন্তু লজ্জা করতে লাগল, কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

মাখনলাল বলল : 'চলি।' বলল, কিন্তু দু'পা মাটিতে ঠেকিয়ে সাইকেলের ওপর তেমনি বসে রইল। আমরা দাড়িয়ে আছি নারকেল গাছটার নীচে। বড় বড় ঘাস, লতা, ঝোপ আর কচুপাতার জঙ্গলে ভেতর দিয়ে তির তির করে বইছে একটা নালা, তার ওপর তক্তা ফেলে আমাদের বাসায় যাওয়ার পথ। আমাদের ছাযা গিয়ে পড়েছে রাস্তার লাল সুরকির ওপর। নারকেল গাছের পাতা বাতাসে হেলছে, দুলছে অলসের মত। মোটামুটি পরিষ্কার উজ্জ্বল দিন। মাখনলাল উদাস হয়ে আছে। ওপর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে বলে, মুশকিল।

আমি বললাম : অর্চনাদি'র বাসায় আর কবে যাওয়া যায় ? মাখনলাল এই কথার জবাব দিল না। রাস্তা ছিল নির্জন। কেশবপুর লজের প্রাচীর বিশাল টবের মত ওপরে ধরে রেখেছে বাগানের গাছপালা। মাখনলাল হঠাৎ 'চলি রে' বলে নির্জন ফাঁকা রাস্তায় খামোকা অনবরত বেল বাজিয়ে ছুটলো। সামনের দিকে মাথা নুইয়ে দ্রুত প্যাডেল করছে মাখনলাল, দেখতে দেখতে নোনা ইলিশের গুদামটার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাসায় পা দিতেই ছোটন চাচার সঙ্গে দেখা। তক্তপোষের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে,

ভাল রকম তাকিয়ে দোখে কাঁদছে, হাতের চেটো দিয়ে চোখের পানি মুছছে। বাসায় যে সকাল বেলা লণ্ডভণ্ড কিছু একটা ঘটে গেছে তক্ষুণি বুঝতে পারলাম এবং ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গেল। আমাকে দেখে ছোটন চাচা বলল, এই দ্যাখ্ আতা, তোর বাপ আমাকে মেরেছে। তোর বাপ আমাকে সম্পত্তির অংশ দেয়নি, চাকরের মত দোকানে খাটায় আর মারে। এই দ্যাখ, বেতিয়ে আমার পিঠের কি অবস্থা করেছে ?

তখন আর কাঁদছিল না ছোটন চাচা। জামা খুলে পিঠ দেখাল। এ যেন মস্ত এক ঘটনা, ছোট চাচা যেখানে প্রধান চরিত্র এবং সেই ভঙ্গিতে শরীরের কোথায় কোথায় মার পড়েছে, বাবার কোন্ লাথিটা লাগেনি, আগেই সরে পড়েছে উল্টে বাবাই পায়ে ব্যথা পেয়েছে, এইসব অনুপূর্বিক বলতে লাগল। ছোটন চাচা ঐ রকম, একটু বেশী সরল, কখনো খুব জেদী, একগুঁয়ে, বাবাকে গালিও দিয়ে দেয় কোন সময়। ছোটন চাচা বলল : তোর বাবা আমাকে সম্পত্তির অংশ দেয়নি কেন ? আমিও তাহলে একটা দোকান দিতে পারতাম। দ্যাখ পায়ে কি রকম বেতের গিঁট লেগে বসে গেছে।

আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। মা মারা যাওয়ার পর আমাদের সংসারে কোন আনন্দ নেই, দোকান আর ভাল চলছে না, ছোটন চাচা আর দুলি প্রায়ই মার খায় বাবার হাতে এবং যেদিন ঐরকম হয় সেদিন বুঝতে পারি বাবার হাতে একদম টাকা-পয়সা নেই, হয়ত বাজার হবে না সেদিন। আজও হয়ত সে-রকমের অবস্থা। কেন জানি না, বুকের ভেতর অসহ্য একটা ক্ষোভ উথলে উঠতে লাগল। কাপড়জামা না ছেড়েই গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুঁজে শুয়ে কত কি যে ভাবছিলাম! আমাদের মুর্শিদাবাদের বাড়ীঘরের কথা, উঠোনে খড়ের প্রকাণ্ড স্তূপ, গোয়ালে একজোড়া কালো গাই, বাঁদায় দুপুরবেলা চিলের ডাকাডাকি আর মায়ের চেহারা সব মনে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর সেই ক্ষোভটা আর রইল না। অর্চনাদি'র কথা মনে পড়ছিল। অর্চনাদির যে কি অসুখ বুঝতে পারি না। সেই অতো ভোরে আমাকে আর মাখনলালকে দেখে দারুণ খুশী হয়ে উঠেছিল বলেছিল দুপুরে খেয়ে দেয়ে বিকেলে যেতে। 'তিনজনে মিইল্যা নদীর চরে যামু, থাইক্যা যা' অর্চনাদি মাখনলালকে বলেছিল। মাখনলাল অর্চনাদিকে ভয় করে, ভক্তি করে, ভালবাসে ভীষণ রকম। খাটে শুয়ে গল্প করছিল অর্চনাদি, গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়ে একসময় বলল, এ্যাই ছ্যামড়া, এদিকে আয়। মাখনলাল পাশে যেয়ে বসলে অর্চনাদি ওর মাথার লম্বা চুল টেনে ধরেছিল। মাখনলাল উহু-হু করছিল বটে কিন্তু হাসছিল। অর্চনাদি ঐ রকম। কী যেন তার অসুখ আমরা জানি না। মাথার চুল টেনে ধরলে তবে বুঝতে হয় অর্চনাদি তোমাকে ভালবাসে। ছবির মত ঝকঝকে সুন্দর দেখতে এই মহিলা, পাশটিতে বসলে চন্দন, গোলাপ, বেলি বা কেয়া, কিসের যে সুগন্ধি পাওয়া যায় আর সব মিলিয়ে কি রকম যে ভাল লাগে। অতো বড় এক বাগান বাড়ী, সে বাড়ীর নির্জন এক কোণে কেন যে একা একাকী থাকে অর্চনাদি। গোমেজবাবুকে আমরা দেখিনি, তার কথা শুনেছি, সেই লোকের কি চোখ নেই, চিনতে পারে না অর্চনাদিকে ? অর্চনাদির আছে বাঘের মত ভয়ঙ্কর দেখতে এক কুকুর, বাঘা, আছে খুব চুপচাপ এক নেপালী আয়া, যার চোখ দু'টি সবসময় ভাবলেশহীন আর সারা অঙ্গন জুড়ে গোলাপের ঝাড়, নীচে মাটিতে উঁই পোকার রঙিন পাখার মত অজস্র পাঁপড়ি পড়ে আছে, এই তো অর্চনাদির সংসার। কিছুদিন আগে সৌরিন্দ্রমোহনের একটা ডিটেকটিভ বই পড়েছিলাম, অর্চনাদিকে কখনো মনে হয় সে বইয়ের একটি চরিত্র। সেই রকম রহস্যময়ী। অর্চনাদি কি মাঝরাত্তিরে উঠে কুয়াশার ভেতর হেঁটে হেঁটে নদীর ধারে যায়, এবং একটা নীল আলো জ্বালিয়ে কাউকে সঙ্কেত দেয় ? এরকমটা হলে অর্চনাদিকে খুব মানাত। আমার তাই মনে হয়।

একটু পর বাবা এল। বাবা আসছে টের পেয়ে আমি চোখ বুঁজে পড়ে থাকলাম, বলতে চাইলাম আমি ঘুমোচ্ছি। টের পেলাম ঘরে ঢুকেই বাবা আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। অনেকক্ষণ কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে চোখ দু'টি সামান্য খুলে পিট পিট করে তাকালাম। দেখি বাবা আলনার কাছে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ছে।

একটু পর কপালে নরম স্পর্শ অনুভব করলাম। বাবা।

: বাজান, কি হয়েছে তোমার ?

: কিছু হয়নি।

: উঁহু, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তা নাইলে তুমি এভাবে শুয়ে আছ কেন ?

আমি তখন এক ঝটকায় বিছানা থেকে উঠে বলি : তুমি ছোটন চাচাকে মারলে কেন ? বাবা তক্ষুণি নিভে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। আমি আর কথা না বলে আলনা থেকে লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে ছুটলাম নদীর দিকে। বোঝাতে চাইলাম, এই যে মারামারি, সংসারে অশান্তি হয় যাতে, ওসব পছন্দ করি না। আসলে বাবার এইরকম আদরে অস্বস্তি লাগছিল বলে গোলস করার নামে পালাবার উপায় করলাম।

বাপজান বলে ডাকলেই বুঝতে পারি বাবা এখন ভীষণ নরম। এ সময় বাবাকে দেখলে আমার খুব অস্বস্তি হতে থাকে। বাবা আমাকে পাঁচ বছর, ছ'বছর বয়সের বাচ্চা ছেলেটির মত কেন যে ভাবে ! আমার রাগ হয়। একদিন বলেছিলাম 'বাবা, তুমি ওরকম করো কেন', শুনে বাবা খুব হেসেছিল।

মা বেঁচে থাকার সময় বাবা ছিল একটু রগচটা, একটু বদমেজাজী। মা'র তো ছিল চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যেস, বাবা এ নিয়ে প্রায়ই রাগারাগি করত। মা তক্ষুণি নিভে যেত। ভয়ও পেত। বলত, কি জানি বাপু, অমন চেপেচুপে কথা বলতে জানিও না, ভুলেও যাই।

বাবা বলত, অনেকদিন মানা করা হয়েছে, ভুলে যাও কেন ?

বাবা তখন ছিল একটু অহঙ্কারী। নাকের নীচে বাটাবফ্লাই গোঁফ ছিল। বাঁশীও নাকি বাজাত এককালে। আমরা শুনিনি, তবে মা মাঝেমধ্যে সেই কথা বলত। এক-আধদিন বাবা ও মা বিকেলবেলা বাঁদা পার হয়ে কড়ুই, রাধাচূড়া আর অশ্বত্থের গাছগাছালি ঘেবা ছায়াময় বার্ণীদীঘির ধারে বেড়াতে যেত। বেড়াতে যাওয়ার সময় মা ট্রাঙ্ক থেকে তার নীল শাড়ীটা বার কবে পবত, সেই শাড়ীব মোটা আঁচলে ছিল হলুদের রেখা, হিজিবিজি জরিব ফুল, খুব সুন্দর দেখাত মাকে, চোখমুখ থেকে এক রকমের আলো ফুটে বেবোত। মাযের মুখটা এখনো আমাব চোখে পরিষ্কাব ভাসে।

মা মারা গেল ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে। শেষের দিকে মেজাজ হয়ে গিয়েছিল খিটখিটে। যখন তখন কান্নাকাটি করতে বসত। বাবাও তখন থেকে শুকোতে শুরু কবল। তখন আবার দাঙ্গাব সময। হিন্দুরা মিটিং কবতো আমাদের নীলমণিপুর স্কুলেব মাঠে, আমাদেব মৌলানা হেশামউদ্দিনকে একবার ওরা দাড়ি টেনে খুব অপমান কবেছিল। এই সময়টাই মারা গেল মা আব বাবাও বদলে গেল, থুঁতনির নীচে একটুখানি দাড়ি রাখল, ভীতু ভীতু হযে গেল চোহারাটা। কথাবার্তা বলত না বিশেষ। সবাইকে তোয়াজ তোষামোদ করে বেড়াত। আমার ও দুলিব সাথে খাতিব জমাবাব চেষ্টা করত আপ্রাণ। আমরা অবশ্য তখনও মাইগ্রেট করিনি। নীলমনিপুবের বহু কথা আজও আমাব বেশ মনে পড়ে। মনে পড়ে বাবার সেই অহঙ্কাবী, রাগী চেহারা। নাকেব নীচে বাটাবফ্লাই গোঁফ। যে এককালে বাঁশী বাজাত, কথা বলত চেঁচিযে, রাগ কবলে তাকেই আমাব বাবা বলে মনে হয। কাবো বাবা নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে যেমনটা দেখায় বাবাকে লাগে আজকাল সেবকম। মুশকিল, মেলাতে পাবি না।

পরদিন বিকেলের দিকে বায়হান এল। অর্চনাদিব ওখানে যাওযাব কথা বললাম। একটু বাড়িয়েই বললাম। দিদি আমার চুল টেনে ধবেছিল। আসলে দিদি তো টেনেছিল মাখনলালের চুল। কিন্তু কেন জানি না ব্যাপারটা জুড়ে দিলাম আমার নিজের মধ্যে। রায়হান মনে হল ক্ষুণ্ন হয়েছে। বলল, আমারে লয়া গেলি না ক্যান ?

: বা:, আমাকে তো নিয়ে গেল মাখনলাল।

: অ শালা মাউবাব খালি পার্সেলিটিং। আমারে লয়া গেলে কি ক্ষতিটা হইত !

আমি বলি, চল, তুই আর আমি একদিন যাই।

রায়হান বলে : ঐ কুত্তাটা আছে ?

: আছে।

: নেপালী মামীটা ?

: হ্যাঁ আছে। তুই এব মধ্যে গেছিলি নাকি দিদির বাড়ীতে ? বায়হান মুচকি হেসে বলল : কয়বার ! দিদি আমাব কি নাম দিছে জানস ? ক্ষুদে সাহিত্যিক।

একটু লাজুক আর ভেতবে ভেতরে খুব সন্তুষ্ট দেখায় বায়হানকে। আমাদের মধ্যে বায়হান একটু লেখেটেখে, স্কুল-বার্ষিকীতে ওরা লেখা থাকেই। মুকুলের মহফিলেও দু'একটা লেখা ছাপা

হয়েছে। একবার পাড়ার কিশোর মজলিশের এক সাহিত্য সভায় রায়হান গম্ভীরভাবে বক্তৃতা দিয়েছিল : 'আমরা সাহিত্যিকরা যদি সমাজের দায়িত্ব না নেই তবে কে নেবে ?' খুব হাততালি পেয়েছিল সেদিন রায়হান। প্রায়ই সে বলে 'এমন একটা উপন্যাস লিখুম, ফাটায়া দিমু চাইরদিক, ওয়েট কর।' এই হল রায়হান। মুখ একটু লম্বাটে, মাথার সোজা সিঁথির দু'পাশে ঢেউ ভাঙ্গা চুল। পেটা শরীর। ওর মুখে অর্চনাদির গল্প শুনে আমারই ঈর্ষা হতে থাকে। আমার বুকটা অভিমানে ভরে উঠেছিল এই ভেবে যে এতদিন মাখনলাল বা রায়হান কেউ অর্চনাদির ওখানে যাওয়ার কথাটা আমাকে খুলে বলেনি। তার মানে ওরা দু'জন ঠিক যেত লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাকে বাদ দিয়ে।

আমরা হাঁটছিলাম আর কথা বলছিলাম। বিকাল মরে যাচ্ছে। পাটগুদাম রোড ধরে এক একবার লরী ট্রাকগুলো ছুটে যায় আর তখন চারদিক ধূলায় অন্ধকার আর তখন পোড়া মাটি বা কাঁচা সব্জি বা ভাঁপের গন্ধ। ওপরে গাছ-গাছালির মাথায় রোদের খুব শান্ত হাত, সবুজের ফাঁকে ফোকরে বসে আছে আলোর কিছু নীল পাখি, রোদ দেখে এই রকম মনে হয়। ধাঙড়দের বস্তি, তাদের উঠোন জুড়ে শুকনো কাদা, নীচে কচুর ঝোপে চরে খাচ্ছে দুটো শূকর। রেল লাইন পার হয়ে এগোই কেওয়াটখালির দিকে রাস্তায় তখন বাতি জ্বলে উঠছে।

লোহার বেড়া ও কাঁটামেদির ঝোপ দিয়ে ঘেরা মাখনলালদের দোতলা বাড়ীটা একেবারে নি:সাড়। বাগানে ফুল ফুটে আছে, এখানে ওখানে ছিমছাম করে ছাঁটা পাতাবাহারের কালো ডুম, বাতাস খেলছে একা একাকী, গেট-সোজা লাল কাঁকরের রাস্তাটা নির্জন, আলোও জ্বালা হয়নি বাড়ীতে, কিরকম ভূতুড়ে লাগছিল। আমরা মাখনলালের ঘরের জানালার নীচে দাঁড়িয়ে ডাক দিই : মাখনলাল, এই মাখনলাল, কেউ জবাব দেয় না, একটা টুঁ শব্দ নেই কোথাও। মাখনলালের বাবা খুব বদরাগী বলে হাঁকাহাঁকি করতে ভয় হচ্ছিল। কিন্তু ভর-সন্ধ্যেয় জানলার নীচে এভাবে দাঁড়িয়েও তো থাকা যায় না। তাই বেশ একটু জোরেই ডাক ছাড়ি: মাখনলাল আছিস ?

খুব করে জানলাটা খুলে যায়। হ্যাঁ, মাখনলাল। চোখ দু'টি ফোলা। কেমন এক অপরিচিত গলায় ফিস ফিস করে বলল : কাইটা পড়। দেখলে কিন্তু খাবাপ হইয়া যাইব।

রায়হান বলল : 'ছাতা অইব। কারে ডর দেখাও মিঞা, রায়হানউল্লা ডরায় না কাউরে, হ্যাঁ, এই বলে রায়হান বুকে চাপড়ও দিল দুটো। কিন্তু মাখনলাল যখন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে ভীষণ রাগ করে বলল 'আরে শুয়োর, রায়ট লাগছে শহরে। জলদি পলান দে' তখন এই আচম্বিত সংবাদে আমাদের জান শুকিয়ে গেল। রায়হান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে: এ্যাঁ, রায়ট লাগছে ?

মাখনলাল বলে : হ ছাতে বন্দুক লয়া ঘুরতাছে আমাগো দল, জলদি পলান দে শালা গরুখোরের জাত।

রায়হান রেগে উঠে বলে : কি কইলি শালা মালাউন !

মাখনলাল বলে : চোপ শালা গরুখোরের জাত।

রায়হান বলে : খবরদার মালাউনের গুষ্টি !

ছাতের দিক থেকে গুরু-গম্ভীর স্বরে 'কেডারে' শোনা যায়। আর ঠিক এসময় বহুদূরে ঢোলের বাজনা, করতালের শব্দ এবং অনেক মানুষের উম্মত্ত চীৎকারের আওয়াজ ভেসে উঠল। আওয়াজটা ঝাঁকের কইয়ের মত হঠাৎ লাফিয়ে উঠল অন্ধকারে। আমি ও রায়হান ছুটলাম রাস্তায়।

রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। ছোটন চাচার খুব ইচ্ছে ছিল বেরোয। সে একটা রেত শান দিয়েছে অনেকক্ষণ, কাকে কাকে মারবে তার একটা মৌখিক লিষ্টও তৈরী করে ফেলেছে। মাখনলালকে মারা হবে না। সে ঘোষণা করল। এমন রাজপুত্রের মত চেহারা, ছোটন চাচাকে 'মেলা' ছবিটা দেখিয়েছিল, অষ্টমীর দিন একটা মাউথ অর্গান কিনে দিয়েছিল। আহা, তাকে কেন মারবে ! তবে পানের দোকানে বসে যে ফাজিল ছোকরা শিবনাথ, তাকে সে সোজা জবো করে ফেলবে। হারামজাদা একদিন ছোটন চাচাকে বাকীর তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেতাই অপমান করছিল। আর মারবে বিধান বাবুকে। বিধানবাবু মহা হারামী, জাত হিন্দু যাকে বলে, সবসময় মুসলমানের গা বাঁচিয়ে চলে ব্যাটা ত্যাঁদড়, শালাকে কোরবানী না করলে জানটা ঠাণ্ডা হবে না। এই রকম ঘোষণা করতে লাগল ছোটন চাচা বিছনায় চিৎ হয়ে শুয়ে। শেষে আমি চেঁচিয়ে বললাম, এই তুমি ঘুমোবে ! তখন একেবারে চুপ

করে গেল ছোটন চাচা।

চোখ বুঁজে পড়ে থাকলাম বিছানায়। কিন্তু ঘুম এল না। মাঝেমধ্যে ভেসে আসে ভয়াবহ কোলাহলের শব্দ। কখনো নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর, কখনো কালী মাঈ কি জয় আমাদের বাসার পেছনেই কালিবাড়ী, সেদিক থেকে হঠাৎ হঠাৎ ঢোল আর করতালের বিকট আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। পাশের ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বাবা ওজিফা পড়ছেন। তার হয়ত মনে পড়ছিল নীলমণিপুরের ভয়াবহ স্মৃতি। দাঙ্গার সময় নীলমনিপুবের ফুটবল খেলাব মাঠে কি রকম রক্তারক্তি কাণ্ড হয়েছিল। সেই ঘটনা আমাবও মনে পড়তে লাগল। একটা দারুণ উত্তেজনা টগবগ করে ফুটতে লাগল বুকের ভেতরটা। ছোটন চাচাব মত আমি রেত শানাইনি, কিন্তু আমারও বেশ মনে হচ্ছিল মালাউনদের একটু শায়েস্তা হওয়া দরকার, বড় বাড় বেড়ে গেছে ওদেব। ইণ্ডিয়ায় কি অত্যাচাবটাই করল আমাদের ওপর। সেই আমরা নীলমনিপুরে ছিলাম, বাগানেব মধ্যে আমাদের ছিল দাদাব আমলেব পুরনো দোতলা বাড়ী, বাঁদা পর্যন্ত প্রায় সব জমি ছিল আমাদেব, কি সুখেই না আমবা ছিলাম, ফি বছর বেড়াতে যেতাম কলকাতায় নানাব বাসায় আর দাঙ্গা লেগে সব মিসমাব হয়ে গেল। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে আসতে হল পাকিস্তানে, ব্যাংকের টাকা-পয়সা দূরে থাকুক, হাতেব টাকাগুলিও আনা গেল না, সেই শোকে বাবার চুল বাতারাতি সাদা হয়ে গেল। নীলমণিপুবে কি রকম মান্যি-গণ্যি লোক ছিল আমার বাবা আর পাকিস্তানেব এই মফস্বল শহবে এসে বাবাকে মুদি আব লাকড়িব দোকান দিতে হয়েছে, তাতেও চলে না। বিছানায় শুয়ে নিঝুম রাতের কোলে হঠাৎ হঠাৎ আল্লাহু আকবর আওয়াজ শুনি, মনে হয় গোটা শহব উড়ে যাচ্ছে ছিঁড়েখুঁড়ে, আমাবও ইচ্ছা হয় চেঁচিয়ে উঠি, চেঁচিয়ে শহরবাসীব কানে তালা লাগিয়ে দিই। বিছানায় শুয়ে ছটফট কবতে লাগলাম। একসময়, কখন জানি না ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে এল।

ঘুম ভেঙ্গে গেল একটা চাপা শব্দে। বাইবে থেকে 'আতাউব, এ্যাই আতাউব' বলে কেউ ডাকছিল। তড়াক কবে লাফিযে উঠি বিছানায়। বায়হান। দবজা খুলে দিই। বাযহান একা নয়, সাথে আছে ষণ্ডামতন দু'জন লোক, প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। রায়হানেব এক হাতে একটা বামদা, আরেক হাতে টর্চ। বলল, ঘুমাবি না যাবি আমাগোব সাথে? বললাম, যাব। জামাটা সাত তাড়াতাড়ি গাযে দিয়ে একটা রড হাতে নিয়ে দবজাটা ভেজানো অবস্থায রেখে বাস্তায নামলাম। পেছনে তাকিযে দেখি ছোটন চাচাও তাব ধারাল রেতটা নিযে আমাদেব সাথে আছে। বাযহান বলল, আগে যামু জ্ঞান চক্রবর্তীব বাসায়। চল্ চল্।

অল্প জ্যোৎস্না ছিল। গাছপালা তোলপাড় কবে বইছে বাতাস, বাস্তা ঘুমন্ত অজগরের মত চুপচাপ পড়ে আছে। বাবা বেরুতে দেযনি বলে বাসায আটকা পড়ে যাচ্ছেতাই খাবাপ লাগছিল, এখন খোলা রাস্তায নির্জন নিশীথেব ভয়াবহ রহস্যেব মধ্যে এসে পড়ে ভয লাগছিল কি ভাল লাগছিল কিছুই বুঝতে পাবছিলাম না। হাঁটতে হাঁটতে শুধু একবার মাখনলালেব মুখ আব একবার অর্চনাদি'ব চেহাবা ভাসছিল, সেই মোহ-চিন্তা এক একবাব ঝাপ্টা খাচ্ছিল ঝড়ো বাতাসে, থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল ব্রহ্মপুত্রের ডাক। জ্ঞান চক্রবর্তীব বাড়ীব কাঠের গেট হা কবে খোলা, অল্প বক্তিম জ্যোৎস্নায হবতকি গাছের ডালপালাগুলি বাতাসে নৃত্য করছে আব চারিদিক নিশব্দ। বাড়ীব ভেতবে ঢুকে কাউকে পাওয়া গেল না, ভাঙ্গা আসবাবপত্র পড়ে আছে ঘরেব মেঝেয ও বাবান্দায়, উঠোনেব তারে ঝুলে আছে একটি সবুজ রঙেব জামা। কাব, দীপালীব? আমবা উঠোনে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললাম, কেউ আছেন? কেউ সাড়া দেয় না। শুধু দীর্ঘদেহী হরিতকি গাছেব ওপর শিস দেয় মেঘে-জলে ভেজা অল্পবক্তিম স্ফটিক। চাবপাশে হু হু বাতাসের ঝাপ্টা আর মনুষ্যহীন নির্জনতা, আর কোন কিছুর সাড়াশব্দ নেই। রায়হান বলল, শালার বেবাকগুলানরে আগেই মাইরা ফালাইছে, মাইবে ভাসায় দিছে। বলতে গিয়ে রায়হানের গলা ভেঙ্গে যায়। তাকে দেখাচ্ছিল জ্বরো বোগীর মত ক্লান্ত আর হতাশ। রাযহান কাকে মারতে চেয়েছিল, জ্ঞান চক্রবর্তীকে?

রাস্তায় নেমে নি:শব্দে হাঁটছি। সাথের দু'জন ষণ্ডামতোন লোক বিড়ি ধরাল, নিজেদের মধ্যে বলল, কি করুম, বাবায় আসতে দিল না, শেষে তো খিল ভাইঙ্গা আসছি। বাযহানের এক হাতে টর্চলাইট, অন্য হাতে রামদা। ছোটন চাচা রেতটা দেখিয়ে বলে, দেখ দিকি কি যন্তর নিযে এসেছিলাম, কাজেই লাগল না। রায়হান ছাড়া বাকী তিনজন কপালের দোষ দিতে লাগল। কুমার উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠের

কাছে যেতেই বাঁদিকের পামগাছের আড়াল থেকে কে যেন হঠাৎ দৌড় দিল, দিতেই আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম, ভয়ে কি আগ্রহ-উত্তেজনায় জানি না এবং আমরাও দৌড়তে শুরু করলাম। ভেতরে মহারাজার পরিত্যক্ত বাড়ী, পাহাড়ের মত উঁচু এক-একটা গাছ, নীচ দিয়ে দৌড়ুচ্ছিল লোকটা, দৌড়ে পেছনের ভাঙা দেয়ালটা টপকে ধোপাবাড়ীর দিকটায় ছুটে গেল।

আমরা দেয়াল টপকে ওপাশে গিয়ে দেখি, লালমোহন বাবুর টালির দোতলার ওপর সেই একটা অল্পরক্তিম, ভাঙাচোরা চাঁদ, চারদিক ব্যাপে বাতাস বইছে, কেউ নেই। লালমোহনবাবুর বাড়ীটা বহুকাল থেকে পরিত্যক্ত, দেয়ালগুলি ভাঙাচোরা, দোতালার কার্নিসে বটের চারা গজিয়েছে। 'আমার সন্দেহ হইতাছে' বলে রায়হান ষণ্ডামতোন বেঁটে লোকটাকে আলো জ্বালাতে বলল, বোধহয় টর্চের আলোয় ভরসা করতে পারছিল না। লোকটা কেরোসিনে চোবানো ত্যানার মশালে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে ধরতেই দপ করে জ্বলে উঠল একটি অতিকায় আলো এবং চারপাশের বাতাস উন্মাদ হয়ে উঠল। নীচের সম্পূর্ণটা ঘুরে দেখা গেল কেউ নেই। সিঁড়ি ছিল ভাঙ্গা, ইটের টুকরো ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম এবং মশালের আলোটা নিয়ে বারান্দা ধরে এগোতেই প্রাণঘাতী আর্তনাদ শোনা গেল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, দু'হাত কাঁকড়ার মত বাড়িয়ে বেঁকিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে ইষ্টিশানের কুলি ইয়াসিন। পায়ের কাছে তিনটে মৃতদেহ, দুটো পুরুষ মানুষের, একটা মেয়েলোকের। ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পুরুষ দুটোকে হাত-পা বেঁধে মারা হয়েছে। মেয়েটার বাঁধন নেই, তবে একেবারে উদোম উপুড় করে শোয়ানো। আমাদের সাথের বেঁটে লোকটা মেয়েটার চুল ধরে চিৎ করে শোয়ালে চিনতে পারলাম, দীপু। জ্ঞান চক্রবর্তী আর তার ছেলে হারাণকেও চিনতে পারলাম। ষণ্ডামতোন লম্বা লোকটা বলল, 'মাইয়াডার' ওপর বলাৎকারী হইছে, শুনে আশ্চর্য, ছোটন চাচা, আ: আ: করে চেঁচাতে লাগল। যেন তার গলা দিয়ে কতকগুলি স্বর বেরুতে পারছে না। রায়হান বলল, আরে চুপ করেন, ইয়াসিন তো আমগোর লোক, কিন্তু ছোটন চাচা হা করেই আছে, গলা দিয়ে বেরুচ্ছে আ: আওয়াজ, চোখ দুটো ভাঁটার মতো গোল হয়ে উঠেছে। তখন রেগেমেগে রায়হান কনুইয়ের এক ঝাপ্টা লাগায় ছোটন চাচাকে, আর লুফে নেওয়ার মত তার দুর্বল মাথাটা বুকের ভেতর টেনে নিল ষণ্ডামতোন বেঁটে লোকটা, স্নেহে আদরে প্রবোধ দেওয়ার মত করে বলল— দূর বোকা, ইয়াসিন তো আমগোর লোক, ডরাইতেছো কিযাবে ?

ছোটন চাচাকে ঠাণ্ডা করার জন্য বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। হাতের সেই ধারাল রেতটা যে কোথায় পড়েছে, আর তিন তিনটা লাশ দেখে বোগাভুখা লোকটা যে কিরকম জবুথবু হয়ে গেছে! আমার তখন বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। কোথাও শুয়ে চোখ বুঁজতে চাইছে শরীরটা। কিন্তু কিছুই বলতে পারছিলাম না। নীচে নেমে এসে বেঁটে লোকটা বলল, ধোপাগো বাড়ীটা দেইখ্যা যাই। আমরা নি:শব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। বৈলর লজের পেছনে ধোপা বাড়ী, বেশ ছড়ানো ছিটানো একটা বস্তি। বাইরে উল্টে পড়ে আছে কয়েকটি মাটির গামলা। কর্দমাক্ত একটা নালা যেয়ে পড়েছে এস কে হাসপাতালের পুকুরে। একটা কুকুর ডেকে উঠল কোথাও ; তারপর সব চুপ। কৃষ্ণতিথির চাঁদটা এখন হেসে পড়েছে, আকাশে ভাঙা ভাঙা বহু মেঘ, মনে হয় মেঘের মিটিং বসেছে। ষণ্ডামতন লম্বা লোকটা বলল, আমরা বৈলর লজটা ঘুরা আসি, আপনেরা ধোপাগো বাড়ীটা দেখেন। বেঁটে লোকটা খুব বিরক্ত। বলল, 'শালার মালাউন পাইলাম না। একটাও, কিসমতটাই খারাপ।' মশালটা সে আমার হাতে তুলে দিল তারপর ওরা দু'জন পুকুরের কিনারা ঘেঁষে বৈলর লজের দিকে হন হন করে চলে গেল।

রায়হান বলল, আতাউর, ডরাবি না তো ?

বললাম, দূর, ডরাব কেন।

: সাবাস এই তো চাই।

আমরা তিনজন ঢুকলাম বস্তির ভেতর। রায়হানের হাতে রামদা। আমার এক হাতে একটা বড় আর হাতে মশাল। ছোটন চাচা পেছন পেছন আসছে। এক পা দু'পা করে এগোই, এদিক ওদিক তাকাই, আমার তো খারাপই লাগছিল, কিন্তু বলতে পারছিলাম না। বস্তির উঠোনটা ফাঁকা, আশপাশের ঘরগুলি নির্জন। রায়হানকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। এগিয়ে যেয়ে রামদা দিয়ে বাড়ি দিল বস্তির বেড়ায়। হেঁকে বলল, কেডা আছো, বাইর হয়া আসো। রায়হানের গর্জন ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি তুলতে

লগল। নীলমানপুরের মাঠে আমাদের মুসলমান চাষাদের ধরে কিরকম কচুকাটা করেছিল হিন্দুরা, সেই কথা মনে পড়ল আমার। আমিও চিৎকার করে বললাম, বাইরে আসো, কে আছ। একটু আগে আমরা রক্ত দেখে এসেছি, তিনটে লাশ দেখে এসেছি। আমাদের শরীরের শিরা-উপশিরা জুড়ে পাগলা বাতাস ছুটতে লাগল। দু'জন আমরা বস্তিব ঘরগুলোর বন্ধ দরজা ঘুরে ঘুরে পাগলের মত চেঁচাতে লাগলাম। রায়হান রামদা দিয়ে বস্তির বেড়াগুলো ভেঙ্গে দিতে লাগল। ঠিক তখন ভেতবে কে এক শিশু কেঁদে উঠল। সেই সাথে একজন মহিলা। রায়হান দৈত্যের মত চেঁচিয়ে বলল, বাইর হয়া আসো। খবরদার চিল্লাবা না। খবরদার!

শিশুর চিৎকার থেমে যায়, মনে হয় কেউ তাব মুখ চেপে ধরেছে। এগিয়ে যেয়ে রায়হান দরজার ঝাঁপটা টান দিয়ে খুলে ফেলল। মশাল ধরে সাবধানে এগোলাম। ঘরের ভতর একপাল ছেলেমেয়ে, মহিলা ও বুড়ো মানুষ। রায়হান থবথব কবে কাঁপছে। হঠাৎ বিশ্বাস কবা যায় না, তাকিয়ে দেখি মেঝের উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মাখনলাল, মাথাটা সামান্য তুলে আমাদেব দিকে পিটপিট কবে তাকাচ্ছে। ওর মুখটা কালো আর থ্যাবড়া হয়ে আছে। জামার এখানে সেখানে বক্তেব দাগ। মাখনলালকে আমবা দেখতে লাগলাম, মাখন আমাদেব দেখতে লাগল। কয়েকটা নিশ্চুপ মুহূর্ত কেটে যায় এভাবেই।

রায়হান বলল, উইঠ্যা খাড়া।

মখনলাল কথা শুনে ওঠার চেষ্টাব কবল। পিঠ খানিকটা উঠল, তারপব যেন লজ্জা পেয়েছে আর গোটা ব্যাপারটাকেই উড়িয়ে দিতে চাইছে সেভাবে শুয়ে পড়ে বলল, দূব উঠবার পাবতাছি না। রুল দিয়া পিটাইছে বুঝলা? টাকা-পযসা দিলাম, সোনাদানা দিলাম, তয জানে মাবল না, কিন্তু যা পিটানিডা পিটাইছে. উ:!

এই বলে একটু হাসার চেষ্টা কবল মাখনলাল। বড় রকম একটা নি:শ্বাস ফেলে বলল, মুশকিল!

বায়হানের নাকটা কাঁপছে, দাঁত কিড়মিড় কবছে সে. মুখটা চেনা যায না এমন অদ্ভূত দেখাচ্ছে। চাপা গলায চেঁচিয়ে বলল, উইঠ্যা খাড়া।

মাখনলাল তখন আবাব চেষ্টা কবল এবং উঠতে না পেবে যন্ত্রণা ও ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ল ও হাঁপাতে লাগল। আবো একবার বলল, মুশকিল!

আমিই বোধহয় প্রথম ফুঁপিয়ে উঠলাম। তাবপব বাযহান। বাযহান ভাঙ্গা গলায কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে দৈত্যের মত চেঁচাতে লাগল। রামদা ও টর্চ ফেলে দিল হাত থেকে। মাখনলালের দিকে না তাকিয়ে দু'হাতে চোখ বেড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। 'মাখন বে মাখন' এই বলে চেঁচাচ্ছিল আর কাঁদছিল সে। আমিও কাঁদছিলাম। ছোটন চাচা চুপ কবে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। মানখলাল মাথা তুলে আমাদের দেখতে লাগল। বলল কানতাছ্স কেন বাযহান?

কাঁদতে কাঁদতে রায়হান বলল, তোবে আমরা মাবতে আইছিলাম।

দুই নৌকা বোঝাই হয়ে আমবা ব্রহ্মপুত্র ছেড়ে বিকেলেব দিকে মগবা নদীতে পড়লাম। ছোট হলেও পাহাড়ী নদী, স্রোতের বেশ টান আছে। অনেকটা শখ করেই দাঁড় বাইছিলাম আমি আর রায়হান, মাখনলাল ছই ঠেস দিয়ে বসে আছে চুপচাপ। অর্চনাদি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, দ্যাখ দ্যাখ, কি নমুনার মেঘ।

ছোট আব খণ্ড খণ্ড মেঘ, যেন ভেড়ার পাল, নীল বাগানে শুষ্ক হয়ে ফুটে আছে, এদিক সেদিক কিনারায় এসে লেগেছে লাল রঙেব ছিটা। অর্চনাদি যুঁই ফুলের মত সাদা শাড়ী পবেছে, হাঁটুব ওপর থুতনি বেখে একপাশে তাকিয়ে ঐ আকাশ দেখছে। দুই কানের দুই ফিবোজা বঙের দুল স্ফটিক চমকাচ্ছে। মাখনলাল বলল, শীত পইড়া যাইতেছে!

সামনের বড় নৌকায় মাখনলালের বাবা, মা, ভাইবোন এবং বিধানবাবু'র ফ্যামিলি। এই নৌকায় আমরা ও অর্চনাদি ছাড়া আছে বিধানবাবুব এক পিসি, একেবাবে চোখে দেখে না, কানে শোনো না থুত্থুরে এক বুড়ী। অর্চনাদি যেয়ে পিসির পাশে শুলো। পিসির ঘুম নেই, অনুমানে বলল, কেডা, অর্চনা নি?

: হ।

: কোন্ ঠাঁই আলাম বে দিদি, জিগাযে দ্যাখ তো মদনপুবে আলাম নাকি।

মদনপুব ছিল পিসিব বাপের বাড়ী। 'মদনপুবে আলাম নাকি', জিজ্ঞেস করে নিজেই বাপেব বাড়ী গল্প ফেঁদে বসল। বাপেব ছিল তালুক মুলুক, কালো কুচকুচে ছিল গাত্রবর্ণ, খুব অত্যাচাবী আব দাপটি পুরুষ ছিল, প্রজাবা রাগ কবে 'কাইল্যা বামুন' বলত। পিসির গল্প কেউ শুনছিল না, কিন্তু ফোকলা দাঁতে হেসে আপন মনে বাপেব বাড়ীব গল্প বলেই চলল বুড়ী। বাহিব বাড়ীর পুকুবের ধাবে ছিল মুচকুন্দ, বদ্দিরাজ, তেজপাতা, নিম আব গাবগাছেব জঙ্গল। দিনে দুপুবেও কি বিবাট ছায়া ধবে থাকত। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছিল শিবেব প্রতিষ্ঠা, পিসি তাব বিয়ের আগে সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ সাজিযে দিযে আসত মন্দিবের সোপানে। মাখনলাল বুড়ীব জ্বালায টিকতে না পেবে বলে, দূব বুড়ী চুপ কব! তখন অর্চনাদি হাত বাড়িযে মাখনের পিঠের জামা খামচে ধরে বলল, এই শুয়োর, গুরুজন লাগে না, ভক্তি কইবা কথা ক।

মাখনলাল বাগ করে বলে, ভক্তি কইরা লাভটা কি ? তোমাব ফাটকালা বুড়ী বুঝবো কিছু ?

শুনে অর্চনাদি ধমক দিয়ে বলল, আবে ছেমড়া, মুখে আটকায় না কিছু। দেখছস আতাউর, মাখনডা কি বকম অসভ্য ?

ভাঁটিব দিক বলে নৌকা বেশ দ্রুত যাচ্ছিল। নদীব বাঁকে বাঁকে পাতা জালেব চোঙ। চোঙেব ওপব বসে আছে করুণ মাছবাঙা। পানির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে কাঠেব গুঁড়ি, ছেঁড়াখোঁড়া জাবমুনিব দঙ্গল আব ডেউযা ফল। পালে এ সময বাতাস দিল, নৌকা ছুটে চলল প্রায তীববেগে। ভুবনপুব, সাজিনগব, বেতেবগাঁও পাব হযে বাত আটটাব দিকে আমবা পৌঁছলাম ভেদেরগঞ্জে। আগের নৌকা ঘাটে যেয়ে নোঙব কবল। আমাদেব নৌকা বাঁধা হলে অর্চনাদি একবুক নি:শ্বাস ছেড়ে বলল, যাক বাবা, বাঁচা গেল।

ভেদেবগঞ্জ থেকে বর্ডাব সাত আট মাইল দূবে। নৌকা দিয়ে ঠিক ওপারে যাওযাব উপায় নেই, যেতে হয় মাঠ পাড়ি দিযে মাইল ছযেক হেঁটে, তাবপব এপাবে ওপাবে লোকজন আছে, তাবাই সব ঠিকঠাক করে দেয। বাতে আমবা থাকলাম ভেদেবগঞ্জের দত্ত বাবুদের বাড়ীতে। নদীর ধারে চমৎকাব কাঠেব দোতলা বাড়ী, দেযালে নীল ও কালো রঙেব নকশা, ওপাবে ঘেরাটোপেব মধ্যেব সবুজ কালিতে লেখা পাকিস্তান জিন্দাবাদ। বাতে আমবা ঠিক যে ঘুমালাম তা নয, কিছুক্ষণ নদীব ধাবে ঘুবে বেড়ালাম, দোতলাব বারান্দায অর্চনাদিব কাছে শুযে বসে গল্পটল্প হল, মাখনলাল বেশ গানটান গেযে শোনাবাব চেষ্টা কবল, শেষে মেঝেয শুযে ঘুমাবাব চেষ্টা কবলাম সবাই। অর্চনাদি বলল, আর কার্বালিসি কবতে হইব না, ঘুমা তোবা। কিন্তু ঘুমায কে, অর্চনাদি নিজেই তো ঘুমাবাব ভান কবে এক একবার খিলখিল কবে হেসে ওঠে। রাযহান বলল, দিদি, ঘুমাইতে দেও। দিদি বলল, ঘুমা না, মানা কবে কেডা। মাখনলাল তখন চোখ বুঁজে মুহূর্তেই দারুণ নাক ডাকতে শুরু কবে দেয যেন গভীর ঘুমে অচেতন। বাযহান বলে, মাউরার কাববারই আলাদা, ঘুমাইতেছে না য্যান গরু ডাকতেছে। মাখনলাল চোখ বুঁজে শুযে তেমনি নাক ডাকতে ডাকতে বলে, অবশ্যই। শুনে অর্চনাদিব আব এক দফা হাসি। বাযহান রাগ কবে বলল, শালা মাউবা কাঁহেকা। মাখনলাল গা জ্বালানো সুরে বলে, অবশ্যই। তার এই 'অবশ্যই' বাযহানকে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দিল, সে বলল, দূর ভাল্লাগে না, ঘুম আইতাছে, চুপ কর, এভাবেই বাতটা শেষ হয়।

পবদিন ভোববেলা পায়ে হেঁটে যাত্রা। মাখনলাল সপ্তাহখানেকের বিশ্রামে আর চিকিৎসায় বেশ সেরেই উঠেছে তবু বেশী হাঁটতে পাবছিল না, কিছুদূর যেয়ে বিশ্রামের জন্য তাকে থামতে হচ্ছিল। মেয়েরা সবাই মাথা পর্যন্ত চাদব মুড়ি দিযেছে, পুরুষেরা ধুতিব বদলে পবেছে চক্রাবক্রা লুঙ্গি, সবাই হাঁটছে আব ভয়ে কাবু হযে আসছে। বিধানবাবু অভয দিচ্ছিলেন সবাইকে। বলছিলেন, এংজাইটির কোনই কারণ নাই, পার্টিকে যথেষ্ট দেয়া-টেয়া আছে। ভোরবেলার ঘাসে ছিল শিশির, আলোর রং ছিল লিচুর মত ঘোলাটে, মৃদু আব ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। মাইল তিনেক যাওয়াব পর চোখে পড়ল আউট পোষ্ট। পুরো দলটা দাঁড়াল এখানে। আমার ও রাযহানের এখানেই সীমা, এখান থেকেই ফিরতে হবে। বিধানবাবু বলল, দেরী কইরো না, জলদি যাও গে। কিন্তু মাখনলাল দুই হাত দিয়ে আমাকেও রায়হানকে জড়িয়ে ধরে রাখল। শেষে বোধহয় একটু লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, চিঠি দিবি

তো ?

রায়হান বলল : তুই দিবি তো ?

: দিমু । রেজাল্ট আউট হইলে টেলিগ্রাম করবি । করবি তো ?

: করুম ।

অর্চনাদি এসময় এগিয়ে এল । এসে বলল, যা তোরা যা গে । ভাল কইরা পড়াশোনা করিস । দিদিব কথা মনে থাকবে তো ?

রায়হান বলল, দিদি, আতাউবের চুলটা একটু টাইন্যা দিয়া যাও । ওবটা তো কোনদিন টান নাই, ওব খুব দু:খ ।

দিদি আমার চুল টেনে ধরল । হাসতে লাগল । চোখ দু'টি ভিজে হয়ে এসেছ । বিধানবাবু বলল : অর্চনা, আর দেরী কইরো না ওগোরে যাইবাব দেও ।

আমবা দাঁড়িয়ে রইলাম । দলটা দ্রুত এগোতে লাগল । মাখনলালটা হাঁটছিল একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ।

মণীশ রায়

টিকটিকি

আজকেব রাতটাই অন্যবকম । এব সাথে আব কোন রাতের যেন মিল নেই ।

এমনিতেই আগেব মতন আব ঘুম হয না । বুক ধড়ফড় করে, মাথা দিয়ে ধোঁয়া বেবোয আব ঘন ঘন প্রকৃতির ডাকে ঘরেব বাইরে আসতে হয । দুটো আড়াইটাব দিকে বাড়িব পেছন দিককার আড়া জঙ্গলেব ভেতব থেকে যখন তক্ষকটি ডেকে ওঠে, সবমাব চোখেব পাতা তখন থেকে নবোম হতে শুরু করে । ঘুম আসে ভোরেব দিকে, তিনটা চাবটা হবে তখন । এই নিদ্রাহীনতার জন্যে সবমা কবিরাজি কবিযেছে, হোমিও ঔষধ খেযেছে, টুকটাক এ্যালোপ্যাথেব শবণ নিয়েছে । তবে এ্যালোপ্যাথ ওব ভাল লাগে না । নাম শুনলেই শবীব কেমন সিটিযে আসে, তাছাড়া, খরচাপাতিব ধাক্কা তো আছে !

ইদানীং ঘুম না হলে সবমা আব উতলা হযে পড়ে না, ববং তক্ষক সাপটির ডাকের জন্যে এক ধবণের ব্যাকুলতা ওকে চিমটাতে থাকে । নিজেকে তখন আবেক নিশাচব মনে হয় । প্রতিদিন বাতে সরমা নতুন নতুন শব্দেব সাথে পরিচিত হয । ঘড়ঘড়ে পাতাব শিরশিবানি, ইঁদুবেব চিঁ চিঁ ডাক, নাবকেলের চিরল পাতায় বাতাসেব হিস্‌হিস্ স্পর্শ, 'ঘবকূলি' পাখিব হঠাৎ রাতচেবা আর্তনাদ, এক সঙ্গে অনেকগুলো কুকুবের কান্না আব হুলোবেড়ালদেব ঝগড়ার শব্দ সবমাকে এখন অন্যবকম এক আনন্দ দেয । কে কখন রাতেব নির্জনতাকে খান খান কবে দেবে সে যেন তা আগেভাগেই বলতে পাবে ; কখনও কোন ব্যতিক্রম হলে সবমা তা সহজেই ধবে ফেলে । সকালে ঘুম থেকে উঠে বড় বউকে বলে, বাইত ভব কাইজা কবত দুইটা হুলা বেলাই, হিডিব শব্দ পাইলাম না যেন কাল ? পাড়া কি ছাইবা দিছে ?

অ মা, আপনে কি অহন তবি জানেন না ? কাইলকাই তো পাড়ার পিচ্চি পিচ্চি পোলাপানে দুইটা হুলা বেলাইব একটাবে ইটেব চাক্কা দিয়া মাইবা ফ্যালাইছে, অন্যটা দৌড়াইয়া জঙ্গলেব ভিতবে পলাইছে । পুষ্কণীব ঘাটে অহনও পইবা রইছে । দেহেন গা যান ।

এ কথায সবমা আকাশ থেকে পড়ে । মিড়মিড় কবে ওব ছেলেবউর দিকে তাকিযে থাকে কতক্ষণ । কোন কথা বলে না, কেবলি মনে হয় ওব ছেলেবউ যা বলছে, তা মিথ্যে, বানানো । সে কোন উত্তব না দিযে বাড়ী থেকে বেব হযে পুকুবঘাটে এসে দাঁড়ায । সকালেব পুকুবঘাট চাবধাবেব বাড়ি ঘরেব বৌঝিবা দখল কবে বাখে । ওদেব চান আব বাসন কোসন মাজাঘষাব শব্দে শব্দময হয়ে থাকে পুরো সকাল । সরমাও ওব বযসকালে রাতেব সব এঁটো বাসন কোসন বগলদাবা করে বাঁশের খুঁটিব ওপর কাঠের চিকন তক্তা পাতা ঘাটে এসে বসত । আব চান করে ভেজা কাপড়ে ঘরে ফিরত ।

ঘাটের কাছাকাছি কিনার ঘেঁষে বীচিকলার আড়া আব একটি বড়ুই গাছ । বড়ুই গাছটি সরমাব মতন বয়সেব ভাবে কোমব ভেঙ্গে হুমড়ি খেযে পড়ে আছে পুকুরেব জলে । ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে সে ওদিকে তাকাতেই চমকে ওঠে । মাছি ভন্‌ভন্ কবা মাথা থেতলানো হুলো বেড়ালটি একপাশে নিঃসাড়ে পড়ে আছে । হয়তো কাল থেকেই পচা গন্ধ বেরোতে শুরু করবে । কুকুর আর কাকেরা নাড়িভুঁড়ি নিয়ে টানা হেঁচড়া করার আগে ভাগেই হযতো বড়দের দাবড়ানি খেয়ে কোন ন্যাংটো পিচ্চি বাঁশের ডগায় বেড়ালটি নিয়ে পুকুর ঘাট পার হয়ে পাটক্ষেতের আড়ালে ফেলে দিয়ে আসবে । সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে । পচা দুর্গন্ধের হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল ।

সেদিনের পর কদিন বড় খারাপ লাগত সবমাব । যখনই হুলোদের ঝগড়াব সময় হয়েছে বলে ওব মনে হত, তখনই ওব মনটা কেমন চিনচিন কবে উঠত । এবকম কদিন যেতেই হঠাৎ একরাতে দুটো

হুলো বেড়াল এসে ওদেব বাড়িব উঠানে ঝগড়া বাধিয়ে দেয । সরমা অবাক হয়ে মৃত হুলোটির সাথে এ দুটোব একটিকে মিলাতে চাইল । দরজা খুলে হ্যারিকেন দিয়ে চিনতে চালি হ্যারিকেনের আলো বেড়াল দুটোর গায়ে পড়তেই কাঁচের মতন ঝকঝকে চোখ দুটো দিয়ে কয়েক পলক ওর দিকে তাকিয়ে আড়ার ভেতর লুকিয়ে পড়ল । আর তখনই সবমাব মনে হল–বেড়ালদের কি খুব তাড়াতাড়ি পুনর্জন্ম হয় ।

বালিশে মাথা দিয়ে তক্ষকের ডাক শুনা পর্যন্ত সরমা এলোমেলো অনেক কথাই ভাবে । কখনও নিজেব কথা, কখনও সংসাবেব কথা । আজকাল সে এসব ভাবাভাবিও ছাড়ান দিয়েছে । গত বৈশেখ মাসে বয়স যখন ওর সাড়ে তিন কুড়িতে এসে ঠেকল, তখনই সবমা বুঝতে পাবল-ভাবাভাবি দিয়ে কিছু হয় না, ভবিতব্য ওকে যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে, তাকে সেদিকেই দৌড়াতে হবে । সংসারের সকল চিন্তা ছেড়ে প্রতিটি অনিদ্রার রাত সে এভাবেই কাবার করে দিচ্ছে । হয়তো আজকের রাতটিও সরমা এভাবেই কাটিয়ে দিত । কিন্তু সে জেনে গেছে – এ রাতই ওর শেষ রাত ! কাল ভোবে ওকে আর কেউ দেখবে না । অন্য রকম একটি রাতের ভেতর সে ঢুকে পড়বে, অন্য একটি পরিবেশে ।

আজ বড় তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া দাওয়া হয়ে যায় । এমনিতে এগাবটার আগে রাতের খাওয়া হয় না । আটটা সাড়ে আটটা বাজলেই সরমার ক্ষুধা লাগে । আর ক্ষুধা লাগলে সরমাব দুচোখ 'অন্ধকার' হয়ে আসে । কিছুতেই কিছু সহ্য হয় না । ছেলেরা কখন দোকানে ঝাঁপি বন্ধ করে ঘরে ফিরবে আব খাবার হবে সেজন্য সে অপেক্ষা করতে পাবে না । ঘবেব বাচ্চাদেব সাথে সেও নটাব মধ্যে খেয়ে নেয় । ছেলেরা এলে ওদের সাথে স্বভাব সুলভ দুচাবটে ব্যবসা কিংবা নিজেব শারীবিক সমস্যা নিয়ে কথা বলে নিজের আলগা ঘরে চৌকির ওপর পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে । কখনও কখনও গরম সরিষার তৈল ডলে পায়, কখনও হ্যারিকেনের সেক দেয় কোমরে ; বাতের ব্যথা যদি কমে সেই আশায় ।

আজ সন্ধ্যায় ঝাঁপি বন্ধ করে সরমার দুই ছেলে ঘরে ফিবে আসে । কতক্ষণ পব মিঞা বাড়ীর সুলতান আসে । ফিস্‌ফিস্ কবে কথা কয় । তাবপর চলে যায় । সরমা তখন ওব নিজেব ঘরে বসে শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে থাকে । একটাই ঘর, দোচালা । এখন মাঝখানে তরজাব বেড়া দিয়ে দুই ছেলে থাকে বৌ ছেলেমেয়ে নিযে । আর সরমাকে থাকাব জন্যে রান্না ঘবের লাগোয়া একটি ছোট চৌকি পাতা যায় এমন একটি পাতিটিনেব ঘব বানিয়ে দিযেছে ছেলেবা । তাতে ওব ভালই হয়েছে, নিজের কাজে থাকতে পারার এক নতুন অভিজ্ঞতা তৈরী হচ্ছে । সরমার ঘবটিব দুটো দবজা । একটি দিয়ে বড় ঘবে যাওয়া-আসা যায় । অন্যটি বাড়ির ভেতবে কিংবা পুকুরঘাট হয়ে বাইরে বেরুনোর কাজে লাগে । বছর দুয়েক হয়েছে সে এই নতুন ঘরে এসেছে । তবু এরই মধ্যে সে এই ঘরটিকে ঘিরে এক নতুন সংসার গড়ে নেবার আনন্দ পাচ্ছে । পানের ডিবা থেকে হ্যারিকেনটি পর্যন্ত সে বড় যত্নের সাথে গুছিয়ে রাখে । চৌকির ওপরকার একমাত্র তেল চটচটে কম্বল-কাঁথা আর বীচিওলা ঝনঝনে বালিশটিও ওর বড় প্রিয় । এত প্রিয় যে সে নাতি-নাতনীদের পর্যন্ত এখানে বসতে দেয না । ওদের কেউ ধুলাকাদা মেখে বিছানায় উঠে বসতে পারলেই হল, সে চিৎকারে চিৎকারে পুরো বাড়ি গবম করে দেবে । চোখে ভাল দেখতে পায না, তবু ঠারেঠুবে যে জিনিসটি যে জায়গায় রাখা তা অন্ধকারেও খুঁজে নিতে পারে । নখ কাটার নরুণ কিংবা কান খোঁচানিটি সে ঘবের কোন দিককার বেড়াব গায়ে গেঁথে রেখেছে তা সে চট করে বলে দেয় । এতটুকু ভুলে যায় না । এমনকি ঘরের কোন্ কোণায় কযটি ব্যাঙ কিংবা চিকা থাকে তাও সে বলতে পাবে । এই নতুন সংসারে সরমা কখনও একা ভাবেনি নিজেকে । বরাববই সে নিজেকে পূর্ণ আব স্বাধীন ভেবেছে ।

শুধু আজকেব রাতটিই সরমার কাছে নতুন ঠেকছে । কখনও কখনও অপরিচিতও। সুলতান চলে যাবার পব সরমা বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, সব কি ঠিক কইরা ফ্যালাইছস, বাবা ?

সরমাব বড় ছেলের নাম অসীম । লেখাপড়া তেমন করেনি, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি বড় পাকা । সরমার ধারণা—সে ওর বাবার মতন হয়েছে । তবে দোকানে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওর মেজাজ মর্জি বড় ঠাণ্ডা থাকে, কথায় বার্তায় মধু ঝরে, শুধু বাড়ি ফিরে এলেই ওই মেজাজমর্জি খিঁচড়ে যায় । যে কোন কথাতেও রাগ করে ।

সরমার এ প্রশ্নে অসীম মুখ চোখ খিঁচিয়ে উত্তর দেয়, সব কথা অত জানতে চাইও না তো, মা। বহুত চিন্তায আছি। হগলেব যে অবস্থা, তোমাবও এক অবস্থা। অহন গিয়া ঘুমাওগা যাও।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে সরমা নিজের ঘরে এসে বিছানায শুয়ে পড়ে। হ্যারিকেনের টিমটিমে সলতেটি কিঞ্চিৎ উসকে দিয়ে একবার ভাবে—কথাটি কি বড় বউকে জিজ্ঞেস কববে? পরক্ষণেই ওর মনে হয়—যা হবে তাতো ওর জানাই আছে। অসীমেব ছেলে টিকলু ওকে সবকিছু বলেইতো দিয়েছে। সে কেন আব সবাইকে বিবক্ত কবে? কতক্ষণ এবকম সাত পাঁচ ভেবে সে বিছানা ছেড়ে আবাব বড় ঘরে যায়।

ঘরের মাঝখানে তখন দুই ছেলে আর ছেলেবউদেব গোল টেবিল বৈঠক হচ্ছে। কিছু বুঝা যায না, শুধু ফিসফিসানি, গত একবছর থেকেই ওদের এই ফিসফিসানি লক্ষ্য করে আসছে সবমা। যেদিন সুলতান আসে, সেদিন রাত দুটো পর্যন্তও ওদেব এই মৃদু কথাবার্তা চলে। কখনও সবমা এসে পডলে ওবা চুপ হয়ে যায়। ওব বড় ইচ্ছে কবে—দুই ছেলে বউব মতন সেও ছেলেদেব সাথে কথা বলে, ঘন্টাব পব ঘন্টা। এই বাড়ীর ওপব কি ওর কোন অধিকাব নেই? স্বামীব মৃত্যুব সাথে সবকিছু কি একচেটিয়া ছেলেদের হাতে চলে যাবে? কিন্তু নিজেকেই নিজের বড় অপাংক্তেয় লাগে ওদের কাছে। বরং নাতি-নাতনীদেব সাথে কথা বলে সে এক ধবনেব আরাম পায।

সবমা এবার অসীমকে ছেড়ে ছোট ছেলে বতনকে খুঁজে নেয। ছোট হলেও ওকে বয়স্ক বলে মনে হয়। সারা মাথাজুড়ে বিশাল এক টাক। সবমার ধাবণা – সে ওব ছোট ভাই হাবাধনেব মত হয়েছে। ওই বকমই গোঁযার গোবিন্দ, সাবাক্ষণ মুখে মুখে হম্বিতম্বি। তবে অসম্ভব ভীতু, বাড়িতে চোব এসেছে টেব পেলে সে ববাবরই কাঁপতে কাঁপতে চৌকিব নিচে পালিযে থাকে। চোব যাওয়ার পব বতনের হম্বি তম্বি বেড়ে যায়। তখন মনে হয়—ওর মতন অত বড় বীর আব এই তল্লাটে নেই। অথচ চৌকিব তলা থেকে ওর বউই ওকে টেনে বের কবে আনে প্রতিবাব।

সবমা রতনকে মিনাতভবা কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করে, তবা কি আমারে কিছু কবি না? আমাব নিজেব কি কিছু গুছগাছ নাই?

একথায বতন কিছু বলাব আগেই বড় বউ মালতি হেসে গড়িযে পড়ে ছোট বউ ছায়ার কোলে। সবমাব যখন দাপট ছিল এ সংসাবে তখন সে ওকে 'বেগবা মাইযালোক' বলে বকাঝকা কবত। সংসাবেব বশি হাতছাড়া হবার পব এখন সবমাকেই রকমাবি ঠিসিঠাট্টা হজম করতে হয। তবে মালতি মুখ খাবাপ কবে না কখনও, এই যা মন্দেব ভালো। কামে কাজে বড় ঢিলাঢালা, কাজেব চেযে চীৎকাব চেঁচামেচি বেশি কবে। তবে যে কাজই কবে তাব খুঁটিনাটি বর্ণনা সে যতক্ষণ অসীমেব কাছে উপস্থাপন না করবে ততক্ষণ ওব যেন নিস্তাব নেই, কখনও দুপুবে খাওযাব সময, কখনও বাতেব বেলায ওব বলা চাইই চাই। সেই তুলনায ছোট বউব ঘাড়ে কাজেব চাপ বেশি, কাজ কবতেও পাবে। কিন্তু মালতির মতন ইনিয়ে বিনিযে ফিবিস্তি দিতে জানে না, আয—আত্মীয়স্বজন থেকে পাড়া প্রতিবেশী পর্যন্ত সবাইকে।

সরমা বড় বউর হাসি দেখে বিবক্ত হযে আবাবও প্রশ্ন করে, অত হাসনেব কি অইল বড বউ? আমাব কি কোন গুছগাছ নাই?

মালতি হাসি থামিয়ে হাসি মুখে উত্তব দেয, আপনেব আবাব কি গুছগাছ, পানেব ডিবা, নখ কাটনের নরুণ, কান খোচানি আব কেথা বালিশ তো? এই কডা জিনিসেব গুছগাছ আমিই কইবা দেমনে। আপনের অত উতলা অওনেব কাম নাই। ঘুমান গিয়া যান।

এসব কটু কথা প্রায়ই হজম কবে সরমা। আজও কোন কথা না বলে চেহাবায় নি:শব্দ বিরক্তি আব উষ্মা প্রকাশ করে নিজেব ঘরে ফিবে আসে। চৌকিতে শুযে পড়ে উথাল পাথাল ভাবতে থাকে। এমনি সময একটি টিকটিকি ঠিকঠিক বলে ডেকে ওঠে। সবমা পুরনো অভ্যেসবশে বিড়বিড় কবে বলে ওঠে, এক সত্য, দুই সত্য, তিন সত্য। তবে সে কোন কথাটি ভাবছিল তা আর ঠাহর করতে পারে না। সে কি ওর পুবনো কথা ভাবছিল নাকি ওব সাথে ছেলেদের এই লুকোচুবি খেলাকে মনে মনে শাসাচ্ছিল? টিকটিকিব কোন কথায ঠিক ঠিক বলে ফেলল তা ঠাহব করতে না পেরে সবমা উসখুশ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে দরজা খুলে বাড়ীর উঠানে নেমে আসে। ছেলে ছেলের বউ আগে এভাবে বাইরে বের হতে না করত। ওদেব ধারনা—একদিন এই সরমাব কাবণেই হযতো ওদের কোন বড় বিপদ ঘটে যাবে। কিন্তু সরমা এতে কোন গা কবে না। প্রকৃতির ডাকে সে তো

বেরোয়ই এমন কি উতলা বোধ করলেও সে রাত দুপুরে দবজা খুলে অতি সন্তর্পণে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভূতুড়ে গাছগাছালি আর পবিচিত অজস্র শব্দের ভেতব ঢুকে পড়তে বড় ভাল লাগে। তখন নিজেকে ওদেরই একজন মনে হয়। সে তখন বিড়বিড় করে কখনও নিজেব সাথে কথা বলে, কখনও ওদের সাথে। ঘন্টা দুই সরমা এভাবেই কাটিয়ে দেয়।

অবশ্য আজকের রাতটাই অন্যবকম, এর সাথে অন্য কোন বাতেব তুলনা হয় না।

সরমা বাইরে এসে প্রথমেই চটঝুলানো একটি স্যাঁতসেতে জায়গায় প্রাকৃতিক কর্ম সারে। তাবপর এক অদ্ভুত দরদী চোখে পুবো বাড়িটির দিকে তাকায়। থানা সদবেব সবচে পুরনো বাড়ী এটি। সরমার পাঁচ পুরুষের ভিটে। ওব যখন বিয়ে হয় তখনও এ বাড়ীতে প্রথমে পা দিয়ে এই দোচালা ঘরটিই পেয়েছে, এখনও তাই আছে। শুধু ওর থাকার জন্যে আলাদা একটি ঘব করে দিয়েছে। দূব থেকে পুবনো ঘবটিব মাথাই চোখে পড়ে, সরমারটি দেখা যায় না। এই দোচালা ঘরটিতেই ওর শ্বশুব মালা জপতে জপতে সহসা চোখ বুজে ফেলেছে। কেউ বুঝতেও পাবেনি, কখন গেল। শাশুড়ী ঠাকরাইন টানা তিন মাস কামেলা রোগে ভুগে তারপব ওকে নিস্তার দিয়েছে। যেদিন যাবে এর একদিন আগে থেকে সহসা চোখ খুলে তাকাত আর ঘরেব চাবপাশে কি যেন খুঁজত। মাঝে মাঝে ককিযে বলে উঠত, ঐ, ঐ যে রথ আযে। আমাবে নেওনেব লাইগা। না, না আমি যামু না। যামু না। সেকথা মনে হলে সরমাব শরীর এখন কাঁটা দেয। পুবো ঘব ভবে আছে পাড়াপড়শিতে, কেউ কেউ খোল কবতাল বাজিয়ে নাম সংকীর্তন গাইছে। কেউ মাথায চন্দন লেপে দিচ্ছে। আব সবমা চামচ দিযে একটুক্ষণ পবপব গংগা জল দিচ্ছে মুখে। দাঁতকপাটি লেগে থাকায় জল গড়িযে পড়ছে। তবু পাড়ার বুড়িগুলো ওকে তাড়া দিয়ে বলছে, সময় অযা গেছে। হবিব নাম লও আর গংগা জল দেও।

এসব কথা আজকাল আর মনে পড়ে না। হয়তো মনে কবাব ইচ্ছেই হয না। নিজেবইতো সময় হয়ে গেছে, এখন আব অন্যেব মৃত্যুব কথা ভাবাভাবি কেন। তবু এই জ্যৈষ্ঠেব বাতে একাকী উঠানে দাঁড়িয়ে চির পরিচিত ঘবটির দিকে তাকাতে ওব বড় ভাল লাগে। ঘবেব ভেতব থেকে এই অনুভূতিব ছোঁয়া পাওযা যায় না। যেদিন থেকে সুলতান এসে ওব দুই ছেলের সাথে ফিসফিস্ কবতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই সবমা বুঝতে পেরেছে — ঘবেব ভেতব থেকে নয়, এখন বাইবে থেকেই ঘবেব দিকে তাকাতে হবে। সবমাদেব এই বাড়ীটি দেড় বিঘা জমিব ওপব। বাড়িব পেছন দিকে শুধু বেত আবা আব নাম না জানা অন্য গাছের সাবি। আগে বাঘডাস-শেয়ালেব বাস ছিল। এখন ওবা চলে গেছে। থাকাব মাঝে শুধু দু-তিনটে বেজি আছে, মাঝে মাঝেই দৌড়ঝাঁপ কবে ওবা ওদেব অস্তিত্বেব জানান দেয়।

খস্ খস্ খসস্। চিঁ চিঁ। সরমা চমকে মাটিব দিকে তাকায। স্পষ্ট কিছু দেখতে না পেলেও বুঝতে পাবে—ইঁদুরগুলো ওর অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে। তাই হল্লা কবছে। ইদানীং উঠানে এসে দাঁড়ালেই সবাই যেন টের পেযে তাকে ঘিবে মেতে ওঠে। কাকেদেব ডানা ঝাপটানো, ইঁদুবদেব হুটোপুটি, ঝিঁ ঝিঁ পোকাব ঝাঁঝালো শীস সবকিছুই যেন সবমাব জন্যে। এমনকি গাছগুলোও বাতেব বেলায় ওকে দেখলে উজ্জীবিত বোধ করে। ওদেব হিমেল হিমেল নিশ্বাস আর নিজেদেব মধ্যে ফিসফিসানি কথা সে উঠানে পা দেবার পবই শুরু হযে যায। বেশকটি গাছ সবমার নিজেব হাতেব। দুটো নারকেল, পাঁচটি সুপাবী, একটি ডালিম, একটি বড়ুই আব বকমাবি ফুলেব গাছ আর তুলসীর ঝাড় ওকে দেখলেই কথা বলতে শুরু করে। এদেব মাঝে সবচেযে কচি আব নতুন ডালিম গাছটি। এবারই প্রথম লাল হয়ে ফুল ফুটেছে গাছে। সবমার হাতের স্পর্শ পেলেই কেন মিইয়ে যায়। এই ডালিম গাছটিব দিকে তাকালে বিয়ের পবপর ওর আবেগ থব থর কুণ্ঠিত লজ্জাবতী সরমার কথা মনে পড়ে। অসীমের বাবার সাথে যখন সরমাব বিয়ে হয় তখন ওব বযস বার বছব। অসীমের বাবা তখন ষোল বছরে পা দিয়েছে। কিস্যু মনে নেই সেই সময়ের কথা, সবকিছু অস্পষ্ট। তবে বিয়ের পর পর দিনের বেলায় হঠাৎ ওর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলে বুকের ভেতবটা যেন কেমন করে উঠত। এমন পাগলপাবা অনুভূতি মাত্র কয়েক মাস সে বোধ কবত। তাবপব এই দীর্ঘ জীবনের কখনও সে আর বুক খালি করা এমন প্রেমজ অনুভূতিব স্পর্শ পায়নি। কিস্যু মনে নেই তখনকার কথা, তবু রাতের বেলায় এই ডালিম গাছটাব কচি আর সবুজ ডগায় হাত বুলাতে গেলেই ওর সেই অনুভূতির কথা মনে পড়ে যায়। ওব এই অন্তর্গত সংগোপন অনুভূতিব সাথে এই সদ্য ফুল ফোটা খুকী ডালিম গাছটিব কি সম্পর্ক তা সে বলতে পাবে না। তবু এই গাছটিকে সরমা বলে ডাকতে ওর বড় ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে

ডাকেও। বড় আতাফলের গাছটিকে দেখলেই ওর অসীমের বাবা বলে মনে হয়। যখন ওদের বিয়ে হয় গাছটি সবে বড় হতে শুরু করেছে। বড় ঘরের লাগোয়া গাছটি। দরজা খুললেই সবার আগে আতা গাছটি চোখে পড়ে। রাতের বেলায় গাছটির নিচে এসে দাঁড়ালে সরমার মনে হয় – গাছটি ওকে আদর করে কাছে ডাকছে। অনেক ভুলে যাওয়া স্মৃতি এর নিচে এসে দাঁড়ালে গড় গড় করে মনে পড়ে যায়। তখন কেমন লজ্জা হতে থাকে, এক ধরণের ইতস্তত কুণ্ঠা ওকে পেয়ে বসে। ইদানীং বাড়ীর সীমানা ঘেঁষে বিশাল বেল গাছটিকে সে দেখতে পারে না। প্রায়ই অসীমকে বলে এই গাছটা কাইটা ফেলছ না ক্যা। বুড়া গাছ রাইখা কুন মুরাদ আছে ? এ কথায় অসীম কিছু বলে না। এ ধরণের আকস্মিক প্রস্তাব সরমা প্রায়ই দুই ছেলের কাউকে না কাউকে দেয়। প্রথম প্রথম বুঝতে না পেরে মেজাজ বিগড়ে যেত। এখন কোন কথা না বলে শুধু শুনে যায়।

বেল গাছটির বয়স বেশি নয়। দেখতে দেখতে হাতে-পায় বড় হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন বেল হয় না। বেলের কুঁড়ি আসতে না আসতেই ঝড়ে যায়। শুধু মাঝে মাঝে পুজো-আর্চায় বেলপাতা দরকার হয়। গাছটির দিকে তাকালেই সরমার সারা শরীর কেমন রি রি করে ওঠে। এরকম কেন হয় সে তা জানে না। মনটা কোন কারণে খিঁচড়ে থাকলে গভীর রাতে গাছটির দিকে তাকিয়ে বলে, তুই একটা সুলতান। তুই একটা সুলতান।

আজ সরমা আর ওভাবে সীমানার বেল গাছটির দিকে তাকায় না। বরং এক ধরণের দু:খ মেশানো মমতা ওর ভেতরে দানা বাঁধতে থাকে। পুরো বাড়ীটাই আজ সরমার দিকে দু:খী চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে। জ্যৈষ্ঠের মেঘলা আকাশ আর মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে হঠাৎ দেখা চাঁদের বিষন্ন হাসির মতই ওদের বাড়িটিও সরমার দিকে মলিন চোখে তাকিয়ে আছে। সে মাঝ উঠানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। দ্রুত ঘরের দিকে এগিয়ে আসে। চৌকাঠে পা দিতেই সহসা চালের ওপর ঢিল পড়ার মতন শব্দ হয়। সরমা বুঝতে পারে, এটি ঢিল নয়, ঘরের চালের ওপর যে নতুন আম গাছটি ঝাপড়ি মেলে রয়েছে ওরই উপহার। সে হ্যারিকেন নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকা টসটসে আমটি কুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। হ্যারিকেনের মৃদু আলো আঁধারিতে আমটি হাতের মুঠোয় নিয়ে সরমা হাসতে চাইলো। অন্যদিন হলে সে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠত। কেবলি মনে হত – সরমা এখনও ভালো মতন চোখে দেখতে পায়, সে বুড়ো হয়নি। কিন্তু আজ সরমা আনমনে হাসতে চেয়েও হাসতে পারল না। হাসিটি কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে, সে বুঝতে পারে না।

বিছানায় শুয়ে সরমা প্রতিরাতের মতন আবারও উথাল পাতাল ভাবতে শুরু করে। রাত খুব বেশি হয়নি। এখনও বড় ঘর থেকে ছেলে ছেলেবউদের গোলটেবিল বৈঠকের ফিসফিসানির আওয়াজ শুনা যায়। ওরা হয়তো আজ আর ঘুমাবে না। হয়তো আবারও সুলতান আসবে। ওদের গোপন কথাবার্তা আরও নি:শব্দ হবে। এক সময় বড় বউ সরমার ঘরে এসে টোকা দেবে। একবার, দুবার, তিনবার। রাতজাগা সরমা দরজা খুলে দিতেই বড় বউ বলবে, তাড়াতাড়ি রেডি হন। নদীর ঘাটে নৌকা আইছে। ভোর হওনের আগেই যাইতে অইব। তাড়াতাড়ি গোছ-গাছ করেন। তাড়াতাড়ি।

সরমা কিছু বলবে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে গজরাবে আর বিড়বিড় করবে। রাতের বেলায় এই কথা কয়টি না বলায় সবার ওপরই রাগ হবে। শেষমেষ সমস্ত রাগ আর উষ্মা গিয়ে পড়বে সুলতানের ওপর। আর সুলতানের ওপর রাগ হলেই সরমা বাড়ীর সীমানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বেলগাছটি কেটে ফেলতে চাইবে। বিড়বিড়িয়ে বলবে, মড়ার গাছ একটা ফল নাই। খালি কাওয়ার বাসা।

সুলতান ঠিকাদারি ব্যবসা করে। অসীমের বন্ধু। সেই সুবাদেই এই বাড়িতে ঘন ঘন আসা যাওয়া। এমনিতে মান্য মানতার কমতি নেই। চোখাচোখি হলেই ওকে 'মাসিমা কেমন আছেন' বলে দরদ দেখায়। পাড়ার ছেলে, জন্মকর্ম সব সরমার চোখের সামনে। তবু ওকে দেখলেই ওর শরীর কেমন বিষিয়ে ওঠে। চোখমুখ কুঁচকে ওকে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। রাতের বেলায় যখন সে বড় ঘরে বসে ছেলে-ছেলেবউর সাথে চাপা কথা আর হাসি হাসে তখন সরমার বড় গা জ্বালা করে। সুলতানের বাবা কবিরউদ্দিন মারা গেছে গত বছর। অসীমের বাবা বেঁচে থাকতে প্রায়ই গল্প করতে আসত কবিরুদ্দিন। পান খেত আর চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলত। নিজে হাসত না, কিন্তু সবাইকে হাসাতে পারত। কোন প্যাচগোছ নেই। একদম সাদা সরল ব্যবসায়ী, অসীমের বাবার মতই। কিন্তু সুলতান বড় প্যাচের লোক। বয়স চল্লিশও হয়নি। তবু এই বয়সেই এতটুকুন থানা সদরে তিনটি বাড়ি

কবে ফেলেছে। পুবনো বাড়িটি ভেঙে দোতলা কবেছে। মাঝ উঠানে দাঁড়ালেই সরমার সুলতানেব দোতলা বাড়িটি চোখে পড়ে। পাবতপক্ষে সে সেদিকে তাকায না। কখনও চোখে পড়ে গেলে সে চেহারা কুঁচকে গলার স্বব বিকৃত করে সামনে যাকে পাবে তাকেই বলবে, অসীমবে যে অত কইরা কই, বেলগাছটা কাইটা ফেলা, হের কতাডাও ঘামে না, বলে বিড়বিড় করতে থাকবে। এমন হয় যে সময়ে ঘন্টা খানেকও এই বিড়বিড়ানি চলে।

ইদানীং সুলতান এ বাড়িতে দিনের বেলায় কিংবা সন্ধ্যারাতে তো আসেই, মধ্যরাতেও ওর জন্যে দবজা খোলা থাকে, গত কদিন থেকে ওর যাতায়াত বেড়ে গেছে। দরজায টোকা দেবাব শব্দেই সবমা সুলতানকে চিনতে পাবে। কোন ভুল হয না। পবে বেড়াব ফোকর দিয়ে বড় ঘরে তাকিয়ে সে আবও নিশ্চিত হয। দরজায় টোকা দেবাব লোকটি সুলতানই। আজ রাতেও সবমা উৎকর্ণ হয়ে থাকে টোকার শব্দ শোনাব জন্যে। চোখ বুজে থাকে, কান দুটো ফেলে রাখে বড় ঘবের দবজাব সামনে দাওয়ার ওপব। আব ঠিক তখনি ওর কানে এক অপরিচিত শব্দ ঢুকে পড়ে। পাতার ওপর দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে যাবাব শব্দ। কান খাড়া হবার পাশাপাশি চোখ দুটোও খুলে যায়। হ্যাবিকেনের আলোয সে ঘবেব বেড়া ভেদ করে উঠানেব যে খানটা থেকে সন্তর্পণে হাঁটাব শব্দ ভেসে আসছে সেখানে দৃষ্টি স্থিব বাখতে চায়। হাঁটার শব্দ বড় ঘবেব ঘেব পাড় হয়ে এবাব ওর ঘব অতিক্রম কবছে। ওব ঘব পেবিয়ে সীমানাব বেলগাছ বরাবব হাঁটার শব্দ এগুতে থাকে। সরমার ঝাপসা ঘোলাটে চোখ আবও তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে। ওর মনে হতে থাকে – যাবা হেঁটে যাচ্ছে ওবা সুলতানের মতন কেউ নয। সতর্ক তবে জটিল কোন হাঁটার ভঙ্গি নয। নতুন হাঁটতে শিখলে যেমন অগোছালো অবিন্যস্ত শব্দ ওঠে, যাবা হাঁটছে ওবাও তাই। সহসা হাঁটাব শব্দ সীমানা থেকে দ্রুত ফিবে আসতে থাকে। সহসা সবমার ঘবেব সামনে এসে থমকে দাঁড়ায। তাবপব মৃদু অথচ কোমল হাতেব ঠক ঠক শব্দ হয় সবমাব দরজায়। একবাব চিৎকাব কবে বড় ঘবের সবাইকে ডাকতে চাইলে সে কিন্তু তাব আগেই বাইবে থেকে অতি পবিচিত কণ্ঠস্বব ওকে চাপা গলায় বলে উঠল, ঠাম্মা, আমবা। জীবন আর ললিতা। একথায় ধড়মড কবে বুড়ি বিছানায উঠে বসে। হ্যাবিকেনেব শিখা উসকে দেয। তেল নেই, চিমনিও পবিস্কাব কবা হয়ে উঠে না বেশ কদিন, তাই এই আলোয হাতেব আঙ্গুল পর্যন্ত গোণা যায না।

সবমা দবজা খুলে দিতেই অসীমেব ছেলে-মেয়ে দুজন হুড়মুড় কবে ঘবে ঢুকে ওকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। জীবন ক্লাস এইটে পড়ে। এ বছব বৃত্তি দেবাব কথা। ওব ঘবে এসে প্রাযই লুকিয়ে তামাক খেয়ে যায। সবমা হাজাব না কবলেও সে ওব হুঁকোয় টান একটা দেবেই। ললিতা ক্লাস ফাইভেব ছাত্রী, জীবনেব তুলনায় বেজায় ঠাণ্ডা অর নির্লিপ্ত। জীবন ওকে হাজাব বকাঝকা কবলেও কখনও নিজে ওকে পাল্টা গাল দেয না। বড় ভাইব সমস্ত অন্যায় আব্দাব সে সহ্য কবে নীরবে। শুধু মাঝে মাঝে মধ্য দুপুবে বাড়িব পেছনে আড়া জঙ্গলে একটি সবুজ ডুবে শাড়ী পবে সবাব অলক্ষ্যে একা একা ঘুবে বেড়ায় আব বিড়বিড় কবে কথা বলে। সরমা একদিন লুকিয়ে ওব পিছু নিয়েছিল, আড়ি পেতেছিল বিড়বিড় কবা কথায়। মৃদু পাতলা কণ্ঠস্বর, সব বুঝা যায়নি। তবু সবমাব মত সেও এসব গাছপালাব সাথে সম্পর্ক তৈবী করে নিজেব আবেগগুলো ওদের কাছে ঢেলে দিচ্ছে তা সে কযেক মিনিটেই টেব পেয়ে যায। ঘবে ফিবে ওর মনে হল—ললিতা আব সবমাব মাঝে কোন তফাৎ নেই। তারপব থেকে ললিতাকে দেখলেই ওব বড় আপন মনে হতে থাকে।

জীবন আব ললিতাব ফোঁপানো কান্নাব কি অর্থ সবমা তা ভাল করেই জানে। তবু সরমা নবম গলায ওদেব জিজ্ঞেস কবে, তবা এই বাইত দুপুবে বাইব অয়া আইছস ক্যা ? কেউ দেহে নাই ?

জীবন উত্তব দেয, দেকলে দেহুক গা। আমরা কেউবে মানি না। আমবা এই বাড়ি ছাড়ুম না।

সবমা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, সুলতান কি আবাব অহন আইছে ?

ললিতা বলে, সব ঠিক অইয়া গেছে, ভোব বাইতে নদীতে নৌকা লাগব। কিন্তুক, আমরা যামু না। আমরা যামুনাগো ঠাম্মা।

এই প্রথম সবমা টেব পেল—কদিন থেকে ভেতবে ভেতরে এই বাড়ির প্রতিটি গাছপালা আব পশুপাখিব কাছে যে কথা কযটি বলতে চেয়েও সে বলতে পাবেনি, ওব দুই নাতি-নাতিন অবলীলায তা বলে ফেলেছে।

সরমা কিছু না বলে ওদেব গভীর মমতায় বুকেব সাথে জড়িযে বাখে, আর তক্ষুণি তক্ষকটি ডেকে ওঠে। রাতের অন্ধকার আর নির্জনতা চিবে সেই শব্দ ওদেব তিনজনকেই স্পর্শ করে। এই তক্ষকটিকে সরমা কখনও দেখেনি। তবে অনেকদিন থেকে ওর কণ্ঠস্বব শুনে আসছে। মাঝে মাঝে তক্ষকটিকে ওরই মতন বুড়ো আব পরিত্যক্ত মনে হয।

তক্ষকটি আবাবও ডেকে ওঠে। এবাব আরও নিবিড় আব বিদাযী কণ্ঠস্বব। সবমা ওদেব মাথায় হাত দিযে ফিসফিসিযে বলে তবাব মতন আমিও যামু না। এই বাড়ি এই দেশ ছাড়তে আমিও পাকম না।

তক্ষকটি তৃতীযবাবেব মতন ডেকে ওঠে। সাথে সাথে একটি টিকটিকি 'ঠিক' 'ঠিক' কবে কণ্ঠ মেলায়। সবমা ওব ঘোলাটে ঝাপসা চোখ দিযে জীবন ওব ললিতাব কাঁধে উষ্ণ চোখেব জল ফেলে বিড়বিড় করে বলে, এক সত্য, দুই সত্য, তিন সত্য।

আজকের বাতটাই অন্যবকম, এব সাথে অন্যকোন বাতেব ঠিক তুলনা চলে না।

বারেক আবদুল্লাহ্

শীত

হুহু করে বাতাস আসছে। এবং সেই বাতাসেব ঝাপটাব সংগে সমস্ত মুখ, দেয়াল, আববণহীন স্থানগুলোতে শূন্যে জমে থাকা কুয়াশা গুঁড়া চাবুকের মতো পড়ছে অনবরত। প্রতি মুহূর্তে কুয়াশার হাল্কা প্রলেপ পড়ে পড়ে কপাল, গাল, ভুরু, দাড়িতে জমছে বিন্দু বিন্দু ঘামের মতো।

জীর্ণ কাঁথাব ভেতব সর্বাঙ্গ ঢেকে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখলে মানুষগুলোকে মনে হয় অনেক বড় একটি বোঁচকা। এক সময় ঐ বোঁচকা নড়ে ওঠে, আস্তে আস্তে মুখ বের করে। নি:শ্বাস নেয়। চোখ পিট পিট করে আকাশের দিকে তাকায়। দিনের দেখা নীল আকাশটার চিহ্ন খুঁজে পায়না কোথাও। পরিবর্তে দেখে, ধোঁয়ার মতো আবছা বং-এব একটা বিশাল চাদর আকাশ থেকে নেমে সারা দুনিয়া ঢেকে বেখেছে।

লাইট পোষ্টের আলো ফিকে। বড় বড় দোকানের আলো, সন্ধ্যার পর থেকে রাত আটটা অব্দি ভয়ংকর উজ্জ্বলতায় জ্বল জ্বল করছিলো যা চোখ ধাঁধানো রূপ নিয়ে, তা এখোন নেই। পরিবর্তে জ্বলছে বন্ধ দোকানেব সাইন বোর্ডের ওপব পাহারাদার আলো। কিন্তু তাও এতো ম্লান, ওদেব কাছে মনে হয়, ঘুম জড়ানো চোখে ভাবে, দোকানগুলোর তালা নিশ্চিন্তে ভাঙ্গতে পাবে এখোন যে কোন একটা ফুঁচকে চোর। দোকান পাহাবা দিতে যে আলোব প্রযোজন, সে উজ্জ্বলতা এখোন কুয়াশাব গ্রাসে। পর মুহূর্তেই ভাবে ; যা শীত ; চোর বেরোয়না এ শীতে। বুকের ভেতব কিংবা দু'উকব মাঝখানে জড়ো কবে হাত দুটো আরো উষ্ণতার জন্যে নিবিড় ভাবে চেপে ধবে।

আবার বাতাস আসছে। থেমে থেমে কিছুক্ষণ বিরাম দিয়ে দিয়ে এমনি হু হু বাতাস আসে। মানুষগুলোর মনে হয়, এখানে বাতাসটা যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ইচ্ছাকৃত আক্রমণ চালায। কুণ্ডলী বাঁধা মানুষগুলো নড়ে ওঠে। আর নি:শ্বাস রুদ্ধ করে শবীবের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে সহিষ্ণুতার।

তবুও বাতাসের শীতল প্রকোপে মাংসহীন বুকের ভেতর শীর্ণ পাঁজরগুলো যেন একে অন্যেব সঙ্গে আঘাত খায়। ঠকঠক শব্দ ওঠে দাঁতে। পাঁজরেব হাড়ে। মানুষগুলো মবতে মরতে বাঁচে প্রতিক্ষণ।

কে একজন মলিন কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে কঁকিয়ে উঠলো। তারপব ছুঁড়ে দিলো : বাচুম না। খোদা।

উচ্চারিত শেষ শব্দটা ইথারে ভেসে কুয়াশার প্রথম স্তবে আছড়ে পড়ার আগেই সে আকাশের দিকে মুখটা তুললো। যেন দেখতে চায় এই দুরন্ত শীতে আরশে অধিষ্ঠিত খোদাও ওদেব মতো ঠকঠক করে কাঁপছে কিনা। কিন্তু লোকটা তার দৃষ্টি বহুক্ষণ চতুর্দিকে ঘুরিয়েও কিছু দেখতে পেলো না। বারবার কুয়াশার আস্তরের পর আস্তরে হোঁচট খেয়ে ফিরে এলো।

: হবির মা। ও হবির মা।

লোকটা নিস্তেজ কণ্ঠে ডাকলো।

কিন্তু হবিব মা নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে লোকটা আবার ডাকলো। কিন্তু সাড়া নেই। এবার মুখ ঘুরিয়ে দেখলো, আপাদমস্তক আবৃত হবির মা নি:সাড়ে পড়ে আছে। সামান্য শব্দে ঘুম এখনো ভাঙ্গবে না। ঘুম ভাঙ্গবে পাতলা কাঁথাটা যখন কুয়াশার বিন্দু শুষে শুষে ভিজে উঠবে, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সূচের মতো বাতাস স্পর্শ করবে শরীর, তখন।

তখন হবির মা আর ঘুমোবে না। কয়েক মাসের হবিকে বুকে জড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে

সারারাত দরদ পড়তে পড়তে প্রথম বিস্ক্রার ঘন্টা শুনবে এবং মুয়াজ্জিনের আযান ।

কিন্তু হবির মা নামাজ পড়ে না ।

ষ্টেডিয়ামের চারদিকে, বন্ধ দোকানগুলোর সমুখের ফুটপাতে এসে রাত্তিরে ঘুমোয় এরা ।

প্রথমবার যে যেখানে ঘুমিয়েছে, তার জন্যে সে জায়গাটা বরাদ্দ । এ যেন ঈশ্বরের সেই অমোঘ নির্দেশিত কপালের ভিক্ষাবৃত্তির মতোই অনড় বরাদ্দ । কোন নড়চড় নেই ।

অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে নিজেরা করে । সেখানে ঈশ্বরের হাত নেই । এবং সেই ব্যতিক্রম নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয় ব্যাপকভাবে । সমস্ত ঘটনার সমাপ্তির মতো কলহের মীমাংসাও হয়ে যায় এক সময় । তবে এমন স্থান পরিবর্তনের বিবাদ খুব কম ।

দিনভর এরা ভিক্ষা করে । চাল, ডাল, পয়সাটা সঞ্চিত রেখে পেট চালায় হোটেলের উচ্ছিষ্ট, কিংবা কোন বাড়ীর উদ্বৃত্ত থেকে । ফেলে দেবার আগের মুহূর্তে লুফে নেবার মতোই সংগ্রহ সেটা । তাতেই দিন কেটে যায় । কোনদিন পেটপুরে জোটে । কোনদিন অর্ধাহার । তবু ওরা বেঁচে থাকে । বেঁচে থাকে দীর্ঘনিশ্বাস আর রোগক্লিষ্ট দেহটা সম্বল করে।

সমস্ত দিন কাটায় রাস্তায়, এখানে-ওখানে । সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় গন্তব্যের দিকে পা চালানো। কেউ লাঠি ভর দিয়ে, রাস্তায় ঠকঠক শব্দ তুলে এগোতে থাকে ।

কোলের বাচ্চাটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কাঁদতে থাকে কাঁখে আধঝোলা অবস্থায় কারো কারো । কারো বুক সম্পূর্ণ উদোম । ঝুলে পড়া স্তনের বোঁটায় শিশুর মুখ ।

রাত বাড়লে আস্তে আস্তে এসে ঘুমোয় বন্ধ দোকানের সমুখে ।

ক'দিন থেকে হবির মার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ।এবার ছেলেটা হবার পর থেকে আরো ভেঙ্গে গেছে আগের তুলনায় । চামড়ার নীচে মাংস প্রতি মুহূর্তে গলে যেন নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে কোথায় । চামড়া কুঁচকে হাড়ের সঙ্গে মিশেছে । তর্জনী আর বৃদ্ধার সংযোগে চামড়াটা টেনে তুলতে অন্তত: দেড় ইঞ্চি উপরে উঠে আসে । আবার ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ইলাষ্টিকের মতো ছিটকে গেঁথে যায় হাড়ের উপর ।

দিন দিন হবির মা ক্ষয়ে যাচ্ছে । মরে গেলেও হয়তো এমনি রাস্তার পাশে পড়ে থাকবে ।

লোকটা হবির মাকে আর না ডেকে স্থির চেয়ে আছে বোঁচকার দিকে । এবং তখনি, চেয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় দেখলো, বোঁচকার ভেতর হবির মা, যে তার স্ত্রী, সে নড়ছে । সামান্য একটু নড়েই গোলাকার বোঁচকাটা লম্বা হয়ে গেলো । ঘুমন্ত দেহের আড়মোড়া ভাঙ্গছে হয়তো । তারপরেই লোকটা শুনলো ভীষণ করুণ কণ্ঠে হবির মার গোঙ্গানি ।

লোকটা অস্থির হয়ে উঠলো সহসা ।

: হবির মা, ও হবির মা ।

উত্তর নেই । আবার ডাকলো –

: হবির মা ।

বোঁচকাটা গোল হয়ে গেলো ।

: কি ?

: আহুম ?

নিরুত্তর হবির মা ।

স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলো লোকটা এবার ।

: কও । হবির মা উত্তর দিলো ।

: শীত করেনা ?

: হ ।

: আহি ?

: না । থাউক ।

লোকটা আর কথা বললো না । শুধু অনুভব করলো, পল্টনের দিক থেকে আসা বাতাসটা প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । সেই সঙ্গে ধোঁয়ারং কুয়াশার একটা স্তরও হুড়মুড় করে পড়লো । লোকটার মুখে কুয়াশার প্রলেপ । দাড়িতে বিন্দু বিন্দু । একহাতে মুখ মুছে, জীর্ণ কাঁথায় সর্বাঙ্গ মুড়ে সে

আবাব কুণ্ডলী বেঁধে বোঁচকা হলো ।

কোন দিকে শব্দ নেই । শব্দ যেন একটা বল হয়ে উধাও হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে ।

আবার কখোন শব্দের বল ছুটে আসবে পৃথিবীতে ? ষ্টেডিয়ামের ফুটপাতের মানুষগুলো হাঁসফাঁস করে উঠলো । তবু, একবার কেউ কাঁথার ভেতব থেকে মুখ বের কবে দেখতে চাইলো না । আকাশটা দেখা যায় কি না, কুয়াশার একটা স্তবও কেটেছে কিনা ।

কুয়াশার মিহি গুঁড়া পড়ে পড়ে শায়িত মানুষগুলোর চারপাশ ভিজে গেছে । শবীরেব ওপব কাঁথা ও কুয়াশার বিন্দু নিজের ভেতর গ্রহণ করছে আস্তে আস্তে । লোকগুলোর শবীব এখোন স্পর্শ করছে বাতাসের সঙ্গে জলও । আগের চেয়ে আরো তীব্র লাগছে শীত এখন । শরীব জমে যাচ্ছে ।

আল্লা, রাইত পোহায় না ক্যা । একটা বোঁচকার ভেতব থেকে কথাগুলো বেবিযে এলো ভয়ানক কেঁপে কেঁপে ; ভৌতিক স্বরের মতো । লোকটার চারপাশে শীতাক্রান্ত মানুষগুলো কোন উত্তর দিলো না । পবিবর্তে ভীষণ শীতকষ্টে হুঁ হুঁ শব্দ করলো ।

রাত এখনো শেষ হয়নি । কুয়াশায় কিছু বোঝাও যাচ্ছেনা রাত কত । তবুও বাতেব আয়ু প্রায শেষ এটা অনুমান করা যাচ্ছে ।

কান্নার ব্দটা প্রথমে শুরু হযেছে ষ্টেডিযামের উত্তর দিক থেকে । এখোন কান্নার শব্দের পরিবর্তে সেখানে একটা সোরগোল । এবং আস্তে আস্তে তা ছড়িযে পড়লো ষ্টেডিযামের চারদিকে । বোঁচকার ভেতর থেকে মানুষগুলো বেরিয়ে সোবগোল লক্ষ্য করে হাঁটতে শুক কবলো ।

একদল মানুষ কুণ্ডলী বেঁধেছে । সেই কুণ্ডলীর একপাশে হবির মা চিৎকার কবছে । কিন্তু সেই চিৎকাবের শব্দ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সোবগোলেব ভেতব ।

একজন মানুষ নত হয়ে স্পর্শ করলো বাচ্চাটাব শবীব । ভীষণ ঠাণ্ডা । হবিব মাব বুকেব উষ্ণতা সূর্যোদয় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পাবলো না কয়েক মাসের সন্তানকে ।

বাচ্চাটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে ।

পশ্চিমবঙ্গ পর্ব

বাংলা গল্পের অঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ

তিনটি ভিন্নতব ভৌগলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে থাকা মূলত বিপুল সংখ্যক বাঙালিপাঠকেব জন্য এই যে সংকলনটি প্রকাশিত, তাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উনিশ জন লেখক নির্বাচিত হয়েছেন। এমন নয় যে, এখানে, বর্তমানে ঐ উনিশ জনই শুধু গল্পচর্চায় সিদ্ধকাম ; আধুনিক দেশকালেব পটভূমিকায এ বাজ্যে লেখকেব সংখ্যা অনেক বেশি। বই এব আকাব, বিক্রযমূল্য এবং ছাপাখরচের কথা মাথায রাখলে নির্বাচিত লেখকদেব একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায বাঁধতেই হয় — তাই উনিশ। পশ্চিমবাঙলার প্রতি 'অক্ষব' প্রকাশনেব কিছু পক্ষপাতিত্বেব জন্যই হযতো সাধ্যেব সীমাবেখাটিকে টেনেটুনে সর্বাধিক সুযোগেব ব্যবস্থা কবেছেন তাঁবা। এজন্য নিশ্চয়ই, তাঁবা ধন্যবাদার্হ-এ বাজ্যেব সমস্ত লেখকদেব তবফ থেকে।

সাহিত্যে ছোটগল্পেব বিভাগটি বাঙালির গৌববময় ঐতিহ্যেব। ববীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নযের দশকেব শেষপর্বে তরুণতম লেখকটি পর্যন্ত — প্রায় শতাধিক বছরেব কালখণ্ডে — বিচিত্র পথে, চৈতন্যের কত নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হযে সৃষ্টির উজ্জ্বল ফসলগুলো ছড়িয়ে আছে। কত ভিন্নভিন্ন মাত্রায ব্যক্তি, জীবন ও সমাজকে লেখকবা দেখতে চেযেছেন! বিভূতি-তাবাশঙ্কর-বনফুল-সুবোধ ঘোষদেব যেমন আমরা পাই, তেমনই স্বকীযতায তুমুলভাবে উপস্থিত থাকেন মানিক-সোমেন চন্দ-ননী ভৌমিক-সমবেশ বসু-মহাশ্বেতাবা। আছেন রমেশ সেন-জগদীশ গুপ্ত অমবেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। আবাব বিমল কব - শীর্ষেন্দু-মতি নন্দীবা যেমন আছেন, পাশাপাশি দীপেন-দেবেশ-অসীম বাযদেবও পেযে যাচ্ছি আমবা। কমলকুমাব-অমিযভূষণ-সন্দীপনদেবও বা এড়িযে যাই কী ভাবে? বিচিত্র একটি কোলাজ হযে, বং ও তুলিব টানেব বিভিন্নতায, বাংলাগল্পেব একটি সার্থক পরম্পবাব সৃষ্টি।

তবু খুঁটিযে দেখলে বোঝা যাবে সত্তবেব বসন্তেব বজ্রনির্ঘোষেব প্রাককাল পর্যন্ত, বাংলাগল্প মূল দুটি ভাবনা-প্রকল্পকে ঘিবে আবর্তিত। কোনোকোনো দশকে যদি প্রথমটি মুখ্য হযে ওঠে তো কখনো দ্বিতীযটি। যেন থিসিস এবং এ্যান্টিথিসিস। একটিকে যদি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাব মডেল বলি, অন্যটি তবে অস্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ক্ষয ও ভোগেব মোড়কে পশ্চিমী দর্শনেব নানা উপধাবা— যার শিকড়টিও ভাবতীয ঐতিহ্য বা উপনিবেশ-পূর্ব জন-সাইকিতে গ্রথিত ছিল না। প্রকৃত অর্থে, দুটি মডেলই মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষার আলোকস্নাত নব্যমধ্যবিত্তেব উদাব চিন্তাব আমদানিকৃত। এতে কোনো মহাভাবত অশুদ্ধ হযনি। সংস্কৃতিব অন্যতম বৈশিষ্ট্য নানা ফুলেব পাবস্পবিক পবাগমিলন। দিবে আব নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিবে! তাই বাংলাগল্পের পবম্পবায উভয ধাবাতেই আমবা উৎকৃষ্ট কিছু গল্প পেযেছি। তবে এই দুইযেব বাইবে থেকেও কোনো কোনো লেখক তাঁদেব ভাবনাচিন্তাব শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন।

সত্তরের বজ্রনির্ঘোষের রাজনৈতিক মাত্রার সমান্তরালে নতুন দিগন্ত খুলবার প্রচেষ্টা— যা রাজনৈতিক উগ্রতার আড়ালে ছিল অস্পষ্ট, অঘোষিত ; শেষরাতের অন্ধকারে অখ্যাত ফুলের একঝলক সুঘ্রাণের মতো — ক্রমে দশক অতিক্রান্ত হয়ে নির্দিষ্ট অবয়বে উঠে আসতে থাকে। থিসিস-এ্যান্টিথিসিসের পাশ কাটিয়ে নতুন সিনথেসিস। সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিকে সাহিত্য কতটুকু বহন করবে কিংবা সামাজিক দায়হীনতা ও ফর্মসর্বস্বতাই আর্টের একমাত্র উদ্দেশ্য কিনা — এইসব যুযুধান ভাবনাবিতর্কের পথ এড়িয়ে, সাতের দশকের লেখকরা স্ব স্ব ক্ষমতার সম্বলটুকু নিয়ে শিকড়ের সন্ধান শুরু করলেন। তাঁদের গল্পে মূলত তিনটি ভিন্ন লক্ষণের সূচনা ফুটে উঠল। ১. শিল্প বাস্তবকে ইন্দ্রিয়জাত নিরেট বাস্তবের নিয়মকানুন থেকে বেশি-বেশি করে মুক্তি। ২. ছোটগল্পের প্রচলিত সংজ্ঞা ভেঙ্গে বহুস্তরীয় করে তোলা। ৩. এশিয়ান প্রাচীন সমাজের কথা ভেবে গল্পের বিন্যাসকে টিলেঢালা রেখে, ফাঁকগুলোতে নীরবতার ভূমিকাকে প্রধান করে তোলা। তাঁদের এইসব ভাবনাচিন্তা আধুনিক না উত্তর-আধুনিক, বাঁশবনে ডোমকানা না হয়ে বলতে পারি, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা বা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন প্রজন্ম যে ভাবে শিল্প সাহিত্যকে দেখেছেন, আমাদের বাংলা ভাষাভাষী তরুণ লেখকরাও খুঁজছিলেন নিজেদেব পায়ের তলাব মাটি — পাঁচহাজার বছরের পুরনো সভ্যতার গোপন জটাজাল।

এরা কতটুকু সফল, ব্যর্থ কতখানি, আপন-আপন স্টাইল ও ভাষা তৈরির আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন কিনা — এইসব বিতর্কে ন'মন তেল পোড়ানো নিষ্প্রয়োজন। নতুন ভাবনার গর্ভচ্যুত, বক্ত-ক্লেদ মুছে নবাগত শিশুকে স্পষ্টতর করে তুলতে প্রয়োজন সময় ও প্রতিভার। কিন্তু নতুন পরম্পরা সৃষ্টিতে, ভিন্নমাত্রার ভাবনা-চিন্তার জন্যই এরা সেলাম পাওয়ার যোগ্য অবশ্যই।

সংকলনের উনিশ জন লেখকই সিনথেসিস পর্যায়ের। প্রবীন ও কনিষ্ঠতমেব বয়সের তারতম্য প্রায পঁচিশ বছরের। অর্থাৎ দুই প্রজন্মের ভাষা ও শিল্পগত বিবর্তন চিহ্নিত হয়েছে গল্পগুলিতে। তাই এই সংকলনটি ঐতিহাসিক।

ইতিমধ্যে, এই উনিশ জনেরই এক বা একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত এবং লিট্‌লম্যাগাজিনে নিয়মিত লিখে বিদগ্ধ পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাই এদের কতটুকু গ্ল্যামার, কী বাণিজ্যিক খ্যাতি — এমন ভোগবাদী ভাবনার বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু বিভবমাত্রাটিকেই মাপকাঠি ধরা হয়েছে। চূড়ান্ত বিচাব অবশ্যই সচেতন পাঠকবর্গের উপর। নতুন ভাবনাচিন্তায় লেখক যখন 'দ্বিজ' হঁয়ে ওঠেন, তাকে আবাহন করতেও দরকার আধুনিক চৈতন্যের।

রাজ্য ও রাষ্ট্রের সীমানা উড়িয়ে দিয়ে, প্রায় বিশ কোটি বাঙালি ও অন্যান্য পাঠকদের কথা ভেবে, বাংলাগল্পের 'তিনধারা — এক উৎস'-এর সন্ধান দিতে যে-ভাবে শ্রম ও অর্থের দায়ভার তুলে নিয়েছেন প্রকাশনার কর্ণধার শ্রীমান শুভব্রত দেব — আশা করব ভবিষ্যৎ প্রকল্পেও পাঠকবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত পাশে এসে দাঁড়াবেন তাঁর।

অভিজিৎ সেন

নদীর মধ্যে শহর

সেপ্টেম্বর মাসের বন্যা। সমস্ত শহর আজ চারদিন যাবত জলেব তলায়। সেপ্টেম্বরে কদাচিত এরকম হয়। এ সময়তো বৃষ্টির বেগ কমেই আসে। কিন্তু নদী ক'দিন ধরে ক্রমাগতই ভরছিল। তিন চারশো কিলোমিটার দূরে পাহাড়ে আচমকা ব্যাপক বৃষ্টি হযেছিল। হয়েছিল এবং শোনা যাচ্ছে এখনো হচ্ছে। সেই জল নেমে এসে ভাসিয়েছে আবো দু'একটির সঙ্গে আমাদের এই ছোট শহরটিকেও।

বন্যার জন্য আমাদের কোনও প্রস্তুতিই ছিল না। চারদিন শহর ডুবে থাকার ফলে সংসারে অনেক কিছুরই অভাব দেখা গেল। সে কাবণে জল ঠেলে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরোলাম। বাস্তায় কোথাও কোথাও জল হাঁটু সমান, কোথাও তার থেকে একটু কম। বাজারের পাড়াটা উঁচু। জল সেখানে রাস্তায় তেমন না থাকলেও, রাস্তার পাশের কোনা-খানায জমে আছে। চাবদিন ধরে জল যেন একইভাবে থম ধবে আছে। শহরের উত্তর ধারে যে নদী, তা যেন জীবন্ত। ভরাট। তাব গতি জান্তব। নির্ঘাত প্রলয়েব মাত্রায় যেন নির্দিষ্ট। আর সে জন্যই তার গতি বোধহয় অত ধীব। অর্থাৎ নদীর দিকে তাকালে বোঝা যায় নিচের দিকেও অনেকদূর পর্যন্ত সে প্লাবিত করেছে। মাইল চল্লিশেক দূবে এই নদী যেখানে গঙ্গায পড়েছে, গঙ্গাও সেখানে যথেষ্ট উঁচু। উঁচু না থাকলে জল দ্রুত নেমে যেত। কিন্তু এখন শহরটা নদীর মধ্যে।

আমার বাড়ি শহরতলির দিকে। ছোট শহবের শহরতলি বলতে যা বোঝায় আর কি। বাড়িঘর ফাঁকা ফাঁকা। বেশিবভাগই খেটেখাওয়া গরীব মানুষের বাড়ি। এর মধ্যেই আমার মত দু'একজনের পাকা দালান। পাকা দালান প্রায় সবই নতুন।

রাস্তায় নেমে আমি জল ভেঙে বাজারের দিকে এগোতে লাগলাম। চা আনতে হবে। অগতিব গতি ডিম ডজনখানেক। এছাড়া শুনেছিলাম গ্রামের দিকে বহু পুকুর ভেসে যাওয়াতে বড় বড় মাছ শহরের বাজাবে এসে পড়েছে। নাকি সস্তাও। তেমন যদি পাই, একটা মাছও কিনব। চার পাঁচদিন মাছ খাওয়া হযনি।

শহবেব মাঝখান দিযে যে খাড়িটা গেছে তাব উপরে গ্যারেটি ব্রিজ। বস্তুত, নদীর বেশিরভাগ জলটাই এই খাড়ি দিয়ে ঢোকে শহরে। গ্যাবেটি ব্রিজ শহরের দুই অংশকে জোড়া দিয়ে রেখেছে। ব্রিজে ওঠাব মুখে উঁচু জাযগায় লক্ষ্মণেব চায়ের দোকান। আমি সেখানে ক্বচিৎ-কদাচিৎ বসি। বহুকাল আগে, বন্ধুদের সঙ্গে নিযমিত আড্ডা মারার বয়সে রোজই কয়েক ঘন্টা সময় এখানে কাটত। এখন বসি হয়ত ছ'মাসে একবার। অনেকখানি জল ভেঙে লক্ষ্মণের দোকানের শুকনো জায়গায় এসে একটু স্বস্তিবোধ হল। বন্যার জলের মধ্য দিয়ে আসাতে গা ঘিনঘিন কবছিল। আমি টিউবওয়েলের কাছে গিয়ে হাঁটু থেকে পা অবধি ধুয়ে নিলাম। হাঁটুর উপর অবধি গুটিয়ে রাখা লুঙ্গি ছেড়ে দিয়ে দোকানের টেবিলে এসে বসলাম।

লক্ষ্মন বলল, বাপরে, তুমি যেন এদেশে আব থাকই না। কদ্দিন পরে এলে বলতো জয়দেবদা ? আমি বললাম, চা দে। জলেব খবব কি বলতো ? লক্ষ্মণ বলল, সকালে নিমাই

হালদার এসেছিল, বলল, কাল রাত থেকেই নাকি ফাট ধরেছে। জলেব পেট পড়তে শুরু করেছে।

এসব শব্দের অর্থ সবার কাছে পরিষ্কার নয়। "জলে ফাট ধবা" বা "জলেব পেট পড়া"র মানে এককথায় জল থেকে পলির বিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ জলের তলানিপড়া প্রক্রিয়া শুরু হওয়া। নদীতে জলের টান স্তিমিত হলেই এমন হয়। অর্থাৎ উপর থেকে আব সেভাবে ভেঙে ধেযে আসছে না। অর্থাৎ বন্যার তীব্রতা কমে এসেছে, এবার জল কমবে।

আমি বললাম, তাতে কি বোঝা গেল ? সামনে গঙ্গা উঁচু হযে আছে না ? জলেব গতিতো ধীব হবেই। লক্ষ্মন বলল, তা হোকগে। নিমাই হালদাব অভিজ্ঞ লোক। দেখো, দুদিনের মধ্যে জল কোথায় নেমে যাবে। লক্ষ্মণ আমাব সামনে চাযেব গেলাশ বাখল। চায়েব গেলাশ হাতে তুলে আমি নিচু হযে চুমুক দিতে গিযেও থেমে গেলাম। আমার চোখ গিযে পড়েছিল ঠিক ওপারে। খাড়িটা যেদিকে ক্রমশ প্রশস্ত হতে হতে নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেখানে খাড়িব ধার ঘেঁষে সারি সারি কুড়ে ঘব। রাস্তাব সঙ্গে প্রায় সমতলে তৈরি একখানা খোলার ঘরের সামনে আমি অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায বিনযকে দেখলাম। সত্যি বলতে কি, বিনয় যেন উৎখাত হচ্ছিল ওই ঘরটির বারান্দা থেকে। পাঁচ ছ'জন অত্যন্ত মাবমুখি ধাঙব স্ত্রী-পুরুষ এবং তার সঙ্গে তাদেব একদঙ্গল ছেলেমেযে বিনযকে ঠেলে, খামচে, এমনকি চড়চাপড়ও মেরে রাস্তার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তাদের মুখে অশ্রাব্য গালি-গালাজ। বিনযেব জামা, লুঙ্গি, কিছু কাগজপত্র, দু'একখানা বই, ইত্যাদি সবকিছুই রাস্তায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলছিল। আমি চাযেব গেলাশে চুমুক দিতে ভুলে গিয়ে বিনয়েব দুর্গতি দেখতে লাগলাম। বিনযেব চোখেব ময়লা লেগে ঘোলাটে হওয়া কাঁচের চশমা একজন স্ত্রীলোকের হাতেব চতুব খামচায একদিকে ছিটকে পড়ল। আমি জানতাম বিনয চোখে খুবই কম দেখে। চোখে খুব কম দেখা লোকেব চশমা হাতড়ে খোঁজাব দৃশ্যটা বড় করুন। আব যদি কাকচিলেব মত তাড়া কবা একদল মানুষ তার পিছনে থাকে তাহলে ব্যাপাবটা ভয়াবহ।

বিনয চশমা, বইখাতা, জামা, লুঙ্গি হাতড়ে দু'হাতে তুলে বেশ খানিকটা দূবে সবে এসে দাঁড়াল। আব কযেক পা এগোলে বাস্তাব ঢালু অংশ শুরু। সেখানে বন্যাব অঢেল জল ? ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া পাতলুন পবা বিনয় চশমাব কাঁচ মুছে চোখে লাগিযে জলের দিকে তাকাল তারপব হঠাৎ ঘুরে সে পিছনের জটলার দিকে স্থির হযে তাকিযে থাকল কিছু সময। জটলার ভিতর থেকে দু'তিনটা বাচ্চা মারমুখি ভঙ্গি কবে খানিকটা কবে এগিয়ে এসে ফের পিছিয়ে গেল। পিছিয়ে গিযে হ্যা-হ্যা করে হাসল তাবা। আমি জানতাম ওই বাচ্চাগুলোর মধ্যে অন্তত তিনটা বাচ্চা বিনযেব।

বিনয়ের দৃষ্টি অনুসবণ করে আমি এতক্ষণে তার স্ত্রী মহাবাণীকে দেখতে পেলাম। মহাবাণী রঙ্গমঞ্চের দিকে তির্যক হয়ে ঘবটাব ডান দিকেব দেযালে হেলান দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে ছিল। সে যেন একটা পাথবেব মূর্তি। এবকম একটা অসাধাবণ বঙ্গমঞ্চে দর্শকদেব দিকে পিছন ফিবে বিনয়, আমার বাল্যবন্ধু বিনয, অপবাধীর মত ফ্যাসফসে গলায বলল, কোথায যাব ? কোথায যাব আমি ?

বিনয়েব এই প্রশ্ন এত মোটা দাগেব, এত অনাটকীয যে উদ্দিষ্টদেব মধ্যে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তবুও জটলাব মধ্য থেকে একজন খানিকটা এগিযে এসে চেঁচিয়ে বলল যাঁহা খুশি ওহি যা ! অপনা ভাই-বিবাদবকে পাস যা, নেহি তো পানি মে ডুব্‌কে মর্‌-যাঃ ! ইঁহা ফিব্ আওগে তো — সে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত কবল। তাবপর ফিবে গিয়ে লোকটি ঘরেব ভিতরে ঢুকে একটা গেলাশ নিয়ে এল। গেলাশে খানিকটা মদ ঢেলে সে মহাবাণীব হাতে ধরিয়ে দিল।

মহাবাণী পাথবের মত মুখেই দু'তিন চুমুকে গেলাশ শেষ কবে পাশে বাখল। লোকটি মহারাণীব পাশে বসে ঐ একই গেলাশে মদ ঢেলে এবাব নিজে খেতে শুরু কবল।

লক্ষ্মণ বলল, পবশুদিন থেকে চলছে। আজ বোধহয ফাইনাল হয়ে গেল।

আমি কিছু বললাম না।

বিনয় যদি ব্রিজ পার হয়ে ওপারে যেত, তাহলে যে বেশি শুকনো ভূ-খণ্ড পেত। ওপাশটা জলে তেমন ডোবেনি। কিন্তু সে তা করল না। সে আরেকবার হতাশভাবে তার স্বজনদের দিকে তাকিয়ে এপারের জলের মধ্যেই নেমে হাঁটতে শুরু করল। চিবুক একটু তুলে ভারি কাঁচের চশমার ভিতর দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে সে জলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। এই প্রথম আমি আবিষ্কার করলাম বিনয়ের হাঁটার বিশিষ্ট ভঙ্গিটি আর নেই। ছোটবেলা থেকেই তার হাঁটাচলায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার একটা ভঙ্গি ছিল। তার জীবনে যত বিপর্যয় এসেছে, তার পরিমাণ নেহাত কম নয়। কিন্তু চলাফেরা বা চোখমুখের সেই বিশিষ্ট উজ্জ্বল ভঙ্গিটিকে কখনোই ম্লান হতে দেখিনি। আমার কখনো কখনো মনে হত বিনয়ের ভিতরের আসল মানুষটার সঙ্গে বুঝি বাইরের কোনও সম্পর্কই নেই। সে যেন সত্যিই ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। আবার কখনো মনে হত এসবই তার ভাণ।

আমি আর বিনয় দু'জনেই পিয়ারগঞ্জ থেকে এ শহরে এসেছি। পিয়ারগঞ্জ জায়গাটা এ শহর থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার দূরে। সেখানে একটা হাইস্কুল আছে, একটা রুরাল লাইব্রেরি আছে, আর আছে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পিছনে বিনয়ের ঠাকুর্দা গোলোক মজুমদারের হাত ছিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো গোলোক মজুমদারের দান করা জমির উপরে হয়েছে। এই শহরটার কলেজ, হাসপাতাল এবং মহিলা উন্নয়নের সংগঠনের জন্য গোলোক মজুমদার অকাতরে জমি দান করেছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে শ্বেতপাথরের প্লেটে গোলোক মজুমদারের নাম আরো কয়েকজনের সঙ্গে দাতা হিসাবে মুদ্রিত আছে।

পিয়ারগঞ্জ ইস্কুলে আমি আর বিনয় একত্রে পড়াশুনা করেছি প্রাথমিক স্তর থেকে বেশ কয়েক বছর। সেই সময় আমাদের এদিকে অবস্থাপন্নদের মধ্যে ছেলেমেয়েকে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার খুব ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। গোলক মজুমদার বিনয়কে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করিয়ে দেয়। বিনয় শান্তিনিকেতন থেকে ইস্কুল ফাইনাল পাশ করে গ্রামে ফিরে আসে। তারপর আমরা দু'জনেই আমাদের শহরের কলেজে ভর্তি হই। কলেজে থাকতে থাকতেই একটা সুযোগ পেয়ে আমি পলিটেকনিকে চলে গেলাম। সেই থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।

তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে জাতিয়তাবাদী আবেগে গোলোক মজুমদার অনেক দানধ্যান করেছিল। সেই গৌরব নিয়ে সে মরে গেলে তার ছেলে মন্মথ মজুমদার আমাদের জেলায় একজন কেউকেটে মানুষ হয়ে যায়। প্রচুর খেয়ে এবং পান করে, প্রচুর স্ত্রীসঙ্গ করেও মন্মথ মজুমদার তার বাপের অর্জিত গৌরবকে কমাতে পারল না। গ্রামের লোকে বলত, একটা পুরুষ বটে মন্মথ মজুমদার। শেষে শেষবয়সে আমাদের পাশের থানা গয়েশপুরে একজন নিচ বংশীয় স্ত্রীলোককে নিয়ে সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিল। সেখানে তাদের একটা খামারবাড়ি ছিল। মন্মথ কোনওদিন আর পিয়ারগঞ্জ ফিরে আসেনি।

ফলে বিনয়ের রক্তে সম্ভবত তার পূর্বতন দুই পুরুষের দু'ধরনের আবেগই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডল থেকে আহৃত একধরনের আধুনিকতার বোধ এবং যাবতীয় গ্রাম্য ধ্যানধারণা, সংস্কার ইত্যাদির উর্ধে ওঠার এক নাগরিক আকাঙ্খা।

আমি পলিটেকনিক থেকে ফিরে এসে দেখলাম বিনয় বি এ পাশ করে বসে আছে। ততদিনে তার গায়ে সাদা পাজামা-পানজাবি পাকাপাকিভাবে উঠে গেছে। শান্তিনিকেতনের গুরুস্থানীয় কারুর প্রভাবে বিনয় সি পি. আইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। চারপাশে এতসব শক্তিশালী দল থাকতে সে যে কেন সি পি. আইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল তা আমাদের বোধগম্য হল না। কেননা, এ জেলাতে ঐ দলটির অস্তিত্ব নামমাত্র আছে বললেও বেশি বলা হবে। তাছাড়া তার ছিল একটা পারিবারিক রাজনৈতিক পরিচয়। সে শৈশবে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিনয়ের সঙ্গে আমার তফাৎটা বুঝতে পারছিলাম। তখন থেকেই তাকে আমার খুব স্বাভাবিক মনে হত না। ইস্কুলে থাকতেই তার চোখে চশমা ছিল। প্রতি দু'বছরে চশমার পাওয়ার বাড়িয়ে বাড়িয়ে তার আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে

সমর্থ হয়েছিল। সে যখন তাকাত, মনে হত সে কাছের কিছু দেখে না। সে শুধু দূরের দিকেই তাকাত।

তারপর সরকারি চাকরি পেয়ে আমি মুর্শিদাবাদ চলে গেলাম। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কই থাকল না একরকম। একবার মাঝে দু'চারদিনের জন্য এসে কার কাছে যেন শুনলাম যে বিনয় পিয়ারগঞ্জ হাসপাতালের ঝাড়ুদারদের একটা মেয়ের কাছে যাতায়াত শুরু করেছে এবং সেসব নিয়ে খুব কেলেংকারি হচ্ছে। আমি মাত্র দু'চারদিনের জন্যই এসেছিলাম। এসব নিয়ে ভাববার আমার আদৌ কোনও অবসর ছিল না। সরকারি বাস্তকারের অফিসে প্রচুর টাকাপয়সা রোজগার করছিলাম আমি। ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকলেই লোকসান। যদি বা পারিবারিক কোনও জরুরি কারণে কখনো বাড়ি আসতাম, দু'তিনদিনের বেশি থাকতাম না।

এবকমই একবাবের আসায় পিয়ারগঞ্জেব প্রাথমিক হাসপাতালের সামনে দিয়ে আমি বিনয়কে হেঁটে যেতে দেখলাম। হাত তুলে ডাকতে গিয়েও নিজেকে সংযত করে নিলাম আমি। বিনয়ের সঙ্গে একটি দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীলোকও হেঁটে যাচ্ছিল। লম্বায় বিনয়ের প্রায় সমান সমান মেয়েলোকটির চেহারায় একধরনের স্বাভাবিক অহংকারের দৃপ্ত ভঙ্গি ছিল। সে যেন জানত যে সে হেঁটে গেলে আশপাশের পশুপক্ষিও তাকে লক্ষ্য করবে। তাছাড়াও এমন উগ্র অসংস্কৃত আকর্ষন তাব শরীবে ছিল, যা এড়ানো কোনও পুরুষমানুষেব পক্ষেই কঠিন। হঠাৎ কেন যেন বিনযেব প্রতি ঈর্ষা আমার মনের মধ্যে বিন্‌বিন্ কবে উঠল। আমি তাকে ছোটবেলা থেকেই যদিও ঈর্ষা কবতাম, কিন্তু এ ঈর্ষার প্রকৃতিই যে ভিন্ন। তবুও আমি নিজের কাছে অস্বীকার কবতে পারলাম না যে বিনয়ের সঙ্গে তাকে মানিয়েছিল চমৎকার। কিন্তু তাই বলে মেথবেব মেয়ে।

সেই মেয়ে এই মহাবাণী বাঁশফোড়।

গ্রামে ততদিনে টিটিক্কার মিইয়ে এসেছে। বিনযের পবিবারেরও গা-সওযা হয়ে গেছে সবকিছু। বিনযদের শবিকদের মধ্যে যাদেব সামর্থ্য ছিল, তাবা আগেই শহরে উঠে গিয়েছিল। ততদিনে বিনয়ের বোনেদের বিয়ে হযে গেছে, ছোটভাই কলকাতায় ডাক্তাবি পড়ছে এবং পুবো পরিবাবটা অসম্ভব দুস্থ হযে পড়েছে। পিয়াবগঞ্জেব বাড়িতে দু'চারজন নিরুপায বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা আশ্রিত ছাড়া বিশেষ কেউ ছিল না। তাদেব প্রায সমস্ত জমিজমাই ভেস্‌ট্ হয়ে গেল। বিনয় একবার বুঝি চেষ্টা কবেছিল মহারাণীকে নিয়ে তাদেব পুবানো বাড়িটাব দু'একখানা ঘব দখল করতে। কিন্তু সমাজ ও স্বজনদের প্রবল বাধাদানে তা আব শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ফলে সে নিজেই গিয়ে উঠল হাসপাতালেব ঝাড়ুদারদের ভাঙাচোরা কোযার্টারে।

বিনয়দের দাম্পত্য কেমন হয়েছিল তা পরিষ্কাব বোঝা কাবোই সাধ্য নয। গ্রামে এলে আমি পুরানো বন্ধুবান্ধবদেব সঙ্গে দেখা কবাব জন্য সুশীলেব দোকানে বসতাম। একদিন সুশীলের দোকানে বসে গল্প করাব সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মহাবাণী কোলে একটা এক-দেড় বছবের বাচ্চা নিযে তাব সেই স্বাভাবিক দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। আব তার পিছন পিছন একটা জীর্ণশীর্ণ এবং এক পা খোঁড়া লোক লেংচাতে লেংচাতে যাচ্ছে। খোঁড়া লোকটার চেহাবায় সারাক্ষণ নেশা খেয়ে থাকাব লক্ষণ। কোনও একটা আবেদন নিয়ে ঘেঙাতে ঘেঙাতে সে মহাবাণীর পিছন পিছন যাচ্ছিল। মহাবাণীব পরনে যথাবীতি একখানা নতুন ছাপাব শাড়ি এবং মানানসই ব্লাউজ। আমি তাকে যতবার দেখেছি, প্রত্যেকবারই তার পবনে নতুন ছাপার শাড়ি ছিল।

তাকে দেখিয়ে সুশীল আমাকে বলল, জমিদারবাড়ির নতুন বংশধব দেখেছিস?

— মানে? আমি একটু চমকেই উঠলাম, যদিও তার কোনও কারণ ছিল না।

সুশীল বলল, হ্যাঁ, ওটা বিনয়েরই ছেলে।

— আর ও লোকটা কে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— ও হল ধম্মা বাঁশফোড়, মহাবাণীব স্বামী।

— ও-ওকি এখানে থাকে নাকি?

— না, ধম্মা থেকে বিনশিবা। বিনশিরা হাসপাতালেব চাকবির খাতায় নাম আছে। কাজ করে ওর ভাই। ও শুধু মাইনের দিন খাতায় সই কবে। ভাই ওকে নেশা কবার জন্য কিছু টাকা দেয়। কিন্তু তাতে ওর চলে না। তাই মাঝে মাঝে মহারাণীর মাঝে ঘেঙাতে আসে।

ঘেঙানিতে বিরক্ত হয়ে মহারাণী তাব হাঁটা থামিয়ে পিছন ঘুবল এবং আচমকা তার বলিষ্ঠ, দীর্ঘ একখানা হাত দিয়ে ধম্মার মুখেব উপব দু'তিনটা এলোপাথাড়ি চড় মাবল। ধম্মা লেংচাতে লেংচাতে দু'তিনপা পিছিয়ে যেতে মহারাণী আবার চলতে শুরু করল। পরমুহূর্তে ধম্মাও সেই একই ভঙ্গিতে মহাবাণীর পিছন পিছন এগোতে শুরু কবল।

সুশীলকে জিজ্ঞেস কবলাম, বিনয়েব চলে কিসে ? সুশীল বলল, চলে না। জমি-জমাতো বেশিরভাগ ওর বাবাই শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। বাকি যা ছিল বেচে সোনাকাকি এক মেয়ের বাড়িতে উঠেছে। ওর ভাই প্রণযেব এবাবতো বোধহয় ফাইনাল ইয়াব। জমিবেচা টাকায় তার খবচটা চালায় সোনাকাকিমা।

— বিনয় জমি বেচার টাকাপয়সা দাবি করেনি ?

সুশীল বলল, তেমন তো কিছু শুনিনি। ও তো কেমন ছিটিয়াল সে তো জানিসই।

কিভাবে কয়েকবছব কেটে গেল। আমি নিজেব শহবে চেষ্টাচবিত্র কবে বদলি হয়ে এলাম এবং জমি কিনে বাড়ি করলাম। গ্রাম থেকে মা-বাবা ভাই-বোনদের শহরে নিয়ে এলাম। আমার রোজগার আবো বেড়েছিল। ফলে পাঁচ বছবেব মধ্যেই আমাব বাড়ি দোতলা হল ? বিনয়ও ইতিমধ্যে শহবে চলে এসেছিল। সুশীলেব কাছে শুনেছিলাম পিয়াবগঞ্জের হাসপাতাল থেকে মহাবাণীর বদলির জন্য গ্রামেব লোকজন কলকাঠি নাড়াচাড়া কবাতে তাকে শহরের হাসপাতালে বদলি কবা হয়। মাঝেমধ্যে বাস্তাঘাটে বিনয়েব সঙ্গে আমার দেখা হত। দেখা হলে আমি একপাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম, বিনয অন্যপাশ দিয়ে। এতে কোনওবকম এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপাব ছিল না। আমাদের জীবনযাত্রা এত পৃথক হয়ে গিয়েছিল যে আমরা পবস্পরেব কাছে প্রায অপবিচিতই হয়ে গিয়েছিলাম।

এবকম সময়ে একদিন বিনয আমার কাছে এল। সে যে আমার কাছেই আসছে সে সম্পর্কে তাব বোধহয় আগে থাকতে ধাবণা ছিল না। আমার মনে হয়েছিল সে শুধুমাত্র একটা দোতলা বাড়ি দেখেই ঢুকে পড়েছিল। কেননা সামাজিক বা অন্য কোনবকম যোগাযোগ সে ভদ্রসমাজেব সঙ্গে রাখত না।

দরজা খুলে তাকে দেখে আমি একটু বিস্মিত এবং শংকিত হলাম। ভাবি পাওয়াবের চশমাব কাঁচে বাজ্যেব নোংবা। বোদে পোড়া তামাটে রুক্ষ চেহাবা তাব। সর্বাঙ্গে বাস্তাব দাবিদ্র। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

দরজা খুলতেই সে তার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতায বলতে শুরু কবল, একটা ইস্কুল খোলার জন্য কিছু সাহায্য পাবাব প্রত্যাশায আমবা আপনাব কাছে —

আমি বললাম, বিনয !

এতক্ষণে সে আমার চোখাচোখি তাকাল।

বলল, ও, তুমি ?

আমি বললাম, আয়, ভিতবে আয।

সে বলল, ভিতবে ? না ভিতবে যাব না।

আমাব ভিতবে কেমন যেন ভাঙচুব হয়ে গেল। আমার বাল্যকালেব প্রাণের বন্ধু। ক্লাশ ওয়ান থেকে একসঙ্গে পড়েছি। দু'জনে দু'জনেব গলা জড়িয়ে দিনের পব দিন ইস্কুলে গেছি। নদীর চবে তরমুজ চুবি কবতে গেছি একসঙ্গে।

হাত ধরে তাকে ভিতবে আকর্ষণ করলাম।

জোব দিয়ে বললাম, আয় ভিতবে।

সে ভিতরে এল। বস্তুত দশবারো বছরের ভিতরে এই বোধহয় প্রথম তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা।

সে খুব সংকুচিতভাবে আমার সাজানো বৈঠকখানার সোফার এককোণে বসে নার্ভাসভাবে এদিকে ওদিক তাকিয়ে দেখল। বলল তুমি খুব বড়লোক নাকি ?

আমি তৃপ্ত হয়ে বললাম, বড়লোক আব কোথেকে হব ? চাকরি করে খাই—

— কি চাকবি কর তুমি ?

বললাম।

সে বলল, ও, তুমিতো পলিটেকনিক পাশ কবেছিলে।

আমি বললাম, তুই আমার সঙ্গে ওরকম "তুমি তুমি" কবে কথা বলছিস কেন ?

সে একথা শুনল কিনা পবিষ্কাব বুঝলাম না।

বলল, একটা প্রাইমারি ইস্কুল খুলব বলে লোকজনেব কাছে যাচ্ছি। মেথবেদের ছেলে মেয়েদের প্রাইমারি —

আমার ভিতবে একটু কুঞ্চন হল। তবুও সহৃদয়ভাবে বললাম, প্রাইমাবি ইস্কুলতো পাড়ায় পাড়ায়ই আছে। আবার একটা নতুন করে কি লাভ। তাছাড়া, মেথবেব ছেলেমেয়েবা কি ইস্কুলে যায় ?

সে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি ঠিক পুবোপুবি একটা ইস্কুলেব কথা বলছি না। সারাদিনে কিছুক্ষণ ছেলেমেয়েদেব নিয়ে বসতে চাই। তাব জন্য একটা জায়গা, আর কিছু বই, শ্লেট, ব্ল্যাকবোর্ড, একটু বসাব ব্যবস্থা, এইসব। তাওতো হচ্ছে না।

আমি বললাম, তুই থাকিস কোথায় এখন ?

সে একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, আমিতো হাসপাতালেব ওখানে থাকি। ওখানেই তো একটু জাযগা চেয়েছিলাম। কতগুলো ওয়ার্ড তো খালিই পড়ে থাকে। কিন্তু হাসপাতালেব জাযগা ব্যবহার করতে দিতে সবাব আপত্তি।

আমি জানতাম, এইভাবে কোনও সরকারি সম্পত্তি ব্যবহাব করতে দেওয়াব ঝুঁকি কতখানি এবং ব্যাপাবটা কতখানি বেআইনি। আমি আবো জানতাম ওই হাসপাতালের তিন একব জাযগাব এক একরের দাতা বিনয়েব ঠাকুর্দা গোলোক মজুমদাব। কিন্তু অন্যমনস্ক বিনয় সে প্রসঙ্গ তুলে আক্ষেপও করল না।

সে আবাব বলল, আমার ছেলে তিনটাবও, জানো, পডাশুনা হচ্ছে না।

আমার হঠাৎ খুব রাগ হল বিনয়ের উপব। বিতৃষ্ণা হল।

সে আমাব স্বজাতি। উচ্চবর্ণের মাহিষ্য আমবা। তাব উপবে গোলোক মজুমদাবেব নাতি। একটা মেথরের মেয়েছেলেব জন্য জীবনটাকে নষ্ট করল। বংশ এবং সমাজের মুখে চুনকালি লেপে দিল। ওব বাবাব মত বাখত না হয় মেয়েলোকটাকে একপাশে।

বললাম, কি যে করলি তুই জীবনটাকে নিয়ে। বিনয় এতক্ষণে আমাব দিকে একটু সোজাসুজিই তাকাল। তাব সেই ধাবালো উজ্জ্বল চেহারাটার আব কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে একটু হাসল। ছাইয়ের নিচে লুকানো আগুন যেন অতি সামান্য একটু ঝিলিক দেখালো। বলল, জীবন ? জীবন এবকমই। জীবনেব কোনও নির্দিষ্ট ধরণ নেই।

বিনয় ছোটবেলা থেকেই এবকম হেঁযালিভরা কথা বলত কখনো কখনো। ওব কোনও কিছুই আমাদের সঙ্গে মিলত না। কখনো কখনো ভাবি দুর্বোধ্যও লাগত তাকে। তাছাড়া শান্তিনিকেতন থেকে ফেরাব পব তাব কথাবার্তাতে নতুন একধবণের তীব্রতা এসেছিল।

আমি বললাম, বিনয়, তুই এভাবে জীবন কাটাবি, এ আমবা ভাবতেও পাবি না। তুই ফিবে আয়, বিনয়। আমবা সবাই মিলে চেষ্টা করে তোর একটা ব্যবস্থা কবে দেব।

বিনয় বলল, ফিরে আসব মানে ? কোথায় গেছি আমি, যে ফিরে আসব ?

আমি শরীরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, ফিরে আসবি ওই মেথরপট্টি থেকে, ফিরে আসবি ওই মেয়েলোকটাকে ছেড়ে।

সে সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, আমি চলি।

আমি তার হাত চেপে ধরলাম। শৈশবের আবেগ আমার গলাও আটকে ধরেছিল।

—তুই ফিরে আয় বিনয়, আমি কথা দিচ্ছি আমরা তোর কথা ভাবব। ব্যবস্থা করব।

— আর আমার স্ত্রী সন্তান ? তাদের কথা কে ভাববে ?

সে আমার হাতের মধ্যে শক্ত হয়ে বসে থেকে বলল।

— তুই ছাড়তো ! কে তোর স্ত্রী সন্তান ?

সে বেশ ধীরস্থিরভাবে বলল, তোমাদের সবার একথা ভাবতে এত কষ্ট হয় কেন বলতো যে আমি আমার স্ত্রী সন্তানদের ভালোবাসি এবং মর্যাদা দেই ?

আচমকা আমার একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ল। সেটা সেই সময়কার কথা, যখন সুশীল আমাকে জমিদারবাড়ির বংশধর চিনিয়েছিল। সেটা ফাল্গুন চৈত্র মাস। নদীর জল শুকিয়ে বালির চড়া বেরিয়ে পড়েছে অনেকখানি। আমি গ্রামে যাবার জন্য নদীর ঘাটের দিকে এগোতে কিছুটা দূরে দুরন্ত হাওয়ার মধ্যে বিনয় এবং মহারাণীকে দেখেছিলাম তাদের শিশুটিসহ। বালির মধ্যে টলমল পায়ে শিশু দৌড়বার চেষ্টা করছিল। মাহরাণীর পিছন ছিল নদীর দিকে, আর বিনয়ের আমার দিকে। তারা দু'জনে শিশুটির চাঞ্চল্য ভারি উপভোগ করছিল। মহারাণীর টানটান শরীরে একখানা নীল ছাপা শাড়ি বাতাসের বিপরীতে আরো টানটান, তীক্ষ্ণ। তার দু'হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি। হাওয়ায় উড়ছে তার চুল। তার এসবের সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় হা-হা করে হাসছিল। দৃশ্যটা এত প্রাণবন্ত যে, এখন পর্যন্ত ভুলতে পারিনি আমি।

তবুও বিনয়ের কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। ঐরকম চেহারার একটা মেয়ের কাছে যাওয়া হয়ত যায়। যেমন সুশীল বলেছিল, মেথরের মেয়েলোক বটে, তবে স্বপ্নের মেয়েমানুষের মত তার চেহারা। কিন্তু তাই বলে একেবারে স্ত্রী সন্তান ! বিনয় তার নিজস্ব ভঙ্গিতে একটু বাড়াবাড়ি করছে।

বললাম, হয়েছে বিনয়, বাড়াবাড়ি করসি না। তোকে আমার থেকে বেশি চেনে কে ? একজন স্ত্রীলোকের কাছে একজন পুরুষ সবসময়ই যেতে পারে। আর ওরকম একজন স্ত্রীলোক। কিন্তু তার মানে এই নয় —

বিনয় এবার আমার নাম ধরে বলল, জয়দেব, আমি আর তোমাদের লোক নই। আমি যদি তোমাদের লোক হতাম, তাহলে এই শহরে যে কোনও একটা চাকরি আমার হত। নিদেন প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি একটা। চাকরির বয়স আমার অনেকদিন চলে গেছে। সারাজীবনে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তিনটা ডাক পেয়েছিলাম। সেসব জায়গায় যাওয়ার আগেই আমি জানতাম যে ওসব চাকরি আমার হবে না। তোমরা আমাকে অনেক আগেই ত্যাগ করেছ। আমি মেথর। আমি এখন মলভাণ্ডের পাশে বসে খেতে পারি, নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারি কুকুরকে জড়িয়ে ধরে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করতে পারি। আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে যেতে পারে। তোমাদের এটা শুধু পুরুষরাই পারে, যেমন আমার বাবা করেছিল। কিন্তু আমি তাকে ধরে এনে মেরে রক্তাক্ত করতে পারি এবং তারপরে মদ খেয়ে দু'জনে হল্লা করতে পারি। এইসমস্ত কিছুর পরে দু'জনে উন্মাদের মত যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পারি।

আমি জানতাম, আমার স্ত্রী দরজার আড়ালে কোথাও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। বিনয়কে ঘরে ঢোকবার পর থেকে তার নড়াচড়ার কোনও আওয়াজ আর আমি পাইনি।

আমি আবার বললাম, বিনয়, মানুষ ভুল করে, আবার সংশোধনও করে নিজেকে। আমাদের উপর তোর অনেক অভিমান জমা হয়ে আছে এটা ঠিকই, কিন্তু সেসবতো এখনো

মেবামত কবে নেওয়া যায় ? যে গোলোক মজুমদার লক্ষ লক্ষ টাকাব সম্পত্তি জনহিতে দান করেছেন, তার নাতি সাধাবণ মানুষেব দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কবে বেড়াবে ? একটা কদর্য জীবন কাটাবে ?

আচমকা বিনয় বলল, তোমাব অনুমান ঠিক। আমি মেথরতো, আমার প্রবঞ্চনাব মাত্রা ওই দশ-বিশ-পঁচিশ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইস্কুল কববার ছলে তোমাদের ঠকাচ্ছি। কিন্তু জয়দেব, তোমাব পৈত্রিক অবস্থা আমি জানতাম। এই বাড়িঘব, এই আসবাব ও বিলাস সামগ্রী—এ নিশ্চয়ই সব তোমার মাইনেব টাকাতে হয়নি ? কদর্যতা তোমাদেব জীবনে বোধহয় খুব কম নয়, কি বল ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাব মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সে আবাব বলল, তোমাকে আঘাত কবার ইচ্ছা আমাব ছিল না। কিন্তু তোমবা আমার স্ত্রী সন্তানের প্রতি আমার ভালবাসাকে এত অবিশ্বাস কব কেন বলতো ?

আমি নিজেকে গুটিযে নিলাম।

বললাম, না, আমাবই ভুল হয়েছে। তবুও একটা কথা তোকে বলি। যদি কখনো এমন মনে হয় যে আমি তোব কোনও সাহায্যে লাগতে পাবি, আমাব কাছে আসতে দ্বিধা করিস না।

ভুল আমাব যথার্থই হয়েছিল। আমাদেব দু'জনেব বর্তমান অবস্থান আমাকে বিনযেব উপব করুণাব আড়ালে কর্তৃত্ব করার জন্য প্ররোচিত কবেছিল। আমি আমাদেব বাল্যের ও যৌবনেব রোখা চোখা এবং অসম্ভব সংবেদনশীল বিনযকে ভুলে গিয়েছিলাম।

সেই হল বিনযেব সঙ্গে আমার শেষ আলাপ। তাবপব গত পাঁচ ছ'বছরে একই শহরে বাস কবার ফলে বাস্তাঘাটে আমবা নিয়মিত পরস্পরকে দেখেছি কিন্তু কখনো আব কথা বলিনি। শৈশব থেকে যৌবনে আমাদেব পবস্পবেব মধ্যে যে তীব্র ভালবাসা জন্মেছিল, তা কিন্তু আমি কখনোই ভুলতে পাবিনি। তাকে দেখলেই আমাব শাপভ্রষ্ট কোন দেবতাব কথা মনে হত। শেষপর্যন্ত বিনয সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপাবটাই আমাদের নিরুপায় অভ্যাসে পবিণত হয়ে গেল।

লক্ষ্মন বলল, চা যে জল কবে ফেললে। আব এক গেলাস দেব নাকি ?

আমি বললাম, দে।

মেথবদের জটলা থেকে দু'জন বয়স্কা স্ত্রীলোক এসে লক্ষ্মনেব দোকানেব সামনে প্রায় বাস্তাব উপরেই বসল। লক্ষ্মণ একই সঙ্গে চা কবে তাদেবও দিল, আমাকেও দিল। এতদিন পরে হঠাৎ আমার কাছে ধবা পড়ল যে মেথবদেব সঙ্গে আমরা একই গেলাশে চা খাই ! অবশ্য কোনও মেথরকে দোকানেব চেয়ার-টেবিলে এসে বসে চা-খাবাব খেতে দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

জমাদাবনীদেব চা দিতে গিয়ে লক্ষ্মণ বলল, ও মৌসী, কা ভইল ?

উদ্দিষ্টা হিন্দী বাংলা মিশিয়ে কোন রাখঢাক না বেখে বলল, কা ফিন্ হোবে ? নয়া কুস্তো নায হোয়। মহাবাণীযোকে খাবে, মহারাণীযোকে পিন্বে এবং মহাবাণীব সঙ্গেই সঙ্গম কববে—ফিন্ ডাঁটেগা ভি ! বন্যাব জলে মেথরদেব সবগুলো ঝোপবি, অফিস বাড়িগুলোব একতলা ডুবে গেছে। এই সামান্য জাযগাটুকুতে শহরেব তাবৎ বাঁশফোড়গোষ্ঠী আশ্রয় নিয়েছে। এব মধ্যে মেথব মেয়েলোকেব ইযে-চাটা 'এক বাবুকা জগাহ্ কৈসে হোগা ? কোই বাবুকাবুকা জগাহ্ নেহী হোগা !"

জমাদাবণীরা চলে গেলে লক্ষ্মণ বলল, এই যে মদ নিয়ে এল দেখলে না, ওব নাম রামলহর। মিউনিসিপ্যালিটিব ট্র্যাকটব চালায়, ভাল মাইনে পায। মাসখানেক হল ওব বউ মাবা গেছে টিবিতে। মহারাণীর সঙ্গে এখন ওই থাকে।

আমি চুপ করে থাকলাম। শেষবাব বিনয় বড় অহংকাবের সঙ্গে বলে এসেছিল "আমি

মেথর" । কিন্তু মেথর সে হতে পারেনি, আবার মহারাণীকেও বের করে আনতে পারেনি ওই পরিমণ্ডল থেকে । এসব সম্ভবই না । সমাজে যার যেখানে অবস্থান, তাকে সেখানেই থাকতে হবে । এটাই নিয়ম । মহারাণী আমাকে ভাল চিনত না কিন্তু পিয়ারগঞ্জের বহু লোককেই সে চিনত । পিয়ারগঞ্জের লোকেরা তাকে ভয় পেত । কেননা, শহরের রাস্তায় পিয়ারগঞ্জের কোনও লোক তার সামনা-সামনি পড়লেই সে উচ্চস্বরে গালাগালি দিত । বুকে, পেটে এবং উরুর উপরে থাবড়া দিয়ে সে রুখে উঠে কুৎসিত গাল দিত। আঙুল মটকে অভিশাপ দিত । কেউ জানত না পিয়ারগঞ্জের লোকের উপর তার কেন এত রাগ । প্রথমদিকে শহরের একেবারে দরিদ্র অঞ্চলে বিনয় মহারাণীকে নিয়ে একটা কাঁচা ঘর ভাড়া করে বসবাস শুরু করেছিল । সে পাড়াটা মেথরপাড়া নয় । কিন্তু সেখানকার মানুষের আর্থিক অবস্থা মেথরদের থেকেও খারাপ । আরো শোচনীয় । পুরুষরা পঞ্চাশ-ষাট টাকার তবিল নিয়ে ব্যবসা করে অথবা রিকসা, ঠেলা, এইসব চালায় আর স্ত্রীলোকেরা শহরের বাবুদের বাড়ি ঝিগিরি করে । পিয়ারগঞ্জের গেদু ভূঁইমালী, যে গাঁজা টানতে টানতে দম ফেটে মারা গিয়েছিল, তার ছেলে বোবা কানু সেখানে থাকত । কানু শহরের রাস্তায় রাস্তায় বাদাম, বরফ, এইসব ফিরি করত এবং হাত, পা, চোখ, মুখ দিয়ে নানারকম কেরিকেচার দেখাত । লোককে নকল করে দেখাত । আমার অফিসেও বাদাম বেচতে আসত সে । একদিন ইঙ্গিতে বিনয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই, সে ব্যাপারটা ধরে ফেলল এবং প্রথমেই মহারাণীর অসাধারণ চলার ভঙ্গি নকল করে দেখাল । কানুর কাছ থেকে জেনেছিলাম বিনয়-মহারাণী ভাবি একা । সেই ঝি-পাড়াতেও তারা একঘরে। বোবা কানু নাকটিপে, চোখ কুঁচকে এবং শব্দ করে থুথু ফেলে তার ঘৃণা প্রকাশ দেখিয়েছিল ।

চা খেয়ে, পয়সা দিয়ে আমি ব্রিজ পার হয়ে বাজারে গেলাম । সত্যিই বেশ ভাল মাছ এসেছে । দু'কিলো-তিন কিলো ওজনের কাতলা মাছের দর কিলোপ্রতি বিশ-পঁচিশ টাকা করে। আমি বেশ বড় একটা মাছ কিনলাম । তারপর প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে ফের জল ভেঙে ঘরে ফিরে এলাম । যাক্, দিন তিনেকের মত বাজার যাওয়ার হাত থেকে রেহাই ।

পরদিন থেকেই শহরের জল নামতে শুরু করল । কিন্তু সে নামা এত মৃদু যে এমনি চোখে ঠাহর হয় না । চব্বিশ ঘন্টায় চার ইঞ্চি জল নামল কিনা সন্দেহ । আমার বাড়ি যেহেতু শহরতলির দিকে সেখানে জল প্রায় একই রকম থাকল । সন্ধ্যার সময় আমার অফিসের তরুণ অ্যাসিসট্যান্ট ইনজিনিয়ার টেলিফোনে জিজ্ঞেস করল যে আগামীকালের কথা আমার মনে আছে কিনা । তখন মনে পড়ল যে পরদিন বিশ্বকর্মা পূজা । পি. ডবলিউ. ডি অফিসে বিশ্বকর্মা পূজার খুব ধুম হয় । পান-ভোজনের একটা ব্যাপক ব্যবস্থা থাকে প্রতি বছর । অফিসারকে বললাম যে আমি যাব বটে, তবে দিনেমানেই ফিরে আসব । কেননা আমার রাস্তার জল সরতে এখনো দেরি আছে ।

পরদিন অফিসের প্রসাদ নিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন খিচুরি-প্রার্থী দুর্গতদের ভিড়ের মধ্যে বিনয়কে আমি একঝলক দেখেই সেখান থেকে সরে এলাম । বিষণ্নতা আমাকে গ্রাস করল। আমরা সবাই এই শহরে আছি । প্রণয় এখন এই শহরের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার । আর বিনয়, আমাদের পিয়ারগঞ্জের সেরা ছেলে বিনয়, ভিখারিদের সঙ্গে খিচুরি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে !

ভারি মন নিয়ে আমি বাড়িতে ফিরে এলাম । মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না দেখে সন্ধ্যার পর তিনতলার ছাদে উঠে গেলাম আমি । রাস্তার আলো আলো জ্বলছে । বিদ্যুৎ দপ্তর এই বন্যার মধ্যেও খুব ভাল পরিষেবা করছে । কিন্তু রাস্তার ওই নির্দিষ্ট আলোর রেখাটুকু বাদ দিলে চারদিকে একেবারে ভুতুড়ে অন্ধকার । সেই অন্ধকারের মধ্যেও বোঝা যায় কালো জলের অস্তিত্ব। সেই জল এখন পচে উঠেছে । একটা আঁশটে পচা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে । আশপাশের গরীব মানুষদের কাঁচা বাড়িগুলো বন্যার জল বাড়তেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল । আমার বাড়ির পিছন দিকে একটা উঁচু ভিটা আছে । কয়েকঘর লোক সেখানে তাঁবু খাটিয়ে গরু ছাগলসহ আশ্রয় নিয়েছে ।

আমি দীর্ঘসময় ধরে ছাদের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করে যাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম বিনয় সম্পর্কে কি করা যায় । আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না বিনয়ের চিন্তা

এখনো আমাকে কেন এত অস্বস্তিতে ফেলে। একবার ভাবলাম নিচে গিয়ে টেলিফোনে প্রণয়কে ডেকে যা হোক একটা পরিকল্পনা করি।

এমন সময় রাস্তার উপরে জলেব মধ্য দিয়ে কারো হেঁটে আসাব শব্দ শুনলাম। সে শহরের দিক থেকে আসছিল। আমি এগিয়ে ছাদেব ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। কে যাচ্ছে এত রাতে জলের মধ্য দিয়ে ? রাস্তায় আলো থাকলেও সবগুলো পোস্টে তো আলো নেই। তাছাড়া সামনের দিকে জল আরো গভীর। রাস্তার দু'পাশের খানাখন্দে ডুব জল।

লোকটি এগিয়ে আসতে আসতে একবার পড়ল। পড়ে বিরবির কবতে কবতে সে আবাব উঠে দাঁড়াল। আমি বুঝলাম লোকটি মাতাল। সে আবো খানিকটা এগোতে আবছা আলোয আমি তাকে দেখতে পেলাম। সে রাস্তাব মাঝখানে দিয়ে এগোবাব যত চেষ্টাই করুক, বাববার এদিকে ওদিকে হড়কে যাচ্ছিল। আমার কেন যেন মনে হল, ও যদি আরো এগোবার চেষ্টা করে তবে নির্ঘাত ডুবে মরে যাবে।

আমি উপব থেকে হাঁক দিয়ে বললাম, থামো ওখানে। কোথায় যাবে ?

রাস্তার উল্টোদিকের একটা বাড়ির বেড়ার গায়ে গিয়ে সে আবার পড়ল। পড়ে জলেব মধ্যেই সে বসে রইল। বসে পড়তে কাঁধ অবধি জল উঠল তার। সে ওইভাবে বসে অনুচ্চস্বরে গালাগাল দিতে লাগল। জীর্ণশীর্ণ ভাঙাচোবা একটা হাভাতে লোক।

আমি চিৎকার করে বললাম, ওইখানে বসে থাকো। আব এগোবেনা তুমি। আমি আসছি।

আমি পিছন ফেবার আগেই সে উঠে পড়ল আবার। ফলে তাকে সাহায্য কবাব জন্য আমার আর নেমে আসা হল না। আমি চিৎকার করে আবারো বললাম, খবরদার আর এগিযোনা, ওইখানেই থামো–

মাতাল এবাব লাঠিছাড়া অন্ধেব মতই এগোতে লাগল। আমি আবাব তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবে তুমি ?

সে বলল, বাড়ি যাব।

আমার ছাদ থেকে এই সময়ে তার দূরত্ব আড়াআড়ি তিনশ'-সওয়া তিনশ' গজেব মত। রাস্তার নিকটতম বাল্বটি আমার বাড়িব সামনেই। সেই মৃদু আলোয় মাতাল আমার নিষেধেব তোয়াক্কা না করে তার নির্ঘাত-নিয়তির দিকে এগোতে লাগল। আমি আতংকিত হয়ে দেখলাম আমাব সীমানার পাচিল যেখানে শুরু হযেছে তাব আগের ফাঁকা জমিটাব সামনেব রাস্তার উপরে সে দাঁড়ানো। কোনওবকমে যদি সে বাঁদিকে পিছলে সরে যায়, তাহলে সে ডুবে যাবে। কেননা ওখানে ডুবজল। আমি তাকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিতে লাগলাম, তুমি ডানদিকে থাক, ডানদিকে থাক!

ডানদিকে আমাব প্রতিবেশী বামাপদের নতুন বাড়িব অনেক উঁচু করে তৈরি ভিটে। আমি বামাপদর নাম ধরেও চিৎকার করতে লাগলাম। তার বাড়ি থেকে টি ভি-ব আওয়াজ আসছিল। আমার চিৎকারে এতক্ষণে আমার স্ত্রী পুত্র দোতলার সামনের বারান্দায় এসে ব্যাপার কি বুঝতে চেষ্টা করছিল। টর্চের আলো মাতালের উপরে পড়তে তারাও বামাপদর নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তাব লোকটি তার নির্ধারিত মৃত্যুর দিকে টলে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে পরমুহূর্তেই সে গলা জলে এবং আমার সতর্কতাকে ভ্রুক্ষেপ না কবেই খলবল খলবল করতে করতে গভীরতর জলের দিকে সরে যেতে লাগল।

বামাপদর ঘর একদম রাস্তার সঙ্গেই। এথক্ষণে ব্যাপাবটা সে টের পেয়ে টর্চ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল! ব্যাপারটা বুঝতে পারা এবং মাতালকে নির্দিষ্ট করতে কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেলেও বামাপদ সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার জলের মধ্যে নেমে এসে দাঁড়াল। তার কাছ থেকে ছ'সাত হাত দূরে লোকটা খাবি খাচ্ছে। বামাপদ এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই আমি ছাদে থেকে দৌড়তে শুরু করলাম। পুরো ছাদ দৌড়ে আসা, সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা থেকে একতলায়

নামা, জল ভেঙে লম্বা উঠান পেবিযে এসে গেট খোলা এবং শেষপর্যন্ত রাস্তার উপবে আসার মধ্যে মাতাল অদৃশ্য হযে গেছে। আমাব আসাব জন্য জলে যেটুকু আলোড়ন উঠেছে তা বাদে জল নিথব। আমি ঝোঁকেব মাথায লোকটি যেখানে ডুবেছে সেই দিকে কোমর জল অবধি এগিয়ে যেতে বামাপদ লাফ দিযে এসে আমাব জামা টেনে ধবল। আমি থমকে থেমে গেলাম। আমার বুকেব ভিতরে একটা কাঁপুনি শুরু হল। সামনের আলো আঁধাবি জলেব দুরভিসন্ধি আমার ভিতরের আতংককে শতগুণে বাড়িয়ে দিল। সেদিকে তাকিয়ে আমি বাববাব শিউরে উঠতে লাগলাম। ছাদ থেকে দৌঁড় দেবার পূর্বমুহূর্তে লোকটিব উর্ধে আন্দোলিত হাতের মায়া অস্তিত্ব বারবার আমার চোখেব সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

বামাপদব চেঁচামেচিতে আমাব বাড়ির পিছন দিকেব সেই উঁচু ভিটে থেকে কেউ একজন সাড়া দিয়ে একটা কলাব ভেলায চেপে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে আসতে বুঝলাম সে আমাদের একজন প্রতিবেশী যুবক, কালা। বামাপদ তাকে নির্দেশ দিলে কালা ভেলাখানাকে জায়গামত নিয়ে টুপ কবে অন্ধকাব জলেব ভিতবে নেমে পড়ল। জলে ডুব দিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লোকটিব দেহ কাঁধের উপবে বয়ে সে বাস্তাব দিকে নিযে এল। আশ্চর্য, মাত্র দু'হাত দূবে কোমব জল। কালা জল ভেঙে লোকটিকে বয়ে বামাপদব বাবান্দাব বেলিংযেব উপব তাব পেট রাখল। তাবপব পা দুটো উপব দিকে উঠাতেই লোকটির মুখ দিযে হড়হড় করে নোংরা জল বেরিয়ে এল। মদ ও বমির দুর্গন্ধে সমস্ত জাযগাটা ঘুলিযে উঠল। কালা তাবপব তাকে শুইযে বুকেব উপব চাপড় মেবে, ধাক্কা দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস ফিবিয়ে আনাব চেষ্টা কবে বিফল হল। বোগা ঢ্যাঙা চেহারাব লোকটিব মুখেব উপব টর্চেব আলো ফেলে আমি আর্তনাদ কবে উঠলাম। সে আমাব বাল্যবন্ধু বিনয়।

আমাব ছেলে আমাকে ধবে ঘবে নিযে এল। আমি ভূতগ্রস্থেব মত ভিজে জামাকাপড়ে দোতলাব সিঁড়ির উপবে বসে থাকলাম। শেষে বামাপদ এসে একসময বলল, দাদা উঠুন। ডেডবডিতো সাবাবাত এখানে পড়ে থাকবে না। টেলিফোন করুন।

আমি ঘবে এসে টেলিফোনেব সামনে বসলাম। প্রথমেই আমাব প্রণয়েব কথা মনে হল। কোনওরকম সতর্কতা ছাড়াই প্রণযকে খববটা দিলাম আমি। প্রণয একটা শব্দ করে অনেকক্ষণ চুপ কবে থাকল। শেষে বলল, আমাকে তুমি এখন কি করতে বল ?

আমি বললাম, পুলিশে খবব দিচ্ছি আমি। কিন্তু তাবাই বা কি করবে ? যাই হোক্, ছাড় তুই। মাকে সামলা। পরে তোকে আবাব ডাকছি।

পুলিশে ফোন কবতে তাবা বলল, বডি বাতেব মত যা হয ব্যবস্থা করুন। জীপ থানাব সামনে জলে ডুবে আছে। আব আমবা গিযেই বা কি করব ? যা হয কাল সকালে হবে।

আমি তারপবে একে একে হাসপাতাল, দমকল এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে ফোন কবলাম। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে বন্যার জন্য একটা কনট্রোল অফিস তৈবি হযেছিল। সেখানে চেযারম্যান নির্মল সেনকে পাওযা গেল। সে বলল, বামাপদ বা আপনাব বাড়িব একতলাব বাবান্দায় বাখা যাবে না ?

টেলিফোনেব রিসিভাব ধবে আমি চুপ কবে থাকলাম। শেষে বললাম, বামাপদেব ওখানে বাখা যাবে না, অগত্যা আমাব বাবান্দা। কিন্তু সেখানেওতো জল এখনো আধাকুট। তাছাড়া সাবাবাত ধবে পাহাবা দেবে কে ? আমি তো আবাব প্রেসাবেব বোগী।

নির্মল সেন কথা বাড়াল না। বলল, বুঝলাম। দেখি কি কবতে পাবি। কোনওবকমে হাসপাতালেব মর্গে পাঠানো যায় কিনা দেখছি। আপনি একটু থাকুন ওখানে।

ঘন্টাখানেক অপেক্ষা কবাব পব একটা ট্রাকটবের আওযাজ পেযে আমি আবার নিচে জলেব মধ্যে নেমে এলাম। টর্চেব ফোকাসেব নির্দেশে ট্রাকটর কাছে এলে দেখলাম চালক সেই বামলহব। তাব সঙ্গে আরো জনা তিনেক মেথব যুবকও আছে।

বামলহব ড্রাইভারেব সিট থেকে নেমে আমাকেই জিজ্ঞেস করল, কাহা হায ও মুর্দা ?

আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তারা বামাপদর বারান্দায় গিয়ে এক নজরেই সনাক্ত করল বিনয়কে ।

রামলহব অস্ফুটে বলল, হে ভগোয়ান, বিনযওয়া ।

তারা মৃতদেহ ট্রাকটবের ট্রেলারে চাপিযে নিযে চলে গেল ।

পবদিন সকাল ৯টা নাগাদ মিউনিসিপ্যালিটিব কনট্রোলরুমে ফোন করলাম । নির্মল সেন সুযোগ পেযে একটা খোঁচা দিল । বলল, না, হাসপাতালেব মর্গে নয় । আছে মিউনিসিপ্যালিটিব স্যানিটাবি অফিসেব লাগোয়া স্ট্যাকইয়ার্ডে ওই ট্রলাবের মধ্যে । বিনয মজুমদাবতো ওদেবই লোক— বিনয় বাঁশফোড় ! আপনাদেবতো কেউ নয । ওবাই শোক কবছে । একটু পবে হাসপাতালে পাঠাব ।

গোলোক মজুমদার আমাদের তিনপুরুষেব সামাজিক এবং বাজনৈতিক অভিভাবক । সেই সূত্রে চেয়াবম্যান নির্মল সেনেব আমরা বাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এখনো । শহবেব মিউনিসিপ্যালিটি অনেককাল আমাদেব হাতছাড়া । নির্মল সেন এই সুযোগেও ছোবল মাবতে ছাড়ল না ।

হাসপাতালের মর্গের সামনে প্রণয়, আমি এবং পিয়ারগঞ্জেব আবো কযেকজন মৃতদেহ নিতে গিয়ে দেখলাম মেথরবা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে আছে । একপাশে মহাবাণী এবং তার তিন সন্তানও বসে আছে ।

মেথররা লোকদেখানো হল্লা ও মাবপিট করে । দেখলে মনে হবে, এক-আধজন এব মধ্যে খুন হয়ে গেছে অথবা ছেড়ে দিলেই খুন কবে ফেলবে । অল্প মদ খেযে বেশি মাতলামো কবে । দশজনকে দেখাবার জন্য উচ্চস্ববে বুক থাপড়ে বিলাপ ক'বে শোকপ্রকাশ কবে । আমি এসব জানতাম ।

কিন্তু এখন মনে হল এই মেথববা যেন একটা লড়াইতে নেমেছে । মহাবাণী ঝি-পাড়াতেও সঙ্গী পায়নি । পায়নি সুখদুঃখেব কথা বলার লোক । বিনযেব আত্মীয-স্বজন, এমনকি গ্রামেব লোক তাকে দেখলে দূব থেকেই সবে গেছে । আবাব বিনয় শত চেষ্টা কবেও মেথব হতে পাবেনি । তাব পবম্পরাব সংস্কাব, তাব শিক্ষা প্রতি-মুহূর্তে তাকে বাঁধা দিযেছে । সেই সংস্কাবই আবার তাকে তাব স্ত্রী সন্তানেব সঙ্গে আটকেও বেখেছে । নিবলম্ব, বাযবীয অস্তিত্ব ছিল তাব সারাজীবন । শেষবাবে তাকে আমি বলেছিলাম, বেশ, যদি তবুও কখনো আমার সাহায্যেব— সে কি আমার কাছেই আসছিল ? সে কি হাসপাতালেব দিকে তাদেব ঝোপবিব দিকে যাচ্ছিল ? ওদিকটাব জলতো গতকালই অনেকটা কমে গিয়েছিল ।

কিন্তু বিনযেব অস্তিত্ব আব যেন তত বায়বীয ছিল না । তাব মৃতদেহ আমবা ছুঁতেই পাবলাম না । শ্মশান দশফুট জলেব তলায । নিকটতব উঁচু জলহীন স্থান বলতে বড় বাস্তাব জেগে থাকা একটা অংশ । সেখানেই চিতা সাজাল মেথবরা । আমি, প্রণয, ইত্যাদিবা দূব থেকে দাঁড়িয়ে দাহ দেখলাম । মর্গে মৃতদেহ দাবি কবাব সাহস পর্যন্ত আমবা করিনি । পাথবের মত মুখে কবে মেথরবা তাদের রীতি অনুযাযী বিনয়ের শবদাহ কবল। সবশেষ হতে শ্মশান যাত্রী চোদ্দজন মেথব মাথা কামিয়ে তাদেব স্বজনকৃত্য শেষ কবে ট্রাকটব চালিযে চলে গেল ।

অমর মিত্র

বাদশা ও মধুমতী

ধ-বনি অপেবা যাচ্ছে মৌচুবিযা। নদীর কূল ঘেঁষে দশমাইল হাঁটা পথ, তাবপব জালবিঠি মৌজার কাছে নদী পাব হযে মৌচুরিয়া। পালা আবম্ভ রাত্রি নয ঘটিকায, পৌঁছে দুপুরবেলা পেট পুবে খেযে ঘুম। সন্ধে থেকে সাজন গোজন।

নদীব নাম সুবর্ণবেখা। এই পৌষেব সকালে তা বালিভাসা। নদী খুব পুবোন, তা-এব কূল দেখলেই ধবা যায। ধ-বনি অপেবার বযস ও কম হলো না। অধিকাবী নবোত্তম দাসেব নিজেব পার্টি, অর্ধেক শেযাব তার, বাকি অর্ধেক ধ-বনি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টাব মোহন মাইতির। অর্ধেক শেয়াব হোল্ডাব হওযাব কাবণে সব পালাব মুখ্য চবিত্রেব অভিনেতাও এই মোহনকুমাব।

আগে চলেছে ড্রেসাব মেকাপ ম্যান ড্রেসবাক্স সমেত নবোত্তম দাস আব অন্য অ্যাক্টববা। অনেকটা দূবে দূবে তাকে অনুসরণ কবছে সেন্ট ভুব ভুর টেবিকটনেব চোস্ত পাযজামা পাঞ্জাবি আব নিউকাট পবা মোহনকুমাব। কাঁধে পড়ে বযেছে চওড়া পাড়েব কাশ্মিবী শাল, হাতে কমদামী সিগারেটেব প্যাকেট। পাশে পাশে এবাবেব পালাব মূল আকর্ষণ অভিনেত্রী মন্দাকিনী।

মন্দাকিনীব আসল নামটি জবা। মোহন মাইতিব বুদ্ধিতেই লিফলেটে এই নামটি ছাপানো হযেছে, লোকে নেবে ভাল, জবা মাজি কোন নাম হলো নাকি! ওই নামে লোকে ভীড় কববে!

এবাব ধান হয়েছে ভাল। বানে যায নি, শুখায যায নি, আশ্বিন কার্তিকেব ঝড়েও যাযনি। তাই যাত্রা পার্টিব বাযনা খুব। হাইওযেব ধাবে, মফস্বলী গঞ্জে আসছে কলকাতাব সুবিখ্যাত অপেবা ···, আর মৌচুরিয়া আটাঙ্গী অমর্দা, সাতমা জালবিঠিতে যাচ্ছে ধ-বনি অপেবা, দলং অপেরা, ঝাড়গ্রাম অপেবা, সাঁওতাল গ্রাম পাযবাচালিতে সাঁওতালি পালা আসছে পর্যন্ত সিংভূম-চাকুলিয়া থেকে কেননা ওইসব গাঁয়ে বাস ঢোকবাব পথ নেই, গো গাড়ি এক নাগাড়ে চলাব পথও নেই। ঝোরা ঝর্ণা, ধানক্ষেত নদী, সব পাব হযে তবে ঢোকা যায। আব দশ হাজাবি বিশ হাজারি কলকাতাব অপেবা আনাব ক্ষমতাও ওদেব নেই, সুতবাং বছব বছব যেমন যায ধ-বনি অপেরা, এবারও যাচ্ছে তেমন। যাচ্ছে বটে, কিন্তু এবাবেব যাওযাব একটু আলাদা মাত্রা আছে, নাযিকার ভূমিকায়, হাস্যময়ী লাস্যময়ী যৌবন জোযাবে ঢলো ঢলো রূপসী মন্দাকিনী। মোহন মাইতিব দেওয়া এই বিশেষণ লিফলেটে ভুল বানানে ছেপে বেবোনব পব যেন সাড়া পড়ে গেছে। ধ-বনি অপেবায 'ফিমেল' একবাব মাত্র এসেছিল, সেই বছব পাঁচেক আগে, কিন্তু প্রথম বাত্তিবেব পব তাকে দূব ক'রে দেয অধিকাবী, পালার নির্দেশক নরোত্তম দাস, না পারে গান গাইতে না পাবে কোমব দোলাতে, জড়োসড়ো, মুখস্থ ডাযালগ-ই ঠিক ঠিক বলতে পাবে না। এর চেযে শ্যামল দণ্ডপাটই ভাল। অপেবার জন্ম থেকে ফিমেল সে নিজে, কন্ঠস্বরটি বাদ দিলে কে বলবে না সে ফিমেল, বুকে দুই নারকেল মালা চোখে কাজল ঠোঁটে রঙ মাখিযে সে যেন ফিমেলেব উ-, রঙ ঢঙ কী! কিন্তু এবারে আব তা চলল না। মৌচুরিয়া থেকে সতীশ বেরা এসেছিল অঘ্রাণেব মাঝামাঝি কনট্রাক্ট করতে। ব'লে গেছে ধান মাব খেলনি, ইবাবে টাকা ববং বাড়ায়ে দিবো, কিন্তু ফিমেল চাই, দাড়ি গোঁপ

কামানো দঁড়পাটের নাথ নাথ বুলে চিৎকার লকে শুনবেনি দাস মশায়। গাঁয়ে ভি.ডি.ও. ঢুকতো আরম্ভ করিছে, ডায়নামো দিয়া ভি.ডি.ও দিখানো হলো অমর্দায়, পাঁচ কানিযাতে হয়ে গেল গিরাউণ্ড সিনিমা, দু দিনা চারটা উত্তম সুচিত্রার বই। সত্যিকারের ফিমেল আনুন, আমরা পালায় ডায়নামো লিয়ে আসব।

অঘ্রাণের সেই সময়ে নদীর তীব জুড়ে গ্রাম গ্রামান্তরের মাঠ সোনা হলুদ, ধান পেকে টসটসে ভাবটি শুকিয়ে যাওয়ার মুখে। সেই ধান কাটা প্রায় শেষ, কোথাও এখনো কাটা চলছে। নামাল খাটতে যাওয়া পরিবাব হাত গরম ক'বে ফিবছে ঘবে, ধ-বনি অপেরা যাচ্ছে মৌচুবিয়া। অপেরা পৌছলেই এত ফসলেব গরম একটু ঠাণ্ডা হয় বটে।

২.

ফিমেল চাই। এ দাবী নরোত্তম বলেছিল তাব অপেরাব লোকদের।

অপেরার সকলে চাষীবাসী মানুষ। আশ্বিনেব মাঝামাঝি থেকে যখন মাঠ নিয়ে নিশ্চিন্ত, নিষ্কর্ম, রিহার্সাল আবম্ভ কবে। কার্তিকের শেষ পর্যন্ত বা দরকারে অঘ্রাণেও গড়িয়ে যায় রিহার্সাল। তারপর তো ধান কাটা শুরু। কেউ নিজে নেমে পড়ে কাস্তে হাতে মজুব কামিনের সঙ্গে। কেউ বা মাঠের ধারে ব'সে তদাবকি করে, ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে কামিন মজুবেব সঙ্গে। শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বিড়ি ধরায়, ডায়ালগ আওড়ায়, 'শুনো শুনো কনিয়া, আমু দিল্লীর বাদশা, অসমুদ্দরো হিমেচল আমোর বুগির ভিতরে, তাই লিয়ে আমু তুমার পনয় পাখি, তিষণা মিটাবেনি ?'

ডায়লগেব ছিরিতে হাসতে হাসতে ধানে গড়িয়ে পড়ে যুবতী কামিন, মজুব ঠায দাঁড়িয়ে বলে 'উরম ভাষা বললে হবে নি মাইতি বাবু, বাদশার মত বলো !'

হা হা কবে হাসে প্রাইমারি মাস্টাব মোহন মাইতি, 'লগড় করছিলাম।'

মজুব নবীন সিং এব বউ কুসমি ধানেব গোছা বাঁধতে বাঁধতে ঘাড় বাঁকিযে তাকায, কালো টসটসে মুখ, এই শীত সকালে ঘামে একাকাব, যেন বিন্দু বিন্দু শিশিব ধ'বে আছে নাকের পাটায, চওড়া কপালে, গলাব কাছে বুকেব খাঁজে, হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি পালা হইছে ইবাব মাস্ট'ব বাবু, কি পালাব ডাযলক দিচ্ছ ?'

মোহন মাইতি তাব দিকে তাকিযে আবার ডায়লগ আওড়ায়, ... 'আমু তুমাব পনয পাখী, তিষণা মিটাবেনি ... পালাব নাম দিল্লির বাদশা।'

টলটলে শিশিব বিন্দু যেন হাওয়ায় ধানেব ডগা থেকে চলকে মাটিতে পড়ে, হাসি চাপতে চাপতে কুসমি বলে, 'দিল্লির বাদশা ইখন নাই, উব অবস্থা খারাপ, ইখানের বাদশাব কথা বুলো।'

মোহন মাইতি গম্ভীর হয়, ইখানের বাদশা তো লালপাট্টি।

– উয়াদেব ডায়লক বুলো। নবীন সিং ও বউ এর সঙ্গে মসকবায় যোগ দেয ধানেব গোড়ায় কাস্তে চালাতে চালাতে, 'মিটিন হলো শুনোনি, দিল্লির বাদশা যায় যায।'

মোহন মাইতি উঠে দাঁড়ায, রসেব কথা বাজনীতিতে গিয়ে মিশছে, সে আল বেযে হাঁটতে থাকে বলে, 'উযাদেব ডায়লকে পনয ভালবাসা নাই, রস নাই শুধু লড়াই আব লড়াই, শুন ইবার ফিমেল আসছে, লড়াই উয়াব সঙ্গে হব্যা।'

ফিমেল ! দাঁড়িযে পড়েছে আব সব মজুব কামিনও। মোহনেব এখানে এক লপ্তে ছ'বিঘা জমি। জমি তাব সর্বমোট তিবিশ বিঘা, তা বাদে পুকুব ভিটেবাস্তু পতিত মাটি তো আছেই। বর্গা হযেছে মাত্র পাঁচ বিঘায। নিজে দাঁড়িযে থেকে বাকি পঁচিশ বিঘাব বর্গাদাব উচ্ছেদ কবেছে অনেক কাযদায়। সে এখন আল ঘুরে ঘুবে সব জমিতেই যাবে। ফাঁকি মারছে কিনা মজুব কামিনে তা দেখ ভাল কববে। আর হ্যাঁ, খবব দেবে ধ-বনি অপেরায এবাব নাবী চরিত্রে ফিমেল, ফিমেল বোলে ফিমেল। নবোত্তম দাস গেছে বালিচক, কনট্রাক্ট করে ফিবল ব'লে, 'লে লে সাফ ক'ব্যে ফেল, ফিমেল এস্যা গেলে মোব আব টায়েম হবেনি ধানের হিসাব নিয়াব,

পালা ইবার সুপার হিট ।'

অবাক খবর ! মোহন মাইতির কথায় সব মজুব কামিনেব হাত থেমে গেছে। আঁচলে গলা মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়েছে কামিনেব দল নানান জমিতে । তাদের গায়ে খড় শিশির মাটি একসঙ্গে ঘামে জড়িয়ে গেছে। ঘাম টসটসে ধান গন্ধ নিয়ে পব পব সব যেন উঠে দাঁড়াতে থাকে, 'উ মাস্ট'র বাবু, সাচ বুলছো ?'

৩.

'–হাঁ হাঁ সাচ বলছি, জবা মাজি সুন্দবী, গায়ের বঙ ধলা, কলাপাকাব মত, চবিবশ অঘ্রাণ আসব্য । বিহাস্যালে ।' বলল, 'নবোত্তম দাস, বালিচক কনট্রাক্ট কবে সে ফিবল এই শেষ বাসে ।

–'তুমি চিনতা আগে ।' জিজ্ঞেস কবল চাযে চুমুক দিতে দিতে মোহন মাইতি।

–'যখন খড়্গাপুবেব শিল্পীচক্রে ছিলাম তখন উযাবা দুই বুন এস্যাছিল অগকটিং কবত্যা, সে ধরে । দশ বছব আগে, জবা চামেলি দুই বুন, ষোল সতোবো বয়স ছিল, দিখেছিলাম সেই বড় বন্যাব পবের বছব ।'

–'তাহলে তো ইখন বযস অন্যাক ! চলব্যা ?' সন্দেহ প্রকাশ কবেছে মোহন।

–'খুব চলব্যা, উ বযসেব মেয়্যা ইখন পাব কুথায, রিহাস্যালে আসুক দিখবে তখন, বুঝতেই পাববেনি চাষা ঘবের মেয্যা ।'

নবোত্তম দাস তাব পুবোন ডায়েরি ঘেঁটে নাম ঠিকানা বেব ক'রে চ'লে গিয়েছিল বালিচক। চাষা ঘবের মেযে, বাপ বিছানায শুযে, তাই দুই বোনকে তখনই যাত্রাপার্টি ধরতে হযেছিল । অনেকবছব কেটে গেছে । এখন দু'জনেরই বিয়ে হযে গেছে । চামেলিব অনেক দূবে, নাড়াজল এ । জবাব ওই বালিচকেই ।

–'বিযা হয়ে গিইছে ! ভ্রু কোঁচকান মোহন মাইতি ।'

–'তা তুমবা পাঁচ হাজাব দশ হাজার দিতে পাববেনি, ইদিকে চাও টাটকা ফিমেল, তা তো হাওয়ার লয় ।'

অন্ধকাবে তাকাল নবোত্তম । জবা মাজিকে চলবে, ভালই চলবে । তার সেই বিছানায শোযা বাপ এখন বেঁচে নেই । দুটি ছোট ভাই বড় হচ্ছে ? তাবা ক্ষেত মজুবি কবে । জবা চামেলিব বিযে না হলেও ধান কেটে ধান রুয়ে পেট চালাতে হতো । কিন্তু বিয়েব পব জবারই বা দিন যাচ্ছে কিভাবে । স্বামী মযদাকলে কাজ কবে, তা এখন বন্ধ। নবোত্তমকে দেখে ঠিক চিনতে পেবেছে, বলল, 'কাকাবাবু পাবব খুব, কবছি তো ডেববাব এক পার্টিতে তবে উদের বাযনা কম, নোতন দলতো. ধ-বনি অপেবার তো নাম আছে, কি'র'ম বায়না ইবাব ?'

–'বিয়া অলা ফিমেল, দাস ই ঠিক হলোনা, নাচতে পারব্যা ? গান কবত্যা পারে ! রোমান্টিক সীনে জড়ো মতো হযে থাকবেনি তো !' মোহন খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে ।

–'সব বুলে এসেছি, কী কবত্যা হব্যা ।'

–'লাগবে কত ?' জিজ্ঞেস কবল মোহন মাইতি ।

–'রিহাস্যালেব দিন তিবিশ ইবাদে টিফিন আব দুফরেব মিল, দুপিঠের বাস ট্রেন ভাড়া, আব পালাব জন্য পঞ্চাশ, টিফিন মিল আব বাসট্রেন ভাড়া তো দিতে হব্যা, সব মিলে শ'ট্যাকার উপবে যাবে ।

তাহোক, এখন জবা মাজিকে চোখে দেখাব দরকার। মোহনমাইতি চাপা গলায় জিজ্ঞেস কবল, 'ফিগাব কিমন, গাযে মাংস আছে তো ?'

–শ ট্যাকায় যা পাওয়া যায় তাব চেয্যা খাবাপ লয়, বরং ভালই। নবোত্তম দাস অন্ধকারে পা বাড়ায । তাব চিন্ত আসবে তো, টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছে দশ, না এলে ওটা লস, এছাড়া

তার আজ বালিচক যেতে আসতে খবচ কম হয়নি। একশো টাকা একটু বেশিই খরচ হচ্ছে। আরো কমদামী ফিমেল খোঁজ করলে পাওয়া যেত হয়ত। কিন্তু এখন আর সময় নেই।

৪.

মোহন মাইতি কেন নরোত্তম দাস পর্যন্ত অবাক। বাস থেকে জবা মাজি আর তার স্বামী ননীগোপাল নামতে। জবা যদি হয় চাঁদ, ননীগোপাল তার কলঙ্ক। একদমই মানাযনা। আর নবোত্তম যেদিন কনট্রাক্ট করতে গিয়েছিল সেদিন এই চাঁদেব চোদ্দ কলা পূর্ণ হয়নি যেন, আজ একেবারে পূর্ণিমা লেগেছে জবা মাজির চাঁদ অঙ্গে।

শুধু মোহন মাইতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উটিকে, সঙ্গে ?'

নবোত্তমেব কাছে জবাব পেযে মোহন বিড়বিড় কবল, 'গার্ড লিযে এস্যাছে, উ স্বামীব সামনে দিল্লিশ্বরের গলা বেড় দিতে পারব্যা ?'

নরোত্তম কথা ঘুবোয় 'কিন্তু ফিমেল কিমন, পছন্দ হইছে ?'

– 'তা হইছে তবে উ মর্কট সঙ্গে এল কেনে ? মোহন কথা বলতে বলতে জবা মাজিব এক এক অঙ্গের সুষমায় এক একবাব মুগ্ধ হয়।'

কুঠিঘাট সুবর্ণরেখাব সেতুর উপরে পাশাপাশি দাঁড়িযেছে স্বামী স্ত্রী। স্বামী দেখছে নদীব বালির ঢেউ, স্ত্রী দেখছে দূব পশ্চিমে জেগে থাকা সিংভূমেব পাহাড়েব নীল। জবাকে লাগছে ঠিক বড় ঘরেব মেয়ের মত। এস ডি ও সাহেব একবাব তাব শালি নিযে এসেছিল এই নদী দেখাতে। সেই রূপসীর ছিবি ছাঁদ যেন একেবারে জবাব সঙ্গে মিলে যাচ্ছে পিছন থেকে। বলেছিল নরোত্তম, কলাপাকাব মত রক্তই বটে, তাতে হলুদ ফিনফিনে ব্লাউজ মানিযেছে বেশ, ভিতরের কালো অন্তর্বাস ফুটে বেরোচ্ছে। দলামলা পাট সিল্কের হলুদ শাড়ি, কমদামী কিন্তু জবামাজিব গায়ে উঠে যেন তার দাম বেড়ে গেছে। ধ্বনি অপেবার দামও এবার বাড়বে। বাড়বে তো বটেই, যেমন আশঙ্কা কবেছিল মোহন মাইতি তা নয়, গাযে মাংস আছে ঢের, তাকালে চোখ যেন কাঁঠালের আঠায আটকে যায। মোহনেব সন্দেহ ছিল, সেই বছর পাঁচ আগে পবীহাটি থেকে যে ফিমেল এনেছিল নবোত্তম, তাব মত হবে হয়ত। সে মেয়ের না ছিল রূপ, না ছিল অ্যাকটিং-এর ক্ষমতা। তবু তাকে ঘষে মেজে তৈবি কবছিল নবোত্তম, বিহার্সালে যতবাব বলো আসবে, শুধু বাস ভাড়া খাওযা আর পাঁচটাকা দিলেই হবে। কিন্তু ফার্স্টনাইটেব পব তাকে দূর করে দিয়েছিল নরোত্তম, কেননা সে নাকি কেঁদে পড়েছিল তাব কাছে, মাইতিবাবু পালার পব জঙ্গলে ডেকেছিল তাকে। ডেকেছিল মোহন, তবে সকলেব সামনে তো নয।

নবোত্তম মোহন মাইতিব কাঁধে হাত দিল। 'ইবাব তুমি কিন্তু অ্যাকটিং ছাড়া অন্য কথা বলবেনি, অপেরার বদনাম হঁই যাব্যা।'

মোহন নিঃশব্দে হেসে অন্যদিকে ঘুবে তাকায। নবোত্তম এই ভয়ে ফিমেল আনা বন্ধ কবেছিল। অভিনয যে একটা আর্ট তা মোহন মাইতির বুঝবার সময় নেই। সে টাকা ঢালে অপেরার পিছনে, তাব নিজস্ব মতামত অন্যের দ্বাবা প্রভাবিত হতে যাবে কেন ? যতই বলুকনা নবোত্তম শিল্পীচক্রেব ডিবেক্টব নির্মল পাল কী বলেছিল, নট্টকোম্পানিব মাখন নট্টই বা একবাব কী উপদেশ দিয়েছিল তাকে।

নবোত্তম ডাকল হেঁকে, 'এসো হে, টিফিন কব্যা পাঁচ মিনিট বেস্ট লিযে লাও, নদী দিখলে তো চলবেনি , তুমার অ্যাকটিং চলবে কিনা আগে তা দিখাব দবকাব, আমি অ্যাকটিং চাই।'

নরোত্তমেব কন্ঠস্বব একটু ভাবীই। একদম ঢিলে দেওযা চলবে না। টাকা উশুল কবে নিতে হবে খাটিয়ে। ফিমেল আর্টিস্ট একটু ফাঁক পেলেই সুযোগ নেবে। তা যেন না নিতে পারে।

নরোত্তম আবাব কন্ঠস্বব ভাবী কবে, 'আসাব কথা একজনের, এল দু'জনা, দুটা মিল টিফিন তো লাগবেই, দাম কাটাব কথা, তবে কাটবোনি, বদলে বিহাস্যালটা বেশি সময ধব্যা

হোক, তিনটার জায়গায় পাঁচটা পর্যন্ত, শেষ বাস খড়্গপুর যায় পাঁচটা পনেরোয়, উতে গেলেও লাস্ট ট্রেন পাব্যা ।'

শেষ কথাটায় ভীতমুখে আগে ঘুরে দাঁড়ায় ননীগোপাল, পরে তার বউ । বউ এগিয়ে এল, ননীগোপাল ভীত ধীরপায়ে বেশ তফাতে ।

– 'কথাটা কানে যাচ্ছে, টায়েম নষ্ট করছ ।' নরোত্তম আবার দাবড়ে দিল ।

জবা বলল, 'ইদিকটা চিনা নাই তো, একা আসত্যা দিতে উর ভয় করছিল, পাঁচটা পর্যন্তই বিহাস্যাল দিবো দাস মশায়, তবে যদি পাবেন দুপিঠের না হলেও উর এক পিঠের ভাড়াটা যদি দেন, একা মেয়েমানুষ, প্রথম দিন আসতে দেয় কি করে ইটা ভাববেন তো ।'

নরোত্তম ফিরল মোহন মাইতির দিকে, 'দিখলে, ফিমেলে মানেই টাকা আদায়, কনটাক্ট হলো একজনের ভাড়া দিবো, ইখন বলছে উয়ার সোয়ামীরও লাগব্যা, চলো চলো আগে পাট বলো দেখি ।'

নরোত্তম জোর পায়ে হাঁটে প্রাইমারি স্কুলের দিকে । জবা মুখ কালো করে একবার পিছনে ফিরে তার স্বামীকে দেখল, তারপর হাঁটতে লাগল নরোত্তমের পিছনে । তার পাশে হাঁটতে আরম্ভ করেছে মোহন মাইতি, প্রথমেই বিনা ভূমিকায় বলল, 'ভাড়া দিয়া যাব্যা, তবে ল্যাংবোট লিয়ে আসা তুমার ঠিক হয় নাই, দরকারে আমি গিয়ে লিয়ে আসতাম।'

জবা ভীরু চোখে মোহনের দিকে তাকায়, চোখের দৃষ্টি একটু ধারালো এই মানুষটা তবে তার উপর সহানুভূতিশীল, তাই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি পালায় আছেন ?'

হাঁ, হীরো, মোহন মাইতি আমার নাম, পালায় দিল্লিশ্বর, তা তুমার মুখখানি কিন্তু মন্দাকিনীর মত, ও নামেই লিফলেট ছাপব, জবা নামে চলবেনি ।'

জবা চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ননীগোপাল কত দূরে । সে মোহন মাইতির কথার জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটছে ।

৫.

মোহন মাইতি কমদামী ফিল্টার সিগারেট বাড়িয়ে ধরল নরোত্তমের দিকে, বলল, 'লিফলেটে মন্দাকিনী নাম ছাপা হব্যা, নামেই আসর ফাটব্যা ।'

মাথা নাড়ল নরোত্তম, 'উহুঁ, মুখখানি ঠিক বৈজয়ন্তী মালার মত নাম দাও বৈযন্তী, কুমারী বৈযন্তী ।'

সজোরে মাথা ঝাঁকায় মোহন, 'তুমি মন্দাকিনীর বই দ্যাখোনি, তাই বৈজয়ন্তীমালার কথা বুলছ, রাম তেরি ..।'

পাশের ঘরে তালপাতার চাটাই এ তখন মুড়ি চপ পিঁয়াজ আর আখের গুড় নিয়ে বসেছে জবা ননীগোপাল । ননীগোপাল খুব ভয় পেয়ে গেছে । নরোত্তমের কথায় গুটিয়ে গেছে কেন্নোর মত, বউকে বলছে । 'তাড়াতাড়ি খেয়ে কাজে বসো দেখি, বাবুরা এমনি ট্যাকা দিবেনি ।'

সে কথা যেন নরোত্তম শুনেছে । যেন নরোত্তম কে শোনানোর জন্যই গলাটা একটু জোর করেছিল ননীগোপাল, 'তুমি কাজ ঠিক মত করলেই তো দু পাঁচটাকা বেশি চেয়ে লিবে।'

যতটা বোকা ভাবা হয়েছে ননীগোপালকে ততটা যেন সে নয় । তবে বুদ্ধি জাহির করতে ও ভয় পাচ্ছে রীতিমত । মুড়ি পিঁয়াজ চপ দু থালা এলে সে প্রথমে বলেছিল খাবেনা, তার খিদে নেই, শেষে বউ জোর করতে আর মোহন মাইতি বলতে তবে না নিল । এখন খাচ্ছে গো-গ্রাসে । সকাল থেকে কারোর পেটে কিছু পড়েনি তা বোঝা যাচ্ছে ।

নরোত্তম বলল, 'গঙ্গা যমুনা দিখেছো । তবে বুঝতে বৈজয়ন্তীমালা কেমন ছিল । কেমন অ্যাকটিং, দিখেছো রাজকাপুরের সঙ্গম, সাঁতার পোষাক পরা বৈজয়ন্তীমালা !'

–'উসব বিটিশ আমলের বই, সে আমলে তুমার বৈজয়ন্তী সায়রাবানু, আর ই আমলে

হলো..., ইখন আব অ্যাকটিং দ্যাখেনি লকে, দ্যাখে ফিগাব। বঙঢঙ যাকে বুলে গ্ল্যামার, আর...। খুব চাপাগলায় বলল মোহন মাইতি, 'সেক্স, ইখন উটাই চলছ্যা, তুমার আনা ফিমেলের কিন্তু তা আছে।'

কথা হচ্ছিল চাটাই এ বসে সিগাবেট ফুঁকতে ফুঁকতে, তখনই কথার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে জবা, বলল মাইতিকে, 'বিড়ি হব্যা ?'

চমকে উঠেছে একসঙ্গে দুজনেই। তাদেব শেষ কথাটি কানে গেছে কিনা কে জানে। মোহন ভাবল, যাক না কানে, যা সত্যি তাই বলেছে, ববং এতে খুশিই হবে জবারাণী। কিন্তু বিড়ি চায কেন। রসে যে ছাই পড়ে যাবে বিড়ি ধরালে।

–'বিড়ি কেনে ?' মোহন মাইতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। এত সুন্দব চুল, এত সুন্দর মুখ, কোমর, লেবু কোয়াব মত ঠোঁট, বিড়ি খাওয়ার অভ্যেস আছে নাকি জবা বাণীব। হলুদ পাটসিল্কের শাড়ি ছেড়ে ইতিমধ্যেই পবে নিয়েছে আধ মযলা ছাপা শাড়ি, চুলের খোপা ভেঙে দিয়েছে, চুল নেমেছে কোমব অবধি, বুকের ব্লাউজটি আগেব মতই আছে। মোহন মাইতির চোখ শেষ পর্যন্ত বুকের কাছে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

জবা আঁচল টেনে বলল, 'আমাব হাজবাণ্ড খাবে, খুব নেশা, যদি এক বাণ্ডিল বিড়ি আর ম্যাচ এসে দেন ....।'

নবোত্তম কী বলতে গেলে মোহন তাকে থামায়, সে নিজে পকেট থেকে টাকা বের ক'রে একটা ছেলেকে পাঠালো দোকানে।

নরোত্তম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাব বিবক্তি চেপে বাখতে পারল না, বলল, 'আব কি চাই, একা আসতে পাবনা, পিকনিক কবত্যা এসেছো নাকি, লাও আবম্ভ কবো, একদম ফাঁকি চলবেনি।'

জবা মাথা নামায, 'ধবে নিন অতিথ এসেছে আপনাব গাঁযে, আমি অ্যাকটিং এ পুষিয়ে দেবো দাস মশায়।'

নরোত্তমের হঠাৎ খেয়াল হলো সকাল থেকে তাকে দাস মশায দাস মশায করছে ননীগোপালেব বউ জবারাণী। কনট্রাক্ট করতে গেলে কিন্তু কাকাবাবু কাকাবাবু ব'লে আলাপ করিয়ে দিযেছিল তাব স্বামীর সঙ্গে।

বিহার্সাল আবম্ভ হচ্ছে। বিড়ি আর দেশলাই স্বামীব হাতে ধবিযে দিযে জবা বলল, 'তুমি ববং একটু ঘুরে এস, খাওযাব এখনো অন্যাক দেরি।'

ননীগোপাল ঘাড় কাত করে বেবিয়ে যেতেই মোহন মাইতি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন তাব বউকে পাহাবা দেওযার জন্যই সঙ্গে এসেছে। তাতে রসের গুড়ে বালি। সে একেবারে জবাব মুখোমুখি বসল, চোখে চোখ লাগছে অবিবত, নবোত্তম বোঝাচ্ছে কোন সীনেব মাহাত্ম্য কি বকম।

জবা বলল, বইতো আপনি দিয়ে এসছিলেন দাসমশাই, আমি পাট মুখস্থ করেছি, ইখন রিহাস্যাল আরম্ভ কবেন, ভুল হলে বুঝাযে দিবেন, উনিতো দিল্লীব বাদশা, আমি চাষীব মেয়ে মধুমতী, দেখা হলো দুজনায, বলি .., উঠে দাঁড়ান আপনি মাইতিবাবু।'

জবা নিজে দাঁড়িযে মোহন মাইতিকে দাঁড় কবালো, তাবপব আবেগ মথিত গলায ডায়ালগ বলতে আবম্ভ কবল, 'তুমি তো দিল্লীশ্বব, সব মানুষেব ঈশ্বর, যদি যাচ্ঞা কবো, কতশত রূপসী সুন্দবী তোমার তৃষ্ণা দূব করবে হে প্রিয়, আমি অবলা চাষীকন্যা, ঘবে অন্ন নাই, কুটীবে ছায়া নাই, তুমি কেন দুযাবে দাঁড়ালে ?'

মোহন মাইতি মুগ্ধ হযে তাকিয়ে থাকে জবাবাণীব দিকে। সত্যিই যেন সে অবলা চাষীকন্যা আর তাব সামনে প্রণয় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে দিল্লিব বাদশা। গলা খাঁকাবি দিযে মোহন কোন বকমে বলল, 'মধুমতী তোমাব রূপই অন্ন, তোমাব রূপই ছায়া, রূপে মোব তৃষ্ণা মিটাও ...।'

জোর রিহার্সাল চলতে লাগল। প্রাইমারি স্কুলের দরজা জানালা মানুষের মুখে অন্ধকার। গোটা ধ-বনিই যেন ভীড় করেছে ফিমেল দেখতে। দিল্লীশ্বর মোহন মাইতির বারবার ভুল হতে লাগল, ভুল হবে না কেন, জবারানী যেন অবলা চাষীকন্যা মধুমতী হয়ে মজিয়ে দিয়েছে তাকে। নাচের মহড়াও হয়ে গেল। নরোত্তমের নির্দেশে হাঁটুর অর্ধেক উন্মুক্ত করে কোমরে শাড়ি গুঁজে জবারানী কোমর দোলাতে লাগল। 'বাহ্ বাহ্! ইমন স্মার্ট ফিমেল আর কুনো অপেরাই নাই।' চাপা গলায় নরোত্তমের কানে কথাগুলো বলল মোহন মাইতি।

দুপুরে কুমড়োর ঘ্যাঁট, বিউলির ডাল আর পোস্ত বাটা দিয়ে ননীগোপাল আর তার বউ ভাত খেল পেটপুরে। তারপর ননীগোপাল পাশে ঘরে চাটাই এর উপর লম্বা হলো, নাক ডাকতে আরম্ভ করল ওর।

আবার রিহার্সাল। পাঁচ মিনিটও বিশ্রাম পেল না জবারানী। তাকে টেনে তুলল নরোত্তম ভারী গলায় হেঁকে হেঁকে, এস হে, শীতকালে ঘুমানো ভাল নয়, ইখনো অনেকগুলান সীন আছে, নাইট হল্ট তো করবেনি।

জবা বলল, 'বসে বসে বলি, খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে।'

—বেশি খেলে কেনে, ফিমেলদের বেশি খেতে নাই তাতে ফিগারও যায় আলিস্যিও আসে, নাও দাঁড়াও। আর একবার গানটা ধরো, না, না গান লয়, উটা ঘরে অভ্যেস করো, নাচটা আর একবার হোক, ততক্ষণ মোহন মাইতি একটু রেস্ট লিয়ে লিক।

ভরা পেটে কোমর দোলাতে লাগল জবারানী, নরোত্তম সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নির্দেশ দিতে লাগল, আহা ঘুরে ঘুরে করো, শুধু সামনে হলে তো হবে না, পিছনটাও দিখবে লকে, অপেরায় ফিমেল দিখতেই না ভীড় করবে লকে, তা ফিমেল যদি লজ্জাবতী হয় —

জবার মুখে ভয় এল। সে হাঁপাতে লাগল নাচতে নাচতে। তখন মোহন মাইতিই রক্ষা করল তাকে, থাক, বাড়িতে অভ্যেস করো ইটাও, খাওয়ার পর ইসব হয় না দাস।

—তবে বাসে উঠার আগেই ভাত খেলে পারত। বলল নরোত্তম, 'রিহাস্যাল তো ফোকটে দিয়া হচ্ছেনি, তিরিশ টাকা, তারপরে...।

রিহার্সাল চলতে লাগল। মোহন মাইতি উঠে দাঁড়াল আবার। সে এতক্ষণে অনেক স্বাভাবিক, জবাও তার কাছে যেন নির্ভর করছে একটু, তাতে চাষীকন্যা মধুমতীর প্রণয় সম্ভাষণ আরো গাঢ় হচ্ছে যেন। মোহন মাইতি, দিল্লির বাদশা, গলা বেড় দিয়ে টেনে এনেছে চাষীর মেয়েকে বুকের উপর, বলছে, 'দিল্লির বাদশা আমি সব ছেড়ে দিবো।'

—এ তুমার মোহমায়া বাদশা।

মোহন মাইতির চাপে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে জবার। বুকে পিষে ফেলছে তার হাসফেসে শরীরটাকে। হিন্দি সিনেমার অনুকরণে এ পালাতে কোন রাখঢাক নেই। সে কোনরকমে দিল্লির বাদশার বাহু বন্ধনমুক্ত হয়ে জোর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বুকের দলামলা আঁচল ঠিক করতে লাগল, হালুকচালুক তাকাতে লাগল একবার পাশের ঘরের দিকে। আর একবার প্রাইমারির বারান্দায় জমা দর্শকদের দিকে। কোন কথা বলল না। এত লোকের মাঝখানে তাকে যে প্রায় এলোমেলো করে দিল বাদশা তাতে মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়, তবে হ্যাঁ, লোক ছিল বলেই না বাদশা তাড়াতাড়ি ছাড়ল।

৬.

বিকেল পাঁচটায় নদী অন্ধকার। বাস এল ওপার গোপীবল্লভপুরর থেকে, নদীর উপর সিধুকানু সেতু পেরিয়ে।

বাসে ওঠার সময় মোহন বলল, আর গার্ড আনার দরকার নেই, চিনে গেলে তো, পালার দিন ফার্স্ট বাসে আসব্যা, ফার্স্ট ট্রেন পেলেই ফার্স্ট বাস পাব্যা।

ঘাড় কাত করল জবারানী।

নরোত্তম বলল, রিহাস্যালটা মনোমত হলোনি, শেষ দিশ্যটা আরো ভাল করে করতা পারতে, না কবলে স্টেজে মাত কবব্যা কি কব্যা ।

— তা তো বটে । সমর্তন করল ননীগোপাল ।

নরোত্তম বলল, বউকে একা পাঠিয়ে, ভয় নাই, কত ফিমেল একা অ্যাকটিং কব্যা যায, তবে না উ বুঝত্যা পারবে সব, চালাক হব্যা, আবো তো বায়না আছে ।

ননীগোপাল ঘাড় কাত করল ।

— হাঁ জবা, ভাল করে অভ্যেস করো ঘবে, সব সময় মনে কবব্যা তুমি ননীগোপালেব বউ লও, অবলা চাষী কন্যা, বাপ গবীব পেটে ভাত নাই, কিন্তু রূপে তুমি গাঁ আলো কবো। নরোত্তম উপদেশ দিল ।

— উতো তাই বটে দাসবাবু, নাহলে এ্যাদ্দুব আসবে কেনে আপনাদের নিকট, শিখাযে পড়ায়ে নিবেন । ননীগোপাল বিড়বিড়িযে বলল ।

দাস হতভম্ব । মোহন মাইতি নির্বাক । ননীগোপাল বউ এব আগে আগে বাসে উঠে গেছে । কথাটা ও ভেবে বলল, না এমনি বলল ।

৭.

ধ-বনি অপেবা চলেছে মৌচুবিযায আসব কবতে, নদীব পাড় ঘেষে ঘেষে পশ্চিমে, সিংভূমেব পাহাড় শ্রেণীব মুখোমুখি । যাচ্ছে ফিমেল জবাবানী, লিফলেটে কুমাবী মন্দাকিনী, কুমাবী না হ'লে রস গাঢ় হয না । কোলে তার দেড় বছবেব ছেলে, কখনো ঘুমিযে কখনো জেগে মায়ের কোলে চেপে সে-ও চলেছে মৌচুবিযা ।

বাস থেকে বাচ্চা কোলে জবা নামতেই মাইতি ক্ষুব্ধ, 'আবাব পাহাবা নিযে এলে, তুমি কুমারী মন্দাকিনী, বাচ্চা লিযে মৌচুব্যা যাব্যা ?'

নবোত্তম আরো কঠিন, 'এই জন্যই ম্যাবেড ফিমেল আনতে নাই, ল্যাংবোট থাকব্যাই, অ্যাকটিং কিমন হব্যা সে চিন্তা কবব্যা কখুন ল্যাংবোট লিযে ।'

জবাব মুখ অন্ধকাব । এই ধরণেব প্রতিক্রিয়া যে হতে পাবে তা সে আন্দাজ কবেছিল, তবে এতটা নয় । ননীগোপাল এলে আসরে কোমব দোলানো, দিল্লীব বাদশাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে তার বাধো বাধো ঠেকত ঠিক, বাচ্চা নিযে তো সে অসুবিধে হবে না । আসবে আজ সবাব মন জয় করে নেবে এই ভেবে ভেবে এসেছে, তাতে আবো ডাক পাবে অন্য সব অপেবা থেকে, কিন্তু দাসমশায় আব মাইতি বাবুব মুখ দেখে সে অসহায় বোধ কবল, কোনরকমে বলল, ছেল্যাটা সঙ্গে থেকে ঘুমায, কুনো অসুবিধে হবেনি দাস মশায, আপনি দিখবেন অপেবার নাম আমি বাখব, আগেব বাব মার কাছে রেখে এসেছিলাম, মার হইছে ইবাব জ্বর, ভাই দুটা ধান কাটত্যা গিইছে হুগলী, বাখি কাব কাছে, উপায হলে বেখেই আসতাম।

—কেনে ননীগোপাল, উ মদ্দাটা কি করছে, বউ এব আয খ্যাবা আব ছেল্যা বাখতে পারবেনি ? নবোত্তমেব গলায় ঝাঁজ ফোটে ।

—তাইতো ঠিক ছিল, কিন্তু উর ময়দাকলেব মালিক নাকি মিসিন তুলে নিয়ে যাওযাব ফিকিব কবছে, সব লেবাবে পাহারা দিতে লেগেছে কল, ঘবে থাকাব উপায নাই, ঘর তালা দিয়া মেয়্যাটাকে বেখে এলাম মাব কাছে, উটাব বযস ছয, দেখে এলাম গা ঘুষঘুষ করছে ।

কথা বলতে বলতে জবা মুখ নামিযেছে । শেষ কথাগুলি খুব আস্তে বলল যাতে বলাও হয এবং দাসমশায না শুনতেও পায ।

নরোত্তম এতে গলে না, ইসব কথা বহু শুন্যাছি, সব এককথাই বলে, কুনো ফিমেল আলাদা লয়, হাঁ কনটাক্টর বাইরে কিছু দিতে পারবোনি, নাও বেডি হও, হাঁটত্যা হবে ।

মোহন মাইতি ভাবছিল নরোত্তম ঠিক ই বলছে । ম্যাবেড মেয়েছেলে নিয়ে ঝামেলা

বিস্তর। তাছাড়া কুমারী মন্দাকিনী, বাচ্চা নিয়ে গাঁয়ে ঢুকলে লোকে ঠিক জেনে যাবে এ হলো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফিমেল। তাতে গ্ল্যামার তো যাবে। সমস্যা আরো। পার্টি রওনা হবে এই সময়েই জেগে উঠল জবারানীর ছেলে। একেবারে ননীগোপালের মুখ বসানো, ময়লা রঙ, মাথায় কোঁকড়া চুল, খুব রোগা। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। জবা এতে খুব বিব্রত, শেষে না পেরে মাইতিকেই আশ্রয় করল, দাদা শুনবেন।

রাগী নরোত্তম বিড়ি টানছে ফস ফস করে। মোহন এগিয়ে আসতেই জবা ইঙ্গিতে ছেলের গা দেখালো, আসতে ঠাণ্ডা লাগল কিনা, জ্বর এলো কিনা। তাকে আশ্বস্ত করল মোহন মাইতি, না, ও কুছু লয়, চাদরে ঢাকা ছিল কিনা, তাই একটু গরম গরম লাগছ্যা গাটা।'

মোহন মাইতির সহানুভূতি পেয়ে জবা চাপা গলায় বলল, 'একটু দুধ হতো তো খাউয়ে নিতাম, পথ তো কম নয়।'

কথাটা নরোত্তম প্রথমে শুনতে পায়নি। মোহন মাইতির মাথায় চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল, ঘুরে বলল, 'দাসমশায় রওনা হও, ই বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাউয়ে লিই, এতটা পথ যাবে তো, শিশু বলে কথা, পিছে পিছেই যাচ্ছি।'

তাই হলো। নরোত্তম আপত্তি করল না। তার দরকার অ্যাকটিং। তার জন্য মোহন আর মন্দাকিনীর পরস্পরের কাছে ফ্রী হওয়াও দরকার। আসছে তো পিছনে।

চা-দোকানে জবার ছেলে দুধ খেল এক বাটি। তাতেই ঠাণ্ডা। জবাকেও চপ মুড়ি আর দুটো রসের মিষ্টি খাইয়ে নিল মোহন মাইতি। পালার দিন টিফিনের ব্যাপার রাখেনি দাস মশায়। খাওয়ার পর চা খেতে হলো জবাকে মাইতি বাবুর সঙ্গে। তাতেও সময় গেল। অপেরাপার্টি এগিয়ে গেছে অনেকটা। প্রায় আধ ঘন্টা বাদে উঠল মোহন মাইতি। জবা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, 'চলেন দাদা, ইকে লিয়ে আর চিন্তা নাই, শুধু ঘুমায়, শরীরে বল কম।'

মোহন বলল, 'আবার দিয়া যাব্যা, মৌচুর‍্যা পৌঁছে এক সের দুধের অর্ডার দিবো, তুমার বাচ্চা খাবে আর ঘুমাবে।' হাহা করে হাসল কথা শেষ করে মোহন।

জবা তার গায়ের খদ্দরের চাদরটি খুলে ছেঁড়া ফোমের কাঁধ ব্যাগে ঠেসে দিল। ওই চাদরেই জড়িয়ে এনেছে ছেলেটাকে। রোদ ইতি মধ্যে গাঢ়, নদীর ধারে হাওয়াও তেমন নেই, পৌষ মাসে যেন ফাল্গুনের আনচান করা ভাব। বাচ্চার মাথা থেকে ফ্ল্যানেলের ময়লা টুপি আগেই খুলে নিয়েছিল জবা, ফ্ল্যানেলের জামাটির বোতাম খুলে দিল, তার নিচে ছেঁড়া সোয়েটার তো রয়েছেই। কালো কালো পাদুটি বেশ সরু, নেতিয়ে পড়েছে একেবারে মায়ের বুকে। অপেরাপার্টি অনেক দূরে, এখান থেকে মেঘ ডাকলেও বোধ হয় সাড়া পাবে না।

—দাদা আপনি খুব করলেন। জবা আবার কৃতজ্ঞ হয়।

না, না এ আর কী, তা তুমারে দিখলে কিন্তু বুঝা যায় না দুই ছেল্যা মেয়্যার মা বডিটা রেখিছো চমৎকার, কে বলব্যা তুমি কুমারী না, লিফলেট দিখেছো?

জবা এই ধরণের প্রশংসায় আনত, কোন রকমে বলল, কে লিখল উসব কথা?

—আমি, ভাল হয় নাই? মোহন আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করে।

জবা মুখ তুলতে গিয়েও পারে না, বাচ্চার গাল হাত বোলায় অন্যমনস্কের মত।

মোহন মাইতি হঠাৎ সাহসী হয়, শুনো যৌবন জোয়ারে ঢলো ঢলো।

জবার মুখ লাল, সে বাচ্চা আঁকড়ে কোন রকমে হাঁটে। পৌষমাসের রোদ্দুর মোলায়েম। এখনো হাঁটা হয়নি বেশি পথ, তবু জবা মাজি ঘেমে একাকার।

— তুমি খুব চালাক, ননীগোপালকে আসতে বারণ করেছি তো ইকে লিয়ে এলে গার্ড কর‍্যা, কী ঠিক বলিনি!

হয়ত কথাটা ঠিক। জবা নিজেই তো আগবাড়িয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এল। ছেলে থাকলে

যেন অনেক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত, কিন্তু সেকথা বলবে কি ক'বে, বলল, 'গার্ড তো আর আসরে থাকবেনি, আমি দাসমশায়ের দিয়া টাকা উশুল করে দিবো, সে চিন্তা নাই।'

মোহন মাইতি শুনল ওর গলায় ঈষৎ ঝাঁজ, তা হোক, মেয়ে মানুষ নেতিয়ে থাকলেই বা ভাল লাগে কার, সে উপদেশ দিল, 'হাঁ সিটা মনে রেখো, না হলে দাসমশায় আর ডাকবেনি, পরীহাটির বিমলা এসেছিল বছব পাঁচ আগে, এক বাত্তিরের পব ই তাকে দূব কবে দিল, মোর নামে নালিশ করত্যা গিইছিল দাসের নিকট, দাস অ্যাকটিং ছাড়া আর কিছু বুঝেনি, তাব পাওনা উটা, পেলেই হলো।'

জবা চট করে মুখ তুলল, নালিশ কেনে ?

—কেনে আবার, উসব যাক, হাঁটো দেখি।

জবা মাজি চিন্তিত হলো যেন। কোল বদল করল বাচ্চাটা, কাঁধ বদলও হলো। তাবপর হঠাৎ অন্যমনস্কের মত বলল, পাহাড় অবধি যেতে হবে ?

হাসল মোহন মাইতি, 'উহুঁ, পাহাড় অন্যাক অন্যাক দূব।

জবা ঘাড় উঁচু করল সিংভূমের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, ফিসফিস কবে বলল, আমি এর আগে কখুনো পাহাড় দেখিনি।

—তাই ! অবাক হলো সেন্ট ভুরভুবে মোহন মাইতি।

—হাঁ, বিহাস্যালের দিন পথম দেখলাম।

—বুঝা যায়নি তো তা। মোহন সরে এল জবার পাশে।

জবা এবার হাসল মাইতির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে। 'বলার উপায় ছিল ! ভবাপেটে পর্যন্ত নাচতে হলো, দাস মশায় খুব কঠিন মানুষ।'

— আর আমি ! মোহন মাইতি এবার কাঁধ ছুঁয়ে ফেলল জবার নিজের কাঁধ দিযে।

অন্য মনস্কের মত জবা নদী দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি না বললে আমি বেহাই পেতাম ! আজ যেমন... !' কথা শেষ করতে পারলনা জবাবানী, মোহনেব দেহেব ধাব তাব দেহে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবাব।

মোহন বলল, আজ কিন্তু ঢেলে অ্যাকটিং কবব্যা !

জবা একটু সরে গিয়ে বলল, না করলে দাস মশায় টাকা দিবেন ?

—তা যখন বুঝেছো তুমার দ্বারা হব্যা, আজ দুজনায় আসর মাত !

মাথা তুলল না জবা, হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'শেষ সীনটায় অতটা না করলে হতনা মাইতিদা, গাঁ ঘরের লোক দেখবে।'

হা হা ক'রে হাসল মোহন মাইতি, কালো ছেলের গাল টিপে দিল আলতো ক'রে, 'লকে তো উ সীনের জনাই টাকা দিবে, অ্যাকটিং কবতে অতো রাখঢাক করলে চলে, যা বুলেছো বুলেছো দাসকে বলোনি কিন্তু।'

—না, না, তা কেন, আপনাকেই বলছি। জবা একটু সরে গেল।

—ইতে তো লজ্জার নাই, তুমি চাষীর মেয্যা মধুমতী, আমি দিল্লিব বাদশা, অ্যাকটিং করতে গেলে ফ্রী হত্যা হব্যা। মাইতি আবাব সরে এল জবার দিকে।

জবা যেন শুনতে পেলনা কথাগুলো, বাচ্চাকে আবাব কোল বদল কবতে করতে বলল, 'দাদা পঁচিশটা টাকা বেশি দিবার বেবস্থা করবেন দাস মশায়কে বলে, পরেব বার না হয় কেটে নিবেন।'

নরোত্তম দাস বলেছিল, এইসব ফিমেলের টাকাব খাঁই খুব যেদিক থেকে পাবে চুষে নেবে অপেরাকে ...। নরোত্তমের কথাগুলো সত্যি মনে হচ্ছে এখন। মোহন মাইতি প্রকাশ

করলনা তার মনের ভাব। শুধু আরো সরে এসে জবারাণীর ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। বাচ্চাটা একহাতে খামচে ধরেছে মায়ের অনাবৃত কাঁধ, সে বাচ্চার হাতের পাশে আচমকা নিজের হাত রাখল, বলল, আমিই দেব, দাস মশায়কে আজ বুলতে হবেনি।

জবা যেন কুঁকড়ে যায়। কলের পুতুলের মত দম নিয়ে সে হাঁটছে একটি কচি হাত আর একটি শক্ত থাবা কাঁধে নিয়ে। বাঁদিকে মাইলের উপর চওড়া বালি ভাসা নদী। ডাইনে ধানক্ষেত। কোনক্ষেতের ধানকাটা শেষ, কাটাধান উঠছে গো গাড়িতে, কোন ক্ষেতের ধানে এখনো কাস্তে পড়েনি। নুয়ে আছে এই জবারাণীর মত। আকাশটা হাল্কানীল, তা সাঁতরে পাখির ঝাঁক নামছে ক্ষেতের উপর। মাঠের মানুষ হাঁ করে দেখছে দুজনকে, অপেরায় তাহলে সত্যি ফিমেল এল।

মোহন মাইতি হঠাৎ যেমন হাত রেখেছিল ঘাড়ে, তেমনি নামিয়েও নিল হঠাৎ তাতে জবা যেন স্থির হয়ে শ্বাস নিল, একটু হেঁটে জিজ্ঞেস করল, ই নদীতে বান হয়?

– হয়, খুব বান, একেরে যৌবন জোয়ারে ঢলো ঢলো!

জবার মুখ লাল হয়েছে আবার তা দেখতে পেল মোহন। আরো দেখল ছেলেটা জেগে উঠেছে হঠাৎ, নড়ছে ক্রমাগত, পিটপিট করে তাকাচ্ছে অচেনা পৃথিবীর দিকে। জবা থাবা দিল, ঘুমো বাপ ঘুমো না ঘুমুলে তোর শরীর খারাপ হবে।'

নদীর ধাবে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হাঁটছে ধ-বনি অপেরার ফিমেল। বাচ্চাকে জাগতে দেখে মোহন একটু তফাতে। তফাতে বলেই জবা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমন্ত বাচ্চাব দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করে, 'দাদা আপনার ক'বিঘা জমিন ?'

– তিরিশ বিঘা, পুকুর বাস্তু বাদে অবশ্য। মোহন ভারী গলায় জবাব দেয়।

জবা অবাক চোখে তাকায় মোহনমাইতির দিকে! মোহনমাইতি তার সম্পত্তির হিসেব দিতে পেরে খুবই খুশি, উল্টে জিজ্ঞেস করে, ননীগোপালেব নাই ?'

জবা উত্তর নাদিয়ে জিজ্ঞেস করে, সব জমি বর্গায় ?

–পাঁচবিঘা ছাড়া রিকড হয় নাই।

জবা আরো অবাক, জিজ্ঞেস করল, 'আপনার তাহলে চিন্তানাই, আচ্ছা দাদা, বর্গা কাটানো যায়নি ?'

মাথাদোলায় মোহন, 'উঁহু, উ হলো কলঙ্কের মত, মেয়্যামানুষের গায়ে যা লাগলে আর উঠেনি।'

–মোদেব দুই বিঘার সবটাই বর্গা লিখা হয়ে গেছে, ধান দেয় না। বিষণ্ণ গলায় জবা বিড়বিড় করতে করতে হাঁটে, 'আপনি পার পেয়ে গেলেন, অথচ মোদের দুবিঘা চলে গেল, একটা ধানও দেয় না।'

মোহন মাইতি এবার সরে এল জবার খুব কাছে, হাত রাখল তার ব্লাউজ আব শাড়ির বাঁধনের মধ্যবর্তী অনাবৃত পিঠে, 'ঠিক কর‍্যা অ্যাকটিং যদি করত্যা পার, কত জমিন হব্যা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়ে, পেটেই জুটেনি, জমিন হবে কি করে।

–না না হব্যা! মোহন মাইতি হাত সরিয়ে এনে কোমরের ধারে রাখল, আঙুল সামনে বাড়ালেই পেট, একটু তুললে বুক।

এতক্ষণে যেন জবার খেয়াল হলো তা, সে চট করে সরে গিয়ে চাপা গলায় যেন ধমক দিল মাইতিকে, আপনি বড় গা ঘেষা মানুষ, ছেল্যোটা জেগে যাবে, নিন দেখি, আমি একটু সামলে নিই।

মোহন মাইতিকে এভাবে নিরস্ত করছে জবারানী তা সে বুঝেও বাচ্চাটাকে দু হাতে

ধরল। জবা তার হাতে বাচ্চা দিতে দিতে অস্ফুট গলায় বলল, 'কী গন্ধ আপনার গায়ে, গন্ধে না জেগে ওঠে।'

– চাল্লি সেন্ট, গায় দিবে ? মোহন এক হাতে বাচ্চা সামলে অন্য হাত পকেটে ভরল, নাও না, বেলাউজে দাও ভাল লাগব্যা !

– না, হাসল জবা। দাঁড়িয়ে কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করল। ব্লাউজের কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসা ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ ঢুকিয়ে দিল ভিতরে, নদীর দিকে ফিরে। পিছন থেকে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে ধ-বনি প্রাইমারির হেডমাস্টার, তিরিশ বিঘা জমির মালিক মোহন মাইতি।

আঁচল টেনে জবা ঘুরে দাঁড়াতেই মোহন বলল, নাওনা সেন্ট।

– না, আমি চাষীর মেয়ে মধুমতী। জবা এড়াতে চাইল।

– তো কি হলো, আমি দিল্লির বাদশা দিচ্ছি, আচ্ছা আমি না হয় স্প্রে কব্যা দিই মধুমতী, বুকে লাগালে সর্বক্ষণ গন্ধ পাব্যা।

– না, না। জবা ভীত হয়ে ওঠে, ছেল্যাটাকে দিন, আপনি যা করছেন উ পড়ে যাবে।

মোহন মাইতির নিঃশ্বাস গরম। চোখ যেন ক্রমশ ঘূর্ণায়মান। সে দেখছিল বালিচকের ননীগোপালের বউ এর সব অঙ্গই প্রখর, নেশা-য় যেন টানছে তাকে। আঁচলের আড়ালে ভরী দুটি বুক ভয়ে কাঁপছে, গাল দুটি রোদে পুড়ে অথবা মোহনের কথায় যেন রক্তাভা। বেলা অনেক। সূর্য মাথায়। ডানদিকের কোন ক্ষেতে আর মানুষ নেই, শুধু পাখির ঝাঁক। সে এগিয়ে দুহাতে বাচ্চাটাকে তার মায়ের কোলে তুলে দিতে দিতে আবার সুযোগ নিল, ছুঁয়ে ফেলল জবার বুক, কোমর। জবা শুধু তাকাল একবার। তারপর সামনের দিকে উধাও করল দৃষ্টি। অপেরার মূল পার্টিকে আর দেখা যাচ্ছে না, নদীর বাঁকে মিলিয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই। অগণন প্রকৃতি, কিন্তু মানুষ মাত্র দুটি। মোহন মাইতি আস্তে আস্তে জবার কাঁধে হাত রাখল, বসবে ইখানে মধুমতী !

জবা কেঁপে ওঠে, বলল, দেরি হয়ে যাবে।

– যাক ! হাঁটা রয়েছে অনেকটা, তুমি আবার ছেল্যা কোলে নিয়েঁ, ছেল্যাটাকে শুইয়ে দাও মাটিতে, ঘাসের উপর ঘুমাক।

– আর কতদূর ? জবা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে।

– মাইল তিন, নদী পার হত্যা হব্যা উদিকটায়। মোহন তর্জনী তুলে দেখায়।

জবা বলল, না চলেন, দাস মশায় কি বলবে !

– তুমি কিছু না বলল্যাই হলো, বিমলা মানে পরীহাটির সেই ফিমেল নালিশ করত্যা গিয়েছিল, উকে দূর কর্যা দিল নরোত্তম দাস, অ্যাকটিং ছাড়া উ কিছু বুঝেনি।

মোহন মাইতির ভারী রসস্থ কণ্ঠস্বরে জবার গা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। দাঁড়াতে তার ভয় করল। বসতে আরো ভয়, অথচ বসার কথা বলায় সে যেন খুশিই হয়েছিল মোহন মাইতির উপর। কোমর টনটন করছে। ছেলে কোলে ক'রে এত হাঁটার অভ্যেস তো নেই। সে ঘুরে তাকায় ফসলের ক্ষেতের দিকে। শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, টিয়া-শালিক দুপুরটা ঘন হয়ে উথলে পড়ছে যেন দুধের মত।

মোহন মাইতি আবার বলল, বসো, আমি বসছি, তুমি তো একা যেত্যা পারবে নি।

মোহনের ঠোঁটে চাপা হাসি। সে জমির আলে ব'সে সিগারেট ধরায়। জবা একটু ওধারে কোমর নামিয়ে দিল আলের উপর। আহ্ কী আরাম ! বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরল বুকের উপর। তখন দেখল মোহন উঠে আসছে, তার মুখোমুখি উবু হয়ে ব'সে ধোঁয়া ছেড়ে দিল

একগাল, তামাকগন্ধী। সিগারেটটা হঠাৎ ছুঁড়ে দিয়ে মোহন যেন শকুনের লাফে এগিয়ে এল উবু হয়েই, দুটো হাত বাড়িয়ে জবার আনত মুখ তুলে ধবে, মধুমতী, আমি দিল্লির বাদশা।

জবা ঢলে যায় পিছনে, মুখ ছাড়িয়ে নেয় মোহনের দুই হাত থেকে, 'আপনি স'রে বসেন দাদা, আমি গবীব চাষার মেয়ে, গবীব চাষা, লেবাবের বউ, ময়দা কল ইখন বন্ধ।'

মোহন মাইতি নিঃশব্দে হাসে, চাপা গলায় বলল, ডায়লক ভুল হলো একটু, তবে চলব্যা, ই র'মেই চলব্যা, শুধু বলোনি গরীবেব বউ, তুমি কুমাবী মধুমতী।

জবা আবার পিছনে ঢলে, 'আপনি সত্যিই বাদশা, তিবিশ বিঘা জমিন, মাত্তর পাঁচ বিঘায় বর্গা, মোদের জমিনের সব বর্গা, ধান পাইনা, সরে বসেন দাদা।'

বাববার জবার পিছনে ঢলে যাওয়া ভালো লাগেনা মোহনের, সে বলে, 'ইতেই তুমি ইমন করছ জবারানী, কথা আছে শেষ দিশ্যে চুমু দিবাব, তুমাকে জানান বারণ ছিল, চুমু দিলেই হই হই পড়্যা যাবে, বায়না হব্যা একশোটা।'

জবা থর থর করে কাঁপে, বাচ্চাকে আঁকড়ে ধবে খুব জোবে। মোহনের আঙুল চেপে বসছে তার রোদ পোড়া ত্বকে, জবাব চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল প্রায়। তাকে এক হাতে বেড় দিয়ে ব্লাউজেব বোতাম অন্যহাতে খুলতে যায় বাদশা মোহন মাইতি, তাতে জবা ছটফটিয়ে উঠতেই বাচ্চাটা তীব্র আর্তনাদে নদীর তীব ভাসিয়ে দিল প্রায়। এতে যেন সম্বিত ফেবে জবা মাজির, সে তীব্র চোখে মোহনকে ভৎর্সনা কবে, একি কবছেন!

মোহন মাইতি হেসে বলল, কানছে কেনে?

জবা এবাব বিব্রত ছেলের দিকে তাকায, কান্না তার খুব চেনা, সে হঠাৎ কাতব চোখে মোহনেব দিকে তাকায়, আপনি একটু সবেন দাদা।

– কেনে, আমি কি বাঘ, আসবে তুমাব গায হাত পড়বেনি?

– না, না তা নয, একটু সরেন। প্রায কেঁদে উঠেছে যেন জবারানী, 'ইকে গুম পাড়াই!

কী মনে কবে মোহন মাইতি সবে গেল। গিয়ে বসল বুনো কুলঝোপেব ওধাবে। ছেলেটা সত্যিই পাহারা দিচ্ছে ওব মাকে। জবা মাঝিব বুদ্ধি কম নয়। হিসেব কষে এসেছে। কিন্তু তার দেহ এখনো উদোম হাওয়ায় আনচান। ঝিমঝিম কবছে সর্বাঙ্গ। জবাবানীব সর্ব অঙ্গ যে তাকে টানছে ক্রমাগত। বাচ্চা ঘুমোক। রাতটা তো পড়ে আছে। বাচ্চা ঘুমোক। নদীর ধাব আব জনহীন দুপুবটা শেষ হতে তো এখনো অনেক দেবি। ঘুমোক। বাচ্চা ঘুমোক। থাবা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে বোধহয জবা। মোহান ঝোপের আড়ালে ঘুবে বসল। সোজা ভবভরন্ত পাকাধানের মাঠ। ধান কাঁটা শেষ। এখন গাড়ি এসে নিয়ে গেলেই হলো। এব ফাঁকে শালিক টিয়া ছুটছে উড়ছে। এব মাঝে! মোহন মাইতি দেখল জবা তাব বুকেব আঁচল ফেলেছে, ব্লাউজের কটা বোতাম খুলে ব্রেসিযাব তুলে, পা মেলিযে বসে ঘন রৌদ্রে যেন মেলে ধরেছে কচি তালের মত মসৃণ বসস্থ বুক। বাচ্চার মুখে তা ঠেসে ধবেছে জবাবানী। কোলেব ছেলে দুধ টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে। সামনে দুই টিযা অবাক স্থিব চোখে দেখছে জবারানীকে।

মোহন মাইতি কাঁপতে লাগল। এ দৃশ্যেব প্রথমটায় যেমন দৃষ্টি জুড়িয়ে এসেছিল, তা যেন এখন শত চক্ষু হয়ে খুলে যেতে চাইছে। ধান গন্ধী, দুগ্ধ গন্ধী পৃথিবীর অঢেল দুপুর ক্রমশ ঘন হচ্ছে। মোহন মাইতি আবাব উঠল, ডাকল কুলঝোপের আড়াল থেকে, 'মধুমতী! বড় তিষণা আমাব গো।'

–দাদা আমি গরীব চাষাব মেয়ে, গবীব ঘবের বউ, ঘরে ভাত নাই, অন্ন নাই..

জড়িয়ে যেতে লাগল জবারানীব কথা, আপনি বড় মানষ, বাদশা মানুষ, কত জমিন, কত মেয়ে আপনার...। ভুল হয়ে যেতে লাগল কথাগুলি। চাপা কান্না হাওয়ায় লাট খেতে লাগল।

৮.

ধ-বনি অপেরার পুরো পার্টি এতক্ষণে পৌঁছল। ওইতো ফিমেল আর হীরো। ফিমেলের চুলে ধুলো বালি, পিঠে ধান খড় মাটি, শাড়িতে পাছার কাছটায় মাঠের ঘাস খড় মাটি ঘষে লেপটে গেছে। মাথা নামিয়ে হাঁটছে। মুখ তোল, না হলে গাঁয়ের লোক তোমার দেখবে কী। কাঁধে তার ছেঁড়া ফোমের ব্যাগ দোল খাচ্ছে। ও মা, বাচ্চা রয়েছে যে। কাঁখে বাচ্চা। বাচ্চাটা কাঁদছে, তীব্র রাগে হাত পা ছুড়ছে একনাগাড়ে। গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক দাঁড়িয়েছে পথের দুপাশে। তাদের গায়েও ধান খড় মাটি, পাখির পালক। ফিমেলের গায়েও তাই। শীতের হাওয়া হঠাৎ আবার বল পেয়েছে যেন, মাঠের খড় উড়োচ্ছে, ধূলো সাঁই সাঁই পাক খাচ্ছে।

নরোত্তম চিৎকার করল, দেরি হলো কেনে ?

বাদশা মোহন মাইতি চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়ে জবাব দিল একটু জোরে, 'ল্যাংবোট লিয়ে এস্যাছে যে।

কাঁখের বাচ্চা সামলায় জবারানী, তার মুখে হাত চাপা দেয়, চুপ কর বাপ চুপ কর, বাবুরা বকব্যা, মারব্যা।'

বাচ্চা কোলে জবারানী বসল বটতলায়। নরোত্তম দাস তাব দিকে এগিয়ে এল, নরোত্তমকে দেখে জবারানী তাড়াতাড়ি বলে, কুনো চিন্তা নাই দাসবাবু, এমনি খুব ঠাণ্ডা, কেনে যে ইমন করছে !

জবারানীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্তিমিত হয়। মৌচুবিয়ার লোক ভীড় করছে তার চারিদিকে ! বাচ্চার কান্না থামছেনা।

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

প্রমাথী

ওদের অনেককেই শরৎ চেনে। ওর দেখায় বা কল্পনায় কিংবা অনুমানে বিশেষত যারা থাবার ভেতর দম বন্ধ হয়ে ছটফট করছে তাদেরকে ও চেনে। ছটফট কবে যারা মরে গেছে ভিন্ন কথা, কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছে, তাবাও কেমনভাবে গদগদ হয়ে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে।

গ্রামের ভেতর শহর ঢুকে পড়া সময়েবই, অথচ ওদের আদিম অন্ধত্বের ভেতর আজ সময় স্তম্ভিত অনড় পরিবর্তনহীন অন্তহীন এক নিদারুণ যন্ত্রণায় বেঁকে চুরে যাচ্ছে। ওরা চালাক, কিন্তু ওরা বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। জানে না কী কবা উচিত বা কী করতে পারে। ছাল খুলে ভেতর দেখলে দেখা যাবে, ঝাপসায় ছায়াচ্ছন্নতায় সেই অস্তিত্ব এক বিকট রহস্যে মোড়া। যেখানে মুড়োনো চারার মতো পবিবর্তিত মুল্যবোধের ধাবণাগুলি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে নির্লজ্জের মতো পড়ে আছে।

এই জন্য নিয়তির মতো মেনে নিতে বাধ্য হলেও ওরা ক্ষমার অতীত। দল বেঁধে আসছে, একপাল বৃদ্ধ রুগ্ন গরুকে জবাইখানার দিকে কেউ যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ভোট দেয়, ওরা ভোট দেবে, অথচ আটকা পড়ে গেছে এব রূঢ় অনতিক্রম্য জগতে। বারবার বলেও, ইঙ্গিত দিয়েও শরৎ ওদেব বোঝাতে পারেনি। উল্টে বরং ওদের নিজেদের কথাটাই শরতের মুখে শুনতে চায়। কতকগুলো বিশুদ্ধ বাজে স্তুতির ওপর দাঁড়িয়ে ওরা সিদ্ধান্তটা নিতে চায়। অথচ নিশ্চয়ই জানা উচিত কী মিথ্যেটাই না বলছে।

ধুলোয় গবমে মাখামাখি হয়ে ওরা হাজির হল। কেউ পান খাচ্ছিল, কেউ চুটা, কেউ বিড়ি বা চুন-মতিহার। কিন্তু সবাই হাসছিল। হাসিটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, শুভেচ্ছাসহ কিছু একটা কবতে পারবে বলেই হাসছে। কিন্তু যদি তা না হত, যদি একেবাবে আনন্দের, একটা শয়তানের রাজত্বের অন্তে, নতুন সময়ের সূচনার স্বপ্নে আশায় ওরা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পাবত, তবে সেটাই কি হত না একমাত্র সত্যি!

তার নিজস্ব আটপৌরে সাদামাটা ডানায় ভর দিয়ে উড়ে উড়ে শবৎ তো গোটা পৃথিবীকে এ কথাটাই বারবার শোনাতে চেয়েছে। বলেছে চোরকে চোর বলো। বাপ চোর হলে তাকে বাপ বলার দরকার নেই। কারণ সে চোর। বাপ বলে তাব চুরিকে আড়াল না করে, সে যে চোর এটা জানিয়ে দেওয়াই ভালো। সে জানে এই জন্যই তাকে দু-চোখে কেউ দেখতে পারে না। আর ওদের বোঝালেও না বুঝে উল্টে ওরা একটা কিম্ভূত কিমাকার প্রাণীর কণ্ঠস্বব যেন শুনে অবাক হবে। সেই অসহায়তার জ্বালায় ডানাগুলো ধরে এলেও কিছুই করার নেই। ও ক্লান্ত ডানার ভেতর নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে উড়ে চলে। যেদিন বাড়ি ছেড়েছিল, কিংবা যেদিন শহরের চা-দোকানে খাটছিল, যেদিন হেমন্তদার নজবে পড়ল, পড়াশোনা শিখল, রাজনীতি করল, চাকবি পেল, বিয়ে করল, বাচ্চার জন্ম দিল-প্রতিটি মুহূর্তেই ও অনুভব করতে পারছিল ও বেঁচে আছে! সেই জেদটা আছে বলেই ও মাকুন্দ ভীমের মৃত্যুকেও অনুভব করতে পারে না। নিজের ওপর একশভাগ বিশ্বাস রেখে ও বুঝেছে, ওটা অনুভব করার দরকারও নেই। কিন্তু ওরা অবুঝ হয়, তখন প্রায়শই কেন যেন মনে হয়, একটা স্রোত অস্তিত্বহীন অন্তহীন তাকে নিয়ে ভেসে যাচ্ছে। জ্যান্ত তীব্র ভাবগুলো আদৌ ছাগলছানার পায়ে ছটফট করে না! আর

তখনই মনে হয় এ সময় এ পৃথিবীতে প্রকৃত সুস্থ বোধ নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকাটা কী ভয়ানক কঠিন। আধুনিক রুচি তার জীবন ও মনকে সীমায়িত করেনি। দৃষ্টিভঙ্গিতে আজও ক্লেদ শ্যাওলা জমেনি। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের বোঝাতে চায়, ওরা যা করতে চায় সে-টা ভুল। মহা ভুল। বোকামি। কারণ প্রতিনিয়ত ওরা মর্দিত হয়েছে, পিষ্ট হয়ে চলেছে। অথচ কে বোঝাবে!

অনেক দিন গ্রামছাড়া হলেও ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি ঘটনা তার জানা, এই জানতে চব্বিশ ঘন্টা উপস্থিত থাকা জরুবি ছিল না। বাৎসরিক এই যে ধরাবাঁধা একবারের আসা সচেতন হবার পর থেকে, এই আসাতেই সে ওদেরকে বুঝে নিয়েছে, কারণ এল্লাবনীর ভীম ভূঞাকে শরৎ জানত।

জানত, অথচ দীর্ঘ ব্যবধানের পরও তাকে আসতে হয়েছে, অভিমানে ক্ষোভে ক্রোধে জ্বালা আব অসহাযতায় ভীমকে ত্যাগ কবেও করতে পাবেনি কারণ এল্লাবনী তাকে ডেকেছে। সে নিজেই নিজেকে বাধ্য করেছে। বহু বছর বাদে দেখে খুশিতে উপচে পড়লেও ভীম কোলে তুলে নেয়নি। চতুর ভীম জানত কোলে তুলে নিতে এগিয়ে এলে শরতের ক্রোধ আর ঘৃণাটা বাড়বে বই কমবে না। সেসব আবেগ বা দুর্বলতা নয়, এল্লাবনী তাকে টেনেছে। তাই এই কদিনের জন্য প্রতিবছর একবার করে আসা। আর ফিরে যাওয়া। কারণহীন, অর্থহীন, ব্যাখ্যাহীন সফর। শরৎ মনে করে, এটা যেন তার অস্তিত্ব, তার বাঁচা, তাব নেশা, তাব পরিচিতি। নিজেব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকেও সে বোঝায়, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক না কেন, প্রতিবছর ওখানে এল্লাবনীতে একবার যাবে। সেটাই হবে তোমার নিজস্বতা। নতুন নতুন যত পাতাই প্রতিবছর গজাক না কেন, ঝরে যাক না কেন, শেকড়টাকে ঠিক থাকতে হয়। এই আসার মানে ঠিক থাকা। ঠিক না থাকলে যাকে অতিক্রম করতে চাও তাকে ঠিকমতো বুঝবে চিনবে জানবে কীভাবে ?

এসব কথা নিজের কানেই লেকচারের মতো শোনালে শরৎ অবাক হত না। কারণ সে তো মাস্টারমশাই। শিশুগুলো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে হাঁ করে, শরৎ আবাব ডানা মেলে চোখ বন্ধ করে উড়ে চলে। যেখানে উড়ে যায়, সেই দেশ এল্লাবনী ছাড়া আব কিছুই নয়। গ্রাম, গ্রামের সীমায় অশ্বত্থতলায় ভীমের থান, ছাড়িয়ে গেলে এলা ঘাসের জঙ্গল, জঙ্গল বরাবর সরু রেখা রাস্তায় পড়লে সোজা নদীর চব, চবের বালি ভাঙলে নদী, নদীর জলে চাঁদ। নদীর ভেতব চাঁদ বা অন্ধকার –গান বা গাথা–আদিম লোককথা বা–সমাজবদল সবকিছু একাকাব হয়ে যায়।

জয়ন্তীর পোষা পাখিটা ভগবানের নাম গাইছে। গলায় তুলসীর মালা যুবতী জয়ন্তী কেত্তন গাইছে তার লাল মাটির ফুল-লতা -পাতা-পাখি আঁকা দেওয়ালের তলায় দাওয়ায বসে। সেই সব গান শোনা যায় এই এত দূরে নদী পর্যন্ত। যেন বহু পথ বহু সময় পেরিয়েও। অথচ শুনতে শুনতেই মনে হত জয়ন্তী পতিতা। বাল্যবিধবা জয়ন্তীর পতিতা-জীবনেব কত কথাই না উপচে পড়ত, যেগুলো লোকমুখে শোনা! পুরাণের চরিত্র এভাবেই আজকের মানুষের ভেতর সব কিছুর জট পাকিয়ে দিয়ে ঘৃণায় বা ভালোলাগায় মিশিয়ে তার কিশোর মনকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে চাইত। তখনো শরৎ গায়ের পালকে ঠোঁট ডুবিয়ে নিজেকে বলেনি, তুমি যদি তোমার বাবাকে অস্বীকার বা অতিক্রম করতেই চাও, তাহলেও তোমাব বাবাকে বোঝো এবং বোঝার পর চেনার পর সিদ্ধান্ত নাও।

এ কথা বলেছিল, নিজে নিজেকেই, সেই দিন, যে দিনের কথা সবাই জানে। সমস্ত প্রাথমিক রাগ উত্তাপ জ্বালা যন্ত্রণার পব, মাথাব চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিঃশেষিত হবার পর যেন আগুন নিভে গেছে। অথচ ভেজা ছাই-এর স্তূপ থেকে পোড়া গন্ধটার সঙ্গে সঙ্গে হালকা ধোঁয়া উঠছে। সেসব এখানকার সবাই জানে, সবাই-এর মুখে মুখে ফেরে লোকগাথা হয়ে।

তবুও ওরা এসেছে, ওদের কথাটাই শরতের মুখ থেকে শুনবে বলে, শরতেব কথা শুনতে নয়। সব জানে অথচ বোঝে না, বুঝতে চেষ্টা করবে না। এমনই অন্ধ, এমনই বিশ্বাস। থাবায় থাবায় ইঁদুর হয়ে, খেলাব সামগ্রী হয়েও সেই অন্ধত্ব দূর হয়ে যায়নি। অথচ রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন। কুণ্ডলীপাকানো সেই যন্ত্রণাটা কেবল শরতের ভেতর থেকে উপচে উপচে ওপরে উঠে

যায়, জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে ঘরে আগুন লাগা ধোঁয়ার মতো। ওই যে ইঁদুর দুটো ! লজ্জায় সংকোচে শতরঞ্চিটাতে বসছে না। অথচ ওদেরই বসার জন্য পেতে রাখা। ওরা এসেছে ওদের প্রিয় মানুষটির স্মৃতিতে। রাগ হয় শরতের। মনে হয় সে তার পেঁচার ঠোঁট দিয়ে টুক করে তুলে নিয়ে গিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বলে, তোদের কি শিক্ষা হবে না কোনো কালে ? একটু অসচেতন হতেই ইঁদুরটা টুক করে নিচে পড়ে গিয়ে পাঁই পাঁই দৌড় দিল গ্রামের দিকে। কানা ইঁদুরটা রেগে গেছে। গ্রামের দিক থেকে আবার ঘুরে এল। গাছের নিচে, শরৎ যেখানে বসেছিল তার তলায়। বলছে, 'তোর এত বড় সাহস ! আমি না বাঁচাইলে সেদিন তুই থাকতু কথা ? পুড়ে ভূত হয়ে যাইতু'–

শরৎ একটা চক্কর মেরে এসে আবার বসে। ডানা ঝাড়ে। হাসির মতো শব্দ বাতাসে ভেসে যায়। ইঁদুরটার এই ক্রোধ ঈর্ষা খুবই আন্তরিক। কিন্তু ঐ আন্তরিকতা এমন এক কুৎসিত অন্ধত্বে আচ্ছাদিত যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। বৃদ্ধ কানা ইঁদুরকে সে বলে, সেই জন্যই তো তোমাদের ডেকেছি, সব বলব বলে, না হলে বলতাম–ভাগো হিঁয়াসে। মূল্যবোধের কথা আমাকে শেখানোর দরকার নেই। তাই জয়ন্তীকে তোমাদের দলে দেখার পরও তোমাদের আসতে বলেছি। জীবনে কথাবার্তা না বলেও, দেখে দেখে বিস্মিত হয়েছি বলেই ওকে গুরুত্ব দিয়েছি।

ততক্ষণে আর একটা ইঁদুর চেঁচাচ্ছে। পেছনে পেছনে আরো একদল আসছে। ওদের লাল চোখ। গাছের ডালে ওকে লক্ষ করে শিকারির মতো তীরকাঁড় উঁচিয়ে ধরেছে। যেন ওরা এই উদ্ভুট জীবটাকে মেরেই ফেলবে।

শরৎ গুলি খাওয়া বৃদ্ধ কানা ইঁদুরটার অসহায়তার দিকে তাকিয়েছিল। ও চুটা ফুঁকছে। এ দেশের এই সব ইঁদুরেরা নেশা ছাড়া থাকতে পারে না। ওরা ভেতরে ভেতরে পুড়ছে। সেই আগুনে ঘামতে শুরু করে শরৎ। মাথা ঘুরছে, শরীর জ্বলছে, সব পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। ভীম ভূঞার ঘর-পোড়া মানুষ -পোড়া গন্ধে গোটা গ্রাম, মানুষের ভাগ্য তছনছ হয়ে যাচ্ছে। ওরা দেখেও দেখছে না। জীবনচক্রের কোনো এক অজ্ঞাত কারণে যেন এল্লাবনীর মাকুন্দ ভীম ওদের বাবা হয়ে গেছে।

ডাকাতদের লাগিয়ে দেওয়া আগুনে এক পরিবারের বাবোটা বেড়াল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাড়ি সুদ্ধ। রেডিও টিভিতে এই খবর শুনে ষষ্ঠীর ব্রত করা মানুষেরা হা-হুতাশ করছে। ভীম ভূঞা কোনোরকমে বিশ্বস্ত অনুচর কোড়াপাড়ার বৃদ্ধ কানা ইঁদুরটার সহায়তায় শরৎকে নিয়ে জানে বেঁচেছে। সবাই জেনে গেল ডাকাতদের মাল কিনত ভীম ভূঞা। তাদেরই সঙ্গে হিস্যার কোনো গুণ্ডগোলে ঐ কাণ্ড ! ভূঞাদের বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকার ছাই দেখল ইঁদুরগুলো। শূন্যে লাফাল। ভীম আর কোনোদিনই কোনো মতেই ঐ সব ভয়ানক ডাকাতদের জব্দ করতে পারল না, বদলে পোষা ইঁদুরগুলোকে নিয়ে সারা জীবন মনের আনন্দে খেলে গেল।

পিতা মাতা স্ত্রী সন্তান সন্ততি ভাই ভাইবৌ সবাইকে হারিয়ে উদভ্রান্ত সর্বস্বান্ত ভীম পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার নিজের ভেতর ফিরে এল। সেই ফিরে আসা পুত্র শরতের মুখের দিকে তাকিয়ে, না জয়ন্তীর মুখ থেকে শোনা ভগবানের সেই গান শুনে–কে জানে ! ভীম মরে গেল, কিন্তু কেউ জানল না আসল কারণটা কী !

জয়ন্তীকে ঘরে এনেও নিজের উদ্দেশ্য সাধিত হল না ভীমের। সে মনে করত বাচ্চার জন্ম দেওয়াটা এক অলৌকিক কাণ্ড। সেটা সবিশেষ কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক ক্ষমতা জয়ন্তীর যে একেবারেই ছিল না একথা ভীম বুঝেছিল কিছুদিন পরেই। তখন বুঝেও সে জয়ন্তীকে ফেলে দেয়নি। যার উদ্দেশ্যই ছিল, বংশবৃদ্ধি করে ক্ষতিপূরণ করা, সে বংশবৃদ্ধি হচ্ছিল না দেখেও কেন যে জয়ন্তীকে আবার এলা ঘাসের জঙ্গলের ধারে গ্রামের সীমানায় ভীম থানের পাশে রেখে এল না কে জানে। ভীম মরে গেল। কিন্তু কেউ জানল না এরও আসল কারণটা কী !

জয়ন্তী আছে। তার স্বাতন্ত্র্য তার বৈচিত্র্য নিয়ে সে ওদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, অথচ মাকুন্দ ভীমের সঙ্গে কাটাল কী করে ? কিংবা সত্যিই কি এল্লাবনীর ভীম ওকে কিছু বলত

না ? স্বতন্ত্র হয়েও জয়ন্তী ওদের দলে কেন কীভাবে এসব প্রশ্ন শরতের মনে জাগলেও জিজ্ঞেস করা হয় না। জয়ন্তী একটা রহস্য। যুগ যুগ ধরে ওদের সঙ্গে ভীমের রাজত্বের জল বাতাস খেয়েও জয়ন্তী অন্য রকম কেন ?

ধেড়ে ইঁদুরটা বোধহয় শরতের মনের ভাব বুঝতে পেরেই, না কেন কে জানে ঠিক এই প্রসঙ্গটাই তুলল।—তুই যে বলতিছু বাবা খারাপ কাজ করত, বাবা ভালো লোক ছিল না, বাবা পাপী ছিল, কিন্তু জয়ন্তী-মাকে আন্যে রাখা ছাড়া আর কুনো খারাপ কাজ তো সে করেনি।

শরৎ ডানা ঝাপটায়। — না। একমাত্র ওটাই ভালো কাজ করছিল।

—ভালো তো তুই বাবাকে, অকে ঘিন্না করতু কেন ? কথা বলুনি কেন কুনোদিন ? ঘর ছাড়ছিলু কেন ?

—তোমরা আজে যা ভাবো, আমি সে-দিন তাই ভাবতাম বলে। এ কথা শুনে কিছুই না বুঝতে পেরে ওরা গা চুলকাচ্ছিল। গোঁফ নেড়ে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছিল। তখনই একটা মস্ত ধুলি ঝড় নদীর দিক থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর ওরা হাত জোড় করে বসে মুখে বিড় বিড় করছিল। কখনো গুনগুনিয়ে গান গাইছিল। প্রায় কয়েকযুগ ধরে এই সব কাণ্ড ঘটে চলল। শরৎ একটা কোটরে আশ্রয় নিয়ে ধ্যানীর মতো গুম হয়ে বসে থাকল। ঝড়ে গাছের ডাল ভাঙছিল, পাতা ঝরছিল।

গ্রামের সীমায় ভীমের থান। সেই অশ্বত্থতলার পাশে পোড়ো বাড়িটা, যেখানে এখন প্রচুর সাপ বংশবৃদ্ধি করে চলেছে, মওকা পেয়ে দেওয়ালের আঁকা গাছ লতাপাতাগুলো লাফিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আগাছা হয়ে স্ফূর্তিতে বেড়ে চলেছে। সেখানে থাকার সময় জয়ন্তী বলত, তাকে ভগবান জন্মই দিয়েছে, তাকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে, সব বিলিয়ে দেবার জন্য। আর ঐ জন্যই তো যমের দূত এসে তুলে নিয়ে গিয়েও হরির দূতের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে ফিরে গেল।

নদী-জঙ্গল ডিঙিয়ে আপন মনে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকারে যে প্রাণীটাকে শরৎ জয়ন্তীর গানের ভেতর ঢুকতে দেখল সে আসলে অন্য কোনো হুলো নয়, শরতেরই বাবা ভীম ভূঞা, এল্লাবনীর মাকুন্দ ভীম। ভীমের থানে পূজিত ভীমের ইয়া বড় গোঁফ—হাতে মধ্যম পাণ্ডবের গদা। অথচ চাষী ভীম শিবের অনুচর। শিবের ত্রিশূল ভেঙে ফাল করে যে হাল চষত, মাটি ভাঙত, চাষ করত। অশ্বত্থথানে সারা বছরই প্রায় ভীমের কাঠামোটা পচে গলে দাঁড়িয়ে থাকে। তারই সঙ্গে আলাদা করতে ওরা ওকে বলত মাকুন্দ ভীম।

পরের দিন ধেড়ুয়ার স্কুলে না গিয়ে ও গিয়েছিল জয়ন্তীর ঘরে। নির্লজ্জ মেয়েটা আদর করে মাদুরে বসিয়ে সরবৎ খাইয়ে তরমুজ খাইয়ে আম খাইয়ে বলল, ঐ কথা—ভগবানের কথা। ওসব বলছিল যখন সে বঁটিতে আম কাটছিল। আর আমের রক্ত গড়িয়ে ভাসিয়ে পুরো দাওয়া আর উঠোনটাকে ভিজিয়ে দিয়েছিল। অমন রক্ত কেবল থাকে শরীরে, প্রাণী বেঁচে থাকলে। শরৎ বুঝেছিল জীবনের রংটা আসলে লাল। জয়ন্তী জীবনের কত কাছেই না থাকতে চেয়েছে। ওর শাদা থান কাপড় লাল হয়ে যাচ্ছিল। নাবী শরীরটা লালে লালে টইটুম্বুর হয়ে থাকে। বলল, আমি তোমার মায়ের মতো বাবা, মায়ের ওপর কি সন্তানের রাগ করতে আছে, না মাকে মাগী বলে গালাগাল দিতে আছে ?

কানে হাত চাপা দিল শরৎ। কতকগুলো সাপ তারকানে ঢুকে খামচাচ্ছে। আজও এল্লাবনীতে কোনো বাপের বেটা নেই যে ভীম ভূঞার মুখের ওপর কথা বলত। সে দিনও ছিল না। কেবল জঙ্গল থেকে হাতি নেমে এলে তখন ভীমের সামনে ভীমের চেয়েও জোরে চেঁচাত। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ভীম ভূঞা একদিন নিজের নতূন ঘরে ওকে নিয়ে এল। বলল, আমি বিবাহ করলি —আমাব ইস্ত্রী-জয়ন্তী। নারীসঙ্গ না করলে আর বাঁচা কী ! আর ঘর ছাড়া কি নারীসঙ্গ হয় ? তাই তোবা যারা ওকে এতদিন সীমানায় জঙ্গলের ধারে ফেলে রেখেছিলু, দ্যাখ, তোদেবই নাকের ডগায় আমি কেমন তুলে আনলি ঘরে।

আশ্চর্য ! একথা কিশোর শরৎও শুনেছিল। কিন্তু ওরা ধীরে ধীরে ইঁদুর হয়ে যেতে যেতে চুপ করে গেল। কেউ কিছু বলল না। বরং জোড় হাতে ভূমিষ্ঠ হল। বলল, বাবা তমার জয় হউ–

কিন্তু বলা উচিত ছিল, তোরা মানে কাদের বুঝাইতিছ ভূঞার পো ? এল্লাবনী মানে তো তুমি, তুমি মানে আমরা। তুমিই ফেলে রাখ্যেছিলে, তুমিই মর্য্যাদা দিলে, ইটা ফের লতুন কথা কী ! শরৎ সেই দিন প্রথম অনুভব করল, না, এ পৃথিবীতে কেউ বাবাদের চোর বলে না, দাদাদের বদমাশ বলে না, প্রভুদের লম্পট বলে না। বলতে গেলে আকাশে যেতে হয়, ডানায় ভর দিয়ে উড়ে উড়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি তৈরি করে দেখতে হয়। তারপর পৃথিবীতে নেমে এসে বলতে হয়, শোনো হে জনগণ, আমাদের বাবা চোর। পৃথিবীর সব বাবারা যা করে, আমাদের বাবাও তাই করে, তার নাম শোষণ ও অপরিমিত ব্যবহার।

পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গেল শরৎ। বাস।

শরৎ পালিয়ে গিয়েছিল। সেই তার গ্রাম ছাড়া। যাওয়ার সময় একটুও কাঁদল না। কষ্ট পেল না। ঘুমন্ত বাবার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। শুধু ভাবল, বাবা যে ল্যাংটো মূর্তিটিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে, ওর নাম জয়ন্তী, ও এল্লাবনীরই অথচ অন্যরকম কথা বলে কোন শক্তিতে ? একটা গোটা রক্তের নদী কী করে ওর মধ্যে ঢুকে থাকা সম্ভব হল ?

বাবার দিকে না তাকিয়েই কেবল মনে দৃশ্য এনে থু-থু করে থুথু ফেলল। অথচ কে না জানে সর্বস্ব হারিয়ে একমাত্র শরৎকে বাঁচাতে পেরে, নতুন করে বেঁচেছিল এল্লাবনীর মাকুন্দ ভীম। আর শরৎ। সারাক্ষণ যে বাপের পিঠে বাপের কাঁধে হাটে মাঠে বাটে দেবালয়ে শ্মশানে সর্বত্র।

পরে শুনেছে, কাটা পাঁঠার মতো, মাথা হারিয়ে ছটফট করছিল ভীম ভূঞা। দীর্ঘদিন চোখ দিয়ে রক্তের মতো জল ছুটত। সেই জলের রং যে লাল, এটা নাকি অনেকেই দেখেছে। আর দেখার পর থেকে ভীম ভূঞা যা করত, এদের মনে হত, ওগুলো সব অলৌকিক কাণ্ড ! বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এল্লাবনীর ভীম ভূঞা।

হয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটা একটা মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছিল। কিন্তু তারা ভাবছিল, ওগুলো মাকুন্দ ভীমের অলৌকিক কাণ্ড। মাকুন্দ ভীম এভাবেই এই পথেই মৃত্যুর আগে আগে সবার বাবা হয়ে গেল।

তাইতো ওরা মৃত্যুর পরও বায়নাক্কা ধরেছিল, বাবা জাগবে বাবা উঠবে। চামড়াগুলো উঠে গিয়ে নতুন চামড়া গজাবে। চুলগুলো উঠে গিয়ে নতুন চুল হবে। ওরা বিজ্ঞান জানে না, জানলে বলত, কোষগুলোও সব নাকি বেঁচে উঠবে – নতুন নতুন কোষ জন্মাবে। কিন্তু সামনেই ভোট। ওরা ভোট দেবে। তাই ভোটের জন্য ব্যস্ততায় ওরা সে পথে গেল না। কিন্তু নতুন দাবি তুলল। নতুন দাবি এখন ওদের মুখে মুখে ফিরছে।

তারপর বহুদিন বাদে শরৎ একবার চলে এল। কারণ ছাড়া কারণটা হল এল্লাবনী তাকে ডাকছে। না এসে এসে সে ছটফট করছিল। কোথায় যে, কোন অন্তর্গত দেশে সেই হাহাকারটা গুমরে গুমরে উঠছিল কে জানে। আজও রহস্য, আজও ব্যাখ্যাহীন। কিন্তু ক'দিনের জন্য উড়ে এসে এই বসায় অসম্ভব এক তৃপ্তি, অস্বাভাবিক এক প্রাণ-জুড়িয়ে যাওয়া। এভাবেই বোধহয় জীব তার শেকড়ে শেকড়ে হারিয়ে শেকড় খুঁজে পেতে চায়। গাছের ডাল কিংবা নতুন করে ইঁদুরের হাড় কাঠামো দিয়ে বানানো অলৌকিক ঘরের টং-এ বসে ঝিমিয়েছে। বাৎসরিক এই আসায় জয়ন্তীর উচ্ছলিত বাৎসল্য আর ভীমের আনন্দাশ্রু। উভয়ত শরতের অপরিসীম ঘৃণা অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য এড়িয়ে যাওয়া। প্রত্যেক বাবারই বোধ হয় এই রকম এক একটা দুর্বল পয়েন্ট থাকে। তার নিয়তি তাকে সেই পয়েন্টে ফেলে দিয়ে মর্দন করতে থাকে, পিষতে থাকে। মর্দনকারী মর্দিত হতে থাকে।

শরৎ এসেছে, কিন্তু একটা দানাও খুঁটে খায়নি। ছোঁয়নি। ছুঁতে গিয়ে দেখেছে বমিতে

বস্তিতে পৃথিবী ছয়লাপ হয়ে যাচ্ছে ! এসবের মাঝে শরতের সম্বল নির্জন নদীতট। বাল্যের নদীর সেই সরু প্রবাহ বয়ে বয়ে চরে চরে আজও এগিয়ে চলেছে মগ্ন চৈতন্যে। সেখানে চড়া নেই, খরা নেই, ধ্বস নেই। আজও স্বচ্ছ, অমলিন।

এবারেও তাই। এবারেও সেই রকম আসা।

কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ এল্লাবনীর মাকুন্দ ভীম মারা গেল। তাই আজ দিনের প্রখর দাবদাহের অসম্পূর্ণ অবসানের পর, এই প্রায় সায়াহ্নে ওদেব মাঝখানে তাকে বসতে হয়েছে। যদিও ওরা ব্যস্ত, কারণ সামনেই ভোট। ওখানে ওরা ওদের মত ব্যক্ত করবে। ওরা তবুও এসেছে, নিজেদের প্রয়োজনেই। ওদেরই কথাটা ওরা শরতেব মুখ থেকে শুনতে চায়। তারপরই কাজে লেগে পড়তে চায়। মাঝে ভোটের জন্য যা কিছুটা বিরতি। অথচ দাবিটা অবাস্তব।

এখন দেখে মনে হচ্ছিল, এই প্রস্তাবেব সম্পূর্ণতার সঙ্গে ওদেব বাঁচা মবার প্রশ্নটাও যেন জড়িয়ে আছে।

ঝড় থেমে গেছে। কোটর থেকে বেরিয়ে ডালে এসে বসল শবৎ। শরৎ উঁড়ে চলে এল ভীমের বাখুলের দিকে। পেছনে পেছনে ওবাও লাঠি তীর কাঁড় উঁচিয়ে ছুটে এল।

কিছুতেই বসল না পেতে বাখা শতরঞ্জিটাতে। দাঁড়িয়ে থাকল। খুঁটিতে হেলান দিয়ে বা উবু হয়ে মাটিতে বসল। একই কথা। জিড়িব জিড়িব।–তুই বল অ্যাটা ভালো কাজ –তুই অনুমতি দে–টাকা দে–

লোকটাকে শবৎ চেনে। সাঁওতাল পাড়ার মনা টুডু। আটমণ ওজন, এগারো হাত লম্বা। ঘন কালো রঙ। কোঁকড়ানো চুল। একটা গাছ ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেছে, সেই রকম ওর বসে থাকা। দাদনে দাদনে ওকে ভীম ভিখারি কবে ছেড়েছে। বললে বলে ওবই দোষ। ওর নিজের কপালের দোষ। বাবুর আর কী কববাব ছিল !

ও বলেছে, তরা থাকবি তো থাক। শহরে যায়্যে মাস্টার ছোকরা ডাঁটিয়াল হয়ে গেছে, মোদেব মানুষ বলে গণ্য করেনি। তাই উল্টাপাল্টা কথা কয়। বাপ মরে গেলে মানুষ কত কাঁদে, অকে এক ফঁটা কাঁদতে দেখছু কেউ !

এটাই শরতের নিয়তি। সে বেশ বুঝতে পারে, লেকচারে আব যাই হোক্‌ মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করাব পরিচয় তুলে ধবা যায় না। কিন্তু এ ছাড়া তার আব কী করাব আছে ? বসতে বললে এই সাম্রাজ্যের লোকেবা ভাবছে অপমান করছে। সত্যি কথা বললে ভাবছে, উল্টাপাল্টা কথা–বড়রা বাচ্চাদের যেমন ভোলায় !

ও চলে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে আরো কয়েকজন অসন্তুষ্ট বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে আবো একজনেব গল্প সে খুব জানে, যার মেয়ের সঙ্গে ভীম ভূঞা শুত। সে সব জানে, তবু বলে, আজকাল ক-টা লোক ও রকম হয় ক'?

ভীমের কোনো গুণই ছিল না। কিন্তু ও বলে, আপদে বাবু ছাড়া মোদের কে দেখছে ক' ?

অন্যদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

মাহালীপাড়ার একজন উঠে এসে শরতের দুহাত জড়িয়ে ধরে। বলে, কয়ে দে ছ্যানা ! দিয়ে দে না –বাবু –

একে শরৎ ছোটবেলা থেকে চেনে। কাঁধে চেপে গল্প শুনতে শুনতে হাটে যেত। প্রায় দেড়শো বছব বয়স। এখনো বেঁচে আছে। এদের যেন কোনো সময় নেই আয়তন নেই অবয়ব নেই –সবকিছুই অন্তহীন। ভীম ভূঞা তার যাদু জল, সেই যে চোখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল লালরঙের সেই জল ছিটিয়ে ওদের অমর কবে দিয়েছে–দৈত্যাকৃতি করে দিয়েছে। মাহালীদাদুর ছেলেকে দু'টুকরো অবস্থায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল সত্তর সনে। ছেলেটা পার্টি কবত। ভীমের পাঁচ বিঘা জমি ও চাষ করত। সেই পাঁচ বিঘা জমি ছেলেটা পার্টির সাহায্য নিয়ে বর্গা করাতে চেয়েছিল ! ভীম তাকে ফেলে দিয়েছিল জঙ্গলে দু'টুকরো করে। সেই থেকে পুত্রহাবা লোকটির মৃত্যু নেই, বছর বছর বয়স বেড়ে চলেছে। মাথা

নেড়া । গায়ের লোমগুলো সব শাদা ।

লোকটা বলছে, বাবু মোদের ভালবাসত । মোবা মান্যিগণ্যি কইরতম । উটা হইলে সে মোদের মধ্যিখানে, থাইকতেন — এউ আর কি !

টেবিলের ওপর টেবিল তুলে তার ওপব দাঁড়িয়ে শবৎ মানুষটাব গায়ে হাত বাখে । বলে, তোমাদের মাঝখানে ওর কি থাকার কোনো দরকার আছে ?

যথাসম্ভব গলা নামিয়ে ওব কাছে গিয়ে আন্তবিক কণ্ঠে শবৎ এই কথা বলে, যাতে লেকচারেব মতো না শোনায় । যেন কোনো ঘবোয়া পরামর্শ । যে কন্ঠস্বর একমাত্র তখনই নির্গত হয়, যখন মানুষের পাশে মানুষ থাকে । লোকটি ফোকলা মুখে বলে, আছে বাবু আছে, মানুষকে যদি মানুষ মনে না বাখে, তবে আর রইল কী ?

কথাটি চমৎকাব লাগে শবতেব । সে অভিভূত হয়ে যায় । এত দীর্ঘদিন ধবে তার যে আশা স্বপ্নকল্পনা, সেটা এই সূত্র ধরেই । প্রত্যেকটি মানুষেব মধ্যেই একটা করে বীজ থাকে। শুধু আলো বাতাস উত্তাপ দিয়ে তাকে গাছ কবে দিতে হয় । পৃথিবীব বাবাদের সঙ্গে তার বিরোধটা এখানেই। ওবা বীজটাকে শুকিয়ে দেয় । বা পুড়িয়ে ফেলে ।

সূত্র ধরেই সে বলে, সেটাই তো আমিও এতক্ষণ বলছি । মানুষকে মানুষ মনে রাখছে না । অমানুষকে মানুষ মনে বাখছে । যেহেতু তাব কাছে সে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বসেছিল। কোনোদিন দেখতেই পায়নি, বুঝতেই পারেনি তাব বিকিয়ে যাওয়া দেউলিয়া দশাটা !

লোকটা আবো নুইয়ে পড়ে । বলে, তাব কথা বুঝতে পাবতিছিনি ।

ধন্ধে পড়ে যায় শবৎ । সে জানে লেকচাবগুলো মানুষ বুঝতে পাবে না । তবে কি তাবও কথাগুলো সত্যিই লেকচাব হয়ে যাচ্ছে ? ঠিক কোন ভাষায় পৃথিবীর কোন প্রার্থীব কণ্ঠে আশ্রয় নিয়ে সে ওদের কাছে পৌঁছবে ? কাবণ সত্যি কথাগুলো তাকে বলতেই হবে—যা তার বাঁচা তাব অহং তাব সর্বস্ব । প্রশ্নটা অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে।

কী এক ধরনের অস্বস্তিতে তাব দম বন্ধ হয়ে এলে, ভূমিজ পাড়ার অনা সিং নামের মধ্যবযস্ক লোকটা, যাব হাতগুলো তিন মাইল লম্বা, যে তিন মাইল দূরেব বস্তুকেও আয়ত্তে আনতে পাবে অনায়াসেই, বলে, সাফ সাফ ক'তুই হ্যাঁ বলবি কি না, তোকে মারো্ই ফেলব নাইলে, মোরা না হয বাইরের লোক, তোব ঘবের লোক জয়ন্তী মা, সে-ও তো মোদেব সঙ্গে, তাবও খুব ইচ্ছা—

—জানি । বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শবৎ ।

সে বলে সে জানে । কিন্তু বুঝতে পাবেনা জয়ন্তী কী করে ওদের দলে ? তারপব ভাবে, সে-ও তো এল্লাবনীর ভীম ভূঞার বাজত্বে বাস কবে তাব সঙ্গে শুয়েছে যে তাকে সামাজিক মর্যাদা সম্পদ প্রতিপত্তি দিয়েছে তাকে অস্বীকার করবেই বা কী করে ! যত বড় খাল নদীই তার ভেতব শুয়ে থাকুক না কেন ! যতই তার হাতে কাটা আমের ভেতব থেকে রক্তের স্রোত বয়ে যাক না কেন !

গাছ ইঁদুব বা অতিকায় আদিম শক্তিধব প্রাণী—ওবা অশান্ত । ওবা প্রত্যেক প্রত্যেকেব মুখের দিকে তাকায় ।

অনেকে চলে যাওয়াব পব, যে সবচেয়ে বেশি সবব সে ক্রোধে নীল হয়ে যাচ্ছিল দেখে শরৎ ঠাণ্ডা কবার চেষ্টা করে । পাথবটাকে বলে, তুমি কিছু বলবে কাকা ?

সে চমকে ওঠে । কিন্তু কিছু বলে না । গর্তটা দিয়ে লালা গড়াচ্ছে । গোটা শরীরে ক্ষত-ঘা । হাড়িপাড়ায় পড়ে থাকা ঐ পাথরটাকেও শরৎ চেনে । ওর ওপর চড়ে ছোটবেলায় ঝাপাঝাপির কত খেলাই না খেলেছে । এক সঙ্গে । তখন ও ভীম ভূঞার বাগাল ছিল । নিশ্চয়ই ওর মা এখন বেঁচে নেই । থাকলে অনেক প্রশ্নেব উত্তর যাচিয়ে নিতে পারত । ভীমের দেওয়া পাতা শেকড় ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করেছে । আসলে ওগুলো সব বিষাক্ত জিনিশ । ওর

মাকে দিয়ে ভীম তার সব অবৈধ সন্তানগুলিকে নষ্ট করত। গোপনে। ওর মা রাজি না হওয়ায় হাতের কাছেই পাওয়া বাগাল ছানাটাকে অসুস্থ করে, বাঁচা-মরা করে রেখে এভাবেই ভীম মা-পাথরের মুখ বন্ধ রেখে কাজ হাসিল করত।

পাথরটার ক্লান্ত বিষাক্ত গহ্বর থেকে ধ্বনি নিঃসৃত হয়। —তুই হ্যাঁ বলবি কিনা বল ?

শরৎ মুষড়ে পড়ে। বলে তোমাদের যা ইচ্ছা করো। আমি এসব কোনো দিন ছুঁইনি। ছোঁব না। আমি আমার সময়টা কাটিয়ে চলে যাব। কোনো দিন থাকতে আসিনি। থাকব না। তোমরা শুনবে না যখন। আবার বলছি, তোমরা যা বানাতে চাচ্ছ, ওটার দরকার নেই।

শরতের এই বিষাদের সুব, হেরে যাওয়া ক্লান্ত ধ্বনির পর হঠাৎই কেন কে জানে, কান্নার শব্দে সবাই উৎস সন্ধান করতে থাকে।

সন্ধ্যা নেমেছে।

দরজার আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে ছিল। তারই কান্নার শব্দ। ওরা কেউ কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু শরৎ অনুমান করতে পারে, কে, কেন আচমকা অমন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এবং ঠিক শরতের ঐ কথাগুলোর পর !

রহস্যটা সেখানেই। যা ক্রমশ ঘনিয়ে উঠছে।

শরতের মন কান্নার জায়গাটায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

এরই মধ্যে একজন বলেছে, তা অমন শোকতাপ পাইলে মানুষ একটু আধটু বিগড়ে যায়।

তার মানে ও জানে, যে ওদের বাবা একটু আধটা বিগড়ে গিয়েছিল। খুব বাগ হল শরতের। এরা অনুকম্পা বা সহানুভূতির অতীত। সব জানে, অথচ—ওদের কিলবিল করা দশাটা সে সহ্য করতে পারছিল না। এই হেরে যাওয়ার গ্লানি নিয়ে আর এক মুহূর্তও বাঁচার মানে নেই। ডাকাতদের সঙ্গে যোগ রেখেছিল বলেই তো ভীমের পাপের পয়সা এক ডজন মনুষসহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ওরা কেবল সেই ছাই মাখা শিবানুচরের উদ্দাম নৃত্যটাই দেখল ? কিন্তু শরৎ জানত না সে আগে থেকেই হেরে বসে আছে কারোর কাছে। এল্লাবনী হল সেই গ্রাম, যেখানে ভীম ভূঞা ছাড়া আর কেউ সবদিন দু-বেলা খেত না। যারা এল্লাবনী ছাড়া বাইরের সূর্য দেখত না। জল খেত না। এ ছিল ভীম ভূঞার সাম্রাজ্য। কতকগুলো নেংটিপরা ক্ষীণ শরীবের দরিদ্র প্রাণী যা বস্তুকে বাঁদরেব মত নাচিয়েছে ভীম, আর ওবা নেচেছে মাভৈঃ মাভৈঃ করে।

—বাবু তোর পাপ হবে। লোকটি বেশ উত্তেজিত।

শরতের মনে হল, অন্ধকারে মিশে থাকা ঐ প্রেতের ধ্বনি আদিম কোনো গুহার অভ্যন্তর থেকে কোনোরকমে বাইরে বেরিয়ে এল।

ও কোনো কথা বলল না। ক্লান্ত লাগছে।

যেমন ব্যাঙ ডাঙায় রোদ পুইয়ে জলে নেমে যায়, ওরা অনেকেই অন্ধকারে ডুবে গেল।

শেষ পর্যন্ত একজন দরজাব কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, মা শুনতিছু—

—তোমরা যাও। আমি রাতে রাজি করাব।

লোকটি গলার স্বর আরো নামিয়ে বলে, আমরা এতগুলা লোক পারলমনি আর তুই একা—

—বললাম যে তোদের। যা—

ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে ভরসা না রাখতে পেরেও চলে গেল। কিন্তু শরৎ তখনও ভাবছিল, দরজার আড়াল থেকে হঠাৎ রাতে রাজি করানোর কথাটা ভেসে এল কেন ? এ রাত কোন স্থানের কোন কালের কোন পরিবেশের ?

মনে মনে হাসছিল শরৎ। যার সঙ্গে তার সেই থেকে কথাবার্তা বন্ধ সে কি না তাকে রাজি করাবে !

চাঁদ উঠেছে।

তাই না সে টের পেল তার যে মনুষ্যবয়ব। তার গায়েব পাঞ্জাবিটা ঘামে ভিজে গেছে। দাওয়া থেকে নেমে সিগারেট ধরিয়ে উঠোনে সে পায়চাবি করতে থাকে। তারপর এগিয়ে যায় নদীর দিকে। গ্রামের সীমায় ভীমেব থান-অশ্বত্থতলা-পৌরাণিক পোড়ো বাড়ি—জঙ্গল বরাবর সরু রাস্তা—বালিময় চর—নদী। নদীর জল। জলে চাঁদ।

কতক্ষণ কে জানে ! হয়তো টানা চল্লিশটা বছর এভাবেই কেটে গেল। এভাবেই কেটে যায়। তারপর মৃত্যু আসে এক সময়। তখন মনে হয়, অনেক ইচ্ছে ছিল, কিছুই হল না।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে।

পেছনে পায়ের শব্দ।

জ্যোৎস্না আর বালির গড়াগড়ি খাওয়া ফাঁকা নির্জন চরে কার পায়ের শব্দ।

চারপাশে তাকিয়ে কাউকে খুঁজে পেল না শরৎ। কেবল গা ছমছম করানো একটা অলৌকিক বাতাস। কে !

শরতের ভয় করে। এই সময় এই জায়গা তো একমাত্র তারই। ভীম ভৃঞ্জার সাধ্য কী এই মুহূর্তকে টেনে হিঁচড়ে তার সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢোকায়।

—আমি।

একটা বাতাস পাক খাচ্ছিল। পরিষ্কাব শাদা একটা ভূত। দেখা যাচ্ছে, আবার যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে অথচ যাচ্ছে না। বাত শব্দটা ব্যবহারেব তাৎপর্য এবার বুঝতে পারে শরৎ। সে এলে, তুমি বলে যে ! কিছু বলবে ? বাতে তোমার এই রূপ ?

হাওয়াটা বাড়ছে। নদীর জলেব মতো খল খল একটা শব্দে হাওয়াটা হাসি হয়ে কানে বাজছে।

তার মাঝখানে ওব দৃপ্ত গম্ভীব ভাবি কণ্ঠস্বর। —হ্যাঁ। দাঁড়াও।

কী ছিল সেই কণ্ঠে কে জানে ! শরৎ দাঁড়াতে বাধ্য হল। এবং এই প্রথম ওর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়ে গেল।

নারীশরীরের এই অলৌকিক রূপ থেকে তীক্ষ্ণ দুটি দ্যুতি শরতের মুখে আটকে পড়েছিল।

— কোথায় যাচ্ছ ?

— জঙ্গলেব দিকে।

— যেও না।

— কেন ? কেন যাব না ? যাব কী যাব না তুমি বলবাব কে ?

— যেও না। ও রাস্তায় ভীষণ সাপখোপ।

— তাতে তোমার কী ?

— বৌমা বাচ্চাদের নিয়ে কোঠার বারান্দায় পড়াতে বসেছে। ক'দিনের জন্য আস, তাও বইপত্র নিয়ে।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি—

—তোমরা কবে শহরে যাচ্ছ ?

—সময় হলেই।

—আমাকে একা ছেড়ে ? জানো, আমি তোমার কে ?

– কেউ নয়। তাই ছাড়াছাড়িব প্রশ্ন নেই। তুমি ওদের দলের। যারা আমাকে কাল মেরে ফেলবে।

ও হাসছে। বাতাসটা বাড়ছে। পাগলের মতো বাতাসটা ঘুরছে। পাল্লা দিয়ে চাঁদও বেড়ে চলেছে।

অলৌকিক নারীমূর্তি বলল, তা হয় নাকি ? একটা মানুষ আব একটা মানুষের কেউ হয় না, এটা হতে পাবে ?

শরৎ চমকে ওঠে। কথাগুলো শোনার পর তার মাথাটা ঘুরছে মনে হয়। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। কোনো উত্তর মুখ গহ্বরে এগিয়ে এল না। শুধু পাঞ্জাবিটা মনের আনন্দে ভিজে উঠছে।

আবার একটা হাওয়ার ঝাপটায় গুমোট ভাবটা কেটে গেল। চাঁদের আলোয ধীরে ধীরে সব কিছু স্পষ্ট হচ্ছে। কিন্তু একটা ভয় জাগছে মনে মনে। অস্তিত্বটাব উত্তাপ কোনো মতেই সে সহ্য করতে পারছে না।

ও যেন বাতাসের সঙ্গেই কথা বলছে। –মানুষটাকে সাপেই কাটল।

শরৎ থতমত খেয়ে গিয়ে বলে, তুমি জানলে কী করে ?

–বা ! গ্রামের সবাই তো জানে। বছরে এক আধটা লোক যেখানে সাপকাটিতে মাবা পড়েই, তারা সেখানে সাপেকাটা মড়া চেনে না ? তুমি ওদের বলেছ হার্টফেল। ভূত দেখে হার্টফেল করেছে। ওবা বিশ্বাস কবেছে, কারণ ভূতেব সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় অতিলৌকিক ব্যাপারটা এসে গেছে। সাপেব কামড়ে তো ওদের মতো সাধারণ মানুষেরা মবে। তাই না ?

–হবে বোধহয়। বলেই উসখুস করতে থাকে শরৎ। তার চাঞ্চল্য এতই স্পষ্ট যে তা মূর্তিটাব চোখে ধরা পড়ে।

ধরা পড়ে গেছে এ কথা শরৎও বুঝতে পারে। বুঝতে পেবে আব কী করবে। কাবণ ও জিজ্ঞেস করছে, ছটফট করছ কেন ?

– তোমার সামনে দাঁড়াতে পারছি না। তুমি কি বেঁচে আছ ?

–চঞ্চল হয়ো না। মায়ের সামনে দাঁড়াতে কষ্ট কী ? আচ্ছা একটা কথাব উত্তর দাও তো। ও তখন খুব চেঁচাচ্ছিল। তুমি কোথায় ছিলে ?

–বাগানে। চাঁদের আলোয় ঘুবছিলাম।

–ঐ গভীর রাতে ? বৌমা –

–ওর সঙ্গে ঝগড়া কবেছি।

–নিশ্চয়ই বিষয়টি আমি। আমি না বিষয় ?

–তুমি।

–বা এই তো বেশ বাধ্য ছেলে। তাই বলি, রেগে লাভ আছে কিছু ? অবশ্যি অবুঝ সন্তান মাকে এই বকমই যা-তা বলে। তারপর বুকে মুখ ডুবিয়ে কাঁদে। এ সব নিযম সেই কবে থেকে।

ভূতেব দীর্ঘশ্বাস কী শুনতে এই বকম হয। ও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এসব জানি বলেই অবাক হচ্ছি না।

পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, শরৎ–তুমি সব কিছুতে এমন অবাক হচ্ছ কেন ?

–কই না তো !

– তুমি অযথা উত্তেজিত। চঞ্চল। যেন তুমি তোমার মধ্যে নেই। কেন বলো তো ?

— সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে ?

— না, কৈফিয়ৎ নয়। আসলে আমি জানি ?

— কিচ্ছু জানো না। তুমি কী করে আমাকে বুঝবে ?

— কেন ? তুমি কী চাঁদ হয়ে গেছ !

— না। তা হব কেন ! মানুষ।

— ওই জন্যই তো বলছি, ওকে সাপেই কেটেছে।

— হ্যাঁ। ঠিক তাই।

— তুমি ঠিক জানো ?

— সাপটাকে ঘরে ঢুকতে আমি দেখেছি। তুমি ? তুমি কী জানো ?

— সব।

— মানে।

— সাপটাকে আমিই বিছানায় মশারির ভেতর ঢুকতে সাহায্য করেছি।

ঘাসের জঙ্গলের দিকে না ফিরে শ্বেতকায় অলৌকিক নারীমূর্তি নদীর দিকে ছুটে চলে গেল। শরতের সাধ্য কী তার পেছন ধরে। তবুও দৌড়ে দৌড়ে ও এক সময় পিছিয়ে পড়ে হেরে গিয়ে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বালিশ ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে গেল।

পড়ে রইল।

মাথার ওপর চাঁদ।

হাওয়ায় হাওয়ায় সব কিছু একাকার হয়ে গেল।

অসীম ত্রিবেদী

শিকড়

এই রকম ভাবে যদি শুরু করি যে : ছেলেটা বনসাই প্রদর্শনী থেকে ফিরে এসে আত্মহত্যা করেছিল, তাহলে মনে হতে পারে যেন ওই বিশেষ বনসাই প্রদর্শনীতেই ছেলেটার, অনির্বাণের – আমার বন্ধু অনির্বাণের আত্মহত্যার সমূহ কারণ নিহিত ছিল। যেন, যেন ওই বনসাই প্রদর্শনীতে কিছু একটা, ভয়ঙ্কর কিছু একটার মুখোমুখি হয়েছিল অনির্বাণ – যার ফলে এই পৃথিবী তার কাছে এমন পাথুরে মনে হল, শেকড় হারিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা – ক্রমশ ওঠা, আরো আরো উঠে দাঁড়ানোর পক্ষে এতটাই অযোগ্য মনে হল, কিংবা নিজের তাবৎ কিছুকে টবে প্রতিপালিত, মৃত্তিকা-অতিরিক্ত এবং এমনকি মৃত্তিকাভুক ভিটামিনের ওপর নির্ভরশীল মনে হল যে, আর – আর একদিনও, কি এক ঘন্টাও বেঁচে থাকার প্রয়োজন বোধ হল না অনির্বাণের। এবং তাই বনসাই প্রদর্শনী থেকে ফিরে আর খাবার টেবিলের দিকে – অনির্বাণদের টেবিলে খাবার মতো আর্থিক স্বাস্থ্য আছে – গেল না, বলল : 'ক্ষিধে নেই'। একা, খুব একা অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকল অনেকটা সময়। তারপর রাত যখন গভীরতম, নদীর ওপার থেকে যখন নাইট শিফটের গম্ভীর ভোঁ থম্‌থমে রাত্রির বাতাসে ভেসে যেতেও ভয় পায়, তখন মা—যাঁর নাড়ির বাঁধন মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে দাঁড়াতে হয়েছিল —সেই মায়েরই কথা মনে পড়ে হয়তো, হয়তো তাঁর শাড়ির গন্ধ মনে পড়ে – মায়ের সিন্‌থেটিক শাড়ি সিলিং ফ্যানে বেঁধে, নিঃশব্দে বিছানায় টুল রেখে, মায়ের শাড়ির সঙ্গে যেন বা নিজেকে মায়ের সঙ্গে শেষ বারের মতো জুড়ে অনির্বাণ – আমার বন্ধু অনির্বাণ জীবনের সঙ্গে সব কথা শেষ করে মৃত্যুর হাত ধরেছিল।

কিন্তু সম্পূর্ণতই তা তো নয়, কখনোই নয়। কেননা, ঐ বনসাই প্রদর্শনীতো একটা লক্ষণমাত্র, সূর্যকে ঘিরে প্রাচীন পৃথিবীর তিনবার প্রদক্ষিণ করার মুহূর্তমাত্র এবং এমনকি প্রদর্শনী থেকে ফেরার পরের ঘটনাবলীও. আবার তেমনি হল যেমনটি অনুমেয়। অনির্বাণ বনসাই প্রদর্শনী থেকে বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে – ওরা এই উপমহাদেশের সেই লঘিষ্ঠ জনমণ্ডলীর একজন, যাদের খাবার খাওয়ার মতো টেবিলও থাকে – সকলের সঙ্গে খেতে বসেছিল। হ্যাঁ, কম – খুব কম কথা বলেছিল সে রাতে। কম – খুব কম খেয়েছিল সে রাতে। পরে জেনেছি যে প্লেটে-প্লেটে ভাত খাওয়ার মতো মহার্ঘ সচ্ছলতা দিতে পেরেছিলেন অনির্বাণের পিতা-মাতা-পিতামহ – প্লেট থেকে আসলে ভাত ছোট ছোট মুঠোয় মুখে পুরে দিচ্ছিলো। 'আর ভাল্লাগছে না' বলে টেবিল ছেড়ে বেসিন – আহা বেসিন ! তাই তো স্বপ্ন দেখি আর কাজ করি. আবার স্বপ্ন দেখি সব কিছু পালটে দেওয়ার – যাতে আমারও, আর সকলেরও কোন একদিন একটা বেসিন হয় মুখ ধোওয়ার। আঃ, কুলি করে মুখের ভেতর, দাঁতের ফাঁকে টাকরার চালে আটকে থাকা ভাতভাঙা, ডালের কুচি কিংবা তরকারির আঁশ ফেলে দেব তেলতেলে বেসিনে এবং বেসিন, তেল-পেছল শরীরের বেসিন, তাকে একপলকে প্রবাহিত করে দেবে ড্রেনের দিকে—যার ড্রেনে থাকার কথা, তার মুখে থাকার আর যে কোনো অধিকারই নেই, এটা দারুণ পেছল গতিতে করে দেখায় যে বেসিন, তা পেতে হলে এই সব কদাকার বিশ্বব্যবস্থা পালটে দেওয়ার স্বপ্নটা খুব জরুরী। বেসিনে অনির্বাণ মুখ ধুয়ে ওপরে নিজের ঘরে চলে যায়।

হ্যাঁ, আমার বন্ধু অনির্বাণদের ওপর আছে, ওপরেরও ওপর আছে – তেতলার চিলেকোঠা ছিল অনির্বাণের নিজের ঘর। হ্যাঁ. আমার বন্ধু অনির্বাণদের নিজের নিজের ঘর থাকে, সকলে

মিলে এক ঘরে জড়াপালটি খেয়ে কিম্ভূত থাকা নয়, নিজের আলাদা এক ঘরে আলাদা নির্জনতা থাকে। আর যদি উলটে বলি, এক ঘরে সকলে মিলে না থেকে, একা একা একঘরে হয়ে থাকা – তাহলে তাই-ই না হয় হল। সে রাতে ওর ঘরে অনেকক্ষণ আলো জ্বালা ছিল। সকলে পরে বলেছেন। কেন ছিল ? অনির্বাণ দীর্ঘ সময় ধরে একটা অসমাপ্ত ছবি এঁকেছিল। একটা ল-ম্-বা টানটান তালগাছ–'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে।' সত্যিই সে তালগাছ অনেক, অনেক বড় হয়ে আকাশের অসীম সীমানায় উঁকি দিয়েছে, গোল গোল পাতার মাথায় মেঘের মুকুট–এসব অনির্বাণ এঁকেছিল। ছবিটা অসমাপ্ত। আকাশের দিক, স্বপ্নবর্ণ নীলে ফুলের মতো ছড়ানো মেঘের দিকটা সম্পূর্ণ হয়ে এলেও – 'মা যে হয় মাটি তার' মাটির অংশ, তার ঘাস-ঝোপঝাড়-আগাছা-ঘর-গেরস্থালি অসম্পূর্ণ ছিল : শেষ করে যেতে পারেনি আমার বন্ধু, বারো ক্লাশ শেষ করে বি এস সি-তে পদার্থবিদ্যার ছাত্র অনির্বাণ।

একসময়ে সে দীর্ঘক্ষণ পরপর অনেক গান নিচু গ্রামে টেপে ক্যাসেট চাপিয়ে শুনেছে। রবীন্দ্রনাথের গন শুনেছে–'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পাবাবারে..', ভজন শুনেছে – মীবার ভজন–জ্ঞান জলের চেয়েও সূক্ষ্ম, বেদনা ভূমির চেয়েও ভারি, ক্রোধ আগুনের চেয়েও লেলিহান, হতাশা কাজলের চেয়েও বেশি কালো : নাকি আমার ভুল হল ? মীরাতে-আমাতে মিলে অন্য রকম কোনো ভজন হয়ে যাচ্ছে ? আসলে এটা তো হতেই পারে, মীরা – আমার দূরতব প্রপিতামহী – সেই কবি, সেই জ্যান্ত প্রতিবাদ, আমার কালে এসে যখন আমাকে স্পর্শ করছেন, তখন তাঁর ভজনার ভজন আমার মধ্যে এসে পড়ে তো অদলবদল হতেই পারে – আমাব কাল, এই আমার-অনির্বাণের প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে আমরা জীবনের, তাজা-টাটকা-দুর্গন্ধ-সুগন্ধময জীবনের ভজনার দিকে চলে যাচ্ছি–তাই তো যাওয়াব কথা হে দূরতর প্রপিতামহী ! তুমি এসে আমার চোখ ছুঁলে, খুলে দিলে দুচোখের পাতা এবং তাকিয়ে দেখলাম এক অনমনীয় দেশভূমি ও বিশ্ব। আব তোমার বাণী আমার কালেব স্পর্শে তোমাকে অবলম্বনও করলো আবার নিজের স্বরূপও গড়লো–আগামী, আগামী কোনো অতি দূব প্রজন্মের কাছে পৌঁছনোর জন্য। হে প্রপিতামহী !

আমি তো তোমাব শিকড়ে লগ্ন থাকলেও–তুমি নই। আমি–আমি।

সুতবাং ভজন শুনেছিল। রবীন্দ্রনাথেব গান, গালিবের গজল শুনেছিল অনির্বাণ দীর্ঘ সময। পাশেব দোতলাব ভাড়াটে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন পরে। কারণ, ওই সময়ে তিনি ঘর ছেড়ে আরও ছোট ঘব, বাথরুমে গিয়েছিলেন। তিনি ঘর থেক ঘব, ফেব ঘরে যেতে-আসতে শুনেছিলেন যে, রাত্রিব জমাট-বাঁধা স্তব্ধতায় ছোট ছোট ঢেউযের নক্সা বুনে ববীন্দ্রনাথ, মীবা, কি গালিব শুনছে কেউ। ঘাড় ঘুরিয়ে, ঘাড় উঁচু কবে তিনি খুঁজেছিলেন কোথায় কোন ঘবে কে গভীর বাত্রিব শরীরে গানের নক্সা বুনে চলেছে। তিনি দেখেছিলেন পাশেব বাড়ির তেতলার ঘরে শাদা অন্ধকাবের পটভূমিকায় খুবই শাদা আলোর বৈপরীত্য নিয়ে তাকিয়েছিল ডোবাকাটা জানলাটি– সত্যি ছেলেটা পাগল ! এই রকম কিছু একটা ভেবে নিয়ে সুস্থ প্রতিবেশী ঘুমোতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু পবের দিন সকাল নটা নাগাদ যখন পাশেব বাড়ির দরজায় পুলিশেব গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং হতচকিত মানুষজন এসে দাঁড়াতে দেখলেন, তখন অবাক, ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নিজেব খাঁচাপ্রতিম গ্রীলের দরজা খুলে বাইরে বেবিযে এসে যখন শুনলেন অনির্বাণ আত্মহত্যা কবেছে তখন চকিতে, হঠাৎ এই এক ব্যাপাবে–কী যেন হয় মানুষেব, চকিতে তাঁব চোখ গেল সেই তেতলায় অনির্বাণেব ঘরের খোলা জানলায়। দিনের এই এত আলোয় সেই নীবব জানলাটি তখন রাত্রির চেয়েও অন্ধকাব, কালো।

পুলিশ ইন্সপেক্টর অনির্বাণের ঘরে ঢুকে থমকে যায। বুক্‌কেসে, দেওয়ালের ক্যাবিনেটে, টেবিলে বাশি রাশি বই দেখে ইন্সপেক্টর গত বাতেব ঢেকুব চাপে। নাকেব একেবারে ডগায় চার্লি চ্যাপলিনেব বিশাল একটা ফটো ফ্রেমে বাঁধানো। আহা চার্লি ! পায়েব পাতা চ্যাটালো কবে দাঁড়িযে আছেন, যেমন চ্যাটালো করতে হয় ফুটবল খেলায দুর্ভেদ্য বক্ষণ চিরে থ্রু বাড়াতে

গিয়ে — আহ, কত থু বাড়িয়েছেন আপনি চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন, গোল হল কই ? বাঁকানো মজাব লাঠি হাতের কাছে এসে কিছু শাসনেব ভঙ্গিই হয়েছে, যে শাসন মেয়ে তার বাবাকে করে। আব মুখ, আব মুখ — জড়ো কবে আনা ঠোঁট দুটি উদ্যত, যে দু ঠোঁটের ওপিঠেই রয়েছে বিস্ফোরক ধ্বনি, শব্দ বাক্য, বেরিয়ে পড়লেই—বুম ! আব চার্লি, আপনাব দু চোখ ঘের করে নাকেব ডগা পর্যন্ত এই ত্রিভুজ তো মারণাস্ত্র—যাবা আপনাকে পুরস্কৃত করে হাত ধুতে চেয়েছে তাদের জন্যে। অথচ দুই ভুরুতে দোল খাচ্ছে পাখির রাজসিক ডানা, নাকের নিচে নরম প্রজাপতি গোঁফ অস্ফুট পাখনায় তালি দিচ্ছে—আব সেই গোঁফই চুবি করেছিল এক হন্তারক !

না, ইন্সপেক্টর কী ভাবে তা আমাদের অজানা, আমবা খালি দেখতে পাই যে, চার্লিব ফটোগ্রাফেব সামনা-সামনি হয়ে সে একটু থমকালো—থমকাতেই হয়, চার্লি যে—মনে মনে নতজানু হতেই হয়। এ পাশের দেওয়ালে বিশ্বকবি, ইন্সপেক্টর ভুরু কুঁচকে তাকালো, সত্যজিত রায়েব বাবা না, হ্যাঁ বাবাই তো, সুকুমার রায় —'বাবুবাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুবে'— সুকুমার রায়েব মুখ। আবও দু-দুটো ফটো কিংবা আঁকা ছবি বয়েছে কোণের দিকে — কী দবকার বাবা জিজ্ঞাসাবাদেব ঝুঁকি নিয়ে, ফেঁসে গেলে মুস্কিল ! এ ঘবের ব্যাপাব-স্যাপাবই একটু ঘ্যাম। আবাব উদ্গাব আসে হুইস্কির, আবাব চাপতে হয়।

পড়ার টেবিলে আঁকাব সবঞ্জাম আব একটা অসমাপ্ত ছবি চিৎ হয়ে আছে। একটা বিশাল, লম্বা আকাশ ছোঁয়া তাল গাছ—তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে—ভেতবে কেউ হাততালি দিয়ে ওঠে, ইন্সপেক্টবেব বুকের ভেতবে—কে যেন শিখিয়েছিল ছেলেবেলায়। আবও এক-আধটা রবি ঠাকুব মনে কবাব চেষ্টা কবে, কেন করে—এই রাশি বাশি বই সাত সকালে চেপে ধবে নাকি উর্দির আড়ালে থাকা প্রাণীটিকে ! নাহ্ এক ওই মুক্তি ওবে মুক্তি কোথায় পাবি এ স্থলে মুক্তি বলিতে লেখক প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ ছাড়া আর কিছু তো মনে পড়ে না। এবং শেষমেশ ভা-আ-উ কবে গত বাতে আগরওয়ালাব গেলানো হুইস্কিব ঢেকুবটা উঠেই গেল। গলাব কাছে অম্বুলে চোঁয়া, মগজেও একটা টোকো স্মৃতি ঃ গত রাতে আগবওয়ালা দোলতলার সেই সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে শুলো। মেয়েটাও, এই প্রথম হলেও, সাবলীল শুতে গেল—ডাকসাইটে সুন্দরী, কিন্তু সহজে হুটোপাটি বড় হতে চায, হাইব্রিড শস্যেব মতো। তাই চটপট শুলো। এবপব আবও অনেক শোবে··· শালা !

টি-টেবিলে, যেটা এখন ঘবের মেঝেয় এবং সম্ভবত যেটা খাটেব ওপব বেখে ছেলেটা গলায় দড়ি দিয়েছে সেই ওলটানো টি-টেবিল তুলতেই একটা ডায়েবি পাওয়া গেল। পাতাব পব পাতা উলটে কোথাও একটা কালিব আঁচড়ও চোখে পড়ছে না দেখে ওটা প্রায় ছুঁড়ে শোওযাব খাটে ফেলতে যাচ্ছে ইন্সপেক্টর, তখনই হঠাৎ একটা পাতায দেখা গেল ঃ

বনসাই একটি দর্শন। এটা ধবে ফেলেছিলেন মার্কস নামেব এক দাড়িওলা ভদ্রলোক। আর এটা ধরতে গিয়ে নিজেব মেয়েদের মুখের কটিও জোগাড় কবতে পাবনি দাদু ! দোলতলাব বঞ্জনাদি—রণিদি নিজেকে বনসাই হতে দিচ্ছে। চারপাশে খুনীর ভিড় বাড়ছেই। দিদিও হচ্ছে। বাবা-মা-দাদু ···

আর কিছু লেখা নেই—না, কিচ্ছু না। এ শালা আঁতেল কেস ! ইন্সপেক্টর ঘব থেকে বেবিয়ে এল।

আমি আমার মৃতবন্ধুকে একবাবেব জন্যেও দেখতে চাইনি। অনির্বাণ, জীবিত ও জীবন্ত অনির্বাণেব দক্ষতা ও মুগ্ধতাব কাছে মৃত্যু অবাস্তব বলেই আমি সোজা শ্মশানেই চলে যাই। শ্মশানে তখন বিকাবহীন কাঠেব স্তূপ, বিকাবহীন আগুন এবং আঁচ, আব সুকান্তব আঠাবোর হঠাৎ মৃত্যুতে চুপচাপ নিজের কাজ কবে যাওয়া শ্মশানযাত্রী। মানুষের নিস্তব্ধতাব একটা ভাব আছে, এই ভাব এলোমেলো হয় জ্বলতে থাকা কাঠেব গাঁট ফাটাব শব্দে, মৃত বন্ধুব খুলি ফাটাব নিষ্প্রাণ ফটাস্ শব্দে, শ্মশানেব বিশ্রামঘবেব ছাদে দু-একটা কাকেব অকাবণ কথা বলায়। এইসব, আচমকা ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সবটুকুই শ্মশান।

অনির্বাণ, পুড়ে গেল অনির্বাণ। তারপর তো দু পায়ের ফাঁক দিয়ে দা-এর এক ঘায়ে পেছনের ভরা কলস ভেঙ্গে সেই কলস আর জলের নিয়মে ছড়িয়ে পড়া জলের দিকে ফিরে দেখা অকারণ। তবু মানুষ তার মানস নিয়ে ফিরে ফিরেই দেখে ... আরে ! তুমি তো অনির্বাণ ! ফণীন্দ্রনাথের নাতি না তুমি ? মাল্যবানের বেটা — বাহ্ ! মোটামুটি মূল্যবান পরিচয়ের আভিজাত্যের সুযোগ পেয়েছিল বন্ধু আমার, নাকি দুর্যোগ ? যাঁরা ছেলেমেয়ে — নাতিপুতিদের যে-কেউ হতে দেবেন না পণ করেন, তাঁরা তো আসলে অতি সামান্য জমিতে একতলা তোলেন, দোতলা তোলেন, তেতলা ... ছাদের কার্নিস ঘেঁসে আরও অতি সামান্য মাটিতে বাগান সাজান। আর অনির্বাণের সাথীরা, যারা কেউ বন্ধু হল না, তারা তো একটা সৌরভই হারালো—বাগানে একটা, অন্তত একটা গাছের বৃক্ষ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা ছিল হে—সেই আকাঙ্ক্ষার সুগন্ধ ছিল হে ! আমি তার সাক্ষী। সদ্য বি. এস. সি.-তে ভর্তি হওয়া ছেলেটা তো বলতে পারছিল—আমি ডাক্তার না, ইঞ্জিনীয়ার-ফিয়ার কিস্সু না, বি. এস. সি. পড়বে দাদা—ফিজিক্সের রিসার্চে নামব ! বলতে পারছিল তো ? ডালপালা আকাশে তুলছিল তো ? সুগন্ধ জমা হচ্ছিল অবশ্যই।

দু দিন পার করে তিন দিনের দিন শেষ বিকেলে আমার প্রয়াত বন্ধুর বাড়ি গেলাম। ভীষণ বন্ধু ছিল অনির্বাণ। আমার বয়স বিয়াল্লিশ—সব কিছু নতুন করে শুরু করার বয়সে আমার খুব বন্ধু ছিল আঠারো-উনিশের সব কিছু সবে শুরু করার ছাত্র অনির্বাণ। তার মৃত্যুর রাতকে রিমোট কেন্ট্রোলে দিনের দিকে ফের ফিরিয়ে আনলে যে বিকেল, সেই বিকেলে বনসাই প্রদর্শনীতে যাওয়ার কথা তুললে সে রাজী হতে চায়নি।

কেন রে ?

বলেছিল, আমার কষ্ট হয়, ভীষণ কষ্ট।

তারপর আর কথা হয় না। আঠারো-উনিশের কষ্ট তো, প্রায়শই ছলনাহীন কষ্ট। কিন্তু আমি যে বিয়াল্লিশ—একথা সেকথা চালাতে চালাতে ছল্‌কে না ওঠে এমন ছলনামাখা কথাবার্তায় ওকে ঠিক রাজী করাই।

প্রদর্শনীতে নিয়ে গেলে নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ঝুরি নামা বটগাছের কাছে দুদিক থেকে আমরা দুজনেই নিজের নিজের মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে, ও প্রথমে বিবেকানন্দের মতো বুকের ওপর হাত মুড়ে দাঁড়ালো, খানিক পরে ডান হাত জগদীশচন্দ্রের মতো গালে চলে যায়, তারপর বিদ্যাসাগরের মত কুঁচকে যাওয়া ভুরু এবং শেষে ঝুঁকেপড়া কোল কাঁধ বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রতিমা। শেকড় কাটতে কাটতে একটা সুবিশাল ছায়াময় ফলবন্ত, প্রতি ঋতুতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠা—বিশেষ করে বসন্তে কচি সবুজ পাতার সমুদ্র নিয়ে ঋজু, খাড়া প্রসারিত একটা বটগাছের খালি শেকড় কেটে কেটে কী নির্মম পরিণাম ! আমার উলটো দিকে দাঁড়ানো আমার বন্ধুটির বুক তখন দ্রুত ওঠানামা করছে, জ্বরে তম্‌তম্ মুখ—পাশে ছুটে এসে আমার বাজু আঁকড়ে বলেছিল –

— বড্ড কষ্ট হচ্ছে !

তখনো বুঝিনি সম্পূর্ণ, এখনো জানি না কেন এই আত্মহত্যা। শুধু জানি বনসাই প্রদর্শনী থেকে ফিরে আসার কয়েক ঘন্টা পরে অনির্বাণ আত্মহত্যা করেছিল।

আজ এ বাড়িতে এসে এখন দেখি গ্রীলের দরজা খোলা, বসার ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে যাওয়ার দরজা খোলা—অন্য দিন বন্ধ থাকে। তার মানে আজ বাড়িটি জনতার মাঝখানে এবং তথাপি, একা। বসার ঘরে ঢুকে এ বাড়িতে সংযত হতেই হয়। কেননা, সাধারণত এঘরে আমার বন্ধুর বাবা বসেন, তাঁর আরামকেদারা শূন্য। আজ তিনি ঘরে নেই। এই ঘরের মানুষটি মানুষের মুক্তির কথা বলেন। শুয়ে বসে জেগে তিনি সত্যিসাত্যিই মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন :

যে মানুষটি রেললাইনে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেন এবং সঙ্গী সাথীদেরও দেখান যে, সামনের দূরের ও-ই আকাশ ফুঁড়ে এগিয়ে যাবেন, তিনি সকলের সঙ্গে একসময়ে একটা স্টেশনে এসে

পৌঁছতে পারলে ক্লান্তি, খুব ক্লান্তি ঘিরে ধরে তাঁকে, সকলকে। আমার বন্ধুর বাবার স্বপ্নের পাড়ে ক্লান্তির কারুকাজ ইদানীং। এতদূর আসতে কেমন লাগল, এভাবে আসা উচিত হল কিনা, কারা কারা পথেই হারিয়ে গেল—এখন কে কী ঘোঁট পাকাচ্ছে, কেন ঘোঁট পাকাচ্ছে, কার কোথায় হাত-পা কাটল, কাকে কাকে কতটুকু আরাম-বিশ্রাম দেওয়া যায়—একটা অদ্ভুত আলস্যের ঘের। যার আরামের প্রয়োজন নেই, সেও আরামের জন্যে উমেদারী করে, যার বিশ্রাম বিলাসিতা, সে প্রকৃত ক্লান্তকে ঠেলে সরিয়ে দেবার প্রতিযোগিতায় নামে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ নিয়ে একটা চারকোণা বৃহদাকার অ্যাকোয়ারিয়মের শোভা হয়ে পড়েন মুক্তিকামী মানুষেরা। রেশন কার্ড-ক্যারেকটার সার্টিফিকেট চাকরি-কনট্র্যাক্ট-গাড়ি-দল ও উপদল-গোষ্ঠী ও প্রতিগোষ্ঠী—অন্যেরা দেখে আলস্যের অলস খেলা।

তাই কি ইদানীং তাঁর ঘরে ধূপের ধোঁওয়ায় মৃত্যুর স্মৃতি ? এবং আজ তো বিশেষ করে। হালকা সবুজ আলোয় বন্ধুর বাবাব ঘরে আলোর চেয়ে অস্পষ্টতা বেশি। আর একটা কি যেন আছে অথচ নেই — না, নিঃশব্দে আছে। মানুষের মুক্তির কথা খুব বলেন যে মানুষটি, তাঁর ঘরে দুর্দান্ত অ্যাকোয়ারিয়ম আছে। কাচ ঘর, রং করা অ্যালুমিনিয়মের দোচালা, ভেতরে জলে টাইগার-ফাইটার থেকে শুরু করে হরেক রকম রং বেরঙের মাছ—খেলে শব্দহীন কুলুকুলু খেলা, মুক্তির বিভ্রমে ছুটে এসে কাচে ধাক্কা খায়, ফিরে যায় ফের ধাক্কা খায়, জলে বুদ্বুদ ফাটে — অথচ না ছলাৎছল্, না পাখনায় গান, একেবারে নিঃশব্দ। গা সির্‌সির্ করে।

এ ঘরে আলোর দরকার, আলো। টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপলেই অনেকটা অট্টহাসি জাগে, খানখান হয়ে যায় এ ঘরের ছায়া আর অস্পষ্টতা। টেবিলে আজকের খবরের কাগজের মাঝের পাতা। পাতায় আমার বন্ধুর পিতামহর মানে-বই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন বেশ মোটা দাগে দেগে দেওয়া। অথচ সকলেই জানে — দূর, অতি দূর অতীতে তাঁর করা কালিদাসের মেঘদূতম্-এর অসামান্য অনুবাদ ছিল — আজও আছে, মৃচ্ছকটিকম্-এর অনুবাদও করেছিলেন কি দারুণ খেটেখুটে ! জীবনের কী মানে বুঝেছিলেন যে দূর অতীতে ! পাণ্ডুলিপি হাতে কটা দরজায় ঘুরেছিলেন পিতামহ জানা যায় না, কতগুলো মুখ অরণ্যময় অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল, তার তালিকা হয়তো তাঁর বুকের পাথরে লেখা আছে। এখন তাঁব চোয়ালে চাপচাপ ভাব, সেখান থেকে স্নিগ্ধ কালিদাস ঝরে গেছেন। সেই মহামূল্য অনুবাদদুটি ছাড়া তাঁর যৌবনে তিনি যে কর্ণার্জুন, কংসবধ, এইসব যাত্রাপালায় দাপটে অভিনয় করতেন, দল করেছিলেন পাগলের মতো দৌড়োদৌড়ি করে—সেই অর্জুনের, সেই কৃষ্ণের স্মারক কয়েকটি মেডেল আর মেডেল ঝোলানোর নিবর্ণ সুতো আজও ঘরসাজানো পুতুলের সারির পাশে পুতুলের মতো আছে।

এখন কর্ণার্জুন পালার কৃষ্ণ, কংসবধের গোপাল মানে-বই লেখেন, ইংরিজীর। ক্লাস টেন থেকে একেবারে বি এ পর্যন্ত। মোটামোটা বই, শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম এ(ডবল) প্রণীত। এই মানেবই বাড়িকে মসৃণ তিনতলা করেছে। যা করতে পারেনি তা দাদু নাতিকে বলেছেন — কালিদাসের কালের গল্প বলেছেন। শকুন্তলার অঙ্গুরীয়র বর্ণচ্ছটা বর্ণনা করেছেন। রথচক্র গ্রাসিছে মেদিনী আর সময়, সময় ভিক্ষা চাইছেন মহাবথী কর্ণ, সে গাথা শুনিয়েছেন। বিশাল কালীয় নাগের ফণার ওপর তা-থৈ-তা নৃত্যরত কৃষ্ণের তাণ্ডব রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ নাতি নিজেব মতো করে শুনেছে, বুঝেছেও —অতি ভয়ঙ্কর নাগের মাথার ওপব নৃত্যমগ্ন এক বালক, তার পদতলের ঘর্ষণে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ দাবানলের আকার নিচ্ছে, এসব বুঝে নিয়েছে পৌত্র আর শুনে নিয়েছে পিতামহের ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস। নিজের জীবনের মানে শেষ করে এখন তিনি মানে-বই লেখেন। শো কেসে মাটির পুতুলের পাশে তাঁর মেডেল, তাঁর কৃষ্ণ-অর্জুন এখন মাটি।

বসার ঘর পেরিয়ে এসে ভেতরে ডাইনিং স্পেসস। ডাইনিং স্পেসের দেওয়াল তাকে মধ্যমণি কালার টিভি। এ বাড়ির টিভি শেষ কবে বেজেছিল কে জানে ? সুশীল টিভির নব্ থেমে আছে বিদেশী চ্যানেলে। কী ছবি দেখিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানী ? ডানদিকের দেওয়ালে ঝক্‌মকে ভিসিপি। ভিসিপির ওপর খামেমোড়া সদ্য স্মাগলড্ হয়ে আসা মাফিয়া জীবনচরিতেব নীল চলচ্চিত্র। বাঁ দিকের দেওয়ালে ঝুলন্ত র‍্যাকে চোরপথে আনা বিদেশী ক্যাসেট প্লেয়ার।

'ইজেক্ট' টিপতেই বেরিয়ে আসে সাম্প্রতিকতম র‍্যাপ্-এর ক্যাসেট। সব এ বাড়িতে ! ডাইনিং স্পেসের পর সরু করিডর মতো। ডান হাতে বন্ধুর দিদির ঘর। দিদি ডাক্তারী পড়ছে — অপারেশান সফল, এখন আল্লাকে ডাকুন—সেই ডাক্তার ! ছুরি-কাঁচি হাতে নিয়ে বিজ্ঞানের মূল উৎপাটন করেন যে ডাক্তার তাঁর আকাশছোঁওয়া ফ্ল্যাট হয়, ফ্ল্যাটে সোনার ঠাকুর সিংহাসন হয় — পথিক ভগবান কি আল্লার মতোই তাঁকেও শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে খোঁজে।

ডাক্তার-দিদির টেবিলে—আমি জানি পাঁচ দিন আগে এ বাড়ির মেয়েরা হস্তশিল্প মেলায় গিয়েছিল—টেবিলে আর সব কিছুর সঙ্গে উপচে পড়ছে মোটা মোটা বালা, ছোট ছোট পাথর বসানো গলার হার, কানের রোল্ডগোল্ডেব মোলায়েম ঝুমকো দুল, ক্রিস্টাল্ পাথরের অপরূপ বিছাহার কোমরের জন্যে, পায়েব ভারি ভারি জোড়া জোড়া রাজস্থানী মল। আমি বন্ধুর দিদিকে জানি, ছেলেবেলা থেকে জানি। এখন এই স্তূপাকাব নকল গহনাব সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে মেয়েটাকে নগ্ন করলাম। গলায় হার বেঁধে দিলাম, নাকে গাঁথলাম নথ, কান ফুটো করলাম দুলে, কোমরে বেড় দিলাম বিছাহারে, আর সব শেষে পা দুখানিতে মোটা মোটা মলের বেড়ি—কবি জীবনানন্দ ক্ষমা করবেন, উটের গ্রীবার নিচে চোখ যাওয়ার আগেই চোখ ও মন কেড়ে নিয়েছে মরুদেশে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা চতুষ্পদ ও দ্বিপদ ভারবাহী, মগজ ও মেধাহীন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়হীন প্রাণী। আব এখানে এই ঘরে তো আমি আমূল স্প্রে এবং ভিটামিন ট্যাবলেটে বিকশিত অন্য এক প্রাণী দেখছি মনে মনে, যার গ্রীবার নিচে শতাব্দীর কাদা—হা ডাক্তার !

দিদির ঘরের পাশেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ি গিয়ে ঠেকেছে দোতলায় মায়ের ঘরে। সেখানেও কেউ নেই। বন্ধুর মা পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা। অধ্যাপিকার ঘরে পা দিতেই চোখে পড়ে ঠাকুরের সিংহাসনে বিদ্যুতের প্রদীপে আলোক শিখাব ওঠানামা। এ ঘরে মৃদু কমলা আলো। দেওয়ালে সার সার ঠাকুর ও দেবতার ক্যালেণ্ডার বাঁধানো। মধ্যমণি গুরুদেবের ছবি। বরাভয় মুদ্রায় ডান হাতের প্রদর্শনী। মাথার পেছনে জ্যোতি। চোখের কোলে চালাকি ও ক্লান্তি। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকার ঘরে দু-তিনটি অবশ্যপাঠ্য পদার্থবিদ্যার বইয়ের সঙ্গে আর যা যা আছে তা হল, গুরুদেবের দুখণ্ড সচিত্র জীবনী, মরণের পরে, আত্মা সর্বশক্তিমান ইত্যাদি আর একটা মেয়েদের খুব চালু ঝল্‌মলে সাময়িক পত্রিকা যাব প্রচ্ছদে এ সংখ্যাব মূল বিষয় অবৈধ প্রেম।

হাঁফ ধরে যায়। এক একটা গোটা দিনে তোর কত বার শ্বাসকষ্ট হোত রে বন্ধু, এই যেমন এখন আমাব হচ্ছে ! বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই তিনতলার ঘরে জড়ো হয়েছেন। হয়তো পারিবারিক স্মৃতির বিলাপ চলছে। থাক, আমি নিচে নামতে থাকি। একতলার বসার ঘরে ফেরামাত্র দেখি আমার বন্ধুর সমবয়সী প্রতিবেশী পল্লব বাইবে থেকে ঢুকছে। আমাকে দেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমিই বলি—

বোস, এনারা সব তিনতলায়।

পল্লব বসলো। গম্ভীর, জিন্‌সেব চাপা প্যান্ট পবে ডাবু চেয়াবে বসতে অসুবিধে হয় বোঝা গেল। ব্যাগি গেঞ্জিতে মোটা অক্ষরে লেখা : এনি ডে ইউ সে ! আলোচনায় আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আসে। ভীরুতা স্বার্থপরতা শব্দগুলো বেজে ওঠে। তাসার মতো দমাদম্ বেজে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলতাও। আমি পল্লবকে দেখি। ঘাড়ের পাউডার, নাকে এসে পৌঁছনো বহুজাতিক সেন্টের সুবাস, পোশাকের বাহাব, বারদবজায় উঁকি মাবতে থাকা স্মাগল্ড জুতো—ঝানু চোরাকারবারীর স্মৃতি। পাপোষের দিকে তাকিয়ে আছি, আমার কানে এসে ধাক্কা মাবে 'আত্মকেন্দ্রিতকার সঙ্গে আপস।' বিপ্লবের গ্যাঁজলায় আমার নাক, কান ও মর্ম ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

বাইরে পা রাখি। পথে এলোমেলো আলো আর অন্ধকার। বিদেশী জেনারেটরের একটানা তীব্র হিংস্র গর্জন। তার মধ্যে চায়ের দোকানে বোম্বাইয়া-কোলকাতিয়া গান, পরিবেশ দূষণ-বিরোধী পথসভা, রেডিওর দোকানে বিলাতী চিৎকার, রক্তদান শিবিরের মাইক-প্রচার. পান সিগারেটের গুমটিতে হোলির গান, আগামী বন্‌ধ নামক ছুটির দিনের নিরক্ত ঘোষণা—মনে হল : এই আমাব বন্ধু-অবান্ধব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, এইসব দোকানদার, ইংলিশ মিডিয়ম্ বিপ্লবী, রক্তদান শিবির বা বন্‌ধ-এর আয়োজক ও শ্রোতা—এই সমূহ মানুষের স্রোত আমাকে তেড়ে আসছে।

কেবল আমাকে তাক করে ছুটে আসছে একচোখো টেম্পো, দুচোখো নারী কি বাস ভর্তি মানুষ !

এবং আমি অবাক হয়ে দেখি প্রতিটি মানুষের হাতে ধারালো কাঁচি, আমার বন্ধু কি দেখতে পেয়েছিল এই আলো ঝিল্‌কে ওঠা রাশি রাশি কাঁচি ? উদ্যত কাঁচি হাতে তেড়ে আসছে পাথুরে মুখের মানুষেরা । কন্ঠে উল্লাস–

আয় শালা ! শেকড় কেটে দেব । বনসাই করে দেব শাল্লা !

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম । আমার দুচোখে বোধহয় আগামী বসন্তের কৃষ্ণচূড়া ছিল। উড়ন্ত চুলে কি কালবৈশাখী ? খুনী মানুষজন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল, দাঁড়াতেই হবে । আমি তো তলায় ঝাঁঝরি কাটা টবে প্রতিপালিত নই, আমার শোভন ও মহার্ঘ যাপনের অভ্যেসের বন্দীদশা নেই– আর, আর আমি তো বিয়াল্লিশ বছর বয়সের বহুমাত্রিক ভারসাম্য। বলে কিনা বনসাই করবে ! আরে যাঃ, শেকড় কাটবে । নির্বোধ ধূর্তেরা জানেই না আমার শেকড় কোথায় কত দূর গভীরে।

আর তারপর আমারই এগনোর পালা । কোমরে হাত দিয়ে প্রাচীন মাটির গভীরে নিজের শেকড় চারিয়ে দিতে দিতে দেখি অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এক অনন্ত মনুষ্যবীথির একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী আমি–তাল বীথির মতো । দূর থেকে দেখতে একা, এক পা। মাটির নিচে শেকড়ে শেকড়ে জড়াজড়ি–এই সর্বব্যাপী খুনীদের মুখোমুখি চিৎকার করে কথা বললাম আমি, অথচ স্বর শোনা গেল সমবেত এককে ঃ

আয় শালা ! অ্যাকোরিয়মের টাইগার, আয় !

কিন্নর রায়

তুলসিচরিত মানস

ভোরে, কুয়াশার আড়ালে আবছা হয়ে যাওয়া কয়েকটি রেললাইন, তার কাঠের পাটির ওপর হিমের দাগ দেখতে দেখতে লাইনের ওপর কিছু বিবর্ণ ঘাস, বুনো লতা– এমনটিও চোখে পড়ে। খুব কাছেই বি. টি. রোড। বলতে গেলে গায়ের ওপর। বাস, ভারি লরি, ট্রাকের চাকা গড়ানোর শব্দ, চিৎকার খুব সকাল থেকে–অনেক রাত অব্দি। বড় রাস্তার গায়ে একটি মাজার আছে। খানিক দূরে একটি মসজিদ। আর একটি বন্ধ জুট মিল। জুট মিলের নাম লোকের মুখে মুখে কিন সিন থেকে কিংসিং। এ রেল লাইনের ওপর সকালে হাট বসে একদিন। ঠিক হাঁট নয় বড় বাজার। রেডিমেড জামাকাপড়, ছারপোকা-উকুন-ইঁদুর মারা বিষ। লুঙ্গি-গামছা-সায়া, আন্ডারপ্যান্ট, সস্তার রঙিন অথবা শাদা ব্রা। চুলের কাঁটা, ফিতে, পাউডার, নেল পালিশ। ধনেশ পাখির তেল, যা দিয়ে নাকি বাত সারে। যৌনশক্তি বর্ধক সাঁড়ে কা তেল–এমনটি বলা হয়ে থাকে, কালো ঘন তেল বোঝাই ছোট ছোট শিশি। পাশে পায়ে দড়িবাঁধা কাকলাস চেহারার জ্যান্ত কোনো সরীসৃপ। এর পাশেই বদরিনারায়ণ নাকি অমরনাথ থেকে ভেসে আসা–পাহাড়ি নদীর স্রোতের টানে চলে আসা শুকনো কাঠের ভেতর থেকে বের করা তেলের বিন্দু। এই তেলও নাকি বড় কামইযাবা কেজো।

এই বাজারে বসার দিনটি কারখানার হপ্তা মেলার দিনের সঙ্গে মিলিয়ে। এমন কি কারখানা বন্ধ থাকলেও সেই হপ্তার দিন ধরেই বাজার। সকালে রেল লাইন আর তার আশপাশ জম জম করে ওঠে ব্যাচাকেনার শব্দে। সঙ্গে নানান হকারি-আওয়াজ।

মসজিদের খানিকটা দূরে একটা পিপল কি পেঁড়–অশ্বত্থ গাছ। তার নিচে সিঁদুর মাখানো নুড়ি। মহাবীর থানের তিন কোণা লাল রঙের ঝাণ্ডা। পিপল কি পেঁড়-এর নিচে খৈনি নিয়ে বসে তুলসিদাস। লম্বা লম্বা তামাকের জটা। চৌকো কাঠের ওপর রেখে সরু, ধারাল ছুরিতে কুচিয়ে নেয়। পাশে বড় টিনের কৌটোয় গোলা চুন। সেই থকথকে শাদার ভেতর একটা কাঠের ছোট লাঠি।

এক রুপেয়া কা দো, দো রুপেয়া কা, আঠ আনেকা দো–এমন শুনতে শুনতে তুলসিদাস সরু কাঠের ওপর তামাকের জট কুচোয়। কুচোতে কুচোতে খুব ধীরে কাজরি-র সুর, নয়ত রামচরিত মানসের কোনো চৌপাই গেয়ে ওঠে। হাতের ছুরি চলে। গাহকের খৈনি বনে। খৈনি কিনলে তার সঙ্গে মুফত মে চুনা। চুনৌটির একদিকে কুচোনো তামাক পাতা, অন্য দিকে চুন। পেতলের ডিব্বা এখন আর কেউ রাখে না। সে ছিল পবন মিশ্রার। ইয়া মোটা মুছ। গলায় হলুদ রঙের পৈতে। কিনসিনের 'তাঁত'-এ ছিল বপন মিশির। দেখতে দেখতে ওহি ডিপার্টে মিশিরজির কালা মুছ সফেদ হলো। মাথার চুলও হলো শাদা। তবু গলার জনেউটি তেমনই পিলা। শাদা ফতুয়ার পকেটে পেতলের খৈনি কা ডিব্বা। হাতে হাতে সোনা-রঙের। ম্যায় ভি উসি ডিপার্ট মে থা। তুলসিদাস মনে করার চেষ্টা করে। তাঁত ঘরে পাটের ফেঁসো নিয়ে কাজ। মাকুর খটখটাস। লেকিন শালা বদ্‌কিবালা। বসিয়ে দেয়। রোজ কাম মেলে না। ইউনিয়ন ভি মেনে নেয়। হাঁ, লাল তিরঙ্গা–দোনো ইউনিয়ন। লিডার লোগ বলে, সকলকে কাম দিতে হবে। নইলে মজদুর লাইনে হমারা সংগঠন ....।

পবন মিশ্রা খুব সকালে উঠে মজদুর লাইনের কলে লাইন দিয়ে নহানা ধোনা সেরে নিত। তারপর পূজাপাঠ। রামচরিত মানস। হনুমান চালিসা। তুলসিদাস মনে করতে পারে মিশ্রাজি—মুখে মুখে যা মিশিরজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, খালি গায়ে গামছা পরে হনুমান চালিসা পড়ে যাচ্ছে –

সব সুখ ল হ্যায় তুমহারি সরনা।
তুম রক্ষক কাহু কো ডরনা ॥
আপন তেজ সমহারো আপে।
তিনোঁ লোক হাঁক তেঁ কাঁপে ॥
ভূত পিশাচ নিকট নঁহি আওয়ে।
মহাবীর জব নাম সুনাওয়ে ॥
নাশে রোগ হরে সব পীড়া ॥
জপত নিরন্তর হনুমত বীরা ॥
সংকট তেঁ হনুমান ছুড়াওয়ে।
মন ক্রম বচন ধ্যান যো লাওয়ে ॥
সব পর রাম তপস্বী রাজা।
তিন কে কাজ সকল তুম সাজা ॥
অওর মনোরথ জো কই লাওয়ে।
সোই অমিত জীবন ফল পাওয়ে ॥
চারোঁ যুগ পরতাপ তুমহারা।
হ্যায় পরসিধ্ জগৎ উজিয়ারা ॥

মজদুর লাইনের নিচু ছোট ঘরে কাচ বাঁধানো রাম-সীতা-পবনপুত্র হনুমান। সামনে আগরবাত্তির সুগন্ধ, প্রদীপের আলো। মিশিরজির তামাটে পিঠে ভুলভুলে কালো লোম। তার ওপর দিয়ে শোয়ান হলুদ পৈতে। পবন মিশ্রাও তাঁত-এর মজদুর। লেকিন আমার মতো বদলিবালা নয়, পারমিন্ট। ডিব্‌টির পর রোজ পাকা কলা গোটা দুই খেত মিশ্রাজি। বলত, এতে নাকি নাকের মধ্যে দিয়ে যে সব পাটের সুতো সিনার ভেতরে জমছে, তা টাট্টির সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। চট করে খোখী টি, বি হবে না। মিশিরজি যখন মুলুকসে এসে কাজে লাগল তখনও চটকলের মালিক-ম্যানেজার আংরেজ। গ্যাট ম্যাট ফ্যাট বলে বাত করে। মাড়বারিরা এলো অনেক পর।

খৈনির তামাক কুচোতে কুচোতে তুলসিদাস মনে করতে পারে এই যে শালার সরু, লম্বা চাক্কু, তা ঐ জুটমিলের। আমাদের 'তাঁত'-এ কাজে লাগত। আর তখনই বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের পাশে সেই যে লম্বা গভীর দাগটি চোখে পড়ে যায় তুলসির। ফ্যাটফ্যাটে শাদা, চামড়ার ওপর। আমার গাঁওয়ের যত জন যাদব, কৈরি, পাশি, চামার মজদুর এখানে আছে, তাদের প্রায় সবারই বুড়ো আঙুলের পাশে এই রকম লম্বা মতো দাগ। বড় হাঁসুয়ায় গায়-ভঁইসের ঘাস খুব তাড়াতাড়ি কাটতে গিয়ে প্রায়ই রক্তারক্তি। তুলসি দেখতে পায় সবুজ সবুজ বড় বড় ঘাস। কালচে ইস্পাত-রং কাস্তে দিয়ে তা কাটতে কাটতে কখনও ফসকে গিয়ে কেলেঙ্কারি। ব্যথা, যন্ত্রণা। লাল খুন।

ঐ যে লাইনে রিকশা চালায় সূরজ পাশি, যে নকশাল হয়ে গাঁওয়ে চলে গেছিল চাকরি ছেড়ে, ক্রান্তি করবে বলে— তারপর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বিহার-বাংলার মামলা মিটিয়ে সাত সাল পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রিকশাবালা। এখনও লিডারি করে রিকশা লাইনে। লেকিন তিরঙ্গা। দারু ভি পিতে হ্যায়, সাট্টা ভি খেলে। কা জানে আব উনকে আঁখো মে

ক্রান্তি কা সপ্পা হ্যায় ইয়া নহি ! খৈনি লেতে হ্যায় হামসে। পয়সা দে দেতে হ্যায় । উধার নহি মাংতা —উনকে হাথো মে ভি ওহি নিশানি —ওহ হাঁসুয়াকে দাগ । যো ঘাঁস কাট্‌নে কা সময়—মার খুন এ খুন —তুলসিদাস এসবই নিজের মনে ভেবে নিতে পারে । তুলসিদাস যাদব — কিনসিন জুট মিলের তাঁত বিভাগের একদা বদলিবালা । এখন খৈনি ব্যাচে ।

এই পিপলের ছায়া থেকে মসজিদের এলা রঙে রাঙানো গম্বুজটি চোখে পড়ে। পাশে ঐ রঙেরই মিনার । তার গায়ে নীল রঙের মাইক । মসজিদ থেকে খুব ভোরে ফজরের আজান অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে কাঁপতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশে যায় । একটা সকাল আসে। তখনই একটু দূরে শিবালা—শিবমন্দিব থেকেও —হয়ত ঠিক তখনই নয়, একটু পরে কাঁসর-ঘটার শব্দ এসে হাওয়ায় জড়িয়ে যেতে থাকে । এভাবেই দিন যায় ।

পবন মিশ্রা প্রায়ই বাসে বারাকপুরের মণিরামপুর ঘাটে নাহাতে যেত । তখন তার সঙ্গে গঙ্গাজল রঙের আট হাতি ধুতি, গামছা, আন্ডাবওয়ার । কোনো কোনো দিন আমিও গেছি গঙ্গাজি নহানে । বি. টি. রোড থেকে সরু ফালি রাস্তা চলে গেছে গঙ্গার দিকে। খেয়া-নৌকো পেবিয়ে ওপারে শেওড়াফুলি হাটে চলে যাওয়া যায় । তখন মোটর লাগান ভটভটি নৌকো হয় নি। মাঝি দাঁড় টেনে পারাপাব করে । এখন তো ভটভটি নৌকোয় বোঝাই হয়ে মানুষ যায় ওপারে । আসে । সঙ্গে সাইকেল । শেওড়াফুলি থেকে কুমড়ো বোঝাই নৌকো আসে এদিকে, গরমের সময়ে।

গেরুয়া জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পাড় ছোঁয় । নদীর কিনাবা থেকে অনেকখানি গঙ্গার বালি মাটি মেশান নরম । ডান পাশে চিমনি লাগানো ইটখোলা । তার ইট পোড়াবার ভাটি। ইটের জন্যে মাটি কাটা কুলি, কামিনদেব ব্যস্ততা । ছোট ছোট দু একটা কাঁচা বাড়ি । টালির চাল । পাঁচ ইঞ্চির ঘেঁষ-চুন বা সুরকি-চুনেব গাঁথনির মাথায় টালি চাপান । সন্ধেবেলা খেয়া ঘাটে একটি দুটি ইলেক্‌ট্রিক বালব জ্বলে ওঠে। পাশাপাশি বট অশ্বত্থ নয়ত পাকুড়ের বিশাল ছায়াল অন্ধকার । তার ডালে পাখিদেব কিচিমিচি, সন্ধে লাগার আগে । বাঁশ বেঁধে লাইন করে দেয়া আছে প্যাসেঞ্জাব যাওয়ার জন্যে । টিকিট ঘর । বছরের জন্যে যিনি জমা নিয়েছেন তার লোকজন সেই কাঠেব ঘরেব ভেতর। আবাব শেওড়াফুলি থেকে আসার সময় টিকিট না কেটে এপারে এসে খালি দশটা পয়সা নামিয়ে দেয়াব জন্যে কাঠের চৌকির ওপর একজন দুজন । নামে দু পয়সার ঘাট । বাড়তে বাড়তে দশ পয়সা—ইদানীং —এই ১৯৯২-এর ডিসেম্বর আরও বেড়েছে কিনা তুলসিদাসেব জানা নেই । বরং তার এও গুলিয়ে যায় বারাকপুরের লঞ্চ ঘাটে সে টিকিট ঘব দেখেছে, নাকি মণিরামপুরের খেয়াঘাটে—মাথার ভেতর জিজ্ঞাসা উঁকি দেয় । বারাকপুরের লঞ্চ ঘাট থেকে লঞ্চে শ্রীরামপুর যাওয়া যায় । মাঝে মাঝে গঙ্গার বুকে জল কমে এলে বন্ধ থাকে লঞ্চ । তখন মণিবামপুরের দু পয়সার খেয়াঘাট প্রচুর পাবলিককে এপার ওপার করায় ।

পবন মিশ্রার গঙ্গাজি নাহানা এমনি দিনে তো ছিলই । এছাড়া তিথি-নক্ষত্র দেখে দেখে। বিশেষ করে পিতৃতরের সময় । দুর্গা পূজার আগে । পনের দিন ধরে গঙ্গাজিতে মন্তর উন্তর পাঠ করে তিল-জল । কালো তিল । এই তিল-জল নাকি ভেসে ভেসে মিশ্রাজির চলবসা পিতাজি, মাতাজি, দাদা, পর-দাদা, নানা, পর-নানা, দাদি, নানি-সবার কাছে পৌছে যাবে ।

প্রতিবার পিতৃতরের শেষে পূজার আগে মস্তক মুণ্ডন করত মিশ্রাজি । ন্যাড়া মাথার গম্ভীর মিশ্রাজিকে তখন একেবাবে অন্যরকম লাগত । দাড়ি মোচ্ কিছু নেই । পরিষ্কার করে কামানো মুখ । লল্লু হাজাম বগল পর্যন্ত চেঁচে দিত মিশ্রাজির । মিশ্রাজি অবশ্য এমনিতেই লল্লু হাজামের কাছে সপ্তাহে একদিন হজামত হওয়ার জন্যে বসে হাত তুলে দিত ওপরে। শুধু জল দিয়ে বগলের লোম নামিয়ে দিত লল্লু । পায়ের কড়া কাটত নরুন দিয়ে । তারপর হাত-পায়ের নখ।

মিশ্রাজির পায়ের নখ ছিল খুব শক্ত । জল দিয়ে অন্তত আধাঘন্টা না হোক, মিনিট

পনের ভিজিয়ে রেখে তারপর নরুন দিয়ে আস্তে আস্তে। পেতলের ছোট বাটিতে জল। পেতল বাঁধানো বাটঅলা ক্ষুর—কামাতে কামাতে গম্ভীর লল্লু। তাকে দেখলে এখন কে বলবে হোলির এক মাস আগে থেকে এই এলাকায় ঢোল বাজিয়ে স্যা-রা-রা-রা-রা গান গাইতে গাইতে লওন্ডা নাচায় লল্লু। গান বাঁধে। প্রচলিত ভোজপুরী সুরের সঙ্গে কথা বসিয়ে বসিয়ে, নতুন নতুন বাণী—প্রতি বছর কথা পাল্টায়।

পবন মিশ্রার সঙ্গে কতবার আমিও গেছি গঙ্গাজি নাহানে। আমার ত্যায়রনা—সাঁতার তেমন আসত না, তবুও পুন্—গঙ্গাজিতে ডুবকি লাগালে সব পাপ ভেসে যায়। তখনও তো গঙ্গাজলে তৈরী 'গঙ্গা' সাবান আসে নি বাজারে। টি.ভি. বিজ্ঞাপনে 'ও গঙ্গা সাবুন সে স্নান কর ...' এইসব গানের লাইন যা কিনা ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার ও ফিল্মস্টার ঋষিকাপুর আর আরও কোনো সুন্দরী হিরোইন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠতে পারে। আর বি. টি. রোডের ওপর সেই যে বড় হোর্ডিং — খৈনি কুচোতে কুচোতে তুলসিদাস মনে করার চেষ্টা করে —সম্পূর্ণ গঙ্গা জলে তৈরি—এই বাংলাটুকু তার মনে থাকে, লল্লু হাজাম তাকে পড়িয়ে শোনায়। আসলে লল্লুর ঘরে টি.ভি.-তে একদিন গঙ্গাজলে তৈরি সাবানেব বিজ্ঞাপনে নাচাগানা করা লোকজন -লল্লুই বলে, ও সুনীল গাভাসকার, এ ঋষিকাপুর, এ ফলানা, ও ঢেকানা — সব নাম মনে থাকে না। আর সেই সাবুনের খোসা হোর্ডিংয়ের গায়ে বড় ছবি হয়ে ফুটতে দেখে লল্লুকে জিগ্যেস করলে লল্লু জবাব দেয়—আবে উতো ওহি গঙ্গাজলি। গঙ্গাপানি সে বনা হুয়া সাবুন। গঙ্গাজিকা পানি। বিশুধ্। ম্যায় তো ওহি ইস্তেমাল করতা হুঁ সহি।

লল্লুর হাতে তখন হাজামতের বাক্স নেই। পবনে টেরিকটেব ফুল প্যান্ট। গায়ে বুক-কাটা ফুলশার্ট, টেরিকটের।

হম তো শিখ্সিত না হো—তুলসি তার অক্ষর পরিচয়টুকু জানায়, যাতে হনুমান চালিসা পড়া যায়, তুলসিদাসজির রামচরিত মানস বড় জোর, তাও বানান কবে কবে —ঐ যে আছে না —

নবমি ভৌমবার মধুমাসা
অবধপুরি ইয়া চরিত প্রকাশা।
যেহি দিন রামজনম শ্রুতি গবাঁহি
তিরথ সকল তা হি চলি অবাঁহি ॥

বালকাণ্ডের এইসব লাইন মনে পড়লে খৈনিবালা তুলসিদাস এমনটি ভাবে, চৈত্রমাসের দ্বিতীয় ভাগের নবম দিনটিতে, মঙ্গলবারে রামচরিত মানস লেখা শুরু করেছিলেন সন্ত তুলসিদাস। ও তো সব ওহি কিতাব মে হ্যায় —

লল্লু হাজামেব দেখাদেখি গঙ্গাজলে তৈবি সাবান কিনে আনে খৈনিবালা তুলসিদাস। খোসা ফেলে দিয়ে লাইনের কলে বালটি পেতে চান করতে করতে নিজেকে অসম্ভব শুদ্ধাচারী, পবিত্র মনে হতে থাকে। সে তো আরও পরের কথা। আর এখন এই সকালে ক্যাটকেটে হলুদ রঙের দেয়ালের গায়ে কালো কালো অক্ষরে লেখা দাদের মলম জালিম লোশন-এর বিজ্ঞাপন, পাশে সুফলা ইউরিয়া আর রেমণ্ড সিমেন্ট—যার গাঁথুনিতে পাহাড় ও লৌহার গুণ সমপরিমাণে—এমনটি বলা হয় —সে সব কিছুই দেখতে পায় না তুলসিদাস। খালি এই মরাধরা রেল লাইনের ওপর দিয়ে মাইক বাজানো রিকশায় দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন-চিৎকার গড়িয়ে যায়।

জুট মিল থেকে পাওয়া সরু লম্বা বড় ছুরিতে শাক কাটছিল তুলসিদাস। পালককে শাক। চুলহায় তাওয়া বসানো। গরমা গরম রোটি সেঁকে নেবে। ব্যস, বাঁচতে আর কি লাগে! শাক কাটতে কাটতে গঙ্গা সাবুন সে স্নান করো... রোজ গঙ্গা সাবুন সে স্নান করো.. এরকম কিছু একটা গান গাইছিল তুলসিদাস। গতকাল মুলিকে শাক অওর রোটি— ছিল। আজ পালককে শাক। রাম যে দিন যেমন মাপায়। শাকবালার কাছ থেকে দশ পয়সা দিয়ে একটা

লাল টমাটর এনেছে তুলসি। সোয়াদিস্ট হবে পালককে শাক। গরমা গরম শাক আওর রোটি —

মিল বন্ধ হওয়ার পর দিহাত যাওয়ার জন্যে তাকে অনেকে বলেছিল, ঘর যাও। ক্ষেতি জমিন, ক্ষেত-খলিহান, গায়-ভঁইস। আরে, ইয়ে সব তো শুননে মে হি মজা আতা হ্যায়। রামজিনে দিয়া কেয়া! মিল বন্ধ হওয়াব পর সাত্তুবালা জগদীশ চলে গেল টিশান ধারে। ব্যাটারির বাক্স, লোটাভর পানি, ইমলির চাটনি, অ্যালুমিনিয়ামের থালা কয়েকটা। লোটাও অ্যালুমিনিয়ামের। আগে থালা, লোটা-সব ছিল পেতলের।

প্রায়ই শুনি, লাইনের এই ঘর থেকে আমাদের তুলে দেবে। এখানে বড় বাজার হবে। মাথা উঁচু ফেলাটি বাড়ি। বইস আদমিরা থাকবে। লেকিন হমলোগ যায় গা কাঁহা! হম খৈনিবালা তুলসিদাস, সত্তুবালা জগদীশ, চানাবালা সুরিন্দর, দাঁতুইনবালা সুলেমান!

পালংশাকের তরকারির ভেতর ছুরিতে চাবফালা টোম্যাটো ছেড়ে দিতে দিতে নিজেকেই নিজে জিগ্যেস করছিল তুলসিদাস। হর এলেকশানেব আগে বাজাবে শোনা যায়, এবার মিল খুলবে। আবার নটায় কলের বাঁশি। তাবপর এক ঘন্টা ছাড়া ছাড়া তিন শিফটের কাম। ইউনিয়ন আপিস গরম। শবাবের দুকান গরম। বাণ্ডীপাট্টি গরম।

যো দিন হফ্তা মিলে মজদুর মুরগা খরিদে। ঘর মে বানায়। নহি তো খাসি কে মাস্। ঘরমে খুশবু। যো পিতে হ্যায় ও লায়ে শরাব কা বোতল। পি পিকে মস্ত হই যাওয়ে। হম শরাব নহি পিতে হ্যায় রামজিকা কিরপা মে। লেকিন এহি রহে যায়ে। কিংসিং জুট মিলকে লাইন মে। চুনাও আতে হ্যায়, যাতে হ্যায়—চুনাও কা টেইমমে নেতা লোগ ভাষণ দেতে হ্যায়—মিল খুলনে হোগা। মিল খোল দেঙ্গে। সবকো পাবমিশ্ট করনে হোগা। মজদুর লাই —মে পানি জাদা দেনে হোগা-টাট্টি, নরোয়া —সব সাহি সাহি সাফাই—ইঁয়ে সব সপ্না।

উনোনে পালংয়ের তরকারি। আর একটু শুখা হয়ে গেলেই তুলসিদাস একে বলবে, পালক-ভাজি। আর এখন লোহার খুন্তি দিয়ে শাক নাড়তে নাড়তে, সেদ্দ হয়ে ওঠা শাকের সুঘ্রাণে ঘরের বাতাসে খিদের গন্ধ ছড়িয়ে গেলে তুলসিদাস এমনটি ভাবে, ইলেকশান এলেই সবাই অঙ্ক কষে। মজদুর লাইনে অবাঙালি শ্রমিক থাকলে কোন দলের সুবিধে, না থাকলেই বা কার ফয়দা—তা নিয়ে এক জটিল অঙ্ক। তুলসিদাস জানে না এসব নিয়ে আখবারে পত্রকার, আখবারবালোঁ নে গম্ভীর গম্ভীর সমীখ্সা তৈরি করে। আর এমন সব ভাবনার ভেতরই তার কড়াইয়ে পালং শাকেব জল শুকিয়ে যায়।

খাবার মুখে তোলার আগে ছেঁড়া রুটিতে পাকানো পালককে ভাজি কপালে ঠেকিয়ে নেয় তুলসিদাস। রামজিনে দিয়া, মালিক যো দে ওহি সাহি—মনে মনে বলতে বলতে তার মনে পড়ে দিহাতে তার নিজস্ব ঘরটির পড়ো পড়ো অবস্থা। খত্ এসেছে কয়েকদিন আগে। ঘরে মিট্টি দিতে হবে। চালে এই শীতে নতুন খাপরা, ভাটিতে পোড়ান হলে তা দিয়ে ঘরের মাথা ছেয়ে নেয়া। জরু রামপিয়ারি লিখেছে, মায়ের কোমর মে বহুত দর্দ। কালকাত্তাসে কই দর্দ নাশক তেল। আসলে বৌ তো চিঠি লিখতে পারে না। ভাতিজা রামাধবকে দিয়ে লেখায়। হাইস্কুল পাশ করেছে। মণ্ডল কমিশন পুরা লাগু হলে ভাতিজার নোকরি হয়ে যাবে—এমন কথা গত নির্বাচনে বক্তার মাইক থেকে শুনতে পেরেছিল খৈনিবালা তুলসিদাস যাদব। আসলে ফরওয়ার্ড আর ব্যাকোয়ার্ড—বর্ণহিন্দু আর পিছড়েবর্গের মধ্যে ক্রমাগত যে সংঘর্ষ তার শিকড় তুলসিদাস যাদব জানে না। তবু তাব মনে পড়ে অ্যাযসে তো হমলোগোঁনে হরিজন, অচ্ছুৎ নেহিথা। বামহন, ভূইহার, ছত্রী ঠাকুবলোগোঁনে হমলোগনকে হাত কা পানি পিতে হ্যায়—তার এই ভাবনার সঙ্গে গ্রামের হরিয়ালি, কোনো ম্লান গোধূলিতে ঘরে ফেরা গোরু-মোষের গলার ঘন্টারবে-ধ্বনি নয়, রবই—একসঙ্গে এতগুলো গলার ঘন্টা-তার মনে পড়ে পেছনে সূর্যাস্তের আভা লাগা আকাশ, সেখানে বেলাশেষের আগুন, সে দিকে পিছন কবে গোয়ালে ফিরে আসা সিল্যুট মোষের পাল, মাথার নিটোল শিঙে দিনান্তের খুন-খারাবি- আলো কালো মোষেবা ঘবে ফিরছে-কবে যেন তারা অবণ্যভূমি ছেড়ে পোষ মানতে বাধ্য হয়েছিল মানুষের বাথানে, সেই বন্দি অরণ্যেব স্মৃতি—ঐসব গলা থেকে ছিটকে আসা ডাক-পাশাপাশি লম্বা, উঁচু গোরুরা, সবাই ঘরে

ফিরছে। তাদের কারও কারও গলায় বড় বড় রঙিন পুঁতির মালা। তাদের খুরে খুরে উড়ে যাওয়া শীতের লাল ধুলো—দিন বড় তাড়াতাড়ি মুছে আসে।

অব ঘর যা-কে কা করে হম ! না ক্ষেতি না জমিন, না ভঁইস। হ্যায়, লেকিন ইতনা তো হ্যায় নেই—যিসসে সাল ভর চলে। তাছাড়া একবার এই শহর ছেড়ে লাইনের অধিকার ছেড়ে চলে গলে ঘর পাব কোথায় ! এতদিন বাদে দেহাত—কাদা কিচড়, অনধেরা। শাম ছে সাত বাজে শো যাও। সুবে চার বাজে বিস্তর ছোড় দো। রুটি চিবনোর ফাঁকে গালে কামড় খেল তুলসিদাস। এখানে থাকলে তবু ভোটার লিস্টে নাম থাকে। রেশন কার্ড বেঁচে থাকে। যদি কোনো দিন মিল খোলে 'তাঁত' আবার চালু হবে। মাকুর খটাখট। উড়ে যাওয়া পাটের আঁশে আঁশে দম আটকানো বাতাস। ভেতরে কম পাওয়ারের ডুমে সব সময়ই মেঘলা মতো আলো। আবার হফতা। লাইনে দাঁড়িয়ে তন্‌খা নেয়া। ওভার টাইম। ই এস আই কার্ড। বন্ধ হওয়ার পর কয়েক মাস তো আমরা মাইনেও পেয়েছি। তুলসিদাস শাক মোড়া রুটি চিবোচ্ছিল।

সেই এক আশা—যদি খোলে মিল—আবার সব ঠিক হো যায়ে গা —

লেকিন হম পারিমন্ট নহি—বদলিবালা—খোলনে সে ভি হমারা ফয়দা কা ! ওহি তো ব্যয়ঠায় দেঙ্গে কুছ দিনো কা বাদ। যাতে না পাবিমন্ট হই। পহেলে ঠিকেদার লোগ মজদুর লাতা—আব—সামান্য পালংশাক লেগেছিল আঙুলে। খেয়ে ওঠার আগে জিভ দিয়ে তা খুব মন লাগিয়ে চাটছিল তুলসিদাস। বাইরে ফালি চাঁদের গায়ে কুয়াশা ঝুলে আছে। হিম মাখা বাতাস একটু একটু করে ঢুকে পড়ছিল ঘরের ভেতর। নিচু এক কামরার ঘরে কতদিন পোতাই হয়নি দেয়ালে। কে করাবে চুনকাম ! মেঝেয বড় ঠাণ্ডা। কয়েকটা চটের বোরা আছে। সেই বস্তাদের ওপর তুলসিদাস যাদবের বিস্তর। খাওয়ার পর লেটে গেলেই ঘুম। পিঠের নিচে বন্ধ চটকলের বস্তা। মাথার নিচে গায়ের ওপর। এখন তা থেকে ড্যাম্পের প্রচীন গন্ধ। ঘবেব সামনে এক ফালি নিচু সিমেন্ট বাঁধানো রোয়াক। তার ওপরের সিমেন্ট পালিশ অনেকটাই খুবলে গেছে। সেই খুবলোনোব পাশাপাশি ফাটলের কালচে দাগ। তার নিচে চওড়া নর্দমা। মিল বন্ধ হওয়াব পর লাইনের ঘরে জেনানা লোগ তেমন আর কেউ নেই। দু চারজন যারা থেকে গেছে, তাবা দূরে বর্তন মাজতে যায়। কেউ কেউ কাপড় কাচুনি, বাবুদের বাড়ি। পুরনো কাগজেব ঠোঙা তৈরি কবেও ব্যাচে । তাও তো কাগজের ঠোঙা এখন তেমন চলে না। সব পলি প্যাক। আলু ভি সবজি ভি, মশালা ভি, চাওল ভি। তবু ঠোঙা নেয় মুদি দোকানে।

কুয়াশামাখা চাঁদেব আলো পড়েছিল মজদুর লাইনের রোয়াকে। ফাটা সিমেন্টের ভেতর জ্যোৎস্না ঢুকতে পারে না। তার ঘোলাটে আলোয় দোতলা মজদুর লাইনের নিচু নিচু ঘর, রং উঠে যাওয়া দেয়াল, জানলার চৌখপ্পি—সব মিলিয়ে এমন একখানা ছবি, যা দেখার জন্যে মহল্লার দু চারটে কুকুর ছাড়া এখন আর কেউ নেই। তারা ঘোলা চাঁদের দিকে মুখ তুলে মাঝে মাঝে নিজেদের ভাষায় কেঁদে ওঠে। খালি খানিকটা দূরে চটকল মজদুর ইউনিয়ন অফিসের বোর্ডটি, তার রেজিস্টার্ড নম্বর সহ কুয়াশামাখা চাঁদের ফোকাসে ঝিম মেরে পড়ে থাকে। তার সামনের দেয়ালের ছায়াটি ভাঁজ হয়ে সরু গলির ওপারে যেদিকে লাইনের কল—পায়খানা — সেখানে মেশে।

এমনই কোনো শীতের রাতে সন্ত তুলসিদাস তুলসিঘাটে রামমন্দিরে নিজের হাতে দেওতার আরতি করছিল। তার বয়েস হয়েছে। ভারি প্রদীপ তুললে হাত কাঁপে। হিন্দুস্থানে এখন বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমত। তবু এই শীতে অস্‌সি-গঙ্গা সঙ্গমে শীতের পাখি। আমি সন্ত তুলসিদাস। হিন্দুস্তানের পড়িলিখি আদমি আমায় ডাকে সন্তকবি নামে। বাবর বাদশা হিন্দুস্তানে আসার তিন বছর আগে আমার জন্ম, ইসাই সাল ১৫২৩। বাঁদা জেলার রাজপুর গ্রামে। আমরা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ।

শীতে কুঁকড়ে যাওয়া চাঁদ ভেসেছিল কাশীর গঙ্গায়। রাত বেড়ে যাচ্ছিল বাদশা

জাহাঙ্গীরের হিন্দুস্থানে। বয়েস হলে ঘুম কমে যায়। শেষ রাতে জেগে গেলে সন্তকবি একা একা ভাবছিল আমার বাবার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী। আমার গুরু নরহরি দাস।

চাঁদের টানে রাতের নদী বুঝি বা সামান্য চলকে ওঠে। তার গেরুয়া স্রোতে আকাশের চাঁদও ভেসে যায়। কোনো এক বর্ষার রাতে আমি এরকমই এক নদী পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলাম রত্মাবলীর কাছে। আমার বিয়ে করা বৌ রত্নাবলী।

সে গল্প এখন মুখ মুখে চালু সারা দেশে।

পাথরের দেয়ালে ঠাণ্ডা জাপটে ধরে। সেই শীত গরম কম্বল ভেদ করে বুড়ো হাড়ে বিঁধে যায়। চাঁদ ভাসা গঙ্গার ঘাটে আছড়ানো ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বুঝি বা কানে আসে সন্তকবির, এই আধো-ঘুমে, আধো-জাগরণে।

রত্নাবলী বলেছিল, যে আবেগ, বিরহ নিয়ে তার কাছে ছুটে গেছি, সেরকম আবেগ, আর্তি যদি আমার থাকত রামের নামে! হায় রাম! বুক ভাঙল তুলসিদাসের।

কোথায় যাইনি—মথুরা, বৃন্দাবন—শেষে অযোধ্যা। সরযূ নদীর তীর। অপ্রশস্ত, প্রচীন সব রাস্তা; অনেক মন্দির। আব হনুমান। বড় বড় হনুমান। তুলসিদাসের সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। রামচরিত মানস লেখা শুরু করলাম অযোধ্যায়, আমার বয়েস তখন বাহান্ন। রাম জন্মভূমি সে যদি কোথাও থাকে, তাতো আমাব হৃদয়ে। এই হৃদয়-মন্দিরেই আসন পেতে আছেন পুরুষোত্তম রাম। তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যায় খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এক কাত হয়ে শুয়ে থাকা প্রাচীন মানুষটির চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। এখন হঠাৎ হঠাৎ এমন হয়। কোনো আবেগ চট করে ধাক্কা দিলেই জল-অশ্রুরেখা। একা একা ফুঁপিয়ে উঠল গোস্বামী তুলসিদাস। তারপর গায়ের কম্বলে নিজেকে আরও ভালো করে ঢেকে নিয়ে ভাবতে লাগল চৈত্র মাসের আধাআধি সময় পেরিয়ে এসে মঙ্গলবার শুরু করেছিলাম বামায়ণ রচনা। তার আগে যমুনার পারে আগ্রার সঙ্গে আমাব দেখা হয়েছে। দেখেছি গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রয়াগ। আকবর বাদশা যার নাম দিয়েছেন ইলাহাবাদ।

সুনি সমুজাহিঁ জন মুদিত মন
মাজ্জহিঁ অতি অনুরাগা।
লহঁহি চারি ফল অদ্ভুত তনু
তিরথরাজ প্রয়াগ।'

নিজের লেখা বালকাণ্ডের এই চৌপাইটি মনে মনে উচ্চারণ করে আবারও চোখে জল এলো তুলসিদাসের। এ চৌপাই আমারই লেখা, বামায়ণেব বালকাণ্ডে আছে। আমি তো আমার কল্পনা মতো রাম আর সীতার দেখা করিয়ে দিয়েছি তাঁদেব বিবাহের আগে। মনে হয়েছে এমন হলে মন্দ কি! অযোধ্যার গলি গলিতে ছানবিন কবে কোথাও সেই শ্রীরামেব জনমস্থান খুঁজে পাই নি। অনেক অনেক বছর ধরে বয়ে যাওয়া সরযূ নদী, তাব ঘাট, অলিগলিতে শাক্যমুনির ধর্মের সন্ন্যাসীদের স্তূপ—কারা যেন বলেছিল, এ সেই সাকেত নগরী—যেখানে শাক্যমুনিব ধর্ম নেয়া মাথা ন্যাড়া শ্রমণরা, ভিক্ষু-ভিক্ষুনীবা — যাঁদেব পরনে চীবর।

চারদিকের পাথরের শীতল দেয়াল। মাঝখানে পাথরের মেঝেতে এক সন্তকবি। এখন তার চোখের সামনে সরযূ নদীর বহে যাওয়া। তার ঘাট। আশেপাশে ছড়ানো শাক্যমুনির ধর্ম নেয়া মানুষের উপাসনার জন্যে অনেক স্তূপ। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আনাগোনা। সন্ন্যাসী কমছে। অনেক কমে গেছে। এক সময় এসব গম গম কবত।

রামাযণ—রামচরিতমানস লেখা শুরু কবেছিলাম অযোধ্যায়। অবধি ভাষায়-পূর্বী হিন্দিতে। রামচরিত্র রূপ মানস সরোবব, তাতে সাঁতাব দেবে শ্রদ্ধাশীল ভক্তজন। আমি তো তাই চেয়েছি। তবু হলো কই!

একটু আগে যে চৌপাইটি মনে মনে আওড়াচ্ছিল তুলসিদাস, তা আবারও মনে পড়ল।

কাশী নয়, অযোধ্যা নয় —তীর্থরাজ বলেছি আমি প্রয়াগকে। আমার এই কাব্য পড়ার পর সাধারণ মানুষও ভবিষ্যতে হয়ত তাই বলবে। তখন হয়ত মোগল বাদশার হুকুমত থাকবে না। আকবর বাদশা নেই। জাহাঙ্গীরও থাকবে না। আমিও থাকব না। সময়ের স্রোত রেহাই দেয় না কাউকেই। দিন বছর মাস যাবে। ভাবতে ভাবতে নিজের কাত পাল্টাল তুলসিদাস—ঐ কম্বলের ভেতরই। আমি থাকব না, এ বাদশাহি থাকবে না। তবু হিন্দুস্তানের আকাশ-বাতাস এরকমই থাকবে। নতুন মানুষ আসবে। সারাদিনের ক্লান্তি, থকাবটের পর, কাজ-কাম সেরে তারা সামনে একটু আলোর ব্যবস্থা করে রামচরিত মানস পড়বে। পড়তেই থাকবে। আমি বেঁচে থাকব।

এই শীতের শেষ রাতে এক জন কবি, আলো ঘিরে গোল হয়ে বসা কয়েকজন মানুষের কালচে শরীর, একটু দূরে ছড়িয়ে যাওয়া তাদের কাঁপা কাঁপা ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। সেই মানুষেরা রামচরিত মানস পড়ছিল, শুনছিল। দুলছিল। কবির চোখ তো এমনই স্বপ্ন দেখে।

নিজেকে ঘুমের আঠার ভেতর জড়িয়ে ফেলে তুলসিদাস যাদব এত সব দেখতে পাচ্ছিল না। তার মনে পড়ছিল ঘরে আমার বৌ আছে। বৌ খত্ ভেজি। চিঠি অনুযায়ী ছাদে খাপরা ছাইবার জন্যে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তার মনে পড়ছিল কারখানা বন্ধ হওয়ার আগে মেন গেটে তোলা কয়েকটি নারা—যো হামসে টকরায় গা/চুরচুর হো যায় গা—বোল মজুরে হল্লাবোল —হল্লাবোল হল্লাবোল, জোর জুলুম কা টক্কর মে/সংঘর্ষ হমারা নারা হ্যায়। আমার বৌ রামপিয়ারি মেথি ভাজা মশলা দিয়ে খুব ভালো তরকারি রাঁধে বেগুনের। আমি পারি না। রসুন দিয়ে, ঘি আর শাদা জিরে পোড়া দিয়ে দারুণ সোয়াদিস্ট অড়হড় ডাল। যা দিয়ে রুটির থালা সাফ হয়ে যায়। চওড়া চওড়া হাত রামপিয়ারির। দুহাতে কালো উলকি। অক্ষর জ্ঞানহীন আনপড়। সারা দিন গায়ে গোয়াল আর গোবরের গন্ধ থাকে — তবু কুয়াশা চাপা চাঁদের আলোয় স্বপ্নে তাকে বার বার মনে পড়ছিল খৈনিবালা তুলসিদাসের। কোথায় টাকা পাব, কাঁহা রুপেয়া। বাইরে চাঁদ হাসছিল। তার মুখে কুয়াশার আড়াল।

সকাল সকাল খৈনির বাজার তেমন জমে না।

একটু বেলা বাড়লে, রোদ্দুর আর একটু ঘন হয়ে উঠলে দু এক জন দু এক জন করে খরিদ্দার। তুলসিদাস মনে মনে রামচরিত মানসের কোনো সুর ভাঁজছিল। সকালে খৈনি কুচোতে কুচোতে মুখই বা চুপ থাকে কেন! তার সামনে দাঁড়ান দাঁতুইনবালা সুলেমান খৈনি চায়।

দেখ্ সুলেমান, বাকি খা-লেকিন উধার মত্ চা-নিজের রসিকতাতে নিজেই দাঁত বের করে তুলসিদাস। তার হাতে হাতে খৈনি কোটা চলতে থাকে। এরপর চানাবালা সুরিন্দর এসে দাঁড়াবে।

শীতের এমনই এক সকালে কাশীর অসসি ঘাটে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবছিল সন্ত তুলসিদাস। দূরে দূরে শীতের পাখিরা নেমেছে গঙ্গার চরে। সেখানে শাদা বালির ওপর নরম রোদ। তুলসিদাসের মনে পড়ছিল এখানে এসে আমি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড লিখছি। নদীর বুকে রোদ পড়ে চিক চিক করে উঠছিল। গেরুয়া জলে ভেসে যাচ্ছিল মন্দিরের ফুল। বাসি মালা। কাল সন্ধের আরতির কথা মনে হচ্ছিল তুলসিদাসের। থালার ওপর কর্পূরের-আগুন, তার কালচে ধোঁয়া। শাদা সুগন্ধী কর্পূর, তার ঠোঁটে সোনালি আগুন নাচছিল। থালার ওপর কর্পূরের আগুনে দেবতার আরতি হচ্ছিল। একশো বছর অনেকদিন পেরিয়ে এসেছি আমি। হিন্দুস্তানের তখত এ তাউস-এ আকবর বাদশা সরে গিয়ে জাহাঙ্গীর — আমার কাব্য কি সময়কে অতিক্রম করে যেতে পারবে!

দূরে গঙ্গার ওপর রোদ নাচছিল। আকাশে পাখির ঝাঁক চলে যাচ্ছিল আরও দূরে কোথাও।

বয়েস হলে শীত বেশি লাগে। গঙ্গার হাওয়ায় সেই সত্যটি বুঝতে পারছিল সন্ত তুলসিদাস। তার মনে হলো — কতই তো হলো জীবনে। এই শীতে বড় বড় আখের নৌকো

লাগছে ব্যাপারী ঘাটে। মণিকনিকার ঘাট থেকে উড়ে আসে মড়া পোড়ান ধোঁয়া। সেখানে অফিঙের জল খাইয়ে জোর করে সতীদাহও হয়। এদিকে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে দূর দূর থেকে মৃতদেহ পুড়তে আসে। পাশে ডোমপাড়া। গঙ্গার স্রোতের টানে সন্ত কবি কত কি ভেসে যেতে দেখতে পাচ্ছিল। সে কি জীবন, সেকি যৌবন, সে কি ধন মান ?

এ দুনিয়ায় তো কিছুই থাকে না। থাকবে না। তবু যদি কাব্য থাকে—রামের নামে। যাঁকে কল্পনায় আমি আমার হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছি। তাঁব জন্ম তো এইখানেই, এই বুকের গভীরে। তুলসিদাসের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। সেদিন হবিভক্ত বহিম আমার সামনে এসে—দাঁড়ালে অনেক কিছুর সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছিল চুহা-বিমারির কথা। শিবের ত্রিশূলেব মাথায় বসান এই কাশী নগরীর মানুষজন মরে যোত, হয়ে গেল। মহল্লাকে মহল্লা ফাঁকা। বাড়ি-ঘর, রাস্তা-সব সুনশান। আমার বাঁ হাতটাও কমজোবি হয়ে গেল চুহা-বিমারিতে। চুহা মরে। মানুষ মরে। আমি বেঁচে গেছি—শ্রিফ ওহি রামজিকে কিরপায়। রহিমকে সে কথা বলেছি। রহিম তো হরি নামে বাঁচে। ঐ নামে চোখের জল ফেলে।

আর কতদিন। আর কত দিন ! এইভাবে জীবন বয়ে হাঁটব —তুলসিদাসের চোখের সামনে নদীব ছোট ছোট গেরুয়া ওঠা-পড়ায় সূর্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। শীতের গঙ্গা বড় সাফ-সুতবো। মানুষ তো এই জলই খায়। নিজের জীবন বাঁচিয়ে রাখে।

সংবত ১৫৩১, অযোধ্যায় রামায়ণ লেখা শুরু কবেছিলাম, আর এখন কাশীতে দাঁড়িয়ে শেষ করব। তাবপর আব একটা লেখা, বিনয়পত্রিকা—ভেবে বেখেছি। পাপ, দুঃখ আর গরিবি —এই তিন কারণে দুনিয়া জ্বলছে। এসব কথাই বলব বিনয়পত্রিকায়। তুলসিদাস তাব সামনে গঙ্গার বুক ছুঁয়ে একটি বজরা চলে যেতে দেখল ঠিক তখনই। ময়ূরমুখী সেই বজবাব ছাদে একজন বন্দুকধাবী বরকন্দাজ।

সকালে লাইনেব ঘবে ঘুম ভেঙে গেলে খৈনিবালা তুলসিদাস যাদবেব প্রথম চিন্তা আসে — আজ লাইনেব কলে জল আসবে তো ! খুব সকালেই পায়খানা আব জলেব কলে বড় লাইন। নাহানা-ধোনা সেবে একটু বামচরিত মানস পড়ে নিয়ে পিপলেব নিচে খৈনি-চুনা নিয়ে বসা। আজ কাল 'গঙ্গাজল সে'-বিশুধ্ গঙ্গাজল সে বনা হুয়া সাবুন ব্যবহাব করে তুলসিদাস। অনেকদিন মনিবামপুব ঘাটে যাওয়া হয না নহানে। এমন কি পিত্তবেব সময়েও না।

পায়খানায় বড় লাইন ছিল। জলের কলেও। এমন তো বোজই হয। আর আজ পোড়া লালচে মলাটের ওপর কালোবঙেব দেবনাগবী হবফে লেখা রামচবিত মানস পড়বার আগে-মলাট খুলে পাতায় যাওযার আগে তুলসিদাস সেই কিতাব মাথায় ঠেকাল।

সুব কবে পড়লে নিজের মনে বেশ লাগে। যেমন সকালে উঠে হাত পা নেড়ে খানিকটা কসরত কবলে শরীব ঝরঝরে তাজা-- এও সেবকম আর কি। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল তুলসিদাস। সেই কবে যেন পবন মিশ্রা তার ঘরে রামচরিত মানস পড়ত সুর করে। ঘরে খুসবুদার আগববাত্তি। পড়তে পড়তে ঘোব এসে যাচ্ছিল তুলসিদাসেব।

তারপর এক সময় এই পাঠ সমাপ্ত হলে নিজেব ব্যবসাপাতিব জিনিস গুছিয়ে নিয়ে অশ্বত্থ গাছের নীচে এসে বসছিল। শীতেব সকাল রোজ যেমনটি হয়ে থাকে আজও তেমনই। কাঠের উপর ছুরি দিয়ে খৈনি কুটতে কুটতে তুলসিদাস ভাবছিল বৌ চিঠি দিয়েছে। ঘরের চালের খাপবা বদলানো দরকার। কিছু টাকা পাঠাতে হবে।

কা হো ভকতজি—জয় রামজিকি—। চায়বালা বেণীনন্দন সাউ — তুলসিদাস মুখ তুলে দেখতে পায়।

সকাল সকাল বেণীনন্দনের কপালে হলুদের টীব। মুখে পান।

দেও আঠ আনে কা — বলতে বলতে বেণীনন্দন তাব চুনৌটি এগিয়ে দেয়। ঘব যা রহে হো কা ?

তুলসিদাস ঘাড় নাড়ে — নাহি। তার হাত খৈনি কুচোতে থাকে।

কমলকে ফুল খিলেঙ্গে। মন্দির ওহি বনেঙ্গে — বেণীনন্দন নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল।

মন্দির, কিসকে মন্দির ? বার দুই কথাটা শোনার পর তুলসিদাসের জিজ্ঞাসা।

আরে ওহি রামজিকা মন্দির অযোধ্যা মে। করসেবা হোতে যা রহে হ্যায় — আখবার তো পড়তে নহি কা ?

নহি। খরিদনে কা পইসা কাঁহা ! তুলসিদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আরে মেরে দুকান পে তো আতা হ্যায় —

তুলসিদাস চুপ। কোথায় অযোধ্যা, কোথায়ই বা রাম মন্দির ! কারাই বা বানাবে। জালিম লোশনের বিজ্ঞাপন লেখা হলুদ পাঁচিলের ওপর একটা কাক ডাকছিল। অনেকক্ষণ।

জোরে জোরে। চুপ বে কাউয়া। বলে বেণীনন্দন ঢিল ছুঁড়ল। কাক ডানা ঝাপটে একটু দূরে গিয়ে বসে আবারও ডাকতে লাগল।

ম্যায় ভি যাউঙ্গা করসেবা মে — সোচ রহা হুঁ — বলতে বলতে বেণীনন্দন পানের পিচ ফেলল রাস্তায়। ধুলো মাখা জর্দার গন্ধ ঘুলিয়ে উঠল। কাটা খৈনি আর চুনের ডিব্বার দু দিক ভর্তি করে দিচ্ছিল তুলসিদাস। পয়সা মিটিয়ে বেণীনন্দন চলে যাবে। আরও খানিকক্ষণ পর চানাবালা সুরিন্দর, দাঁতুইনবালা সুলেমান আসে খৈনি নিতে।— হাঁ জি শুনতে হো। ইয়ে লাইন কা কামরা অব মালিক নে তোড়োয়াঙ্গে। য়ঁহা মকান বনেগা। ফেলেট। মার্কিট। বেঙ্ক।

তুলসিদাস আগেও অনেক বার শোনা একথায় তেমন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু দুপুরে লল্লু হাজাম, তার হজামতেব বাক্সটি নিয়ে ফুসুর ফুসুর করে বললে যা দাঁড়ায়—তা এইরকম—

১) মিল আর খুলবে না।

২) লাইনের ঘরবাড়ি সব মালিক কোনো করোড়পতি আদমি কো বেচ দিয়া

৩) য়ঁহা উঁচা উঁচা মকান বনেগা। আঁরেজি ইস্কুল। মার্কিট। বেঙ্ক।

৪) ইউনিয়ন—দোনো হি ইউনিয়ন—ইয়ে সব শর্ত মান লিয়ে

এই চারটি কথা বলে পাঁচ নম্বর জিজ্ঞাসাটি করে লল্লু—আখির হমলোগ কা হোগা কেয়া ?

তুলসিদাস তাও জানে না। সে চুপ করে থাকে।

তো ইয়ে লাইন হর্ম লোগোন কো ছোড়নে হোগা। চুপচাপ। বিনা কিসি বাতচিত সে। আখির হমলোগ যায়েঁ কাঁহা—অগর চানাবালা সুবিন্দার, দাঁতুইনবালা সুলেমান, লল্লু হজামের বাত সাহি হো তো —

সারাদিনের খেলাধুলো শেষ করে সূর্য তার লাল জামাটি খুলে উড়িয়ে দিয়েছে আকাশের গায়ে। অশ্বত্থের ধুলো মাখা কালচে সবুজ পাতায় পাতায় গোলা সিঁদুরের রং। আকাশে গায়ে যেটুকু খুন-খারাবি, তার ওপর দিয়ে পাখির ঝাঁক কালির ফোঁটা ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলে যাচ্ছিল। এই পাখিরা শীতে কত দূর থেকে উড়ে এসেছে। কাছাকাছি কোনো জলায় বা মাঠে নামবে। খৈনি ব্যাচায় মন বসছিল না তুলসিদাসের।

আখির হম লোগ রঁহে কাঁহা —ইয়ে শহর মে-কিরায়া মকান—ও তো সোচনে কা ভি বাহার হ্যায়। তুলসিদাসেব এমন ভাবনার ভেতরই তার হাফ শার্টের বাঁ কাঁধে পায়খানা করে দিল অশ্বত্থ ডালের কোনো পাখি।

গরম মতো কিছু স্পর্শ টের পেতেই তুলসিদাস বলল, শালা হারামখোর—। তারপর রাস্তায় পড়ে থাকা একটা সিগারেটের প্যাকেট তুলে কাঁধের ময়লা সাফ করতে থাকল।

গাছের দিকে চোখ তুলে অদৃশ্য পুরীষ নিক্ষেপকারীকে খুঁজছিল তুলসিদাস। পাতার আড়ালে ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার আবছায় তাকে আবিষ্কার করা গেল না। নিজের মনে গালি বকতে বকতে তুলসিদাস কোনো ইটা পাত্থর, ঢিল অথবা আধ্ধা খুঁজছিল না-দেখা পাখিটিকে

ছুঁড়ে মারার জন্যে। হাতের কাছে না পেয়ে আরও গালাগালি-চার অক্ষরে। ছ অক্ষরে—

রাস্তার ওপার থেকে এসব দেখে চায়বালা বেণীনন্দন তাব পান-জর্দা – খৈনির কষলাগা দাঁত বের করে মজামারা হাসি হাসছিল। ঠিক তখনই একজন খরিদ্দাব এসে খৈনি চাইল তুলসিদাসের কাছে।

আজ বাতে রোটির সঙ্গে ছোলা শাকের ভাজি। কয়েকটা হরি ধনিয়ার পাত্তি লেচির ভেতর দিয়ে বেলে নিয়েছে তুলসিদাস। টেস্ ভালো হবে। সবুজ সবুজ ধনে পাতা দেয়া স্বাদিষ্ট রুটির সঙ্গে ছোলা শাকের খিদে পাওয়ানো গন্ধ। বাইবে আজও চাঁদের গায়ে কুয়াশার ছেঁড়া মশারি। কুয়াশা, তাই তেমন করে জম্‌কে শীত নামেনি। এই বহুদিন বং না হওয়া ঘরের চার দেয়াল, নিচু ছাদ, সিমেন্ট উঠে যাওয়া মেঝে–সব ছেড়ে চলে যাব! আখির যায়ে কাঁহা? তুলসিদাস নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসায় ছিল। দিহাতে লওটকে ভি কা কবে–না খেতি না খলিহান। খায় কা! ভুখ্ পিয়াস মে মরে?

উনোনে ছোলাশাক ফুট কাটছিল। রাত বাড়ছে নিয়মে। রাতে খাওয়া হলে বর্তন গুছিয়ে আবার বিছানায়। আর তারপর খানিক এপাশ ওপাশ কবে ঘুম এসে গেলে তার ভেতর দিয়ে বামচবিত মানসেব সন্তকবি তুলসিদাসকে দেখতে পায় খৈনিবালা তুলসিদাস।

আর তাকে দেখে—হম লোগ লাইন সে চলে যায়েঙ্গে কেয়া তুলসিদাসজি–এমন প্রশ্ন কবিব কাছ থেকে জানতে চায় খৈনিবালা।

কা জানি — সন্তকবির জবাব।

আখিব কেয়া বাম কা মন্দির হোগা–অযোধ্যা মে—যো বেণীনন্দন চায়বালা কহা করতে থে–

য়ো ভি কেয়া মালুম। লেকিন দেখো, ম্যাযনে তো বামজনমভূমি কা বারে মে না শুনা কুছ–নাতো দেখা—

অযোধ্যা—ও তো সাকেত তা — বর্ষোঁসে পহেলে। শাক্যমুনি — এক বড়া ভারি মহাত্মা–সাধুজি–উন্‌হিকে চেলা সব বহতে থে। স্তূপ মে। মুণ্ডাশিব — উসকে আগে অওর কুছ–সমঝ লো।

কবি তুলসিদাসজির বর্ণনায় খৈনিবালা তুলসিদাস চাঁদেব আলো লাগা অযোধ্যার প্রচীন সব রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল। সরযূ নদীতে ঢেউ। তার অনেক অনেক পুরনো ঘাটের ধাপে জ্যোৎস্না আর অন্ধকার দাবার ছক সাজিয়েছিল। বড় বড় গাছ। তার মাথায় হনুমান। হয়ত ময়ূরও ছিল কোনোদিন। সেখানে আমি রামেব নামে কাব্য লেখা শুরু করি। কাব তুলসিদাস বলছিল। তার মাথার চার পাশে চাঁদ ঘিরেছিল। কেমন যেন শাদাটে আলো। দু চোখ ভরে যাচ্ছিল খৈনিবালা তুলসিদাসের। সেই আলোর চাকা লাগানো সন্তকে দেখে খৈনিবালার মনে পড়ছিল লল্লু হজামের ঘরে টি.ভি-তে দেখা কোনো দেওতার কথা।

দেখো, ও রামচন্দ্রজি মেরে হৃদয় মে থা–হৃদয় সরোবার মে–ওহি থা মানসরোবার– উসমে ব্যায়ঠায়া থা রামজি ভগবানকো। উনকে জনম ওঁহি পে।

অব ইয়ে যো লাইন মে মজদুরোঁ কা ঘর–ইয়ে সব তোড়তাড়কে বড়া মকান বনায় গা – বেঙ্ক হোগা–বাজার–

সন্তকবি হাসছিল। তার মাথাব পেছনে চাঁদের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আলো–

আখির হোগা কেয়া মহারাজ? বেণীনন্দন বোল রহা থা, করসেবা হোগা, মন্দির বনেগা – রাম মন্দির।

অন্ধকারে সন্তকবি তুলসিদাসের মুখ দেখা যাচ্ছিল না –তার মাথার পেছনে গোল মতো আলোবাহাব। — দেখো, ও মন্দির তো তুমহারা মন মে–ঝ্যায়সে তুম সুবে সুবে নাহা ধো-

কে পূজাপাঠ করতে হো–কভি রামচরিত মানস ভি পড়লেতে হো–যব মন চাহতে হ্যায়—ওহি রামচরিত মানস, যো হমনে লিখা থা। শুরুয়াত অযোধ্যা মে হুয়ি—অওর শেষ কাশী মে। তো ইয়ে দেখো রাম তুমকা হৃদয় মে। হৃদয় মন্দির মে। ইসকো বাহার লেনা গুনাহ হ্যায়। ধরম পালন তো মন কা বাত হ্যায়। আখির তুম পড়তে হো। তুমহারে য্যায়সা বহুত আদমি পড়তে হ্যায়। এহি মেরা সুখ—সন্ত তুলসিদাসের মুখে এক আশ্চর্য হাসি।

আপকো কাঁহা ব্যায়ঠায় প্রভু! ইয়ে ছোটা সা কামরা মেরা–যাঁহা আপ পাধারে হ্যায়–ঘুমের মধ্যেই কবিবরকে বসাতে না পারার কুণ্ঠা ফুটে উঠছিল খৈনিবালা তুলসিব গলায়।

ঠিক হ্যায় বেটা। রামকো আপনা মন মে বাখ্খো—উনকা কই জনমভূমি হ্যায় নেই। উনকা জনম মনমে। মেরা মন, তুমহারা মন–যো সমঝো–

রামচরিত মানস লেখকেব হেঁটে যাওয়াব শব্দ–খড়মেব খটাখট শুনতে পাচ্ছিল খৈনিবালা।

বাইরে কাক ডেকে উঠবে উঠবে কবছিল। আকাশে একটি ভোর ফুটে উঠবে বলে তৈয়ারি শুরু হয়ে গেছে। মজদুর লাইনে কলে আবারও ভিড়, চ্যাঁচামেচি বালতির খটাখট। পায়খানায় লম্বা লাইন।

তুলসিদাস আড়মোড়া ভাঙছিল। নতুন করে একটা দিন শুরু করতে হবে। অশ্বত্থের তলায় খৈনি, চুনেব পাত্র সাজিয়ে বসতে হবে। নিজেব মনেই কালকের স্বপ্নেব কথা মনে হচ্ছিল তুলসিদাসেব। বৃদ্ধ বেণীনন্দন বলে কি! বাম মন্দিব বানাবে! কবসেবা! বাম তো মেবা মনমে–তার জনমস্থান তো এহি–

তুলসিদাস নিজেব বালতি টেনে জলেব লাইনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

কামাল হোসেন

মর্ত্যে তিন পরী

দূবে উত্তব দিক বরাবব একপাশে আলোকিত বাস্তা। মানুষ-মানুষী পথ হাঁটছে। স্কুটাবেব ব্যাক সিটে হেলমেট মাথায় দেওয়া সুন্দবী বমণীকে বসিয়ে তীব্র বেগে পুরুষবা ছুটে যাচ্ছে। চলমান গাড়িগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি ভিন্‌দেশী স্বপ্ন-দৃশ্য। বাস্তাটাব ও-প্রান্তে একটা বহু-পরিচিত প্রমোদ উদ্যানের বিশাল ফটক। ওখানে শুধু পুরুষ ও নাবী যুগলে প্রবেশ কবতে পায়। অত দূব থেকে বাতাসে ভেসে আসা কামনাব শব্দপুঞ্জ চিনে নিতে এতটুকু ভুল হয় না এই তিনজনেব।

তিনজন অর্থাৎ জোবেদা, আনিসা এবং রুকসানা।

একটা অন্ধকার মাঠেব মধ্যে তাঁবা তিনজনে বসে আছেন। ওপাশে একটা খুবই ছোটখাটো বটগাছে ঝুরি ডালপালা সমেত দাঁড়িয়ে বয়েছে। বলা উচিত, সাজানো রাখা আছে। গাছটাব বয়স নাকি নব্বই বছব। মেজ দেওবের ছোট ছেলে অর্থাৎ রুকসানাব ছেলে আমজাদ গত বছর জাপান থেকে এনে দিয়েছে।

পাযেব তলায় ঘাসেব মতো জমাট কার্পেট। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কোমরে ব্যথা কবে। ওই বেঁটে বটগাছটাব মতো নব্বই বছব বয়স হয়েছে জোবেদাব। হাসি পায় কথাটা ভেবে। সত্যি বলতে কি, মাঝে মাঝে ভাবি হিংসা হয় গাছটাকে। দিব্যি ছোটখাটো চেহারাটা বাগিয়ে নিয়ে সময়কে অতিক্রম করে চির-যৌবনেব চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে ওই 'বনসাই' গাছটা।

'বড় ভাবী দেখ, ও পাশটা কী আঁধাব!' আনিসা বলেন।

এতক্ষণ মাঠেব উত্তব দিকেব আলোময় বাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে গেছলেন জোবেদা। অথবা হয়তো বনসাই বটগাছটাব কথা ভাবতে ভাবতে।

মাথা তুলে জোবেদা বলেন, 'উঁ, কিছু বলছিস আনুবিবি?'

আনিসা অর্থাৎ আনুবিবিব বয়স এখন আশি। জোবেদাব ছোট ননদ। তিবিশ বছর হল বিধবা হয়ে বাপেব বাড়ি চলে এসেছেন। একমাত্র ছেলে শামিম এনজিনিয়ার। এখন কানাডায় সেট্‌ল কবেছে। মেমসাহেব বিয়ে কবেছে। মাঝে মাঝে মাকে টাকা পাঠায়।

'বলছিলাম কী, ওপাশটা দেখ বড় ভাবী। কী আঁধাব!' আনিসা বলেন।

মুখটা ফিবিয়ে মাঠেব দক্ষিণ দিকে চোখ বেখে বুকেব ভেতবটা কেমন হু-হু কবে উঠল। আঁধাব, সত্যি ঘন আঁধাব। চোখ মেলে তাকালে প্রথমটা কিছুই ঠাহর হয় না। মাথাব উপরে অন্ধকাব আকাশে ঝিকমিক করে অসংখ্য তারা।

'আঁধারেব মধ্যে কিছুটা দূবে মাটিব ঢিপি মতো একটা উঁচু জায়গায় মানুষের মতো কিছু যেন বোধহয় বসে আছে, তাই না বড় বু?' রুকসানা বলেন। এ বাড়ির মেজ বউ। বয়স পঁচাশি। স্বামী মাবা গেছেন বিশ বছব। দুই ছেলে। বড় ছেলে আফতাব ব্যাঙ্গালোরে থাকে। সেখানে ব্যবসা কবে। ছোট ছেলে আমজাদ জাপানে কী একটা বড় চাকবি কবত। গত বছর ফিবে এসেছে। এখন মাদ্রাজে পোস্টিং। দু' ছেলেই মাকে নিজের কাছে বাখতে চায়। কিন্তু

রুকসানার ওই এক জিদ, শ্বশুরের ভিটে ছাড়বেন না। তাছাড়া বড়জা জোবেদা আছেন মাথার উপরে। আছেন ননদ আনুবিবি। আর.... আর বিধবা ছোট জা জিনাত আরা — সকলের জিনিবিবি —এদের তিনজনের কাছে ছুটকি।

আনিসার শরীরের যেটা সমস্যা, গত বছর পাঁচেক সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। কোমরের মেরুদণ্ডের হাড়ে কী সব অসুবিধা দেখা দিয়েছে, ডাক্তারের ভুলে হয়তো চিকিৎসা-বিভ্রাটও ঘটেছে কিছু। এখন তাঁকে আক্ষরিক অর্থে বুকে হেঁটে সরীসৃপের মতো এ-ঘর ও-ঘর—বাথরুম এসব করতে হয়। সকলের কাছে এমন চোখ সয়ে গেছে ব্যাপারটা, কেউ কিছু মনে করেন না। শরীরের এরকম বিপর্যয়কর অবস্থায় কানাডায় শামিম আর তার বৌয়ের উপর বোঝা হবার ইচ্ছে বা আত্মমর্যাদা হানি হয় এমন কিছু অবস্থার মধ্যে আত্মসমর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেন না।

রুকসানার কথাটা লক্ষ করে জোবেদা এবং আনিসা দুজনেই খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূরে অন্ধকার প্রান্তরে কী যেন খুঁজে বেড়ান। মনে হয় সেখানে একটা মানুষ পায়ের উপর পা দিয়ে খুব আরাম করে বসে আছে। পুরুষ মানুষই হবে।

'মাথায় কাপড় দাও বড় বু। বেগানা পুরুষ মানুষ হবে।' রুকসানা বলেন।

'পুরুষ মানুষ!' খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে আনিসা বলেন, 'মেজ ভাবীর কথার ধরণ দেখ। আশি-নব্বই বছরের বুড়ি আমরা। বুক-পিঠ সমান হয়ে গেছে, আমরা এখন আর মেয়ে-মানুষ আছি নাকি ? ওসব আদব-কায়দা পর্দা জোয়ান মাগীদের জন্য। তা আজকালকার মাগীরা ওসব গেরাহ্যিই করে না।'

'আমরা আর মেয়েমানুষই নই ? কী করে বললে আনুবিবি ?' প্রতিবাদের গলায় রুকসানা বলেন।

'চ্যালাকাঠ। তোমাকে আমাকে দেখে কোন্ পুরুষ মানুষটা মেয়েছেলে বলে গণ্য করবে শুনি ?' আনিসা বলেন।

জোবেদা কী রকম ম্লান গলায় বলেন, 'যাই বলিস আনুবিবি, আমি কিন্তু কথাটা মানতে পারলাম না।'

'কেন বড় ভাবী, অন্যায়টা কী বললাম ?' আনিসা শুধান।

'নারে আনুবিবি, ব্যাপারটা অত সোজা না। শরীরটাই কি সব ? মন বলে জিনিস নেই ? বাইরের চেহারাটা যেমনই হোক, মানুষের ভেতরটা কখনো পাল্টাতে পারে ?' জোবেদা বলেন।

'কী যে হেঁয়ালি করে বল বড় ভাবী, ভারী রাগ হয়। আচ্ছা, সাফ সাফ কথা জিগ্যেস করছি, এখনো যদি তোমার মধ্যে সত্যিকারের মেয়েমানুষের মন বেঁচে থাকে, তাহলে বলো— পেয়ার-মহব্বত করতে ইচ্ছে হয় ? একটা জলজ্যান্ত পুরুষ মানুষের সোহাগ পেতে এখনো ইচ্ছে করে ?' আনিসা ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন।

কেউ বুঝি কোনো কথা খুঁজে পান না অনেকক্ষণ। জোবেদা ঘাড় কাৎ করে চুপচাপ দেখেন, মাঠের উত্তর দিকের রাস্তায় স্কুটারের ব্যাক সিটে মোহিনী প্রিয়াকে বসিয়ে দ্রুতবেগে কোথায় যেন ছুটে চলে যায় ব্যস্ত যুবক। কয়েকজন আনন্দ-বিলাসী তরুণ-তরুণী গল্প করতে করতে স্বচ্ছন্দে সেই বিশাল ফটক দিয়ে ঢুকে যায় প্রমোদ উদ্যানে। বাতাসে ভেসে আসে কিছু পরিচিত সুগন্ধি আর শীৎকার ধ্বনি।.....

আর তখন মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় মাঠের দক্ষিণ দিকে। সেখানে ভুতুড়ে অন্ধকার। বহুদূরে বড় বড় গাছের ছায়াসর্বস্ব ধোঁয়াটে উপস্থিতি। উঁচু মতো একটা টিলার উপরে বসে সেই রহস্যময় পুরুষ কী মতলব ভাঁজছে কে জানে।

চরাচরে এতটুকু বাতাস নেই। আকাশের তারাগুলো ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে। যেন শেষ রাত্তিরের পর এই মাঠ আকাশ উদ্ভিদ কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত থাকবে— ঠিক তখনই

রূপকথার গল্পের মতো আকাশের তারাগুলো ভিন্‌দেশী বাজকন্যার অশ্রুকণার মতো শিশিরের সঙ্গে টুপটাপ করে ঝরে পড়বে এই পৃথিবীব উপর।

জোবেদা অনেকখানি ক্লান্ত গলায় বলেন, 'তুই কখনো শিউলিফুল কুড়াসনি আনুবিবি ?'

অন্যমনস্ক গলায় আনিসা বলেন, 'হুঁ। ছেলেবেলায়। বিয়ের আগে। এ বাড়ির পেছন দিকের বাগানটায়। তোমার সঙ্গেও কত কুড়িয়েছি। মালা গেঁথেছি। বিয়ের পর কলকাতায় চলে গেলাম। তারপর যখনই এখানে এসেছি, তোমার সঙ্গে কুড়িয়েছি। ফুলের বোঁটা দিয়ে কাপড় রাঙিয়েছি। তারপর কী ভাবে যেন গাছটা একদিন মরে গেল ....'

'তুই তাহলে ভুলে যাসনি ?'

'ভুলব কি গো বড় ভাবী, মনে হয় এই যেন সেদিনেব কথা। বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যে কথা বলছি না, এখনও আমার নাকের কাছে ভোববেলাব শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।'

'আমি তোকে অবিশ্বাস করছি না আনুবিবি।'

'তুমি কার কথা বিশ্বাস করছ বড় বু ?' রুকসানা ফোঁস করে ওঠেন, 'আনুবিবি আজকাল মাঝে মাঝেই কী করম সব ভুলে যাচ্ছে, দেখতে পাও না ? সকালে নাস্তা খাওয়ার খানিক বাদে ভুলে গিয়ে দেলজান মাগীর উপরে চোটপাট কবে। তুমি এখুনি জিগ্যেস কর, কাল সন্ধেয় কী খেয়েছে, বলতে পাববে না।'

কেমন যেন বিব্রত অবস্থায় কিছুটা ভয় কিছুটা শোকের গলায় আনিসা বলেন, 'কী জানি, আজকাল কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এটা দিন না রাত, বুঝতে পাবি না। এখনই আমরা নিজেদের ঘরেব মধ্যে বসে আছি, না কোনো অচেনা মাঠে অন্ধকারে তাবা ভবা আকাশের তলায় বসে আছি, ঠিক ঠাহর করতে পাবছি না।'

'মন খারাপ কবিস না আনুবিবি। আমাদেব এই এতদিন ধরে বেঁচে থাকাটাই তো ভারি তাজ্জব ব্যাপার। এ-বয়সে ও-বকম একটু-আধটু গণ্ডগোল হতেই পারে। তা নিয়ে বেশি মাথাব্যথা কবে লাভ নেই। আমাদেব সাহেবরা সব কতকাল আগে জন্নাতবাসী হয়ে গেছেন। এদিকে আল্লাব দোওয়ায় আমরা চার বুড়ি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি।' স্মৃতিচাবণেব ভঙ্গিতে জোবেদা বলেন। কত কথা নতুন করে বুঝি মনে পড়ে। বড় মেয়ে জহুরা এখন বিলেতে থাকে। ছোট মেয়ে তহমিনা বোম্বেতে থাকে। বড় ছেলে শওকত প্রফেসর। কলকাতায় থাকে। চাকরি থেকে বোধহয় রিটায়াব হয়ে গেছে, কবে যেন চিঠিতে লিখেছিল। ছোট ছেলে নাজিম নামকরা বিজ্ঞানী। সে থাকে দিল্লিতে।

'আল্লা কতদিন আমাদের বাঁচিয়ে বাখবেন কে জানে।' নিরুত্তাপ গলায় রুকসানা বলেন।

'সবই আল্লার অসীম করুণা।' দু'হাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে কী যেন বিড় বিড় করে বলেন জোবেদা, হয়তো ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেব জন্য কোনো ধর্মীয় শ্লোক।

'দেখতে দেখতে চোখের সামনে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেল। মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে। ছেলেরাও রোজগারের ধান্দায় এই ছোট শহর ছেড়ে বাইরে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে।' আনিসা বলেন।

'এরকমই নিয়ম।' বিড় বিড় করে রুকসানা বলেন।

'এদিকে পাঁচ পুরুষের ভিটে আগলে পড়ে আছি আমরা চার বুড়ি।' আনিসা বলেন।

'আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু খুব ভাল। ওদেরও তো বয়স হয়েছে। তবু নিয়মিত খবর রাখে আমাদের।' জোবেদা বলেন।

'ওদের সংসারের কত দায়দায়িত্ব ঝামেলা রয়েছে। তবু মনে রেখে নিয়মিত চিঠিপত্র লেখে। টাকা পাঠায়। উপহার পাঠায়। পাগল সব। আমাদের দরকার নেই, তবু পাঠাবে গাদা গাদা জিনিস।' রুকসানা বলেন।

'বড় ভালোবাসে আমাদের। সবাই আমাদের নিজেদের কাছে কাছে রাখতে চায়।' আনিসা বলেন।

'কিন্তু আমরা চারজনে চারজনকে ছেড়ে কেউ কোথাও থাকতেই পারব না।' জোবেদা বলেন।

'সেটা ওরা বোঝে। তাই জোর করে না।' রুকসানা বলেন।

'মাঝে মাঝে ওরা ছুটি কাটাতে আসলে বাড়িটা আবার আগের মতো গম্‌গম্‌ করে ওঠে। আজকাল অবিশ্যি সব ক'টা নাতি-নাতনীর মুখ মনেও থাকে না ছাই।' আনিসা বললেন।

জোবেদাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য বোধহয় রুকসানা বলেন, 'আজ আমবা কিন্তু এখানে চারজন একসঙ্গে নেই বড় বু।'

'হুঁ, ছুটকি!' জোবেদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'ছুটকি ইনশাল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে, না বড় ভাবী?' ছেলেমানুষেব গলায় অনিসা বলেন।

'কী জানি, বয়স তো হয়েছে। সব সময ভয লাগে।' জোবেদা বলেন।

'হঠাৎ কেন যে ওর বুকে অমন ব্যথা উঠল। সময়মতো কিছু বলবে না। ভাবে, আমাদেব ব্যস্ত করা হবে।' রুকসানা বলেন।

'পেসাব করতে যাবে, দেলজানকে ডাকলেই পারত। নিজে থেকে পাকামো করে বাথরুমে একা একা ঢুকেছিল কেন? কতক্ষণ যে অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়েছিল কে জানে।' আনিসা বলেম।

'ভাগ্যিস বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি লাগানো ছিল না। দেলজানের কী মনে হতে ভিতবে ঢুকে ওকে দেখতে পেল।' জোবেদা বলেন।

তখনই দেলজানকে ননী ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জোবেদা। খবব পেয়ে পাড়ার ছেলেরাও খুব করেছে। ননী ডাক্তার বেশি ভরসা না দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। সন্ধেবেলায় ছেলেবা সবাই মিলে জিনাত আরাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে পাশের বাড়ির আবুজাফর জানিয়ে গেছে, অবস্থা ভালো না। স্ট্রোক হয়েছে। জ্ঞান ফেরেনি। বাঁ-দিকটা অবশ হয়ে আসছে। ছেলেরা সারারাত হাসপাতালে থাকবে। কখন কী দরকারে লাগে।

তাবপর আর খাওয়া-দাওয়াব কথা তাঁরা ভাবতে পাবেননি। এই অন্ধকাবের মধ্যে তিনজনে বসে আছেন। কখনো কথা বলছেন। কখনো কেউ কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

রাত কত হল কে জানে। দূরে ফাঁড়িব পেটা ঘন্টার আওয়াজ, শুধুমাত্র কিছু অর্থহীন ধ্বনি বাষ্পের মতো বয়ে যায় এই স্থবির জমাট বাঁধা পরিবেশে। জোবেদা চেয়ে থাকেন সময়বয়সী ছোট বনসাই বট-গাছটির দিকে। আনিসা দক্ষিণ দিকের অন্ধকারে মুখ ফিবিয়ে বসে থাকেন। রুকসানার চোখে রোমাঞ্চ আনে উত্তরের আলোকিত পথে উজ্জ্বল মানুষ-মানুষীর দৃপ্ত চলাফেবা।

আনিসা হঠাৎ শুধান, 'আচ্ছা বড় ভাবী, দূরে ওই যে লাল, নীল আলোঅলা বিরাট লম্বা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওটাই কি বেহেশ্‌তের প্রাসাদ?'

দক্ষিণ দিকের অন্ধকার ছাড়িয়ে, টিলা ছাড়িয়ে, ভুতুড়ে মানুষটা এবং গাছপালার ছায়া ছাড়িয়ে একটা রহস্যময় প্রাসাদের সম্মোহন তাদেব তিনজনকেই বোধহয় অনেকক্ষণ স্তব্ধ কবে রেখে দেয়।

আর তখনই রাস্তা দিয়ে কেউ বুঝি হঠাৎ ট্যাঁড়া পিটিয়ে ফুল ফল ফসলের নীলাম ডাকতে ডাকতে চলে যায়।

আপন মনে কথা বলাব ভঙ্গিতে জোবেদা বলেন, 'সংসারের কত কিছু হেঁয়ালিব যে উত্তর খুঁজে পেলাম না।'

আনিসা যেন কিছু গোপন কথা শোনাচ্ছেন, এবকম চুপি চুপি ভঙ্গিতে বলেন, 'তোমাদেব একটা সত্যি কথা বলব বড় ভাবী, আজকাল সবকিছু আমি পদে পদে ভুলে যাই। কিছু মনে রাখতে পারি না। এই খাচ্ছি, এই ভুলে যাচ্ছি। এই কথা বলছি, এই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস কবো তোমবা, পুবোনো দিনেব সব ঘটনা হুবহু আমি মনে করতে পারি। কিছু আমি ভুলিনি।'

ঠাট্টা করে জোবেদা বলেন, 'পুবোনা দিনেব কথা যখন কিছুই ভুলতে পারিস না, তাহলে এটা মানবি তো, এককালে তুই বেশ ডাগব-ডোগব খুবসুবৎ মেয়েমানুষ ছিলি– এ কথাটা এখনো মাথা থেকে হারিয়ে যায়নি!'

আনিসাব জবাকুঞ্চিত মুখে এক মুঠো লজ্জাব আবিব কে যেন ছুঁড়ে মারে, কেউ টেব পায় না। কিন্তু তিন জনেবই বোধহয় মনে পড়ে যায়, একদা সেই অসামান্য সুন্দবীব যৌবনের মদিব কটাক্ষের সম্মোহনী বোমাঞ্চ।

জোবেদা বলেন, 'তোদের মনে আছে, ছোট মিঞাব বিয়ের গায়ে-হলুদের সময় আমরা সকলে মিলে কেমন নাচ-গান করেছিলাম?'

জোবেদা হঠাৎ কবেকার ভুলে যাওয়া একটি আদিবস-মাখা গ্রাম্য বিয়ের গান ভাঙা-ভাঙা কাঁপা-কাঁপা গলায় সুর করে গাইতে থাকেন।

এবং তখন দিগন্তে কোথাও বুঝি বাতচরা পাখিদের অস্তিত্ব হঠাৎ টেব পাওয়া যায়। কী আশ্চর্য, স্বপ্নের স্তবকে যেন সজ্জিত হয় তিন সুন্দরী পবীব অপর্যাপ্ত কেশরাশি। হ্যাঁ, ওঁবা কোন্ মায়ামন্ত্রবলে পরী হয়ে যান কিছুক্ষণেব জন্য। এই অন্ধকার পটভূমিতে খোলা আকাশেব নিচে এই তিন পরীবব সর্বাঙ্গে হীবের কুঁচিব মতো জমা হতে থাকে শিশিবেব কণা, শীতের বাতাস, জীবনেব ওম। বাতাসে বাতাসে ওড়ে আঁচলের পাল।

এই নিঝুম আদ্যিকালেব প্রান্তবে, হঠাৎ যদি এখন কেউ উপস্থিত হত, দেখত এক আশ্চর্য বোমাঞ্চিত দৃশ্য। সাদা বসন পবা তিন অপরূপ সুন্দবী পবী জীবনের আগ্রহে আপন মনে গান গেয়ে যাচ্ছে, নাচছে, তালে তাল দিচ্ছে। একটু পবেই বুঝি ওবা উড়ে চলে যাবে পৃথিবীব মানুষেব অজানা অথচ বহু আলোচিত সেই অপরিচিত নির্জন দ্বীপভূমিতে।

হঠাৎই বাইবেব দবজায় কড়া নাড়াব শব্দ। বাইরেব ঘবে গৃহ-পবিচাবিকা দেলজান ঘুমায়। উঠে গিয়ে সেই খুলে দেয় দবজা। কেউ ঢোকে বাইবের ঘবে। নিচু স্ববে দু'জনের মধ্যে কী যেন কথাবার্তা হয়।

এখান থেকে কিছুই স্পষ্টভাবে শোনা যায় না।

আতঙ্কমাখা দৃষ্টি নিয়ে আনিসা তাকান বাকি দু'জনেব দিকে।

রুকসানা বলেন, 'কার গলা মনে হচ্ছে? দেলজান কাব সঙ্গে কথা বলছে বড় বু?'

জোবেদা বলেন, 'আবুজাফব না?'

পাশেব বাড়িব ছেলে আবুজাফব। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। রগের চুলে পাক ধবেছে। বিশ-বাইশ বছব আগেব টালমাটাল দিনগুলিতে উগ্রপন্থী রাজনীতির দলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে। এখনো সে ধবণের একটি দলের সঙ্গে যুক্ত। জীবিকার তাগিদে ইদানিং টিউশনি কবে। বিয়ে কবেনি। আর অল্প বয়স থেকেই পাড়াপড়শীর বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালোবাসে। সে অভ্যাসটা এখনো ছাড়তে পারেনি।

আনিসা বলেন, 'আবুজাফর এত বাতে কেন এল?'

জোবেদা বলেন, 'রাত আর কোথায় বাকি আছে আনুবিবি? এখনই সকাল হবে।' রুকসানা বলেন, 'অ্যাম্বুলেন্সে করে ছুটকিকে হাসপাতালে নিয়ে গেছল আবুজাফর। নিশ্চয়ই কিছু একটা খবর এসেছে।'

দূরে কোথা থেকে একটা চেনা ফুলের গন্ধ যেন হঠাৎ ঢুকে পড়ল এই ভ্যাপসা দম বন্ধ করা অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

খানিকক্ষণ বুঝি কোনো কথা খুঁজে পান না তিনজনে। ছুটকির কথা ভেবে ভেবে .....

জোবেদা বলেন, 'তোর মনে আছে রুকসানা, একবার পূর্ণিমার রাতে ছাদে বসে তুই আমি আর ছুটকি অনেকক্ষণ ধরে গান করেছিলাম।'

রুকসানা গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন।

আনিসাও চুপচাপ।

রুকসানার ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, ঠিক মতো মনে করতে পারছেন কিনা সেরকম কোনো সুখভরা রাত।

কিংবা বুঝি হঠাৎ মনে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে বলেন, 'ওমা মনে পড়বে না কেন? ওরা তিন ভাই গেলেন সারারাত ধবে যাত্রা দেখতে। ছুটকি তখন পোয়াতি ছিল। তাই আমরা তিন বউ যাত্রা শুনতে যাইনি। ওরা চলে যাওয়ার পব তিনজনে ছাদের উপর উঠে মাদুর পেতে বসেছিলাম। আকাশে সে রাতে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। আমরা একসঙ্গে কত গান গেয়েছিলাম, গল্প করেছিলাম।'

আনিসারও হয়ত মনে পড়ে অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা। তোবড়ানো মুখে হাসি এনে বলেন, 'শুধু তোমরা তিন বউ কেন, আমিও শ্বশুববাড়ি থেকে যখন এখানে আসতাম, কত হুল্লোড় করেছি চারজনে।'

'আমাদের সাহেবরাও ছিলেন দিলদবিয়া লোক। যেটা বায়না কবতাম, সব আবদার মেটাতেন তাঁরা।' রুকসানা বলেন।

'অমন সব জলজ্যান্ত মানুষগুলো কীভাবে একের পর এক হারিয়ে গেল।' জোবেদা বলেন।

বাইরের ঘর থেকে নানারকম শব্দধ্বনি ভেসে আসছে এখানে। দেলজান মাগীকে কী এত বোঝাচ্ছে আবুজাফর? স্ট্রোক ..... প্যারালিসিস ..... বয়স হয়েছিল ..... যা হয়েছে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে ..... কত রকম চেনা অচেনা সব কথা ভেসে আসছে আবুজাফরের গলা থেকে। ছেলেটা আসছে না কেন তাদের কাছে ..... আসল কথা তো ছুটকির খবব ..... বাড়ির সব থেকে আদবের ছোট বউ ছুটকির জন্য তাদেব বুকের ভেতর কী হচ্ছে, বাইরের ছেলেটা কী করে তা বুঝতে পারবে .....

নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে এক ভয়ংকর ও অসহ্য উপলব্ধি এনে দেয়, তাঁরা তিনজনে মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করতে পারছেন।

বহুক্ষণ তাঁরা কোনো কথা খুঁজে পান না।

'বড় ভাবী, ছুটকি কি তাহলে চলে গেল?' আনিসা একসময় জিগ্যেস করেন।

কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না জোবেদা।

তিনজনেই বুঝি চিরাচরিত কান্নাকাটি করার কথা কতকাল ভুলে গেছেন। হয়ত কোনো অতিরিক্ত শোকের শব্দও তাঁরা চয়ন করতে পারছেন না এই নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবিকতায়।

এখন শুধু প্রতীক্ষা। হ্যাঁ, প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর তো কিছুই তাঁরা করতে পারেন না। আবুজাফর এখন নিশ্চয়ই এ ঘরে এসে জানিয়ে যাবে সেই অমোঘ সরল সত্যটুকু।

তারপর তাঁরা প্রতীক্ষায় বসে থাকবেন। কিসের প্রতীক্ষা? ছুটকির হাসপাতাল-ফেরত লাশ দেখার জন্য? নাকি নিজেদের মৃত্যুর জন্য? সে তো কবে থেকেই নিশুত চোখে প্রতীক্ষা করে করে অন্যমনস্ক ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বসে আছেন। কোমর নড়ে না। মাজা ব্যথা করে। শরীরের সমস্ত সৌন্দর্যের কণাটুকুও এক বিষম শক্তিশালী

অভিশপ্ত হাতের ছোঁয়াতে দিন দিন মুছে যাচ্ছে। জীবনের শেষ দিনগুলোর এই নির্জন সমারোহ ভরিয়ে তুলতে ইচ্ছার দিগন্তে এক অপূর্ব গম্ভীর ঘন্টাধ্বনি শোনার জন্য তাঁরা কান পেতে বসে আছেন কতকাল।

অথচ যাব বললেই কি আব যাওয়া হয় ?

আনিসা ডাকেন, 'বড়ভাবী !'

জোবেদা মুখ তুলে তাকান।

রুকসানা বলেন, 'বড় বু।'

জোবেদা ঘাড় ফেরান।

আনিসা আবার ডাকেন, 'বড়ভাবী–অ বড়ভাবী–'

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জোবেদা বলেন, 'হ্যাঁরে আনুবিবি, তুই কিছু বললি ?'

রুকসানা অভিমান কবে বলেন, 'আমিও তো কতক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি বড় বু !'

কতকাল যেন এই ঘন আঁধাব মাখা এক টুকবো জমির উপরে বসে আছেন তাঁরা। হায়রে, এরকম দমবন্ধ করা আবছায়া অপ্রাকৃত পবিবেশে তাঁদের আরো কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে। একটা বিচিত্র নকশাঅলা বাহাবি সিন্দুক যেন তাঁরা পাহাবা দিচ্ছেন, যার ভিতরে জমা আছে রাশি রাশি ঘুমের স্তূপ। কত রাত তাঁদেব চোখের পাতায় ঘুমের আচ্ছন্ন জ্যোৎস্না মায়াপরশ বুলিয়ে দেয়নি ....

আনিসা শুধান, 'বড় ভাবী, ছুটকির যদি সত্যিই খারাপ কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই তো তাকে গোসল দেবে ? পাববে তো ?'

পাথবেব মতো চুপচাপ বসে থাকেন জোবেদা। সাবা মাথাময় ছড়ানো রয়েছে মাকড়সার জাল, ডাইনি বুড়িদেব মতো। চোখেব কোটর থেকে গড়িয়ে পড়ছিল শোক আর অবসাদের তবল চিহ্ন।

আনিসার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কী ভাবে যেন হাসতে থাকেন জোবেদা। তাবপর একসময় হাসি থামিয়ে ম্লান গলায় বলেন, 'আমার আট বছরের মেয়ে সকিনা যেবার কলেরায় মারা গেল, শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হবে, আমি নিজে হাতে তাকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম দাফনের জন্য।'

রুকসানা বলেন, 'বড় বু, তুমি কিছু মনে কোবো না গো। আসলে আমাদের মাথা তো কিছুই কাজ করছে না। একটা সময ছিল, যখন গোটা সংসার চালাতাম আমরা। কত লোকজন। বাড়ি গম গম করতো। আর এখন বাড়িতে একটা পুরুষ মানুষও নেই। আমাদের অতগুলো ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী থাকতেও বাড়ি একেবারে ফাঁকা। আমরা চার বুড়ি কীরকম অসহায দিন কাটাচ্ছি .....।'

আনিসা বলেন, 'তুমি ছাড়া কার সঙ্গে এখন পরামর্শ করবে বলো ? তুমি আমাদের বাড়ির বড় বউ। আমাদেব বড় ভাইজানের সাধের দুল্‌হন। আব্বা-আম্মা বেঁচে থাকতেই তোমাকে আমাদেব খানদানের সবথেকে বড় জায়গায় বসিয়ে রেখে গেছেন। তোমারও বাপু সবদিক চালিয়ে নিয়ে বেড়ানোব ক্ষমতা ছিল। কোনো কিছু সমস্যা দেখা দিলেই সবাই বলত—তোমাদের বড় ভাবীই সব সামলে নেবেন !'

'সব দায়িত্ব টানতে টানতে যত বয়স বাড়তে থাকল, হঠাৎ দেখতে থাকলাম, চাবপাশ থেকে চেনা মানুষদের সংখ্যা কেমন কমে যাচ্ছে...' আপন মনে জোবেদা বলেন।

'আমরাও একদিন ওই সব হারিয়ে যাওয়াদের দলে মিশে যাব।' রুকসানা বলেন।

'খুব দেরি নেই আর।' আনমনা গলায় আনিসা বলেন।

জোবেদা বলেন, 'কবে যে সেই নসিব আসবে, কে জানে। আর বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না।'

'ছুটকি আমাদের মধ্যে বয়সে সব থেকে ছোট। অথচ ওই বোধহয় সবার আগে বাদশাজাদীব মতো চলে গেল।' রুকসানা বলেন।

'সেদিনকার কথা তোমাব মনে আছে বড় ভাবী, বিয়ের পব ছুটকি যেদিন প্রথম এ-বাড়িতে পা রেখেছিল—' আনিসা শুধান।

'আঃ কী খুবসুবৎ-ই না লাগছিল তাকে। আমি ঠাট্টা করে ছোট মিঞাকে বলেছিলাম, তোমার বিবি যে সত্যি সত্যিই চৌধবী-কা-চাঁদ গো! তো ছোট মিঞা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাদের বাড়ির বউ-বিটিরা সকলেই তো হুবী-পবীর মতো খুবসুরৎ। তোমরা কে কাব থেকে কম শুনি।' জোবেদা বলেন।

'আল্লা, সেই ছুটকি আমাদেব ফেলে রেখে চলে গেল কিনা কে জানে।' রুকসানা বিড় বিড় কবে ওঠেন।

'সবাই চলে যায়। কেউ আগে পরে।' আপন মনে বকবক করতে করতে বাতগ্রস্ত শরীরটাকে নিয়ে দেরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ান জোবেদা। একটা পুরোনো ডায়েরি বের করে হাতে নিয়ে ধীর পায়ে চেয়ারে গিয়ে বসেন। তারপর চশমা চোখে ডাযেবিব পাতা উলটিয়ে উলটিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের ঠিকানা খুঁজতে থাকেন। সত্যিই যদি আবুজাফর এখনই এ-ঘরে ঢুকে ছুটকির কোনো খারাপ খবর শোনায়, তাহলে জোবেদাকেই তো সকলেব কাছে খবব পাঠাতে হবে। ছুটকির নিজেব সন্তান বলতে অবশ্য একমাত্র কন্যা হাসিনা। বিয়েব পবই তাব মাথার গোলমাল দেখা যায়। অনেক চিকিৎসাব চেষ্টা হয়েছিল। কিছু উপকার হয়নি। শেষপর্যন্ত কলকাতার একটি প্রাইভেট নার্সিংহোমে মাসিক বন্দোবস্তে রাখাব ব্যবস্থা কবেন ছুটকিব স্বামী। এখনো পর্যন্ত সেখানেই থাকে। মাসে মাসে টাকা মানিঅর্ডাব কবে পাঠান জোবেদা। তাব কাছে মায়েব মৃত্যু-সংবাদ পাঠানোব অবশ্য কোনো অর্থ হয় না।

ক্রমশ একঘেঁয়েমি গ্রাস করতে থাকে জোবেদাকে। অন্যমনস্ক চোখে উত্তর দিকে তাকিয়ে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান চলমান জীবন্ত মানুষেব আকাঙ্ক্ষার উৎসব। কান পেতে শুনতে থাকেন অদ্ভুত মাদকতায় মৃদঙ্গধ্বনি। আর দক্ষিণ দিকে সেই হিমেল তুষার মাখা অন্ধকাব প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে, সেই টিলার উপরে অপেক্ষমান ভুতুড়ে মানুষটিব দিকে চোখ ফিরিয়ে মনে মনে ভারি অবসন্ন বোধ করেন জোবেদা। পা দুটো ভীষণ যন্ত্রণা করে। রাত্রি জাগরণের জন্যই বোধহয় মাথার ভিতরে একটা ব্যথামাখা শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ে।

টলতে টলতে খাটের উপর পা ছড়িয়ে শরীরটা এলিয়ে দেন। কপালে ঘাম জমা হয়।

আনিসা ভয় পাওয়া গলায় বলেন, 'পানি খাবে বড় ভাবী?' অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বুকে হেঁটে ঘরের কোণে রাখা সুরাই থেকে এক গ্লাস জল এনে জোবেদাব হাতে দেন।

আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে গ্লাসটা সবিয়ে রাখেন জোবেদা।

রুকসানা জোবেদার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

মনে মনে তিনজনেই হয়তো চাইছেন, আবুজাফর আর একটু দেরি করে এঘরে এসে শোনাক সেই ভয়ংকব খবরটা। ··· এখনও তাদেব ছুটকি নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, হাসপাতালে, বেডে শুয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে মৃত্যুর সঙ্গে, পক্ষাঘাত হয়ে যাওয়া অর্ধেক অঙ্গকে সবল করার জন্য তীব্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ··· কথা বলুক আবুজাফর বেশিক্ষণ ধরে দেলজানের সঙ্গে···

বাইরের ঘর থেকে টুকরো টুকরো শব্দপুঞ্জ ঠিকই ভেসে আসছে এঘরে। জোবেদা হঠাৎ

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন, তাঁব বয়সী বনসাই বটগাছটির শাখা-প্রশাখা জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক রহস্যময় ঘন নীল কুয়াশার জাল। কতদিনকার কত কিছু অভ্যাস—শয্যাত্যাগ, প্রাতবাশ, খাদ্য, প্রেম, যৌনতা, ঘুম, স্বপ্ন, জাগবণ।..... সবকিছু এই মুহূর্তে বড় এলোমেলো আর ভাঙাচোরা মনে হয় তাঁর কাছে।

তার চেয়ে এই চমৎকাব ঘাসেব উপরে বসে তিনজনে এখন উত্তবদিকের সেই বৌদ্রময় পথে জীবনের গতিময স্রোত দেখতে থাকবেন।

আব তখনই বুঝি অচেনা জ্যোৎস্না চাদর বিছিয়ে দেয সেই চলমান স্কুটাব-যুবকের হেলমেটের উপর। যুবকেব কোমব চেপে ধরে খিলখিল কবে হাসে এক মোহিনী নারী, তাব মুখটা হঠাৎ যেন ছুটকিব মতো মনে হয। এই চঞ্চলতা, স্বাস্থ্যময়তা, খুশি, স্পন্দন, হাসি আর যৌবন চিনে নিতে ভুল হয় না তাঁদেব।

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁবা তাকিয়েই থাকেন। জীবনেব উজ্জ্বল প্রবাহ খুব নিবিড়ভাবে স্পর্শ কবে তাঁদেব এই প্রাচীন নির্জনতা।

নিঃশব্দ সুবের ধ্যানে তিন পবী মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকেন সেই আশ্চর্য রূপকথাব মতো দৃশ্য।

নলিনী বেরা

ঝিঙাফুল কাঁকুড়ফুল

'রাত ইস্কুল' চলছে। সেই সঙ্গে চলছে 'সীতাহরণ' নাটকের মহড়া !

যারা সারাদিনে লেখাপড়া করার এতটুকু অবসর পায় না, সেই সকাল সকাল ছাগল চরাতে কি গোরু চরাতে বেরিয়ে যায়, ক্ষেতি খামারে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে থেকে সাহায্য করে, 'তলা' বা ধানচারা হাতে হাতে জুগিয়ে দেয়, ধান রোয়ার আগে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে নাচানাচি করে বিলজমিন কাদা করে, কর্মরত মুনিষদের জন্য 'বাসিয়াম' বা দুপুরের খাবার হিসাবে ভুজা-মুড়ি ধামা করে দিয়ে আসে জোতজমিনে, ফেরে সেই সন্ধেবেলা যখন মাঠ চবন্তি গোরু ছাগল দলবেঁধে 'শেষ-খাবল' খেতে রাস্তার ধারে এ ঝোপ সে ঝোপে মুখ দিতে দিতে উঠে আসে, সারাদিন প্রায় সকাল ছ'টা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত যাদের কাজে অকাজে কেটে যায় মাঠে ঘাটে তাদের আর টায়েম কোথায় ইস্কুলে রোলকলের সময় উপস্থিত থেকে 'জয়হিন্দ' বা 'সোনার ভারত' বলে নিজেদের হাজিরাটুকু সরবে ঘোষণা করে ? অতএব

তাদের জন্যই 'রাত ইস্কুল' খোলা হয়েছে !

'রাত ইস্কুল' চলছে। সেই সঙ্গে চলছে 'সীতাহরণ' নাটকের মহড়া।

আমার দিদি মুনকু, ক্ষিতীশের দিদি খুকা, চাঁড়রা বুড়োর মেয়ে বাসন্তী, নেগড়ুগোপালের মেয়ে সুস্মিতা, মোহন রানার বোন ভুসকী, কাঁদুরার বহিন কাঁদুরী, প্রফুল্লর বোন চাঁপা, ধনু সাঁওতালের মেয়ে সুনি, সুরে চৌকিদারের মেয়ে বেহুলা —এরাই সব রাত্র ইস্কুলেব ছাত্রী।

দিদি মুনকু ছাগল চরিয়ে এল করনতলার বিল থেকে। তার দু'পা ভরতি ধুলো ! মাকে বলতে হলো না — এই মুনকু পা ধো, পা ধো। তার আগেই দিদি বাইরের কলসি থেকে জল গড়িয়ে পা ধু'ল। হাতের চেটোয় অল্প অল্প জল নিয়ে বেশ সুস্থির চিত্তে মুখ ধু'ল। একটুও তাড়াহুড়ো না করে কপালে চুলের গোড়া অব্দি ধুয়ে ফেলল। তারপর কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচলা টেনে হাত মুখ ধীরে সুস্থে মুছে নিল।

এত ধীর স্থির যে দিদির উপর মাঝে মাঝে রাগ হয় — আরেকটু জীবন্ত গতিশীল হতে পারে না দিদি ? আরেকটু দ্রুত হাত চালিয়ে কলসি উপুড় করে জল ঢেলে ফেলে পা ধুলে কী হয় ? মুখের উপর পিচকিরির মতো জল ছিটিয়ে মুখ ধুলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ? আমি হলে এতক্ষণে হয়তো জলের কলসিটাই অসাবধানে ভেঙে ফেলতাম। আর ভেঙে ফেলে অযথা মায়ের বকুনি খেতাম —

দিদি বকুনি খায় না, সে ছাগল চরিয়ে এসে দুপুবের জল ঢালা ভাত, নুন পেঁয়াজ কি চেঁকা শাকের চচ্চড়ি খায়। সামনে বসে থেকে মা তাকে আদর করে খাওয়ায়। বলে, আরেকটু ভাত দিই, আরেকটু চচ্চড়ি দিই সুরুবুড়ি ?

'সুরুবুড়ি' অর্থাৎ ছোট মেয়ে।

ছোড়দি খুব পরিপাটি করে ভাত খায় — থালার ভিতরে কি বাইরে একটা ভাতও পড়ে থাকে না। আমি হলে থালার চারধারে ভাত ছড়িয়ে একশা করতাম। আর তাই দেখে মা রাগে গজ্‌গজ্ করে বলে উঠত, হতভাগা ছেলে এতদিনেও খেতে শিখলি না !

শেষের দিকে খুঁটে খুঁটে একটা একটা ভাত খাচ্ছিল মুনকুদি। আমি মনে মনে তাড়া দিলাম তাকে — ওঠ, উঠে পড় ছোড়দি। আর তোকে খেতে হবে না — ঐ কটা ভাত না খেলে কি হয় ?

ছোড়দি ছাড়ল না, শেষ ভাতটা পর্যন্ত নখে টিপে মুখে পুরলো। তারপর আস্তে আস্তে হাত মুখ ধুয়ে হেরিকেনের চিমনি ছাই নিয়ে বসলো সাফ করতে। চিমনি খোলার সে কি শম্বুক-ভঙ্গিমা দিদির। হেরিকেনের ঘোড়াটাকে প্রথম প্রথম উসকিয়ে-মিচকিয়ে দেখলো বারকতক। তারপর বুড়ো আঙুলেব ডগায় খিটকিনিটার উপর ধীরে ধীবে চাপ দিল — যেমন কবে শহুরে সোনারুপোর গহনার দোকানদাব তার তুলাদণ্ডের আঙটায় হাত বেখে বাড়িয়ে-কমিয়ে দেখে। তেমনি করে আমাদের ছোড়দি হেরিকেনের চিমনিটাকে সাবধানে — অতি সাবধানে উপরের দিকে তুলল। কী যেন উঁকি মেবে একবার দেখল। তাবপব সন্তুষ্ট হয়ে এক পায়ে হেরিকেনের নিম্নাংশ চেপে একহাতে হেরিকেনেব মাথাটাকে টেনে ধীবে সুস্থে কাচটাকে খুলে ফেলল।

এবার ছাই দিয়ে ধীরে — অতি ধীরে হেরিকেনের চিমনিটাকে ঘষতে লাগল। রিন-ঠিন কবে হাতের চুড়ি বাজতে লাগলো ছোড়দির। মনে মনে বললাম, হাতে কি তোর জোরও নেই ছোড়দি ? আরেকটু জোড়ে ঘষ না। আমি হলে এতক্ষণে ঘষতে ঘষতে কাচেব চিমনিটাকে ভেঙে ফেলতাম। আর ভেঙে ফেলে মায়ের চড়-চাপড় খেতাম।

মুনকুদি হেরিকেন জ্বেলে, বই-সেলেট হাতে রাত-ইস্কুলে যাবাব জন্য তৈবি, মাকে ধরে বসলাম — আমিও যাব মা !

তুই কেন ? হাসতে হাসতে মা বলল তোর তো দিন —— ইস্কুল — তুই আমার দিনমণি ও আমাব রাতের মণি ! মুনকুটা দিন-কানা, দিনের বেলা বইয়ের অক্ষর দেখতে পায় না, লক্ষ্মীপেঁচা !

কাক, পেঁচা, গুয়ে-বনি--সে তুমি যা-ই বল মা, আমি যখন যাব বলেছি যাব ! শুধু কি বাত-ইস্কুল ? 'সীতাহরণ' নাটকেব মহড়া চলছে যে !

মা ছেড়ে দিলেও ছোড়দি কি সহজে সঙ্গে নিতে চায় ? সে তো তার হেরিকেন হাতে পিঁপড়েব চেয়েও অধোগতিতে হাঁটে। আমিও যথাসম্ভব আলোব বলয়ের বাইরে অন্ধকারেই দিদির পিছু পিছু হাঁটি। কখনও আমার গতিবেগেব দ্রুততা হেতু হেরিকেন-আলোব বৃত্তের ও মুনকুদির দৃষ্টির ভিতব যদি এসে পড়ি তবে ছোড়দি চোখ কটমট করে তাকায়। তখন আমিও আমার হাঁটার গতি আচমকা বন্ধ রাখি।

আমাদের গ্রামের লোকালয়ের অনতিদূরে আমাদের গ্রামেরই নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রাত-ইস্কুল খোলা হয়েছে। খুকাদি, ভুসকীদি, চাঁপা, বাসন্তী, সুনি সবাই একে একে হাজির। তারা মাটিতে চটের উপর বসে চার-পাঁচটা হেরিকেনের আলোয় ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়ার কাজ করছে। আর ওদিকে আরো চার-পাঁচটা হেরিকেন হেথাহোথা টাঙিয়ে দু-দশটা কাঠ বেঞ্চি জড়ো করে তার উপর চলছে 'সীতাহরণ' নাটকের মহড়া।

বিভূতি হয়েছে সীতা। সীতারূপী বিভূতি জড়ো করা কাঠ বেঞ্চির এককোণে জুবুথুবু হয়ে বসা — বোধ করি তার এবার 'রোদন করার পালা' আসছে।

রাম লক্ষ্মণ যখন কাঁড়-কাঁড়বাঁশ হাতে মঞ্চের উপর দাপাদাপি করে তখন ভয় হয়—পাছে তাদের দাপটে জড়ো করা বেঞ্চিগুলি এবার না সত্যি সত্যি ভেঙে পড়ে। রাম হয়েছে অনন্ত আর আশুতোষ লক্ষ্মণ। তাদের দু-জনের হাতেই কাঁড়-কাঁড়বাঁশ। তারা কাঁড়-কাঁড়বাঁশ হাতে নিয়ে মঞ্চে ঘোরাঘুরি করছে।

কাঁড়-কাঁড়বাঁশ অর্থাৎ তীর-ধনুক।

সে তীর-ধনুকও ভারি অদ্ভুত। ছিলা পরা ধনুকের মাঝ বরাবর একটি ফুটো — সে ফুটোর ভিতর দিয়ে বাঁশের তীর গলানো। ছিলা থেকে ধনুকের ছিদ্র পর্যন্ত তীরটির অংশভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা। ধনুকের ছিলা আকর্ণ টেনে তীর ছুঁড়ে দিলেও সে তীর হাত ফসকে ধনুক

ছেঁড়ে আর কোথাও যায় না, কাউকে তীরবিদ্ধ করে না, বড়জোড় ধনুকের গায়ে লেগে খটাং করে আওয়াজ হয় !

অনন্ত আর আশুতোষ কাঠবেঞ্চির উপর ঘুরছে ফিরছে, 'একেকটা পাট' বলছে আর কাঁড়-কাঁড়বাঁশ ঘন ঘন আওয়াজ তুলছে খটাং খটাং ! যেন কে কত জোরে আওয়াজ তুলল তার উপরই বোঝা যাবে কে কত বড় বীর ! অনন্তের চেয়ে আশুতোষের কাঁড়-কাঁড়বাঁশের আওয়াজ অতিশয় ভারি । বোধকরি অনন্তের কাঁড়-কাঁড় বাঁশটি কাঁচা বাঁশের, এখনও ঠিকমত শুকোয়নি । আর আশুতোষেরটা পাকা ঝুনো বাঁশের । তাই খটখটে, আওয়াজটাও বেশি ।

কাঁড়-কাঁড়বাঁশের টংকারে ইস্কুলঘর ভরে যাক, সীতারূপী বিভূতির রোদনে পাতাল মেঘ-পাতাল পশুপক্ষী তরুলতা যতই 'হা সীতা' 'হা সীতা' বলে কেঁদে উঠুক, রামরূপী অনন্ত লক্ষ্মণরূপী আশুতোষ যত ভাল ডায়লগই দিক না কেন – রাত ইস্কুলে আসা মেয়ে-পড়ুয়াদের পড়া কিন্তু থামল না । সেই যে তারা একবার মাথা ঝুঁকিয়ে গুনগুন করে পড়া শুরু করেছিল – সে গুঞ্জন এখনও থামেনি । মাঝে মাঝে মহড়া দেওয়ার অবসরে সীতা কিংবা রাম কি লক্ষ্মণ পড়ুয়াদের কাছে উপস্থিত হয়ে এটা-ওটা দেখিয়ে দিচ্ছিল – সাত কত্তে সাত, সাত দুগনে চৌদ্দ, চৌদ্দের চার বসল, হাতে রইল এক – হাতের কড় গুণ না রেউলা !

সুবো চৌকিদারের মেয়ে বেহুলা হেরিকেনের আলোয় আঙুলে থুথু লাগিয়ে হাতের কড় গুনতে বসলো । মোহন রানার বোন ভুসকী এখনও ভাল করে অ-আ-ই শেখেনি – সে শেলেটে লেখা অ-আ'র উপর সেই থেকে দাগ বুলোচ্ছে । তাই দেখে আমার খুব হাসি পেল – অত বড় মেয়ে যে কিনা দেখতে অত সুন্দরী, সে এখনও অ-আ শেখেনি ! আমার ভারি ইচ্ছা–এক ছুটে তার পাশটিতে গিয়ে বসি । বলি, আজই তোমাকে 'ৎ'-অব্দি শিখিয়ে দিচ্ছি । ভুসকীদি, দাও তো শেলেটটা !

'সীতাহরণ' নাটকে এবার শুরু হলো গান । একদল নাচুয়া হাতে 'চাঙ্' যন্ত্র নিয়ে কাঠ বেঞ্চির মঞ্চে উঠে চুড়িয়া নাচের মতো নেচে নেচে গাইতে লাগল –"সীতাঙ্ক মুখকু চাহি বলই রাবণ । গো আহে রামারব ! কেউঁ দেশে ঘর ভুস্তে রহিঅছি বন ।"

তার উত্তরে সীতা বলছে, "স্বামী মোর দশরথ রজাঙ্ক কুঁওর গো আহে যোগীবর । পিতৃসত্য পালিবাকু এহি বনবাস গো, এহি বনবাস ।"

'সীতাহরণ" নাটকের মহড়া যখন তুঙ্গে, সোনার হরিণ সেজে মারীচ যখন এসে গেছে আসবে, রামের কাঁড়-কাঁড়বাঁশ হরিণ-শিকারে 'খটাং খটাং' করে ঘন ঘন টংকার তুলছে, আরেকটু হলেই 'ভাইরে লক্ষ্মণ' বলে মারীচ নকল গলায় ডাক দেবে – বলতে লজ্জা, তখন আমার ভয়ানক 'ছোট-বাইরে' পেল ।

গিয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে ছোড়দিকে বললাম । পাত্তাই দিল না মুনকুদি । আমি তখন আমাদের 'দিন ইস্কুলে' 'ছোটবাইরে' কি 'বড়বাইরে' যাবার সময় হেডস্যারকে হাত জোড় করে যেমন বলি তেমনি হাত জোড় করে বললাম, 'ছোড়দি বাইরে' !

মুনকুদি তেমনি অবিচল একটিও কথা বলল না । বোধকরি মায়ের কাছে আব্দার করে, তার সঙ্গে রাত-ইস্কুলে আসার এতক্ষণে শোধ তুলল !

হাত জোড় করে তখনও দাঁড়িয়ে আছি, মোহন রানার বোন ভুসকীদি শেলেট ফেলে উঠে এল এই মুনকু হচ্ছেটা কী ! যা না ভাইকে আলো দেখিয়ে বাইরে নিয়ে যা !

মুনকুদি ঘাড় না তুলেই বলল, কে ওকে আসতে বলেছিল ! যেমন কর্ম তার ফল ভোগ করুক এখন । আমি এই অঝোরঝর অন্ধকারে ইস্কুল ছেড়ে আর কোথাও মেরে ফেললেও যাব না !

উরে জিদ্দি মেয়ে ! বলেই ভুসকীদি একহাতে হেরিকেন, আরেক হাতে টানতে টানতে আমাকে বাইরে নিয়ে এল ।

হোক সে মাটির দেওয়াল খড়ের চালঅলা জানলা-ভাঙা দরজা-ভাঙা ইস্কুল, যেহেতু ইস্কুল লেখাপড়াব জায়গা সেইহেতু পবিত্র। তাই ইস্কুলের কাছাকাছি কেউ অপকর্ম কবে না। 'ছোট বাইরে' সারতে হলেও আমাদের যেতে হয় ইস্কুল ছেড়ে শ'গজ দূরে ঝুনঝুনি ঝোপ আতা ঝোপেব আড়ালে।

ভুসকীদি আমাকে হাত ধবে নিয়ে গেল সেখানে। ইস, ভুসকীদিটা কি ভাল! কৃতজ্ঞতায় মন আমার ভবে যাচ্ছিল। হেরিকেন মাটিতে বেখে উল্টোদিকে মুখ করে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। আমি আমাব কাজ সাবলাম। কিন্তু কাজ সেবে উঠে দাঁড়াতেই দেখি — কোথায় ভুসকীদি! শুধু মাটিতে একটা টিমটিমে হেরিকেন আব তাব পিছনে অথৈ অন্ধকাব! মুনকুদির ভাষায় অঝোবঝর অন্ধকার। আমিও বলি এ অন্ধকারের যেন আদি নেই অন্ত নেই শ্রী নেই সৌন্দর্য নেই কু নেই কদর্যতাও নেই, আগম নেই নিগম নেই — নিগমা নিবাকার — এ অন্ধকাব বর্ণনার অতীত, কল্পনাব অতীত। এ অন্ধকার রচনা-বিরচনা-আলোচনা-সমালোচনাব অতীত। এ অন্ধকাব ভয়ের উর্ধ্বে ভাবনার উর্ধ্বে, চেতনা-অবচেতনার উর্ধ্বে এমনটি ইহজন্মে আব কখনও দেখিনি! মুহূর্তে কে আমি, কাব কাঁড় কাব কাঁড়বাঁশ, কে সীতা কে ভুসকী — সব যেন বিস্মৃত হলাম! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রিঁ রিঁ করে। কিন্তু মূর্ছা ও পতনেব আগেই কোত্থেকে ঝোপঝাড় ফেড়ে বেবিয়ে এলো ভুসকীদি। তাকে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাব বুকের উপর, কাঁকড়াব মতো দু-হাতে জড়িয়ে ধবলাম।

আমাব পিঠেব ওপর হাতেব মৃদু থাবড়া দিতে দিতে ভুসকীদি বলল, তোব বুকটা পাযবা ছানাব মতো ধুকধুক কবছে — খুউব ভয় পেয়ে গেছিস ললিনভাই?

কোমল তুলোগাদাব মতো বুকে মুখ লুকিয়ে কেন জানি বলে ফেললাম, আমাকে ছেড়ে আব কোথাও কখনও যাবে না তো ভুসকীদি?

ভুসকীদিও বলল, না ভাই এই কানমলা খাচ্ছি, আব কোথাও কোনও দিনও —

আমাদেব গ্রামেব 'উপব কুলহিতে' কামাব বাড়ি। শ্রীবামচন্দ্র রানা, শ্রীমোহনচন্দ্র বানা — সম্পর্কে কাকা-ভাইপো। তাদেব ঘবেব পাশে গোঠ টাঁড়েব মাঠেব ওদিকে কামাবশালা। সেখানে সকাল-বিকেল লোকজনেব ভিড় — খান্দাব পাড়া, বড়োডাঙা, নুযাসাহী, চঁদবপুর, রুখনীমাবা, সুখজুড়ি, কদমডাঙা ডাঙাসাহি থেকে ফাল-কোদাল দা-কুড়ুল 'পাজাতে' গোরুব গাড়িব চাকার মুখপাত লাগাতে কড়া-ঝিঁঝবি কাঁটা-বিলাইকাঁটা বানাতে লোক আসে।

তারা তাদের পাজানো জিনিসটা হাতে নিযে সদ্য 'জলধবা' ধার পবখ করতে করতে বলে, নাঃ হেঃ রামচন্দ্র বানা-মহনা বানাব হাতের কাজ আছে। এতল্লাটের সেরা কামাব, ফার্স্টকেলাস।

বলতে বলতে তাবা কামারদেরই উঠোনেব লতানো ঝিঙে কি কাঁকুড়গাছের পাতা ছিঁড়ে গবম ধার দেওয়া যন্তবটাকে মুড়ে নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিল। তখন ঝিঙে লতায় কাঁকুড় লতায হয়তো পড়ন্ত আড়বেলাব রোদেব ঝিরিঝিরি খেলা, কাক-শালিকের ছানাদেব হাঁ-মুখেব মতো ঝিঙে ফুল কাঁকুড়ফুল স্ফুটনোন্মুখ! এই ফুটল বলে! খলা-খামাবেব সেই ঝিঙেলতা কাঁকুড়লতার মাচানতলায বসে ভুসকীদি হয়তো শিংয়ের কাঁকই আব লাল ফিতা দিয়ে মাথা বাঁধছে আব মুখে গুন গুন করে গাইছে —

'ঝিঙাফুল কাঁকুড়ফুল ফুটে বদোবদো গো'

দিন-ইস্কুল শেষে লাউ ফুলেব মতো সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে ওদিকে বেড়াতে গেছি, হযতো মনে মনে নতুন কালিকো গেঞ্জিটাকে দেখাতেই গেছি, ভুসকীদি হাত নেড়ে কাছে ডাকলে, আয় ভাই! বলল, বস্ ভাই, নতুন কিনলি বুঝি? বলেই স্যাণ্ডো গেঞ্জিব একটা কাঁধ টেনে দেখলো — বাঃ খুব সাফা ত।

তারপর মাথাব চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে শিংয়েব কাঁকই নিয়ে আঁচড়াতে বসল —মাথাব

চুলগুলোও ঠিকঠাক আঁচড়াতে পারিস না রে ললিন ?

আমার তখন ভুসকীদির শিং-চিরুণীর দাঁড়ায় মাথার চুল উপড়ে যাবার জোগাড়। উঃ আঃ করেও নিস্তার পাচ্ছি না। ভুসকীদি গজগজ করে বলে চলেছে, গোঠ টাঁড়ের মাঠে তুই যখন দৌড়াস তোর চুলগুলো ঘোড়ার ল্যাজের মতো নাচে – সে জানিস কি ?

আমার মাথার চুল বরাবরই লম্বা, দৌড়তে গেলে লম্বা চুল যদি ঘোড়ার ল্যাজেব মতো লাফায় – তাতে কার কি ক্ষতি, কার কি যায় আসে !

বললাম, তাও ভাল বলেছো চুলগুলো ঘোড়ার ল্যাজের মতো। ভাগ্যিস বলনি–তোর মুখটাও ঘোড়ার মুখের মতো নলিন।

অ রে ! আমার গালের উপর চকাস-শব্দে একটা আস্ত চুমু খেয়ে ভুসকীদি বলল, খুব যে পাকা-পাকা কথা। ঘোড়া কেন হবি ভাই, তোর মুখটা হক রাজার মতো !

বলেই গান ধরল –'হাতি চড়ি আয়ো তো ইন্দর রাজা, ঘোড়া চড়ি আয়ো তো করম রাজা''– হ্যাঁরে ললিন, এবছর করম গাড়বি নাই ভাই, করম ?

বর্ষা প্রায় শেষ। চাষবাসের কাজও উঠে গেছে।

বনে-ডুঙরিতে 'পরব-ছাতু' ফুটতে শুরু করেছে। ভোর ভোর জঙ্গলে যে যায় ফেরার সময় একটা হোক দুটো হোক শিশির ভেজা পরব ছাতু সে হাতে করে নিয়ে আসে।

পরব-ছাতু – তাব মানে দুর্গাপূজার আগে আগে ফোটা ব্যাঙের ছাতা।

পরব-ছাতু ফুটলো। ভাদরের গাদর মকাও শেষ – মকা ক্ষেতে এখন একা একা কাকতাড়ুয়া।

সন্ধে হলো তো আর রাত ইস্কুলে যাওয়া নেই। আমাদেব উঠোনেই জড়ো হচ্ছে মেয়েরা – মুনকু, খুকা, সুস্মিতা, ভুসকী, রসনা, তরু, সাজো-বালার দল।

শুনতে পাচ্ছি খুকাদি বলছে, রাখ তোর রাত-ইস্কুল ! ঘরে আব কদিন বাদেই কবম – কোথায় সঞ্ঝাবেলা 'জাওয়া' জাগাব, তা নয় হিস্কুল না ফিস্কুল !

সুস্মিতা বলল, ককিল মাস্টার আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, বলছে মেয়েরা যতসব 'পেঁদ' নিয়ে মেতে আছে —

হুঁ, মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠল ভুসকীদি, ককিল মাস্টারই খালি সৎ আর সব পেঁদ – আন তো মুনকু জাওয়া ডালা – 'সবনরেখার বালি দিয়ে জাওয়া পাতিব গো' –

ধীরে অতি ধীরে উঠে গিয়ে মুনকুদি আমাদের মাঝু ঘর থেকে জাওয়া ডালা নিয়ে এলো। তাতে রয়েছে অঙ্কুরিত সরিষা মুগ বিরি কুরথি কলাইয়ের চারা, অন্ধকারে আলো খুঁজে খুঁজে এই কদিনেই চারাগুলো বেশ ডিগডিগে হয়েছে। আমি লুকিয়ে কটা ঝিঙেবিচি ডালার বালিতে পুঁতে দিয়েছিলাম – কই সে তো গাছ হয়নি ? ঝিঙের অঙ্কুরিত পাতা তো বেশ মোটা মোটা ?

উঁকিঝুঁকি মারছি দেখে মুখ ভার করলো মুনকুদি। কিন্তু আমাকে দেখেই ভুসকীদি গেয়ে উঠলো।

"মা বাপে বেহা দিল বড় লদীর পারে
আর কি রহিব বাপো ঘরে –
বেহা যে দিলি ভাই রে বড় লদীর পারে রে
আনা-লেগা কে করিবে আর –"

আমার মা এসে হাসতে হাসতে বলল, কেন মা তোর ভাই আমাদের নলিন আছে না ? আমি তাই চাই – আমাদের ভুসকীর বিয়ে হোক বড় নদী গঙ্গার ওধারে কইলকাতায–

আমার নাম উঠতে লজ্জায় ঘরের ভিতর ঢুকে এলাম। ভুসকীদিও লজ্জায় কাতরতার

ভান করে বলল, হ্যাঁ কাকী আমি তো বোঝা — আমাকে অত ধুরে না পাঠালে হয়।

ছোড়দির বোধ করি এসব ভাল লাগছিল না, সে গুনগুন করে সুর ধরল —

তুললম ডালি ডালি আরো কত জালি গো—'

একাদশীর দিন সকাল থেকেই 'ছামড় গাড়া' শুরু হলো। 'ছামড়া' হল খুঁটি পুঁতে মঞ্চ তৈরি করা — আঙিনায় কাঁচা শাল খুঁটি পুঁতে তার উপর চাপান দেওয়া হল শালডালা। চারদিকে শালপালার বুনো গন্ধ। মনে হচ্ছে তপোবনের গোটা শাল জঙ্গলটাই বুঝি আজ আমাদের উঠোনে উঠে এসেছে।

ছামড়ার উপর যা ডাল পালা উঠলো উঠলো বাদবাকি 'পালাপতর' ছাগল গোরুতে টেনে-হিঁচড়ে খাচ্ছে। ঘরের ভিতর মা কাকীরা বিবি কলাইয়ের ডাল বাছছে — তাই সেদ্ধ করে খিচুড়ি হবে। ছেলেপুলেরা খাবে।

আমি আর আমার জেঠতুতো ভাই ক্ষিতীশ — দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ আমাদের খুব ফান্টা। আমরা করম আনবো।

আমাদের উঠোনে উঁচু পিঁড়ায় জড়ো হয়েছে গাদাগুচ্ছের ছেলেমেয়ে। ভূত এসেছে অরবিন্দ এসেছে, ভবানী গুরা মহীধর গঙ্গাধর — সব একধারসে হাজির। মুনকুদি খুকা বাসন্তী চাঁপা সুস্মিতা, ভুসকীদিরাও হাজির। তারা মাঝে মাঝে থেমে থেমে গাইছে —

'পিঁড়া ছাঁচোরে দাদা মাচি বুনো রে

আজ আসবেক করম রাজা বসবেক রে —'

দাওয়া পরিষ্কার করো, দড়ি দিয়ে ছোট জলচৌকি বোনো—আজ করম রাজা এসে দাওয়ায় জলচৌকিতে বসবে —

উপস্থিত ছেলেছোকরা ন্যাঙটা-ভুটুঙের দল খুব হুরি করে উঠলে তারা হাসতে হাসতে গান ধরলো —

'আজ রে ছানাপোনারা বিবিখিচড়ি

কাল রে ছানাপোনারা দাঁত গিজড়ি —'

ঘুরে বেড়াচ্ছি, মা বলল, আজ শুধু ঘুরে বেড়ালে হবে বাবা — যা গিয়ে পল্লাদের পুকুর থেকে কিছু শালকফুল আর শালুক নাড়া নিয়ে আয়। আসার সময় দশরথকেও বলে আয় — ওবেলার জন্য গ্রাম ফণ্ডের লাইট-দেড়লাইটগুলো —

আমি আর ক্ষিতীশ দৌড়ালাম পল্লাদের পুকুরঘাটে। রাতে ফোটা শিশিরসিক্ত শালুকফুলগুলো পরিপূর্ণ ফুটে রোদ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন নিজেদের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। কুঁড়ি, ফোটা, স্ফুটনোন্মুখ শালুকের সমারোহে পল্লাদের পুকুর বড়ো মনোহর রূপ ধারণ করেছে!

'পল্লাদ' অর্থাৎ প্রহ্লাদ এখন নেই। থাকলে 'হুরি' করত।

আমরা পরম নিশ্চিন্তে প্রহ্লাদের পুকুর ঘেঁটে একগাছা ডাঁটি সহ শালুক ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ফিরেই বসলাম ফুল দিয়ে ছামড়া সাজাতে। শালুকের ডাঁটি একটু একটু করে ভেঙে রুদ্রাক্ষের মালার মতো মালা গেঁথে মণ্ডপের চারধারে ঝুলিয়ে দিলাম। কতক মালা অবশিষ্ট পড়ে থাকল ও-বেলার জন্য —'পাঁতা নাচ' নাচতে আসবে যে নাচুয়ারা, তারা গলায় পরে নাচবে।

গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে ভুসকীদি বলল, পরিয়ে দে!

বললাম, সে তো ওবেলার জন্য যখন পাঁতা নাচ নাচবে —

ললিন ভাই, আমি যদি ই বেলায় নাচি ? তাবে ?

বলেই ভুসকীদি একটা হাত কোমরে আর একটা হাত মাথার উপর তুলে নেচে নেচে গাইতে লাগল —

'শালুক লাড়ার কোমরদড়ি হাল বাইতে পড়ে মরি –'

সন্ধে হতে না হতেই গ্রাম ফাণ্ডের লাইট-দেড়লাইট এসে গেল, এসে গেল লাইটম্যান পুটু যার ভাল নাম আনন্দ। সে এসেই প্রথমে ঝপাঝপ তেল ভরে নিল লাইটগুলোয। তারপব জ্বালাতে বসল।

মুহূর্তে আমাদের ঘর-উঠোন আলোয় আলোকিত হয়ে গেল। তার মধ্যে একটা আলো হাতে নিয়ে পুটু বলল, চল্‌বে ছানাপোনারা –

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপুলের দল হুরি কবে উঠলো। আমি আর ক্ষিতীশ স্নান সেরে নতুন কোরা কাপড় পরে তৈরি – এবার জঙ্গলে যেতে হবে কবম আনতে।

মা বলল, শুধু পুটু আর চ্যাঙনাব দল – দু-চাবজন বড়বাও যাক সঙ্গে।

শাঁক মাদল বেজে উঠল মুনকু খুকা সুস্মিতা বাসন্তীর দলও গেয়ে উঠল – 'ডহর ডহর রে দাদা ডহর কত ধূব –'

ভুসকীদি ? দলের মধ্যে ভুসকীদি নেই কেন ? মনটা কেমন যেন হাহাকাব কবে উঠল – অমন 'হাউসী' মেয়েটাই নেই যদি তো করম এনে কী হবে ?

সন্ধে-বাত ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে, মাঝুডুবকাব জঙ্গলে রাত বাড়ছে, কবম-কইম গাছের বড় বড় পাতার ওপব টপা-টপা কবে বোধ কবি শিশিব পড়ছে, একটানা ঝিঁঝিঁ কবে বুনোপোকার দল সমানে ডেকে চলেছে। আমি আব ক্ষিতীশ কবম গাছেব পাশাপাশি সুতো জড়ানো দুটি ডালের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় ঝোপঝাড় ফেড়ে কোত্থেকে ভুসকীদি হাজিব হয়ে কানেব কাছে ফিসফিস করে বলল, ললিন ভাই এক কোপে কেটে ফেলবি।

আমরা দুভাই এক এক কোপে সুতো জড়ানো কবম গাছের ডাল দুটিকে কেটে কাঁধে করে বাড়ি ফিরছি, আগে আগে ভুসকীদিবা গেয়ে চলেছে –

'আজ ত বে কবম রাজা ঘ্‌বে দুয়াবে

কাল ত বে কবম বাজা সবন্‌বেখাব পারে –'

বাড়ি এনে ছামড়াতলায ডাল দুটিকে পুঁতে কবম গাড়া শেষ হলো। আমবাও উপোস ভেঙে বিরি-খিচুড়ি খেয়ে মণ্ডপেব চাবধাবে ফূর্তিতে ঘুবতে লাগলাম। ক্ষিতীশেব আমাব আজ খুব ডাঁট – আমরাই মাথায় কবে করম এনেছি যে! উপস্থিত ন্যাঙটা-ভুটুঙেব দল আমাদেব খুব খাতিব কবলো।

করম ডালদুটির কাছে মুনকুদি খুকা ভুসকীদিরা এবাব জাওযা ডালাটা এনে রাখলো। সেই অঙ্কুবিত সরিষা মুগ বিবি কুব্‌থি কলাইয়ের চাবা – হ্যাজাক লাইটেব আলো পড়ে নবীন চারাগুলো এখন লহ লহ করছে। তার চারধারে ব্রতচারিণী ছোড়দি খুকাদি বাসন্তী সুস্মিতা ভুসকীদি – সব একে একে থালায় কবে হলুদ ন্যাকড়ায মোড়া কাঁকুড়, মাটিব ঘোড়া, জলভরা ঘটি, গ্লাসভরা দুধ নিয়ে গোলাকাবে বসে গেল। মণ্ডপেব মাঝখানে নতুন দড়ি দিয়ে বোনা মাচিতে বসে পাযেব উপর পা মুড়ে হাত ঘষতে ঘষতে আমাদের গ্রামের ভবতবুড়ো 'কইনী' শুরু কবল এই বলে, শোন রে ছানাপোনারা –

কাহিনী, ভরতবুড়োর 'কইনী' বলার ভঙ্গিমা, ব্রতচারিণীদের নৈবেদ্যদানেব পদ্ধতি এতবার শুনেছি-দেখেছি যে – সব আমাদের একধারসে মুখস্থ! ভরতবুড়ো বলবার আগে ফিসফিস করে আমরা নিজেবাই বলতে লাগলাম – সেই করম ধবম দুই ভাই, ধবম গেল বাণিজ্যে, করম মেতে থাকলো করম উৎসবে, ফিবে এসে তাই দেখে ধবমেব কী বাগ, উপড়ে ফেলল কবম ডাল, লাথি মেবে ভেঙে ফেলল পূজার ঘট –

'করম রাজা' যাত্রাপালায় এখানে একটি গান আছে –'কি দিয়ে পূজিব তোমার ও বাঙা চরণ, লালফুলে পূজিলে কি পূজা হয় তোমার ?'

সে যা হোক ধবমেব অহংকাবে ধবম কবমেব 'কবমবাম' হলো, তাবপর কবম চলল

সাত সমুদ্দুর লঙ্কা পার থেকে করম রাজাকে ফিরিয়ে আনতে।

যেতে যেতে জলহীন পুকুর পড়ল পড়ল গোরুর গোঠ, ঘোড়ার গোঠ, ডুমুর গাছ। পুকুরে জল নেই, ভরতবুড়ো বলল, দাও রে ছানাপোনারা এবার একটু জল দাও। অমনি মুনকুদিরা ঘটি থেকে সামান্য জল মাটিতে ঢেলে দিল। গোরুর গোঠে গাই থেকে করমকে দুধ দিল না তো ভরতবুড়ো বলল, কইরে ছানাপোনারা এবার একটু দুধ দাও। বলতে না বলতে ভুসকীদিরা গ্লাস থেকে সামান্য দুধ ঢেলে দিল মাটিতে। ঘোড়ার সময় মাটির ঘোড়াগুলো এগিয়ে দিল আর ডুমুর ফলের সময় হলুদ ন্যাকড়ায় মোড়া কাঁকুড়ফল –

যেতে যেতে করমের সঙ্গে এক বুড়ীর দেখা যে বুড়ির পা দুটো উনুনে, এক বুড়োর দেখা যে বুড়োর পিঠে মস্ত কুঁজ, এক কুমীরের সঙ্গে দেখা যার পিঠ জলে ডোবে না। করম রাজার কাছে যাচ্ছে শুনে যে যার দুর্দশার কথা করমরাজাকে জানাতে বলল।

করম রাজাকে সন্তুষ্ট করে ফেরার সময় করম কোন পাপে কার কি দুর্দশা – সব একে একে জানিয়ে দিল আর বলল বামুন-বোষ্টমকে দান করতে, তবেই পাপ থেকে মুক্তি। তারা বলল, বামুন-বোষ্টম কোথায় পাই, তুমিই আমাদের বামুন তুমিই আমাদের বোষ্টম – দানধ্যান তুমিই তবে গ্রহণ কর।

দানধ্যান নিয়ে খুব বড় লোক হয়ে করম বাড়ি ফিরে ধূমধাম করে করম রাজার পূজা করল। করম রাজার কইনীও ফুরোল নটে গাছটিও মুড়োল, কেনরে নটে মুড়োলি, না – ইত্যাদি ইত্যাদি।

'কাঁকুড় চুরির সময় খুব মজা হলো। কাঁকুড় উৎসর্গ করে থালায় রেখেছিল ভুসকীদি – আমি পিছন থেকে চুপিসারে নিয়ে দে দৌড়।

পিছন পিছন দৌড়ুচ্ছে ভুসকীদি, আমাদের আশ ধানের খড়ের গাদায় এসে আমাকে ধরে ফেলল। প্রথমে খড়ের গাদায় ফেলে আমার দু-গালে দু-দুটো চুমু খেলো ভুসকীদি। তারপর কাতুকুতু দেওয়া শুরু করলে হাসতে হাসতে হাতের মুঠো আলগা করে দিলাম আমি। খড়ের গাদায় শুয়ে তখনও শুনতে পাচ্ছি কাঁকুড় হাতে ভুসকীদি গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে –

'ঝিঙাফুল কাঁকুড়ফুল ফুটে রদোরদো গো

আর কি রহিবো বাপো ঘরে গো –'

একটু রাত করে শুরু হল পাঁতা নাচ। পাঁতা নাচ দেখব বলে আমার দুচোখে ঘুম নেই – করম উৎসবের পাঁতা নাচই তো দেখবার মতো জিনিস, সেরার সেরা। কাঁচা শালডালার ছামড়া, তার নিচে ফিট-জোছনার মতো হ্যাজাক লাইট। রাত পোকা ঘুরে ঘুরে আলোর চারধারে শোভা বেঁধেছে। আধফোটা শালুকফুল মালা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে নিশি না পোহাতেই বোধকরি ফুটে গেল।

নাচগানের আশায় আশায় আমাদের উঁচু পিঁড়ায় বসে ব্রতচারিণীর দল ঢুলতে শুরু করেছে। চাঁড়রা বুড়োর মেয়ে বাসন্তী ঢুলতে ঢুলতে মাথা রেখেছিল মুনকুদির কোলের উপর – পাঁতা নাচ শুরু হতেই চনমন করে জেগে উঠল।

পাঁতা নাচ, কাঠি নাচ, চাঙ্গু নাচ, টুসু গান, মহুয়া নাচের আসর বসলে যার ডাক পড়ে আগে – সে হল প্রফুল্ল, নুয়াসাহির প্রফুল্ল সিং। প্রফুল্লই শুরু করল। প্রায় জনাকুড়ি লোক হাতে হাত গলিয়ে মুঠোয় মুঠো ধরে নাচতে লাগল। করম তলায় শিকলের মতো করে টাঙানো শালুকের মালা ছুঁয়েই গান শুরু করেছিল প্রফুল্ল –

'লাল শালুকের ফুল ফুটে আধা রাইতে

যার সঙে যার গোপন পীরিত মরিলে কি ছুটে, বন্ধু

মরিলে কি ছুটে –'

ভুসকীদিকে কোথাও দেখছি না – সারাদিনের উপোস, ক্লান্তিতে তবে কি শুয়ে পড়েছে?

ধীবে ধীরে পাঁতা নাচেব আসরটাও কেমন যেন ম্যাড় ম্যাড়ে, ঘুমে ঢুলে পড়ল। প্রফুল্লর পবে গান ধবেছিল বৈকুন্ঠ, উচ্চাঙ্গের গান সব, ঠিকমত জমাতে পারল না। ভাঙভুড়রু আসর দেখে পিঁড়ায় বসে থাকা মুনকু খুকা বাসন্তী সুস্মিতার দলও ঘন-ঘন হাই তুলল। আচমকা কোত্থেকে মাথার চুলে ময়ূরের পালক গুঁজে আসরে হাজির হল ভুসকীদি। এসেই ধরে দিল –

'কুল্হি কুল্হি যাতেছিলি বাঁশিটি বাজায়ে দিলি

তর্‌হা নাকি বড়ই মনচোরা

দুকানে দু কদমফুল ভরা –'

সঙ্গে সঙ্গে ঝুপঝুপ কবে পিঁড়া থেকে নেমে 'পাঁতা নাচ' নাচতে শুরু কবে দিল বাসন্তী সুস্মিতারাও। দল হয়ে গেল দুটি – পুরুষদের দল আর মেয়েদের দল। মুনকুদি খুকাদি নাচতে পাবে না, তাই তাবা পিঁড়ায় বসে থেকে হাসি হাসি মুখ করলো। হাসিতে হল্লায় করমতলা অতঃপব জমজমাট।

যে বঙ ধরিয়ে দিয়েছিল ভুসকীদি সে বঙ সহেজ কমলো না, ববঞ্চ উত্তবোত্তর বাড়তে লাগল। আরো ভাল ভাল গাইলো প্রফুল্ল, উচ্চাঙ্গেব গান ছেড়ে বঙেব গান ধবলো বৈকুন্ঠ। রসের ভিয়েন বসিয়ে আবাব কখন কোন ফাঁকে ভুসকীদি নিরুদ্দেশ –

কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল আমাবও। খেয়াল হতে আশেপাশে ঘুরে দেখলাম – দেখি তো ভুসকীদি কোথায় ? আশ-ধানেব বিড়াগাদাব উপব ময়ূব পালকেব জেল্লা দেখে দৌড়ে গেলাম। ভুসকীদি আলুথালু বেশবাসে খড়গাদায় শুয়ে।

হাঁটু গেড়ে পাশে বসতেই আমাব গাল দুটো চেপে ধবে নিজেব মুখেব দিকে টানতে টানতে ভুসকীদি বিড়বিড় কবল, খুব পাকা হয়েছিস ললিন ভাই, নাই ?

কিছুটা আনত হয়ে বুঝলাম – মদে চুব হয়ে আছে ভুসকীদি, মুখ দিয়ে গন্ধ উঠছে ভুরভুব।

করম শেষ। আবাব বাত ইস্কুল চলছে। সেই সঙ্গে চলছে 'সীতাহবণ' নাটকেব মহড়া।

সন্ধেটা যেমন তেমন, দিনেব বেলা তাব মায়েব সঙ্গে এব তাব বাড়ি কাঁথা সেলাই কবে দিন কাটায় ভুসকীদি। ছেঁড়া শাড়িব পাড় ছিঁড়ে গুটলি পাকিয়ে দেয় মেয়ে, মা বসে বসে সেলাই কবে। কখনও 'লকসা' করবাব দবকার হলে ছুঁচ টেনে নেয় ভুসকীদি নিজে। – হাঁস পাতা মাছকাঁটা বানিয়ে গৃহস্থেব বাড়িসুদ্ধ লোককে বিমোহিত কবে। তাব পরিবর্তে মা-মেয়ে যৎসামান্য মজুবি পায়।

এমনি এক লক্কাদার কাঁথা সেলাইযেব জন্য আমাদেব বাড়িতে ডাক পড়লো ভুসকীদিব। মা-মেয়ে ঢেঁকিশালে বসে ছুঁচেব কাজ কবছে, আমি ঘব-বাহিব কবছি –আজ আমাব ইস্কুলে যাওযা ডকে উঠলো।

কখনও নির্মীয়মান কাঁথাব উপর অসাবধানে চেপে বসলে ভুসকীদি সতর্ক করে ওঠে – ফুটবে। রে ললিনভাই ফুটবে বে।

জানি আমি না হয়ে এক্ষেত্রে আর কোন মেয়ে হলে বসিকতা চবমে উঠতো। ভুসকীদিব মুখে কোন বাগ-ঢাক নেই।

কামার জেঠিমা পানে মুখ লাল কবে মায়ের সঙ্গে গল্প কবছিল, না বহিন, সেই বলে না –'যকন জামাই আধাবাটে তখন বিটি পুকুব ঘাটে, জামাই দেখে বিটির মাথা দুখা জ্বর গো।' যত কটা জামাই আসে বিটিব পছন্দ আর হয় না ! তবে এবার একটা জামাই এসেছে, পুলিস – দেখি কী হয় !

মা বলল, তাহলে আব দেখাদেখিব কি আছে ? পুলিস যখন ভাল চাকরি, আমবাও বলতে পারব – আমাদেব জামাই পুলিস, না কি ভুসকী মা ?

কার্তিক গিয়ে 'মউসর' মাস, অর্থাৎ অঘ্রাণ মাস পড়তে না পড়তেই বিয়ের সানাই বেজে উঠলো। মথো ডোম গাল ফুলিয়ে সানাই বাজাচ্ছে, সন্তোষ ডোম চচ্ছড়ি —দূর থেকে দেখে এলাম, মিতিঞা ডোমের সে কী ফূর্তিতে ঢোলবাদন !

মুনকুদি খুকাদিরা গেছে।

মা বলল, তুইও যা বাবা, ভুসকীটা তোকে বড়ো 'ভাই ভাই' করত !

কিছু না বলে স্থানান্তরে গেলাম। আজ আমার কেবলই মনে পড়ছে রাত ইস্কুলের সেই — সেইদিনটার কথা। অঝোরঝর অন্ধকার, শুধুমাত্র একটা হেরিকেন — হেরিকেনের আলোটাও যেন অন্ধকারের চূড়ান্ত রূপ। সে অন্ধকারের যেন আদি ছিল না অন্ত ছিল না শ্রী ছিল না সৌন্দর্য ছিল না কু ছিল না কদর্যতাও না — খালি নিটোল নির্মল ! সে অন্ধকার বর্ণনার অতীত, কল্পনার অতীত, রচনা-বিরচনা, আলোচনা-সমালোচনারও অতীত, সে অন্ধকার ভয়ের উর্ধ্বে ভাবনার উর্ধ্বে —

সে অন্ধকারের ভিতর প্রায় সংজ্ঞাহীন ডুবে যেতে যেতে সহসা উপস্থিত ভুসকীদিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিলাম, আমাকে ছেড়ে আর কোথাও কখনও যাবে না তো ভুসকীদি ?

ভুসকীদিও উত্তর দিয়েছিল, না ভাই এই কানমলা খাচ্ছি, আর কোথাও কোনদিনও —

বিয়েও হয়ে গেল, 'বাঁধাপনীর' আসর ছেড়ে বর-কনে এবার সোয়ারি বা পাল্কীতে উঠবে, বড়ো ডাঙার মহাজন ঘরের পাল্কী — ঘরে বসেই সব একে একে খবর পাচ্ছিলাম। নাকি এখন পর্যন্ত একটুও কাঁদেনি ভুসকীদি।

রাগে গুমরে উঠে ভাবছি — মিথ্যুক, ভুসকীদিটা একের নম্বর মিথ্যুক !

সোয়ারি আমাদের বাড়ির সামনে এসে হরিমন্দিরে থামলো। বর-কনে জোড়ে নেমে হরিমন্দিরে প্রণাম করবে — এটাই নিয়ম। তার আগে চলবে বাদ্যকর মিতিঞা ডোমের নৃত্য সহযোগে ঢোলবাদন —

মিতিঞা ডোমের ঢোলও আমাকে টলাতে পারল না, ঘরের ভিতর তখনও গুমরে বসে আছি, কে যেন খবর দিয়ে গেল — পাল্কী চলে যাচ্ছে, পাল্কীতে ওঠার আগেও এক ফোঁটা কাঁদেনি ভুসকীদি।

শোনামাত্র হুড় হুড় করে কেঁদে উঠলাম।

বিছানায় শুয়ে ডব্‌কে ডব্‌কে কাঁদছি, দেখতে পেয়ে মুনকুদি বলল, তুই কেন কাঁদিস ভাই ? যার কাঁদার কথা সে তো —আমরা কত করে মুখস্থ করালাম, এই বলে কাঁদবি ঐ বলে কাঁদবি। রোদন করে বলবি—

"উঠিলা সোয়ারি বসিলা নাহি ভাইরে

ফিরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি ভাইরে —"

চোখ মুছে ভাল করে দেখলাম — আমাদের ছোড়দিই তো ? ধীর অতি ধীর, পারতপক্ষে যে আমার সঙ্গে একটা-দুটোও কথা বলে না — সে এতগুলো কথা অবলীলায় বলে যাচ্ছে কি করে ? এতটা জীবন্ত গতিশীল করে থেকে হলো মুনকুদি ?

দিন যায়, প্রকৃতির জগতে ঋতুপরিবর্তন হয়। ঝিঙাফুল ঝরে গিয়ে কাঁকুড়ফুলে জালি আসে।

বীরেন শাসমল

তিতির

আজ কেউ আসেনি। আজ অরন্ধন। মহাবেশ্যা নগ্নিকাব চোখ স্থিব। ববিষণ ধর্ষিত পথরেখায় অন্ধকার। ব্যাঙেবা বর্ষাবন্দনায় বত। বাত্রির দ্বিতীয় প্রহব ঘোষিত হল। শৃগালেরা চুপ হয়ে গেল। আকাশ প্রণয়ীর মতো উদ্দাম। অশনি গর্জনে বিপন্ন গাছেবা। বিদ্যুল্লেখায় তাদেব ছায়া কাঁপে।

মেঘগর্জনে বিদীর্ণ হয় দিগ্‌দেশ। জীর্ণ কপাটে বিষাদ বাজে। রুদ্ররোষে কেউ ছিঁড়ে ফেলছে পৃথিবী

ব নাভিমূল।

কৃষকযুবাবা কেই আসবে না। বর্ষা সমাগমে তাবা বীজ বপনে ব্যস্ত। নির্বীজ ফুর্তি নিষিদ্ধ এখন। গ্রামীণ তাব অনুশাসন জাবি কবেছে। নটেবা দল বেঁধে আসে না। কুট্টনী বা বীটপবিবৃতা সালঙ্কাবা গণিকাবা ফিবে গেছে নগবীতে। নর্তিনীদেব নর্তনধ্বনিও থেমে গেছে। বণিক আসে না সম্ভাব নিয়ে। দূর তাম্রদেশীয় বণিকেবাও তাদেব নৌকা ভাসায় না। নদীতীবে, গঞ্জেব প্রান্তরেখায়, তাঁবুগুলিতে আলো জ্বলে না। গভীব বজনীতে কখনও বা মন্দিবাব মৃতধ্বনি জেগে ওঠে। বাতাসে ছড়িয়ে গেলে তা কান্নাব মতো শোনায়। আপাতত জল দেখছে নগ্নিকা। কুটির সম্মুখস্থ পথে খলখল প্রাণবন্ত জল।

তাব ভিতব ও বাহির জুড়ে বর্ষণেব তৃষ্ণা। অবিচ্ছিন্ন জলধাবায় ভেসে আছে আবর্জনাব স্তুপ। ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে নিচে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত সেদিন মন্দিব সোপানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন গঙ্গা সর্বপাপবিনাশিনী। পৃথিবীব পাপকে সে বহন কবে নিয়ে যায় নিচে। তাকে বিনষ্ট করে সে পুণ্যতোয়া হয়। দুঃখেও হাসে নগ্নিকা। যদি তাই হয় তাহলে আমিও পুণ্যতোয়া। সমাজের পাপেব বাস নিচে। জনপদসীমার বাইবে তাকে ফেলে আসতে হয়। জনপদেব প্রত্যন্তে তাই বেশ্যাব বাস। তাব কাজ পাপ ধাবণ কবা। নীলকন্ঠের মতো পাপেব বীজকে বিনষ্ট কবা। কোনদিন গর্ভধারণ কববে না সে। মাতৃত্বে তাব অধিকার নেই। পিতামহবা আদব কবে নাম দিলেন জনপদকল্যাণী। অকল্যাণ ভক্ষণ কবে সে হবে কল্যাণী। বহুভুক্তা সে। সাধাবণ্যা। বেশভূষায় বহুজনচিত্তবঞ্জিনী, বিনোদিনী। শূদ্রাণী সে। দাসী। শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ বললেন ঃ জনপদের পযঃপ্রণালী।

অন্তেবাসীব বিলাপ শোনা যায়, বুকেব গভীবে। কোথাও পাখি ডাকলো বোধহয়। পাখি? এত বাতে? প্রত্যন্তে এই শবীরবিলাসিনীব শবীরে পুবাকালিক আঁধাব। এখান থেকে জীবনবেখা কতদূবে! হৃদয় জলতলে বড় তৃষ্ণা! এত জল তবু পানেব জল থাকে না নগ্নিকাব। লবণাক্ত সমুদ্রবিষাদে বয়েছে সে বহুদিন। হায়! আজ কি কেউ আসবে না? কেই বা আসবে এই দুর্যোগময়ী ঘোব বজনীতে? অনাঘ্রাণে যায় চন্দনগন্ধ। অগুরু অঙ্গে শুকায়, শুষ্ক হয় কাষায়চূর্ণমর্দিত দেহকোষ। ধুয়ে যায় পায়ের আলতা। গালেব পত্রলেখা। শিথিল হয় ক'টি দাম। মেখলাব বাঁধন টুটে যায়। এলোকেশী খুলে ফেলে তাব কর্ণিকাব সাজ। ছিঁড়ে ফেলে অর্জুন ফুলেব কুচিকা। অপমানে ম্রিয়মাণ হয় কেয়ূব। চিকনবেলায় বেজেছিল যে কাঁকন, আজ তা মূর্ছা যায়।

তৃতীয় প্রহরে বর্ষণ থামে। বিধৌত আকাশে আশ্চর্য চন্দ্রিমা। নগ্নিকা পড়ে থাকে অবিন্যস্ত তার শয্যায়। আজ তার ঘরে উনান জ্বলবে না।

কুটির সম্মুখস্থ পথ কর্দমাক্ত। বৃক্ষগুলি আহারতৃপ্ত বৃষের মতো রয়েছে রোমন্থনে। শাখাচ্যুত জলবিন্দু ঝরে পড়ছে টুপটাপ। শব্দ ক্রমে সঙ্গীত হয়ে উঠছে। নিকটে, দীর্ঘিকায় মাছগুলি মত্ত জলোৎসবে। রাত্রি মোহময়ী। তার রঙ্গসভায় ধীরে ধীরে শুরু হয় রম্যসঙ্গীত।

একটি পাখি ডাকে কোথাও। অবিচ্ছিন্ন কান্নার মতো সে ডাক। কেমন অপার্থিব আলোকধারায় ডুবে আছে রহস্যপাখির মতন। কেনই বা এই নিশীথিনীর অমৃতময় শুভ্র হাসিতে ঢেলে দিচ্ছে হলাহল? কে জানে! যেন বহুদিন উপোসি রয়েছে সে। জোটেনি কোন কীটপতঙ্গকুল বা বটবৃক্ষের ফল। ধান্যফল, পক্ক গোধূম বা যব সে বোধহয় দেখেনি অ-নেকদিন। ক্ষুৎকাতর তার ডাক হাহাকার বলে মনে হয়। বায়ুস্তরের গভীরতম প্রকোষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে সে ডাক। এমন অসহ্য সুন্দর জ্যোৎস্নায় এই কাতর কুৎসিত কূজন জাগিয়ে দেয় নগ্নিকাকে। নাকি তারই ক্ষুধার পাখি, নাকি গহীন দুঃখের কারাগারে অন্তরীণ তার প্রাণপাখি!

ঘোর লাগে নগ্নিকার। এ কোথায় কোন প্রদেশে সে প্রস্থিত হয়েছে। সামনে তার উত্তম যবাগু, অপূপ, ভাত, ঘৃত, দুগ্ধ, গুড় ও শর্করা স্তূপীকৃত। উত্তম খাদ্যসামগ্রীর গন্ধগুণে তার ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হয়। সামান্য যবানীটুকুও (যবের মণ্ড) যার জোটে না, তার কাছে এ স্বপ্ন বড় মধুর। স্বপ্নেরও যে গন্ধ আছে, ঘ্রাণ আছে আজ তা উপলব্ধি করেছে সে। হঠাৎ সেই উপলব্ধ সত্য নাকি মায়ায় পাখিটা তাকে ডেকে নিয়ে চলেছে! হাহাকারের এমন করুণ সুর বাজিয়ে কোন্ বৃক্ষ শাখায় লুকিয়ে আছে সে পাখি, খুঁজে বেড়ায় নগ্নিকা।

কোথায় ডাকলে গো পাখি?

কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালো একজন মানুষ।

চমকে তাকালো নগ্নিকা।

এই দুর্যোগময়ী রাত্রিতে কে এসে দাঁড়ালো? তার কি শরীরের জ্বালা এই দুর্যোগের চাইতেও তীব্র?

কিন্তু এ কি দেখছে সে! এ যে একজন ঋষি—ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত ঋষিকুমার! বনজ্যোৎস্নায় তার শরীরময় খেলে বেড়াচ্ছে অন্ধকারের লিপিমালা। শুভ্রকান্তি আলোয় ছায়ায় অতিলৌকিক। ব্রহ্মার মতো দুই চোখে তাঁর জ্ঞানদীপ্তি। বাঁ হাতে কমন্ডলু। ডান হাতে লৌহদণ্ড। বৃক্ষবাকলের পরিবর্তে পরনে তাঁর কাপাস নির্মিত বস্ত্র। বহিরঙ্গে শুভ্র অধিবাস। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুঠাম দেহ। সুগঠিত গ্রীবা। পাদুকাবিহীন দুই পা কাদামাখা।

কুটিরে কি মানুষ আছে?

আছে ভগবান।

ঋষিকুমার আজ রাতের অতিথি।

পদার্পণে পবিত্র হোক এ কুটির। গৃহস্বামিনীকে আজ্ঞা করুন— সে আপনাকে কুটিরে নিয়ে আসুক।

তাই কর বৎসে।

নগ্নিকা নিয়ে আসে ঋষিকুমারকে। কুটিরে রাখা জলকুণ্ড থেকে জল নিয়ে পা দুটি ধুয়ে দেয় তাঁর। কেশরাশি দিয়ে মুছিয়ে দেয় পায়ের জল। কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্যোগময়ী এই রজনীতে কোথা থেকে আপনার আগমন ঋষি? এ কি! আপনার পরিধেয় বস্ত্রখণ্ডটি তো ভেজা! আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন ঋষি। আসুন, আপনাকে শুকনো বস্ত্র দিই। কিন্তু কি-ই বা দিই আপনাকে। এ অধীন স্বামীপুত্রবিযুক্তা প্রোষিতভর্তৃকা। পরনের বাস বা নীবি ছাড়া আর যে তার কিছুই নাই, এদিকে শুকনো বস্ত্র ছাড়া আপনার জ্বরবিকার

ঘটবে। ঋষিকুমার ইতস্তত করেন। তাঁর মুখমণ্ডলে তীব্র জ্যোৎস্না এসে পড়ে। অনিন্দ্যকান্তিতে অপরূপ বিভা। দিব্যমুখশ্রী জ্বলে ধিকিধিকি। যেন অনন্ত দহনে পুড়ছে এবং পোড়াচ্ছে। সে মুখ পোড়ায় নগ্নিকাকে। অবিকল বসুমিত্র। শ্মশ্রুগুম্ফ বাদে। নগ্নিকা চেয়ে থাকে ঋষিকুমারের দিকে। শোভা পায় না এই বেশ। এমন সুন্দর যুবাপুরুষেব এমন অকালবৈরাগ্য। এমন কামনাহীন ঋজুতার ছল। কাপাসে আচ্ছাদিত এই সুদেহ – যেন শরদিন্দু রশ্মিবলয় ঢাকা পড়েছে অকালমেঘের চক্রান্তে।

সন্দেহ হয় নগ্নিকার। জীবন দেখার অভিজ্ঞতা তাব কম হয়নি! মানুষী জীবনের রাজপথ থেকে কেন এই ঋষিকুমাব পা ফেলে যায় অবণ্যের তৃণমূলে, কেন চলে যায় নদীতটে, ধূধূ প্রান্তরে? নাকি এও এক বিশুষ্ক অভ্যাস? যে অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়! গ্রাসাচ্ছাদনেব মতোই প্রয়োজনীয়! কে জানে! দীর্ঘদিন মানুষ দেখতে দেখতে, তাব ভেতব বাহির খনন কবতে করতে অনেক সত্য দীপ্ত অগ্নির মতো জ্বলে উঠেছে। দেখা যাক, কোন নতুন সত্য সুপ্ত আছে তাব জন্য। আবাব তাকায় সে ঋষিকুমারের দিকে। মনে পড়ে। এমনই ঘনঘোব ববিষায়, এমনই বজনী গভীরে এসেছিল কুলপুত্র বসুমিত্র। তাবপব অনেক বছব।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঋষিকুমারকে আবার বলে সে, ঋষিকুমাব —— ! আপনাব শুষ্ক বস্ত্রেব বড় প্রয়োজন। আপনি শীতে কাঁপছেন। আপনাকে কৌশেয বস্ত্র একখানি দিই? বিশুদ্ধ, ক্ষাব পবিস্কৃত সে বস্ত্র।

তাই দাও ভদ্রে।

'ভদ্রে' সম্ভাষণে গভীব থেকে নড়ে ওঠে তাব জীবনমূল। আবাব সেই জীবনবেখাব ওপাব থেকে ভেসে আসে মায়া। জীবনশতদল ফুটে থাকে সবোববে। সূর্য কবস্পর্শে দলগুলি যাব প্রাণে প্রাণে প্রস্ফুটিত হয। তৃণমূলে ঠোঁট খোলে অসংখ্য তৃণফুল। প্রকৃতিলোকে ছড়িয়ে পড়ে চঞ্চল তৃষ্ণা।

মনে পড়ে। স্মৃতি! যেন কন্টকশয্যায শুয়ে আছে নগ্নিকা।

সেদিন বনবীথিকায় সেজেছিল বকুল। কদম্বমূলে চাঁদ লুটোচ্ছিল। আজ কদম্বমূলে কেউ যায না। সে বেদিকাটি নেই। পাতা ঝবিয়ে ক্লান্ত হয়েছে বকুল। জোড়া ঘুঘুব একটি মাবা গেছে। আব একটি শুধু কেঁদে কেঁদে ডাকে। দীঘিব জল হীন হয়ে আছে। শৈবালে আচ্ছন্ন সে জল। আকাশ দেখা যায় না। জলমুকুবে কালেব কালি। বসন্তকাল গেল অপ্রেমেব ক্লেদে। শবীর বেচে বেচে কখন শীতকাল নেমে এল চুপি চুপি। নাকি শীতকাল আসাব আগেই শীতার্ত হয়ে উঠল নগ্নিকা।

এমনই ঘনঘোব ববিষায। সে প্রতিজ্ঞা কবেছিল –'আসব'। নগ্নিকা ক্রমে প্রেমিকা হয়ে ওঠে। তৃষ্ণার্ত হয। সে ভুলে গেছে তাব ক্ষুধা।

তাব চেয়ে গূঢ় অন্তরচাবী খেলা শুরু হয়ে যায তার শবীরময়। যেন শবীবে শবীব নেই। প্রস্থিত সে অপরূপ কাকলিশব্দিত পুষ্পগুঞ্জবিত উপবনে। সেখানে শুধুই বাজন্যেব অধিকাব! বসন্তসমাগমে জাতী যূথী চম্পা চামেলিব মতো লজ্জায শিহবিত হল তাব দেহদল। হাঃ! বসুমিত্র! এ কি লজ্জার গৌবব তুমি দিযে গেছ আমায।

নগ্নিকা দেখে, বোধিতে অমল জ্যোৎস্নাব মতো পৃথিবী, পৃথিবীপৃষ্ঠে তাব শুদ্ধ শবীব। পণ্যাব লজ্জাহীনতা নেই তাব শবীবে। সে যেন ভদ্রজন-পবিবাবেব কুলপুত্রী। ঋষিকুমাবকে সে পোশাক পবায। বিনীতার মতন সে নিবেদন কবে ঃ কীভাবে আপনাব সেবা কবতে পাবি ঋষিকুমাব?

আমি ক্ষুধার্ত।

হ্যায! ঈশ্বব। আমাব যে আজ অবন্ধন। ঘরে আমার কিছুই নাই। আমি কী করে এই তাপসের ক্ষুধা নিবৃত্ত কবি?

সে নীববে দাঁড়িয়ে থাকে। তাব দুচোখে টলটল করে বাবিবিন্দু।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব সঙ্কটে পড়েছ ভদ্রে।

অধোবদনে নগ্নিকা। এই দুর্যোগ রজনীতে ঘরে আমাব সক্তু (ছাতু) সম্প বা যবাগু কিছুই নাই। আজ আমাব উপবাস ঋষি।

ঋষি মৃদু হাস্য করে বলেন : ক্ষুধার্তকে অন্নদান না করা পাপ।

জানি ঋষিকুমাব। কিন্তু আজ বাত্রে আমাব ঘবে কিঞ্চিৎ চরু ছাড়া আর কিছুই নাই। সামান্য তণ্ডুলটুকুও আজ রাত্রে দুষ্প্রাপ্য।

আমি একজন গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হয়েছি ?

নগ্নিকা যেন মরে যেতে থাকে। আবাব সেই গৃহের অনিবার্য দ্যোতনা। শব্দটিতে কী কঠিন আকর্ষণ ! গৃহস্থেবা গৃহে কত সুন্দব। গৃহহীনা প্রত্যন্তবাসিনীব এই গুহা যেন শ্রুতি স্মৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত নরক। হায় হায় ! বজ্রপাত হয তাব মাথায়। যে মিথ্যাকে সে উচ্চারণ করেছে সে সত্য বলে, সেই মিথ্যাকে এখনও ববণ করে নিতে হবে সত্য বলে। এ যেন মহাপবীক্ষা— সত্যেব ভাব বইতে পাববে নগ্নিকা ? কেন, কেন নয় ? বক্তমাংস অনুভবযুক্তা মানুষী আমি। অনুশাসন আজ আমাকে সে মর্যাদা থেকে জোব কবে বঞ্চিত কবেছে, সমাজ নামের এক নিষ্ঠুব অন্ধ দৈত্য আমাকে বেঁধে রেখেছে তার তৈবি করা নিগড়ে। জীবজন্তু পশুপাখিদের মতো আমিও তো আলযে বাস কবি, গৃহে আমাব বাসস্থান — তবে কেন আমি গৃহী নই ? অসম্ভব কম্পনকে নিয়ন্ত্রণে এনে সে বলে, এও সত্য ঋষি।

ব্রাহ্মণকে উপবাসী বাখলে গৃহস্থের ঘোর অমঙ্গল।

সত্য।

গৃহস্থেব পাত্রে সর্বদাই উদ্বৃত্ত তণ্ডুল বাখতে হয় অতিথিসেবাব জন্য ?

সত্য।

অতিথি অভুক্ত ফিবে গেলে বিশেষ কবে সে যদি উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হয়— তাহলে ব্রহ্মশাপে তাকে ঘোব পাতকী হতে হয়।

কিন্তু অনিচ্ছাকৃত অবহেলায বা অজ্ঞানে যে কর্ম কবে তার দণ্ড তো লঘু হয়। যদি বাজদ্বাবে শ্মশানে প্রাণসংশয়ে বাষ্ট্রনীতিতে মিথ্যা অধর্ম না হয তাহলে আন্তরিক অথচ অবস্থাবিপাকের ক্রটিও অধর্ম বলে আখ্যাত না হওযা উচিত। আব এমন পাতকীব জন্য শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মনও তো কিছু প্রাযশ্চিত্তেব বিধান রেখেছেন ঋষি !

ঋষিকুমাব বিস্মিত হন। এ নাবী তো সামান্যা নয ! এব যথেষ্ট শিক্ষা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানও তো কম নয ! তাব সন্দেহ হয। তিনি জিজ্ঞাসা কবেন : তুমি কি জানো না ভদ্রে, নাবীমাত্রেবই শাস্ত্রজ্ঞান নিষিদ্ধ ?

ঋষিকুমাব কি জানেন না, অনুশাসন থাকলে তাব শিথিলতাও থাকে, নিযম উজ্জ্বল হয নিযমহীনতা থাকলে, আলো উজ্জ্বল হয় অন্ধকার গভীব হলে ? জ্ঞান তো প্রদীপ্ত আলো। জ্ঞান সূর্যেব মতো তেজস্বী। তাকে কি নিষেধের হাত দিযে আড়াল কবা যায। ঋষিকুমাব বোধহয অধ্যয়ন করেননি — বিদুষী গার্গীব কথা ? যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ভয দেখিযেও নিস্তাব পাননি। মৈত্রেয়ীকে তাই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অত্যাশ্চর্য দৃষ্টিতে নগ্নিকাকে দেখেন ঋষি। জিজ্ঞাসা করেন : কার কাছে এই জ্ঞানলাভ করেছ তুমি ?

আপনাবই মতো একজন ঋষিতুল্য মানুষেব কাছে। তিনি একদিন আতিথ্য গ্রহণ কবেছিলেন আমার। আমি অতি সামান্যা নাবী। আমায মার্জনা কববেন।

ঋষি আবাবও অবাক হন।

এমন মার্জিত উচ্চাবণে অতিথি সম্ভাষণ ! এ কি সম্ভব কোন কুলললনাব পক্ষে ? তিনি আব চিন্তা কবতে পাবেন না। তাঁব উদব জ্বলে যাচ্ছিল ক্ষুধায। দূর দেশে, এক ক্ষত্রিয বাজন্যেব

যজ্ঞে তিনি গিয়েছিলেন ঋত্বিক হয়ে। কিন্তু দানসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণদেব মধ্যে রীতিমত সংঘর্ষ হয়। ক্ষোভে চলে আসেন ঋষি বা বলা যায় পালিয়ে আসেন। কিছুই নিয়ে আসতে পাবেননি। শুধু দ্রুত কমণ্ডলুতে ভরে এনেছিলেন উত্তব ভারতেব মহার্ঘ প্রিয়ঙ্গু তণ্ডুল। আপাতত তাই দিয়ে ক্ষুধা শান্ত হোক। তিনি রন্ধন করতে বলেন নগ্নিকাকে।

কমণ্ডলু থেকে মহার্ঘ প্রিয়ঙ্গু ঢেলে নিতে গিয়ে হাসে নগ্নিকা। মনে পড়ে বসুমিত্রেব সুন্দর কথাগুলি। অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম। প্রাণ এবং অন্ন দুই দেবতা এক হয়ে পরমতা পায়। অন্নেই সমস্ত প্রাণী আশ্রিত। ইহজগতেব সত্যমূল্যহীন ব্রহ্মের অস্তিত্ব তাই মিথ্যা। ঋত্বিকেরা জীবনকে বলেন মায়া। অথচ সেই জীবনকে বক্ষা করতে কমণ্ডলুতে গঙ্গাজলেব পরিবর্তে তণ্ডুল বহন করতে ভোলেন না। ক্রোধেব জন্ম হয় নগ্নিকাব বোধ-এর গভীরে। গূঢ় হিংসার মতো কিছু অনুভব তাকে ওলটপালট কবে দেয। মনে হয সমস্ত কিছুই খাণ্ডব দহনের মতো পুড়িয়ে ফেলে। সামান্য তণ্ডুলের জন্য কী কঠিন জীবিকা তাব। শবীবকে অন্যেব আহার্য কবে তুলে ধরতে হয। তবেই মেলে তাব নিজেব আহাব। রাজার কোন কর্তব্য নেই তাদেব প্রতি। সামান্য করুণা কবে গ্রামশাসক গ্রামীণ। উদবপূর্তিব জন্য তা যথেষ্ট নয। জনপদে, গৃহস্থেব আলয়ে সে ঢুকতে পারে না। ত্রিসীমানায গেলে কঠিন শাস্তির বিধান দেয় গ্রামীণ। জনপদে এত খাদ্য — এত শস্যসমাগম। নবান্ন উৎসবে অপরিমেয অপূপ (পিঠে) অপচয় হয়। ইঁদুব পেচক পাখি এত শস্য খেয়ে ফেলে। শুধু সে খেতে চাইলেই দোষ! গণিকারা এতখানি হীন নয। গণিকাদেব পোষে রাজা। রাজাব আইন গণিকাদেব বক্ষা কবে। তার বৃত্তি অনেক নিরাপদ। গণিকারা বাজাকে কব দেয। রাজ অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ পায। পুত্রজন্মে, পুত্রকন্যাব বিবাহে, অতিথিদেব প্রত্যুদ্‌গমনে। গন্ধবাবি, পূর্ণকুম্ভ বহনেব কাজও পায তাবা। শুধু বেশ্যার কোন কাজ নেই।

বন্ধন কবে নগ্নিকা। যেন জীবনেব শ্রেষ্ঠ বন্ধন কবে। হৃদয পুড়িয়ে সে সিদ্ধ করছে সে তণ্ডুল। কী এক অসহ্য ঘৃণা মঞ্জরিত হয় শরীরে। অসম্ভব অসম্ভব ইচ্ছাগুলি তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। লোমকূপ ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। তার অঙ্গ জ্বলে দু'বকমেব ক্ষুধায। দ্বিতীয় ক্ষুধা তাকে অস্থির উন্মাদিনী কবে তোলে। এ কি তাব অভ্যাসেব ক্ষুধা? নাকি ক্ষুধাব নেশায, ক্ষুধা না থাকলেও এক অদম্য ক্ষুধাকে সৃষ্টি কবা? কালেব পৈঠায বসে হুতাশন জ্বালিয়ে বাখা কাল থেকে কালান্তরে? নাহ! সে ক্ষুধা শান্ত হবাব নয়। অগ্নি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায অতীতকালে। বহস্যময় বয়ঃসন্ধিতে নিষ্ঠুব পুরুষেব বিধান তাব পৃথিবীকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। স্মৃতিপথে ভেসে আসে তাব বাল্যকালেব নদী। যেন এই ডুবে গেল তাব অলক্তবঞ্জিত পা দু'খানি। নয়নসম্মুখে বালিকাব খেলাঘব, স্বপ্ন — মান্দাস। বালিকাব সমাজ ছিল। সামাজিক পরিচয়ে সে কারুর কন্যা ছিল। কিন্তু মিথ্যা দিব্যতাব মোহে, মিথ্যা পুণ্যেব লোভে তাকে বলিদান দিল তাব নিজেবই জন্মদাতা পিতা। যজ্ঞেব দানসামগ্রী হতে পিতা তাকে বিক্রি কবে দেয় বাজাব কাছে। অনুর্ধ্বা বাবো বছরেব, বিবাহেব জন্য উপযুক্তা কন্যা সে তখন — নগ্নিকা এই তার শাস্ত্রীয় পবিচয়। সেই নগ্নিকা তখন সামান্য তৈজসপত্রাদিব মতো পণ্যা হয়ে গেল সামগ্রীব হাটে। মনে আছে তাব — যজ্ঞেব দান হবাব জন্য সাবিবদ্ধ সেই সব অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদেব যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ঠিক পশুদের মতো যূথবদ্ধভাবে, তখন লোভী ঋষিকুল বাজাব জযধবনি দিচ্ছিল। গম্ভীর মেঘগর্জনেব মতো বা ক্ষুধার্ত শিবাকুলের মতো তাদেব বিচিত্র স্ববধ্বনিতে শুধু মাংস ভক্ষণের আহ্লাদ। উপস্থিত পুরুষেবা হিংস্র শ্বাপদের মতো দন্তবিকশিত কবে হাস্য করছিল। নাট্যে যখন বয়স্কা বাবনাবীব বিবাহদৃশ্যেব অভিনয করে তাদেব চূড়ান্তভাবে অপমান করা হচ্ছিল তখন দর্শকেরা হি হি হাস্যবোলে ভরিয়ে তুলেছিল সভামণ্ডপ। তাবপব সেই ঋষিপ্রবব, জ্ঞানতপস্বী নিষ্কলুষ স্বর্ণকান্তিময় চরিত্র — যার সাথে তাকে প্রত্যুদগমনে বাধ্য কবল তাব পিতা, বালিকাদের ভোগ কবাব নামে তাদের ক্ষতবিক্ষত কবে ফেলেছিল। তাবপব তাদেব নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্রীতদাসীদেব হাটে। সেই প্রত্যুষকালে জীবন হয়ে উঠেছিল তমসাচ্ছন্ন বজনী। বালিকা বাববাব প্রার্থনা কবছে : হে তমোনাশকারী সূর্যদেব, আমাকে জ্ঞান দাও, শক্তি দাও, যাতে এই অন্ধকাবকে পরাজিত কবতে পাবি। সেই থেকে ঋষি সম্পর্কে তার যাবতীয় শ্রদ্ধাকুসুমগুলি দলিত হয়ে গেল। ঋষি সম্পর্কে কল্পিত আলো যেন তাদেব জীবনের সমগ্র অন্ধকাবেব বিনিময়ে —

রন্ধন শেষ নগ্নিকাব। পাকপাত্র বাখে সে ভূমিতলে। ব্যাঘ্রচর্মনির্মিত আসন পেতে দেয়। মৃৎপাত্রে জল বাখে। পূজাব জন্য নৈবেদ্য সাজায। ধীবে, কোমল স্বরধ্বনিতে মঞ্জবিত কিশলয়ের মতো আকাঙ্খা দুলিযে সে ডাক দেয় — ঋষিকুমাব —

ঋষিকুমাব ধ্যানে বসেছিলেন। ক্ষুধায কাতব তাঁব ধ্যান গভীরতা পাচ্ছিল না কিছুতেই। বাববাব নষ্ট হচ্ছিল মনঃসংযোগ। চিত্ত চঞ্চল হযে উঠেছিল। শবীবময় বৈকল্য।

নগ্নিকার ডাকে চোখ দুটি উন্মিলীত কবেন তিনি। সামনে অপূর্বা। এমন বমণীমূর্তি তিনি এতদিন নিরীক্ষণ কবেননি। ঋষিকুমাবেব শরীর ঘিবে ঘন্টাধ্বনি — যেন ত্রিলোকজুড়ে খুলে যাচ্ছে সমস্ত বাত্রিব কপাট। এ কি জ্ঞান — সৃষ্টিস্থিতিধ্বংস স্থিত হযে আছে, এই কি সেই মূলাধাব ! মুগ্ধ, উল্লসিত আনন্দবিহ্বল অসীম প্রকৃতিলোকে বেদমন্ত্র ধ্বনিতে হচ্ছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পবিব্যাপ্ত শুধু জীবনেব আলো--যা দিব্যবিভায শস্য-ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতি থেকে প্রার্থনা কবছে শস্যেব আশীর্বাদ — বেদজ্ঞান যেন লোকজ কবিতাব মতো — এই ধবিত্রীর রূপবতী কাযাকে চিত্রিত কবে ছন্দে গানে ঝঙ্কারে, চক্ষু মুদ্রিত হলেই যেন দেবীমানবী তাকে প্রলুব্ধ করে —

সামনে তিনি কাকে দেখছেন ? এই কি পৃথিবী ? মানবীই কি সেই অনুপম সৌন্দর্যময়ী দেবীমূর্তি ? আশ্রমে তাঁব শিক্ষা তালিকায় বযেছে ব্রহ্মচর্য বেদাধ্যযন মন্ত্র অগ্নি যজ্ঞাচাব পূজা গুরুসেবা। কিন্তু এই পৃথিবীরূপিনী নাবী যে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয বযে গেল। কী হয এই নিঃসাব ব্রহ্মচর্যে ? কোন ঋষিই তো ভোগসুখ ত্যাগ কবেন না। তবে ? ধন্ধে পড়ে যান ঋষিকুমাব। কিন্তু হঠাৎই তিনি ধাক্কা খান। এ আমি কি ভাবছি ? এ যে পাপ ! মৈত্রাযনী সংহিতা বলে, বমণীমাত্রই মিথ্যাচারিণী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিণী। তৈত্তিবীয সংহিতা বলে, সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠা নাবীও অধমতম পুরুষের থেকে হীন, শতপথ ব্রাহ্মণও বললো, অনৃত বা মিথ্যা কী ? স্ত্রী শূদ্র কুকুব ও কালো পাখি

সামনে আমি কী দেখি ? মিথ্যা, মিথ্যা। হে আমাব অশান্ত হৃদয়, মিথ্যাব পিছনে ধাবিত হযো না।

সামযিক স্থৈর্য অবলম্বন কবলেন ঋষি। ভোজন কবতে বসলেন।

কিন্তু তিনি দেখলেন, পাকপাত্রটি সম্পূর্ণ নিবেদন করা হযেছে তাঁকে। তিনি নগ্নিকাব দিকে তাকান। শবৎশিশিবে স্নিগ্ধ পুষ্পকলিকাব মতো দুটি চোখ। ঋষি আবাব মাযায পড়ে যান। আবেগমথিত স্ববে বলেন, এ কি কবেছো ভদ্রে ? শুধুমাত্র অতিথিব জন্য কেন ? তোমবাও তো কিছু বাখা উচিত।

অতিথিসেবা কবতে পাবিনি। অতিথিব আনা তণ্ডুল নিজেব জন্য বাখি কোন লজ্জায় ?

প্রীত হলেন ঋষিকুমাব। এমন স্বাভাবিক স্বীকাবোক্তিতে মুগ্ধ তিনি ! এতে লেগে আছে অন্তবেব শ্রদ্ধাব স্পর্শ। আন্তবিকতাই তো শ্রেষ্ঠ আতিথেযতা। তিনি শান্তস্ববে নগ্নিকাকে বলেন, এব অর্ধেক তোমাব জন্য বাখো।

আপনি উচ্ছিষ্ট কবে দিন।

তাই কবেন ঋষিকুমাব।

পবম তৃপ্তিতে ভোজন কবে নগ্নিকা।

বাত্রি শেষ যামে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অসহ্য, অসহ্য জ্যোৎস্নায় পুড়ে যাচ্ছে চাবপাশ। ঋষি বসে আছেন কাষ্ঠাসনে। কোথা থেকে যেন বনজ ফুলেব সৌবভ ভেসে আসছে। নিজেব ভেতবেও এক অনির্বচনীয় বাক্‌সৌবভেব গন্ধ পান তিনি। যেন শব্দেবা উন্মুখ হযে আছে প্রকাশিত হবাব জন্য। কী সেই প্রকাশ ? প্রগাঢ় অনুভব আসে সাড়া দিয়ে। নিজেব বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে নামতে হয তাঁকে।

কুটিবেব পশ্চাদ্দিকে একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপেব আলোতে সেই রমণীব ছাযা। বমণী বেশভূষাব বিন্যাস কবছে। কেশগুচ্ছ খুলে দিলে ঢুকে পড়লো গোপনচারিণী অন্ধকাব। সন্দিগ্ধ

ঋষিকুমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাকিয়ে থাকেন নগ্নিকার ছায়ায। তাঁর বুকের ভেতরেও একটি ছায়া নড়ছে। এত রাত্রে এমন সজ্জাবিলাস কেন? নিজের পবিধেয় বস্ত্রের দিকে চোখ যায় তাঁর। চমকান। এ কি বেশ আমার। সামনেই তাঁর পরিত্যক্ত কাপাস শুকোচ্ছে হাওয়ায়। এতদিনের পরিচিত এই কাপাস, শুদ্ধ, মালিন্যহীন কাপাসে তিনি দাগ দেখতে পান। আবার নিবিড় জ্যোৎস্নায় ধুয়ে গেল সেই কাপাস। তাতে বৃক্ষলতার ছায়া পড়ে দুলছে। তাঁর ভেতরে প্রবল আলোড়ন শুরু হল। পৃথিবীতে কি আজ মহাপ্রলয় শুরু হবে? কাপাসে ছায়াব কারুকার্য শুরু হয়। পত্রশাখা ফুলদলের ছাযা। তাঁর ভেতবে ছায়া সংক্রমিত হয়। এ সময়ে আবার ডেকে ওঠে পাখিটা। বোবা কান্নার মতো। ঋষিকুমার অস্থির হন। মনে হয় পাখিটা তাঁকেই ডাকছে।

আর একজনও অস্থির হল। অদৃশ্য এই পাখিটা তাকে কাঁদাচ্ছে। ঘুরে বসল নগ্নিকা। মুকুরে অস্পষ্ট বিম্বিত হন ঋষিকুমার। নাকি মুকুর ব্যর্থ হয়েছে, তাব মনেব মুকুবে ভেসে উঠলো প্রতিচ্ছায়া? গৌরবর্ণ। দীর্ঘ। জানু পর্যন্ত ছড়ানো বাহু। শাল প্রাংশু। ঋজুবক্ষে উপবীত। জটাজুটশ্মশ্রুগুম্ফের ভিতরে যুবক অসম্ভব শক্তিমান। মূর্ত মদনদেব। স্বপ্নমেদুব সহস্র বজনীর প্রেমার্তি যেন বন্দি হয়ে আছে এই বক্ষোগুহায। শুধু সামান্য আঘাতে তার অর্গল খুলে দিতে হবে। সামান্য আলোকশিখায় তাব অন্ধকারেব স্তব ভাঙতে হবে।

ধীরে সামনে আসে নগ্নিকা। ওষ্ঠে মাধুকী। কপালে তিলক। কপোলে পত্রলেখা। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ বাস ঋষিকুমাবেব শবীরে। শরীর ঢাকা তাব শুধুই নীবিবন্ধে। আমন্ত্রণেব মেখলা বিপজ্জনকভাবে শিথিল। কটিতট শীর্ণা নদীবেখাব মতো দেখায। ওষ্ঠবঞ্জনীতে ওষ্ঠ বিম্বফলকেও লজ্জা দেয়। চক্ষুতারকায় ম্রিয়মাণ নক্ষত্রেবা।

সে আসে। পদক্ষেপে ব্রীড়া। ভঙ্গিমায় লাস্য। স্বর্গোদ্যানেব নর্তিনীব মতো মধুকবকুঞ্জিত নূপুবনর্তনে সে আসে। ঋষিকুমাবেব কাছে এসে দাঁডায। আচ্ছন্ন সেই ঋষি। গূঢ় হৃদযদেশে সংঘাত। থবথব কেঁপে ওঠেন তিনি। ঋষিকুমাব!

মধুস্রাবী সে কন্ঠস্বরে মিথ্যাস্বরূপিণী বমণী তাঁকে ভয দেখায। তাব চোখেব দ্যুতিতে দুরন্ত বিদ্যুৎ। তাকে আহ্বান জানায।

ঋষিকুমার! সারারাত অনিদ্রায় কাটাবেন না। গাত্রোত্থান করুন। অনাথিনীব এই শয্যায় আপনি শযন করুন। অনাথিনী ভূমিতলে শযন করুক।

ব্রহ্মচাবীর পক্ষে তৃণশয্যাই শ্রেষ্ঠ শয্যা।

মনে করুন এই শয্যাই তৃণশয্যা। সামান্য এই পালঙ্ককে মনে করুন ভূমি। এক বাত্রির শযনে পাপ হবে না আপনাব।

আমি সংসারত্যাগী ঋষি। জগতেব মাযায আমায বন্দী করো না।

আপনি মুক্ত ঋষি। আপনাব চবিত্র প্রভাতকালীন সরোবরেব নির্মল জলবাশিব মতো। যদি সামান্য শয্যাশয়নে আপনাব ব্রহ্মচর্য চলে যায তবে কিসেব ব্রহ্মচাবী আপনি? কাঞ্চনকে ত্যাগ কবাব অনেক আগে তাকে মন থেকে ত্যাগ কবতে হয। তাই না ঋষি? কাঞ্চনেব স্পর্শে আপনাব কলুষ লাগবে না, কামিনী আপনাকে বিচলিত কবতে পাববে না, তবেই আপনি ঋষি। আপনি নিখাদ স্বর্ণ। স্বর্ণ কোনদিন কলুষিত হয়?

তুমি বড়ই বাক্‌চতুবা।

আপনাকে দেখামাত্র আমাব সব চাতুর্য খসে পড়েছে ঋষি। আপনি শয্যা গ্রহণ করুন।

দুটি হাত ধবে ঋষিকুমাবকে সে শয্যায় নিযে আসে। চঞ্চল ঋষিকুমাবেব কাপাস পড়ে থাকে ওদিকে।

শয্যায় শযন কবিয়ে তাঁকে নিজেব উত্তম পশমবস্ত্রটিতে ঢেকে দেয নগ্নিকা। হঠাৎই

ঋষিশরীরে কম্পসাত্ত্বিকের উদ্গাম হয়। অসম্ভব শৈত্যপ্রবাহে ডুবে যাচ্ছেন তিনি। প্রবল শীতবাতাসে হাহা ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছে শরীরময়। তৃষ্ণার দংশনে বিক্ষত তাঁর মন।

নগ্নিকার পুষ্ট অধরে প্রতিজ্ঞা। বসে থাকে সে পায়ের কাছে। তপ্ত করতলে সে ঋষিকুমারের পা দুটি চেপে রাখে। আপনি কাঁপছেন কুমার। যেন গভীর থেকে বলে ওঠে নগ্নিকা। ধীরে সূক্ষ্মতন্তুজালের মতো অঙ্গুলি বিস্তার করে সে। একটি একটি করে লোমকূপ খুলে দেয়। পদমর্দন করে।

ঋষিকুমারের শীত বাড়ে। তৃষ্ণা বাড়ে। চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ হয়। ফিসফিস করে নগ্নিকা।

ঋষিকুমার!

উঁ।

কখনও কোন পবিত্র প্রভাতে ফুলগুলিকে ফুটে উঠতে দেখেননি তপোবনে, অরণ্যমধ্যে কোন চকিতা হরিণীর গাত্রলেহন করতে দেখেননি হরিণযুবাকে, কখনও কোন বর্ষাসমাগমে ডাহুকীদম্পতিকে এক হয়ে যেতে দেখেননি, কোন মঞ্জুরিত বসন্তকালে ফুলদলে ভ্রমরের ঊর্ধ্বমুখী পশ্চাদ্দেশ দেখেননি? এসব তো আপনার কাছের ছিল, আঁখির সন্নিকটে ছিল?

দহনতপ্ত ঋষি উত্তর দেন, তেমন করে দেখা হয়নি আমার।

কখনও শোনেননি এই আপনার চারপাশের মানুষজনের বেঁচে থাকার সঙ্গীত? দেখেননি এরা কীভাবে মগ্ন প্রেমে জীবনকে ধারণ করে রাখে, স্বপ্নে উন্মত্তরূপে দেখে, মর্ত্যভূমিতেও দেবলোকের কল্পনা করে? কীভাবে প্রতিদিন অগ্নিময় মন্ত্রোচ্চারণ করে? এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, এই ভূমির শ্রেষ্ঠ ফুল মানুষ ছেড়ে আকাশের দেবলোকে কেন বিচরণ করছেন ঋষি? কল্পিত স্বর্গের দেবতাদের পেছনে এতদিন কেন এভাবে ব্যর্থ অতিবাহিত করলেন? ঋষি, বসুমিত্র আমার কাছে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে গেছেন—জীবন ছাড়া বেদাধ্যয়ন মিথ্যা।

তুমি ঠিকই বলছো ভদ্রে। মিথ্যার পেছনে, শুধুই মিথ্যার পেছনে, অনন্ত মিথ্যায় গিয়ে দিক্‌চিহ্নহীন অলীকতায় দিশা হারিয়েছে আমার শিক্ষা।

জীবনকে বাদ দিয়ে জীবনাতিরেক কিছুই দেখা যায় না ঋষি। অবিদ্যার অহঙ্কার ক্ষমা করবেন। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছিলেন একদা, এই অক্ষয়কে না জেনে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া পলায়নের ভীরুতা, জীবন তো আপনার জন্য। এই দেখুন সমগ্র সৃষ্টির গোপন আকাঙ্ক্ষা জীবিতের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন, ভূতলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম এইখানে—এইখানে ব্যাপ্ত সে মহাজীবন, এইখানেই ব্রহ্মোপলব্ধি!

নগ্নিকা খুলে ফেলে তার অবশিষ্ট সামান্য আবরণ। নিপুন শিল্পকারিকা চিত্রিত করেছে তার শরীর। গৃঢ় জ্যোৎস্নায় মহিমময়ী হয়ে উঠলো শরীর।

স্নায়ুতে প্রবল দুন্দুভি বেজে উঠল ঋষিকুমারের। চোখদুটি লোলুপ হয়ে উঠল। দুই চোখে তাকাতে পারেন না তিনি। অনির্বচনীয় বিভায় আলোকিত ত্রিভুবন। উদ্ভাসিত কারুকৃতিতে ফুটে আছে দুটি স্তনফুল। উন্মুক্ত বক্ষোদেশের দু'পাশ থেকে ছন্দিল ভঙ্গিমায় নেমে গেছে দুটি বাহু। গলা ঘাড় স্কন্ধদেশ পুড়ে যাচ্ছে সুরভিত অগ্নিময় কামনায়। আমোদিত এই শরীর পূজায় নিজেকে নিবেদন করলেন ঋষি। স্ফুরিত অধরে দিলেন চুম্বনের দাগ। দংশন করলেন স্তনফুলে। দুরন্ত তস্করের মতো শরীরময় ঘুরে বেড়ালেন মত্ত লুণ্ঠনে।

ক্রমে প্রভাত আসন্ন হল। আলো ফুটছে। চমৎকার নিদ্রায় ছিলেন ঋষিকুমার। হঠাৎ তীব্র আলোকচ্ছটায় জেগে উঠলেন। একি দশা হয়েছে তাঁর? কাপাস লুটোচ্ছে ধুলায়। কমণ্ডলুতে গঙ্গাবারির বদলে ভরা রয়েছে গন্ধবারি। অঙ্গে পরিহিত রমণীর বাস। পাশেই নগ্নিকা। অসহ্য নগ্ন রূপ তার। লাফ দিয়ে উঠলেন ঋষিকুমার।

ঘুমজড়ানো চোখে নগ্নিকা বলে উঠলো, আজ আমি সার্থক।

এ আমি কোথায়?

মাটির পৃথিবীতে। প্রিয়ার কুটিরে।

তুমি আমাব ধর্মনাশ করেছ ।

ববং আমিই তোমাকে পরম ধার্মিক করেছি ঋষি, তোমাকে আমি জীবনেব পাঠ দিয়েছি। দাও গুরুদক্ষিণা দাও ।

কে তুমি ? এমন শীলিত বাক্‌চাতুর্য কাব ?

কার হতে পারে ? অনুমান করো ।

তুমি—তুমি—

আমিই মহাবেশ্যা নগ্নিকা । শূদ্রাণী ।

অহো ঈশ্বর ! এ আমি কী পাপ কবলাম !

বিলাপ করো না কুমাব । তুমি না ঋষি ? তুমি না পুরুষ ? তোমার পাপ কিসে ? তোমার যাবতীয় পাপ তো আমি হবণ করেছি । স্কন্দপুবাণে ঋষিবাই বিধান দিয়েছেন, বেশ্যা একটি স্বতন্ত্র জাতি । তাব সঙ্গে উচ্চবর্ণের কোন পুরুষেব সম্পর্ক ঘটলে সে পুরুষ দণ্ডনীয় নয়।

শেষ পর্যন্ত আমি শূদ্রাণীব রন্ধনকৃত অন্নও স্পর্শ কবলাম ।

তাতে কী দোষ হয় ব্রাহ্মণ ? আপৎকালে, দুর্ভিক্ষসময়ে ব্রহ্মবাদীকে দেখেছি হীনবর্ণেব উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ (মাসকলাই) ভক্ষণ কবছেন । উদব ব্রহ্মকেও ভক্ষণ কবে নেয, তাই না ঋষি ? হে ঋষিকুমার, প্রয়োজনবোধে পূণ্যকে তোমরা বলো পাপ । আব পাপকে মহাপূণ্য বলে প্রণাম কর ।

তুমি ছলনাময়ী মহাবেশ্যা । তোমাব কাছে পাপপুণ্যেব শিক্ষা নেব আমি ? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ?

হাসালে ঋষি । কেমন তোমাদের পাপপুণ্যেব মানদণ্ড ? রাজাকে তুষ্ট কবতে তোমবা সব নিয়মকেই ভাঙতে পার । তোমাদেব বিধানে গণিকা পাপী কিন্তু গণিকাগমনে পাপ নেই । গণিকা বক্ষণেও না । গণিকাব দ্বাবা পূণ্য অর্জনে পাপ নেই । যজ্ঞেব দানে গণিকা গ্রহণেও পাপ নেই । গণিকাব সম্পত্তিভোগে পাপ নেই । তাদেব দানগ্রহণে পাপ নেই । পবাজিত ঋষিকুমাব কোন উত্তর খুঁজে পান না ।

নগ্নিকা কর্তৃত্বপূর্ণ কন্ঠস্বরে বলে, আজ তৃপ্ত এ মহাবেশ্যা । আজ সে ঋষিকে ধর্ষণ করতে পেরেছে । তার শরীবকে ইচ্ছামত ব্যবহার কবতে পেবেছে ।

ঋষিকুমার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন ।

আমি তোমার বিরুদ্ধে রাজার কাছে অভিযোগ কবব ।

জানি, আমাব শাস্তি হবে । আমাব যে অনেক পাপ । প্রলোভিত কবা আমাব পাপ, কিন্তু প্রলুব্ধ হওযাটা তোমাব পাপ নয় । কারণ তুমি পুরুষ । কিন্তু জেনে বেখো ঋষি আমার যদি শাস্তি হয় তাহলে তোমাদেব সবাবই শাস্তি হওযা উচিত ।

ঋষিকুমার আবাবও পবাজিত হন । কিন্তু এই পবাজয তাব ব্রাহ্মণত্বেব অহঙ্কারে লাগে। রক্তচক্ষুতে অগ্নিধারণ করে তিনি তাঁব শেষ অস্ত্রটুকু প্রয়োগ কবতে উদ্যত হন। বলেন, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, নিজেকে বেশভূষায় সজ্জিত কবে তৈলচিক্কণ দেহ নিযে তুমি এখনই তিতির পাখি হযে যাবে । কাল থেকে কালান্তবে তুমি একইভাবে ক্রেতা ডাকতে থাকবে । যেদিন তোমার ঘরে লোক আসবে সেদিনই তুমি যেতে পাবে, যেদিন আসবে না, সেদিন তুমি উপবাসী থেকে বিলাপ কববে ।

একটু যেন কেঁপে উঠলো নগ্নিকা । কিন্তু তারপবই আদিত্যবর্ণ আলোব মতো হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল । এক প্রবল বোধি ধীরে ধীরে অন্তঃপ্রবাহিনী নদীব মতো প্রবাহিত হতে লাগলো তার শরীর থেকে । অগ্নিবর্ণ একাগ্নীতে যেন সে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তার চারপাশের নিষেধ বলয়, সমাজ নামক বিপুল পর্বতগাত্র বেয়ে সে উঠে এসেছে শিখবে, যেখান থেকে নিচেব

পুরুষকুল—অহঙ্কাবী জ্ঞানতপস্বীকুল মানবকে মনে হচ্ছে বামন—পর্বতশিখবের মতোই নিজেকে অবিচল রেখে সে বললো ঃ

এই আমি পাখি হলাম না ঋষিকুমার। ববং সেই ভযঙ্কব কথকতার পাখিটি যেটি তোমাদের ভযে এতকাল ডানা গুটিয়েছিল, তাকে মুক্ত করে দিলাম আকাশে। প্রেমকে তোমবা নাবীজীবনেব স্বপ্নভূমি থেকে নির্বাসিত কবেছ, অনুশাসনকন্টকিত করে গড়ে তুলেছো এক অশুদ্ধতাব বহুপ্রচাবিত প্রচীব—আমি তাব ওপাবে যেতে চাই, তাই তোমাদের অভিশাপেব খাঁচাটাকে আমাকে ভাঙতেই হবে। যে ব্রাহ্মণত্বেব অহঙ্কাবে তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে তা আসলে তোমাব ছলমাত্র। আযেসি, নিঃশ্রমী মানুষেব ছলেব অভাব হয না। দুর্বল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ক্রমে ক্ষত্রিযেব বাজচ্ছত্রতলে প্রার্থী, ভিক্ষুক হযে পড়ছে। শূদ্রজাগবণেব প্রাক্‌কাল এখন। অভিশাপ তাই নখদন্তহীন ব্রাহ্মণেব অনেকগুলি পেশাব মধ্যে একটি পেশামাত্র।

আমি ঋষি — ব্রহ্মজ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী। মূঢ় নাবী তুমি, ব্রাহ্মণেব শক্তি তুমি কীভাবে পরিমাপ কববে ?

তুমি ঋষিও নও, ব্রহ্মবেত্তাও নও। তুমি বক্তমাংসে গড়া ঐহিক মানুষ, শুধু মানুষ বললে ভুল হবে, এই উত্তবীযের আড়ালে তুমি একজন লোভী জৈবিক মানুষ। ঠিক এই পরিচয়টুকুই তো কৌশলে শাস্ত্রবেত্তাগণ প্রণযন করে গিয়েছেন। তোমাব কর্তব্য যজন, যাজন, অধ্যযন, অধ্যাপনা, দান দেওযা এবং দক্ষিণাগ্রহণ কবা। কিন্তু কোথা থেকে শক্তিসঞ্চয় করবে ব্রাহ্মণ ? তাই দ্বিতীয় জন্মেব অবতাবণা কবা হল যাব নাম উপনযন। উপনয়নের পব ব্রাহ্মণ কিন্তু চাষ, গোপালন এবং কুসীদজীবিতা কবতে পাববেন। কোথায় তোমাব ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণ — সবই তো ভূমিব মাটি: পৃথিবীব।

তুমি আমাকে জাতিভ্রষ্ট কবেছ।

ঠিক, তবে আমবা দুজনেই তো জাতিভ্রষ্ট। এসো ঋষি, এই দুই জাতিভ্রষ্ট মিলে এই কালসন্ধিতে দাঁড়িয়ে একটি স্বতন্ত্র জাতিব সৃষ্টি কবি যাব পরিচয এই অচল বর্ণাশ্রমেব দ্বাবা চিহ্নিত হবে না, সে হবে জাতিকলঙ্কচিহ্নবর্জিত নির্মল শুদ্ধ মানুষ —জীবন্ত, সৃষ্টিশীল, ভবিষ্যৎকালের বিপুল শক্তিমান মহাস্থপতি — ঋষি, প্রেম ছাড়া এই মানবসবোবর তো বিপুল বদ্ধ জলাশয, কাল সুখবজনীতে তুমি আমাব সঙ্গে প্রেমে মগ্ন ছিলে, মৃদু প্রেমকূজনে মত্ত বালক থেকে অমিতবিক্রমশালী যুবকের মতো তোমার প্রেমস্পর্শ আমাকে নিযে গিয়েছিল দেবলোকে, যেখানে তুমি ছিলে দেব, আমি হয়েছিলাম দেবী। এই সত্য। সূর্যচন্দ্রপৃথিবীজলবাশির মতো স্বচ্ছ। এসো, তুমি তোমার জ্ঞান দাও, আমি দিই আমাব মনোহব কারুকৃতিময় শবীবস্থাপত্য, জন্ম হোক সুন্দব এবং সজ্ঞান মানুষেব।

থমকে যান ঋষিকুমাব। এ কোন নবজীবনেব বেদজ্ঞান শুনছেন তিনি ! যেন নব ওঙ্কারধ্বনিতে জাগ্রত হয়ে উঠলো প্রভাতকাল।

হাত দুটি ধাবণ করলেন তিনি, নগ্নিকার। আলিঙ্গন করলেন তাকে। বললেন, আমাকে বিদায় দাও সুকন্যে। আমি আবাব তোমাব কাছেই প্রত্যাবর্তন কবব। আজ আমার নতুন সন্ন্যাস, এই দেখ, আমি অঙ্গে ধাবণ কবেছি তোমাব প্রেমসুগন্ধিত কাষায় বস্ত্র।

নগ্নিকার চোখে জল। বিদায় নিলেন ঋষি। তাঁর পদক্ষেপে পৃথিবীর পুবাতন ধূলি উড়ে গেল। সে ধূলায অশ্রুপাত করল নগ্নিকা। দাঁড়িযে রইল কালেব কুটিরদ্বারে।

তাবপর থেকে বহুকাল সে দাঁড়িযে আছে। বহুকাল সে অঙ্গসজ্জা করেছে। তৈলচিক্কণ কবেছে দেহ। পুরাণযুগ থেকে বিজ্ঞানযুগ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছে। জনপদ প্রত্যন্ত থেকে নগরীগভীরে। বহুকাল তাব ক্রেতা এসেছে। কিন্তু একটিও প্রেমিক আসেনি। আজও একটি পাখিপ্রাণ কাঁদে ঃ ঋষি বড়ই বেদবদ, ঋষি বড়ই বেদরদ।

ভগীরথ মিশ্র

অসুখ

অন্ধকারটা ভালো লাগছে। বড় নিরাপদ আশ্রয়, কখনো কখনো, এই অন্ধকাব।

বেডরুমে আলো জ্বলছে। দীর্ঘ ট্রেন জার্নিতে ক্লান্ত বুবুন বুঝি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে। তৃণা বোধকরি কোনও এক শক্ত ডিজাইন তুলছে উলের কাঁটায়। ব্যালকনিব অন্ধকার পবিসরে আমি চুপটি করে বসে আছি। ঠিক বসে নেই, হাতে পায়ে, কনুইতে, পিঠে, জানুতে অবিবাম চিমটি কাটছি। আমাদের পার্ক সার্কাস এলাকায় মশার দৌবাত্ম্যটা বেশি। অন্ধকাবে মশাদেব উল্লাস বেড়ে যায়। মানুষকে অন্ধকাবে পেলে ওরা আকন্ঠ তৃষ্ণায় মৃগয়া শুরু কবে। আমার খালি গায়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা বসছে। তারা হূল ফুটিয়ে আমাব শবীরে অসংখ্য সুড়ঙ্গ তৈরিব কাজে লিপ্ত।

বাতেব ব্যালকনি পৃথিবীব অন্যতম রহস্যময স্থান। মনে হয নিজের মধ্যে নিজে বসে আছি। মনে হয় মায়ের জবায়ুব মধ্যে বয়েছি। মনে হয ···। ডালহাউসি পাড়ার যে বেসরকাবি ফার্মটিতে সপ্তম কিংবা অষ্টম স্থানাধিকারি আমি বেশ কড়া এক্সিকিউটিভ হিসেবে পরিচিত, সেই অফিসেব ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক দিবাকব দত্ত-র যদি ছ-টি মেয়ে থাকে, একটিরও বিয়ে না হয়, তবে তার বড়মেয়ের পাকা দেখার দিনে, এম-ডি সাহেব অফিস ইন্‌স্‌পেক্ট করবেন জেনেও ওকে ছুটি দিতে হবে স্রেফ একটিমাত্র কাবণে যে, তার বড় মেয়ের বয়েস তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে এবং এরপর আর তার বিয়েই হবে না! একে তো আমি, অফিসে, ডিসিপ্লিনের উর্ধ্বে কোনও কিছুকেই স্থান দিইনে, তাব ওপর বিশ্বাস করি, এই বাঙালি জাতটা ছুটি পেলে আব কিছুই চায না। কাজেই, আমি বললুম, 'নো!' খুব স্পষ্ট, ঋজু উচ্চাবণ। ফলে, তেইশে ফেব্রুযাবি, সেটা ছিল ছুটিব দিন, আচমকা আমার পার্ক সার্কসেব সাজানো ফ্ল্যাটে এল ছলছল চোখে দিবাকব দত্ত এবং বসবার ঘরে, চাবপাশটা একবার দেখে নিযে ঝুপ করে জড়িয়ে ধরল আমার ডানপাখানা, 'দয়া করুন স্যব। কন্যাদায় বড় দায়।'

প্রাথমিক হকচকানিটা কেটে যেতেই আমি ঝট করে পা সরিয়ে নিই। আর, ঠিক তখনই আবিষ্কার করি, পায়েব যে অঞ্চলটা জাপটে ধরেছিল দিবাকব, সেই অঞ্চলে তিলমাত্র সাড় নেই। ফ্ল্যাট থেকে প্রায় তাড়িয়েই দিই দিবাকরকে। কিন্তু আমার আতঙ্কিত ভাবখানা আরো প্রকট হয। একটা মানুষ জাপটে ধবল আমার পা, আমি জানতেই পারলুম না? যে পা ধবে তার মানসিক অনুভূতির কথা বলতে পারিনে, তবে পায়ের অধিকারীটিব নির্ঘাৎ এক ধবনেব সুখানুভূতি হয়, কারণ, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের স্নাযুমণ্ডলী সেই উত্তমর্ণতার খবরটি মগজ মারফৎ পাঠিয়ে দেয় অতৃপ্ত অহং-এব কাছে এবং তাতে বিপুল সুখানুভূতি ঘটে এবং যৎপবোনাস্তি নীলাভ স্বেদ ঝরে। এক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটল না কেন? সত্যিসত্যিই আমার পা-খানি জাপটে ধবেছিল তো দিবাকর? ওর আঙুলের ত্বকের সঙ্গে আমাব পায়ের ত্বকের সংযোগ ঘটেছিল তো সত্যি সত্যি? ভাবতে ভাবতেই আমার মধ্যে মৃদু কাঁপুনি শুরু হয়েছে। একটা সেমিনারের টুকরো টুকরো অংশ যেন ক্রমাগত বেজে চলেছে মগজের মধ্যে। ভেসে উঠেছে ডাঃ দে-মুন্সির ভরাট গলা : ভয়টা ঐ বোগটা নয়, ভয়টা মানুষকে, যারা, রোগটা সেরে গেলেও, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, সেবেছে। এবং নানা প্রক্রিয়ায ঘৃণা করতে থাকে ভূতপূর্ব রোগীকে, আজীবনকাল, প্রজন্ম

ধরে। বাট, অ্যাজ আ ডক্টর, আমি বলব, প্রাইমারি স্টেজে ধরা পড়লে এ রোগ সেরে যায়। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি হল, শরীরের কোনও কোনও জায়গায়, প্রধানত আনকেয়ার্ড্-ফর অংশগুলিতে ফ্যাকাসে স্পট পড়বে এবং ঐ জায়গাগুলোতে কোনও সাড় থাকবে না। ঐ অসাড়তা ক্রমশ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়বে। ক্রমশ কানের লতি ফুলতে থাকবে, নাকের চূড়া ভোঁতা হবে, হাতে-পায়ে রস জমবে, জ্বর আসবে মাঝেমাঝেই .... । আসলে, কুষ্ঠরোগ নিয়ে মানুষের আতঙ্কের মূল কারণ হল, সরাসরি সামনে এসে থাবা তুলে দাঁড়ায় না। সে আসে অতি সন্তর্পণে। নিঃশব্দে। শরীরের একেবারে অবহেলিত, অনালোকিত অংশে বাসা বাঁধে। প্রাথমিক স্তরে তার আগমনবার্তা টেরই পায় না মানুষ।

আমি ডান পা-খানা ওপরে তুলি। গোড়ালির কাছাকাছি হাত বুলিয়ে অসাড় জায়গাটা পরীক্ষা করি। কোনও ফ্যাকাসে ছোপ রয়েছে কি ?

বিপন্ন মানুষের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমার তেমন কোনও পূর্ব-ধারণা নেই। ভীষণ কোনও কৌতূহলও নেই। আটলান্টিকের মাঝখানে জাহাজখানা ডুবছে, থইথই জল আকাশের দিকে লক্ষ ফণা তুলে নাচছে, কিংবা দাউদাউ করে মাথার ওপর বাড়িখানা পুড়ছে, ঘরের ভারি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, ভেতরে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সদ্য-প্রসূতি মা পাগলিনীর মতো বন্ধ দরজায় ঘা মারছে অবিরাম – তেমন কোনও, বিপন্ন পরিস্থিতি আমার সামনে কখনো ঘটেনি। গৃহদাহের ঘটনা একটা ঘটেছিল বটে, তবে সেও আমার পরোক্ষ-দর্শন। ঘটেছিল একরাতে, আমাদের গাঁয়ে। আগুন লেগেছিল, গভীর রাতে শেখ জামালের কোঠা বাড়িতে। সারারাত ধরে পুড়েছিল বাড়িখানা। আমি তখন গাঁয়ের বাড়িতে ছিলাম। মাঝরাতে আর্তনাদ উঠল, আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা দেখলুম দোতলার জানালা দিয়ে। সারা গ্রাম ঝেঁটিয়ে দৌড়চ্ছিল আগুন নেভাতে। একবার মনে হয়েছিল যাই। পরমুহূর্তে মনে হল, আমি আর গিয়ে কী করব ? শহরে থেকে থেকে আমার তো সেই আগেকার দামাল অভ্যেসগুলো আর নেই। তাছাড়া, সামনে আমার পরীক্ষা।

আমার মনে পড়ল, বছরটাক আগের এক সন্ধের কথা। আমাদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকেই একটা ওষুধের দোকান। পাড়ার একেবারে শেষের বাড়ির ছেলেটা, প্রবাল না কী যেন নাম, একটা ওষুধ কিনে ফিরছিল বাড়ির দিকে। এমনি সময়ে জনা চার-পাঁচ ছোকরা, 'এই তো রে, মাল তো এখানে' বলেই ঘিরে ধরল ওকে। ছেলেটার হাতে ওষুধের শিশি, চোখে-মুখে ভয়, আতঙ্ক। ওরা বলল, চল্ রে কবরডাঙার ক্লাবে। বাতচিৎ আছে। ছেলেটা মিনমিনে গলায় বলল, 'বাবার ভীষণ বাড়াবাড়ি, ডাক্তার বসে রয়েছে ঘরে, ওষুধটা দিয়ে আসি।'

'ওসব কথা ঢের শুনেছি। চল্, চল্, নেপালদা তোর জন্য বসে রয়েছে।' ছোকরাগুলো ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় কবরডাঙার দিকে।

অন্ধকার ব্যালকনিতে বসে নিঃশব্দে দেখছিলুম দৃশ্যখানা। ছেলেটাকে নিয়ে ওরা এক সময় মিলিয়ে গেল মোড়ের মাথায়। ব্যালকনির ধারে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম। ছেলেগুলোর বয়েস সতেরো-আঠারোর বেশি নয়। একটু ধমকধামকও দিতে পারতুম। নিদেন প্রবালের বাড়িতে গিয়ে খবরটা অন্তত দেওয়া যেত। কিন্তু আমি বসেই রইলুম। আজকের দিনে প্রতি ব্যাপারে হামলে পড়া এক ধরণের বোকামো। কে জানে ছেলেটাকে নিয়ে ওরা কী করবে ! তেমন কিছু ঘটলে আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ওদের টার্গেট হয়ে যাব। তারপর একদিন বাগে পেলেই ওরা আমাকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যাবে ওদের কবরডাঙার ক্লাবে, তৃণা টেরও পাবে না।

সেদিন ঝুঁকি নিতে না চাইলেও ছবিটা তো এখনো ভাসে। বিপন্ন মানুষের নিজের হাতে আঁকা ছবি। আটলান্টিকের মধ্যিখানে ডুবন্ত জাহাজ, জামাল শেখের স্ত্রী-পুত্র, কিংবা প্রবাল নামে ছেলেটার মুখ। তবে এসব আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যেতে পারি, এটাই বাঁচোয়া।

বর্ধনসাহেব, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, তাঁর বাংলোয় জোর তলব। অফিস ছুটির পর গেলুম। বিশাল লাউঞ্জের মাঝখানে ভারি ভারি সোফা-কোচ পাতা। পায়ের তলায় পুরু

কার্পেট। চা-বিস্কিট দিয়ে গেল। বেশ দামি বিস্কিট। আমরা বাড়িতে এমনটা খাইনে। এমনসময় বস-এর বছর-পাঁচেকের ছেলেটি নাচতে নাচতে এসে দাঁড়াল। বেশ মোটাসোটা আর ভীষণ ফর্সা। দেখলেই আমার বাৎসল্যরস বেড়ে যায়। আদর করতে ইচ্ছে করে।

বলল, 'বাসু-আঁক্ল্, আমরা কখন শপিং-এ যাব ?'

বর্ধনসাহেব গেছেন গল্ফ্ ক্লাবে খেলতে। মেমসাহেব সাজগোজ করছেন, আমাকে নিয়ে শপিং-এ বেরোবেন। মাঝে মাঝেই এমনটা হয়। সেদিন রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি নে। পার্ক-সার্কাসের দু'কামরার ফ্ল্যাটে বুবুনকে নিয়ে একলাটি থাকে তৃণা, বিমর্ষ হয়, নিঃসঙ্গ, ভয় পায়, কষ্ট হয়। দেরি হওয়ার কারণটা লুকোতে চাইনে তৃণার কাছে। তৃণা বিদ্ধ হয়, ক্ষুব্ধ অভিমানে ফুঁসে ওঠে, কথা বন্ধ করে দেয় সে রাতে। ওকে আমি বোঝাতে পারিনে যে এটা দরকার। বাঙালি মেয়েগুলো বড়ই অবুঝ। এদিকে ভীষণ অ্যামবিশাস, আবার বাড়াবাড়ি রকমের ইমোশন্যাল। এমন করলে চলে ?

বস-এর বাচ্চাটার দিকে হেসে বলি, 'যাব, মাষ্টার বনি, মা তৈরি হলেই যাব। এই নাও, বিস্কিট খাও।'

ভীষণ নাক কুঁচকে মাথা দোলায় বনি, 'এ বিস্কিট আমি খাইনে। এ বিস্কিট তো জিম খায়।'

আমি দু-আঙুলের ডগায় বিস্কিটখানা ধরেছিলুম। তখনই টের পাই, দুটো আঙুল দিয়ে বিস্কিটখানা ধরে রয়েছি বটে, কিন্তু আঙুলের সঙ্গে বিস্কিটের কোনও সংযোগ ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। কোনও অনুভূতিই পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছে, আমার দু-আঙুলের ফাঁকে কোনো বস্তুই নেই। কী করে এটা হল ? কবে হল ? আমি থরথর করে কাঁপতে থাকি। ঐ দুটো আঙুলে কলম চেপে ধরে আমি তো রোজ লেখালেখি করি। তখন তো খেয়াল হয়নি ব্যাপারটা। আসলে, লেখার সময় আঙুল দিয়ে কলমটাকে বাগিয়ে ধরা হয় বটে, কিন্তু তখন আসল কাজ মগজের। আঙুলের অনুভূতি-টুতির কথা তখন মনেই আসে না।

তৃণাকে এসব কথা বলা যায় না। কাউকেই বলা যায় না। ওরা সকলেই আমাকে স্বাস্থ্যবান নীরোগ বলেই জানে। এককালে আমি খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলুম। অনেক শীল্ড-কাপ-মেডেল এখনও আমাদের পুতুল সাজানোর ক্যাবিনেটে শোভা পায়। ছাত্রজীবনে রোজ ব্যায়াম করেছি ডাম্বেল ভেঁজেছি। তখন আমার শরীরের প্রতিটি পেশী, শিরা-উপশিরা, সতেজ ও মজবুত ছিল। আমার বন্ধুরা এসব জানে। তৃণাও শুনেছে এসব গল্প। ওরা আমাকে অন্য ধাতের মানুষ বলেই জানে। দেহে-মনে এক নিটোল সুস্থ মানুষ। সেই কারণেই শরীরের অসাড় জায়গাগুলো নিয়ে আমার ব্যক্তিগত আতঙ্কগুলো ওদের জানানো চলে না। রণক্ষেত্রে একক সৈনিকের মতো দশদিকের আক্রমণ একলাকেই সামাল দিতে হয়। এই নিদারুণ ব্যূহের মধ্যে অন্য কাউকে, বিশেষ করে তৃণাকে, নিতে চাইনে আমি। ও এসবের বাইরেই থাক।

তৃণার সাড়া শব্দ পাচ্ছিনে। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ? উলের ডিজাইনটা নিখুঁত হল তো ? উঠে দাঁড়ালুম। বসবার ঘরে গিয়ে অ্যাটাচিটা খুলে ধরতেই হলুদ রঙের ফাইলখানা লাফিয়ে চলে এল আমার হাতে। ফাইলখানা হাতে নিয়ে আমি দু'দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পিঠে কে যেন মৃদু চাপড়ায়। চাপড়ানিটা বড় ভালো লাগে। ফাইলটা নিয়ে ব্যালকনিতে এসে বসি। কাগজ পত্তরগুলো অল্পস্বল্প ওলটাই। নিরুপম বিশ্বাসের মুখখানা স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে। নিরুপম আমার থেকে বছর-দুয়েকের ছোটই হবে। ঋজু শরীর, চোখে মুখে প্রত্যয়। এক কলেজেই আমি ছিলুম দু'ক্লাস উঁচুতে। আমার কলেজে জীবনের সেই তেজ দেখে সে আমার ভক্ত হয়ে উঠেছিল। সেটা টের পেলুম সাতাত্তরের একুশে জুন। ও সুপারভাইজার হিসেবে আমার কাছে জয়েন করতে এসেই চিনে ফেলল আমায়। গদগদ গলায় বলল, আপনাকে কি ভোলা যায় ? আপনিই তো হোস্টেলের রেশনের চিনি ব্ল্যাকে বেচে দেবার জন্য সুপারকে বারো ঘন্টা ···। নিরুপমের সেদিনের কথাগুলো মোটেই খোসামুদি ছিল না। কারণ, নিরুপম বিশ্বাসরা এ যুগেও সেই বিরল জাতের মানুষ যারা কোনও কিছুর জন্যই নিজেদের বিক্রি করে না।

সেই তেজই ওর কাল হয়েছে। ওর ব্যাচের সব সুপারভাইজারই দু'ধাপ উঠে গিয়েছে। ও যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সেখান থেকেই ও আমাকে এখনও ভীষণ শ্রদ্ধা করে। নিরুপম যে একটা বড়সড় বিপদে পড়বে, এটা জানতুম। আগে বুঝতুম না, এখন বুঝি, মানুষকে কোনও না কোনও একটা সময়ে এসে একটু-আধটু অ্যাডজাস্ট করতেই হয়। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসও সেই কথাই বলে। নিরুপমকে এসব বোঝানোর চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। এই সমাজে, সংসারে তার সঙ্গে বর্তমানে আমার নিদারুণ ফারাক। বোঝালেও সে বুঝত না, আমি জানি।

বর্ধন সাহেব সাব-অর্ডিনেটদের কাউকে টেলিফোন করলে, কথা শেষ করেই আচমকা রেখে দেন। অপরপক্ষ চমকে ওঠে। ক্ষুব্ধ, অপমানিত বোধ করে। কিন্তু কিছুই করবার নেই, বর্ধন সাহেবের ফোন করবার ধরনটাই এমন। নিরুপম নাকি তেমন অবস্থায় পড়ে ফের ফোন করেছিল সাহেবকে, লাইনটা কেটে গিয়েছিল স্যার। অপারেটর বলল, আপনি নাকি কেটে দিয়েছেন। আমি বললাম, তা কী করে হয়? কথাই শেষ হয়নি। তাছাড়া আমাদের সাহেব পাক্কা আট বছর বিলেতে ছিলেন, তিনি ওরকম করতেই পারেন না। তিনি এটিকেট জানেন।

হপ্তাটাক বাদে বর্ধন সাহেবের ঘরে আমার তলব পড়েছিল। নিরুপমের নামে দুর্নীতির একগাদা অভিযোগ। আমাকেই তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে হবে। তদন্তের রিপোর্টটা কেমন হবে, আমি তৎক্ষণে আন্দাজ করে ফেলেছি। চলে আসার আগে আমার পিঠে একটা আহ্লাদী চাপড় মারেন বর্ধন সাহেব, য়্যু আর দ্য রাইট ম্যান ফর্‌দিস জব।

গেল মাসে আমার মাসতুতো ভাই এসেছিল। এখানকার কলেজে ভর্তি হতে চায়। মেসোর কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। ভয় হল, ভর্তি হতে পারলে, আমার কোয়ার্টারেই থাকতে চাইবে নিশ্চয়ই। মাসী ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখবেন। বড় শহরে থাকবার এই এক জ্বালা। আত্মীয় পরিজন সবাই মুখিয়ে থাকে। তৃণা শোনা মাত্রই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন একটা শীতল বাতাবরণ বজায় রেখে মাসতুতো ভাইকে বলে দিয়েছি, ফর্ম ফিল-আপ করে যাও। নাম উঠলে জানাব।

অফিস বেরোনোর মুখে তৃণা শুকনো মুখে বলল, ও এখানে থেকে পড়বে নাকি?

বলি, দূর, দূর, ও যা নম্বর পেয়েছে, কলকাতার কোনও কলেজে চান্স পাবে না।

আমাদের একমাত্র ছেলে বুবুন। সবাই বলল, মিশনে দাও। পড়াশুনো ভালো হবে, ক্যারেক্টারও তৈরি হবে। মিশনের ছেলেদের কি ক্যারেক্টার ভালো হয়? জানিনে। মিশনের ছেলেগুলো তাদের ভালো ক্যারেক্টার নিয়ে কোথায় যায়, সে খোঁজও রাখিনে। তবুও সবাইয়ের পীড়াপীড়িতে আর তৃণার জেদে বুবুনকে পুরুলিয়ার মিশনে ভর্তি করে দিয়েছি। সে ওখানে ভালোই আছে। পড়ে, খেলে, দু-বেলা প্রার্থনা করে, স্বামীজীদের কাছে ত্যাগ শেখে, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েই খালাস।

নিরুপমের তদন্তের রিপোর্টখানা লিখতে লিখতে বেশ রাত হয়েছিল সেদিন। সবদিক থেকে বেশ বেঁধেছেঁদেই লিখতে হল। নিরুপম যাতে এই ফাঁস কেটে বেরোতে না পারে তেমন ভাবেই লিখেছিলুম রিপোর্টটা।

ও ঘরে তৃণা শুয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি বাথরুমে গেলুম। খুব একটা তেষ্টা নেই, তাও জল খেলুম। তারপর শোবার ঘরে ঢুকলুম। অকারণে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। সারা মুখের মধ্যে আমার সবচেয়ে গর্ব করবার বস্তুটি হল নাক। অমন খাড়াই ধারাল নাক সচরাচর বিরল। বন্ধুরা চিরকালই বলত, আমার ব্যক্তিত্বের বারো আনাই নাকি কেন্দ্রীভূত রয়েছে ঐ নাকে। তৃণাও স্বীকার করে, এমন তীক্ষ্ণ নাকের অধিকারী কোনো পুরুষকে যে কোনো মেয়ের ভালো লাগবে। ধারাল নাকের মানুষেরা নাকি বুদ্ধিমান, স্বাধীনচেতা হয়। তারা পৃথিবীতে নাকি মাথা উঁচু করে চলতে ভালোবাসে। সারা মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে নাকের কাছটিতে এসে আচমকা থেমে যায় হাত। নাকটাকে তো মোটেই ধারাল লাগছে না। চারপাশে মাংস জমেছে, চুড়োটাকেও কেমন ভোঁতা ভোঁতা লাগছে। আমি ভুল দেখছিনে তো! আমি

কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ! আমার শরীরে কি সত্যি সত্যি— ! আমি ডুকরে কেঁদে উঠি। প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করি আমার ধারাল নাক ভোঁতা হয়ে যাওয়া, শরীরের স্থানে স্থানে অসাড়তা, ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে ? তেইশে ফেব্রুয়ারী ? প্রবালেব মৃত্যুব দিনে ? জামালেব ঘর পোড়ার রাতে, যেদিন মাসতুতো ভাইকে বিদেয় করে দিলুম, যেদিন নিরুপমের বিরুদ্ধে তদন্ত-রিপোর্টটা লিখলুম ? নাকি তারও আগে, অনেক অনেক আগে ?

বুবুনের স্কুলেব ছুটি হয়েছে। আজই ফিবল সে। আমরা দু-জনে ওকে রিসিভ কবতে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলুম। তখনও ট্রেন আসতে দেরি আছে। প্ল্যাটফর্মের কলে মুখ-হাত ধুয়ে নিই। তৃণা আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্টলে কফি খাই। ইতস্তত পাযচাবি করি।

বুবুন নামল বন্ধুদের সঙ্গে। ছুটে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কবল, তারপর জড়িয়ে ধরল আমাকে। ওর মাথাটা ঠেকল আমার বুকেব মাঝখানে। সেই মুহূর্তে টের পেলুম, আমার শরীরের নিচের দিকটা, একেবারে বুক অবধি অসাড়। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন কোনো কল্যাণীয় পায়ে হাত ছোঁয়ালেই সে সংবাদ কোনও এক বহস্যময় পথ বেয়ে সবাসবি বুকে পৌঁছে যেত। অথচ, ঐ মুহূর্তে, আমাব শরীবেব অর্ধেক জুড়ে লেপটে বয়েছে আত্মজব শবীব, কিন্তু আমাব মনে হচ্ছে, যা আঁকড়ে রয়েছে আমার শবীবে, তা বুবুনেব ছায়ামাত্র। ছায়াব সঙ্গে ছায়ার মিলনে কোনও অনুভূতি জাগে না।

কোথায় যেন ঝুরঝুর করে মাটি খসে খসে পড়ছে। টুপটাপ শব্দে অবিবাম জল পড়ছে কোথাও। কুটকুট কবে কিছু কাটছে ইঁদুব জাতীয় কোনও প্রাণী। দূবে যেন একপাল কুকুর ডেকে চলেছে অবিরাম। অন্ধকার ব্যালকনিব দেওযালে একটা টিকটিকি সম্মোহনী দৃষ্টিতে তাকিযে রয়েছে একটা পোকাব দিকে। পোকাটা স্থিব...। পাশেব বাড়িব পাঁচিলে একজোড়া বেড়াল কর্কশ গলায় ঝগড়া বাধিয়েছে।

পাশেব ঘরে, এই মুহূর্তে, বুবুনকে কোলেব মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে তৃণা। আমি নিরালম্ব ব্যালকনিতে রাত জাগছি। বাত বাড়ছে। গাঢ় হচ্ছে। উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা কালো রঙের ষাঁড় শুযে শুযে অলস-চোখে জাবব কেটে চলেছে। এই মাঝবাতেও বাস্তাব কলে সর্বাঙ্গ উদোম করে চান কবছে এক ভিখিবি। দেখতে দেখতে আমার অবগাহন-তৃষ্ণা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। তাঁদেব দৃশ্যখানা ধীবে ধীবে সংক্রামিত হতে থাকে আমাব মধ্যে। আমি কি চান কবতে যাব এখন ? শীতল জলের সংস্পর্শে এলে না ক্লান্ত বিশুদ্ধ দেহকোষগুলি সজীব সতেজ হযে ওঠে। সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে অবগাহন স্নান কবতে পারলেই কি আবাব সাড় ফিবে আসবে আমাব শরীরেব নষ্ট প্রত্যঙ্গগুলিতে ?

সন্ধেবেলায, আবাব নিরুপমেব ফাইলখানা খুলে দেখছিলুম। রিপোর্টখানাকে আবাব নতুন করে লিখলুম। বেশ বাঁধুনি দিয়ে লিখতে গিয়ে অনেকখানি সময লাগল। নিরুপমটা এ যাত্রা বেঁচে যাবে। মাসতুতো ভাইকে একখানা চিঠি লিখলুম। তাবপব সাবা সন্ধে এই ব্যালকনিতে বসে রয়েছি।

আমার দীর্ঘকালেব বিশ্বাস, মশার মতো অকৃতজ্ঞ প্রাণী দুনিয়ায় দুটি নেই। যার রক্তে প্রাণধাবণ করে, তাকেই হুলেব জ্বালায় অস্থিব কবে তোলে। আজ, এই মুহূর্তে, মনে হচ্ছে, আমার এ ধারণা ঠিক নয়। মশাগুলো মহানন্দে হুল ফোটাচ্ছে আমার সর্বাঙ্গে। আমি চমকে চমকে শিউবে শিউরে উঠছি। খুশিব জোয়ারে ভাসছি যেন। মশককুলের প্রতি এক ধবনেব গাঢ় কৃতজ্ঞতায় দ্রব হচ্ছি। আহ্, হুল ফোটালে কী আশ্চর্য যন্ত্রণাময় অনুভূতি ! আহা ! আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করছি, অন্ধকাব ব্যালকনিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আমার সারা শরীর জুড়ে বসুক, হুল ফোটাক, রক্ত থাক, আমার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়ুক। আমি যেন ওদের সামনে আমার অনাবৃত শরীরখানিকে নৈবেদ্যের মতে সাজিয়ে বসে আছি। হুলের দংশনজনিত যন্ত্রণা তো কেবল যন্ত্রণাই নয়, সর্বাঙ্গে সাড় ফিবে আসার অভিজ্ঞানও সেটা।

রাত আরও গভীর হলে আমি ঐ বাস্তার ভিখিরিটার মতো উদোম হয়ে স্নান করব আজ।

মানব চক্রবর্তী

ওয়াণ্ডারের মৃত্যু

'ডব্লিউ. এন. পি. ৬৯২' বাস্তায। খেয়ে নিয়েছে একপেট। 'শর্মা ফিলিং স্টেশন' থেকে আধঘন্টা আগে দু'লিটাব পেট্রল আব দু আউন্স টুটি। ব্যাস ··· এই ওই রাতের খাবাব। গত সপ্তাহে গ্যারেজওয়ালা বাবলু আমাব 'ওযাণ্ডাব'কে ডাযেটিং শিখিয়েছে। কম খাবে ছুটবে বেশি 'ওযাণ্ডার' ওব নাম। ডব্লিউ দিয়ে শুরু বলেই নয শুধু। ওব ক্যাবিসমা তাক লাগানোব মত।

এই তো গত মাসে এক বি-শিফ্‌টেব শেষে ফিরছি, লছিপুবেব 'বেডলাইট' এবিয়াব কাছাকাছি যখন, বাত তখন এগাবোটা দশ। জি.টি. বোড। দেখি, জনা-চাবেক মেয়ে গোটা বাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে। অনাবৃত উর্ধাঙ্গ। ঘাগবা ও সায়াজাতীয় কিছু পবা। আব বাস্তাব পাশে অন্ধকাবে কিছু ষণ্ড চেহাবার লোক ঘাপটি মেবে দাঁড়িযে।

টপ থেকে সেকেণ্ড গীযাবে ওযাণ্ডাব ক্ষণেকেব জন্য থমকাল, তাবপব ফিসফিসিয়ে বলল, মাস্টাব, লেট্ দেম কাম ক্লোজ, কাছে এলেই আচমকা টপ গীযাব কবে এ্যাক্সিলেটাবে মোচড় দাও, একবাবে সিক্সটি··· একটাকে শুইযে আমি বেবিযে যাব··· ডোন্ট ওবি ···

সত্যি, 'ওযাণ্ডার' এব জবাব নেই। ঠিক যা যা বলেছিল, হযেছিলও তাই। স্টার্টিং ব্লক থেকে স্টেবযেড নেওযা বেন জনসন যেভাবে ছিটকে বোবিযেছিল, তার চেযে দ্বিগুণ জোবে ওযাণ্ডাব ছিটকে বেবিযেছিল ঐ বাববধু-শৃঙ্খল। হ্যাঁ, হ্যাণ্ডেলেব গুঁতোয একটা পিচ বাস্তায পড়ে তখনও কোঁকাচ্ছিল, 'প্যাট ফুটা হযে গেল বে লচ্ছু ....

লচ্ছু অর্থাৎ ঐ বারবধুব বাখওয়ালে চীৎকাব কবে বলছিল, শালা তোব মা-কে ···

বর্ষায় কেক কোম্পানীব সবাবকলেব ঠিক সম্মুখে গাড্ডয পড়ে ওযাণ্ডাবেব সাইলেন্সাব পাইপ খুলে ছিটকে পড়েছে। আশ্চর্য, তখনও ওযাণ্ডাব যন্ত্রণাকাতব স্ববে বলেছে, মাস্টাব, নিউট্রাল কবে বেস বাড়াও। হেডলাইট জোবে ফোকাস কবো। ঐ যে ··· ঐ গাড্ডায় আমাব অর্গান··· পিক ইট আপ। তারপব দেখছি।

ছাব্বিশ কিলোমিটাব তীব্র শব্দে অন্ধকাবকে পর্দাফাই কবে ওযাণ্ডাব যখন আমাব বেল কোযর্টাবেব দবজায, তখন সাহেব-তানিযাব হাত ধবে বনানী ফোঁপাচ্ছে।

— আহা, কান্নাব কী হল ?

— ফিবতে এত রাত ? সাইলেন্সাব ভেঙ্গে ···

— কী দবকাব রোজ বাড়ি আসাব ? একদিন একটা বিপদ হবে দেখে নিও। তুমি ওখানে মেসে থাকতে পাব না !

ওযাণ্ডারকে ঠেলে ঘবে তুলছি। সিটেব স্প্রিং-এ ক্যাঁচক্যাচ শব্দ, অর্থাৎ ওব ফিচেল হাসি।

তখন আমি ঢাকাইযা কুট্টি, আস্তে কও বউ, ঘোড়ায় হাসতাছে ···

— হুঁঃ, ঢং। একদিন তোমার এই ঘোড়াকে আমি ঠিক খোঁড়া করে দেব, তখন বুঝবে।

না, ওয়াণ্ডারকে খোঁড়া করবে এমন সাধ্য কারও নেই। আমার চৌকির পাশে ও শোয়। ঠিক ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে। মাথাটা একপাশে কাত করা। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে আমি বলি, ডোন্ট মাইণ্ড ওয়াণ্ডার। বউ এর কথায় রাগ করো না। সাহেব পাঁচ, তানিয়া নয়, তাই বনানীর এত ভয়। ডোন্ট মাইন্ড ওয়াণ্ডার···

স্ট্রিট লাইটের ছিলতে আলো জানালার ফাঁক গ'লে ওর মুখে। চকচকে চোখ। আমি বুঝি না ও হাসে না কাঁদে।

— কাঁদছ ?

— ওহ্ নো। হাসছি ···

— সত্যি, দুটোর ফারাক বোঝা দায়।

— ঘুমোও মাস্টার। রাত জাগলে সকালে উঠতে দেরী হবে। গুড নাইট ···

— গুড নাইট···

এহেন 'ওয়াণ্ডার', যে আমাকে দারুণভাবে ফীল করে, বোঝে, বারে-বারে বিপদের দিনে এগিয়ে এসে ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করে, সাহস দেয় — সে এখন বাইরে। যেন বা স্টার্টিং ব্লকে। শুধুমাত্র স্টার্টারের 'গুড়ুম' শোনার অপেক্ষা।

আমি তখন ষাট-ওয়াটের ঘোলা আলোয় হ্যান্টিং-শু্য'র ফিতে বাঁধছি।

ন'বছরের তানিয়া কাঁচুমাচু মুখে বলল, বাপি, আমার ওয়াটার-কালার ?

— ইস্, ভুলেই গেছি। কাল কিনে দেব।

— কিন্তু কাল সকালেই যে আমার চাই ··· মিস্ বলেছেন ···

— আঃ ডোন্ট ডিসটার্ব মি নাড··· এখন ডিউটি যাওয়ার সময় ···

তক্ষুণি লেস ছিঁড়ল জুতোর। বনানী ঝাঁঝিয়ে বলল, সন্ধ্যে অবধি না ঘুমিয়ে আজই তো এনে দিতে পারতে।

— নাইট-শিফ্টে আট ঘন্টা আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসব খুচখাচ দিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। কেন, তুমিও তো পারতে বিকেলে বাজার থেকে কিনে আনতে।

— বাঃ, বেশ বললে বটে। ও. টি'র 'অন-কলে' আছি। দুটো সিজারের পেশেন্ট হাসপাতালে। কখন এ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াবে ঘরের সামনে তার ঠিক নেই, আমি যাব বাজারে!

লেস নেই, অথচ জুতো না বাঁধলেই নয়। এদিক-ওদিক উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে হঠাৎ কাছে ডাকলাম বনানীকে। এদিকে এসো··· আঃ ক্যুইক··· ঘুরে দাঁড়াও।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ও ঘুরে দাঁড়াল। আর আমি তৎক্ষনাৎ ওর খোঁপা খুলে কালো ফিতেটা টেনে নিয়েই সোজা হান্টিং-শু্যর সারিবদ্ধ ফুটোয়।

— একী ! চুলের ফিতে দিয়ে কী করছ।

— লেসির বিকল্প !

— তাই বলে চুল-বাঁধা ফিতে এভাবে কেউ নষ্ট করে ?

— আহা .... নষ্ট কিসের ! কিছুই নষ্ট হয় না। যা ফিতে, তাই লেস। খোঁপায় গুঁজতে ফিতে, জুতোয় বাঁধলে লেস। খালি জায়গা বদল।

— তুমি না একটা ···

— আঃ অমন করছে কেন ? কাল গাদাগুচ্ছের ফিতে কিনে দেব।

আর দেরী করা সম্ভব নয়। স্টার্টিং-ব্লকে পা রেখে ওয়াণ্ডার আমারই প্রতীক্ষায়।

— স্টার্ট। কিক্ মারতেই গর্জন করে উঠল ওয়াণ্ডার ! মাথা নিচু করে ছোট্টসাহেবকে হাসি খেলাম। তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল রেল-কোয়ার্টার, স্ট্রিট-লাইট, দোকনপাট, পরিচিত রাস্তাঘাট। ওয়াণ্ডার উড়ছে।

কপানারায়ণপুরে ব্রীজের মাথায় উঠতেই দেখি চন্দ্র-সূর্য। সেই দুটো বুড়ো। তখন ন'টা দশ।

ওয়াণ্ডার আস্তে হ'ল।

— কী হল ?

— টাইম-কীপার। ঐ যে...

— তা যা বলেছ। সত্যি, ওদের এক মিনিট দেরী নেই। এ-শিফ্‌টে দেখি ঠিক পাঁচটা দশে। সি-শিফ্‌টে ন'টা দশ। আচ্ছা, ওদের ঘড়ি বিকল হয় না।

— না। ওরা রিটায়ার্ড, সবই সময় সচেতন। খাওয়া-দাওয়া-ঘুম, মর্নিং ওয়াক, অথবা রাতে খাওয়ার পর এই যে ব্রীজের মাথায় মুক্ত হাওয়ায় পায়চারি।

ওয়াণ্ডার-কে নিউট্রাল করে বললাম, কী ব্যাপার ! আজও ? এই অন্ধকারে ?

সাতাশির মার্চে রিটায়ার্ড চন্দ্র মজুমদার হেসে জবাব দিল, অন্ধকার কিসের মশাই, সঙ্গে সূর্য আছে যে।

সূর্যকান্ত গুহ, উননব্বইয়ের আগস্টে অবসর নেওয়া বৃদ্ধ হেসে বলল, আপনি কিন্তু আজ দু'-মিনিট লেট।

— মেক আপ করে নেব।

— মেক আপ ? জানেন, দু'-মিনিট মেক আপ করতে বাকী উনত্রিশ কিলোমিটার আপনাকে ঘন্টায় কত কিলোমিটার স্পীড বাড়াতে হবে ? অন্ধকার রাত, রাস্তার অবস্থা খারাপ, তারপরে জি টি রোডে ট্রাকের যা দৌরাত্ম্য ...

— ও কিছু নয়। হয়ে যাবে। আফটার অল, আয়াম্ এ্যান আয়রণ মেকার। ছোটখাট ব্যারিয়ার কিছু করতে পারবে না আমাকে। নো প্রবলেম।

চন্দ্র-সূর্য দেখল আমায়, নিজস্ব আলো-অন্ধকারে।

— দ্যাখো চন্দ্র, দ্যাখো... জীবনভর তো ইনক্রিমেন্ট আর কলিং এর কাজ করে এসেছ, আয়রন মেকার দ্যাখো ... পাথর থেকে লোহা, ফের লোহা থেকে মানুষ ...

সূর্যকান্ত এগিয়ে এল। আমার কাঁধ টিপে বলল, আপনার অম্বল হয় মিঃ আয়রন মেকার ? মানে ... এই যে রাতের পর রাত জাগেন, বুক জ্বলে ? ঘাড়ে দপদপ করে ?

— হ্যাঁ।

— কোষ্ঠকাঠিন্য বা লুজ-মোশান ? পেট গুড়গুড় ? অনিদ্রা ?

— হ্যাঁ। হয় বৈকি।

— তবু আয়রন মেকার ? সে কী ?

— ইয়েস... অফ কোর্স। একজন আয়রন মেকারের চূড়ান্ত সাফল্য কোথায় জানেন ? টু প্রডিউস আয়রন এ্যাজ রিকোয়ার্ড। আগে সোনার বাংলা ভাসত দামোদরের বন্যায়। এখন ভাসবে লোহার বন্যায়। মোল্টেন আয়রনের ঢলে। পলিমাটির উর্বরা শক্তির মত পিউরিটান ভাবনার বদলে লোহাময় হয়ে থাকবে দেশ। 'ব্লুমিং-মিলস্' এর নীল শিখায় অন্ধকারময় ভারতবর্ষের

মুক্তি। 'বার এণ্ড বড' মিলের ইস্পাতে তৈরী হবে যৌবনের শক্ত সমর্থ মেরুদণ্ড। 'মেলটিং-শপ' এব বিশালকায় 'ইনগট' এব আদলে আমাদের চারিত্রিক ঋজুতা বছরের পর বছর রোদে-ঝড়ে মরচে ধরবে না। বাঁকবে না। ঝুঁকবে না। আমি তারই কারিগর। আয়াম এ্যান্‌ আয়রন মেকার। অম্বল-অজীর্ণ-অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, তার অতি তুচ্ছ বাই-প্রোডাক্ট। প্রোডাক্ট এর কোয়ালিটি ঠিক থাকলে বাই-প্রোডাক্ট—যা একটা দেশের সংহতিকে নাট-বল্টু-বিম-ওয়্যারবোপ-কলিয়ারি আর্ক-বেললাইন-জাহাজেরখোল-মর্টাবেব শেল-বকেট লঞ্চাবের অতিকায় শরীর-লোকমোটিভের স্ট্রাকচাব-স্যাসি-এ্যাক্সেল অর্থ্যাৎ অসংখ্য শিরা-উপশিবায় কষে বেঁধে রাখে। দেশ তখন ট্রিপল প্রমোশন পেযে নতুন শতাব্দীতে পৌঁছে যায়। এত সব সাফল্যের পরে অম্বল-অনিদ্রা-অজীর্ণেব দাঁত ফোটানি একজন আয়বন মেকাবেব কাছে নস্যি।

— শোনো চন্দ্র··· শোনো, এই যে বাতদিন বলো 'আব বাঁচতে ইচ্ছে করে না,' বলো এবাব, সত্যি কবে বলো নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে কবছে কিনা !

— আঃ বুক জুড়িয়ে গেল। কথা নয়, যেন জগৎসভাব শ্রেষ্ঠ-আসনেব এক-একটি ধাপ। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি··· স্পষ্ট···

ঘড়ি দেখে বললাম, প্লিজ, আর দেবী কবাবেন না। আয়াম্‌ বানিং সিক্স এণ্ড হাফ মিনিট লেট ···

— আসুন··· আসুন··· ফেব দেখা হবে।

— সি ইউ ···। মুখ বলল। ডান হাত 'টা··· টা'। বাঁ- হাতে গীয়াব চেঞ্জ।

ঠিক ন'টা পঞ্চান্নয প্ল্যান্ট। গ্যারেজে 'ওয়াণ্ডার'কে লক করে বলি, মাই বয, এক্ষণে নিদ্রা যাও···

— হুঁঃ ঘুম ! তিন নম্বব ফার্ণেসেব যা ব্লাস্ট-লিকেজ ! তোমাব হিয়ারিং অর্গান কী বলে এ সম্পর্কে ?

— বাড়ি ফিবে ঘন্টা দুই ধামসাবাজে কর্ণপটাহে। বনানীব প্রেমালাপ অর্ধেক না-শোনার দরুণ পাগলেব প্রলাপ মনে হয়। ছেলেব জন্য লিভোসিন আনতে বলেছিল,- এনেছি কেবোসিন। এনি ওয়ে, মেবা ভাবত মহান। তাব জন্যে এসব তুচ্ছ। বাই···

কনট্রোল রুমে চোপড়া সাহেবেব টুপি।

পীত বঙেব হেলমেট।

হাত কপালে উঠল। টুপি বলল, গো টু নাম্বার থ্রি ফার্নেস। দুপুব থেকে 'হ্যাং' কবছে। হিট ছ'টোব বেশি দেবে না। ঘন্টায ঘন্টায স্ক্র্যাপ্‌-চার্জিং করবে। দবকাবে স্টিম ইনজেক্ট···

চোপড়ার টুপি থামল। এল গৌতম। বামা বাও। অমিয চ্যাটার্জী। বিমল সচদেব।

কী অসীম প্রতাপশালী ঐ পীত বঙের হেলমেট ! ব্লাস্ট ফার্নেসেব বাবোশো কর্মীকে একসূতোয় বেঁধে, একসুবেব মুর্ছনায় কী অপরূপ সুববাহাব ! চোপড়াব টুপি, টুপি নয়, জুবিন মেটাব বাপ। প্রোডাকশান, টার্গেট, মোল্টেন আযবন, স্ল্যাগ, পিগ-মোল্ড, বাব, বড, বীম, ইনগট, 'আই-আব ট্রাবল', অসংখ্য নোটেশান। স্ববলিপিব পাহাড়। তারই মধ্যে কাংক্ষিত অর্কেস্ট্রা। প্রতিটি আইটেম সংখ্যাতত্ত্ব দিযে বাঁধা। উৎপাদনেব প্রতিটি ধাপ হটলাইন-বাহিত হযে ক্যালকাটা, ডেলহী, ইস্পাত দপ্তরের ঠাণ্ডা ঘবে। একটি টুপি, বর্ণ তাব পীত, আকবব-বাদশাব উষ্ণীষেব চেয়ে কম নয মোটে। যতেক 'বি-টেক' তাহাবে কুর্নিশ কবে। শতেক মুখে জয়গান।

চার্জ হ্যাণ্ড-ওভার দিল বি. এইচ.ইউ. এইট্টি-টু সেকেণ্ড ব্যাচেব হবিশংকর পাণ্ডে। শ্যামলা। দোহাবা। কয়লা ও আয়রন-ওরেব গুঁড়ি-মাখা কালো-লালচে বাটিক-প্রিন্ট তার পীত হেলমেটে।

— শালা, ফার্নেসেব অবস্থা যা তা।

— হোয়াই ?

— সিলিকন এসেছে টু পয়েন্ট নাইন জিরো। মাল আর বইছে না। মোল্টেন আয়রনের বদলে রানারে গাঙ্গুরামের দই ভাসছে। ট্রাফ্, স্কিমার-প্লেট, রানার, সব চৌপাট। ফ্লুইডিটি নেই। নাঃ, এভাবে আর চলে না…

— ইস্, ফার্নেস তো বরবাদ হয়ে যাবে…

— হোক। জাহান্নামে যাক। শালার যা ব্লাস্ট-লিকেজ আর হিট, দু-বছরে ইমপোটেন্ট হয়ে যাব মনে হচ্ছে। বউয়ের বয়েস সবে চৌত্রিশ। তারপর ? ইমিডিয়েট রিলাইনিং হলে কিছু দিনের জন্য রেহাই পেতাম।

চলে গেল হরিশংকর।

এমন যোগ্য অফিসার না হলে দেশ এগোবে কী করে !

বাসল পাইপের সামনে যাওয়া যাচ্ছে না, এত লিকেজ। সঙ্গে, গোটা দশেক নায়গ্রার জলপ্রপাতের গর্জন। হবে না ? যে ঝোড়ো-বাতাসের ভল্যুম বাইশশো কিউবিক মিটার পার মিনিট, সেখানে যদি লিকেজ থাকে তবে কী হতে পারে তা বোঝে শুধু ফার্নেসের কর্মী। মনমোহন সিং বা সন্তোষমোহন-কে একদিন একবেলা ঐ নরকে ঘুরিয়ে দিলেই জীবনভরের জন্য নির্ঘাত কালা। অমন গোল-গোপ্পাই লালটুস্ শরীরটা বেগুনপোড়া হয়ে যাবে। নে ব্যাটা, তখন কানে হিয়ারিং-এইড গুঁজে কেলটুস্ শরীরে মেরিকা-রাশিয়া ঘুরে বেড়া গে।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম 'ট্যুইয়ার'। যেন আঠারো নাগর বুকে আগলে রেখেছে ঐ আগুন সুন্দরীকে। বস্-প্লেটের ফাঁকে নীল শিখা। চটুল ছোবল। আহা, কী দেমাকি তার চেরা-জিভের এগোনো-পিছোনো !

অবশেষে সম্মুখপানে। 'ট্যাপ হোল'। অহো ! কী আপাতশান্ত, অথচ লৌহ প্রসবকালে কী-সাংঘাতিক রোয়াব ! এরে কী কহি সখা ? ভারতমাতার জরায়ু ?

অনিঃশেষ গলিত-লৌহের প্রসব হয় যে সংবেদনশীল অই গুহামুখ থেকে—যা কিনা গোটা একটা দেশের ভূত-ভবিষ্যত, গোটা একটা জাতির উন্নতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সোপান, মনোমোহিনী বাজার-অর্থনীতির আকর্ষক বিজ্ঞাপন, টুপিধারী সাহেবদের 'স্যারভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেষ্ট', কেলেকালো গামছাওলা দাঁত-না-মাজা চোখে-পিচুটি শ্রমিকদের 'জীনা-মরনা', রুটির ঝোলা গুড়-মাখা সংগ্রামের সুকঠিন পথ, নাইট এ্যালাউন্স-হিট এ্যালাউন্স-প্রোডাকশান বোনাসের জনক, সকালে উঠিয়া যার গর্জন না শুনিলে ধুয়ো উদ্গীরণ না দেখিলে তাবৎ শ্রমিককুলের শিরদাঁড়া বাহিয়া নামে হিমস্রোত, যাকে আমি-তুমি-সে-তাহারা, বি-টেক, এম-টেক, ধাতুবিদ-চুকলিখোর-ল্যাংবাজ-জাঁহাবাজেরা, ল্যান্সিং-পাইপ হাতে অগ্রগতির শপথ নিয়ে প্রতি শিফ্টে দু-বার করে সম্ভোগ করি, তারে জরায়ু ছাড়া আর কী বলা যায় !

তবে সে বড় মহিমময়ী। ঢালাইয়ের সময় বিনা তার লাজ পিচ, ফায়ার-ক্লে, ফায়ার-ব্রিক্স এর চূর্ণ কম্পোজিসনের সুকঠিন ঘুংঘটে ঢাকা।

ল্যান্সিং-পাইপ ঠেকিয়ে যখন প্রথম কাস্ট ওপন করছি, এ্যাবাউণ্ড টুয়েলভ থার্টি এ. এম. মনে মনে সেরে নিলাম মাতৃবন্দনা। দেহি মাতঃ। গলিতং লৌহং দেহি। অফুরান। দোষ নিওনা ভারতমাতা। আমি তোর অধম সন্তান। দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার এক রাতজাগা সৈনিক মা। ঘরে বউ-ছেলে-মেয়ে, জটিল সংসার। কেতা বজায় রাখতে ন্যাতা হয়ে গেলাম। দাসেরে রাখ মা স্মরণে। আমি তোমার গুপ্তস্থান ছিন্ন করে তোমারই নব্বই কোটি সন্তানের 'সারভাইক্যাল ভারটিব্রা' থেকে 'কক্শিস' অবধি ইস্পাতমণ্ডিত করার ঠিকা নিয়েছি মাগো। হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন। আমাদের শিরদাঁড়া কভু ঝুঁকিবে না। আর্থরাইটিস স্পণ্ডিলাইটিস

কাছে ঘেঁষিবে না। আমবা বিবেকানন্দেব স্বপ্নেব ভাবত গড়াব কাবিগব। দু'হাজার সালে গোটা বিশ্বকে ডমিনেট কবব।

আবও বলি মাগো, চোপড়াব টুপি বড় ভয়ংকব। হৃদয় মানে না। মন চেনে না। জানে শুধু প্রোডাকশন। শালা আব. কে ধাওয়ানেব বিলেটিভ। হাতে মাথা কাটায় বেজায় আনন্দ। তুমি নিঃশেষে লৌহতবল উগাবি দাও মা। ইঞ্জেকশন দেওয়া জার্সি গরু যেমন-শব্দ তোলে খুশিয়াল··· তেমনি··· মাগো··· ঠিক তেমনই···

হায়!

এত সবের পরেও দু'টো ঢালাইয়েব দু'শো কুড়ি টন। ছিঃ, মুখ দেখাই কাকে!

চাবটে দশ। ওয়ার্কাববা কাস্ট-হাউস ক্লিনিং কবছে। দ্বিতীয় ঢালাইয়েব স্যাম্পেল চলে গেছে ল্যাবরেটারিতে। আধ ঘন্টাব মধ্যে এ্যানালিসিস চলে আসবে।

সিলিকন কিছুটা বিডুিস করতে পেবেছি মনে হয়। নেমে যাওয়া সালফাব একটু তুলেছি। ফার্নেসেব 'হ্যাং' কণ্ডিশন কেটেছে। 'মুভমেন্ট' এসেছে। কিন্তু প্রোডাকশন কোথায়? দু'টো ঢালাই মিলে দু'শো-কুড়ি! আউটপুট বিনে সবকিছু বৃথা। এ যেন ছিয়াশিব বিশ্বকাপেব ব্রাজিল। জিকো, সক্রেটিস, কাবেকা, ফালকাও··· তীক্ষ্ণ স্ট্রাইকাব, জমাট মাঝ মাঠ, স্কিল, কম্বিনেশান শ্যুটিং, পাসিং, ড্রিবলিং–শুধু গোল নেই। তাহলে লক্ষ্য কোনটা? গোল? জালে বল? না পায়ে নাচিয়ে লক্ষ লোকেব হৃদস্পন্দনকে দ্রুততব কবা? লক্ষ লোককে অপূর্ব কৌশলে মুগ্ধতায় ভবিয়ে দেশে ফেবাব টিকিট কাটা? দু'টো কাস্টে দু'শো কুড়ি, যেখানে চাবশো হতে পাবতো। তিনশ' আশি, বা নিদেনপক্ষে তিনশ'।

বড় সাংঘাতিক ঐ চোপড়াব পীত টুপি। বড় প্র্যাকটিক্যাল। জর্জ বেস্ট নয় ক্রুয়েফ নয়, পেলে-মাবাদোনা না হয়েও সে অনেক। এইট-ইয়ার্ড বক্সেব ক্ষুধার্ত নেকড়ে, গার্ড মূলার বা বোসি। ও চায় প্রোডাকশন। গোল। রেকর্ড বইয়েব সংখ্যাতত্ত্ব। ব্যাস্··· পাবলাম না আজও চোপড়ার টুপিকে খুশি করতে। ওগো তানিয়াব মা, কবিও ক্ষমা, চোপড়াব টুপিব গুড্-বুকে আমি আজিও উঠিতে পাবিলাম না।

কাস্ট-হাউস ক্লিনিং চলছে। আমি কেবিনে। প্যানেল-বোর্ডে লাল-নীল বাতি। অসংখ্য। স্কিপ-কার হয়েস্টিং স্মল-বেল ওপ্নিং এণ্ড ক্লোজিং··· লার্জ বেল ওপ্নিং ··· কোক-কোক/ ওব-ওব/কোক্-কোক··· (চার্জিং সিকোয়েন্স) হাফ চার্জ কমপ্লিট.. হিট সাড়ে ছ'শো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ··· হট-ব্লাস্ট টেম্পাবেচাব সেভেন হানড্রেড ডিগ্রী ··· পেবিফেবিয়াল টেম্পাবচাব ···

হায়! সব ছাপিয়ে সেই এক যন্ত্রণা ··· দু'টো ঢালাই মিলে দু'শো কুড়ি টন··· ছিঃ লজ্জা!

অথচ আমি কী করতে পাবি! 'কোক-ওভেন' যে কোক তৈবি কবছে, তাতে আব যাই হোক ফার্নেস চালানো যায় না। এ্যাশ্ কনটেন্ট এত বেশি যা আব বলাব নয়। ফার্নেস শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন এমন হয়? যে ভাবতবর্ষ এত আকরিক-সমৃদ্ধ দেশ তাব ব্লাস্ট-ফার্নেসকে চালাতে কেন অস্ট্রেলিয়া থেকে কোক আমদানি কবতে হয়? কেন? আমাদেব ঝাঝবা নেই? চাষনালা? রামনগব? অস্ট্রেলিয়া থেকে বেকের পব বেক কোক না এনে কোক-ওভেনটাকে তো নতুন কবে তৈবী করা যেতে পাবে।

না, তা হবে না। কাবণ তাহলে মন্ত্রী থেকে এম. ডি. অবধি যে বিস্তীর্ণ কাট-মানিব চ্যানেল সেটা শুকিয়ে যাবে।

চার-নম্বর ফার্নেসের বামা রাও এব ফোন এল চারটে সাতাশে।

– হ্যালো ফ্রেণ্ড, শুনলাম মাত্র দু'শো কুড়ি দিয়েছে?

— হ্যা, আমি নয়, ফার্নেস।

— ঐ একই হল। এখানে যন্ত্র নয়, যা কিছু যন্ত্রের পাবফবমেন্স সব যন্ত্রীব এ্যাকাউন্টে। তুমি শালা অপয়া। ইডলি খাবে তো এসো। ভোরবাতে একটু টিফিন করা যাক।

— থ্যাংক ইউ রাও।

— আবে শোনো ফ্রেণ্ড, আজ সকালে নাকি নতুন লিস্ট বেবিয়েছে প্রমোশনেব। শুনেছ ?

— না। সাবাদিনই ঘুমোই। অপিসেব খবব বাখি না।

— সত্যি তুমি না একটা··· তোমাব দেড বছবেব জুনিয়ব হবিশংকব মেবে দিয়েছে। তুমি ইমিডিয়েট একটা অবজেকশন ফাইল কবো থ্রু অফিসার্স এ্যাশোসিয়েশান। দেখি, চোপড়াব কত ক্ষমতা···

ফোন ধবে বসে বইলাম অনেকক্ষণ। এই সেই হবিশংকব পাণ্ডে, যে নাইটশিফ্‌টে টানা দু'ঘন্টা কেবিনে লম্বা হয়ে ঘুমোয়। এই সেই লোক, যে কিনা শিফ্‌ট ম্যানেজাবকে বিলিতি পাঁইট খাইয়ে ঢালাইয়েব একশ চল্লিশ টনকে একশো নব্বই টন দেখায খাতা কলমে। পঞ্চাশ টন তাহলে যায কোথায ? তাবও উপায আছে। 'পিগ কাস্টিং মেশিনে' কিছু ওয়েস্টেজ কিছু 'ডুপ্লেক্স'-এ, কিছু 'মেলটিং শপ'-এ। কনগ্র্যাচুলেশন হবিশংকর। তুমি এগোও। দশ বছবে তুমি হযত এ. জি. এম হবে। পনেবো বছবে জি. এম। বিটাযাবেব আগে এম. ডি। ততদিনে 'সিন্টার-প্ল্যান্ট,' 'এল-ডি প্রসেস', 'কন্টিনিউয়াস-কাস্টিং', কত কী হবে। দেশ যে এগোচ্ছে তাতে আর সন্দেহ থাকবে না। কনগ্র্যাচুলেশনস্ পাণ্ডে।

ফোন ছেড়ে উঠে এলাম। দেখি, দ্রুত ছুটে আসছে 'হোল-কীপাব' বামলখন।

— কী হল ?

— সাব, হট-মেটাল ফার্স্ট বানাব কা জ্যাম্ বহোত জ্যাযাদা। কিবেন ভি ঘডি-ঘড়ি বিগড় যাতা। কাস্ট-হাউস পুবা সাফা নেহি হোগা।

চমকে উঠলাম। চাবশো দশেব ঢালাই যদি ছটাতেও ক্লিনিং না হয তবে যা-তা ব্যাপাব হযে যাবে।

— তোমবা কী শুরু কবেছ বলতো ? আমি তোমাব নামে বিপোর্ট কবব। এতক্ষণ হযে গেল আব তুমি···

— কিবেন ডাউন বা। হমনে ক্যাযা কবি !

— ডাক ক্রেন অপাবেটাব-কে।

নন্দ দলুই ঠোঁটেব কোণে বিড়ি ঝুলিয়ে এল।

— মোটবে গোলমাল সাহেব। হয়েস্ট হচ্ছে না। ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট। আমি নিজে গিয়ে ওদেব খবব দিযেছি, বলল বাতে ঠিক হবে না। 'পিগ-কাস্টিং মেশিন'-এ কী একটা ব্রেক ডাউনে সবাই ব্যস্ত।

নন্দ দলুই চলে গেছে। চলে গেছে রামলখন। ফোঁসাচ্ছে ফার্নেস। স্কিপারেব ওঠানামা। স্ক্র্যাপ চার্জিং এব গুমগুম শব্দ। কাস্ট-হাউসেব গবম বালিতে বস্তা বিছিযে শুযে পড়েছে ঘর্মক্লান্ত শ্রমিকেবা। ক্রেন ব্রেক-ডাউন। আমাব চীৎকাব কবে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

বাতজাগা চোখে স্ল্যাগ সাইডে, ফিফ্‌থ্-স্পাউটেব পাশে ছোট্ট কাঠেব বেঞ্চিটাতে বসলাম। গোটা ফার্নেসটাকে একশ কুড়ি ফুট দূব থেকে দেখতে পাচ্ছি। ওব তুলনায কী ক্ষুদ্র আমি। আমবা। অত দহন সহ্য কবেও কেমন দিনেব পর দিন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ

আমি, আমরা, সামান্য একটা ঘটনায় কত বিচলিত। সাহেবের কনভেন্টে ভর্তি হতে না পারার যন্ত্রণা, তানিয়ার জন্য ভাল মাস্টারের অভাব, বনানীর বহুদিনকার সখের একটা ওয়াশিং-মেশিন কেনার জন্য অদ্যাবধি আক্ষেপ, আমাকে টপকে জুনিয়ার পাণ্ডের প্রমোশন, অথবা আজকের লো-প্রোডাকশান বা ক্রেন-ব্রেকডাউন-জনিত যন্ত্রণা,—সব মিলেমিশে রাতজাগা আমি কুঁকড়ে যাচ্ছি। হে ঈশ্বর, যন্ত্রকে এত ভালবেসে, নিজেকে সমর্পিত করেও যান্ত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারলাম না।

এখনও চোপড়ার পীতবর্ণ টুপির লাল চোখ তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

পাঁচটা। ভোররাতের ঠাণ্ডা বাতাস। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ আমার কত কাজ বাকী। কত কৈফিয়ত! কত দায়!

ক্লান্তিতে নুয়ে পড়া আমি হঠাৎ একটা যান্ত্রিক শব্দে চমকে উঠলাম। ঘাড় ফেরাতেই দেখি ক্রেনের উদ্ধত 'বুম' তার মাথা নামিয়ে এনেছে। ডি.সি. মোটরের ঘর্ঘরে-স্বরে বলছে, কী হল? ভেঙে পড়ছ কেন? হ্যালো ম্যান?

— কে তুমি?

— আমি জোসেফ।

— তুমি কোত্থেকে বলছ! কোথায় থাক?

— আমাকে চেনো না? এতদিন কাস্ট-হাউস দাপিয়ে বেড়ালাম। আমি জেসপের এট্টি-টনস্ ক্রেন। জন্ম উনিশশো বাষট্টিতে। ইংলণ্ডে। কেন্ট, নটিংহাম ঘুরে তবে ইণ্ডিয়া।

— জোসেফ ... জোসেফ... তুমি আমাকে বাঁচাও ... তুমি চালু হও। আমার কাস্ট-হাউস ক্লিনিং বাকী। প্রোডাকশান দিতে পারিনি। আমি ভীষণ কোণঠাসা। বাঁচাও... বাঁচাও।

জোসেফ তার বিরাট দু'টি লম্বমান আর্ম দুলিয়ে হাসল।

— এত ভয় কেন তোমার? যন্ত্রকে যে মানুষ ভালবেসেছে, তার কাছে পরাজয় নেই। যন্ত্রকে ভালবাসাই তো সবচেয়ে বড় জয়। আর বাকীগুলো সব জয়ের বাই-প্রোডাক্ট। যুদ্ধজয়ের পরে সৈনিকেরা যেমন বাড়ি ঢুকে টেনে আনে যুবতী মেয়েদের, ধানের গোলায় আগুন লাগায়, জলে বিষ মেশায়, তেমনি...

— জোসেফ!

— হ্যাঁ বন্ধু... ভোররাতের হাওয়া বইছে। চলো, যাবে?

— কোথায়?

— ঐ যে স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক পেরিয়ে, নাকড়াসাঁতা পেরিয়ে, ঐ যে কুলকুল স্বরে বয়ে চলা দামোদর... যাবে তার বালুতটে? ভোরের সূর্যোদয় দেখতে ইচ্ছে করে না?

— ভীষণ ইচ্ছে করছে জোসেফ ... ভীষণ.. কিন্তু ঐ একটা টুপির রক্তচক্ষু...

জোসেফের বিরাট লোহার শরীরটা ঝমঝম শব্দে কেঁপে উঠল। ঝুলন্ত সিলিং-এর নিচে ওর রোপ-ড্রামটা ধাতব শব্দে হাসছে।

— হাসছ কেন জোসেফ?

— তুমি টুপির কথা বললে কিনা ... তাই। আরে ম্যান, তুমি চোপড়ার টুপিকে ভয় পাও, চোপড়া পায় আহুজার টুপিকে। আবার আহুজা তার চেয়েও বেশি ভয় পায় গ্যাডগিল-এর টুপিকে। এটাই তো ট্রাডিশান। একটা কথা মনে রেখো ফ্রেণ্ড, ফিউডালিজম ব্যাপারটা কোন কালেই ধুয়েমুছে যায় না। কমিউনিজম বলো, ক্যাপিটালিজম বল, পৃথিবীর যত ইজম আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্যি এই টুপিইজম, যা কিনা ফিউডালিজমেরই পরিবর্তিত ও

পবিশ্রুত রূপ। চলে এসো, ভয় ভাঙ্গাতে না পারলে, সে সব ইজম এরই দাস। তার স্লেভারি জীবনে কাটে না। চলো…ভোব হচ্ছে…

— বিশ্বাস কবো জোসেফ, আমি অতো সাহসী নই। তুমি যা পার, আমি তা পারি না। আমি সাহেবেব ভবিষ্যত নিয়ে ভাবি। তানিযার রেজাল্ট বেরোনোব দিন টেনশনে মরে যাই। বনানীর মেনস্ট্রুয়েশান না হলে ভয়ে সিঁটিযে থাকি। ভাবি, সংসাবে না জানি ফের নতুন উৎপাত… প্লিজ জোসেফ, তুমি সচল হও…, আমি মুক্তি চাই এই ভয থেকে, তুমি সচল হও…

— আমি সচল নই কে বলেছে ? ঐ নন্দ দলুই, দ্যাট বাস্টার্ড, দেশি মদ গিলে ঘুমোবাব জন্য আমাব মোটরের দু'টো তাব খুলে রেখেছে। তাছাড়া আমি তো অল বাইট …

চিচিং ফাঁকেব মন্ত্র পেয়ে গেছি।

দ্রুত ছুটে এলাম ঘুমন্ত নন্দ দলুইয়েব কাছে। হাঁচকা টান মেরে উঠিয়ে বললাম, তোমার চাকরি খেয়ে নেব… চালাকি করছ ? যাও, যে তাব দু'টো খুলেছ তা লাগিয়ে এই মুহূর্তে ক্রেন চালু কবো।

নন্দদুলাল আমাব টুপিব দিকে চেযে হাউ হাউ কবে কেঁদে ফেলল।

— বড় অন্যায় কবে ফেলেছি স্যাব… জেবনে আর হবে না… এবারের মত ছেড়ে দ্যান স্যাব… সব কাজ কবে দিচ্ছি।

ঘর্ঘব শব্দে চালু হল ক্রেন। কাস্ট-হাউসে ক্লিনিং হচ্ছে।

ফেবাব পথে ফের দেখা চন্দ্র-সূর্যব সঙ্গে। তখন ছ'টা পঞ্চাশ।

চন্দ্রব হাতে খুবপি।

সূর্যব বগলে এক আঁটি কলমীশাক।

— এই যে আয়বণ মেকাব, গুড মর্নিং… আমবা আপনাব জন্য দাঁড়িয়ে।

— হাতে খুবপি দেখছি যে সাতসকালে মিঃ চন্দ্র ?

— হ্যাঁ, কেঁচো খুঁড়তে বেড়িযেছি। একটু পবেই বউ রুটি আলুভাজা করে দেবে, খেযে মাছ ধবতে বেবোব। ধবিব মৎস, মহাসুখে আছি বৎস।

— মাছ ? কেঁচো দিয়ে মাছ ?

— হ্যাঁ, মাটিব নিচেব কেঁচো, জলেব নিচেব মাছকে টেনে আনে।

— তা সাবাদিনে কত মাছ হয় ?

— খুব বেশি নয। তবে কিনা সময়টা বেশ কাটে। দারুণ শান্তি। জলের বুকে মেঘের ছাযা ভাসে। তার বুকে আমাব ভাবনা। নাত-বৌ এব ভবা মাস। মেয়েব জন্য একটা পাত্তরেব সন্ধান পেযেছি, তবে কিনা বড্ড ডিমাণ্ড। গিন্নিব চোখটা দেখাব ডাক্তাবেব কাছে। আসল কথাটা কী জানেন মিঃ আয়রন মেকাব, এসব ভাবনায যত দুঃখ তত সুখ। আর এই সুখ বা দুঃখ জলের বুকে রোদ্দুর আর মেঘেব মতে খেলে। মাছগুলো হ'ল অভিলাষ। কেউ ধরা পড়ে কেউ পড়ে না।

ভোরের বাতাসে বড় করে শ্বাস নিল চন্দ্র মজুমদার।

সূর্যকান্ত গুহর দিকে ফিরে দেখি টাটকা কলমীশাকের গায়ে তখনও ভোরের শিশিব। মুখে রাজ্য-জয়ের হাসি।

আশ্চর্য মানুষ ! এত অল্পে এবা খুশি হয কিভাবে ? চন্দ্র মজুমদারেব কথাবর্তা মোটেও

ভাল লাগেনি। তাই ইচ্ছে করে সূর্যকান্ত-কে খোঁচা মেরে বললাম, সাত-সকালে এই ঘাসপাতা ? তাও বুকে জড়িয়ে রেখেছেন। সত্যি, আজব মানুষ !

সূর্যকান্ত রাগল না সামান্য। ভোরের শিশির-মাখা কলমীর বড় করে ঘ্রাণ নিয়ে বলল, কলমীশাক আর কুমড়ো-ফালি দিয়ে শুঁটকি মাছের ঝাল যা হয় না ! আহা, অমৃত ! চারদিন জ্বরের পর গিন্নি আজ এই দিয়ে ভাত খাবে। তিরিশ পয়সা দিয়ে তাই এক-আঁটি কিনে নিলাম। কলমী-শুঁটকির গন্ধে একথালা ভাত দেখতে-দেখতে উড়ে যায়।

– বোগাস।

– এ্যাঁ··· কিছু বললেন ?

– না, বলছি, আপনাদের গন্ধের বলিহারী !

– তা যা বলেছেন মিঃ আয়রন মেকার। আরে মশাই গন্ধই তো সব। গন্ধই জীবন। এই যেমন কলমীশাক শুঁটকির গন্ধ, ফ্যান-ভাতের গন্ধ, আলুচোখা-বেগুনপোড়া, আহা···হা···। আচ্ছা বলুন তো তোষকে-হিসির গন্ধ, চুলের-কাঁটায় 'লক্ষ্মীবিলাস'-এর গন্ধ, লোড-শেডিং-এ ঘরের এক কোণে বসে থাকা বুড়ো-বুড়ির শরীরের গন্ধ—এসবের কোন বিকল্প আছে ? প্রতিটি জীবনের একটা করে গন্ধ থাকে। সুখ-জীবনের গন্ধ··· দুঃখ জীবনের গন্ধ ··· আচ্ছা মিঃ আয়রন মেকার এসব ছাড়ুন, আপনি বরং বলুন লোহার গন্ধ কেমন ?

গম্ভীর স্বরে বললাম, লোহার গন্ধ নেই। কারণ সে লোহা। 'এফ, ই'। 'ফেরাস।' আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার একটি মুহূর্তও ভাল লাগছে না এখানে। আযাম্ অ্যফুলি টায়ার্ড।

চন্দ্র-সূর্য অবাক চোখে দেখল আমায়।

ভোরের আলোয় ওরা কত রাঙা। অভাবের প্রতিটি স্তর কী নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে চলেছে। মুখে হাসি। আর আমি, এত লোকের হুকুমদাতা, বিশাল একটা যন্ত্রদানবের সঙ্গে নিত্যিদিন যুদ্ধ করা, পেমেন্টের মোটা খাম বুকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া স্বখ্যাত ধাতুবিদ, একটা অদৃশ্য টুপির একটুকরো অন্ধকারে এই প্রভাতেও কেমন বিষণ্ন। নিস্তেজ।

চন্দ্র-সূর্য এগিয়ে এল। আমায় খুঁটিয়ে দেখল অনেকক্ষণ। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল চন্দ্র, সত্যি, আমাদের জীবনে কিছুই হল না। আপনি কী বিরাট দায়িত্ব মাথায় নিয়ে কাজ করে চলেছেন। দেশ এগুনোর মহান ব্রত বহন করা কি সোজা কথা ? আচ্ছা, আড়াই হাজার সাল নাগাদ আপনার নিশ্চয়ই কাটোয়ার ডাঁটার বদলে স্টীলের ডাঁটা, ফুলকপির বদলে 'পিগ-মোল্ড'-এর ফুলকপি, মাচার উচ্ছের বদলে স্ল্যাগের উচ্ছে—এসব বানিয়ে ফেলবেন। মাটির তখন আর প্রয়োজন-ই থাকবে না। ওঃ ভাবতেই কী আনন্দ ! আমাদের ছেলেমেয়েরা সত্যি ভাগ্যবান ! কিহে সূর্য, বড় আপশোষ হচ্ছে তাই না ? আমাদের দাঁতগুলো বড় তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। নইলে বেশ মজা হ'ত কিন্তু। একদিন পেটভরে খেলে আর অনেকদিন খিদে পেত না। আচ্ছা মিঃ আয়রন মেকার, আয়রন ওরের ফুড-ভ্যালু কত ?

– আপনি আমাকে ইনসাল্ট করছেন। জানেন আমি কে ?

– আহা, এত রাগ করছেন কেন ? মুসুর ডালের সঙ্গে গন্ধরাজ লেবুর বদলে স্টিলের লেবু চটকাতে চটকাতে হাতের তেলো ছড়ে যাচ্ছে, আহা ··· তবু অক্ষয় ঐ ধাতব লেবু, অসীম পরমায়ু, একটি মাত্র লেবুতে জীবন কেটে যাবে··· যত ভাবছি এসব, ততই পুলকে···

– স্টপ ইট। আপনাদের মত অশিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে আর বাক্যালাপ নয়। স্টার্ট ওয়াগুার··· কুইক্···

ওয়াগুার ছুটছে। বুকের মধ্যে জ্বালা করছে। ওরা আমার টুপিকে সামান্য সম্মান দিল

না। এ দুঃখ ভোলা যায় ? চুপ করে থাকতে না পেবে ওয়াণ্ডাবকে বললাম, আচ্ছা ডিয়ার, তুমিই বলো, এরা কেমন ধারা মানুষ ?

— ধুস··· এরা মানুষ-ই নয়। চাকরিটা এদেব কাছে বাস্তবিকই ছিল চাকবিগিবি। আব চাকরদের এ্যামবিশন যে সীমিত, তা কে না জানে। চাকবদের ডেডিকেশন থাকে ? কিন্তু তুমি তা নও। তুমি চাকবি কবো মাস্টাব, কিন্তু চাকব নয়। কাজ তোমাব কাছে পূজো। ওয়ার্ক ইজ ওবশিপ। অথবা যুদ্ধ। হয় জিত নয় হাব। অর্থাৎ চাকবি তোমাব কাছে সাফল্য—অসাফল্যেব ইনডেক্স অব এক্সট্রিমিটি। লৌহকীর্তন ওদেব মত লোকেব বিষযবস্তু নয়।

— রাইট··· বাইট ··· ওযাণ্ডাব।

রাঙ্গামাটিযা পার হচ্ছি। দূবেব কানগোই পাহাড় কুযাশায ঢাকা। উঁচু-নিচুমাঠ-ঘাট। সবুজে ছযলাপ। কালি-কয়লাব গুঁড়ি-মাখা মুখে শীতল বাতাসেব ঝাপটা। লৌহকামেব নাগপাশ থেকে যত চলেছি সবুজেব বাজ্যে, ততই মনে পড়ছে সাহেবেব মুখ। তানিয়াব ছবি। এ শিফটেব ভোব বাতে যখন বেরোই, ওবা দু'টিতে তখন মাযেব দু'টি-বুকেব দখল নিয়ে কী অপূর্ব ভঙ্গিতে শুযে থাকে।

সেই তানিয়া বড় হচ্ছে। এক ধাতুবিদ ও এক সেবিকাব যুগল ভালবাসায বেড়ে উঠছে। একজন বযে আনছে আযবন ওব, লাইমস্টোন-ডলোমাইটেব গুঁড়ো, অন্যজন স্যাভলন, ইথাবেব গল্প। একজন গল্প শোনায আগুনেব দশকাহন শিখা, যন্ত্রকীর্তন, অন্যজন স্যাভলন, ইথাবেব গল্প। একজন গল্প শোনায ও টি'র ডিউটি শেষে ছুবিকাঁচির ঋণৎকাব। সদ্যজন্মানো শিশুকে একহাতে কোলে নিয়ে অন্যহাতে মাযেব ডেথ্-সার্টিফিকেট লেখা ডাক্তারের চবিত্র বর্ণনা কবে একজন, অন্যজন ; চোপড়াব টুপিব আগ্রাসী দশবাহু কিভাবে গিলে খায় কাবখানা-জীবন — এবই মাঝে বেড়ে উঠছে তানিযা। সাহেব।

গতরাতে তানিয়া ওয়াটাব-কালাব চেয়েছিল। কেন ? নিশ্চযই ইস্কুলে লাগবে। কী আঁকবে আমাব তানিযা ? আমাব ডি.এন.এ-বাহিত আগুনেব চেবাজিভ ? লৌহ-সহবাসের দিনক্ষণ ? নাকি মাযের ডি.এন.এ-বাহিত আর্টিফিশিয়াল বেসপিবেটাব ? কার্ডিযাক মনিটাব ? নাকি অজস্র সিজাব ও অত্যুজ্বল আলোব নিচে শযান আমাদেব যৌথ-জীবনেব ছিন্ন-ভিন্ন শবীবে নিপুন হাতে জোড়াতাপ্পিব খেলা ?

বাজাবেব সামনে এসে ওযাণ্ডাবেব প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়ালাম। দৌড়ে ঢুকলাম দোকানে।

— ভাল একটা ওযাটাব-কালাব দিন তো, 'ক্যামেল'-এব।

নগদ সাতাশ টাকায কেনা আঠাবোটি জল-বঙেব চৌখুপ। কত বং জানি। কত জানি না। 'ভিবজিওব' এব বাইবেও কত বং ! অনেক মোটা-মোটা বইপড়া চোখে থাকে দেখা যায না। বোঝা যায না। তানিযাব সবে নয়। তাব বঙেব গোনাগুণতি নেই।

— দিলে তো গচ্চা সাতাশটা টাকা ? ওযাণ্ডাব বলল।

— গচ্চা ?

— হ্যাঁ, তা নযত কী ! দু'দিনে নষ্ট কববে।

খটকা লগল। ওযাণ্ডাব বাজে কথা বলে না। বড় প্রাক্টিক্যাল। অনেকটা চোপড়া সাহেবেব মত। তবে কিনা আমাব তাঁবে-থাকা-চোপড়া।

— আচ্ছা ওয়াণ্ডাব, এত ভাল বং দিয়ে মেয়েটা কী আঁকতে চায় ?

— কী আবাব ! সব বং মিলেমিশে যা হয !

— সেটা কী, বী ফ্র্যাংক··· বলো ···

— ব্ল্যাক। ওনলি ব্ল্যাক···

— ওফ্‌···নো··· নো এমন বোল না ওয়াণ্ডাব··· আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমাকে দিয়ে কেন ছেলেমেয়েকে মাপতে চাইছ ?

নাঃ, দিনকে দিন ওয়াণ্ডারও দেখছি বাচাল হয়ে উঠছে, আর কথা নয়। এখনও সাতটা বাজেনি। তানিয়ার স্কুলবাস এখনও আসেনি। তাব মানে এখনও সময় আছে ···এখনও···

মেরুন স্কার্ট, ঘি-রং ব্লাউজে আমার তানিয়া, সদ্য-ফোটা ফুলের মত স্নিগ্ধ মেয়ে, স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষামান। ওয়াণ্ডাব-কে ঘরে ঢুকিয়ে ওব হাতে তড়িঘড়িতে কেনা ওয়াটার কালাব তুলে দিয়ে বললাম, এই নাও, তোমার ওয়াটাব-কালাব।

— কী মজা ! কী মজা ! বাপি তুমি খুব ভাল... খুব ভাল ..... খু-উ-ব.....

আমার কয়লাগুঁড়ি মাখা মুখটা কাছে টেনে আদর কবতে করতে হঠাৎ বিস্মিত গলায় বলে উঠল, বাপি, তোমার টুপিটা কই ?

— এ্যাঁ ? খালি মাথায় হাত বোলালাম। নিজেকে অচেনা ঠেকল। যেন আমার মাথা নয়। অন্য কারও।

মেয়ে তখন হি হি করে হাসছে।

চন্দ্র-সূর্যর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখনও টুপিটা ছিল। অথচ এখন নেই। তার মানে বাজারে ওটা হারিয়েছে। হয়ত সেই দোকানে। বা মাঝেব রাস্তাটুকুতে বেখেয়ালে পড়ে গেছে।

এত বছর ব্যবহার করছি, জলে-ঝড়ে-রোদে — আগুনে যে পীত হেলমেটখানি গভীব কালচেটে, তা আজ সকালে আমাকে ছেড়ে চলে গেল ?

টুপিহীনতায় ভারমুক্ত যতটা ততটাই দুঃখিত ? তবু মেয়েব অনাবিল খুশিকে ভাঙ্গাতে চাই না।

— ওয়াটার কালারে তুমি কি আঁকবে সোনা ?

প্রশ্নটা করেই ভয়ে চাইলাম ওয়াণ্ডাব ও মেয়েব দিকে যুগপৎ। মনে পড়ল ওয়াণ্ডাবেব সেই কথাগুলো।

— বলো সোনা ··· প্লিজ··· এখনই তোমাব স্কুলবাস আসবে ···বলো···

— একটা আবছা পাহাড় বাপি।

— আর ?

— তাব পাশে নদী। নীল জল।

— আঃ গো অন তানিয়া··· গো অন ···

— শেষ দেখা যায় না ধান ক্ষেত, ধানেব শীষ ···

— মাই গড ! তারপর ?

— দুটো সবুজ টিয়া উড়ে যাচ্ছে। ঠোঁটে ধানেব শীষ। তুমি খুব ভাল বাপি। খু-উ-ব, মাই স্যুইট ড্যাডি ···

স্কুলবাস এল। একবুক আনন্দ নিয়ে মেয়ে স্কুলে গেল। আব আমি জয়ীর ভঙ্গিতে চাইলাম দীর্ঘদিনেব সঙ্গী ওয়াণ্ডারের দিকে। ও গুম মেরে আছে। মুখচোখ ফ্যাকাসে, মনে হল রক্তহীন।

বনানীর আজ অফ। চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে শুধাল, আজ কি রাঁধব, বলো ?

ভারমুক্ত আমার মনে পড়ল যন্ত্র-বন্ধু জোসেফেব কথা এক ভয় থেকে অন্য ভয়ে চারিয়ে

যাওয়া টুপির ট্রাডিশনাল ইতিবৃত্ত। ফিউডালিজম-এর নতুন সংজ্ঞা। মনে পড়ল দুই বৃদ্ধের মুখ। চন্দ্র-সূর্য। আলো-আঁধারেব অতিথি। তাদের প্রশ্ন। লোহার গন্ধ, হাই-কার্বন-স্টিলেব কাটোয়া ডাঁটা, পিগ মোল্ডের ফুলকপি—বিত্তান্ত।

আমি হাসলাম প্রাণ খুলে। আজ কতদিন পব! কতকাল! স্বপ্নময় স্বরে বললাম, পারবে বউ? দারুন একটা আইটেম।

— আহা বলো না শুনি···

— তবে আজ জুত্ করে কমলীশাক-কুমড়ো দিয়ে শুঁটকিমাছ রাঁধো দেখি।

— ইস্.. কতদিন খাইনি গো ··· ছোটবেলায মা বাঁধতেন এই পদটা ··· আজ তুমি সত্যিকারেব সংসাবি মানুষেব কত কথা বলছ ···

— তাই নাকি? আব এতদিন এতগুলো বছব?

— হুঁ; জান না বুঝি··· ঢং। বিয়েব পব থেকে তো শুধু একটাই কথা শুনে আসছি। লোহা··· লোহা··· আব লোহা। মাঝে-মাঝে মনে হ'ত আয়রন মেকারেব সঙ্গে একটা স্টেনলেস স্টীলেব মেয়ের বিয়ে হলেই ভাল হ'ত। ভাঙ্গত না, মচকাত না, সাধ-আহ্লাদ সব ঐ নিরেট চকচকে শরীবের নিচে চাপা পড়ে থাকত। ইস্··· সাবাটা ঘব জুড়ে শুধু লোহাব গন্ধ। মাছে লোহা, মাংসে লোহা, সয়াবীনে লোহা। সংসাবটা একেবাবে লোহা-লোহা গন্ধে ছেয়ে গিয়েছিল।

—ধুত্, লোহাব আবাব গন্ধ হয নাকি?

— কেন হবে না? ববফে যেমন, পাথবে যেমন, লোহাবও তেমনি, দারুন গন্ধহীনতার গন্ধ।

বনানীব কথা শেষ হবা সঙ্গে সঙ্গে আমাব ওযাণ্ডাব সশব্দে ছিটকে পড়ল মাটিতে। তবে কি স্ট্যাণ্ডটার স্প্রিং লুজ হয়ে গেছে!

ছুটে ওযাণ্ডাবেব কাছে হাঁটু মুড়ে বসলাম। গাযে-পিঠে হাত বুলিযে বললাম, কী হল? হোয়াট হ্যাপেনড্ মাই ওযাণ্ডার? নাও, ওঠো। ছিঃ, তোমার মত একজন ডাযনামিক, প্র্যাকটিক্যাল, আমাব এতদিনকাব সঙ্গী··· বি স্টেডি ওযাণ্ডাব··· ওঠো প্লিজ···

ওয়াণ্ডার তবু কোন শব্দ কবল না। একটা কথারও জবাব দিল না।

— আঃ, অমন কবছ কেন? ফিলিং আনইজি? ডাক্তাব কল দেব? ওয়াণ্ডার ···ওয়াণ্ডার···

স্ট্যাণ্ডের দু'টি উর্ধ্বমুখী বড স্থিব। নিশ্চল। যেন কোনও দৌড়বাজ ঘোড়া অন্তিমকালীন ভঙ্গিতে সামনের দু'টি পা শূন্যে তুলে বেখেছে। শানে আছড়ে পড়ায হেডলাইটে ক্র্যাক্। কাঁচের বুকে লম্বা ফাটলগুলি সোজা। মনে হ'ল ওয়াণ্ডাবের চোখ থেকে গড়ানো জল। বনানী পাশ থেকে বলল, ওয়াণ্ডাব আব কখনও কথা বলবে না।

চমকে শুধোলাম, হোযাই? কী হয়েছে ওব? পিঠে হাত রেখে বনানীর জবাব, বুঝতে পাবছ না? ওয়াণ্ডার ইজ নো মোব। এক্ষুণি ওব মৃত্যু হযেছে।

— না··· না··· এ হতে পাবে না ··· আমাব ওয়াণ্ডার. মাই ডিযাব ফ্রেণ্ড ওয়াণ্ডার··· তুমি জান না, ও আমার কাছে কতোটা···

— জানি গো জানি। সব জানি। কিন্তু, এও তো মিথ্যে নয়, আজ আব তোমার মাথায় টুপি নেই, আয়রন মেকারের গন্ধ নেই, মুখে যন্ত্রের ভাষা নেই, এবপরও ওয়াণ্ডারের বেঁচে থাকাটা আশ্চর্যের নয় কী!

মুর্শিদ এ. এম

জাড়কাঁটা

খবরটা কী করে যেন পৌঁছে গেছে হামিদার কানে – শোহারাব আসছে। তারপরই শুরু হয়ে গেছে খলবলানি।

একমনে গান গাইতে গাইতে নাড়া কাটছিল মাঠে। ও আর ওর চাচার মেয়ে সাবেরা, সঙ্গে পাড়ার নায়িম গাজির মেয়ে খতেমন। ফসল তুলে নিয়ে গেছে চাষী, পড়ে আছে যৌবনের থুতনিতে নতুন কেশচিহ্নের মতো ধানের গোড়ার বিঘতখানেক টুকরো-নাড়া। সুর করে গাইছিল ওরা রূপবানের পালা থেকে –

বার দিনের শিশুর সাথে গো

ও দাইমা —ক্যামনে হবে বিয়া গো,

ও মোর দাইমা –

দাইমা গো —।

তালে-তালে কাস্তে। পোঁচে-পোঁচে মাঠ হয়ে উঠছিল আরো শাদা মাটিসার। ভরে উঠছিল ঝাঁকা।

আরও কিছুদিন যেতে দিয়ে মাঠে নামবে নতুন ফসল—মাসকলাই, বিউলি। ছেয়ে যাবে সবুজে, মাঠের পর মাঠ, বাদার পর বাদা। তখন শুরু হবে ওদের কষ্টের। আকাশে রোদ্দুরের হলকা উঠবে ধুলোর গন্ধ মেখে। শক্ত হয়ে যাবে বাদার ঢেলা মাটি। থির থির কাঁপবে বাদার দিকে পেছন ফেরা গাঁ, নারকেল তালের সারি।

এখনও কোথাও জমিতে জল আছে একটু-আধটু। নাড়াগুলো কোনওটা ভিজে। ছোট ছোট কুনি-ডোবার চারপাশে নাবাল জমিতে রয়ে গেছে জলের পাতলা আস্তর। দিনে দিনে তা হাত পা গুটিয়ে ডোবার ভেতর সরে যাবে। এখানেও কষ্টের শুরু।

তা জমির মাটি শক্ত হয়ে গেল, জল কমে এলে, কিংবা সবুজের আয়োজনে হামিদাদের কষ্টের শুরু হবে কেন? সাফসুতরো জবাব হলো, বর্ষা বা শীতের কিছু দিনই পাওয়া যায় জলা থেকে সামান্য খুদকুঁড়ো। টানাপোড়েন বেঁচে থাকার যা একান্ত সম্বল। এই যেমন নাড়া। শুকিয়ে গেলে জ্বালানি হয়। উঁচু জমির আলে বা চাষ না হওয়া পতিত জমিতে লম্বা সরু নলের মতো ঘাস জন্মায় —চুঁচকো, বেনা ঘাস। কেটে এনে কুচিয়ে দিলে বর্ষার চরা করতে না পারা গরুছাগলের মুখে দেয়ার মতো খোরাক। তারপর কুনির মোন থেকে ঘুনি পেতে ধরা কুচো চিংড়ি, পুঁটি খলসে, মৌটি মাছ। আঁটলে শোল, বোল, উলকো—। সবই ঐ বর্ষার দিকে কিংবা শেষাশেষি সময়ে। আরও আছে। পনের-বিশ ফুট লম্বা, ফুটদেড়েক চওড়া জাল, ধানখেতের মাঝে পেতে রাখা। জলের একধারে টিপলির টানে লম্বা-লম্বি ঝুলে রইল মাটিমুখো – মাটি ছুঁলো না। টিপলি রইল ভেসে। কইমাছ ভাসতে ভাসতে কানকো লাগিয়ে দেয়। সকালে গুটিয়ে তুলে আনলে গোটা পাঁচ-ছয় নাদুসনুদুস কই উঠে আসে। বাজারে নিয়ে যেতে পারলে দর। কখনও পাড়াতেই বেচে দেয়া। কারও আত্মীয়-কুটুম এসেছে, জোগাড়-যন্তর নেই—তখন। এসব মাছ শিকারে হ্যাপা আছে।

কনকনে আঙুলকাটা জলে ভোর রাতে নেমে যেতে হয়। অন্ধকারে জলের রং কালো। হাঁটুসমান ফসল, ঘাসঝোপ, সাপ। এসব বাঁচিয়ে তারপর মাছের তদ্বির। সারা দিন চোখ পেতে বসে থাকতে হয়। নইলে চোরের ওপর বাটপাড়ি। জাল আঁটল তো একজনের নয়। গাজিপাড়ার হরেক মানুষের ঐ একই ফন্দি-ফিকির। কষ্ট এতেও কম না।

কিন্তু চোত মাসের কাঠফাটা গরমে জোগাড়পাতি না করতে পারাটাই আরও কষ্টের।

এ হলো আমড়াবেড়ের কলজে ছেঁড়া কান্নার কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হদ্দ গাঁ। বেশি ভাগ মানুষই নিম্নবিত্ত। কিংবা বিত্ত থাকলে তবেই না তার উচ্চ-নীচ। বিত্তই নেই, অতএব গরিব গুরবো। আর জমির অধিকারী — ধনী। ফারাক বলতে এইটুকুই। হিন্দু-মুসলমান আধাআধি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই মোটেও। হরিসংকীর্তনের দল মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খোল-করতাল বন্ধ রেখে শ্রদ্ধা জানায়, নমস্কার করে কেউ কেউ। মহরমের মিছিল পেরোয় মুসলমান মহল্লা ছেড়ে হিন্দু মহল্লায়। চাঁদা তোলে, ছুরি-লাঠি-তলোয়ার খেলা দেখায়। বিয়েতে দু রকমের আয়োজন থাকে ধনীর ঘরে। এরা রাজনীতিতে যত না দড়, তার চাইতে বেশি সজাগ ধর্মকে নিয়ে যেন কেউ পলিটিক্স না করে। জাতপাতের দাঙ্গার উত্তেজনা এদের মনমরা করলেও তাপ ছড়ায় না।

ফারাক তাই আর্থিক ওঠানামায়, অন্য কিছুতে নয়। মোহরদ্দি শেখ, পাঁচু শেখ, জোনার ঘরামি, শরিফুদ্দিন সর্দার হল জমিঅলা ধনী। নোনটু কয়াল, নিরাপদ গায়েন, রাঘব সর্দারও তাই। এঁদের জমিতে সম্বচ্ছর খাটে ফরিদার বাপ, সাবেরার ভাই, অক্ষয়, জীবন নস্করের ছেলেপিলেরা। বাড়ির কাজেও পড়ে থাকে কেউ কেউ। একেক পরিবার আট-ন'জন কাজের লোক পোষে, পালে। তারা বাজারে ডাবের কাঁদি কলার কাঁদি নিয়ে বেচে আসে, তরিতরকারি বেচে আসে হাটে। গরুর জাবনা বানায়, চরাতে যায়, লাঙলে হাতও লাগায়। বীজতলা তৈরি, ধান রোয়া থেকে কেরোসিন মেসিনে ধান ভানিয়ে চাল করা পর্যন্ত থাকে। সমস্ত মাঠের ধান উঠে গেলে, পরিপাটি হয়ে গেলে—ভোজ খাওয়ায় মনিব। গরম ডুমো ডুমো ভাতে মাখা সবুজ সেদ্ধ কলাই। সঙ্গে ঘানিভাঙান চাষের সর্ষের তেল, পোড়ান লঙ্কা, পেঁয়াজ।

যখন কাজ মন্দা তখনও এদের পয়সা গুণে যেতে হয় মালিককে। পেটের তাগিদে ঘাটতি জমে ওঠে মালিকের খাতায়। মরসুমে গতর লাগিয়ে শোধ হয়। সবাই সমান না। কেউ হিসেবমত খাটিয়ে নেয়, কেউ হিসেবের বাইরে। কারণ এরা কেউই অক্ষর চেনে না। হলেও হিসেব তো রাখতে জানে। এদের কোনও ইউনিয়ন নেই। যদি কোনও মনিবের চাতুরির প্রমাণ বেরিয়ে পড়ে তবে সমস্ত মজুর মিলে তাকে একঘরে করে। এছাড়াও মজুরদের রোয়ার বেশ সইতে হয় মনিবকে। কাজের ফাঁকে জলপানির একটু এদিক ওদিক হয়েছে কী —কথা ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় রটে যায় বদনাম। এমন কি চুরি করে —ডোবাতে, জলাতে মাছধরা নিয়ে, ঘাসকাটা নিয়ে, আপত্তি তুললে, একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায় রসিদ গাজি, আছিরদ্দি গাজিরা। সাদা চোখে দেখতে গেলে এসব ঘটনা মালিকদের ওপর অন্যায় জুলুম বলে মনে হয়। কিন্তু মজুরদের চোখে তা অন্যায্য হয়ে ওঠে না। যাদের আছে, তাদের কাছ থেকে সামান্য চেয়ে-চিন্তে, কিংবা এক-আধটু হাত সট্‌কা করলে এতই কি কমে যায়?

না বিবেক-বিবেচনা, চরিত্রের সততা এসব বড় বড় কথায় ওদের বিশ্বাস নেই। মাথায় রাখা যায় না সব সময়। আবার এদের সাহায্য করেও দেখা গেছে —কাজে আসেনি। চোদ্দ পুরুষের স্বভাব, বলে না—'শুকো মাছের না যায় রোয/কমিনের না যায় খোয।' সহজে মোছার নয়। ফলে চুরি-চামারি হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্মানের, যোগ্যতার এবং মানানসই হয়ে ওঠার চরম মাপকাঠি।

তা জলজ্যান্ত দিনদুপুরে চুরিটা হয় কি করে? ধরা পড়ে না? পড়লেই বা। কেঁদেকেটে মুখ খারাপ করে পাড়ার লোক জড় করে বসে। ঐ মুখের সঙ্গে 'ভালো-মানুষের ঝি-রা পারবে কেন! শেষে যার জিনিস, তার মনে হয়— চোর ধরে কী এক অপরাধ করে ফেলেছে।

মোহরদ্দি শেখ হলো ঐ সাহায্য বাড়িয়ে রাখা লোকগুলোর মধ্যে একজন। জমিজমা

অন্য ধনীদের তুলনায় কম হলেও মনটা ঐ দিকজোড়া ধূ ধূ মাটির মতো সহনশীল। বয়েস হয়েছে, সবকিছুই কাজের লোককে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তাতে করে হিসেবের গড়বড় মেনে নেয়া, ওজন কম সহ্য করা, জোরজবরদস্তি আনাজ-তরকারি বাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার মতো ছ্যাঁচড়ামি–সবই সহ্য। দুই ছেলে। বড়জন বউ নিয়ে খিদিরপুরে থাকে। জমিজমার কোনও খোঁজখবরই রাখে না। অন্যজন এম.এ. পড়তে মেসে আছে। সেও সেই কলেজস্ট্রীটের কাছে। যদি মতি হয় গ্রামে থাকার, সামান্য নজর দিলেই হয়ত বেঁচে থাকবে চাষবাস, জমিজিরেত।

এক মেয়ে মোহরদ্দির –খুরশিদা। ডাকনাম খুশি। চাঁপাফুলের রং। নাক নকশায় এ পাড়ার কেউ ধারে কাছে আসে না। পড়াশোনায় ভালো। দেরি করতে তবু মন চায় না মোহবদ্দির। চারদিক থেকে কথা উঠছে। সে কথার মধ্যে কতটা অখলতা, আর কতটুকু আকচা-আকচি তা ভালোমতই টের পায় মোহরদ্দি শেখ। আসছে বছরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে –তেমন কথাবার্তা চলছে। কিন্তু গোল বেধেছে অন্যখানে।

কিছুদিন হলো বাড়িতে আসা যাওয়া করছে দূর সম্পর্কের এক শালির ছেলে শোহরাব। কথাটা উঠেছে সেখান থেকেই। শেষ অবদি তার হাতেই না তুলে দিতে হয় মেয়েটাকে। হলে, আফশোসের সীমা থাকবে না। ছেলেটা মুখে হামবড়াই করে। এখনও তেমন খোঁজখবর করা হয়নি কী আছে, আর কী নেই। দু-চাকার ফট্‌ফটি–মোটরবাইকে ধুলো উড়িয়ে আসে যখন, তখন কেই বা চোখ বুজিয়ে বসে থাকবে ? হুলুই দেযা একদল ন্যাংটো ছেলেপিলে আর দুচারটে কুকুর তো গাড়ির পেছন পেছন ছুটে চলে আসে সামালি মোড়ের বাস রাস্তা থেকে। এই গাঁ অবদি। বেটি তাই দেখে নাচে। খুশির মা এখনও মনে করতে পাবে না, তাব কোথাকার কোন দূবসম্পর্কের বুনের বেটা শোহরাব ! তবে ছেলেটার জমি-জমার জ্ঞান আছে ভালো। সম্পত্তি কীভাবে বাখতে হয়, তার পরামর্শ মাঝে মধ্যে সঠিক মনে হয়েছে মোহরদ্দির। পাড়াব মানুষের মনকষাকষির কারণ সেটাও হতে পারে।

খুশি বিকেলে টানটান কবে চুল বাঁধে, বিনুনি কবে। তারপর ওড়না পরিপাটি কবে ঢেকে দেয় উদ্ধত আকর্ষণ। মাটির কলসি কাঁখে নিয়ে এগোয় ধীব পায়ে। এখানকার জলের তল বেশ নিচে। সরকারি সাহায্য ছাড়া কোনও বাড়িতেই নিজস্ব টিউবওয়েল নেই। জল আনতে আধমাইল হাঁটা। তারপর লাইন দিয়ে গল্পগুজব আর জল ভবে আনা। সকাল বিকেল দুবাব যেতে হয় জলের খোঁজে। শুধু খাওয়ার জন্যে। অন্য কাজ পুকুরেই।

এমনিতেই ধীর মেয়ে খুশি। চোখেমুখে তবুও যেন চোরা গর্ব লুকিয়ে থাকে রূপের। কলসি কাঁখে যখন সে হাঁটে, তখন তাব রূপ ঢেউ তুলে বেড়ায়। যাদের সে কাকা বলে, সেইসব চ্যাংড়ারাও নানা অছিলায় কথা বলে, ওর সঙ্গে হাঁটে। শান্ত খুশি তাতে বিবক্ত হয না। সবার সঙ্গে তার খোলামেলা আলাপ। মোহরদ্দি এ নিয়ে সামান্য শাসন করেও কোনও ইতববিশেষ কবতে পারেনি। খুশি জানে যতই সবাই ঘুরঘুর করুক না কেন, আব্বাব নামের দৌলতে সাহস হবে না কারও নোংরামি কবাব। অথচ শোহরাবের কাছে কিছুতেই সহজ হতে চায় না কথাবার্তা। তাতেই ভয় ধরে যায়। ভয়, আবার হিংসেও হয়। গাজিবাড়িব মেয়েরা যখন উঁকিঝুঁকি মেবে একনজর দেখতে চায সুদর্শন শোহরাবকে – তখন। অথচ তাবা কী দেখায়, কী চলায়, কী শিক্ষা বা পয়সায়–খুশির নখের যুগ্যি নয়। তবুও, শোহরাবটা যেন কিছুই বোঝে না। ন্যাকা, ছিঃ।

নিজেব ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ওঠে, আয়নার খুশিকে দেখে। দাঁত থেকে গোড়াকষি ফিতেটা হাতে নিয়ে ভেঙচায। আর তাবপরই কানে আসে মোটরবাইকের কট্‌-কট্‌, কট্‌-কট্‌ শব্দ।

গান থামিয়ে ঝাঁকা হাতে উঠে পড়ে হামিদা। ছড়িয়ে যায় কুচি কুচি নাড়ার কিছুটা। এবার ফ্রকের পেটে হাওয়া ঢুকিয়ে সে দৌড়য়। ফট্‌ফটিখানা পাড়ার ভেতর সেঁধোবার আগে পৌঁছতে হবে রাস্তায়। বাকুলেব পেছনবাড়ে, গোয়াল ঘরের মধ্যে থেকে নজর রাখতে হবে। শুধু নাড়া-ই না। ফেরার পথে ঘুনি আজড়াতে হবে, আঁটিকতক কলমি তোলা আছে – শেখদের

কুনি থেকে। কয়েকটা শাপলা। চুলোয় দেয়ার মতো খানকতক নারকেলের শুখা পাতা — চুমরি নিতে হবে আড়া থেকে। গরু আর খাসি দুটোকে এখন নেয়া যাবে না। সাঁঝ বরাবর মাছের জাল তুলবে, সেইসঙ্গে ওদের নিয়ে ফিরবে। জলাটা পেরোয় হামিদা। আড়ায় ওঠে। আড়া ধরে ট্যাঁড়শ-বাড়ি পেরিয়ে বাখারি ঘেরা জমিটাও পার হয় — বাখারি ফাঁক করে। আবার নামে জলায়। তারপর নোনটু কয়ালের কুনির মোন বরাবর হাঁটুজলে।

হামিদার মা রাহিলা তখন খড়ো চালের বাতা থেকে কঞ্চি টেনে উনুন জ্বালানর তোড়াজোড়ে ব্যস্ত। দড়ির দোলায় ঘুমিয়ে দুমাসের রক্তশূন্য ম্যাতা বাচ্চা। মাটিতে মাদুরে আরও দু'জন। সরু হাত পা, ভুঁড়ো পেট, ন্যাড়া। কতই বা বয়েস, সাত বছর আর দেড় বছর।

নাড়ার ঝাঁকা ধপাস করে উঠোনে নামিয়ে দাঁড়ায় হামিদা। হাত পা সিটে, গায়ে জাড়কাঁটা। বড় বড় হাঁইনিঃশ্বেস, বুক দুটির ওঠানামা—রাহিলা দ্যাখে, খুশি হয় না। এত খরখর বাকুলে ফেরার আশা করেনি। মন্দ খোঁজে মেয়ের চোখেমুখে। বছর চারেকের আরেকটা শিশু হামিদার পেছনে এসে দাঁড়াল। ধুলোকাদা মেখে কোথা থেকে যে আসে, ওদের তা নিয়ে মাথাব্যথা বড় একটা থাকে না। সে পয়লা হামিদার জামা ধরে টানে, তারপর মার কোলে গিয়ে আঁচলটা সরায়। দুধ খাওয়া শেষ হলে, যেমন এসেছিল, তেমনি আবার কোথায় চলে যায়।

আঁচল ঠিক করে রাহিলা। খবর তার কানেও এসেছে। সটান কঞ্চি হাতে ঘুরে দাঁড়ায় হামিদার সামনে। চুলের মুঠি এক হাতে, অন্য হাতে কিল। দমাদ্দম পড়তে থাকে বুকে। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল।

— হারামজাদি, এই কটা নাড়া নে তোর কোতায় দিবি রা ? বাঁড় আমার। ভাতারের জমি খেনে চাড়িড কাটকুটো নেসতি গতরে বেতা হয় ? চুলোয় কি দোব রা — হাত পা ? অবলা জন্তুগুনো কি তোর বাপের, হ্যাঁরা ? সাঁজ অবদি তারা আঁটি চোঁসপে। মাছগুনো কে আনবে — হ্যাঁরা মাগী, ভাতারের জলায় উটতি শরম হয় ?' তা, যা না, দুরো —উটগে যা না নাগরের ভিটেয়। চুন্নির জাত, চুন্নির বংশ কোত্থেনে এসে পড়ে মরেচে। ফট্‌ফটি চাইলে মিনসে এরার আসপে, তাই মা গিচি-বাপ-গিচি করে দৌড়িচিস। নজ্জা শরম হায়া কায়া নি ? ছ্যা ছ্যা ছ্যা। মর মর, গোলায় দড়ি জইড়ে ঝুলে পড়। বেরো —

কোনও কথা বলা হয়ে ওঠে না হামিদার। মায়ের থেকে গালাগালিতেই তার মুখ বন্ধ থাকে। এসব রোজের ব্যাপার। শুধু জামার পেছনের দুখানি বোতাম আরো ছিঁড়ে যায়। গলার ফাঁকটা বড় হয়ে ওঠে। নিচু হয়ে কাজকাম করতে গেলে চ্যাংড়াদের নজর চলে যাবে। কোনমতে হাত ছাড়িয়ে দাবায় ওঠে। তার পর বাঁশ-খুঁটি ধরে পাল্টা আক্রমণ শানায় —

— চুন্নি আমি, না তুই ? তোর বাপ চুন্নি, তোর মা চুন্নি। কার জন্যি চুরি করি রা ! আসুক আজ তোর ভাতার, বলবো, সব বলবো তারে, মিছে কথা কইতি জোগানে আটকায় না ? ইদিনে ঘাট থেনে ভিজে কাবুড়ে উটে আস্তায় ডেঁইড়ে কতা কোস নি মোহরদ্দির হবু জামায়ের সাতে ? শরম আচে তোর, আবার বলিস ? কিচ্ছু আনব নি। শুইকে মারব তোদের —

জবাব যেন আসে হাঁড়ির আগুন মুখে — বেশ বলিচি, তুইও বোলগে যা না। বাকুলে হাত ধরে টেনে নে ছেঁড়া চ্যাটাই বসা। বসা না।

হামিদা এবার ভেঙে যায়। কথাগুলো সবটাই মিথ্যে নয়, অথচ এত লাগে কেন তা বোধবুদ্ধির বাইরে। কিছুক্ষণ কেঁদে নিয়ে, চুবড়ি হাতে উঠে পড়ে জলার উদ্দেশে। বেশ মালুম পায় এর মাঝেই বাকুলের পাশ দিয়ে ফট্‌ফটিটা আওয়াজ তুলে, ছেলেছোকরা আর কুত্তাদের পেছনে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখতে পায়, খুশির মুখখানা আরও রাঙা হয়ে উঠেছে পড়ন্ত রোদ্দুরের ঝলকানিতে।

পাকা রাস্তার মোড়ে দোকানপাট সামান্য। রোজের দরকারি সামগ্রী ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় না। পাড়ার পুরুষেরা এখানেই মিলিত হয় রোজ সন্ধেয়। পাওনাগণ্ডা হিসেব নিকেশ

চলে। মনিব আর মজুরদের এ এক মিলন মেলা। কিছু কিছু চাষের আনাজ, মাছ, ফলপাকুড় আসে। সবই গ্রামের নিজস্ব ফলন। বাজাব নয়, বাজারের মতো।

হামিদা সন্ধে পেরিয়ে 'রাস্তায়' চলেছে। মোড়ের নাম, শুধুই 'রাস্তা'। একহাতে শিকা-র মতো দড়িতে ঝোলান দুলতে থাকা ভাঁড়ে মাছ। বাচ্চা জ্যান্ত শোল, উলকো, কই। ছলাক ছলাক নাচছে ভাঁড়ের জল। বগলে চাপা চটের টুকরো — মাটিতে পেতে বসতে হবে। মাথায় কয়েক আঁটি কলমি আর গোটা দুই লাউ। দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা। গামছা দিয়ে সেগুলোর পেট বাঁধা। তার পা চলছে, মুখখানাও থেমে নেই। গাঁয়ের পালান মুদির দোকান থেকে চিটেগুড় কিনে নিয়েছে খানিকটা — তাই চিবোচ্ছে। বাকিটা ইজেরের ট্যাঁকে পরম যত্নে রাখা। আধঘন্টা হেঁটে সে রাস্তায় পৌঁছয়।

বেশিরভাগ দোকানেই কুপিব টিমটিমে অলৌকিক আলো। বড় দোকানে বেচাকেনা বেশি – সেখানে হ্যাজাক। তারই সামনে রোজকার মতো, ওরই মাথার চ্যাটচেটে তেলের দাগ ধরা পিলারে ঠেস দিয়ে হামিদা বসে পড়ে। বিক্রি করে সবজি, মাছ। তারপর আব্বার সঙ্গে ঘরমুখো হয়। আব্বা ঐ সময়টা মজুরি নেয়, তাস খেলে। তারপর নেশা করতে যায় বিবিবহাটে। ঘরে ফেরার সময় অবশ্য নেশাটা ঝরে যায় কিছু। অসুবিধা হয় না হামিদার। বেশি নেশা থাকলেও ঘরে নিয়ে যাওয়ার দায় তার। এসবে শিশুকাল থেকে ও এতই সড়গড় যে, এটাই নিয়ম মাফিক জীবনযাত্রা — তা মেনে নিতে কোনও ধন্দে পড়েনি কোনও দিন। ঝামেলা বলতে একটাই। গাঢ় নেশা হলে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে আব্বা — যার এতটুকুও বুঝতে পারে না। আব্বার সঙ্গী নেশাড়ু হল সুদর্শন কাকা। দুজনে বলাকওয়া করে — হারামজাদা দেশের কিচ্ছু হবিনি। যত্ত কথা সব কইবে শালা নেতার বাপেবা, সুমুন্দি গরিপদেব বলার রাইট নি। উত্তরে সুদর্শন বলে–বাঁড়ের বেটাদের কাছে কিনতি যাও — চড়া। আর চাষের সামগ্রী বেচতি যাও – মন্দা। ফেলে রেকে পইছে, সাড়ে সর্ব্বোনাশ হয়ে গেল গা!

কলমি পড়ে আছে এক আঁটি, শাপলা সবটাই। কিছু মাছ এখনও জলে খলবলে আওয়াজ ছাড়ছে। শোল, উলকো — এসব সস্তায় পেয়ে কিনে নিয়ে গেছে, কিন্তু বাকি মাছগুলো কেনার লোকজন বুঝি রাস্তায় আজ আসেই নি।

রাহিলা বিবির ঝাঁটায় একটা কাঠিও নিটুট থাকবে না, সবই ভাঙবে ওর পিঠে — ভেবে সারা শরীর কাঁটা হয়ে যায় হামিদার। দোকানের হ্যাজাকটা দপ্ দপ্ করছে। সেই কাঁপা আলোব শিখায় হামিদার মুখ উথাল পাথাল। বুকের গুরু গুরু শব্দ যেন শোনা যায়। আব্বার আসার সময় হয়ে এল। আশপাশে হাপিত্যেশ চোখ একবার বুলিয়ে যায় ভাবী খদ্দের খুঁজতে। হঠাৎ কোথা থেকে বুকের আওয়াজ যেন বাতাসে ভাসে, উঠে আসে রাস্তায়!

মোটরবাইক চালিয়ে শোহরাব একেবারে তার সামনে থামল। হাত ঘুরিয়ে পিঠের বোতাম লাগানোর চেষ্টা করে হামিদা। চুলগুলো কি পরিপাট আছে! গামছাটাকে বুকেব মাঝ বরাবর ঠিক করে নেয়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। হলদে কষ পড়া পায়ের নখগুলো লুকোবার চেষ্টা করে। জামাটাকে যতটা পারে হাঁটুব নিচে নামায়, পা ঢাকে। চড়চড় করে গায়ে ফুটে ওঠে জাড়কাঁটা।

গুরুগুরু শব্দটা বুঝি বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে শোরহাবের হাতে। এক ধরণের ভয়। শোহবাবের হবু শউরের কুনিব মাছ, জানতে পেরে গেছে নাকি! হায় খোদা! কেমন এক সুবাস নিয়ে এসেছে শোহবাব — চারপাশ তার গন্ধে মাতোয়ারা। এগিয়ে আসে হামিদার দিকে।

— জীয়ল মাছ রয়েছে? শোহরাব বলে।

হামিদা 'মাছ' কথাটুকুই শুধু বোঝে, মাথা নাড়ে। শোহবাব সবগুলোক ওজন করতে বলে ফিরে যায় গাড়িতে। বক্স থেকে সিগারেট বার করে জ্বালায়। ছোট চটের থলিটাও বাব করে আনে।

হামিদা ওজন করতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলল। কয়েকটা কই, পাল্লা থেকে লাফ দিয়ে

মাটিতে। কানকো বেয়ে দূরে পালাবার মতলব তাদের। গুছিয়ে তুলতে হাত কাঁপছে হামিদার। কতবার কত মাছ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেছে অনায়াসে। এখন কানকো ফুটে গিয়ে জ্বলতে লাগল হাত। চটের ব্যাগে মাছগুলোকে উপুড় করে দেয়ার আগে সে বলে, — এই বেগে কইমাছ যাবিনি গো, কানকুরো ঘসে পেইলে যাবে !

শোহরাব চুপচাপ মানিব্যাগ বার করে।

হায় আল্লা ! হামিদা আবার চমকে ওঠে। কুটুমের ডোবার মাছ — পয়সা দেবে কি গো ! কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলা হয়ে ওঠে না। ধরা পড়ার ভয়, অন্তত শোহরাবের সামনে — সে বড় লজ্জার । একবার ভাবল বলে, — নে যান গো, পয়সা লাগবেনি। কিন্তু যদি জানতে চায়, কেন ? তখন কী উত্তর দেবে সে ? তাই হাত পেতে টাকা নিতেই হয়।

শোহরাব চলে গেছে। পেট্রোলের গন্ধ কিংবা তার সঙ্গে মিশে থাকা শোহরাবের দেহের সুবাস এখনও বুক ভরে টানছে হামিদা। একখানা দীর্ঘ শ্বাস নিল সে, তাতে স্বস্তির চিহ্ন নেই। চুরি করে সে। 'চুন্নি' তার গয়না, টায়রা-টিকলি। তবু এভাবে যার ধন, তাকেই বেচে পয়সা নেয়নি কখনও। টাকার বদলে সে যেন তার মান ইজ্জত বিকিয়ে দিল, তার অহংকার বিকিয়ে দিল, তার ইমান বিকিয়ে দিল ... ।

হামিদা স্পষ্ট দেখতে পেল, কইমাছগুলো লাল লাল পুরুষ্টু কানকোয় ভর করে, চটের ব্যাগ বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ... আরও আলো বাতাসের দিকে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিক্রমা

নদীব কাঁথি ভেঙে, জল পেবিয়ে, জঙ্গল মাড়িয়ে আসত মানুষটা। ঝোলা থেকে বাব করত জগন্নাথের পট। মাথায় ঠেকিয়ে নামিয়ে বাখত নিচে। আবার হাত ভবতো থলেতে। বেরিয়ে আসত বঙীন লাঠি, ঠাকুবের প্রসাদ, পান-সুপোবীব কৌটো। শ্রীনাথের এক মেয়ে আর খুচরো তিন ছেলে হাঁ কবে সেই দৃশ্য দেখত। সব শেষে ভগবান পাণ্ডাব থলে থেকে বেরোতে জগন্নাথের তাগা। তালেব মতো বিশাল এক কুণ্ডলী।

কুণ্ডলীটা শ্রীনাথেব ঘব থেকে যেত পশ্চিমের গয়লা-পাড়া। সেখান থেকে পুবেব কামাবপাড়া। যখন ফিরত তখন কুণ্ডলীতে হাতে গোনা পাঁচ-সাত খি।

মানুষটা আসত প্রত্যেক বছব। নবীনগঞ্জেব শ্রীনাথ চক্রবর্তীব ঘবকে কেন্দ্র কবে বিশ-পঁচিশ গাঁ ঘুবত। পৌষ পেবোল, বছবেব কাজ শেষ। এবাব চল। চুলে শবতেব মেঘ ওড়ে, শবীবেব চামড়ায় ভূমেশ ফাট। এখনই তো কড়ি জমানোব সময়। মবায়েব ধান, বস্তাব চাল, বাব গণ্ডা গক, তিন বাগানেব ফল – কিছুই নেবে না পাটনি। কড়ি নেবে। শ্রীক্ষেত্র চল। আকাশে-বাতাসে পারাণিব কড়ি মিলবে। ভবনদী পেবিয়ে যাবে তবতবিয়ে।

কানে শোনে মানুষজন, চোখে দেখে। নদী পেবলে ডাঙা, ডাঙা পেবলে বন। বন পেবিয়ে পাহাড়, পাহাড় টপকে স্বর্গদ্বাব। ভেতবে পদ্মাসনে ভগবান। এবাব সুখেব দিন। সাপ নেই, নেকড়ে নেই, বান নেই, ওলাউঠা নেই। মাঝ বাতে মাথার ওপব ডাকাতে কুড়োল তোলে না। আঁতুড়ে নাতিন মবে না। মেয়ের হাতেব শাঁখা বছর না ঘুবতে ভাঙে না। হাতে কড়ি এলেই সব সুখ। পুরী হয়ে ঘুববে। ফুলে ফুলে মধু খাবে।

কড়ি চাইলেই কড়ি মেলে না। আশ্বিনেব ঝড়ে ঘবেব চাল অর্জুন গাছেব মাথায়। শ্রাবণের বানে খড়েব পালুই পুবে ভেসে যায়। হালেব গক ছটফটিয়ে মবে। মেয়ে খালাস হতে আসে। নাতনিব বিয়ের দিন ধবা হয়। বোশেখেব বাজে দেওব ছিটকে ছাঁচতলায়। এসব সামলে কেউ কেউ বেবিয়ে পড়ে। ভগবান পাণ্ডাব পেছন পেছন হাঁটে। গাঁ পেবোয়, বন পেবোয়, নদী পেবোয, খেত পেরোয়, গঞ্জ পেরোয। ট্রেনে চেপে জগন্নাথেব শ্রীচবণে। সব আকাঙ্ক্ষাব পুবণ। তখনই মনটা হু-হু করে ওঠে। নাতনীটাকে পেঁচোয় ধবেনি তো ? ক্ষুদে বামনীব মুখে আগুন। পাঁচ সেব দুধেব গাইটাব বাঁটগুলো শুকিয়ে আমসি।

শ্রীনাথকে বলেছিল ভগবান, 'বৌমাকে নে ঘুবে আসবে চল।'

শ্রীনাথেব বৌ ঘুঁটে দিতে দিতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘোমটাব ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছিল শ্রীনাথেব দিকে। শ্রীনাথ তালকুব কাটছিল দক্ষিণ-দুয়াবী ঘবেব সামনে বসে। তিন ছেলে আব এক মেয়ের শবীবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল মুখটা। ইচ্ছে-অনিচ্ছে বোঝাব উপায় নেই।

– মাযেবই হলো নি।

শ্রীনাথেব উত্তরটা শোনে বৌ। ঘুঁটেতে ফেবে।

– তোবা যা না ! বৌটার বাপেব ঘরে সাতকূলে কেউ নাই, দু'দিন যাবাব জায়গা নাই। নে যা।

শ্রীনাথের সৎমা রান্নাচাল থেকে বলে। বিযেব বছর না ঘুরতে বিধবা। বাপের ঘরের লোকজন নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যাযনি। সৎ ছেলের সংসাব আঁকড়ে পড়ে আছে। আর কটা দিন পার করতে পাবলে ছেলের আগুনে স্বর্গে।

শ্রীনাথ মাথা নাড়ায় – লোকে বলবে সৎমা বলে নে গেল নি।

– লোকেব মুখে আগুন। মেয়েটার আমাব কাছে বেখে তোবা যা।

– তুই যা। বোয়েবে নে যা।

শ্রীনাথ উঠে দাঁড়ায। মা-কে সে তীর্থ কবাবেই।

– তা হবে নি। হাঁড়ি নে তুমি তখন ঘবে নেত কববে, ধান সেদ্ধব উনোনে ভাটি চাপাবে।

শাশুড়ি আর ছেলের কথাব ভেতব দোল খায বৌ। যে কেউ গেলেই সে যাবে শ্রীক্ষেত্র।

– তাহলে দাদাব সঙ্গে তুই-ই যা। একাই যা।

শ্রীনাথেব বৌ দেয়ালের গায়ে সপাটে বসিয়ে দেয় গোবরেব তাল।

আড়াই পাড়াব গাঁয়েব পাঁচজন যাত্রী মেলে। শ্রীনাথেব মা, গোপাল কামারেব কাকা-কাকী, সাধন গয়লা আব তাব বৌ। কামাব আর গযলাপাডাব চিঁড়ে-মুড়িব পুঁটলি আসে শ্রীনাথেব ঘরে। পবে নাতি-নাতনীরা। তাদেব খানিক পবে ছেলেবা। সবাব শেষে বৌবা। যাবা যাবে তাবা এখনও শিবদালানে। ঘব সংসাব কাব সাহসে বেখে যাবে!

শ্রীনাথেব সংসাবে তখনও কান্না চলে। সকাল থেকে খাসিটা মেলেনি। মনমেজাজ ঠিক নেই। [illegible] নিশ্চয টেনে নিযে গেছে জঙ্গলে। দেখা নেই শ্রীনাথেবও। কে জানে কোথায নেশা কবে পড়ে আছে! দুপুব হতে চলল। এবাব যেতে হয। ভগবান পাণ্ডাব দু'কাঁধে ঝোলে প্রকাণ্ড দুই ঝোলা। এক মাসের নানান সংগ্রহ। ঝোলাব পেছনে পেছনে গয়লা আর কামারপাড়াব ছেলের দল। তাব পেছনে বৌ-ঝিবা। তাব পেছনে পুরুষ মানুষ ক'জনা। শরেব বনেব ভেতব দিযে চলে। শিশু, অর্জুন, সেগুনেব গা বেয়ে হাঁটে।

শ্রীনাথের তিন ছেলে আব বড মেয়েটা ঠাকুমাব আঁচল ছাড়ে না। কোনদিন চোখেব আড়াল হযনি। আজ চলে যায। নদীর জলেব কাছে এসে থমকে দাঁড়ায গাঁযেব মানুষ। শ্রীনাথ বালিব ওপর দিযে পা টেনে টেনে আসে। মাযেব হাতে গুঁজে দেয কটা টাকা। দূরেব পথ, কাজে লাগবে।

এবাব ফিববে গাঁয়ের মানুষ। ভগবান পাণ্ডা হেঁটে যাবে পাঁচ বুড়োবুড়িকে নিযে। আবো জুটবে নদীর ওপাবে। কুমোবগঞ্জেব দুজন যাবে, নবোত্তমবাটিব চাবজন। তাদেব নিযে পানপাতা। সেখানে বাত কাটিয়ে পুণ্ডহীত। ওখানেব যাত্রী দুজনা।

শ্রীনাথেব বৌ থমকে দাঁড়ায়। এমনি কবে সেও চলে যেতে পাবত জল ভেঙে। ভগবান পাণ্ডার পায়ে পায়ে পৌঁছে যেতে পাবতো জগন্নাথেব শ্রীচবণে। কত বউড়ি দিদিব, বাপের ঘর, দেওব-জাযেব ঘব যায়! কত লোক কত দূব যায! শাশুড়ি নদীব স্রোতেব কিনাবে দাঁড়িযে বৌকে বলে – কাঁদিস নি। কটা দিন পরেই ফিবে আসব। ছেলেগুলোকে নজবে রাখিস। নদীতে নামতে দিস নি। পরেব বছর ছিনাথ আব তুই যাবি। জগন্নাথ দর্শন হলে ছিনাথের নেশা কেটে যাবে। তোর গাযে বল আসবে। কাঁদিস নি বৌ। ছিনাথ আব তোবে আমি সামনের পৌষে জগন্নাথ দর্শন কবাবো।

ঘরমুখো আর বাবমুখো মানুষেব মাঝে নদী বয়ে যায়। সূর্য ডোবে, সূর্য ওঠে। যাত্রী-মানুষ ক্রমশ দূরে চলে যায় নবীনগঞ্জ থেকে। দূরত্ব বাড়ে। সেই ফাঁকে মাঠ ঢোকে, গাঁ ঢোকে, গঞ্জ ঢোকে। নদী, পাহাড়, বন ঢুকে যায।

দিন পেরোয়। মাস পেরোয়। বারমুখো মানুষ আবার ঘরমুখো। কিন্তু কখনো সখনো কেউ কেউ আটকে যায় জগন্নাথের চবণে। ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভবনদীতে গড়িয়ে

পড়ে। জগন্নাথ টেনে নেন নিজের কোলে।

নদীতীরে কৃশদেহ দাহ করে শ্রীনাথ। অস্থি ভাসিয়ে, নদীর স্রোতে। চোখের জলে শ্রীনাথের বৌয়ের চোখ দুটো ঝাপসা – কাঁদিস নি বৌ। ছিনাথ আর তোরে সামনের পৌষে জগন্নাথ দর্শন করাবো।

দুই

শ্রীনাথের বৌয়ের ঠোঁটে বাবলার আঠা। কারো বিয়ের সাজ দেখলে মনটা নেতিয়ে যায়। কারো গায়ে বেনারসী চাপলে নিজের বিয়ের সাজেব কথা মনে পড়ে। বৌভাতের দিন সে শালুর কাপড় পরেছিল। তখন সবে বারো বছর। দুঃখটা তেমন জমে ওঠেনি। বয়স বাড়তে মনের কষ্ট বাড়ে। আহা, টিয়া রঙেব বেনারসী।

শ্রীনাথ বৌয়ের ফোঁসফোঁসানি দেখে। শ্রীনাথ বানভাসী-কালনাগিনীর গর্জন শোনে পালুয়ের গায়ে। ফণাটা সবটুকু মেলে দেয় ভিনদেশী সরীসৃপ। হেঁসোর কোপটা গিযে পড়ে দু-খড়মের মাঝামাঝি। কপালেব সবটুকু সিঁদুর ঝরে পড়ে। উঠোনের পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে যায়।

– ছ'টা মাস সবুব কর, জোড়া বেনারসী কিনব।

– একটা জুটল নি, তার আবার জোড়া।

– অঘ্রানে ময়নাব বিয়ের দিন ধবব। একটি ভাল পাত্র আছে ঘুঘুডাঙায়। কলকাতায় চাকরী করে।

– এ অঘ্রানে ?

– পনের পেরলো। আব বছর ঘুরিয়ে করবিটা কী ?

– যোগাড় নাই ?

– পিসেমশাইরে বলেছি। পুবেব পনের বিঘে জমি আটশ টাকায় কিনবে। বলেছে টাকা জুটলে পরে শুদে দিস। জমি ফেরৎ করে দেব।

– শুদতে পাববে ?

– পাঁচটা বছর যেতে দে। এঁড়ে পাঁচটা হালের বলদ হবে। পুকুর পাড়েব তালগাছগুলো সোনার দরে বিকোবে। দুটো বছর নদী চুপ থাকলে মবাইয়ের বেড় বাঁধবো পাঁচ কাহন খড়ে।

– আমার বেনারসী ?

– এ অঘ্রানে। ময়না-মায়ের ময়ূরকণ্ঠী, তোর টিয়া।

পনেরর ময়ূব আর তিরিশের টিয়ে ডানা মেলে। বর্ষার জলে ডানা ধোয়, শরতেব রোদে ডানা শোকায়, হেমন্তের শিশিবে ডানায় বুদ্বুদ্ গাঁথে।

নদীর মুখে গেঁজে ওঠে। ডাক পাড়ে নদী, হাঁক পাড়ে। পুণ্ডহীতের ঘাট-খেয়া বন্ধ। পানপাতাব জেলেরা নৌকায় মাছ তুলে কুটুম্বিতে করতে বেরোয়। তিন কেজি রুই। কার পুকুরের পাড় ডিঙিয়ে স্রোতের শবীরে গা ভাসিয়েছে। বান এসেছে। ফূর্তি কর। মাছের ঝোল রাঁধো। নিজেরা খাও, আমাকে খাওয়াও।

জল থৈ থৈ নবীনগঞ্জ। গয়লাপাড়া আব কামারপাড়ার মাঝের জমি আকাশের জলে উপুড়চুপুড়। শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ঘরের সঙ্গে কামারপাড়ার আর গয়লাপাড়া লেতুড়। নদীর বান শ্রীনাথের দক্ষিণের দেওয়ালে শ্বাস ছাড়ে। কুচো ছেলেরা কলার ভেলা ভাসায়। হাউসে মানুষেরা তালের ডোঙাতে চেপে জলের নাচন দেখতে বেরোয়। বুড়োরা শিবদালানে বিশ বছর আগের মহাবানের গপ্পো জোড়ে। বানেতে বড়লোক করে দিয়েছিল হরিসাধন গযলাকে। চল্লিশ ভরি গয়না ছিল ভিনদেশি মেয়েটার শরীরে। যেমন, এসেছিল তেমন ভেসে চলে গেল। হরিসাধন বিশ বিঘে জমি কিনল, পাঁচটা গাই-গরু কিনল, ভালুকবাঁদিতে একটা মেয়ে পুষল।

শেয়ালের মুখ থেকে হাঁসটা ছাড়িয়ে এনে খরপোশ করতে বসে শ্রীনাথ। মেয়ে ময়না হাঁসের শোকে অঝোরে কাঁদে। ময়নার মা শেয়ালকে গাল পাড়ে। শ্রীনাথের তিন ছেলে হাঁসের পেটে কটা ডিম আছে তা দেখার জন্যে প্রতীক্ষা করে। বিজয় জেলে নিজের ভাগ্যে আনন্দে আটখানা। বেনো মাছ দিতে এসে মাংস-ভাত।

আয়েসী দিন। হাত-পা ছড়িয়ে শ্রীনাথের সংসার খেতে বসে। শ্রীনাথের বৌ মাংসের বাটি সাজায়। কার বাটিতে কটা মাংস সেই নিয়ে শ্রীনাথের ছেলেরা ঝগড়া করে, এ-ওকে খিমচোয়, বাপের হাতের ঘা খেয়ে কাঁদে, হাঁসের ছালকে বাগে আনতে কান্না ভোলে।

আকাশের মুখ আবো গোমরা হয়। বানের জলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোন। কামারপাড়ার বদন আসে। গয়লাপাড়ার রবি হাঁক মারে। বৌ-ছেলে আর গরু-ছাগলগুলোকে এবার নদী পার করে দিতে হয়। ঘর সামলাতে এক-আধজন পুরুষ মানুষ থেকে যাবে।

বিজয় জেলের ডিঙিতে শ্রীনাথের সংসার নদীর ওপারে চক্রবর্তীদের ঘরে চলে। যাবার আগে শ্রীনাথের জন্যে চিড়ে বেঁধে দেয় বৌ। জল তেমন বাড়লে চিড়ের পুঁটুলি নিয়ে টুসি আমগাছের টঙে উঠে যাবে। ছাগল দুটোকে ডিঙির ওপর চাপিয়ে গরুর পাল নিয়ে চলে শ্রীনাথ। গয়লা আর কামারপাড়ার থেকেও মানুষজন বেরিয়েছে। কেউ নিজের ডোঙায়, কেউ জেলে নৌকোতে। যে যার স্যাঙাৎ, তীর্থমা, বন্ধু-বান্ধবের ঘরে গিয়ে উঠবে। দু-তিনটে দিন কাটিযে আবার যে যার সংসারে।

নবীনগঞ্জ নদী পেরোয়। সাঁতারে কার কত ক্ষমতা তার পরীক্ষা হয়। কার মোষ কতখানা ঘাড় তোলে তা নিয়ে ইয়ার্কি চলে। বৌদের ভেতর কথা-চালাচালি হয় কার বর ক'ঘোট জল খেলো।

ওপারে যে যার আপনজনের ঘরে নিজের সংসারকে গচ্ছিত রাখে। ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক হলে কেউ বলে – যেমনটি দিলুন তেমনটি ফেরত দিস।

তিনজন ফেরে ঘাটে – শ্রীনাথ, কামারপাড়ার বদন আর গয়লাপাড়ার জগদীশ। নদীর সঙ্গে পাঞ্জা কষে পাড় বদলায়। হরিসাধন গয়লার ভাগ্যের কথা ভেবে সোনার মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। দেখে খড়ের পালুই ভেসে যায়, পোষা টিয়া আকাশের দিকে তাকিযে গড়িযে যায়, পুকুরের পানা ঘূর্ণিতে পাক খায়।

রাত নামে। নদী তীরে, জঙ্গলের মাথায়, আকাশের কালো মেঘ জমাট বাঁধে। নদীর স্বর ঘন হয়, ফেনার চূড় উঁচুতে ওঠে। এক সময় রাতের আঁধার মিশে যায় মেঘের কাজলে। আকাশের জল আর বানের জল জুড়ে যায়। তখন শ্রীনাথের গলা আর কামারপাড়ায় পৌঁছায় না। জগদীশের হাঁক বদনের কানে এসে জোটে না।

শ্রীনাথের বৌ বাজের ডাকে জেগে ওঠে। রাত জাগো। চোখ জুড়লে ঢেউ ফণা তুলবে, শিরে ছোবল বসাবে।

রাত কাটে। জলের রাগ কমে। শ্রীনাথের নবীনগঞ্জের প্রবাসী সংসার নদীর তীরে আসে। আর দুটো দিন গেলেই ঘরে ফিরবে। আজই খবর আসবে পুকুরের কটা মাছ ভেসে গেল, কাদা হল খামারের কত খড়।

বেলা বাড়ে। দুপুর হয়। শ্রীনাথের ছেলেরা খেতে যায়। বেলা পড়ে। ময়নাকে খেতে পাঠিয়ে দেয় মা। শ্রীনাথের বৌয়ের বুকের ভেতর ঢাক বাজে। মানুষ তিনটের খবর নেই কেন? শ্রীনাথের বৌ অথৈ জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকাশের মেঘ কাটে। পড়ন্ত বিকেলের মরা রোদ ওঠে। শ্রীনাথের বৌয়ের চোখ নবীনগঞ্জের হারিয়ে যাওয়া ঘাটের ওপর হুমড়ি খেযে পড়ে। সূর্য মুখ গুঁজে দেয় পশ্চিম আকাশের বুকে। নবীনগঞ্জের এপারের মানুষজন নদীর তীরে আসে। তাকিয়ে থাকে নবীনগঞ্জের ঘাটের পথে। মানুষের মাথা বেরোয় বন থেকে। ঐ যে বদন, ঐ জগদীশ।

শ্রীনাথের বৌয়ের টিয়া-রঙ বেনারসী ঘেলা স্রোতে ভেসে যায়।

তিন

ময়নার বাবার পিসেমশাই দু'বার কলকাতা ঘুরে আসেন। বিয়ে পাকা। ফাগুনের তের তারিখ। মাঝে এক মাস। তোড়জোড় চলে। ধান চাল হয়। দেয়ালের গায়ে ক্ষেতমাটির সাদা রং চাপে। খড়ের সোনালীতে চালের রূপ ফেরে। ময়নার মা নিজের বিয়ের দানগুলো পালিশে পাঠায় ভব কামারের ঘরে।

শ্রীনাথের কাঁচির বন্ধু শিবু সাঁওতাল আসে। হেসোর ঘায়ে শিউলি গাছের ডালে কাটে। পেয়ারা গাছের মাথা ছাঁটে। ওলের গোড়া তোলে। উঠোনের ঘাস চাঁছে। ক্ষেতের মাটি দিয়ে উঠোনে রাস্তা বানায়। জামাইয়ের পায়ে যেন জল না লাগে। কলকাতার জামাইয়ের জন্যে দেড় হাত লম্বা পিঁড়ি বানায়। তেল-শালপাতা দিয়ে গাড়ু মাজে। কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে যায়। শাল-পিয়ালের ডাল কাটে। ময়নার তিন ভাই সে সব ডাল টানতে টানতে ঘরে তোলে।

গোপাল কামারের কাকী উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে। ময়নার মায়ের সুখের কথা শোনায়। মেয়ের বিয়ে মানে চিন্তার শেষ। এখন শুধু ছেলে তিনটের পৈতে। বড়টা চাষ দেখবে, বাকি দুটো ঘটি নিয়ে চলে যাবে দু'মুখে। বামুনের ছেলে চৌদ্দ বছরেই রোজগার। ঘন্টা বেয়ে পড়বে চাল, শাঁখ থেকে মুড়কি। যাদু-ভাদু-মাধোর মায়ের সংসারে লক্ষ্মী খেলে বেড়াবে।

গোপালের কাকীর কথায় নিশ্চিন্তি মেলে না ময়নার মায়ের। পাকমারাদের মেয়েটা কাঠকয়লা দিয়ে ছক কেটেছিল উঠোনে। এ বেয়াড়া ভিটে। এ সংসারে বেড়ি নেই। বাস্তুতে বন্ধন নেই। দেশান্তরে চলে যাবে তিন ছেলে। বড় পুবে, মেজ পশ্চিমে, ছোট উত্তরে। লন্ঠনের ভাঙা কাঁচে ধোঁয়ার প্রলেপ দিয়েছিল। সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তিন ভুবনের ছবি দেখেছিল ময়নার মা। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িঘর, ঘোড়ায় টানা গাড়ি। খানিক দূরে ইঞ্জিন গাড়ি। নদী নেই, নালা নেই, গাছ নেই, গরু-ছাগল নেই। সে দেশে চলে যাবে যাদু। ভাদুর জন্যে কাগজ-কলম। দোয়াত-কালিতে টেবিল ভর্তি। ভাদু মাথা নামিয়ে ঘুমে অঘোর। চিন্তা মাধোকে নিয়ে। তিনটে বুক-ভাবী মেয়ে। ঘরের কোণে ফুলের ঝুড়ি। ঝুড়ির গায়ে বোতল। বোতলের পাশে ঘটি। তারপাশে তেল ছবি। বিছেতে ভেড়া খায়।

তিনটে বাসন নিয়েছিল পাকমারা মেয়েটা। যাদুর জন্যে ভরনের গেলাস, ভাদুর জন্যে কাঁসার ঘটি, মাধোর জন্যে থালা। প্রতি অমাবস্যায় তিনজনের বালিশের নিচে রাখতে হবে তিনটি পাথর। দিন পেরবে, রং বদলাবে। যাদুর কালোপাথর হবে সাদা, ভাদুর হলুদ হবে সবুজ আর মাধোর সিঁদুর-লাল বেগুনি। সংসার নিয়ে সুখে থাকবে ময়নার মা। চালের মাথায় নাচবে ময়ূর। লক্ষ্মীপেঁচা ডাকবে টুসি আমের ডালে। টুঙির হাঁড়িতে পায়রার সংসার বাড়বে। শাশুড়ি বেলগাছ থেকে নেমে কামাখ্যা চলে যাবে। যেমন ভাসতে ভাসতে চলে গেছে শ্রীনাথ তেমন ভাসতে ভাসতে ফিরে আসবে।

মাছের ঘিলু চিবোয় বরযাত্রীর দল। রসগোল্লার হাঁড়ি গেলে বরযাত্রীর দল। যাদুর সোহাগের পাঁঠার হাড় চিবোয় বরযাত্রীর দল। ভাদুর লালু-ভুলু মাছের পেটি খায় বরযাত্রীর দল।

পিশেমশাই বরকর্তাকে নবীনগঞ্জের ইতিহাস শোনান। আগে ময়াল থাকতো নবীনগঞ্জের জঙ্গলে। সেবারই শ্রীনাথের বাবা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর চার গণ্ডা কলাগাছ খেয়েছিল হাতির পাল। তেমন গাছে গাছে ঘুরতো বাঁদর। খোঁড়া কামারকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল গাছ থেকে। আট মাসের ছেলের ডান হাতখানি আঁকশি হয়ে গেল। পিসেমাশাই নিজের কাহিনী শোনান। নদী-নালা থেকে সবে উঠেছেন। ততক্ষণে সন্ধে নেমে গেছে। দেখেন টুসি গাছের নীচে শ্রীনাথের বাবা বসে। কানের কাছে মুখ এনে বলেছেন —'থাকার কথা কোলে, কেন বসে গাছতলে ?' শালা তড়াং করে লাফিয়ে উঠে দে ছুট। নেকড়ে ঢুকে গেল জঙ্গলে।

সকালে আশীর্বাদ। হলুদ জলে দুব্বো ঘাস ডোবানো হয়। শাঁখ বাজে। ময়না এক সের চালে এতকালের ভাতের ঋণ শোধ করে। অন্য ঋণে আবার জড়িয়ে নেয় নিজেকে। গরুর গাড়িতে দান ওঠে। ময়নার শরীরে ওঠে মায়ের নথ, মায়ের আটগাছি সোনার চুড়ি,

মায়ের বিয়ের দুল, ময়নার মাকে শাশুড়ির দেওয়া বাজু। ময়নার মাকে ময়নার বাবার দেওয়া হার। ময়না নিজের সংসারে চলে যায়।

খানিক পরে জোড়া হয় পিশেমশাইয়ের গাড়ি। সে গাড়িতে পাঁচসের মিষ্টির হাঁড়ি ওঠে। হাঁড়িটা পেতলের, পরে ফেরত পাঠাবেন পিসেমশাই। গাড়িতে তোলা হয় পাঁচসের বাদশাভোগ চাল। পিসিমা পায়েস খাবেন। গাড়িতে ওঠে শ্রীনাথের সাধের পেতলের হুকো। পিসেমাশাই টানবেন। গাড়িতে তোলা হয় শ্রীনাথের সৎ-মায়ের পানের সাজ। পিসেমশাইয়ের মা আড়গালিতে পান চিবোবেন। গাড়ির পেছনে জোড়া হয় ময়নার মায়ের তিনসের দুধের গরু-বাছুর। চার বাঁটে ঝুলে থাকবে পিসেমশাইয়ের সংসার।

ময়নার সুখে নবীনগঞ্জের মানুষ হাসে। বড় ভাল পাত্রে বিয়ে হলো ময়নার। ঘুঘুডাঙার চাল, কলকাতার পয়সা। বাপ মরতে মনে হয়েছিল মেয়েটার কপাল পুড়ল। কোনো ঘাটের-মড়া হয়ত গাঁদা ফুলে উচ্ছুগ্যু করে তুলে নিয়ে যাবে কোনোদিন। ভগবান এক হাতে সিঁদ কাটেন, অন্য হাতে দান করেন। মেয়েটার কপালের সুখে আঁক কেটে দিয়েছেন ভগবান।

ময়নার মা হাসে না, ময়নার মা কাঁদে না। ময়নার মা ঘোমটা খোলে। ময়নার মা আর শুধু বউড়ি নয় নবীনগঞ্জের। ময়নার মা শাশুড়ি। মাথার কাপড় নামায় ময়নার মা। খনা ধুতি মাথা থেকে নামিয়ে ঘাড়ে ফেলে ময়নার মা। আঁচল কোমরে জড়ায়। ঘোমটার নিচে ঢুকে থাকার উপায়ও নেই তার। ছেলে তিনটেকে বড় করতে হবে।

যাদু-ভাদুকে ইস্কুলে পাঠিয়ে গরু ছাড়ে ময়নার মা। নদীর মানায় গিয়ে বসে। গাই-বাছুর-বলদে পঁচিশটা। পিসেমশাই একটা গাই-বাছুর নিয়ে চলে গেছে। হিসেব দিয়েছে এখনো একশ'টাকা ধার। আবার কবে কী নিতে আসে কে জানে! বলদে হাত দিলে ছেলে তিনটের কী হবে!

গরু-বাছুরগুলোকে চোখে চোখে রাখে ময়নার মা। কে জানে কখন কোন পথে হারিয়ে যায়! সংসারে বেড় নেই। ঘরে বাঁধন নেই। বেনো জলে কোথায় কী ভেসে যায় কে জানে।

মাঝ রাতে মায়ের কান্না শুনে যাদুর ঘুম ভেঙে যায়। মা কাঁদে ডুকরে ডুকরে, মা কাঁদে হাউ মাউয়ে। যাদু আর ভাদুকে জড়িয়ে ধরে মা কাঁদে। মা কাঁদে পনের বিঘে জমির ধানের শোকে। মা কাঁদে গাই-বাছুরের শোকে। মরাই হবে না সামনের বছর। যাদু, ভাদু, মাধো দুধ পাবে না রাতে। ছাগলের চিৎকারে আর ঘুম ভাঙবে না ভোরে।

যাদু বলে -- ভাবিস নি মা। দেখবি, শ'বিঘে জমি কিনব। বিশ মাপের এক একখানা মরাই করবো। উঠোনে পা ফেলার জায়গা রাখবো নি। তুই সিঁজোতে সিঁজোতে এলিয়ে যাবি।

ভাদু নাকের জল মুছে বলে -- একশ' গোঁজের গুয়োল করবো। ছাগল পুষবো দু'পাল। গয়লাদের পাল জায়গা পাবে নি মানাতে। গাই পুষবো দু'গণ্ডা। অত গাই দুয়াবি কেমন করে?

ঘুমোয় ময়নার মা। মরায় আর গরু-ছাগলের স্বপ্নে রাত কাটে। ধান আর দুধের স্বপ্নে দিন বেরোয়। লক্ষ্মী একদিন পা ছড়িয়ে বসবে উঠোনে। ভগবতী সারা মানা জুড়ে ছুটে বেড়াবে। সুখের সংসারটা দেখতে পায় ময়নার মা। বাগানের গাছে আমের থোকা। তেঁতুলের ডালে ডালে ভরাট শুঁটি। বর্ষায় মানাভর্তি নদীর মাছ। রান্নাচালে গামলা গামলা দুধ। গোয়ালের গায়ে আকাশ ছোঁয়া খড়ের পালুই। সজনে গাছে চিকনির দাঁড়ার মতো সার সার ডাঁটা। পুকুরের পাড় জোড়া কলাগাছ। পোয়াল গাদায় পেথে পেথে ছাতু।

যাদু-ভাদু-মাধোর ছেলেপিলেতে সংসারে নিত্যদিনের উৎসব। কলকাতা থেকে নিজের সংসার নিয়ে আসবে ময়না। সার সার ঘর উঠবে খামারে। লোকে বলবে বামন পাড়া।

চার

রাধাকেষ্ট পাল ঘোড়া থেমে নামলেন। স্কুলের ঘন্টা বাজল। ছাত্র আর ঘোড়া, দুটো একই চাবুকে সামলান রাধাকেষ্ট পাল। বাবা ছিলেন পত্তনীদার। সেই সূত্রে বর্ধমানের রাজদরবারে যাতায়াত। ক্যাম্পবেল সাহেবের সঙ্গে ওখানেই পরিচয়। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে বিনয়কৃষ্ণ

পাল জেনেছিলেন ষাঁড় চরানোর জলাভূমি কেমন করে পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে রাধাকেষ্ট দেখেছেন বাবা অন্যসব মানুষজন থেকে কতখানি আলাদা। চারপাশের বন, সামান্য কিছু বাড়িঘর, বহমান ছোটখাল, ঝিঁ ঝিঁর-স্বব, শেয়ালেব ডাক, ঝাড় লন্ঠন — এসবের ভেতর বসে বাবা চার মাসের পুরনো নিউ স্টেটসম্যান পড়তেন। যাদুর মাকে চিনতে পারেন রাধাকেষ্ট পাল। ছেলেটি যে যাদুর ভাই তাও বুঝতে পাবেন। যাদুর মায়ের কোন কথা শোনার আগেই ভাদুকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন —

দ্য ক্যাকলিং অব গিজ সেভড বোম।

সাবজেক্ট কোন্‌টি ?

মিস কিটি ওয়াজ রুড এ্যাট দ্য টেবিল ওয়ান ডে।

প্রেডিকেট ?

উই ক্যাননট পাম্প দ্য ওসেন ড্রাই।

প্রেডিকেট ?

লিটল স্ট্রোকস ফেল গ্রেট ওক্‌স।

প্যাসিভ ?

মেন মাস্ট ওয়ার্ক এণ্ড উযেমেন মাস্ট উইপ।

পাস্ট ফর্ম অব উইপ ?

উত্তরে খুশি রাধাকেষ্ট পাল। হাতের বেতটা ভাদুর মাযের দিকে তুলে বলেন — যাদুর মতো এরও ফুল ফ্রি। যাদু ইঞ্জিনিযারিং পড়ছে, একে ডাক্তাব হতে হবে। স্কলারশিপ এক টাকা। হি ইজ আ ল্যাড আব গ্রেট প্রমিস। ইজ লাইফ ওয়ার্থ লিভিং ? ইট ডিপেণ্ডস আপন দ্য লিভার। রোজ আদসের করে দুধ দিতে হবে। সঙ্গে আধ ছটাক ঘি।

যাদু শিবপুরে। ভাদু দাদাব মত সকালে চান সেবে বেরিয়ে পড়ে। পরনে ধুতি, হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে নামাবলী। নদী পেরিযে পুজো সাবতে সারতে যায়। পাঁচ গাঁ পেবিযে গোবিন্দপুরেব চক্রবর্তীদের বাড়ি। ওখানে ভাত ভোগ সেবে পোশাক বদলায়। চক্রবর্তীদেব বাড়িতে খেযে স্কুলে যায়। ফেবত পথে ওখানেই পোশাক খুলে ঠাকুরের সন্ধ্যাবতি দেয়। সকালের চাল-আলু আব রাতের মুড়কি-বাতাসা নিয়ে মেঠো পথে হাঁটে। এক গাঁযে সন্ধ্যাবতি সেবে পরেব গাঁযে ঢোকে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে-রাত গড়িয়ে যায়।

পিসেমশাই জমির ধান বছর চারেক ছেড়ে দিয়েছিলেন। পবে আধা ভাগ নিতেন। যাদু ইঞ্জিনিযারিং কলেজে ভর্তি হওযার পব পিসেমশাইয়ের বড ছেলে আসে। জমিতে ধান আলু বড় কম হচ্ছে। ঠিক সময়ে সেচ হচ্ছে না। লাঙল পরছে না বাত ওঠাব মুখে। লোক ডেকে এনে চাষ করালে অমনই হয। গয়লা পাড়াব সুচাঁদকে চাষী ঠিক করে। মযনা হাতে পায়ে পর্যন্ত ধরে। বিযের জন্যে পনেব বিঘে জমি বেচা। সুখে থাকবো ভেবে জমিব মায়া ছেড়েছে মা। দেখ, কী সুখে আছি! জোড়া থান এনে মা-মেয়েতে পবি। ছেলে দুটি নিয়ে মায়ের অন্নে ভাগ বসাচ্ছি। আর ক'টা বছব সবুব কব। ছেলে দুটো একটু বড় হোক, ঘুঘুডাঙায চলে যাব। ততদিনে বড় ভাইটি আমার রোজগেবে হবে। পাবলে দেনা মিটিয়ে জমি ফেরত কবে নেবে। না পারলে তোমাদের জমি তোমবা যা খুশি কোবো। অন্যকে ভাগে দিতে চাও, দিও। বেচতে চাও বেচো।

পিসেমশাইয়ের ছেলে ক্লাশ সেভেন-এ তিনবাব ফেল কবে পিতল-কাঁসাব ব্যবসা করছে। হিসেব বোঝে। হয় চাষী হও, নয কামার। লোকের চাষেব ধানে ভাত খাবে, পড়বে ইঞ্জিনিয়ারিং — হয় না।

নিরর্থক ছয আব চার বছরেব ছেলে দুটোব পিঠে ঘা বসায মযনা। ঐ পনের বিঘের দায় তাদেরও। ও দুটোব জন্যে যত চিন্তাভাবনা। নইলে ঝি খেটে খেতো অন্যের ঘরে। ছেলে

দুটোর পর রাগটা গিয়ে পড়ে নিজের ওপর। দেয়ালে মাথা ঠোকে। কপালটা ফুলে ওঠে বেশ খানিক। বদরক্তের কালো ছোপ পড়ে। মা শুকনো সান্ত্বনা দেয় – আমাদের জুটলে তোদেব ভাত জুটবে।

ভাত জোটে। ছটি প্রাণীবই মুখে ভাত ওঠে। কোনদিন সময়ে, কোনদিন অসময়ে। কোনদিন সেদ্ধ কোনদিন আতপ। দেবদেবীকে কেউ অন্নভোগ দেয়। সে ভোগ বাড়ি আনতে পারে না ভাদু। তবু সেই সব পুজো ভাদু করে। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধে চাল মেলে, দান মেলে। যাদের ভক্তি ভাব কম তারা আতপ দেয়, কেউ বা সেদ্ধ চাল। আতপে ভাদুর মায়ের সুবিধে। ফেন ফেলতে হয় না। সাড়ে তিনসের চালে ছ'জনাব দুবেলা হয়ে যায়।

ভাদুর মায়েব হিসেবে কখনো কখনো গোলমাল হযে যায় – নদীর জল ফুলে উঠলে, আটপুরুষের কাবো সংসারে জন্ম-মৃত্যু ঘটলে, বোশেখেব ঝড়ে নদী কাঁথিব গাছপালা প্রলয় নাচন শুরু কবলে। তখন নিরুপায় ভাদুব মা গয়লাপাড়া কামারপাড়ায় চাল ধাব চাইতে যায়। মাসের পয়লা, সংক্রান্তি আব লক্ষ্মীবাবে ধাব মেলে না।

সন্ধে নামে। মাধো আর ময়নার দু-ছেলে ভানু-কানু রান্নাচালে গিয়ে বসে। উনোনের গায়ে কাঠেব পাহাড়। আর খানিক পবে ভাদু ফিববে। তখন উনোন জ্বলবে। ভাত চড়বে। ভাত ফুটবে। ভাত নামবে।

কোনো কোনো দিন ফিরতে দেরি হয় ভাদুব। বৃষ্টি নামলে, ঝড় উঠলে, নদীতে জল বাড়লে। তখন গাঁ-মুখো মানুষেব অপেক্ষায় নদী তীরে বসে থাকতে হয়। সে সব দিনে মাধো আর ভানু-কানুর সময় কাটে ভবিষ্যতেব পবিকল্পনায়।

বড় হয়ে ভানু চলে যাবে কলকাতায়। মিষ্টি দোকানে কাজ নেবে। রসগোল্লা তৈবি করবে। তৈরি করতে কবতে চাবপাশ দেখে নেবে। যেই মালিক মুখ ঘোরাবে অমনি মুখে পুবে নেবে দুটো।

– এখানে আব আসবি নি ? মাধোব চোখে উৎকণ্ঠা।

– আসব। ছুটি পেলে। তোদেব সবাব জন্যে বসগোল্লা আনবো।

– দাদাব সঙ্গে আমিও কলকাতা যাব। কানু বলে। সিঙাড়া খাব। চপ খাব।

– কলকাতাতে থেকে যাবি ? মাধো অবাক।

– আসবো। আসাব সময চপ-সিঙাড়া আনবো। তুই খাবি, মেজমামা খাবে, দিদিমা খাবে।

– তুই কী করবি ? ভানু প্রশ্ন কবে মাধোকে।

মাধো চুপ। ভানু-কানু কলকাতায ছিল। তাবা দেখেছে অনেক কিছু। সহজেই কী কববে বলে দিতে পাবে। মাধো ঠিক করে উঠতে পাবে না কী কববে বড় হয়ে। গরু চরাতে পাবে। পুজো কবতে পাবে। চাষ কবতে পাবে। গযলাদেব মতো ভিন গাঁযে দুধ দিযে আসতে পাবে। কামাবদেব মতো মেলায় মেলায হাতা খুন্তি বিক্রি কবতে যেতে পাবে। কিন্তু কোনোটাই ভানু-কানুব বসগোল্লার কিংবা চপেব মতো লোভনীয় হযে ওঠে না। অনেক ভেবে চিন্তে মাধো বলে – খেজুর গাছে বস দুবো।

– সে তো শুধু শীতকালে। তাবপব ? ভানুব প্রশ্ন।

– তাবপর আম পাকবে।

– তারপব ?

– বানে মাছ উঠবে। আড় মাছ খাবো।

– তাবপব ?

– গযলাদেব মতোন দু-তলা পাকা ঘব করবো। বন্দুক দিয়ে পাখি মেরে বিদু গযলাদেব

মতোন ছাতে ফিস্টি করবো ।

ভানু-কানুব রসগোল্লা-সিঙাড়া পানসে হয়ে যায় । মাধোব বালিহাঁসের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভানু-কানু ।

পাঁচ

বর্ধমানের ডাক্তার সামন্ত বললেন – আপনি তো রত্নগর্ভা । বড়ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, মেজছেলে ডাক্তার ছোটছেলে এ্যাসিটেন্ট হেডমাস্টার ।

– অনেক কষ্টে মানুষ করেছি বাবা । তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে করেকম্মে খাচ্ছে ।

– তা হলে আর অত কষ্ট কবেন কেন ? ভাদুব সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। বলল আপনি এখনো গরু ছেড়ে নদীর মানাতে বসে থাকেন ।

– সে কি আব পারি বাবা ! বাগালটা না এলে যাই । তাও মাধো দেখলে মুখ করে।

– সে তো কববেই । প্রেসার হাই । এ্যানিমিযা আছে । বেস্ট নিন ।

– কী কবে বসে থাকি বল ! ছোট বৌযেব শবীরে তো কিছু নাই । বড় রুগনো। লাতা বাসনমাজা যতটা পাবি কবি ।

- নবীনগঞ্জে থাকলে আপনার রোগ সারবে না । হয যাদুদাব কাছে বম্বেতে গিযে থাকুন, নয কলকাতায ভাদুব কাছে যান । এই ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাবেন । আমি পেসেন্টগুলো ছেড়ে দিই । আপনি ওপরে যান । মায়েব সঙ্গে কথা বলুন ।

মাসে এক-দুবার ডাক্তার সামন্তের কাছে চলে আসে যাদুব মা । খাল পেরিযে নদী ডিঙিয়ে তিন মাইল মাঠ ভেঙে বাস রাস্তায় ওঠে । বাসে চেপে বর্ধমানে নামে । রিক্সা ধবে ডাক্তার সামন্তের কাছে চেম্বাবে আসে । ভাদুর মেডিকেল কলেজের বন্ধু ছিল দীপেন সামন্ত। কলেজে পড়াব সময় বার তিনেক নবীনগঞ্জে গেছে । সেই সূত্র ধরে বুড়ি মাঝে মাঝে চলে আসে । নিজেব সুখদুঃখের কথা বলে । এক কথা বার বাব বলে । ছোট বৌ রেগে দুকথা বললে রাগের কথা শোনাতে আসে । ভাল কথা বললে খুশিব কথা বলে যায় । পেসেন্টের চাপ না থাকলে যতক্ষণ পাবেন শোনেন দীপেন ডাক্তাব । চাপ থাকলে ওপবে পাঠিয়ে দেন। কথায় ঠিকমতো কান না দিলে দু-মাস হযত আসবে না । বোগটা উপলক্ষ – কথা বলতে আসে যাদুব মা ।

ওপবে গিযে শুরু কবে – দীপু বলছিল যাদু-ভাদুব কাছে যেতে । গেসলুম । মন টিকে নি । যাদুব ঝিটা চটি পবে বাসন মাজে । বউকে বললুম । বললে ওখানে ওই বীতি । কী রীতি কে জানে বাবা । এই তো খালি প্যায়ে আমি কতদূব এলুম। পা কি ক্ষয়ে গেছে !

দীপুর মা বলেন – সে তো বটেই । বিদেশ বিভূঁযে আমাদেব পোষাবে না । বম্বে ফোম্বেতে তোমাব ঐ সিনেমা আর্টিস্টদেরই ভাল । আমাদেব কথা ওবা বোঝে না, ওদেব কথা আমরা বুঝি না ।

ভাদুর মা বসগোল্লাতে মাড়ির কামড় বসিযে বলে – ঠাকুব দেবতা নাই, শনি-মঙ্গলবাব নাই । যাদুকে বললুম – দেশে ফিবে চ বাবা । বর্ধমান জেলায় কি কাবখানা নাই !

– সত্যিই তো ।

– ছেলেটি পেটেব, বৌটি তো না । দেশলাই বাক্সের উপর দেশলাই বাক্স, তাতেই সুখ । আমি বললুম, বিটাব করেছিস । খামারে ঘর করবি চ । মাধো দু পাঁজা ইঁট পুড়িয়ে রেখেছে। নদীতে বালির পাহাড় । ক বস্তা সিমেন্ট আর লোহা আনিয়ে নিবি । ঘরেব চাল, ঘরের আনাজ – সুখ করে থাকবি ।

– কী বলল ?

দীপুব মা জিজ্ঞেস করেন ।

— বলল ছেলেটা চাকরিতে ঢুকলে ঘরে ফিরবে। বৌ বলে, আলো নাই পাখা নাই। হ্যাঁগো আমরা আছি তো, না কি ? সাঁওতাল পাড়ায় আলো এসেছে। মাঠের শ্যালোতে লাইন দিয়েছে। আর ক'টা থাম্বা গাড়লেই তো নবীনগঞ্জ। তখন পাখা, টিভি, ফ্রিজ — যা লাগাবে লাগাও।

— তা ঠিক।

—যাদু ইষ্টিশনে তুলতে এসেছিল। হাত দুটি ধরে বললুম, বাবা মরণ সময় দেখতে পাবনি তোকে ? তোর হাতের আগুন পাব নি ? যাদু সেই আগের মতো। কামারপাড়ার সবার খবর নেবে। গয়লাপাড়ার পিসি, খুড়ি, মেসো — সবার খবর। নদীমানার আঁকড় গাছ, তাল গাছ, খেঁজুর গাছটি অবদি। যাদুর মনটি আমার নবীনগঞ্জের ঘাটে-মাঠে পড়ে আছে। মাসে তিনটি চিঠি আসবেই।

কথা বলতে বলতে বেলা একটা। সামন্ত ডাক্তার ততক্ষণে চেম্বার সেরে চান-খাওয়া করতে আসেন। যাদুকে ছেড়ে ভাদুতে চলে যায় বুড়ি — কিছু বলেছে ? গাজনে আসবে ?

— তেমন কিছু বলেনি। বলছিল যেতে হবে একবার। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

দীপুব মা জিজ্ঞেস করে — গাজনে আসে ?

— আগে প্রত্যেক বছর আসত। এখন মাঝে মাঝে। গাজনে বড় টান ভাদুর। তখন সবে ডাক্তারি পাশ কবেছে। মিশন হাসপাতালের ডাক্তার। গাজনে ছুটি দেয়নি বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। তারা আবার বুঝিয়ে সুজিয়ে ধরে নিয়ে গেল।

— ঠাকুরই টেনে এনেছিল। দীপুর মা বলেন। ঠাকুর টানলে এবারও নিশ্চয় চলে আসবে।

একটু বিবক্তির স্বরে দীপু ডাক্তার মাকে বলেন ঠাকুর টানলেই চলে আসবে ? ভাদু এখন কলকাতার প্রথম পাঁচজন গাইনির একজন। রুগী দেখা অপারেশন সব মিলিয়ে মাসিক আয় প্রায় চার-পাঁচ লাখ টাকা।

— বাবা দীপু, তোমাব কথা ভাদু শুনবে। বর্ধমানে তোমার মতো চেম্বার করুক। ঘর ভাড়া করে থাকুক। মাধোর মতো রোববার রোববাব ঘরে আসবে। বিধবা মায়ের কষ্টেব ছেলে বাবা !

— ময়নাদিব ছেলের খবর কী ? — বুড়িকে ভাদুর প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে দিতে চান ডাক্তার।

— ময়নার আমাব আব এক দুঃখু। ছেলে মানুষ করল। সে ছেলে দেশান্তরী হল। ভানু মেম বিয়ে করেছে। অ্যামেরিকা কত দূর রে বাবা ?

— ময়নাদি যাযনি ?

— একবার গেছল। মাস ছয়েক ছিল। বড় শীত সে দেশে। মেয়েরা অবদি প্যান্ট কোট পরে। ময়না বলেছে, মা আমি তোমার কাছে থাকবো। মাঝে-মধ্যে এক-দু'মাস গিয়ে থেকে আসবো ভানুব কাছে।

দীপুর মা বলেন — ময়নার ছোটটি ছিল আমাব মেয়ের বয়সি। মুখটা বদলে যায় বুড়ির। বুকের ভেতব কিসের উঁথালপাথাল। বুড়ি বলে — ছ'টা মাস কানু ছিল আমাব কাছে। গরু ছেড়ে বসে থাকতো মানায়। মাঠে যেতো। বলতো, দিদিমা আমাব চাকরি ভাল লাগেনে। চাষ করবো। ঘুঘুডাঙায় বাড়িঘর বাগিযে চাষ ধরবে। আমি তো হেসে লুটোপুটি।

— কেন ? ডাক্তাব জিজ্ঞেস করেন।

— জন্ম থেকে কলকাতায়। বলে কিনা চাষ করবে। সাঁওতাল পাড়ায় যেতো। বলতো খাঁদুর ছেলের কাছে তীবকাঁড় ছোঁড়া শিখছে। জমি নিয়ে গয়লাদের সঙ্গে সাঁওতালদেব মাবামারি

লাগল। থানা-পুলিশ হল। ধরে নে গেল কানুকে। ফেরত দিল নি। ময়নার ঘরে ঠাকুর-দেবতার পাহাড়। কত মানুষ কতকাল পরে ফেরে। ঠাকুর মুখ তুলে চাইলে ঠিক ফিরবে।

— মায়ের মন। এ শোক ভুলবে কেমন করে? ডাক্তারের মা বলেন।

— আমিও সে দৃশ্য ভুলতে পারি নি গো। বলতো কলমে কাগজ নোংরা হয়, লাঙলে ফসল ফলে। আমায় বলেছিল কানু, ঘুঘুডাঙায় নবান্নে নে যাবে। নাত-বৌয়ের হাতে পিঠে-পুলি খাওয়াবে।

ঝিমিয়ে পড়ে বুড়ি। ডাক্তার ওঠেন। চেম্বারে বসার সময় হল। দীপুর মা হাত ধুতে ওঠে। বুড়ি আসন তুলে কলের সামনে যায়। এবার যেতে হবে। বেলা দুটোর ঘন্টি বাজলো।

ছয়

দুয়ারে হ্যারিকেনের আলোয় মাধো উচ্চ-মাধ্যমিকের খাতা দেখে। পরশু বর্ধমানে জমা দিতে হবে। মাধোর বড় ছেলে কার্তিক পটাশ সারেব বস্তাগুলোব জন্যে পাড়ন করে। কার্তিকের তিন বছরের ছেলেটা মায়েব বলা বাংলা শব্দেব ইংরেজি কবে। কার্তিকের মা রান্নাচালায দুধ জ্বাল দেয়।

বুড়ি তুলসীতলায় নামজপ কবে। সাবা মুখে দীর্ঘ সময়েব নানান চিহ্ন। নব্বই বছরেব চামড়া, সেমিজের মতো, শবীরের কাঠামোয় ঝুলে আছে। চোখজোড়াতে বর্ষার নদীর ঘোলাটে রং। বটের ঝুরির জড়ানো আকার মাথার চুলে। গ্রীষ্মের রোদ আর শীতের শুষ্কতা ছাপ রেখে গেছে বছরের পর বছর দুগালে, নাকের ডগে। নদীব বালি কুবে কুবে খেয়েছে আঙুলের ডগ, আঙুলের সংযোগস্থল। হাতের কনুই, পায়ের পাতাব বাইরের দুই গাঁট, হাতের আঙুলের আঠের গিরে গাঢ় খয়েরি। সব দায় মিটিয়ে দিযে দুই স্তন পরজীবি উদ্ভিদের মতো ভেসে আছে। ঠাকুরের জপের সমস্ত মন্ত্রগুলো আর মনে আসে না, দুটো শব্দের পরেই হোঁচট খায়। নাসিকা ধ্বনিতে শূন্যতা পূর্ণ করে আর চেনা শব্দে ফেরে বুড়ি। আবার নাকে ফিরে যেতে হয় পবেব শব্দের সন্ধানে। শেষে হতাশ হয়ে নিজের কথায় আসে। যাদুব প্যারালিসিস সারিয়ে দাও ঠাকুর। যাদুর বড় মেয়েব একটি ফল দাও। ভাদুকে বর্ধমানে ফিবিয়ে আনো। ভাদুর ছোট ছেলের চাকরি দাও। মাধোর হেডমাস্টার হওয়াব শখ। বেজোর ইস্কুলটিও কাছে। ছেলেগুলি সব আমার ঘবে ফিরুক। মাধোব বড় ছেলেটির চাষে মন নাই। ব্যবসা-ব্যবসা করছে। কার্তিকেব চাষে মন ফিরুক। মাধোর ছোটটি সমুদ্রে ভাসে। জাহাজে জাহাজে এদেশ ওদেশ। স্বপনকে দেখো ঠাকুর। ময়নার পেটে পাথব। গলিয়ে দিও।

পঞ্চা গয়লা সদর দরজায় হাঁক মারে — এসেছ নাকি মাস্টার?

— হ্যাঁ। ভেতরে আয়। মাধো উত্তর দেয়।

— গত হপ্তায় তো এলে নি?

— হেড এক্সামিনারের বাড়িতে খাতা জমা দেওয়ার ছিল। যেতে হলো।

কালীপুর স্কুলের এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার মাধো। দায়দায়িত্ব অনেক। অন্য কাজও আছে। প্রতি শনিবার আসতে পারে না। সরকাবী নিয়মে এখন ষাটে রিটায়ার্ড। সেই নিয়ে টিচারদের পি. এফ, পেনসন ইত্যাদি নানা হিসেব নিকেশ। কার্তিকের বিয়ের পর মাধো বৌকে নিয়ে গেছে কালীপুরে। হস্টেলের ভাত পেটে আটকাচ্ছে না। কার্তিকের বৌ রেখা সামলাচ্ছে নবীনগঞ্জের ঘরসংসার। একটাই ছেলে। মাধোর মা-ই সামলায় তাকে। সব সময় দেখতেও হয় না। গয়লাপাড়া কামারপাড়ায় নিজেই চলে যেতে পারে। চাষের কাজকর্মও আর তেমন নেই এখন। যতটুকু সংসারেব চালমুড়ির জন্য। তিরিশ টাকায় মজুর খাটিয়ে আর ইউরিয়া-পটাশের দাম মিটিয়ে লাভ নেই এখন। এর চেয়ে ব্যবসাতে বেশি লাভ। যাদুর ছোট ছেলে বোম্বেতে ভিডিও পার্লাব করে লালে লাল। ভাদুর মেজ ছেলে কমপিউটার ট্রেনিং দিয়ে মাসে

বিশ হাজার টাকা তুলে নিচ্ছে হাজরার ক্ষিরোদ ঘোষ বাজার থেকে। মেজ ছেলের বৌয়ের সোয়েটের টিপের ব্যবসা। শেয়ারের কাগজে আলমারি ভর্তি।

চায়ে চুমুক দিয়ে পঞ্চা বলে – শকুনির চোখ পড়েছে গো মাস্টার ? মুখ তোলে মাধো। বর্গা রেকর্ড ক্ষেতমজুর – আন্দোলন, পঞ্চায়েত ইলেকসন – নতুন কী, আবার ?

মাস্টার পিসিকে পুড়োতে গিয়ে হাতাহাতি।

পঞ্চার পিসির কথা হলে উঠে আসে বুড়ি। তার চেয়ে ন'বছরের ছোট ছিল। অকালে চলে গেল।

– কী হয়েছে রে পঞ্চু ? হ্যাঁরে পঞ্চু, হল কী ?

বুড়ি এগিয়ে আসে পঞ্চার মুখোমুখি।

– ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বলে গাছ কাটা চলবে নি।

মাধো মুখ নামিয়ে নেয়। অন্য কিছু ভেবেছিল সে।

বুড়ির মাথায় চিন্তা ঢোকে। দুয়ারের দিকে মুখ তুলে বলে – হ্যাঁরে মাধো, শুনলি ?

– শুনলুম। গবমেন্টের গাছ। না দিলে করব কী ?

– তোরা কি আমায় কবর দিবি ? পুড়োবি নে ? পুঁতে দিবি ?

হেসে ওঠে সবাই। পঞ্চা বলে – তোমার আর চিন্তা কী জ্যাঠাইমা ?

– কেনে ?

– চলে যাবে কলকাতায় ভাদুর কাছে। ছোট মেয়েটার জন্যে সম্বন্ধ করতে গেসলুম। আহা, কলকাতাতে মরেও সুখ গো।

– তাহলে মরার সময় কলকাতাতেও যেও কাকা।

কার্তিকের বৌ রেখা বলে।

– যা বলেছিস মা। এখানে মরলে বাঁশের চৌদলা। ওখানে পালিশ করা খাট। সে খাট গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে।

বুড়ি মুখ তোলে – যে যায় সে সুখেই যায়। যারা থাকে তাদেরই দুঃখু। ভবনদী ...

– নদীর কষ্ট সবার নাই। কেওড়াতলায় ভি-আই-পি-দের পিছনে বন্দুক দেগে দেয়। সোজা গিয়ে পড়ে স্বর্গে।

মাধো খাতাগুলো গুটিয়ে ফেলে। পঞ্চা সন্ধেটা এখানেই কাটাতে এসেছে। মাধো উঠোনে নেমে এসে বলে – কাঠ পেলি কোথায় ?

– কুড়োল নিয়ে তেড়ে গেলুম। পালিয়ে গেল। আমাদের নদী, আমাদের চর, তোরা শালা মাতব্বরি করবি।

বুড়ি বলে – পাঁচটা ডাল কাটলে মড়া পুড়ে ছাই। তার আবার ঝগড়া কিসের ?

– পাঁচটিতে হবে নি। পঞ্চা বলে। নতুন দালানটা ফেঁদেছি। ঠিকই করে রেখেছিলুম দরজার কাঠগুলো নদীমানা থেকে করবো।

– তাই বল। হাসে মাধো। মড়া পোড়ানোর ডাল কাটতে ওরা বারণ করেনি। তুই মড়া পোড়ানোর সঙ্গে দরজা-জানলার কাঠ জোগাড় করছিলি !

– মাস্টার, তোমার মতো বুদ্ধি তো আমার নাই। তুমি কতকাল আগে তিনখানা মাজা অর্জুন ঘর ঢুকিয়ে রেখেছো, তা ঘরটা ফাঁদবে কখন ?

– দাঁড়া। রিটায়ার করি।

– দক্ষিণ দুয়োরিটা ভেঙে করবে তো ?

— নারে বাবু। রিটায়ার করলে পেনসেন সম্বল। আরামবাগের জায়গাটাতে একটা দোতলা তুলবো ভাবছি। নিচের তলাতে কার্তিক ব্যবসা করবে। দোতলাতে আমি টিউসনি করব। ছ-কুঠরি করলে কাজ-থাকা সবই হবে।

— জ্যাঠাইমা, তুমি আরামবাগে না এখানে থাকবে গো ?

বুড়ি কার্তিকের ছেলে টুম্পুর মুখে মধু দেয়। গত রাতে খুব কেশেছে। মাধো পঞ্চার কথায় কান ছিল না বুড়ির। মুখ তুলে বলে — কী ?

— বলি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ?

— যাওয়ার জন্যে বসে আছি রে বাপ। ডাকলেই চলে যাবো।

রেখা বলে — ঠাকুমার কানে কিচ্ছু ঢোকেনি। কোথায় যাবার কথা হচ্ছে বল দিকি ?

বুড়ির চোখ দুটো ভেসে ওঠে। শরীর থেকে বেরিয়ে কার্পাস তুলোর মতো উড়তে থাকে। বাতাসে দোল খেতে খেতে তালগাছের মাথা ছাড়ায়। নিচে পড়ে থাকে নবীনগঞ্জের ক্ষেত-খামার, বালির চর, নদীর জল, ঘর-সংসার, কাশের বন, আম-কাঁঠাল-অর্জুন-আমলকির জঙ্গল। শাশুড়ি বসে আছে পা ছড়িয়ে। আয় মা, কতদিন তোকে দেখিনি। দাঁড়িয়ে আছে যাদুর বাপ, এই নে তোর সবুজ রংয়ের বেনারসী। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে জামাই। ভাদুর বড় ছেলেটা আঠার বছর বয়েসে ডুবে গিয়েছিল দীঘার সমুদ্রে। সে 'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' বলে ছুটে আসে। ময়নার ছোট ছেলে কানু আমড়াগাছের ওপর বসে আছে। সেই আগের একগাল দাড়ি। দিদিমাকে দেখে হুমড়ি খেয়ে ছুটে আসে। ঘুঘুডাঙায় নাত-বৌয়ের হাতে পিঠে খাওয়াতে পারিনি। দেখ, এই তোমার নাত-বৌ। দিদিমা আনন্দে আটখানা। যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনি। বুক-হাঁড়ি পাছা-ভাবি মেয়ে। চিবুক ধরে আদর করে বলে — শত ছেলের জননী হও মা। সংসারের মুখে বোল ফোটাও।

— তুমি বাবা-মায়েব সঙ্গে আরামবাগে গিয়ে থাকবে ? রেখা জিজ্ঞেস করে।

— কোন দুঃখে ?

টুম্পুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বুড়ি।

সাত

বুড়ির একশ বছর হলো। টেলিগ্রাম এসেছে বম্বে থেকে। বুড়ি কেঁদে হাপসে মরে। যাদু বলেছিল নবীনগঞ্জে পাকা দালান করবে। যাদুব ইঁটপাজাটা মাধো গাড়িতে চাপিয়ে আরামবাগ নিয়ে চলে গেল। যাদু বলেছিল বাপের বেচা সব জমি আবার ফেরত করে আনবে। মাধো জমি বেচে দেয়। যাদু গয়লাপাড়া কামারপাড়ার মানুষজনের খোঁজ নিতো ফি হপ্তাব চিঠিতে। মাধো এখন মাসে একবার আসার সময় পায় না। যাদু, অকালে বিছানা নিল। যাদু আর বিছানা ছাড়ল নি। যাদু মরে গেল।

চিঠি লিখেছে কলকাতা থেকে ভাদুর নাতি। তাকে যেতে লিখেছে। কী হবে গিয়ে ? লোকে বলে তোমার বেটার একশ টাকা ভিজিট। কী আছে কাগজের টাকায় ? একশ গরু কিনবে বলেছিল ভাদু। বলেছিল নদীমানা জুড়ে একশ গরু হামলে বেড়াবে। টাকা হামলায় ? টাকা দুধ দেয় ? গাঁয়ের গাজনে কামারপাড়া গয়লাপাড়ার ঘর সংসারে হৈ হৈ। পুকুবে মাছ ধরায়, ছাগল কাটে। রোজ আধ ছটাক ঘিয়েব কথা বলেছিল রাধাকেষ্ট পাল। মাথাব কাজে ঘি দিতে হয়। কত আধ ছটাক ঘি হরলিক্সেব শিশিতে শিশিতে পঁচে গেল। বিয়ের আগে পর্যন্ত মাসে মাসে আসত। দুধ খেত, ঘি খেত। বিয়ের পর দু-তিন মাসে বাদে বাদে আসত। নিয়ে যেতো ঘরের ঘি। মা বেঁধে দিত চাষের চাল, জমিব রাই সর্ষে, গাছেব পেঁপে, লাউয়েব কচি কচি ডগা। এখন বছবে একবারও আসে না। নার্সিং হোম থেকে ছুটি পাওয়া মুশকিল। ঘি করা বন্ধ করে দিয়েছে বুড়ি।

চিঠি পাঠিয়েছে কার্তিকের ছেলে টুম্পু। ছেলেটাকে কোল থেকে কেড়ে নিল মাধো

আর কার্তিক মিলে। মানুষ হবে না। তোরা মানুষ হলি কী করে ? ছেলেটাকে পুরুলিয়া মিশনে ভর্তি করে দিয়েছে। তেমন মা। একটু কাঁদল নে। ছেলেটা বাপের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। মুখ লুকিয়েছিল বড় ঠাকুমার বুকে। যেমন মা তেমন ঠাকুমা। কোল থেকে ছাড়িয়ে নিল দু'জনাতে।

কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল ছেলেটা।

খেজুর গাছের নিচে পাকা খেজুর পড়ে, পঁচে, শুকোয। গাছের পেঁপে কাকে ঠোকরায়। পেয়ারা পেকে পড়ে যায় গাছ থেকে। কাঁচা আম পেড়ে খাওয়ার মানুষ নেই। দুধ দোওয়ার সময় মাছি তাড়ানোর ছেলে নেই। মোষের বাছুর ঘোরে। সাত দিনের বকনা ছুটে বেড়ায়। রান্নাচালায় বেড়াল বাচ্চাগুলো ঘুরঘুর করে। কুঁচো নেংটি ইঁদুরগুলো চালের বস্তার ওপর নেচে বেড়ায়। খড়ের গাদায় মেটেলি সাপের বাচ্চাতে পাহাড়। ওলগাছের গোড়ায় বেঙাচির ঘরগেরস্তি। বাচ্চাগুলো লেজ নাড়ে। সব আছে। সবাই আছে। টুম্পুকে নিয়ে চলে গেল ওরা। নবীনগঞ্জে ছেলে মানুষ হয় না। যাদু-ভাদুর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে মাধোর নাতিকে দাঁড়িপাল্লায় চাপানো হবে। দেখবে কার কতো ওজন।

ছড়িয়ে যাওয়া ঘব-সংসারকে কেমন করে জুড়বে বুড়ি ? কখনো হারিয়ে যাওয়া মানুষজন মনের ভেতব ভিড় জমায়। ছড়িয়ে যাওয়া আর হারিয়ে যাওয়া মানুষজনেব মাঝে শূন্যে ঝোলে বুড়ি। গুলিয়ে যায় সব কিছুই। পঞ্চার মৃত পিসির খোঁজে রাতদুপুরে গয়লাপাড়ায় ছোটে। গোয়ালের গায়ের পোয়াল-ছাতু তুলে নদী পেবিয়ে চক্রবর্তীদের ঘরে দিতে যায। স্কুল-ফেরত ছেলেব কাছে বটকৃষ্ণ পালের ঘোড়ার খবর নেয়। পাকমারা মেয়েব কাছ থেকে নেওয়া পাথর কার্তিকের বালিশের ভেতর ফুটো কবে ঢুকিয়ে দেয়। এই পাথবে কার্তিকেব পায়ে শেকড় গজাবে!

আবার কখনো মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায। তখন পঞ্চার ঘবে গিয়ে সে কখন মেয়েব ঘরে যাবে তার খবর নেয় ? পঞ্চা বোঝায এই শরীরে বাস-ট্রেনের ধকল সইবে না। তাব চেয়ে ভাদুকে চিঠি লিখুক। কিন্তু শুধু ভাদুতে আশ মিটবে না বুড়িব। নাতি, নাত-বৌ, নাতনি, নাতজামাই সবাইকে দেখতে চায বুড়ি। চিঠি লিখলে সবাই মিলে তো আসবে না। নিরুপায় পঞ্চা বুড়িকে মেয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। এখন আশ্বিন। ছ-আট মাস পরেই আসবে মীনা। ছেলেব গবমের ছুটি পড়লে দিন পনেব এসে থাকবে। ওদেব সঙ্গে চলে যাবে। মীনাব সংসারও দেখা হবে, ভাদুদাব ঘরেও থেকে আসবে ক'মাস।

খুশি হয় বুড়ি। পঞ্চাব বৌকে ভাত চড়াতে বলে। পঞ্চার বৌ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পঞ্চা চোখ টেপে। তারকারি বসায়। কার্তিকের বৌকে খবব পাঠিয়ে ভাত আনিয়ে নেবে।

– পঞ্চা, আর আসবি নে তোদের নবীনগঞ্জে।

– কেন গো ?

– নদী সরে গেছে দক্ষিণে। মানাটা নেড়া করে দিয়েছে। মরলে পুড়োবার কাঠ জুটবে নে! তোরা আমায় না পুড়িয়ে কবর দিয়ে দিবি।

– সে কি হয় নাকি গো জেঠিমা ? পঞ্চা হাসে। তোমার চৌদলে আমি কাঁধ দুবো। তোমাকে আপন জ্যাঠাইমা ভিন্ন ভাবিনি কোনোদিন।

– তুই নে যাবি ?

– এই পায়ে হাত দিয়ে বলছি। বুড়ির পা-দুটো জড়িয়ে ধরে পঞ্চা।

– কাঁদবি ?

– বুক চাপড়ে কাঁদবো।

– ভদু, মাধোকে খবর দিবি ? ওদের সবাই আসবে ?

– নদীর চরে লোকে থিকথিক করবে।

– ময়নাকে খবর দিবি ? ও তো ভানুব কাছে। অতদূর থেকে আসবে ?

— নিশ্চয় । শেষ দেখা দেখে যাবে নি ?

ময়নার মারা যাওয়ার খবর দেয় নি বুড়িকে । দশ বছর আগে গত হয়েছে ময়না। বুড়ি জানে উড়োজাহাজের টিকিট মিলছে না ।

ভাত খেয়ে চলে যায় বুড়ি । ঘরে ফিরে কুমড়োর বিচ ছাড়ায় । টিফিনের ভেতর কার্পাস তুলো ভরে । ময়না বলেছিল ওদেশের বালিশ ভালো না । মাথা বসে যায় । ঘাড় ধরে । মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে এলে বালিশ করে দেবে কে ? বালিশগুলো সাঙাতে ঝুলিয়ে রাখবে । কার্তিককে বলে রাখবে মনে করে দিয়ে দিতে ।

কার্তিকের ভাই স্বপনের চিঠি এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে । চিঠি নিয়ে কামারপাড়ায় যায় বুড়ি । স্বপনের জাহাজ ফিরছে । বম্বে আসবে । বম্বেতে জেঠাইমার ঘরে তিনদিন থাকবে । তারপর উড়োজাহাজে কলকাতা । কলকাতাতে মেজজেঠার ওখানে কদিন কাটাবে । সেখানে থেকে আরামবাগ । আরামবাগ থেকে গাঁয়ে ফিরবে স্বপন । স্বপন পুরো বছরটা কাটাবে নবীনগঞ্জে। বুড়ি বলে স্বপন যখন জাহাজে ফিরবে ওর সঙ্গে চলে যাবে । বাসে করে আরামবাগ । মাধোর ওখানে কদিন কাটিয়ে কলকাতা । কলকাতা থেকে বম্বে । বম্বে থেকে স্বপনের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ময়নার কাছে । বালিশগুলোর ওয়াড় করা শুধু বাকি । কামারপাড়ার তিনু কবে আরামবাগ যাবে সে খবর নিতে গেছে বুড়ি ।

আজই গেছল তিনু । মাধোর সঙ্গে দেখা হয়নি । সে হাতির খবর দেয়, হাতি বেরিয়েছে । হাতির পাল । নদী ধরে ধরে আসছে । বিহার থেকে পুরুলিয়া হয়ে মেদিনীপুরে ঢুকেছিল । সেখান থেকে বাঁকুড়া । বাঁকুড়ার জঙ্গল পেরিয়ে হুগলীতে ঢুকেছে । এবার বর্ধমান জেলায় এল বলে । জঙ্গল দেখলেই ঢুকে যাচ্ছে । পঁয়ত্রিশটা হাতির বিশাল এক পাল ।

কপাল চাপড়ায় বুড়ি । পাঁচ সের ধান দিলে হাতির পিঠে চাপাবে বলেছিল মাহুত । পাঁচ সের ধানের চালে একদিন সংসার চলে যাবে । মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিল যাদু । এতো হাতি দোরগোড়ায় বেড়াতে আসে । যাদু নেই ।

দিন-কানা পেঁচা টুসিগাছের ডালে ডেকে চলে । রাত-কানা মানুষ ঘুমোয় ।

বুড়ি ওঠে । যাদুর বাবা নেশা করে এস দরজায় ধাক্কা দেয় । দবজায় চাবি খুলে বাইরে আসে বুড়ি । কেউ নেই । ফিরে গিয়ে শোয় । চোখ দুটো জুড়ে যায় । ডাক শোনে বুড়ি । ময়না ডাকছে । বোশেখের ঝড়ে আমের ডাল ভেঙে পড়ে । এত আম ধবে না আঁচলে, ডালা নিয়ে বেরোয় বুড়ি । ময়না নেই । ঘরে ফেরে বুড়ি । হেমন্তের তরল শীত গায়ে সুড়সুড়ি দেয়। বুড়ি পায়ের নিচে থেকে চাদরটা টেনে গায়ে নেয় । কেটে যায় বেশ খানিক । এবার স্পষ্ট শোনে বুড়ি । যাদু ডাকছে । যাদু ডাকছে । বাইরে আসে । গোয়ালটা ডাইনে ফেলে ছানিঘরের কাছে আসে । বাঁদিকে ছানিঘরটা রেখে ল্যাংড়া আম গাছের নিচে । আর খানিক এগিয়ে পালুইয়ের গা দিয়ে তালগাছের গোড়ায় । হাঁড়ি তালগাছটা পেরিয়ে নদীমানাতে নামে । শরবনের মাথা নড়ে । অঘ্রাণের হাওয়া শিষ দিয়ে যায় । তার বয়সী আসুদ গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায় বুড়ি। নদীমানাতে গরু নেই । দুদিকের জঙ্গলকে ডাঁয়ে-বাঁয়ে ফেলে বুড়ি এগোয় । মাটির পথ ফুরিয়ে যায় । এখন শুধুই বালি । আকাশের চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের লুকোচুরি । বুড়ি বালির পথ ভেঙ্গে এগোয়ে । চলতে চলতে নদীর তীরে আসে । দূরে কাঁথি ভেঙে চলে শাশুড়ি । জগন্নাথ দর্শন করবে । চাঁদের মুখের ওপর মেঘ পড়ে, মেঘ সরে । সেই আলো-ছায়ার ভগবান পাণ্ডার সঙ্গে চলে যায় শাশুড়ি ।

চাঁদ ডুবে যায় মেঘের কোলে । মেঘে জল জমে । চাঁদ-বুড়ির চরকার সুতো শুকোয় না । বুড়ি মেঘ নিকড়োয় । জল ঝরে । জল গড়ায় । জলের স্রোত বয় । নদীতে বান আসে। কী করে ফিরবে ভাদু ? খেয়ার ঘাটের পয়সা দেবে না । বড় একরোখা । বুড়ি বসে থাকে কেওড়া-গাছের নিচে । লণ্ঠনের আলো পড়বে নদীর ওপরে । গামছার চাল গলায় ঝুলিয়ে ভাদু

ঘাটে নামবে। বইয়ের পুঁটলিটা তুলবে মাথায়। মা সাবধান করবে - বাঁয়ে গর্ত। ডাইনে আয়। গামছার গিঁটটা ভাল করে দে। লন্ঠনটা সোজা কর। দেখ তেল পড়ছে নাকি। পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো হালকা দিস নি। অ-মানুঠাকুরপো! ভাদুকে দেখলে? আসছে? গয়লাপাড়ার কেষ্টর সঙ্গে?

ঘরমুখে ফেরে বুড়ি। মানা জুড়ে গরু। ভাদু গরু কিনেছে। একশো গরু। দোতলা গোয়াল করবে ভাদু। ওপরে খড়, নিচে গরু। দুধ বেচে শোধ করে দেবে পিসেমশাইয়েব টাকা। জমি ফেরত।

কত গরু! ভাদুর একশো গরু। ডাক শুনে ভয়ে বসে পড়ে বুড়ি। গরু নয়, হাতি। মড়মড় করে ডাল ভাঙে। হাতির ডাকে জেগে ওঠে তিন পাড়া। শাঁখ বাজায়। টিন পেটায়। পেঁচা ডাল ছেড়ে উড়ে যায়। নদীমানার পাখিরা ডাক দেয়। গোয়ালের গরু ডাক পাড়ে। ছাগল ভেবায়। মুবগী ডাকে। হাঁস প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে।

দুপুর বেলায় সাঁওতালপাড়ার নতুন পোলের ওপর দিয়ে ফায়ার ব্রিগেড আসে আরামবাগ থেকে। বর্ধমান থেকে পুলিশ আসে এক ভ্যান। আবামবাগ থেকে আর এক গাড়ি। নদীর মানাতে আশ্রয় নিয়েছে হাতির পাল। গাছে ডাল ভেঙে পাতা খায়। নদীতে চান সারে। জল খায়। জল ছড়ায়। গাঁয়ের লোক গরু ছাড়ে না। গাঁয়ের লোক ছেলে ছাড়ে না।

চারপাশের গাঁয়ে খবর যায়। সাইকেলে চেপে নৈশরাই বুলচাঁদ থেকে ছেলেরা আসে। আরামবাগ থেকে রাজদূত আসে। বর্ধমান থেকে হিরো হণ্ডা আসে। হাফপ্যান্ট পবা বুড়ো লোক দেখে নবীনগঞ্জ। ফুলপ্যান্ট পবা ছুকরি দেখে নবীনগঞ্জ। আবামবাগ-বর্ধমান টাউনের যুবক-যুবতীবা হাতি দেখে। নবীনগঞ্জ আর চাবপাশের গাঁয়েব মানুষ আরামবাগ আর বর্ধমানের ছোকরা-ছুকবিদের দেখে। নবীনগঞ্জেব নদীমানায এ দৃশ্য বিরল। এ দৃশ্য আগে দেখেনি মানুষ, এ দৃশ্য পরে দেখতে পাবে না।

বুড়ি সব দেখে। বুড়ি সব গেলে। বুড়ির বড় ভাল লাগে বর্ধমানের জিনস-গেঞ্জি মেয়েটিকে। ঠিক যাদুব লাতিনটিব মতো। ডান হাত দিয়ে চিবুক ছোঁয় বুড়ি। মেয়েটি হাসে —কী আশীর্বাদ করলে ঠাকুমা? বুড়ি হাসে—বেঁচে থাক মা। সুখে থাক। গোঁফ ঝোলানো ছেলেটাব কাছে যায় বুড়ি। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—আহা, তোমাব বয়সে আমার মাধো দেখতে ঠিক এমনটি ছিল। হঠাৎ ক্ষেপে যায় বুড়ি। একজন পুলিসকে সামনে পেয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে টানতে যায়। এক ঝটকায় সরিয়ে দেয় সে। গাঁয়ের লোক ছুটে আসে। তেড়ে যায় পুলিশটাকে। অন্যরা এসে সামলায়। বুড়ি চেঁচিয়ে যাচ্ছে তালগাছে কাটাগোড়ায় হাত রেখে —নে গেলি, ফেবত দে। এই মানা থেকে নে গেসলি কানুকে। ফেবত দে।

পাকা আড়াইটে দিন হাতির পাল কাটিয়ে দেয় মানাতে। পুরনো মানুষ চলে যায়। নতুন মানুষ চলে যায়। নতুন মানুষ আসে। তারা নতুন কবে পালে হাতির সংখ্যা গোনে। হাতির আকার আর চেহারা দেখে প্রজন্ম নির্ধাবণ করে। বয়সের হিসেব কবে। মা-হাতি-অর্জুনের ডাল ভেঙে আনে ছেলের জন্য। নাতি-হাতি ঠাকুমা-হাতিব গা চাটে। চানে যায় হাতির পাল। ফিরে আসে। ছড়িয়ে যায় কেউ কেউ। আবার ফিরে আসে দলে।

মানুষ আসে, মানুষ যায়। বুড়িব নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। কার্তিক কোনোবকমে টেনে নিয়ে যায় দুপুরে। খেয়েই ফিরে আসে বুড়ি। বুড়ি হাতির পাল দেখে, বুড়ি মানুষের ঢল দেখে।

রাতনামে। ফিরে যায় অন্য গাঁয়ের মানুষ। রাত বাড়ে। ঘরে ফেরে গাঁয়েব মানুষ। রেখা ফিরিয়ে আনে বুড়িকে। খাইয়ে শুইয়ে দেয়।

মাঝরাতে উঠে পড়ে বুড়ি। তক্তপোশের নিচে থেকে কাস্তে বার করে। পুকুরের পাড়ে ওঠে। একটা কচি কলাগাছ কাটে। কাপড়টা কোমর জড়িয়ে কলাগাছটা কাঁকালে তুলতে চেষ্টা

করে। পড়ে যায়। উঠে দাঁড়ায়। তিনবারের চেষ্টায় তোলে। বাঁশের ঝাড় শরের বন পেরিয়ে এগিয়ে চলে বুড়ি।

ফিরে যাবে হাতির পাল। উঠে দাঁড়িয়েছে। সুখের সংসার নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে চলার পথে এখানে ওখানে দু-চারদিন কাটিয়ে আবার চার পায়ে এগিয়ে যাবে।

হাতির পায়ে পায়ে হাঁটবে বুড়ি। নদীর কাঁথি বেয়ে নেয়ে আসবে শাশুড়ি। ফেরত স্রোতে ঘরে ফিরবে যাদুর বাবা। হাতে নীল বেনারসী। চলার পথে মাধোর সঙ্গে দেখা হবে আরামবাগে। মাধো আর মাধোর বৌ সঙ্গে যাবে। তারপর ভাদুর বাড়ি। ভাদু, ভাদুর বৌ, তিন ছেলে, তাদের বৌ, নাতিনাতনি এসে জুটবে। সেখান থেকে যাদুর সংসার। যাদুর বাড়ি হয়ে স্বপনের কাছে। স্বপন থেকে অ্যামেরিকায় ময়নার ঘর। ময়নার ঘর থেকে পুরুলিয়া মিশন। ঘুঘুভাঙা। সেখান থেকে কানুকে নিয়ে আবার নবীনগঞ্জ। চারপাশে ছড়ানো থাকবে জমি। জমির বুকে হেমন্তের ধান দুধ-বুকে দোল খাবে। ভাদুর গরু চরবে পথের দু-পাশে। ভগবান পাণ্ডার পিছন পিছন জগন্নাথ দর্শনে যাবে শ্রীনাথ চক্রবর্তীর সমগ্র পরিবার।

বুড়ির বগলে কলাগাছ। বুড়ির সামনে চতুর্থ প্রজন্মের হাতির ছানা।

রবিশংকর বল

দারুনিরঞ্জন

‘এ এক অদ্ভুত শতক, দেখ না একজনকে একজনেব বলতে হয়, তাঁকে বিশ্বাস করো’

এখানে গোলাপ ফোটে। গোলাপ বাগিচায়। প্রতিদিন কিছু গোলাপেব ফুটে ওঠা এবং কিছু গোলাপের ঝরে যাওয়া দেখে মণিময়। গোলাপের মুখোমুখি, এই শৈলাবাসে, শুরু হয়েছে তার আয়না-জীবন, যেখানে সময় শুধু জড়ো করে ধ্বংস স্তূপ—চামড়া কুচকে যায়, চুলে লাগায় রুপোলি প্রলেপ, শ্রবণ রুদ্ধ হয়, ঝাপসা হয় দৃষ্টি, ঘ্রাণ অবলুপ্ত। বস্তুতপক্ষে এই শৈলাবাস ও বাগিচার গোলাপগুলি তাকে জানিয়েছে, আয়নার মধ্য দিয়ে কীভাবে দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় যা একদা কক্‌তোর দৃশ্যকাব্যে দেখা গিয়েছিল। এর আগে আর পাঁচটা মানুষের মত আয়নার ব্যবহার জানত না মণিময় অর্থাৎ আয়নার সামনে সে দাঁড়াতো নিজেকে দেখবার জন্য, অর্থাৎ হারিয়ে যাবাব জন্য আয়নার ব্যবহার সে শেখেনি। কেননা আয়না যখন নিজেকে অদৃশ্য কবে তখনই এমন অলৌকিকতা জন্ম নেয়। আর তা এইরকম শৈলাবাসে, গোলাপ বাগিচার পাশেই সম্ভব।

গোলাপ বাগিচায় মণিময় রোজ কিশোরটিকেও দেখে, বয়স দশ-এগারর বেশি নয়। জন্মরুগ্নতাব কারণে সে এখানে বছর খানেকের বেশি আছে। খুবই রোগা, শালিকের হৃদয়ের মত (?), মণিময় ভাবে, এক মাথা ঈষৎ লালাভ কোঁকড়া চুল, ছেলেটি গোলাপ গাছের সারিব মধ্যবর্তী জমিতে নানা জমিতে নানা জ্যামিতি নির্মাণ করে হাঁটে। মণিময়ের কেমন মনে হয়, তার পা ঠিক মাটি ছোঁয় না, যেন কোনো তবঙ্গের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ছেলেটিও ঘুরে ঘুরে মণিময়কে দেখে, যার মুখ জানালায় সাঁটা, স্বচ্ছ কাগজে যেন আঁকা। জানলায় মুখ বেখে এই অনুভূতি মণিময়েরও হয় যে সে যেন বুঝিবা ক্যানভাস ভেঙে বেরিয়ে আসাব চেষ্টা করছে। ছেলেটিকে রোজই ডাকতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু পারে না, কেন যে পারে না তা সে নিজেই জানে না।

দরজা খোলার শব্দ হতে সে পিছন ফিরে তাকায়। ডাক্তার বাগচী দাঁড়িয়ে আছেন দরজার দুই পাল্লায় হাত রেখে। মণিময় হাসলে, তিনিও হাসেন, ‘বিরক্ত করলাম না তো ?’

‘না। বসুন,’ মণিময় জানালা থেকে সরে আসে।

‘আপনাকে আর কিছুদিনের মধ্যে ছুটি দিয়ে দেব। বাড়িতে চিঠি লিখে দিয়েছি আসার জন্য,’ ডাক্তার বাগচী চেয়ারে বসতে বসতে বলেন।

‘আচ্ছা এই ছেলেটির কবে ছুটি হবে ?’ মণিময় বিছানায় ওপর পা মুড়ে বসে।

তার চোখের সামনেই, ডাক্তারের মাথার ওপর, দেয়ালে কাংড়া চিত্রের একটি বাঁধানো প্রিন্ট। আহা, কী সিমেট্রি, মণিময় মনে মনে আবার তারিফ করে। ডাক্তারের কথা ভুলে গিয়ে। তারপরেই সে বিস্ময়াহত যে জানালা দিয়ে ছেলেটির ছায়া কাংড়া ছবির কাঁচের ফ্রেমে এবং তার চলা যেন ছবিটিকে প্রসারিত করে দিচ্ছে দূরের আঁকাবাঁকা শৈলরেখায়।

ডাক্তার বাগচী তার দিকে চেয়ে থাকেন। একটু গলা খাঁকারি দেন। মণিময় তাঁর দিকে তাকালে বলেন, ‘কোন ছেলেটি ?’

‘যে গোলাপ-বাগিচায় ঘোরে।’

'ওর নাম জানেন না ?'

'জানি ।'

'তাহলে নাম বলুন ।'

মণিময় চুপ করে থাকে । এই শৈলাবাসে চিকিৎসাধীন তার আড়াই বছরের জীবনের আগে সে তো কেবলই নাম বলেছে, নামের পর নাম, চিহ্নিতকরণ । সে কি ডাক্তার বাগচীকে বোঝাবে যে নামগুলি একসময় তাদের সব অলৌকিকতা হারিয়ে ফেলে ? আর সেজন্যই নামের বাইরে গিয়ে মানুষকে সম্বোধন করা দরকার ? যেভাবে সে তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকত না, বলত 'নারী যে তুমি আমাকে ঈর্ষার সৌন্দর্য শেখাও।' কিন্তু ডাক্তারবাবুর মতে এটা যে তার রোগেরই একটি উপসর্গ, যাক ওঁরা নিশ্চয়ই ভাষাবিভ্রম বলেন । মণিময় তাই আর কিছ বলতে গেল না ।

'নাম বলুন । আপনি তো ভাল হয়ে গেছেন ।'

উত্তর না দিয়ে মণিময় আবারও কাংড়া চিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে । ডাক্তার-বাবুকে তো জিজ্ঞেস করা যায়, বলুন তো এই চিত্রের নাম কী ? ডাক্তারবাবু বলে ওঠেন, রাধাকৃষ্ণ । মণিময় হো হো করে হেসে ওঠে । ওই পাহাড়, পথ, বৃক্ষশ্রেণী, আকাশ, পাখি, নদী-এগুলি তাহলে কিছু নয় ? এসবের মাঝে ওই দুই মানব-মানবী কেবলই রাধাকৃষ্ণ?

'ওর নাম যযাতি,' ডাক্তায় বাগচী হাই তুলে বলেন, 'যযাতি কে জানেন ?'

'গোলাপ বাগিচায় ঘোরে,' মনিময় হেসে বলে ।

ডাক্তার হাসেন । 'আমাদের পুরানে যযাতি নামে একটি চরিত্র আছে, মনে নেই ?'

'সৌন্দর্যকে যে ভয় পেতো ।'

'মানে ?' ডাক্তার বাগচীর ভ্রুদ্বয় কুচকে যায় ।

'সৌন্দর্য কোথা থেকে আসে জানেন ?' মণিময় বিছানা থেকে নেমে পায়চারি শুরু করে। মাঝে মাঝে জানালার কাছে গিয়ে গোলাপ বাগিচায় কিশোরকে দেখে । আব পায়চারি করতে করতে আবৃত্তি করে :

কে, আমি চীৎকার করে উঠি যদি, হবে শ্রোতা শ্রেণীবদ্ধ ঐ
দেবদূত-পর্যায়ের মধ্য থেকে ? আর যদি কোনো একজন অকস্মাৎ
আমাকে ঘনিষ্ট বুকে চেপে ধরে, আমি হবো মলিন, বিলীয়মান
তার আরো সমর্থ সত্তার মধ্যে । কেননা সৌন্দর্য আর কিছু নয়, শুধু সেই
আতঙ্কের আরম্ভ, যা অতি কষ্টে আমাদের পক্ষে নয়
এখনও অসহনীয় । আরাধ্য সে আমাদের, যেহেতু সে শান্ত উপেক্ষায়
তার সাধ্য সংহার হানে না । প্রতি ভিন্ন দেবদূত ভয়ংকর ।

'আপনার কবিতাগুলি কিন্তু ভারি সুন্দর', ডাক্তার বাগচী আমতা আমতা কবে বলেন।

মণিময় মজা পায় । সত্যিই যদি এটি তাব কবিতা হত, তাহলে ক্ষতির কি আছে ? এই এলিজিটি কি সে নিজের স্বাক্ষরসহ প্রকাশ করতে পারে না ? অতীত এবং ভবিষ্যতের সব রচনার মধ্যেই তো সে আছে, এক জরুরি অনুপস্থিতির মত। ডাক্তাববাবুকে তো এসব বলা যায় না । প্রসর্যমান বিশ্বের কথা তিনি কতটুকু জানেন ? মণিময় দেখল, ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন । সে বলে, 'আমাকে তাহলে ছুটি দিয়ে দেবেন ?'

'হ্যাঁ ।'

'আর ওর কবে ছুটি হবে ?'

'কার ?' ডাক্তার বাগচী এবার একটু বিরক্ত হন। সৌজন্যমূলক হাসিতে বিরক্তির চিহ্ন মুছে ফেলেন তিনি, 'ওহো, যযাতির ?' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। মণিময় বোঝে, ডাক্তার কোনোভাবে নিজেকে বদনাবিদ্ধ করে নিতে চান। ডাক্তারদের নীরবতার কারণ এটাই। হায়, নীরবতা ডাক্তারের ভিতরে কখনো শূন্যতা প্রসব করে না, আর একটি মুখোশ তুলে নিতে সাহায্য করে। এবং সেই মুখোশ আটকাতে আটকাতে তিনি বলেন, 'ও আর কোনোদিনই এখান থেকে ছুটি পাবে না। ওপারে যাবার ছুটি ছাড়া।'

মণিময় হাসতে গিয়েও থেমে যায়। সব কারুণ্য কী হৃদয়হীন, মেধাবর্জিত। যেহেতু এ তার গোলাপ বাগিচার ছেলেটির কথা, যার প্রতিবিম্ব কাংড়া চিত্রের পরম সিমেট্রিতে ভ্রমণ করে, তাই সে হাসে না, ফের শূন্যতার কাছে যায়। বিস্মৃতির রাজপথে পা ঠোকে।

'ওর বাবা-মা ওকে শরীর সারাতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কী যে হয়ে গেল। মাস আটেক আগে—আপনি জানেন না ? —ও আপনি জানবেন কী ভাবে, তখনও তো আপনি অসুস্থ—বাগীচায় ঘুরতে ঘুরতে — গাছে হাত দিয়েছিল — তর্জনীতে গোলাপ কাঁটা ফুটে যায়। সেই ক্ষত থেকেই আস্তে আস্তে লিউকোমিয়া মানে ব্লাড ক্যানসার—' ডাক্তারের গলা অবরুদ্ধ হয়ে আসে।

শুনতে শুনতেই মণিময় এগিয়ে যাচ্ছিল জানালার দিকে। কিন্তু এখন আর ছেলেটিকে বাগিচায় দেখা যায় না। তার ঘরে চলে গেছে বা আর কোথাও। মণিময় দেখল, কয়েকটি গোলাপের পাঁপড়ি ঝরছে ··· কারোরই নিদ্রা না-হবার আনন্দ তুমি, অনেক চক্ষুপল্লবের তলে।

মণিময়ের একটি ফোটন-রকেট ছিল যাতে চড়ে সে সময়ের উল্টোস্রোতে উড়তে উড়তে চলে যেত সেই জলাশয়ের নিচে যেখানে একটি প্রাসাদ তার মর্মরধ্বনি নিয়ে বেঁচে ছিল। জন্ম থেকে জ্ঞানত যে মাকে সে দেখেনি, তাকে ওখানেই দেখেছিল মণিময়, ওই প্রাসাদের একটি ঘরে, সমুদ্রের ফেনার মত সাদা বিছানায়, তাকে জন্ম দেবার সময় যেমন যন্ত্রণায় নীল, তেমনই নগ্ন, দুই পা ফাঁক হয়ে আছে, স্তনদ্বয় স্ফীত, চীৎকারে উন্মুক্ত হা, চোখ বিস্ফারিত, শূন্যতায় মথিত। কাংড়া চিত্রের মতই কী যে সিমেট্রি ছিল মা'র অবয়বে —সে কামনাঘন চোখে তাকিয়ে দেখত এবং মৃত্যুকে স্পর্শ করত। এই ফোটন-রকেটটি পাওয়ার ঘটনাও আশ্চর্যের। একদিন ছাদে উঠে, তখন তার বয়স চোদ্দ-পনের, আকাশের নীল তছনছ করে যখন সে একটি ঘুড়ির গতিপথে ধাবমান, তখনই আলোর এত দ্রুত ছুটতে থাকে এবং অন্ধকারও যে দাঁত মুখ খিঁচোতে খিঁচোতে সে পড়ে যায়। জাগবার পর, কেউ তাকে জাগাতে আসেনি, পাশে মণিময় ফোটন-রকেটটি দেখতে পায়। বস্তুতপক্ষে এই ফোটন-রকেট চড়ার মূল্য হিসেবেই তাকে মাঝে মাঝে সহ্য করতে হয় ধাবমান আলোদের আক্রমণ। কিন্তু এই ফোটন-রকেটটি চড়েই তো সে জানতে পারে নানা জলাশয় ও প্রাসাদের কথা, বন্দর ও গণিকাপল্লির হারানো ভাষা, উদ্ভিদের আতঙ্কিত জীবন, সে জানতে পারে কোথাও সেই নীল রংয়ের কাঁচের পাত্র আছে যা স্পর্শ করলে একই সময়ে সব জায়গায় থাকা যায়। চাকরি, বিবাহিত জীবন কিছুই তাকে চতুর্মাত্রিকতার জ্যামিতি থেকে মুক্ত করতে পারে না। বরঞ্চ ধীরে ধীরে সব নামগুলি হারিয়ে ফেলে তাদের অলৌকিকতা, সে কখন 'নারী যে তুমি আমাকে ঈর্ষার সৌন্দর্য শেখাও' এই বাক্যে স্ত্রীকে সম্বোধন করে, যৌনতার শীর্ষমুহূর্তে স্ত্রীর শরীরকে খাদে ফেলে ফোটন-রকেটে চেপে বসে, ফিরে যেতে থাকে পিছনে, সব প্রাচীন, মৃত্যুর ভিতরে সব স্বগতোক্তি কী সুন্দর ! তারপর একদিন মণিময়কে নিয়ে আসা হয় এই শৈলাবাসে চিকিৎসার জন্য। যদিও তার ফোটন রকেট কেড়ে নেওয়া হয়, কিন্তু এখানে এসেই সে বুঝেছিল, এই হচ্ছে সে-ই হারানো সময়ের গর্ভ, এই শৈলবাস, গোলাপ বাগিচা। আড়াই বছরে ধীরে ধীরে তার অস্থিরতা কমে আসে, কাংড়া-চিত্রের সঙ্গে সহবাস তার মনকে জ্যামিতির শূন্যতায় পূর্ণ করে তোলে। সে মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে শুরু করে। যেমন :

জীবনে বা ইতিহাসে এই হেতু এ-রকম অনেকের মিলনস্থলের
এত বেশি-বেশি মূল্য, মূল্য এই সাগরের, নদী ও পাড়ের, আকাশের,
পাখিদের, মেঘেদের, আমার, সূর্য ও চাঁদ, তারাদের মিলনস্থলের ;

তাহলে এ-নিসর্গের চিরদিনকার এক সোজাসুজি নিয়মবিশেষ
প্রথম পঙক্তির থেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ পঙক্তিতে যেতে হলে
একেবারে তলাকার পঙক্তি ঘুরে যেতে হয়, ঘুরে গেলে তবে যাওয়া যায়
সবচেয়ে পূর্ণ যাওয়া — এই পূর্ণতম যাওয়া নিসর্গের সুনিয়মে আছে ।

সে বিশ্বাস করে এইসব কবিতার লেখক থাকে না ; শুধু স্রষ্টার বোধোধ্যানের বিষয়।

বিকেলবেলা সে বেড়াতে বেরোয় । করিডোরে সেই মানুষটির মুখোমুখি, যার মুখে ইতিহাসের উল্কি আঁকা । মণিময় মুখ ফিরিয়ে থাকে, তার দিকে তাকাতে পারে না ।

'বেড়াতে চললেন ?'

মণিময় হাঁটতে থাকে, পাশে লোকটিও হাঁটে । 'রোজই তো বেড়াতে যান, আজ আসুন না আমার ঘরে । হিংসুটে বৌদের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় আজ দুপুরেই শেষ করেছি । ... আমার কথা আপনি বিশ্বাস করেন না বুঝি ? ... সব তথ্য বার বার যাচাই করে লেখা। .. হিংসুটে বৌদের ইতিহাসের এমন বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ... ।'

'কিছু লোকের খাওয়ার পর টুথপিক না হলে চলে না । দাঁতে কিছু লেগে থাকলে সারাদিন এমন অস্বস্তিতে ভোগে তারা ।' মণিময় বলে ।

'মানে ?'

'কিছু লোক বড় জামা ছাড়া কেনেন না । তাদের সবসময়ই মনে হয়, তারা আরো বড় হবে ।' বলেই মণিময় হাসতে থাকে ।

'হাসছেন ?' লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ে । মণিময় এগিয়ে যায় । গেটেব সামনে এসে রোজই সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে । দূরে সবুজে ঢাকা পর্বতশ্রেণী । যে পাহাড়েব ওপর এই শৈলাবাস, তার চেয়েও অনেক উঁচু উঁচু সব পাহাড় । এই পাহাড় ও দূরের পাহাড়গুলির মাঝে বিরাট খাদ, যেখান থেকে সব সময়ই ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাক খেয়ে ওপরে উঠতে থাকে । এরপব মণিময় আবার হাঁটতে থাকে । রোজই সে শৈলাবাস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাকদণ্ডী পথে উঠে পরিত্যক্ত হেলিপ্যাডে যায় । হেলিপ্যাডে তার একাকী ভ্রমণ। এখানে আব কেউ আসে না । অন্যরা যায় বাজারের দিকে বা গীর্জার মাঠে ।

হেলিপ্যাডে এসে আজ মণিময় গোলাপ বাগিচার ছেলেটিকে দেখতে পেল । নীল ট্র্যাকসুট পরা ছেলেটি বসে আছে সিমেন্টের একটি চাঙড়ের ওপব । মণিময় তার পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল । ছেলেটির ঈষৎ লালাভ চুলেব উড়ান, ঘাড়ের কাছে অস্তগামী সূর্যের আলোর কমলা রং দেখল । কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি পিছন ফিরে তাকিয়ে, মণিময়কে দেখে, অপ্রস্তুত ভাবে উঠে দাঁড়াল ।

'তুমি এখানে ?'

ছেলেটি কোনো উত্তর দেয় না । মণিময় এই প্রথম তার মুখটি দেখে, স্পষ্ট । কিছুটা ফোলা, ফোলা ; ফ্যাকাশে । চিবুকের কাছে দীর্ঘ একটি কাটা দাগ । কপালে, গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। চোখ দুটি লাল । সে মুগ্ধ হয়ে গেল ছেলেটির দুই ভ্রূর বিন্যাস দেখে, যেন চীনা চিত্রকরের বেগবান তুলির টান ।

'তুমি তো এখানে কখনো আসো নি ।' মণিময় ছেলেটির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে।

'আমি আর আসব না ।' ছেলেটি অপরাধীর মতো বলে ।

'আসবে না কেন ? রোজ এসো । আমার সঙ্গেও আসতে পারো । আমি তো রোজ আসি।'

'একা একা ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ যদি আসে না তোমার সঙ্গে ?'

ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনে মণিময় মনে মনে একটি পংক্তি রচনা করে : পাখিটি আঙুল দিয়ে গান গায়। তারপরে বলে, 'তুমি আজ এখানে এলে কেন ?'

ছেলেটি কথা বলে না। তার মনে পড়ে ঝগড়ুর কথা। শৈলাবাসের প্যান্ট্রি বয় ঝগড়ু। সবাই বলে, বুড়ো ঝগড়ু। ঝগড়ু তাকে এখানে আনতে বলেছে, এ-কথা কি সে লোকটিকে বলবে ? ঝগড়ু বলে, এখানে নাকি লুকনো আছে নীল রংয়ের কাঁচের পাত্র, যাও খুজে দেখ সোনাবাবু, ঝগড়ু মিথ্যে বলে না, যদিও সে নিজে এতদিনে খুঁজে পায়নি, ওই পাত্র ছুয়ে তুমি যা চাইবে তা-ই পাবে সোনাবাবু। যযাতি তো একটিই জিনিস চাইবে নীল পাত্রব কাছে। সেই দারুমূর্তি, কালো রং-এর উজ্জ্বল প্রায় দশফুট উঁচু দারুমূর্তি যা সে কলকাতায় থাকতে বাবার সঙ্গে একটি শিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখেছিল। সে খুব বায়না কবেছিল দারুমূর্তিটি কেনবার জন্য, যার নাম লেখা ছিল 'নিরঞ্জন'। বাবা খুব বকাবকি করেছিলেন। 'বোকা ছেলে, ও কি খেলবার জিনিস। কত দাম ! বড় লোকেবা এসব দিয়ে ঘব সাজায়, বারান্দা সাজায়।'

'আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছো ?' মণিময় ছেলেটিব কাঁধে হাত রাখে।

একটু কেঁপে ওঠে ছেলেটি। তারপর মুখ তুলে মণিময়েব দিকে তাকায়। 'ঝগড়ু বলে -।'

'কী বলে ?'

'নীল কাঁচের পাত্র ··· এখানে পাওয়া যায়।'

মণিময় বিস্ফারিত চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকে। 'জোন' সে বিড়বিড় করে। ঝগড়ু জানে জোনেব খবর ? তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসে ছেলেটিকে সে উন্মাদের মত জড়িয়ে ধরে। তার কাঁধে, গলায়, মুখে চুম্বন কবতে থাকে। ছেলেটি নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা কবে হাত-পা ছুঁড়ে। চীৎকার করে। মণিময় তাকে জোবে আঁকড়ে ধরে। এমন এক উত্তেজনা সে অনুভব কবে যা অনাস্বাদিতপূর্ব। প্রতি লোমকূপ শিহরিত। মেরুদণ্ড বেয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের চলাচল। ছেলেটি তার আলিঙ্গনে নির্জীব হয়ে পড়ে। চোখ বোজা দুই হাতে ছেলেটিকে ধরে মণিময় তার গলা, মুখমণ্ডল লেহন করতে থাকে। যেন এই অস্তিত্ব তাব দুই হাতের ঘেরে প্রসারিত লাবণ্যময় কাংড়া চিত্র। আব ছেলেটির গলা বেয়ে উঠে আসছে ঘুঙুরেব ধ্বনি।

ঝগড়ু তার ঘরেব বারান্দায় বসে গাঁজা টানে। বাত দশটাব পর শৈলাবাস ঘুমিয়ে পড়লে মণিময় তার ঘরের পিছন দিকেব দবজা খুলে, কাঠের বেড়া ডিঙিয়ে চলে এসেছে। ঝগড়ু কোনো কথা বলে না। গাঁজা টানে, মাঝে মাঝে হাসে। অনেকক্ষণ পবে বলে, 'আপনি কি আবার পাগল হয়েছেন বাবু ?'

'সেই নীল পাত্র ওইখানে আছে, তুমি ঠিক জানো ?' মণিময় এখনও হাঁফাচ্ছে।

'কোন নীল পাত্র বাবু ?' ঝগড়ু আবাব হাসে।

'গোলাপ বাগিচার ছেলেকে যা ব[illegible]ছো ?'

ঝগড়ু হা হা করে হাসে, মণিময়েব মনে হয় সুদর্শন চক্র যেন বন্ বন্ করে ঘুরছে। ঝগড়ুর হাসি তাকে কাটছে। ঝগড়ু বলে, 'কার কথা বলছেন, বুঝি না যে।'

'গোলাপ বাগিচার ছেলে।'

'আমাদের সোনাবাবু ?'

মণিময় কথা বলে না। সে আশা করে, ঝগড়ু এবার নিশ্চযই সব বলবে।

'তা সে ছেলেমানুষ' ঝগড়ু হাসে আব বলে, '[illegible]কে তাই ভোলালাম একটু। কেবলই বলে, ঝগড়ু, নিরঞ্জন এনে দাও—নিবঞ্জন জানেন তো বাবু —সে এক দারুমূর্তি—কত বোঝাই সোনাবাবুকে—তা তাকে বকি কি কবে বলো—আব কদিনই বা এই পৃথিবীতে আছে সে—তাই

ভোলালাম—নীল পাত্রের কথা বললাম —নিরঞ্জন না পেলে মনে হয় যেন পাগল হয়ে যাবে— ছেলেমানুষকে ভোলাবার জন্য কথা—বলে নিরঞ্জন দাও, নিরঞ্জন এনে দাও—'

মণিময় হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পায় ঝগড়ু তখনও অন্ধকারে উদ্দেশ্যে বলে চলেছে ··· ছেলেমানুষকে ভোলালাম ··· খালি বলে নিরঞ্জন এনে দাও, নিরঞ্জন দাও ···

বিকেলে বেরুনোর সময় আজ সে নিজেই খোঁজ করে ছেলেটির। তাব ঘরে যায়। মণিময় দেখল, সাদা বিছানায়, সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে ছেলেটি। নার্স পাশে বসে আছে চেয়ারে। বলে, 'ওর যা অসুখ, তাতে তো সব সময়ই গায়ে জ্বর। কাল বেড়িয়ে ফিরে আসার পর জ্বর বেড়েছিল। সারারাত প্রলাপ বকেছে। আজ দুপুরের দিকে জ্বর একটু কমেছে। এখন ঘুমোচ্ছে। নিরঞ্জন কে জানেন ?'

মণিময় কথা বলে না। মুগ্ধ চোখে সে ছেলেটির শুয়ে থাকা দেখে, যেভাবে জালশয়ের নিচের প্রাসাদকক্ষে সে তার নগ্ন মা-কে দেখেছিল। আঃ কী সিমেট্রি ! সে মনে মনে উচ্চারণ করে। আব স্বভাবত এ সময়ে তার চোখের সামনে প্রকাশিত হয় কাংড়া চিত্র, যাতে সঙ্গীত বেখার সূক্ষ্মতায়, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে আকারায়িত এবং পরক্ষণেই আবার ছেলেটির ঘুমন্ত মুখ, চুম্বনেব জন্য মণিময়ের ঠোঁটে মেঘ জমে।

'নিরঞ্জনকে চেনেন ? কাল সাবাবাত ওই নামই বলেছে।' নার্স আবার বলে।

'হুঁ', মণিময় মাথা নাড়ে, 'ওব বন্ধু।'

'কলকাতার বুঝি ?'

'না।'

'এখানকার কেউ ?'

'হ্যাঁ। আমার নাম নিরঞ্জন।'

'হোযাট হেল ইউ আর !' নার্সটি দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করে, 'বদ্ধ উন্মাদ।'

মণিময় হেসে ফেলে। বলে, 'জানতে চাইলেন কেন ? আপনারা তো কিছুই বিশ্বাস করেন না।'

'মানে ?'

'কিছুতে বিশ্বাস নেই আপনাদের বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ছাড়া। স্কাড পেট্রিয়ট দিয়ে একটা দেশকে ধ্বংস করা যায়, এসবেই আপনারা বিশ্বাস করেন। এর বাইরে কিছুতে আপনাদেব বিশ্বাস নেই।'

'যান, ওকে ঘুমোতে দিন।'

মণিময়ও আর দাঁড়ায় না। হন হন করে হাঁটে। শৈলাবাস পিছনে ফেলে, পাকদণ্ডী পথ ঘুরে ঘুরে সে উঠে আসে হেলিপ্যাডে। আগের দিনের মত দাঁড়িয়ে সে সিমেন্টের চাঙড়টিব দিকে তাকিয়ে থাকে। শূন্যতাকে এই অবলোকন তাকে শিহরিত করে। কয়েকবার কেঁপে ওঠে সে। কালকের মতই আবার সেই উত্তেজনা ফিরে আসছে। ছেলেটির গলা, মুখমণ্ডল, ঘাড়। সে দৌড়ে গিয়ে সিমেন্টের চাঙড়টির কাছে হাঁটুমুড়ে বসে। মাথা রাখে সেখানে। শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। ফিরে আসছে ঘুঙুরের ধ্বনি। আর এখন সে আঁকড়ে ধরে শূন্যতা, গোলাপ বাগিচাব ছেলেটি যা ফেলে গেছে, উন্মাদেব মত তাকে জড়িয়ে ধরে, লেহন করে শূন্যতার ত্বক, তাকে নগ্ন করে, দোমড়ায় মোচড়া, মুখ ঘষে সারা শরীরে, মুখের ভিতরে প্রবেশ করায় তার যৌনাঙ্গ আর এই কামনার ঘোরে শোনা যায় মণিময়ের ফিসফিস কণ্ঠস্বর ··· আমি এসেছি বালক, তোমার নিরঞ্জন, দারুমূর্তি, আপনাতে সম্পূর্ণ, আমাকে গ্রহণ করো ···

ডাক্তাব বাগচী আবার এলেন আজ। মণিময় তখন জানালার পাশে বসে দুটি পঙক্তিমাত্র লিখেছে :

কারণ— যে-কোনো শব্দ — নিশা, বিভাবরী, রাত্রি, যামিনী, নিশীথ, শর্বরীর ধ্বনি এত হলেও তা বিশ্বে মোটে একটিই আছে কোনো নেপথ্যজগতে।

'কবিতা লিখছেন বুঝি ?' ডাক্তার বাগচী হেসে বলেন।

'জানেন ডাক্তারবাবু', মণিময় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, 'কিছু কিছু মানুষ আয়নার ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারতো। কী ভাবে এটা সম্ভব ? এটা কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, আপনি জানেন ?'

ডাক্তার একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন ! তাবপর বলেন, 'আপনি কি কয়েকদিন হল আবার অসুস্থ বোধ করছেন ?'

'না। কেন ?'

'আমাদেব একজন সিস্টারকে আপনি কী সব বলেছেন।' ডাক্তার এবাব তার পেশাদারি গাম্ভীর্যের মুখোশটি পরেন। মণিময় বোঝে। তাই সে কাংড়া চিত্রের দিকে তাকায়। তাব প্রতিরোধ।

'আমার মনে হয়, তাহলে আরো কিছুদিন আপনাব এখানে থেকে যাওয়াই ভাল।' ডাক্তাব বলেন।

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাড়ি যেতে ইচ্ছে কবে না ?'

'এখানে কিন্তু বেশ ভাল আছি', মণিময পায়চাবি কবতে থাকে, 'আপনি কি জানেন, আমাব নতুন নাম কী ? নিরঞ্জন। আমি আপনার গোলাপ বাগিচার ছেলেব নিরঞ্জন। দারুমূর্তি।'

ডাক্তাব অবাক চোখে মণিময়েব দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'কিন্তু যাবা আযনাব মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারতো, তাবা কীভাবে যেতো বলুন তো। এব জন্য অবশ্য আযনাব যথার্থ ব্যবহার জানা প্রয়োজন। নিজেকে দেখবাব জন্য আয়নাব সামনে দাঁড়ালে এমনটা সম্ভব নয। আযনাব ভিতরে আপনি দেখবেন অন্য কাউকে – যে আপনাকে ছেড়ে দূবে, ধবা ছোঁয়াব বাইবে প্রতিবিম্বেব ভিতরে চলে গেছে, তাকে মোহিত হয়ে দেখুন, দেখবেন আস্তে আস্তে সে কেমন মিলিয়ে যাচ্ছে–হাবিয়ে যাচ্ছে–পুবো জগৎ তখন আয়নার ভিতরে চলে আসে –সবকিছু–সে তখন কোথাও নেই, সবেতে বিলীন, শিশুরা তখন তাকে নিয়ে যৌনক্রীড়ায মেতে ওঠে।'

'মণিময়বাবু !' ডাক্তার বাগচী গর্জন করে ওঠেন।

মণিময় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এখন শুধু ডাক্তাবেব মুখ। সে প্রতিরোধহীন। কাংড়া চিত্র দৃষ্টিব বাইবে।

'আপনাব পাগলামি দিনে দিনে অশ্লীল হয়ে উঠছে। কাল রাতে আপনি যযাতির ঘরে ঢুকে তাকে জড়িয়ে চুম্বন কবছিলেন, ছিঃ। একটি অসুস্থ ছেলেকে –এই রকম পাগলামি করলে আপনাকে বেঁধে রাখা হবে।'

'আমি তো কিছু করিনি,' মণিময়ের কন্ঠস্বর বাতাসের ঝাপটে ছেঁড়া কাগজের খসখেসের মতো শোনায়।

ডাক্তারের কন্ঠস্বব আবার নরম হয়। 'আপনি ভাল হয়ে গেছেন। আর কয়েকদিন পরেই বাড়ি ফিরে যাবেন। ক'দিন ভাল করে বিশ্রাম করুন। স্ত্রী-ছেলে মেয়ের সঙ্গে আবাব থাকতে পারবেন, এর চেয়ে আনন্দেব আর কী হতে পারে।'

আজ আবার মণিময় হেলিপ্যাডে এসেছে। গোলাপ বাগিচার ছেলেও তার সঙ্গে লুকিয়ে চলে এসেছে। পাকদণ্ডী পথে মণিময় কখনো তাব হাত ধরে হেঁটেছে, কখনো তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। তার মুখে মুখ ঘষে অনুভব কবেছে ছেলেটিব জ্বরের উত্তাপ। তাবা দুজনে

সিমেন্টের চাঙড়ের ওপর এসে বসে। মণিময় দুই হাতে ছেলেটির মুখমণ্ডল ছুঁয়ে কপালে চুম্বন করে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ছেলেটি খিলখিল করে হাসে। বলে, 'তুমি এখানে এসেছো কেন ?'

'পালিয়ে এসেছি।'

'কেন ?'

'আমি সব নাম ভুলে গিয়েছি। আর আমার বৌ ডাক্তারদের বলেছিল, আমি নেক্রোফিলিয়াক। বৌয়ের সঙ্গে যখন আমি সঙ্গম করতাম, তখন মনে হত, মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গম করছি। আমি ওকে বলতাম। আসলে ও তো কিছুতে বিশ্বাস করে না। যেমন করে তুমি নিরঞ্জনকে চাও, সেভাবে কাউকে ও চায় না।'

'তুমি নিরঞ্জনকে দেখেছো ?'

'আমিই তো তোমার নিরঞ্জন।' মণিময় এবার তার দুই গালে চুমো দেয়।

ছেলেটি আবার হেসে ওঠে। বলে, 'নিরঞ্জন তো কালো, নিরঞ্জন তো কাঠের।'

'আমিও। দেখ আমাকে।' মণিময় উঠে দাঁড়ায়। এরপর পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে ছেলেটি দেখে, মানুষটি একে একে খুলে ফেলছে তার জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি এবং একটি পেশল নগ্নতা গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মণিময় আকাশের দিকে দুই হাত তোলে এবং বলতে থাকে, 'দেখ আমাকে, চারিপাশে ঘুরে ঘুরে দেখ। আমি কালো, আমি দারু। তোমার নিবঞ্জন।' ছেলেটি ভয়ার্ত চোখে তাব দিকে তাকিয়ে থাকে।

মণিময় ধীর পায়ে ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসে। হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে। ছেলেটি ভয়বিহ্বল, বাক্‌রহিত এবং মণিময় দেখে, তার চোখে আতঙ্কের তা তা থৈ। সে-ও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, বজ্রাহতের মত স্থির। মণিময় তার শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলতে থাকে। হেলিপ্যাডের ধূলিমলিন ভূমিতে সেগুলি সে ইতস্তত ছড়িয়ে দিতে থাকে। ছেলেটির ফ্যাকাশে ফর্সা শরীর আয়নার মত মণিময়ের সামনে উম্মোচিত হয়। সে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে এবং দুই বাহুর আলিঙ্গনে চেপে মাটিতে শুয়ে পড়ে। ছেলেটি যন্ত্রণায় এবং ভয়ে গোঙায়। ছেলেটির গলায়, মুখে চুম্বন করতে থাকে সে। তারপর ছেলেটিকে সে হেলিপ্যাডে শুইয়ে দেয় এবং হাঁটু মুড়ে বসে, ঝুঁকে তার শবীর নিরন্তর লেহন করে চলে। ছেলেটির মুখের ভিতব জিভ ঢুকিয়ে খেলা করে, এক হাতে বিলি কাঁটে চুলে, অন্য হাতে ছেলেটির যৌনাঙ্গ নিয়ে খেলে। কেঁপে কেঁপে ওঠে ছেলেটি, যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ। কখনো ধনুকের মতো বেঁকে যায়। তখন আবার মণিময় তাকে বুকের আশ্রয়ে নিয়ে আসে। ছেলেটিও দাঁত বসায় তাব বুকের মাংসে। কামনাহত হাতে পেষণ করে মণিময়ের যৌনাঙ্গ। মণিময়ের দৃষ্টি শূন্যতায় ভেসে যেতে থাকে —আয়নাব ভিতব দিয়ে — সে ফিরে চলেছে কাংড়া চিত্রের রেখা ও বঙের সঙ্গীত-জ্যামিতিতে। প্রলাপের মতো ছেলেটি উচ্চারণ করে, নিরঞ্জন .... নিবঞ্জন ...

এখন মণিময় কাংড়া চিত্রটির মুখোমুখি বসে। এই চিত্রের রেখাগুলি যে মৃত্যু ও কামনায় এত সংহত, তা আগে সে লক্ষ্য করেনি। সে বুঝতে পারে, ওই চিত্রের সিমেট্রি আসলে শূন্যেব বন্দনাজাত। সে বারবার অনামা শিল্পীকে প্রণাম জানায়। এত শূন্যতার অনুভব ছাড়া এই চিত্রের বাস্তবতা চিন্তার অতীত। আর এই বাস্তবতা তো জন্মগ্রহণ করে সেই নামগুলি অস্বীকারের মধ্য দিয়ে যারা আজ অলৌকিকতা থেকে চ্যুত, যারা কেবল তথ্যের একরৈখিকতা। আলোর ধাবমানতা এবং ফোটন-রকেট তাকে এই টুথপেস্ট টিউবের পেছন টেপা বাস্তবতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তাই সে পেরেছিল এই শৈলাবাসে এসে পৌঁছতে, যেখানে গোলাপ বাগিচা, কাংড়া চিত্র এবং কিশোরের কামনার নবমুকুল ফোটে। এখানেই তো সে নিরঞ্জন হয়ে উঠতে পারে। মণিময় কাগজ ও কলম নিয়ে বসে, লেখে কবিতা :

আলোকের যোগ দেখে, টানের সংযোগ দেখে বেশ অনায়াসে মনে হয়

আসলে একটি শুধু তারাস্ত্র রয়েছে বিশ্বে, একটি তাবাদেহ আছে
সকল তাবার যোগে, যোগফলে ; মাঝখানে ফাঁকগুলি কিছু স্বাধীনতা।
এইভাবে এক হওয়া, ফাঁক রেখে এ হওয়া—মোহানাব ফাঁক দিয়ে হওয়া
সবচেয়ে বেশি ক'রে এক হওয়া, একেবারে পূর্ণতমরূপে এক হওয়া।
ফলে মোহানার প্রায় পুরোটাই আয়োজন—সমুদ্রযাত্রার আয়োজন।

এই সময়ে দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে মণিময় সেদিকে তাকাতে গিয়ে কণ্ঠস্বর শোনে, 'নিরঞ্জন—।' ছেলেটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মণিময় ডাকে, 'ভেতরে এসো।'

ছেলেটি ধীর পায়ে ঘরে ঢোকে এবং তার লেখার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। 'কী করছ নিরঞ্জন ?'

'তোমাকে লিখছি।'

ছেলেটি খিলখিল করে হাসে। হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে। মণিময় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এত প্রাণবন্ত কখনো সে দেখেনি গোলাপ বাগিচার ছেলেটিকে। ছেলেটি বলে, 'নিরঞ্জন লেখে না।'

'কেন ?'

'নিরঞ্জন তো দারু । সে কি মানুষ ?' ছেলেটি আবার হাসে, 'নিরঞ্জন কখনো লেখে না।'

'নিরঞ্জন কী করে ?' মণিময়ের হাতের মুঠিতে কবিতা লেখা কাগজ দলা পাকিয়ে যায়।

'কিছু না।' ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আমাকে তুমি ভালোবাসবে না নিরঞ্জন ?'

মণিময় ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে। এলোমেলো চুম্বন করে।

'নীল পাত্র তুমি আর খুঁজবে না নিরঞ্জন ?'

'নীল পাত্র—'

'ঝগড়ু বলে, ওখানে নীল পাত্র আছে।'

'কাল খুঁজব।' মণিময় তাকে কাছে টেনে নেয়। ছেলেটি তার কোলে মাথা রাখে। মণিময় নিচু হয়ে তার ঘাড়ে চুম্বন করে, চুলে বিলি কাটে। ছেলেটি ঘন হয়ে তার আদর খায় এবং মণিময়ের যৌনাঙ্গ নিয়ে খেলা করে। মণিময়ের মুখের রেখা আবার কাংড়া চিত্রে মিশে যেতে থাকে।

ছেলেটি চলে যাওয়ার পর মণিময় কবিতাটি ছিঁড়ে ফেলে। টেবিলের ড্রয়ার খুলে এতদিন লেখা সব কবিতাগুলি ছেঁড়ে। মণিময় বোঝে, এই জীবন অন্যত্র, অন্যভাবে লিপিকরণের জন্য যা হয়তো প্রাচীন সব শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে, যাদের অর্থ এখন আর বোঝা যায় না। কোনোদিন বোঝা যাবে, কোনো মহাপ্রলয়ের পর, ধ্বংসাবশেষ হিসেবে যখন এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হবে, তখন, অনেক সময়ের শূন্যতা পেরিয়ে শব্দরা পুনর্জীবন ফিরে পায়।

রাতে শৈলাবাস থেকে পালিয়ে ঝগড়ুর কাছে আবার আসে মণিময়। ঝগড়ু গাঁজা খায়, হাসে এবং কথা বলে, 'বাবু আপনি পাগল হয়েছো আবার ··· ছেলে মানুষেরে ভোলাবার জন্য বলি ··· এ কি আর সত্যি, বাবু কেন বোঝেন না ··· বাঁচবার জন্য কিছু মায়া লাগে, আয়না লাগে বলেন ··· আর তিনি তো ছেলেমানুষ ···

'তুমি আয়নার কথা জানো ?' মণিময় যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'ছাড়েন, ছাড়েন বাবু আয়নার কথা, মায়ার কথা কেন জানবো না বলেন,' জগড়ু এক দমে গাঁজার কলকে ফাটায়।

'যারা আয়নার ভিতর দিয়ে যায়, তাদের কথা ?'

ঝগড়ু হাসে। 'জানি, জানি বাবু। কত ছেলেমানুষকে মরতে দেখলাম এত বয়স পর্যন্ত ... তারা তো সব আয়নার মধ্য দিয়েই যায় ... কী দিব্য, বাবু, সেই যাওয়া তাদের, কিছু রেখে যায় না ... শুধু আয়নায় একটু ফাটল ... তাই গাঁজা খেয়ে ঘুমোই ...'

ঝগড়ু কথা বলে, যেন তা আগে থেকে লেখা, 'কিন্তু আপনি সোনাবাবুকে ছেড়ে যাবেন না বাবু ... সে আর বেশিদিন বাঁচবে না গো ... আপনি তার দারু, তার নিরঞ্জন হয়েছেন ... সে আপনার সাধনসঙ্গী ... এই প্রেমে ব্যথা দেবেন না বাবু ... তাকে ছেড়ে যাবেন না ...'

'তুমি জানো ?' মণিময়ের কণ্ঠস্বর সাপের মত হিস্‌হিস্‌ করে ওঠে।

'সে আমাকে বলেছে। আপনি তাকে বড় ভালোবাসেন ... এ তো শুধু বাৎসল্য নয় বাবু, সেও জানে, আপনি তার প্রেমিক হয়েছেন.. কত আদর, সোহাগ তাকে দিয়েছেন ... বলে, ঝগড়ু, নিরঞ্জনকে বলো সে যেন আমাকে না ছেড়ে যায় ... আপনি আবার পাগল হয়ে যান বাবু ...' ঝগড়ু দুলে দুলে হাসে, 'আমি এই লীলা দেখি, কেমন করে সে আপনাকেও আয়নার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় ... এ আমার জীবনেব দিব্যদর্শন হবে বাবু ... তাকে আপনি ছেড়ে যাবেন না ...'

মণিময় ও ছেলেটি পরস্পরের হাত ধরে পাকদন্ডী পথে হেলিপ্যাডে উঠে আসে। ছেলেটি হাঁফাচ্ছে। মণিময় দেখে, ছেলেটির নাক দিয়ে সরু রক্তের ধারা গড়িয়ে নামছে। সে তাকে কোলে তুলে নেয়। রুমাল দিয়ে মুছে দেয় রক্তধারা। 'নীল পাত্র'— ছেলেটি বলে।

হেলিপ্যাড যেখানে শেষ, সেখানে এসে দাঁড়ায় মণিময়। নিচে অতল খাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বলে, 'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

ছেলেটি তার কাঁধে মাথা রাখে।

'ওই দেখ।'

ছেলেটি মাথা তোলে। 'কী ?'

মণিময় আঙুল দিয়ে খাদের দিকে দেখায়। বলে, 'ঝগড়ু বলে, নীল পাত্র ওই অতলে—'

ছেলেটির দুই চোখ চকচক করে ওঠে।

'তুমি কি অত নিচে নামতে পারবে ?' মণিময় তার গালে একটি চুমো দেয়।

'একা ?' ছেলেটি বিস্ফারিত চোখে তাকায়।

'আমিও যাব। আমি কি তোমাকে একা যেতে দিতে পারি ?

'আজ যাবে ?'

'না। তোমার শরীর যখন আরো খারাপ হবে—বোলো আমাকে, যখন তুমি আর কষ্ট সইতে পারবে না, সেদিন তোমাকে নিয়ে আমি ওই অতলে যাব।'

'ঝগড়ু বলে —'

'কী ?'

'তুমি আমার প্রেমিক', ছেলেটি তার গালে চুমো দেয়। মণিময় তাকে আরো জোবে আঁকড়ে ধরে। তার মুখমণ্ডল, গলা চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়।

ডাক্তার বাগচী চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করেন। সুতপার দিকে তিনি তাকাতে পারেন না। বেশ কিছুক্ষণ হল, সুতপা এই ঘরে ডাক্তার বাগচীর মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে। অথচ ডাক্তার বাগচী নির্বাক। তিনি ঘনঘন চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। সুতপা বিরক্ত হয়ে ডাকে 'ডাক্তারবাবু'—

ডাক্তার এবার সুতপার দিকে তাকান। তিনি এই সম্বোধনটির অপেক্ষা করছিলেন। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলেন, 'আয়াম সরি মিসেস সেন। আমি ভেবেছিলাম উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন। আপনাকে চিঠি লেখার পর থেকেই আবার অসুস্থতা বেড়েছে।'

সুতপা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ও বোধহয় আমাদের কাছে আর যেতে চায় না।'

'কেন বলুন তো ?'

'আপনাকে তো বলেইছি, ও আমাকে একটা মৃতদেহ মনে করে। ওর আকাঙ্খা ছিল, আমি মৃত্যু হব।'

'মানে ?' ডাক্তার বাগচী চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে কথাটি শুনে সোজা হয়ে বসেন।

'আমিও জানি না।'

ডাক্তার বাগচী কাঁধ ঝাঁকান। 'কত কিই যে আমরা জানি না।'

'আপনিও এই কথা বলছেন ?'

'কেন ?' ডাক্তার বাগচী হাসেন।

'ও বলতো।' সুতপা মাথা নিচু করে।

ডাক্তার বাগচী একটু ইতস্তত করে টেবিলের ওপব রাখা সুতপাব হাতের ওপব হাত রাখেন। সুতপা মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকায়। হাসে।

'চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। আপনি খুব ক্লান্ত মিসেস সেন।'

'আপনি আমাকে তুমি বলবেন।' সুতপা টেবিল থেকে তুলে সানগ্লাস পবে নেয়।

ডাক্তাব বাগচী উঠে দাঁড়ান। প্যান্টের ভিতর জামা গুজতে গুজতে সুতপার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, 'তুমিও। ছেলে মেয়েরা ভাল আছে ?'

ডাক্তার বাগচীর ঘরে আরাম কেদারায সুতপা গা এলিয়ে ছিল। তার পাশে মোড়ায় বসে ডাক্তার বাগচী বলেন, 'এ নিয়ে তোমাব কোনো পাপবোধ নেই তো ?'

'কেন ?' সুতপা চোখেব কোণে তাকায়।

'আফটার অল মিঃ সেন যখন বেঁচে আছেন —'

'প্লিজ। আমি বহুদিন মরুভূমির মত বেঁচে আছি।'

ডাক্তার বাগচী সুতপার কাছে এসে তাব গলায় চুম্বন করেন। 'ইয়ু আর বিউটিফুল সুতপা, ইয়ু আর ডেড্‌লি লিভিং। তোমার স্বামী তোমাকে জানত না।'

চেয়ারের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মণিময কাংড়া চিত্রের রেখারঙে ভেসে বেড়ায়। ঝগড়ুর কথাই সে বেখেছে। আবার পাগল হয়ে গেছে। এছাড়া প্রেমিকের কাছাকাছি কীভাবে থাকবে সে ? সুতপা তাকে নিতে এসেছে। ছেলেটিকে দুদিন দেখেনি সে। ঝগড়ু এসে বলে গেছে, জ্বরে সে বেঘোর। মাঝে মাঝে নাক, মুখ, কান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্তধারা নাবছে। সে দেখতে যেতে পারবে না। কেননা ছেলেটি যতক্ষণ না আয়না ভেদ করে চলে যাবে, ততক্ষণ তার কাছাকাছি থাকতে হলে পাগল হয়ে, এই বন্দিত্বের মধ্যেই থাকতে হবে। ঝগড়ু অবশ্য বলে গেছে, আয়নায় ফাটল দেখা দিলে সে তার বন্ধন খুলে দিয়ে যাবে। সে তার মৃত্যুমথিত প্রেমিকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, চুম্বন করবে, চাই কি, ঝগড়ুর সহযোগিতায় সবার অলক্ষে প্রেমিককে নিয়ে সে হেলিপ্যাডের খাদের ধারে চলে যাবে, তাবপর অতলযাত্রা, নীল পাত্রের খোঁজে।

এইভাবে বসে থেকে অনেক পংক্তি লিখিত হতে থাকে ··· আমরা যা করি তাব সবই

এই আঁকাআঁকি, কোনোটাই মূল নয়, সবই শুধু ছবি ক'রে আঁকা··· ছিন্নবিচ্ছিন্ন সব পংক্তি, যা কাংড়া চিত্রের রেখাগুলির মত কোথাও লেখা হতে থাকে··· সৃষ্টিদের সবধর্ম এইভাবে পাওয়া যায়, সব নাম মুছে শুধু সৃষ্টি নাম থাকে ··· এখন হয়তো ছেলেটির নাক দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসে ··· আলো, ব্যোম ও সময় খুব কাছে গেছে, এত কাছে – শুঁতো লেগে যাবে মনে হয় ··· জ্বরের তারসে, রক্তের উত্তাপে সে কি বিছানায় উঠে বসেছে ? সে কি ডাকছে .. আলো, ব্যোম ও সময় জীবিত ও সীমাহীন, বিশ্বময় ব্যপ্ত সত্তা, এই তিন জন ··· নিরঞ্জন, নিরঞ্জন ··· তবু তিন জন নয়, যদি ধবা যায় এই বিশ্বে শুধু একজন এরকম হবে ··· এবার মুখ থেকে ঝর্ণার মত উঠে আসছে রক্ত, ঘুঙুরধ্বনি অস্পষ্ট ··· হওয়া প্রয়োজন ছিলো, তবে বোঝা যায় আমি নিজে একা এই আলো, ব্যোম ও সময় ··· কান থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুলো রক্ত ··· শরীরই অন্তর আর অন্তরই শরীর ··· এই অনাদি একের থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো ....পায়ুদ্বার থেকে নির্গত রক্তে ভিজে যায় বিছানা-মানচিত্র .... সব-কিছু আলো, ব্যোম, সময়, কবিতা, দেহ একদিন হয়েছিলো ; কথা ছিলো হবে ... যন্ত্রণায় তাব দুই চোখ শূন্যতাকে ছুঁতে চায় ..... পুনরায় কবে যেন ; অকস্মাৎ শিহরিত হয়ে মনে হতে থাকে আজ তাই হলো ..... বাতাস চিরে জেগে ওঠে শূন্যতাকামী দুই হাতেব উদগীরণ ... গান গেয়ে উঠি আমি, গানের হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বব অনুসাবে সেই স্বরবর্ণগুলি ..... সে ডাকে, আযনায় ফাটল ধরাতে ধরাতে ... যেমন হ্রস্ব ও দীর্ঘ হয়েছিলো একদিন, স্বর সুব তেমনিই এক হয়ে স্বরলিপি আসে ... নিরঞ্জন, ওগো দারু নিরঞ্জন আমাব .... ।

দবজা খুলে গেছে । মণিময দেখে, ঝগড়ু পা টিপে টিপে ঢুকছে । তাব দুই চোখ লাল। গালে শুকনো অশ্রুধারা । সে ডুকরে ওঠে, 'শেষ হয়ে গেল বাবু ... এবার আপনাব বাঁধন খুলে দেব আমি .... সে বড় মায়া নিয়ে ডেকেছিল .. যেন রাইকিশোবী বাবু .... ঝগড়ু, আমার দারুনিবঞ্জন কই, তাকে ডাকো ....'

বাঁধন খুলতেই মণিময় দৌড় লাগায় । তার দুই কষ বেয়ে ফেনা । যেসব কবিতা সে কখনো লিখবে না, যেহেতু নিরঞ্জন লেখে না, সেগুলি উচ্চাবণ করে কবে তার দুই চোখ লাল। করিডোর দিয়ে সে দৌড়য় । চীৎকার ওঠে, 'ধরো, ধবো পাগল পালাচ্ছে।' কেউ তাকে ধরতে পাবে না । সে গোলাপ বাগিচাব ছেলের ঘরে এসে তাব বিছানায ঝাঁপিয়ে পড়ে । রক্তস্রোতে শুযে আছে ছেলেটি । তাকে জড়িয়ে ধরে সে চুম্বন করতে থাকে । অনেকে মিলে মণিময়কে জাপটে টেনে তোলে । টেনে নিয়ে যেতে থাকে ঘরের বাইবে । মণিময দেখে, করিডোরে দাঁড়িয়ে ঝগড়ু মুচকি হাসে । সে বোঝে, ঝগড়ু, এই তাব শেষ আয়না, 'জোন', যাকে এবার সে পেরিয়ে যাচ্ছে । মণিময় শোনেনি, ঝগড়ু তাব চলে যাওয়াব দিকে প্রণাম জানিযে উচ্চারণ করেছে, 'দারুনিরঞ্জন।' তখন তো মণিময় শব্দ ব্রহ্মে স্থির, সব নাম মুছে শুধু সৃষ্টি জেগে আছে ।

(এই বচনায বাইনের মাবিয়া বিলকে, গিওম আপলিনেব ও বিনয় মজুমদাবেব কবিতার অংশ ও নানা পংক্তি মণিমযেব লেখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।)

সমীর চৌধুরী

গ্যারিঞ্চা

বয়স বাড়ার নানারকম সিমটম আছে। চামড়া কুঁচকে যাওয়া, দাঁত পড়ে যাওয়া বা চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যাওয়া —এসব নয়—এগুলো পরবর্তী স্টেজ। শীত আসার খবর গাছ অন্যভাবে জানতে পারে, একটা দুটো পাতা হঠাৎই হলুদ হয়ে যায়। মানুষেরও তাই। কোমরে বাত, প্রেসারের ওঠা-নামা, সুগারটুগার—সবচেয়ে বড় কথা লাখলাখ-পতিদের বাদ দিলে বাকি সকলের ঘাড়টা কমজোরি হয়ে যায়, মাথাটা একটু ঝুলে পড়ে নিচের দিকে। হয়ত কারুর কারুর এমনও মনে হয়, মাথাটা কোনোদিনই ঘাড়ের ওপর সোজা ছিল না। শুধু বুকের ভেতর বয়সকালের তেজি আলো সেটাকে খাড়া করে রেখেছিল।

পরেশবাবুর ক্ষেত্রেও সিমটমগুলো সব ঠিকঠাক আছে, শুধু ঘাড়ের ব্যাপারটাই একটু অন্যরকম। হপ্তায় পাঁচদিন বাজার। শুক্র শনি রবি মঙ্গল বুধ। এরই জেরে চলে যায় অন্য দুটো দিন। তা তেলচিটে থলিটা নিয়ে গলির মুখে পা দেবার সময় মাথাটা বেশ উঁচু হয়ে থাকে ; এতটা উঁচু থাকার কথা নয়। ফেরার পথে অবশ্য ঠিকঠাক ঝুঁকে পড়ে, বয়েসও বেড়ে যায়।

এটাই স্বাভাবিক। পরেশবাবুর মতো লোকেদের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত ঠিকঠাক থাকার সীমা—তারপর অনবরত মেরামত। হেড কেরানি হলেও, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির একজন এটাই তো শেষ পরিচয় ! তা হয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ। দুই ছেলে ধম্মের ষাঁড়। খায়দায়, রক, ফুটবল, তেন্ডুলকর—এসব নিয়েই আছে। ওদের দিয়ে আর যাই হোক, বাজার হয় না। প্রথমত ব্যাচেলার বাজার করবে—কার সঙ্গে কী মেলে, কোন সবজির সঙ্গে কোন সবজি নিলে একটা তরকারি হতে পারে—তাই বোঝে না। খামচা মেরে মেরে জিনিস কেনে। পয়সারও শ্রাদ্ধ। তার মতো এত ঘুরে ঘুরে, ফড়েদের সঙ্গে দরাদরি করে, বেছে বেছে জিনিস কেনা ওদের কম্ম নয়। আর আছে মেয়েটা। সবে কলেজে। পিঁড়িতে তোলার বয়েস হয়ে এল—চিন্তাটা শিঙ্গি মাছের মতো কাঁটা মারে।

তো পরেশবাবুর বাজার যাওয়ার দৃশ্যটা যদি দেখি সেটা এইরকম ঃ টালির চাল থেকে বেরিয়ে প্রথমে গলির মোড়ে সিগারেট ! তারপর ডেল কার্নেগি—মাথা-উঁচু, প্রতিটা স্টেপ মাপা।

তালটা কেটে যায় মাছের বাজারে ঢুকে। 'টাঁই কত করে ?' হলুদ মাংসল গাদার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা চারবার করতে হয়। দোকানদার চেনে। জবাব দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন মনে করে না। পুলিশ অফিসারের বউ আর জমিবাড়ীর এক দালালের সঙ্গে চুটিয়ে 'বাতিয়া' করে। তবে পাঁচবার জিজ্ঞেস করার পর কয়েক সেকেণ্ডের করুণাপাত ঃ 'নব্বই টাকা, নিয়ে যান, একদম টাটকা —'

এই শুরু। থলি হাতে বিদেশিনী নীলনয়নার মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে স্বপ্নসুন্দরী টাঁই, চিতল, বোয়াল ; মাল্টি-ন্যাশনালের বড়সাহেবের মতো আজ প্যারিস কাল লণ্ডন — গলদা ; অভিজাত বাড়ির বড়গিন্নির মতো অহংকারী গোবদা-মুখো পেল্লায় কাতলা পার হয়ে মধ্যবিত্ত তেলাপিয়া, অবশেষে নিম্নবিত্ত ভেলা-ভেটকি-সুন্দরীর কাছে এসে যখন স্থির হন পরেশবাবু, ততক্ষণে সিগারেটের মৌতাত উবে গেছে, মাথাটা আর তত সোজা নেই।

কোনো কোনোদিন ভোলা-ভেটকি না থাকলে তেল-কাঁটা-পটকা—ব্যাসন দিয়ে মাছের তেল বেশ ভালোই জমে—কিন্তু ছন্দা, বিনয় আর দেবাশিসদের মা বাসনে গন্ধ হয় বলে দারুণ চোটপাট করে।

ঘাড়ের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটুকুও নেমে যায় সবজির বাজারে। একটা পাতিলেবু একটাকা, শালা পটলের মতো বেবাক ফালতু জিনিস, অহংকারে তারও পা পড়ে না মাটিতে.

দরদাম করা আর পালিয়ে যাওয়া। এইভাবে সারা বাজারটা কয়েকবার চরকি পাক খেয়ে, তেলচিটে থলিটা বেশ হালকা—এটা অনুভব করতে করতে কোনোদিন একটা বিড়ি, কোনোদিন আবার তাও নয়, একনাগাড়ে পথের দিকে চেয়ে, পরেশবাবু টালির চালের উঠোনে—বাজারের ব্যাগটা রান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে ঘামে ভেজা জামাটা খুলে ঝুলিয়ে দিতে দিতে হাঁক ছাড়লেন 'কি হল, কোথায় গেলে ?'

দুটো মাত্র শোবার ঘর। বড় ছেলে বিনয়, মেজ দেবাশিস আর তিনি নিজে একটা ঘরে, ছন্দা আর তার মা অন্য ঘরে শোয়। ছেলেদের ঘর থেকে একটা উত্তপ্ত বিতর্কের স্বর ভেসে আসছিল। ছন্দা আর দুই দাদার গলা। তারে ঝোলানো ভিজে গামছাটা টেনে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে চরম বিরক্তিতে আরো একবাব হাঁক ছাড়লেন, 'কী হলো, আজও কি লেট করিয়ে ছাড়বে নাকি ?'

দাওয়া ছেড়ে নড়তে পারছেন না পরেশবাবু বেড়ালের ভয়ে। চার-পাঁচটা ভিজে বেড়াল এই পাড়া শাসন করে। এমনি কেউ কোথাও নেই, কিন্তু একটু ফাঁক পেলেই মাছ দুধ—যাহোক কিছুতে থাবা বসাবে।

বাথরুমটা এই বাড়ির পিছন দিকে। সেদিক থেকে করুণা সামান্য বিরক্তি, কিছুটা উদ্বিগ্নতা নিয়ে 'কি হলো অত চ্যাচাচ্ছো কেন !' বলতে বলতে পরেশবাবুর সামনে।

যথারীতি শান্ত পরেশবাবু। স্ত্রীর ঘামে ভেজা মুখটা দেখতে দেখতে কয়েক সেকেণ্ডের স্মৃতিচারণার পর বললেন, 'একটু চা দাও, চান করতে যাব। পব পর দুদিন লেট হয়েছে — সে খেয়াল আছে ?'

করুণা কী বলবেন, শোনার অপেক্ষা না করে তর্কের মাঝখানে ছেলেদের ঘরে পরেশবাবু। দুটো ঘরের মধ্যে এই ঘরটাই একটু সাজানো গোছানো। খাট, আলমারি ; আলমারির মধ্যে নানা টুকিটাকির মধ্যে সুদৃশ্য একটা পিতলের কাপ—যে কেউ এই ঘরের মধ্যে ঢুকবে কাপটা তার নজরে পড়বেই আর সে অনুমান করে নেবে—খেলাধুলোর একটা চর্চা এই পরিবারের কারোর না কারোর মধ্যে বেশ ভাল্যেভাবেই ছিল — তা না হলে এমন সুন্দর একটা কাপ, সম্ভবত কোনো খেলায় সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতির নমুনা —এই ঘরে থাকত না।

পরেশবাবুকে দেখে ছেলেমেয়েরা থমকে গেল। এক পলকেই পরেশবাবু বুঝে নিলেন। দুই ছেলে একদিকে আর মেয়েটা একদিকে। তর্ক করে ওবা ছন্দাকে একেবারে কোণঠাসা করে ছেড়েছে।

ছন্দার সেকেণ্ড ইয়ার চলছে। আধুনিক পৃথিবীর অনেক খবরাখবর রাখে। খুব সহজে হার মানার নয়। কিন্তু দুই দাদার কাছে কোণঠাসা হয়ে তার মুখ-চোখ লাল, সামান্য উত্তেজিত।

পরেশবাবু ঘরে ঢুকলে সাধারণত দুই ছেলে খুব ব্যস্ততাব ভাণ করে বেরিয়ে যায় অথবা অন্য ঘরে চলে যায়। কিন্তু এখন তাদের বেরিয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বিনয় চেয়ারে আর দেবাশিস খাটের এক কোণায় বসে মুচকি হাসি ঠোঁটে রেখে একবার ছন্দাকে আর একবার বাবাকে দেখতে লাগল।

পরেশবাবু খাটে বসতেই ছন্দা বেশ অভিমান মেশানো গলায়, কিছুটা আবার ডুবন্ত মানুষ যেভাবে নদীতে ভেসে-যাওয়া চ্যালাকাঠ আঁকড়ে ধরে —সেই ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক সময়ে তুমি এসে গেছ বাবা।'

'কেন, কি হলো আবার ?'

'আমাদের তর্ক হচ্ছিল।' ছন্দা বলে, 'দাদারা শুধু গলার জোরে জিততে চায়। আমি বলছি পেলে, ইউসোবিও আর গ্যারিঞ্চার মধ্যে — নো ডাউট এঁরা তিনজনেই বিরাট প্লেয়ার—কিন্তু আমি বলছি, এঁদের তিনজনের মধ্যে গ্যারিঞ্চাই সবচেয়ে ভালো সোয়াভিং কিক নিতে পারত'

ছন্দার কথা শেষ হবার আগেই বিনয় তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আসলে খেলা ব্যাপারটা তোর কাছে সেকেণ্ডারি ; গ্যারিঞ্চার ট্র্যাজিক জীবনকাহিনী, পেলের সমপর্যায়ের খেলোয়ার হওয়া সত্ত্বেও পেলের খ্যাতির আড়ালে চিরকাল ঢাকা পরে থাকা শেষ জীবনে তুমুল অর্থকষ্ট, মদ্যপান আর নিঃসঙ্গতা—এইসব মিলিয়ে গ্যারিঞ্চার যে ইমেজ—এই ইমেজটাই তোকে হন্ট করে—'

'হয়ত', ছন্দা বলে, 'বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে অমন একটা অদ্ভুত খেলোয়াড় আবার কবে জন্মাবে—ভাব একবার, ছোটবেলায় পোলিও হয়ে প্রায়-প্রতিবন্ধী—ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো বাঁকা পা—যে দলে টোস্টাও, জোয়ারজিনহো, পেলে—তেমন একটা দলে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে নিজেকে দাঁড় করানো—রিয়েলি—ব্যাপারটা আমাকে সত্যিই খুব হন্ট করে।' এই পর্যন্ত বলেই দুই দাদাকে দেখে ছন্দা। ওদের ব্যঙ্গ-হাসি তার আবেগ ফুটো করে। ভেতরে ভেতরে আবার খানিকটা উত্তেজিত—বলে ওঠে সে, 'কিন্তু এটা ঠিক যে, গ্যারিঞ্চাই সবচেয়ে ভালো সোয়ার্ভিং কিক নিতে পারত। একবার তো মাঝমাঠের লাইনেব ধাবা থেকে—অপোনেন্টের এগারজনকে ছবির মতো দাঁড় করিয়ে রেখে বিরাট এলাকা জুড়ে বল সোয়ার্ভ করিয়ে গোল করেছিল।' বাবার দিকে তাকিয়ে বাকিটুকু শেষ করে, 'তুমি এখনকার খেলার খবর তত না রাখলেও, একসময় তো খুবই ভালো খেলতে, বলো তো, আমি ঠিক বলেছি কিনা ?'

—পরেশবাবু আলমারিতে রাখা কাপটা একবার দেখলেন। বুকের ভেতরটা ফুটবল মাঠের মতোই ফাঁকা মনে হলো। গরমের রোদে এতটা পথ হেঁটে আসার জন্য এমনিই শরীর আনচান করছিল, তার ওপর 'সোয়ার্ভিং কিক', শব্দ দুটো মাথার মধ্যে ঢুকে কী সব লণ্ডভণ্ড পাকিয়ে আরো অস্থির করে তুলল। কোনোরকমে বললেন, 'আর খেলাধুলো —সেসব কবেই গেছে !'

ছন্দা বিরক্ত হয়। 'তোমার এজের বেশির ভাগ লোকেরা কেন যে এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে বুঝি না ! সব কিছুতেই একটা হুতুশে ভাব ! আমি কিন্তু বাবা, এখনকার বাজ্জো, রোমারিও, বেবেতো বা কানিজিয়ার মতো খেলোয়াড়দের কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। গ্যারিঞ্চা তো তোমাদের আমলের —'

পরেশবাবু কিছু বলার আগেই দেবাশিস বলল, 'বাবা কি করে বলবে শুনি ? বাবা খেলাধুলো করত ঠিকই, কিন্তু কি খেলত ? ঐ তো, আলমারিতে যে প্রাইজটা রয়েছে—ওটা তো বাবা টেবিল টেনিস খেলে—'

ছন্দা বাধা দিয়ে বলল, 'তোর মাথা ! বাবা ফুটবল খেলে ঐ প্রাইজটা পেয়েছিল একটা টুর্নামেন্ট থেকে ! এই তো, সামনেই বসে আছে জিজ্ঞেস কর না—'

দেবাশিস রীতিমতো অবাক। তার মিচকে হাসি নিভে গেছে ! একবার বাবাকে দেখে নিয়ে ছন্দার দিকে ফিরে বলল, 'তুই উল্টোপাল্টা বকছিস। এই তো গত হপ্তায় অলক এসেছিল—টেবিল টেনিস নিয়ে কথা হচ্ছিল—বাবা বলল—'

তাদেব কথা শেষ হবার আগেই বিনয় বলল, 'তোদের দুজনেরই মেমারি খুব শর্ট। আমার বেশ ভালোই মনে আছে—বছর চারেক আগে ঐ কাপটা নিয়ে কথা উঠেছিল। তখন বাবা আমাদের বলেছিল কলেজ টিমে ক্রিকেট খেলে বাবা ওটা পেয়েছিল। আমার বেশ ভালো মনে আছে, বাবা ওয়ান ডাউন ব্যাট করত—'

দেবাশিস আর ছন্দা দুজনেই তেড়ে উঠল একেবারে বিনয়কে। দেবাশিস বলল, 'দূর দূর ! আমাদের নয়, তোর নিজেরই মেমারি শর্ট আছে। কোথাও কিছু নেই—অমনি বলে দিলি, বাবা ক্রিকেট খেলত, অ্যাঁ !'

ছন্দা বলল, 'কার মেমারি শর্ট বাবাকেই জিজ্ঞেস কর না দাদা !'

ভয়ানক অসহায় পরেশবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পর পর দু'দিন লেট

হয়েছে অফিসে। প্রাইভেট ফার্মে–'

তার কথা শেষ হবার আগেই করুণা চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'এতক্ষণ তো চা চা করে সাতপাড়া মাথায় করছিলে, এখন আবার উঠে পড়ছ যে !'

অপ্রস্তুত পরেশবাবু, চা-ও কখনও কখনও তেতো মনে হতে পারে এটা অনুভব করে, চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে শেয়ার বাজারে খুব সম্প্রতি সর্বস্ব খুইয়ে-ফেলা কোনো অব্যবসায়ীর মতো খাটের এক কোণে বসে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে আলমারিতে রাখা পিতলের কাপটা একবার দেখে নিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। করুণা স্বামীকে একবার দেখেই ছেলেমেয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'সক্কালবেলায় কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে শুনি ?'

ছন্দা আনুপূর্বিক বলতেই স্বামীকে ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ছন্দা বলল, 'কী হলো বাবা, বললে না যে ! সোয়ার্ভিং কিক–'

বিনয় তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তার আগে ঠিক হোক, আমার কথা ঠিক না তোদের ! ফুটবল সম্পর্কে বাবা অত কথা জানবে কী করে। বাবা তো ক্রিকেট খেলত-'

জিভ পুড়ে যায় প্রায়। তবু তাড়াতাড়ি কাপটা শেষ করে ফেললেন। হয়ত কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু স্মৃতির হাওয়া ঘুরে গেল মগজের মধ্যে দিয়ে। ছেলেমেয়েরা যে কেউ-ই মিথ্যে কথা বলছে না, এ শুধু তিনি জানেন ! কখন কাকে কী বলেছেন, নিজেরও কী ছাই মনে আছে।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে আলমারির মাথায় রাখা কৌটো থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালেন। তারপর ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খেলাধুলো করেছি, কিন্তু তাই নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা তো কোনোদিন করিনি –'

নিজেই বুঝতে পারলেন, উত্তরটা ঠিক হলো না। কিন্তু আর কী বলবেন তিনি। একটা মাত্র কাপ, জীবনও একটা। ইউক্যালিপটাস জড়িয়ে ওঠা লতানে গাছের মতো মনে সেঁটে ছিল কত সাধ স্বপ্ন, ছিল একদিন। যত পিছু হটেছেন ততই ঐ কাপটাকে আঁকড়ে ধরেছেন। অথচ কী ভীষণ মিথ্যে ওর সারা শরীরে জড়ানো, তা শুধুমাত্র তিনি একাই জানেন। কোনোদিন কাউকে বলতে পারবেন না। বলা সম্ভবও নয়, খুব কনশাসলি তিনি পাকে-পাকে এই মিথ্যের আবরণে নিজেকে জড়িয়েছেন–অথবা আসলে মিথ্যে নিজেই তাকে জড়িয়েছে।

বাব-মায়ের মধ্যে এমন একটা কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার ছিল–যার কোনো হদিশ তিনি পাননি। তার এক মাসি আত্মহত্যা করেছিল। কেন, কী কারণে, সেই সময়ে–অর্থাৎ যখন তার বয়েস বারো-তেরোর মধ্যে–জানতেন না ; অনেক পরে জেনেছিলেন, অবিবাহিত সেই মাসির গর্ভে আসলে তার বাপেরই বীর্যশুক্র দানা বেঁধেছিল।

বড় তিক্ত সেইসব স্মৃতি। একটা মাতাল, খেউড়বাজ লোকের মোটা গলায় অন্ধকার ছড়ানো কথাবার্তা, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে মায়ের কান্না, তারই মধ্যে টালির ফাঁক চুঁইয়ে-আসা রমণশব্দ–তারপর চোদ্দ না পোরোতেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য–বাবা আর মামার মধ্যে ঘরের মধ্যে যখন উত্তপ্ত তর্ক চলছে, দরজা বন্ধ বাথরুমের ওপাশে তখন মায়ের সতীদাহ !

খরার আকাশে বিলীয়মান মেঘের মতো বিড়ির ধোঁয়ার দিকে চেয়ে পরেশবাবু, অনেকটা নাটকীয় স্বগত প্রশ্নের মতো, বলেন, 'গ্যারিঞ্চার বাবা-মায়ের সম্পর্ক কিরকম ছিল ?'

তিনজনেই সামান্য অবাক। ছন্দা বলে, 'আমি আসলে গ্যারিঞ্চার সংক্ষিপ্ত একটা জীবনী পড়েছি। এত ডিটেলস খবর বলতে পারব না। তবে ছেলেবেলায় পঙ্গু ছিলেন–অনুমান করা যেতে পারে, সমবয়সী ছেলেদের খেলাধুলো দেখতে দেখতে খুব কষ্ট পেতেন নিজের প্রতিবন্ধী শরীরের জন্য। অসাধারণ সংগ্রাম করে নিজেকে তুলে এনেছিলেন বিশ্ব ফুটবলের একেবারে সামনের সারিতে। কিন্তু সেই অর্থে তেমন কোনো সম্মান পাননি। সবাই পেলেকে নিয়েই মাতামাতি করেছে। লোকচক্ষুর আড়ালে, চূড়ান্ত অভাব আর অবহেলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে–

পরেশবাবু বললেন, 'তাব মানে এক অর্থে ব্যর্থই বলা যায় গ্যারিঞ্চার জীবন। আমাদের– সাধারণ মানুষদের চোখে–মূল্য না পাওয়াই তো ব্যর্থতা।'

ছন্দা কিছু বলছে, কিন্তু স্মৃতিমগ্ন পরেশবাবু দেখলেন বাথরুমের টিনের দরজা ভেঙে মামা মাকে বের করে আনছেন। কাপড়টা আগেই পুড়ে গিয়েছিল, শায়ার দড়িটা টানতেই উলঙ্গ মা দগ্ধ শরীর নিয়ে খাঁটের নিচে। কে খবর দিল, কী করে এতো লোকে জানল, বোঝা মুশকিল–কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকারণ্য বাড়ি, অদ্ভুত এক ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ–সব মিলেমিশে এক অন্য অনুভূতি। তারপর হাসপাতাল, পুলিশ কেস, পলাতক পিতা–এইসবের মধ্যে প্রায়– আওয়ারার মতো প্রথম কৈশোর ; কলকাতার গলিগুলো বড় চেনা হয়ে ওঠে সেই সময়। কখনও কান্না পায়, কখনও চোয়াল শক্ত ক্রোধ। এব মধ্যে মা বাড়ি ফেরে প্রাচীন দগ্ধ শরীরে। পুলিশের সঙ্গে কী সব রফা-টফার পর বাবাও।

পাড়ায় স্পোর্টস ছিল। সাঁতাব, খেলাধুলো, মাবামাবি, দৌড়োনো, লেখাপড়া–সব ব্যাপাবে তিনি ছিলেন পিছিয়ে-পড়া ছেলে। কেউ দলে নিতে চাইত না। অনেক কাকুতি মিনতি কবে কখনও গোলকিপার, কখনও শেষ ব্যাটসম্যান–তাও লোক কম বলে। অথচ মায়েব কী বিরাট আশা। ছেলে একদিন খুব বড় হবে, মায়ের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে।

নিজে কিন্তু নিজেব ওপর খুব আশাবাদী ছিলেন না। ভোলা মুশকিল সেই সব নির্মমতা। 'ন্যাদোস', 'বল্‌দা'–সমবয়সীদেব ছাড়িয়ে সেইসব শ্রদ্ধেয়বা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার পরও এইসব শুনতে শুনতে, একদিন দেখলেন, বর্মি-প্যাটার্ন মুখ, অঙ্কের মাস্টার ডি.সি–দেবেন চক্রবর্তীর নির্দেশে, ক্লাসের সবচেয়ে কমবয়সী, নির্মল, তার কান মুচড়ে দিচ্ছে। তারপরও তার চোখে জল না দেখে হতাশ ডি.সি. বলেছিল –'কিছু হবে না ওর দ্বারা, বলদদেব মান-অপমান থাকে না–'

দগ্ধ মানুষটা এসব জানতেন না। গভীর বিশ্বাসে ডাকতেন তাকে। সেই ছাল-চামড়া ওঠা দেহ থেকে অনেকটা দূবে দাঁড়িযে–প্রায় চৌকাঠের সামনে–কথা বলতেন তিনি। স্পোর্টসে নাম দেবার পর মাকে–এমনিতে নিজেব কথা কিছুই বলতেন না, গলা বুঁজে আসত কঠোব অভিমানে, অথচ সেদিন, হঠাৎ কী খেয়াল হলো –জানিয়েছিলেন খববটা। তো নিশ্চিত বিশ্বাসে তিনি বলেছিলেন, 'কী প্রাইজ পেলি আমাকে দেখাস।'

যেন প্রাইজ পাওয়াটা একরকম নিশ্চিতই !

একশো মিটাব দৌড়ে নাম দিয়েছিলেন। দৌড় শেষ করলেন আটজনেব পিছনে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন–শুধু বিছানায পড়ে থাকা দগ্ধ মানুষটার জন্যে !

দৌড় শেষে মাঠ ছেড়ে এলেন অদ্ভুত এক অভিমানে। যে আটজন তার আগে দৌড়েছে, অভিমান তাদের ওপরে, অভিমান বিচারকদের ওপরে, অভিমান মাঠের প্রত্যেকটা লোকের ওপরে, যেন তাকে নয়, সবাই মিলে চক্রান্ত করে এক দুঃখী আগুনে-পোড়া মহিলাকে হারিয়ে দিয়েছে।

চুপি চুপি বাড়ি ফিরলেন। জমানো পয়সার ভাঁড় ভেঙে ছুটলেন দোকানে। পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দেখেছেন, শো-কেসে সাজানো দারুণ সুন্দর সুন্দর সব ছোট-বড় প্রাইজের কাপ, দু'জন বিদঘুটে চেহারার বক্সারের ছবি।

বেশ বড়-সড় একটা কিনে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি। দগ্ধ মানুষটার একেবারে সামনে, 'মা, এই দেখ, আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি –

বিড়িতে শেষ সুখটান দিয়ে হাতিবাগান থেকে কেনা দশ টাকার অ্যাশট্রেতে যখন সেটা গুঁজছেন পরেশবাবু, ছেলেমেয়েরা যে অবাক চোখে তাকে দেখছে – এটা বুঝতে অসুবিধে হল না তার।

ছন্দা কীসব বলছিল এতক্ষণ। একটা দুটো শব্দ ছাড়া সবই অস্পষ্ট তার কাছে। বিনয়

আর দেবাশিসের অনেককাল অবাক হওয়ার অভ্যেস নেই। সিরিয়াস ভাব মুছে আবার সেই মিচকে হাসি। দেবাশিস বলল, 'বাবা পুরনো দিনের কথা মনে করার চেষ্টা করছে । অনেক আগেকার কথা না !'

বিনয় বলে, 'কী যেন সেই শব্দটা–'

মনে করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয় সে।

ছন্দা বলে, 'নস্টালজিয়া–'

ওদের হাসিতে আনমনার জলাশয়ে ঢিল পড়ে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে বিশাল মাঠে বাজপড়া গাছের মতো একা হয়ে যাওয়ার অনুভূতিতে তলিয়ে যেতে থাকেন তিনি।

শুরু এভাবেই, তারপর পাকে পাকে নিজেই কখন জড়িয়ে পড়েছিলেন। মোহ একটা। একসময় তো এমন একটা বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে কাপটা তিনি সত্যিই দৌড়-প্রতিযোগিতায় জিতেই পেয়েছেন। একটার পর একটা ব্যর্থতা এই বিশ্বাসকে উপড়ে ফেলার বদলে আরো জল দিয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট হলো না, চুলকুমারী, মাখন-সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু সে রয়ে গেল অলৌকিক জ্যোৎস্নায় মাঝরাতে উড়ে যাওয়া বালিহাঁসের মতো নিঝুম স্বপ্নময় ; ভালো কোনো চাকরির আশা ছিল না,—বাবা কিছু দেনা, অনেক অপমান আর তিক্ত স্মৃতি রেখে চলে গেল, তার আগে মা ; ঘুরে ঘুরে হা-ক্লান্ত অবশেষে এই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে। লুকিয়ে কবিতা লিখতেন কিশোর বয়েস থেকে। 'সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজে/তোমার কথা মনে পড়ে।

কোথাও ছাপা টাপা হয়নি। বিয়ের পর করুণা সেইসব খাতার আবর্জনা, কয়েকটা কবিতার বই, রবিবারের খবর-কাগজের সঙ্গে পুরনো কাগজ কিনতে আসা লোকটার কাছে চালান করে সেই পয়সার ব্লাউজ কিনেছিল। এখনও, করুণা যখনই বলে চিরকেলে বাঙালিয়ানায়, 'তুমি আমাকে কী দিয়েছ ?' তখন করুণার মুখের দিকে চেয়ে পরেশবাবুর সেই খাতাগুলোর কথা মনে পড়ে। চাপা দীর্ঘশ্বাস মাটিতে পড়ে না, বুকের মধ্যেই ঘুলিয়ে উঠে মিলিয়ে যায়। স্ত্রী, মাছওলা, অফিসের বেয়ারা–প্রত্যেকের কাছেই তিনি অতি তুচ্ছ। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি মানেই একগাদা ক্যাওড়া লোকের ভিড়। হিন্দুস্থানী বেয়াবা রামবিরিজ প্রায় প্রতিদিনই অদ্ভুতভাবে তাকে অপমান করে। মুখের ওপরেই বলে, 'হামি এখন জোল দিতে পারবে না, বেস্ত আছে, যান না, মালিকের কাছে রিপোর্ট করুন না !'

একঘর লোক, এমনকি অনেক সময় বাইরের লোকের সামনেও এসব কথা শুনতে হয় তাকে। পরেশবাবু জানেন, মালিকের কাছে বলে লাভ নেই।

অদ্ভুত এই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক। তুখোড় ইংরেজি বলতে পারেন, বাঙলাও ভালো জানেন, শিক্ষিত ; অথচ মাঝে মাঝে রুচিহীন ভাষায় নিষ্ঠুর আক্রমণ করতে পাবেন। একটা সামান্য ভুলের জন্য বিকৃত মুখে তাকে বলেছিলেন, 'প্যাঁরদি ইয়ারা ! কী হো গিয়া তেনু ! মেরা তো বুণ্ড মার দিয়া তুনে–'

এছাড়া আছে আরো একদল। সিঁড়ির তলায় বসে জুয়া খেলে, দিনের বেলায় ছিপি খোলে। পয়দাখোর। লরিঅলাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্যাচাল বাধে। রামবিবিজের ওদের সঙ্গে কিরকম একটা সম্পর্ক আছে। ফলে বাড়িতে তিনি বাজার দোকান করার লোক, অফিসে মাছিমারা–

ছেলেমেয়েরা যতই তাঁকে অবাক হয়ে দেখুক বা পরিহাসের হাওয়ায় উড়িয়ে দিক, ওদের দিকে তিনি আর তাকাবেনই না ঠিক করে নিয়েছেন। চোখের ভেতর ঘুলিয়ে-ওঠা নীল-জল চেপে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, 'মনটা বড় খারাপ ! বাজার থেকে ফিরছি, আমার বহু পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। একসময় আমার প্রাণের দোস্ত ছিল–অথচ এখন সে অন্ধ হয়ে গেছে !'

বলেই যাবার জন্যে পা বাড়ালেন পরেশবাবু। চোদ্দ বছর বয়সে এক আগুনে–পোড়া

মহিলাকে শাস্তি দেবার জন্য যে মিথ্যার সূচনা, তারপর নিজেই নিজের অজান্তে যে মিথ্যার ফাঁদে জড়িয়ে পড়া—আজ সেই মিথ্যের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এটুকু মিথ্যে তেমন কিছু নয়।

দেবাশিস বলল, 'অন্ধ ! কি করে হলেন ?'

ছন্দা বলল, 'কে বাবা ? কোথায় থাকেন ?'

'—সে অনেক কথা ! পরে একদিন বলব। পর পর দু'দিন লেট হয়েছে—আজ লেট হলে রক্ষে নেই—'

ঘর থেকে বেরিয়ে গামছা নিয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই করুণার সঙ্গে দেখা। স্বামীর পথ আগলে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ছি ছি ! ছেলেমেয়েদের মিথ্যে বলতে তোমার আটকাল না ! বউভাতের রাতে আমাকে তো বলেছিলে বক্সিং লড়ে পেয়েছো ওটা ! তখন তোমার চেহারা ভালো ছিল—তা বক্সিং করেই যদি পেয়েছ তো ওদের মিথ্যে বললে কেন ?'

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যে চোখে পাত্রপক্ষের দিকে তাকায়, অনেকটা সেই দৃষ্টিতে স্ত্রীকে একবার দেখে নিয়েই পাশ কাটালেন। কতটুকুই বা পথ। বাথরুমের কাছে যখন পৌঁছলেন তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করেই ঝাপসা হয়ে গেল সবকিছু।

সোহারাব হোসেন

গাভীন সময়ে

এখন রাত্রি মধ্যযামে। শীতকালের রাত্রি। কালো ঘুটঘুটে। নিকষ। দু'হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। শুধু শব্দ শোনা যায়। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। রাতপাখির ডাক। বন বিড়ালের ডাক। আর একজোড়া একজোড়া দু'জোড়া মানুষের নিঃশ্বাস-হাফানি। শ্যালো-টিউবওয়েল বসানো 'কলপোতা' মিস্ত্রি ওরা। একধারে হকালে আর হোছেন আলি। অন্যধারে রশিকুল আর নজর আলি। পাম্প চলছে। অনবরত। সেই সন্ধ্যারাত থেকে। মাঝে মাঝে এমন কুহকে-কসমে পড়ে যেতে হয় তাদের। হাজার ফুট বারো'শ ফুট বোরিং করেও মাটি মা'র বুকের নরম কোল পাওয়া যায় না। পাথব পাথর। বালির হদিস মেলে না। মেলে তো জলের হদিস মেলে না। অথচ তখন আর পাইপ টেনে নেওয়াব উপায়ও থাকে না। আবার পাম্প বন্ধ করে রাখাও যায় না। নবম বুকের বালি তখন সারা বাতের চাপে হিমালয়ের হাড়-হক্কড় পাথর হয়ে যায়। ফলে পরের দিন আব পাইপ টেনে তুলে নেওয়া যায় না। হদ্দ আঁটা এঁটে যায়। কার বাপের সাধ্যি আছে যে সে পাইপ তোলে। হেড-মিস্ত্রি হোছেন আলি জানে, এমন অবস্থা হলে হাজার হাজার টাকার পাইপ মাটির নিচেতেই থেকে যাবে। সে আর এক হাংনামার ব্যাপার। তাই সারারাত ধরে চলতে থাকে পাম্পটাকে চালু রাখার প্রাণপণ করসৎ।

এই হাড়-হিম শীতের বুকের মধ্য থেকে ওম খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ চারটি মানুষের মেরুদণ্ড বরাবর ঘাম ঝরছে। নিশুতি নিঃস্তব্ধ রাত। কোথাও কোন শব্দ নেই। রাত জাগা পাখিরাও আজ সন্ত্রস্ত। কামাক্ষাপুর, সাতজেলে, মোল্লাখালির বাত্রি আজ অতি মাত্রায় সচেতন। সন্ধ্যে হতে পারেনি অমনি সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। হোছেন আলির দলের অন্য সকলে সারাদিনের কঠোর খাটুনির শেষে ঘুমে কাদা-কাদা। গ্রামের প্রান্তে ফাঁকা মাঠের ধারে 'ছাইড'। সাতজেলে গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে বসাতে হবে এই টিউবওয়েল। জলের কল।

দলের মধ্যে নজর আলিই সব থেকে বড়ো। বয়স পঁয়ত্রিশ পেবিয়ে দু'কুড়ির কাছে। দমে পেরে ওঠে না। হাফ ধরে যায়। ফুসফুসে বাতাসের অভাব ঘটে। শ্বাস বইতে চায় না। একটু জিরেন দরকার। টানা দু'ঘন্টা চলছে পাম্প। সবাই চাইছিল জিরেন। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিল না কেউ। বললেই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। সকালে উঠে সকলে ঠাট্টা-ঠিল্লি শুরু করে দেবে। কলপোতা মিস্ত্রিদের আবাব দুর্বলতা কি? হাড়ভাঙা খাটুনির আর শেষ নেই। তবুও নজর আলি না বলে পারে না। বলে: 'এট্টু জিরেন নে হোছেন। বুকির মধ্যি য্যানো দোম এঁটকে যাচ্ছে।'

নজরের কথা শেষ হতে না হতেই থেমে যায় যান্ত্রিক শব্দ। থেমে যায় চার জোড়া হাত। ফলে আরো নিঃস্তব্ধ হয়ে পড়ে রাত্রি। এতক্ষণ তবুও একটা যান্ত্রিক আওয়াজ তাদের সব মনোযোগ টেনে রেখেছিল। এখন একদম নিশুতি। বিরাট এক নীরবতা। যেন একটা অনন্ত হা—এসে সব শব্দকে খুবলে খেয়ে নিয়েছে।

হোছেনই কথা তোলে প্রথম তিন জনের হাতে বিড়ি দিতে দিতে। পিঠোপিঠি চারজনই কথা যুগিয়ে চলে:

— তালি দাঙ্গা বাধবে এখেনেও ?

— কি জানি। খোদাইমালুম।

— সাতজেলে-মোল্লাখালি য্যানো বারুদির ঢিবের ওপর।

— শালা নাং করবি তা আর অন্য নাগর পালি নে। হিঁদুর মেয়ে মোছলমানের ছেলে।

— শোরের বাচ্চারা নিজিরাও মজলো —আর দেশ সুদ্ধু সবাইরে মেরে রেখে গেলো।

— তালি দাঙ্গাডা একেনেও বাধপে ?

— না। পাটির কমরেডরা বলেছে, বুকির রক্তের বিনিময়েও সম্পিতি বজায় রাখতি হবে।

— কিন্তুক বি.জে.পি. যে বলেছে বদলা নিতি হবে।

কথার পিঠে কথা পড়তে পড়তে থেমে যায় কথা। কোন উত্তর মুখে যোগায় না কারো। আসলে সবাই তলিয়ে যায় এক আসন্ন বিপদের মধ্যে। তলিয়ে যেতে যেতে ভাবে। বিকেলের কথা। বিকেলের সেই সাবধান বাণীর কথা। পাশের মোল্লাখালি গ্রাম থেকে ক'জন মুসলমান এসে, অতি গোপনে জাতভাইয়ের দাবি নিয়ে হোছেনদের সাবধান করে গেছে। বলেছে, 'দরকার নেই এমন হিন্দু গ্রামে কলপোতার। চলো সবাই আমারগা গ্রামে। ঝামেলা মিটলি তবে এসো। বলা যায় না যদি শালারা .... ?'

কথা শেষ করে না যূথবদ্ধ দল। অশেষের ব্যঞ্জনা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তারা লাশ হয়ে যেতে পারে। ফলে ভয়ে কুঁকড়ে যায় পুরো দলটা। সেই বসিরহাটের মেটে-সাংবেড়ে গ্রাম থেকে আসা। বাপ-মা-ছেলে-বউ ফেলে শুধু দু'মুঠো অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে কি হবে শালার কল পুতে। 'চল বাপের দেওয়া প্রাণটা নে কেটে পড়ি। যায় যাবে শালার এত টাকার ক্ষতি। যাবে শালা গবমেন্টের আর কন্‌টাকটারের।' কিন্তু যাবো যাবো করেও যাওয়া আর হয়ে ওঠে না তাদের। বিকেলে আসে পঞ্চায়েত মেম্বারেরা। হিন্দু-মুসলমানে। বলে, 'কোন ভয় নেই তোমাদের। তোমরা থাকো। কল পোতো। তোমরা সুন্দরবনের দেবতা। এই গা-সপসপ নোনাজলের নোনামাটির গর্ভ ফেঁড়ে তোমরা বের করে আনো ঠাণ্ডা মেঠাই জীবন। জল। জলের আর এক নাম জীবন। তোমরা জীবনের দেবতা। আমরা থাকতে কোন্ শালা দাঙ্গাবাজের বাচ্চা তোমাদের গায়ে হাত দেয় আমরা দেখবো।'

তাই হোছেন আলির দলের মধ্যে পড়ে যায় দোনা-মোনা। কেউ চলে যেতে চায় নিরাপদ দূরত্বে। কেউ বলে, 'না শালা থাকপো একেনে। দেখি কি হয় ?' শেষমেষ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নেয় হোছেন। ভারার মাথায় চড়ে 'সাথবি' গেয়ে ওঠে ঃ 'মারোটানে হেঁইচারে।' বন বন করে পাক খায় পাইপ। বোরিং তখন হাজার ফুটের কাছাকাছি। মিস্ত্রি হয়ে হোছেন আলি কখনই এসব ফেলে চলে যেতে পারে না। পারবে না মাটি-মা'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে। মাটি-মা'র নরমকোমল বুকের গভীরে যে বৃহৎ স্তন লুকিয়ে রয়েছে, সেখান থেকে দুধের মতো জল বার করে আনার বদলে পালিয়ে যাওয়া যায় কি ভাবে ?

এখন এই মধ্যরাতে বিড়ির পাছায় টান দিতে দিতে বড় ধন্ধে পড়ে যায় হোছেন আলি। মনে পড়ে যায় দুই কচুখালি নদীর কথা। ফুলে ফুলে ওঠা ঢেউয়ের কথা। সেই কোথাকার কোন্ সাগরের বুকের ওম খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট সব ঢেউগুলো কচুখালিতে এসে দাপাদাপি করে। সাগরের নিথর বুকের মাঝখানে কিভাবে যে এই নাচানাচি মাতন লুকিয়ে থাকে তার হিসাব রাখে না হোছেন আলি। সে শুধু দেখে কলাগাছি থেকে কালিনগর, রায়মঙ্গল থেকে মাতলা, মাতলা থেকে কচুখালি সব একই চিত্র। দেখে সোনাগাঁ থেকে কামক্ষাপুর, আমলামেতে থেকে সাতজেলে, মথুরাখণ্ড-বিরাজমণি থেকে কচুখালি সব একই ব্যাপার। একই নাচন। সেই দাপাদাপি। সেই ষোল বছুরে ছুঁড়ির বুকের মতোন ওঠা-নামা। সেই গভীর-গহীন নদীর ওম-ওম খেলা। হোছেন আলি তার হদিস নিতে চায়। নিজের ছাব্বিশ বছুরে জীবনের আট-আটটা

বছর কাটছে গোসাবা-সন্দেশখালি-হিঙ্গলগঞ্জ-কালিনগরের গাঁ-গ্রামে, সুন্দরবনের অলিতে-গলিতে। বনে বাদাড়ের এই দেশে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে দেশটার প্রতি। তা বছরের সাত-আট মাস তো এই গাঁ-গ্রামেই কাটে হোছেন আলিদের। মাসে এক-আধবার বাড়ি ফেরা। নইলে গাওরে মন খোনা-দুখের পালা, রাধা-কানাইয়ের সারি। গান গাওয়া আর কলাপোতা। কলপোতা আর জল তোলা। জল তোলা যা—জীবন তোলা তাই। তারা সুন্দরবনের দেবতা তাই। বিকেলে পঞ্চায়েত মেম্বারের মুখে কথাটা শোনার পর থেকেই তাই ধন্ধে রয়েছে সে। তাই নজর আলিকে উদ্দেশ্য করে কথা শুরু করে। পিঠোপিঠি উত্তর পাড়ে তিনজনে :

– এই দাঙ্গা কি বাধবেই ?

– গতিক ভালো নয় কিন্তুক !

– থামাতি পারা যায় না ?

– কতো নেতা-হোতা এলো গেলো, আর আমরা তো শালা তেলাপিয়া।

– রসের কথা নয়। আমরগা' গান শুনতি তো সব কাঁধে কাঁধে মিলগে আসে।

– তবে চল্ সায়রি ধরি।

সুর ধরে চারজনে। নিশুতি রাত। কালো। কষকালো। নিথর। দূরে দূরে সাতজেলে ও মোল্লাখালি গ্রামের কালো ভুতুড়ে আলোহীন বাড়িগুলি সব যেন মরে আছে। উত্তেজনায় ভয়ে সন্ত্রাসে। এদিকে হোছেন আলি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গান ধরে। ধরে 'ক্যায়সে বনি-ক্যায়সে বনি' নামক হিন্দি গানের সুর নকল করে। বাকি তিনজনে দোহারে দেয় :

সমবেত : হেঁইয়া মারি ওরে হেঁইয়া মারি
সব জোয়ানি বেরেল ধরে টানাটানি।

হোছেন : ওর তোদের বাড়ি আর মোদের বাড়ির
পিছনেতে হচ্ছে দেখ লটকা লটকি। ওরে .....

সমবেত : হেঁইয়া মারি ওরে হেঁইয়া মারি
সব জোয়ানি বেরেল ধরে টানাটানি।

গান ও গানের বিষয়-সময় বদলাবার সাথে সাথে হোছেন আলিরা বদলে নেয়। যে গ্রামেই 'ছাইড' পড়ুক না কেন, মাত্র কয়েক ঘন্টার কসরতে হোছেনরা শুনে নেবেই গ্রামের নানান কেচ্ছা-কাহিনীর কথা। এবং গানের কথার মাধ্যমে সুরের মূর্চ্ছনায় তা সায়রির মাধ্যমেই শুনিয়ে দেবে গ্রামের রসিক শ্রোতাদের। এই সূত্রে, গ্রামের জনৈক হেলেন দিদি কেমন করে তার মাঝার খেল দেখিয়ে চ্যাংড়া ছোঁড়াদের গরু বানিয়ে ছাড়ে, কিম্বা ঘোমটা টানা পিরিতে পড়া ছোট বউ বিরহের কোন স্তরে উঠে গিয়ে নিজের যৌবনকে ডালিম গাছের উপমাতে মিলিয়ে রূপক ভাষায় প্রেমিককে ধৈর্য্য ধরতে বলে তা সবই হোছেন আলির সায়রির বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। হোছেন সুরেলা কন্ঠে গেয়ে ওঠে : 'ডালিম এখন জালি-ফুলি/পাকলে পরে তুমি এসো কাছে/ ওরে হেঁইয়ে মারি হেঁইয়া মারি ....।'

ফলে রাত্রির নিস্তব্ধতা ফালা ফালা হয়। রচিত হয় যুথবদ্ধ সুর। সুরের কুহক। কুহক-কুসুম। এক এক কলি হোছেন গায় আর তিনজনে সমবেত দোহারে করে। গান নদী হয়ে যায়। কচুখালির স্রোত হয়ে যায়। গানের পেটে যেন মদ পড়েছে। কিম্বা গান মদ হয়ে যেন হোছেন আলিকে আজ মত্ত করেছে। তার মনে পড়ে ওস্তাদের কথা। ওস্তাদ কানাই ফকির তাদের দলের মূল গায়েন ছিল। ওস্তাদের গানে পাগল হয়ে রাত-বিরেতের ফারাক না করে সুন্দরবনের মানুষ এসে জড় হত। যুথবদ্ধ হত। গাঁ-গ্রাম ফাঁকা হয়ে যেতে। মেয়ে-মদ্দ সব ঘর খালি করে ছুটে আসত 'ছাইড' ঘিরে। সেই কানাই ওস্তাদ বড় মমতা ভরে হোছেনকে গান শিখিয়ে গেছে। বলে গেছে বুকের মধ্যেকার দিঘিতে ঢেউ তুলে : 'হোছনে

আলিরে, এই কলপোতা গান যাদু জানে। কুহক রচনা করে। বিভেদ ভুলিয়ে দেয়। হিংসে ভুলিয়ে দেয়। দেখিস নে দুকুরে যারা চুলোচুলি ঝগড়া করেছে, হুই দেখ, তারা গায়ে গা ঠেক্‌কে কেমন উদাসপারা বসে রয়েছে।'

ওস্তাদের পায়ে হাজার বন্দনা জানিয়ে হোছেন আজ গান মাতাল হয়ে পড়তে চায়। গানের কুহক-কেলি রচনা করে ভুলিয়ে দিতে চায় দাঙ্গা। নজর আলি সমেতে তিনজনে এতক্ষণ নীরব ছিল। এখন বলে :

– হোছেন, কানাই ওস্তাদের কথা মনে পড়ে ?

– পড়ে ! গানের কাছেই লোকটা সেজদা দিতো !

– পারবি ?

– কি জানি !

– তুই পারবি ! তোর গানে আজ সেই কুহক রচনা হচ্ছে রে ! দেখতিছিসনে ?

হোছেন দেখে। দলের দশ-বারোজন সবাই তখন মালকোঁচা মেরে তৈবি। জ্বালছে হেচাগ। ওরা ঠিক করেছে, এই গানের শেষ নয় কলের শেষ। রাতারাতিই পোতা চাই কল। কিন্তু কাজটা অতটা সোজাও নয়। এতো আর ঘরের বউ নয়, যে, যখন ইচ্ছা হবে বিছানায় ফেলে পালগাদা করবা। এ হচ্ছে মা, মাটি-মা। তাকে ভালোবাসতে হয়। মমতাভরে তার মেজাজ বুঝতে হয়। মর্জি চিনতে হয়। অপেক্ষা করে থাকতে হয় সরস একবুক ওমভরা বালির স্তরের জন্য। তা এই সাতজেলের ফাঁকা মাঠের ধারে আঠারোশ' ফুটের আগে জলের দেখা মিলবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ এখনো চার'শ থেকে ছ'শ ফুট পর্যন্ত বোরিং করতে হবে কাঙ্ক্ষিত সমিধ পাওয়ার জন্য। পাইপের মাথায় 'হুলি' চুমু খেয়ে যাবে। 'হুলি'র বাঁধন যেন বিধবা নারীর আদর। পিরিতি শেষ হলে সরে যাবে। তেমনই হুলির আদর খেয়ে খেয়ে একটার পর একটা পাইপ আমুল প্রবিষ্ট হয়ে যায় মাটির বুকের মধ্যে। পাইপ যায়। অনবরত যায়। জল খুঁজতে যায়। আর মাটির উপর নিজেদের দেহ থেকে ঘাম-জল ঝরায় হোছেন আলিরা। কুহক রচনা করে। কুসুম ফোটায়। ধাঁ ধাঁ লাগায়। সুন্দরবনের সাদা ভোলা বন্য বৃক্ষের মতো নরম হৃদয়ে পুষ্প ফোটায়। হোছেনবা গানের ঘুমপাড়ানি মাদক দান করে। হাজারো গ্রামবাসী সেই গানের মাদুরে প্রার্থনায় বসে নিজেদের নদী-ঘোলা জীবনটাকে আবাব সাফ সুতরো করে নেয়।

কিন্তু বিপত্তি বেধেছিল সপ্তাখানেক আগে। এই সাতজেলে গ্রামের বুকেব মধ্যিখানে মোছলমানের ছেলের সাথে হিন্দুর মেয়েব কেচ্ছা। কেচ্ছা আর কি ! কুচখালি নদীতে বাগদা-মাছের ছানা-পোনা ধরতে ধরতে চোখে চোখ। হাতে হাত। হৃদয়ের দরজা দিয়ে যাওয়া আসা। হৃদয়ের পোশাক বদল। চুমু খাবা। বাতের আঁধাবে হাড় হক্কড়ে কালো কালো কেওড়া ঝোপের নিচে বসে পিরিতির বাঁধ ভাঙা ! হিঁদু-মোছলমানের তত্ত্ব ভুলে বাদা বনের গভীবতার মতো একাত্ম হওয়া। স্বপ্নে ভাসা। বনবিবির পায়ে যেমন হিঁদু-মোছলমানে ফারাক নেই, তেমন প্রেমের দেবতার হোজরাতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। এবং এ গ্রাম সে গ্রামের সম্প্রদায়ে বিভক্ত বিষাক্ত সব মানুষদের মুখে কলা গুঁজে দেওয়া। তো এই কেচ্ছা চলতে দেওয়া যায় কি করে ? ফলে একদিন রাত-নিশুতিতে কেওড়া ঝোপের তলায় হট্টগোল বাধে এবং হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণবাদীদের সম্মিলিত পিটুনিতে ফালা ফালা হয় মোছলমানের ছেলেব দেহ। হিন্দুর মেয়েটাকে সমাজের কোন নিশুতি গভীরে লুকিয়ে ফেলা হয়। সেখানে সে নাকি চারদিন না খেয়ে রয়েছে। তাই হিন্দুত্বের সম্মিলন ছোঁয়াচে হয়। মোছলমানেরা সম্মিলিত হয়। 'মানএজ্জতের' ব্যাপাব। হিঁদুর দেশে থাকতি হলি ফুঁসে উঠতি হবে।'– এবম্প্রকার ফন্দিফিকির থেকে কেচ্ছাটা ঘনীভূত হয় এবং কলপোতা মিস্ত্রি হোছেন আলিরা তার শরিক হয়ে ভিন্ন মতবাদের পতাকা হয়।

ফলে আকাশে পতাকা ওড়ে। এবং ওড়ারও কলা-কৌশল আছে, তা রপ্তও করতে হয়। মিন্‌ষের কাছে মাগী যেমন। কিম্বা জনসভা ও সম্মিলিত করতালি ধ্বনি। আর সেই ধ্বনি

থেকে উত্থিত জাগরণ ক্রিয়ার সুষম্না বরাবর যাতায়াত। এটা রাজনীতির ব্যাপার। হোছেন আলিদের মাথায় ঢোকে না। তারা শুধু দেখে। দেখে দেশের এক নম্বর কিম্বা তিন নম্বর দলের নেতা হোতারা সবাই পতাকা তোলে। বাবরি মসজিদ কিম্বা রামমন্দির দখল করে নেয়। নিজেদের পশ্চাৎদেশ ঢাকাবে বলে জনগণকে সুতার জোগান দিতে বলে। হোছেন আলি এতসব বোঝে না। বোঝে বাদা-বনের দেশে নিতাই খুড়ো বা লবে চাচার দাওয়ায় বসে সুখে দুখের গল্পকে। বোঝে খাবা আর শোবা একই ব্যাপার। বোঝে বলেই কলজের গোড়ায় ঘা খায়। বড় ব্যথা লাগে। খাদির কাঁটা ফোটার মতো সে ব্যথার যন্ত্রণায় চোখে সরষের ফুল দেখে। অন্ধকার। আলো চুরি করা। হোছেন বোঝে কেওড়া ঝোপের অন্ধকারের মহত্ত্ব। জানে বাদার যুবতীরা এই কেওড়ার আঁধারে যোনিতে আলো ধারণ করে। তারপর গর্ভে জন্ম দেয় বিয়ের ফুল। হ্যাঁ, হোছেনের নিজস্ব বুদ্ধিতে সে এটাই ব্যাখ্যা করে যে, ঐ হিঁদুর মেয়েও মোছলমানের ছেলেটা মিলে একটা ফুলের জন্ম দিতে চেয়েছিলো। কিন্তুক বাদা-বনে যে অনেক কাদা। থৈ থৈ। কাদাতে গন্ধ। গন্ধতে পচন, পচনে আঘাত। আঘাতে ঝিমুনি, ঝিমুনিতে অসহায় হয়ে হোছেন স্পষ্ট করে বোঝে সাতজেলে-মোল্লাখালি আজ অফিমের ঝিমুনিতে বেঘোর। তার ঝিমুনি কাটানো বড় ভাব। না কাটালে ফুলটা মরে যাবে। এবং মৃত্যু মানে অন্ধকার। হোছেন সেই অন্ধকারে ঘামতে থাকে। নতুন করে 'হুলি'র মাথায় চেনের প্যাঁচ ফেলে। কল্জের মাঝখানে উথাল-পাথাল। দলের দশজন চোয়াল শক্তকরে অপেক্ষায়। নজর আলি উসকে দেয় ঃ 'সায়রি ধর হোছেন।' এবং হোছেনের ঠোঁট দুটি বমি করে যুথবদ্ধ গজল ঃ 'কিছ্কে টান—হেঁইচা/ বেলারে গেল—হেঁইচা /সন্ধ্যা হল—হেঁইচা/সাম কলম্ব—হেঁইচা /জ্বালিয়ে বাতি—হেঁইচা /বাসর ঘরে —হেঁইচা/খাইলরে পতি—হেঁইচা/নাকের বসন—হেঁইচা/খুলেরে ফেলো—হেঁইচা/মবা পতি—হেঁইচা/ লৈয়ারে কোলে—হেঁইচা/ভাসিয়ে চলে—হেঁইচা/গঙ্গার জলে—হেঁইচা/গঙ্গাব জল আর—হেঁইচা। তুলসীর পাত —হেঁইচা /শিব ঠাকুরকে —হেঁইচা। কোববোরে পূজা—হেঁইচা / জোযানা পতি— হেঁইচা/পাইবার আশা—হেঁইচা/হেঁইয়ারে বালা হেঁইয়া ...।'

এক নাগাড়ে এতটা সময় সায়রি বাঁধাব পর দমে ঘাটতি পড়ে হোছেনেব। কল্জেটা হাঁসফাসিয়ে ওঠে এবং অবাক হয় হোছেন। এমন তো হবার কথা নয়। নিদেনপক্ষে ঘন্টা-সোয়া ঘন্টা এক নাগাড়ে সাযরি বলে যেতে পাবে সে। কিন্তু আজ আর হল না। কলজেটা খস খস করে ওঠে। দম নেবার জন্য তেলাপিয়া মাছের মতো উথালি-পাথালি করে। তাই সাযরি পাল্টানোর ইঙ্গিত দেয় সুর ভেঁজে—হেঁইয়াবে বালা হেঁইয়া। বড় মিস্টি—সুরেলা এই টান। এই টান দেবামাত্র অন্য মিস্ত্রিরা তৈরি হয। বোধে আসে মুল গায়েন জিবেন নেবে এবার। আজ এই মধ্যরাত্রে বুড়ো হাড়ের নজর আলি সবাইকে অবাক করে দিয়ে সায়রি বেয়ে যায় ঃ 'কিছ্কে টান-হেঁইচা/খিদিরপুরে—হেঁইচা/বাজেবে ঢোল—হেঁইচা/ঢোল বাজে না—হেঁইচা/বাজেরে কাঁসি—হেঁইচা/দেখতে গেল—হেঁইচা/খোকার মাসি—হেঁইচা/মাসির গলায়-হেঁইচা/পিসির হার— হেঁইচা/হার দোলে না—হেঁইচা/দোলেরে মাজা-হেঁইচা…।'

খানিক ফুরসৎ পায় হোছেন। কানপেতে শোনে সম্মিলিত গানের সুর-ধ্বনি। বাত্রির বুক ফালা ফালা করে তা ছড়িয়ে পড়েছে। বড় নেশা লাগানো এই সুর। বড় মাদকতা এতে। যেন ঝালপোড়া দিয়ে আলু ভাতে মাখার সঙ্গে পেয়াজের পান্তা খাবা। জিবটা লক লক কবে। মনটা টাটিয়ে ওঠে। রাত্রির আওয়াজ বড় থেকে আরো বড় হয়। এবং চারপাশের জগৎ দেখতে গিয়ে হোছেন আবাক হয়। ফাঁকা মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে তার চোখ বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে দেখে মাঠে প্রান্ত ধরে জোনাকি পোকারা ডানা মেলে নেমে পড়েছে সাঁতারে। যেন সারা মাঠ ভবে আছে জোনাকিদের মিটমিট আলো। হোছেন বুঝতে পারে গ্রামে ভাঙন লেগেছে। যে সব বিপবীত কামী যুথবদ্ধ মানুষ ছিল দাঙ্গার পক্ষে, সেই যুথবদ্ধতা ভাঙতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ঐ তো, সাতজেলের কেওড়া ঝোপের ফোঁকল গলে আসছে মানুষ। মোল্লাখালির গবাণ কাঠের ঋজুতা ভেঙে আসছে মানষ। হোছেনের কলিজা খুশিতে ভরে ওঠে। মাঠের দিকে ফিরে নাক তুলে জোরে জোরে শ্বাস টানে হোছেন। মানুষের গন্ধ নিতে চায়। পায়। মানুষ-গন্ধে তার পাকস্থলী হরমোন ক্ষরণ করে। মনে মনে উচ্চারণ করে ঃ 'শালা। আমরাও শিব

ঠাকুরের 'সায়রি' ধরি। গঙ্গার আর তুলসীর পাতা/শিব ঠাকুরকে কোরবোরে পূজা—হেঁইচা। শালা, কলিজা যদি সাফ সুতরো না হয় তবে বাইরে বাইরে হিঁদু-মোছলমানের হিসেব কষলিই হোলো। তবুও হিসেব কষে হোছেন। নিজস্ব ব্যাকরণ সৃষ্টি করে সে জাবেদা খাতায় হিসেব বুঝে নেয়, দাঙ্গা বাধলে হিঁদুর কতটা লাভ—আর মোছলমানের কতটা লাভ। সেই সঙ্গে পোক্ত সমকামে পাকা রাজনীতিওয়ালাদের পালাবদলের হিসেবটাও কলপোতা মিস্ত্রি হোছেন আলি করে নিতে পারে। বুঝে নিতে পারে দাঙ্গা বাধলে কার কার পোঁদের মাংসে কসমেটিকের ঘষা লেগে হীরের মতো ঝা-চিকচিক করবে। হোছেন সবই বুঝে নিতে পারে, কিন্তু শুধু এটুকুই বুঝতে পারে না, দাঙ্গা বাধার পরবর্তীকালে সাতজেলে-মোল্লাখালির বাদাবনের কলিজা-স্তরে যে মাতৃদুধের মতো জল রয়েছে, তার ভাগ হবে কেমন করে। হোছেন আলি বুঝতে পারে না, মাটির নিচের একই জল তাদের পোতা কল বরাবর ওপরে উঠে এসে কি করে হিঁদু ও মোছলমানের আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়াবে।

আব এমনতরো চিন্তা সূত্রের মাধ্যমে পাম্প চলে। হুলিতে প্যাঁচের পর প্যাঁচ আঁটে। আর বহু নিচে মৃত্তিকা যোনিতে সৃষ্টিব ধাক্কা মারে পাই। শক্ত লোহাব পাইপ। ঠিক কলপোতা মিস্ত্রিদের জীবনের মতন। কি শক্ত হাত-পা-দেহখানা। কিন্তু কলজেটা ততটাই নরম। আর এমনতরো চিন্তাসূত্রে হোছেন আলির মাথাটা জমাট বাঁধে। গানের সুব ভাঁজে। সুবের কুহক জাগে। মনেব মধ্যে গানের বিছানা পাতা হয়। এবং মনে পড়ে যায় গতকালকের দুপুরের কথা। মনের সুখে গান ধবেছিল হোছেন। ধোন-মোনা, বনিবিবি, বাধা-কানাই পালার যাদু বিস্তৃত হতে হতে মাযার প্রভাব পড়েছিল। ভর দুপুবে গানের দমকায় পাশেব বাড়ির এক বৌদি বান্না করাব কথা ভুলে যায়। হাড়ি জ্বালাতে দেবি হয। এবং দাদা মাঠ থেকে লাঙল ছেড়ে বাড়ি এসে পাচন-বাড়ি দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। হোছেনের চোখের সামনে স্পষ্টমান হয় ঘটনাটি। মনে জোর আসে। তাব গানই খাদ্য-চিন্তা ভুলিয়ে দেয় মানুষেব। তবে দাঙ্গা ভোলাতে পাববে না, কেন ?

হোছেন এক স্বপ্নে আবিষ্ট হয়। কুহকে পড়ে। মনে ঘোর লাগে। সে যেন রাজা হয়ে যাবে আজ। সিবাজদৌল্লাব সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন কববে। এবং এই কুহকই ভাবতে শেখায়, সংসদীয় বাজনীতিতে সেও একজন ভোটাব—বিশেষ ভোটাব রূপে গণ্য হবে এবাব। ফলত, হোছেন গানেব কলি ধবে নেয নজর আলির মুখ থেকে। পাইপের আন্দাজ নেয় হাত ঘসে। তাবপর ভারা বেয়ে উঠে পড়ে মাথাব উপব। এবং ভাবাব মাথায় উঠতে গিয়েই তার চোখে ধবা পড় অভিনব দৃশ্যগুলি। তাব নজরে পড়ে কলতলা ঘিবে সম্মিলিত মানুষের যুথবদ্ধতা। এবং সাবা মাঠ জুড়ে আরো আলোরা আসতে থাকে—সে দেখে। তার মনে হচ্ছে সাতজেলে-মোল্লাখালির গাঁ-গর্ভ খালাস কবে আজ সবাই হাজির হচ্ছে। হোছেন গলার স্বরগাম সব থেকে উপরে তুলে দিয়ে আবাব গন ধরে। ধরে বাধা-কানাই সায়রির :

হোছেন : জল ভবো জল ভবো বাধে বিবাজ কেন মোন
আর ঘোমটার ভেতব ঢেকে রেখেছো শতেক বাজাব ধন, -রে-এ- এ—

সমবেত : কাঁদাসনে বনের পাখি কাঁদাসনে আর।

হোছেন : আমারো রূপ আমাবো যৈবন আমি বেখেছি ঢেকে
নন্দের বেটা কালোশশিকে কে এনেছে ডেকে -রে-এ-এ—

সমবেত : কাঁদাসনে বনের পাখি কাঁদাসনে আর

হোছেন : কালো কালো করো কেনো ওগো গওলার ঝি,
আর বিধাতায় করেছে কালো আমি কোরবো কি,
কালো হাঁড়িতে অন্ন রেঁধে সর্বলোকে খ৷ ,
কালো মেঘে বৃষ্টি হৈলে পৃথিবী জুড়ায়—রে-এ-এ—

সমবেত : কাঁদাসনে বনেব পাখি কাঁদাসনে আব… ।

গান-মাতাল হয়ে পড়ে হোছেন। কানাই ওস্তাদের কাছ থেকে শেখা সবটুকু দরদে যেন আজ কলিজা উজাড় করে গাইছে সে। গানের কলিতে যেন মৌতাত মিশেছে। অপূর্ব যাদু মিশেছে। লোহার মতো শক্ত দেহ হোছেন মিস্ত্রির। চামড়া যেন গণ্ডারপুরু। তবুও সেই চামড়ার আড়ালে এ কোন্ তাজ্জব নরম কলিজার অবস্থান। গান আর কলিজার দোস্তিতে আজ কলতলা ভারি। সাতজেলে-মোল্লাখালির ঘর খালাস করে মানুষ ছুটে এসেছে। ভারার একেবারে মাথায় থেকে হোছেন অনুভব করে ষোল'শ ফুট বোরিং হবার পর মাটি-মা বুকের বাঁধন হাল্কা করেছে। হুলির মাথায় হাত দিয়েই আন্দাজ করে ভুসভুসে বালিব বুকে এখন রসের সমুদ্র। হোছেন খুশি হয়। খুশি হয় ভারার মাথায় বসে সম্মিলিত মানুষ সকলকে দেখে। সে দেখে তার নিজস্ব দেখার পদ্ধতি দিয়ে। রাজনীতিব দাবা খেলাতে থেকে শত যোজন দূরে থেকে। দেখে গান পাগলা মানুষের দর্শন নিয়ে। তখন গানে হিঁদুর সুর আর মোছলমানের সুর বলে কিছু থাকে না। থাকলে মোছলমান হোছেন আলিব মুখে বাধার-পালা শুনতে লোকের ঢল নামত না। হোছেন মানুষ দেখার পদ্ধতিটাকে বিবর্তিত কবে। এবং বিশ্বাস করতে শুরু করে : 'তালি দাঙ্গাডা আর বাধপে না'। নজর বলে, হোছেন উত্তব কবে :

– তালি দাঙ্গাডা থামবে ?

– থামবে।

– শালার দাঙ্গার মুখি মুতি।

– মুতি ঝাঁঝ দোবো।

– মারো টানা—হেঁইচা/টানের জোবে—হেঁইচা/দাঙ্গারে ভোলে—হেঁইচা।

– তালি দাঙ্গা থামবে ?

– দাঙ্গার মুখি মুতি ! হোছেন তার কলপোতা-দর্শনেব পোশাক খুলে ফেলে। নগ্ন কবায়, বাচ্চা ছেলেব মতো সে উন্মোচন। চান করায় সেই দর্শনকে। তারপব নজরকে বলে :

– তালি দাঙ্গাডা থামাতি পারবো ?

– নিশ্চয়ই।

– তালি সাতজেলে-মোল্লাখালি বাঁচে বলো।

– দেখতিছিস নে ?

– হেঁদুব পাশে—হেঁইচা/মোছলমানে —হেঁইচা/বসে রে বসে—হেঁইচা। হোছেন কুহকে পড়ে পুনরায়। কলতলার উপস্থিত হিঁদু-মোছলমানের মধ্যে সে কুহক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্তৃত হয়। হোছেনের চোখ উদাস হয়। ছুটে চলে মোল্লাখালির প্রত্যন্ত প্রদেশে এবং বিস্মিত হয়। একটি জোনাকি-কণা ভেসে চলে যাচ্ছে। বিপরীত স্রোতে। মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে আলোর বিন্দু। হোছেন ভাবে, সব মানুষ যখন কলতলায় উপস্থিত, তাহলে কে যায় ও ? ভারাতে ডাকে নজর আলিকে। বলে :'ঠাহব করে দেখদিনি।' নজর বলে : 'হিঁদুর মেয়ে—মোছলমানের ছেলে।'

এবং আবারো হোছেন তার নিজস্ব অভিধান-মতে ব্যাপারটা বুঝে নেয়। গ্রাম ফাঁকা, সুযোগ হচ্চে চলাব। হিঁদুর মেয়ে সেই সুযোগে হাঁটে। কাঁধে নিয়ে মোছলমানের ছেলে। হোছেন স্পষ্ট দেখতে পায় আলোটা ধাক্কা খেয়ে, যেন বা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। যেমন করে হুলির একখানা কিম্বা দু'খানা পাইপেব নিচে থেকে বাকি পাইপটা কেটে যায়। হোছেন কুহকে মাতে, মাথায় আফিম বাসা বাঁধে। স্বপ্ন দেখায়, মায়া বিস্তৃত হয়। এবং সবার উপরে ভারার মাথা থেকে দেখতে পায় চলে যাচ্ছে প্রেম। হৃদয়ের দরজা দিয়ে দেখে হোছেন, মৃত্যুপ্রায় ছেলেটা মেয়েটার কাঁধে চেপে রাজনীতির পরিত্যক্ত দেশে যায়। ভালো লাগে তার। বড় আরাম লাগে। নজর আলির সঙ্গে কথোপকথন হয় :

– হিঁদু হেরেছে। মোছলমান হেরেছে।

– দাঙ্গা হেরেছে।

— কলপোতা মিস্ত্রি জিতেছে । মাটি-মা জিতেছে ।

— বাদাবন জিতেছে ।

— দাঙ্গাব মুখি মুতি ।

— দাঙ্গার মুখি মুতি ।

হোছেন দেখে সেই দোলায়মান আলোকবিন্দু বিপদসীমা অতিক্রম করে গাঁয়ের বাদাবৃক্ষে মিলিয়ে যায় । হোছেন আরও নিশ্চিন্ত হয় । গানেব জোযারে ভাসিয়ে দেয় হিঁদু-মোছলমান জনমণ্ডলীকে । এবং আত্মতৃপ্তি ভোগ করে । কুহক ভাসায়, কচুখালি নদীর বুকের ঢেউ নিজের বুকে জুড়ে দেয । ঠিক তখনই গ্রাম-মধ্যস্থ পটভূমি থেকে দাঙ্গার-হৈ চৈ কানে আসে । সম্মিলিত আর্তনাদ । হোছেন ভারার মাথায দাঁড়িয়ে সেই আলোক বিন্দুটাকে খুঁজতে চেষ্টা করে । এবং শোনে সেদিক থেকেই দাঙ্গার আওয়াজটা আসছে। নজব কান পাতে। দলের সবাই কান পাতে। একজোড়া মিশ্র আশ্রয় প্রার্থনা যেন তাদের কানে তীর ছুঁড়ে মারে । কলকাঁধার সবাই হিঁদু-মোছলমানে ভাগ হয়ে ছুটে যায় সেই হৈ হল্লা লক্ষ্য করে । এবং কথা কাটাকাটি হয় ঃ

—দাঙ্গা আমাবগা মুখি মুতে দেলে ।

—দাঙ্গাই আমারগা মুখি মুতে দেলে ।

স্বপন সেন

অলৌকিক যাত্রার নান্দীপাঠ

আশ্চর্য এক স্বপ্নের মধ্যে জন্ম হয়েছিল অনির্বাণের। বহুযুগ পরে বিস্মৃতির অতল খাদ পার হয়ে উঠে এসেছিল সে। অন্ধকারের বুক চিরে দিনের জন্মলগ্ন থেকে, সমস্ত দিন কলকাতার রাস্তায় ঘোরার পরও সন্ধের দিকে বাড়ি ফিরে, আলো না জ্বালিয়েই, জ্বালাতে ইচ্ছে করেনি তাই, ক্লান্ত শরীরটাকে অন্ধকার বিছানায় চিৎ করে শুইয়ে দিয়েছিল যখন, তখনও সেই প্রাক-ভোরের প্রশ্নগুলো আক্রমণ করে চলেছিল তাকে। আর অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ যেমন প্রতিদিনই আবিষ্কার করে কড়িকাঠের গতিবিধি, শুরু হয় কড়িকাঠেব সঙ্গে রোজকার প্রশ্নোত্তরের মাজাকি, সেদিনও সেভাবেই শুরু হয়ে মাঝপর্বে বদলে গেছিল খেলার রঙ। দেখেছিল একটা পেঙ্গুইন সাইজের উড়ন্ত পাখিকে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে কারা যেন ঝুলিয়ে দিয়েছিল, ভোরের বাগানেব অশ্বত্থে, তারপর এখন এই ঘরের কড়িকাঠে তারই ঝুলন্ত লাশ। দেখেই চিনতে পেবেছিল সে, আরে অনির্বাণ না! এভাবেই একটা হত্যা-দৃশ্যের মধ্যে জন্ম হয়েছিল অনির্বাণের। এই বিচ্ছিন্নতা মেনে নিতে পারেনি সে। তাই বিস্মৃতিব অতল থেকে কয়েক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করে উঠে এসেছিল সেদিন। আব তারপরই প্রশ্ন করেছিল, 'কিরে চিনতে পারছিস আমাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কে আমি ?'

'তুই ....তুই....অনির্বাণ।'

'তাহলে তুই কে ?'

'আমি জানি না। সমস্ত লেখার মধ্যে দিয়ে 'আমি কে' এই আইডেন্টিটি খুঁজতে চাইছি।'

'মাজাকি হচ্ছে ! অমরত্বের লোভ, খ্যাতির মোহ এসব উদ্দেশ্যেই লিখছিস তুই। অথচ এগুলোকে ঢাকার বেশ একটা দার্শনিক কৌশল আয়ত্ত করেছিস !

'তুই বিশ্বাস কর আমি এসব কিছুই চাই না। আমি শুধু আমাকেই খুঁজতে চাই।'

'আমার চোখেও হাত চাপা দিতে চাইছিস ? অমরত্বের লোভেই তুই আমাকে হত্যা করেছিস।'

'আমি ... আমি কাউকে হত্যা কবিনি।'

'তাহলে এই ঝুলন্ত লাশটা কার ?'

'তোব।'

'আমি এখানে এলাম কিভাবে ?'

'তুই আত্মহত্যা কবেছিস। কেননা তোর অবস্থা হয়েছিল অনেকটা সোমনাথের গল্পের সেই চরিত্রের মত। মনে আছে সেই কাকতাড়ুয়ার কথা ? যে সচেতন কাকতাড়ুয়া ফসলের ক্ষেতে বর্গী তাড়ায়, সেই কাকতাড়ুয়াই অবচেতনে দু'হাতে নিজের লিঙ্গ মুঠো করে ধরে হেল্প, হেল্প বলে চিৎকাব করে।'

২.

'হেল্প ! হেল্প !'

'কি হল, কি হল, আপনার ?'

অস্পষ্ট এলোমেলো শব্দগুলো কানে যেতে সে ধীরে ধীরে চোখ মেলল । বিছানায় শুয়েই, চারপাশটা ভীষণ অপরিচিত মনে হল । তার পূর্ব-পরিচিত যে জগত তা যেন অপরিচয়ের অন্ধকারে ঢেকে গেছে । শুয়ে শুয়েই সে চোখ মেলল পায়ের দিকের দেওয়ালে, তার ঘরের যে দেওয়াল জুড়ে থাকে নিখিল বিশ্বাসের যীশু, তা নেই, দেখেই তার উপলব্ধি যে সঠিক বুঝতে পেরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানায় । সঙ্গে সঙ্গেই দু'পাশ থেকে দু'জন নার্স, কোথায় ছিল বুঝতেই পারেনি সে, যেন কোন অতল থেকে জেগে উঠল, আব 'উঠবেন না, উঠবেন না,' বলেই তাকে আবার শুইয়ে দিল চেপে ধরে। এবার তার এই অপরিচিত জগতকে সনাক্ত কবতে পারল ধীরে ধীরে । সে শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়, লোহাব খাটে । বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা । কিন্তু কি হয়েছে তার, কেন তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছে না । সে কি অসুস্থ ? কোথায় তাব অসুস্থতা ? শরীরেব কোথাও তো কোন জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যথা কোনরকম অসুস্থতার লক্ষণ অনুভূত হচ্ছে না তাব ।

একজন নার্স পাশ থেকে 'এখন কেমন বোধ হচ্ছে ?' জিজ্ঞেস কবায় চিন্তাসূত্রটা কেটে গেল । আর সে বোকার মত এই প্রশ্নের উত্তর দিল, 'ভালই ।'

'আপনি কিন্তু উঠবেন না ।'

'কি হয়েছে আমাব ?'

'তেমন কিছু নয় । তবে আপনি এখন উঠবেন না ।'

'কেন উঠবো না ? আমি তো সুস্থ । আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ।'

'তবুও । ডাক্তারবাবু মানা করেছেন ।'

সে নিজেকে বেশ সুস্থ বোধ করে । তবু অন্যেব নির্দেশে তাকে শুয়ে থাকতে হবে ? আব একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিরক্তি বোধ কবে । এবং এই বিরক্তি থেকেই চিৎকার করে ওঠে, 'আপনারা কি বলবেন আমার কি হয়েছে ? কেন আমাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে ?'

সঙ্গে সঙ্গে একজন নার্স বলে ওঠে, 'প্লিজ, আপনি উত্তেজিত হবেন না । আপনার কিছু হয়নি ।'

'তাহলে আমাকে এখানে আনা হয়েছে কেন ? কেন ?'

অনির্বাণের চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ডাক্তারবাবু দৌড়ে আসেন, 'কি হয়েছে ?'

পাশ থেকে একজন নার্স বলে, 'ওনাকে কেন এখানে আনা হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করছেন ।'

'আপনাকে মেডিক্যাল অবজারভেশনে রাখা হয়েছে ।'

'কেন ?'

'আপনি অসুস্থ ।'

'কি অসুখ আমার ।'

'আমরাও এখনো জানি না । মেডিক্যাল চেক-আপের পব বলা যাবে ।'

'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ।'

'তাহলেও আপনাকে এখন থাকতে হবে ।'

'কেন ?'

'আপনি অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন ।'

সে অজ্ঞান হয়ে গেছিল ? কবে ? কখন ? কীভাবে ? কিছুই মনে পড়ে না তার। কতক্ষণ বা কতদিন অজ্ঞান ছিল সে ? প্রশ্নগুলো সব হাওয়ায় উড়তে থাকে। শীতের দুপুর। কেমন শীত শীত করে। পায়ের ধারে ভাঁজ করে রাখা কম্বলটা টেনে গায়ে দেওয়ার জন্যে উঠে বসতেই নার্স দু'জন হৈ হৈ করে ওঠে। 'আঃ হাঃ আপনি আবার উঠছেন কেন ? কি দরকার আমাদের বলুন না।' বলে তাদের মধ্যে একজন তার গায়ে কম্বলটা ঢাকা দিয়ে দেয়। এই সময়েই চনচনে খিদেয় পেটটা মোচড় দেয়। ক'দিন বা ক'ঘন্টা খায়নি তাও বুঝতে পারে না। সে নার্সদের উদ্দেশে বলে, 'আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি অন্যজনকে বলে, 'এই ওখানে হরলিকস আছে, খানিকটা তৈরি কর তো।'

'হরলিকস ! আমাকে কি পেয়েছেন আপনারা ? আমি ভাত খাব।'

'না, দেখুন এখন সাড়ে তিনটে বাজে। এই অবেলায় ভাত খেলে শরীর খারাপ হবে।'

এক গেলাস হরলিকস তার দিকে এগিয়ে দেয়। একজন আধশোয়া করে গেলাসটা তার মুখে ধরে। সে বিরক্ত হলেও উপায় নেই। কেননা তার মারত্মক খিদেয় পেটটা জ্বালা করে। সে হরলিকস খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে, 'আমার ঘুম ভাঙাব, না, মানে জ্ঞান ফেরার পর থেকে আপনাদের দু'জনকে দেখছি, অথচ আপনাদের নাম জানি না।'

'আমার নাম অপর্ণা,' লম্বা, ফর্সা, টিকালো নাক আর ধারালো মুখাবয়বেব সুন্দবী নার্স বলল, 'আর ওর নাম সবিতা,' বলে মাথার দিকে থাকা মাঝারি উচ্চতাব, ঈষৎ হলুদাভ, গোল মুখের অন্যজনকে নির্দেশ করল।

'তো আপনাবা আমার সমবয়সী বা দু'এক বছরের ছোট-বড়। কত ? বছব একুশেব মধ্যে বয়স হবে তো ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনাবা আমাব সঙ্গে এমন বাচ্চা ছেলের মতে ব্যবহাব কবছেন কেন ? হরলিকস্‌টা আমি নিজেই খেতে পারব।'

'তাহলেও আপনাকে খাইয়ে দিতে হবে।'

'কেন ?'

'আপনি অসুস্থ।'

'কিন্তু আপনারা যেমন অসুস্থ ভাবছেন আমি তেমন অসুস্থ নই।'

'তবুও। আপনার বেশি নড়াচড়া করা এমন কি কথা বলাও নিষেধ। আমাদেব ওপব সে রকমই নির্দেশ আছে।'

'কেন' বলে অনির্বাণ অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, 'আপনি বেশ সুন্দরী, আর সুন্দবীদের আমাব ভালই লাগে। কিন্তু আপনারা এবকম বোবট-এর মত কেন ? নির্দেশ আছে বলেই আপনাকে তা পালন করতে হবে ? একজনকে সুস্থ জেনেও ?'

অপর্ণা হেসে বলে, 'আপনি নিজেকে সুস্থ মনে করলেও মেডিক্যালি আনফিট।'

'আমি নিজেকে সুস্থ মনে করছি অথচ আপনাদের ডাক্তাবি শাস্ত্র মতে, মানে আপনাদের মতে অসুস্থ বলে আমাকে এখানে বন্দি থাকতে হবে ? প্লিজ.....আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন।'

'সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। আপনার মা বা কাকা এসে যদি 'নিজেদেব দায়িত্বে' আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চান তবেই সম্ভব।'

'আমার শরীরের ওপরও আমার কোন এক্তিয়ার নেই ? স্বাধীনতা নেই ?'

'আপনি তো নিজেব দায়িত্বে বা ইচ্ছায় এখানে আসেননি। অতএব চলে যাওয়ার ব্যাপাবেও আপনার স্বাধীনতা থাকবে কিভাবে ?

'থাকে, থাকে, একমাত্র আত্মহত্যার মধ্যে সে স্বাধীনতা থাকে।'

'একি !' আপনি এসব কি বলছেন ?' অপর্ণা তার কথায় বিচলিত বোধ করে।

সবিতা বলে, 'প্লিজ, আপনি এত কথা বলবেন না। কথা বলতে বলতে আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।'

'আচ্ছা সব সুন্দরীই কি এমন হৃদয়হীন হয়। আমাব কথা বলার বা উত্তেজিত হওয়ার স্বাধীনতাও থাকবে না ?'

এইসব কথাব মধ্যেই একজন ওয়ার্ডবয় একটা হুইল চেয়াব নিয়ে আসে তাব বেডের সামনে।

অপর্ণা বলে, 'আমবা আপনাকে সাহায্য কবছি আপনি এই হুইল চেয়ারে উঠে বসুন।'

'কেন ?'

'আপনাকে নিচের কেবিনে নিয়ে যাওযা হবে।'

'আমি নিজেই হেঁটে যেতে পাবব।'

'কিন্তু আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না আপনাব নড়াচড়া কবা নিষেধ। আপনি আবার যে কোন মুহূর্তে অজ্ঞান হযে যেতে পারেন।'

সে আবাব যে কোন মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যেতে পাবে ! একথা ভেবেই সে বিচলিত হয়ে পড়ে। ভয় করতে থাকে তাব। সে বলে, 'ঠিক আছে, আপনাবা আমাকে ধরুন।'

অপর্ণা আর সবিতা দুই সিস্টাব হাত ধবে তাকে হুইল চেয়াবে বসায়। তাবপব ওয়ার্ডবয় তাকে ঠেলতে ঠেলতে লিফটের কাছে এবং লিফটেব সাহায্যে একতলায় নেমে তার জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে নিযে যায। এই সময়েই তাব মাথায একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায। সে ভাবে, সে যদি অসুস্থতাব ভান কবে তবে এই সুন্দবীদেব সঙ্গ আবও বেশি করে পাবে। সুতবাং কেবিনে পৌঁছবার পর সে সিস্টাবদের বলল, 'আপনারা একটু নিচু হোন, আমি আপনাদেব কাঁধে ভর দিয়ে উঠবো। সিস্টাব দু'জন একটু নিচু হলে অনির্বাণ দু'জনেব শবীবের সঙ্গে বিশেষত অপর্ণাব বাঁদিকেব স্তনের সঙ্গে শরীব লেপ্টে আস্তে আস্তে বেডে ওঠে। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে অনির্বাণ আর সবিতা তাব গাযে চাদবটা টেনে দেয। সে বলে, 'অপর্ণা, আমাব মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে, একটু ম্যাসেজ কবে দেবেন ?'

অপর্ণা তার মাথায় হাত বুলিযে দিতে থাকে। নবম হাতেব স্পর্শে সে চোখ বন্ধ করতেই কেয়ার হাতেব স্পর্শ অনুভব কবে। সে অপর্ণাব হাতটা চেপে ধরে নিজেব হাতে মুঠোয়।

অপর্ণা বলে, আপনি কি খুব অসুস্থ বোধ করছেন অনির্বাণ ? ডাক্তাববাবুকে ডাকব ?'

'না, তুমি আমাব কাছে থাক কেয়া।'

আর তখনি পাযের মৃদু শব্দে সে চোখ খোলে। তার মা আব হাবু কাকা কেবিনে ঢোকে। দু'জনেব চোখে-মুখে ভয, বিহ্বলতাব চিহ্ন স্পষ্ট। মাকে তার কেমন সাদাটে ফ্যাকাসে লাগে। বাবা মারা যাওয়ার পব থেকে সে দেখেছে মা কেমন ধূসব সাদাটে হযে যাচ্ছে।

মা উদ্বিগ্ন মুখে তাব মাথাব কাছাকাছি বসে তাকে জিজ্ঞেস কবে, 'এখন কেমন আছিস অনু ?'

'ভালই।'

সিস্টার দু'জন চলে যায়। অনির্বাণের হাবুকাকাও কেবিনের বাইরে বেবিয়ে যায়।

'কিন্তু আমি এখানে কেন ?'

'তুই অসুস্থ।'

'কি হয়েছে আমাব ?'

'তেমন কিছু নয় ।'

'তেমন কিছু নয় বলছ, অথচ সিস্টাররা আমাকে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না ।'

'তুই সিস্টারদের কথা শুনবি বাবা ।'

'কিন্তু আমার কি এমন হয়েছে যে আমাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আটক করে ৰাখা হয়েছে ।'

'এসব বলছিস কেন ? কেউ তোকে আটকে রাখেনি । তুই অসুস্থ বলেই তোকে এখানে আনা হয়েছে ।'

'কিন্তু আমার কি হয়েছে বলবে কি ? না বললে আমি পালিযে যাব ।'

'কোথায় পালাবি ?'

'যেদিকে খুশি ।'

'না শোন, এমন কাণ্ড করিস না বাবা । আমি তোকে চুপিচুপি বলছি, কেউ যেন জানতে না পারে ।'

'ঠিক আছে কেউ জানবে না, তুমি বল ।'

'তুই অজ্ঞান হয়ে গেছিলি ।'

'এটা আমি জানি । সিস্টাররা বলেছে । কিন্তু কীভাবে ?'

'ঘুমেব মধ্যে ।'

'কবে ?'

'পরশু দিন ।'

একটানা দু'দিনেরও বেশি সে অজ্ঞান ছিল । কিন্তু তার তো মনে হল সে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম ভেঙেছে দুপুরে । তার নির্দিষ্ট ঘুমের সময়ের থেকে একটু বেশি । সাধারণত সে একটু রাত করে শোয়, লেখে বা পড়াশোনা করে । আর ইদানীং মাঝেমাঝেই শুয়ে বসে নানান ভঙ্গিমায় কড়িকাঠের গতিবিধি লক্ষ্য করে । ফলে সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেবি হয়। দশটা নাগাদ ঘুম ভাঙে । তার জায়গায় আজ দুপুরে ঘুম ভেঙেছে । কিন্তু সে অজ্ঞান ছিল ! ঘুম আর অজ্ঞান হওয়াব মধ্যে তফাৎ কোথায় ? এরা বলছে বলেই তার মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান ছিল । এবং টানা দু'দিন । এরা না বললে বা বাড়িতে থাকলে বুঝতেই পারত না সে অজ্ঞান ছিল । ২৩ ডিসেম্বর রাতে ঘুমুতে গেছিল সে । তাহলে তার মায়ের কথানুযায়ী ২৩ তারিখ রাত থেকে ২৪ তারিখ সকাল দশটার মধ্যে যে কোন সময়ে অজ্ঞান হয়েছে । কিন্তু কোন সময় ? এরাও নির্দিষ্ট সেই সময়টা বলতে পারবে না । আজ তাহলে কত তাবিখ ?

এইসব চিন্তার মধ্যেই সে হাবুকাকা আর একজন ডাক্তাবকে কেবিনে ঢুকতে দেখল। তারপর ডাক্তারবাবু আর হাবুকাকা কেবিনের কোণার দিকে গিয়ে আলোর নিচে একটা এক্স-রে প্লেট ধবে নিচুস্বরে আলোচনায় ব্যস্ত হলেন । তাহলে এর মধ্যে তার এক্স-রেও হয়ে গেছে। সম্ভবত মাথার । কিছুটা দেখে কিছুটা আন্দাজে বুঝল । পায়ের কিংবা বুকের হতে পারে ? না, মাথারই । যেহেতু সে অজ্ঞান ছিল তাই মাথার এক্স-রেই এটা, অনুমান করল সে। কেননা অজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে পায়ের বা বুকের কোন সংযোগ নেই । অবশ্য এই এক্স-রের সঙ্গে সংযোগ নেই তার মাথারও । এদের কথানুযায়ী সে হয়তো অজ্ঞান হয়েছিল কিন্তু শারীরিক অনুভূতিতে তাব কোন লক্ষণ নেই । তবু কেন এরা এতটাই ব্যতিব্যস্ত, উদ্বিগ্ন ? এদের চোখেমুখে কেন এত উদ্বিগ্নতার ছাপ ? তাহলে কি তার এমন কিছু হয়েছে যা সে শারীরিক অনুভূতিতে বুঝতে অক্ষম ? যা এদের চোখ-মুখ দেখে তাকে বুঝতে হচ্ছে ? যা এদের গোপনীয়তাব মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে ? না হলে এত ওষুধ, এক্স-রে, হাসপাতালের কেবিন এসবের প্রয়োজন কি ? এরা কি তাকে সঠিক তথ্য দিচ্ছে না সে ভয় পাবে বলে ? হাবুকাকা তার কাছে বসা বা তার সঙ্গে কথা বলার থেকেও

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে ডাক্তাবের সঙ্গে পরামর্শ। কিন্তু কেন ? কি এমন হয়েছে তার ? তাকে কি গোপন করা হচ্ছে সিরিয়াস কোন অসুখ বিষয়ে ?

মায়েব কথায় এবং তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকায় চিন্তা-সূত্রটা কেটে যায়। মা জিজ্ঞেস করে, 'কি ভাবছিস এত ?'

'কিছু না।'

'কিছু না তো আমি যে কত কথা বলছি তাব তো উত্তর দিচ্ছিস না।'

'কি বলো।'

'না তাব আগে তুই বল কি ভাবছিলি ?'

'কিছু না বললাম তো,' সে বিবক্ত হয়।

'না, তুই নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিলি।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তোমবা একজন সুস্থ মানুষকে কিভাবে অসুস্থ করে দিতে পাবো। একথা ভাবলেও সে বলল, 'ভাবছিলাম আমি কবে সুস্থ হব, কবে আমার এই বন্দিত্বের অবসান ঘটবে। আদৌ সুস্থ হব কি না।'

'সেকি ! তুই নিশ্চযই ভাল হয়ে যাবি বাবা। এসব কথা ভাবতে নেই।'

তাদেব কথাব মধ্যেই ডাক্তার চলে গেলে হাবুকাকা তার বেডের কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে 'কেমন আছিস ?'

'ভাল নয়।'

'কি কষ্ট হচ্ছে ?'

'কিছুই না। আমাব কষ্ট তোমবা বুঝবে না।'

'কেন ?'

'বাবা চলে যাওয়াব কিছুদিনের মধ্যেই কেয়া দুর্ঘটনায় মারা গেল। পৃথিবীব থেকে ভালবাসার মানুষগুলো উবে গেল। ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে মাকড়সার জালের মত ছেয়ে ফেলল। মানুষের গোপনীযতা হাবিয়ে গেল। প্রেম, ভালবাসা তার মৌলিকত্ব হাবালো। আমি একেবারে ফৌত হয়ে গেলাম। তারপর থেকে এই বছর দু'য়ে তোমবা বাববাব আমাকে অসুস্থ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা কবছে।'

'কিন্তু এই বছর দু'য়ে অন্তত বাব চারেক তুই এরকম অজ্ঞান হযে গেছিস। আর প্রতিবারই এই অজ্ঞানতার পর তো স্বাভাবিকতা ...'। সম্ভবত মায়ের ইশারায় হাবুকাকা থেমে গেলে মা বলল, 'হাবু চল আমরা যাই। অনু আমবা এখন যাই বাবা। রাতে অপর্ণা থাকবে। কিছু প্রয়োজন হলে ওকে বলবি। আমি আবাব কাল সকালে আসব।'

৩.

ওরা চলে যাওযাব কিছুক্ষণ পবে সে মাথাব চুলে একটা হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুলে তাকাল 'কে, বাবা।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আবাব এলে।'

'হ্যাঁ। তোকে দেখতে। তুই কেমন আছিস ?'

'ভাল নয় বাবা।'

'কি কষ্ট হচ্ছে ?'

'কিছু না। আমার কষ্ট তোমরা বুঝবে না।'

'কেন ?'

'আমি কেমন ইন্টারনেটের মধ্যে আটকে গেছি। সমস্ত কল্পনা কেমন শুষে নিচ্ছে ওই মাকড়শার জাল। আমি ক্রমশ তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছি।'

'তাই তুই এই বয়সেই এমন এলোমেলো হয়ে গেলি ?'

'হ্যাঁ, বাবা। কিন্তু তুমি চলে গেলে কেন এত তাড়াতাড়ি ?'

'পৃথিবীটা আমার কাছে বদ্ধ ডোবার মত মনে হচ্ছিল।'

'আর আমাকে এই বদ্ধ ডোবায় ফেলে পালালে। তোমরা ভীষণ স্বার্থপর। মাও। মা নিজের প্রেম নিয়েই পাগল। হাবুকাকাকে আমি সহ্য করতে পারি না।'

'তার মানে তোর মাকেও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ছিঃ মাকে ঘৃণা করতে নেই। সে তোর জন্ম দিয়েছে।'

'সেই জন্যেই তো ....'

'না, তুই তার সে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারিস না। তোর জন্ম দিয়েছে বলেই কি তার প্রেম করার অধিকার নেই ? তোর মায়ের বয়সটাও তোর বিবেচনা করা উচিত।'

'আমি সে কথা বলছি না। ওদের সম্পর্কের বৈধতা...'

'তুই এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস। তুই না শিক্ষিত, নিজেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলে মনে করিস। অথচ প্রতিষ্ঠানের তৈরি বৈধতা, তার ছাড়পত্র এসব না থাকায় তুই ওদের সম্পর্ক মানতে পারছিস না ? এসব নর্মস্ তুই মেনে নিচ্ছিস।'

'প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আর হতে পারলাম কই ? নিজেকে ভাঙতে পারলাম কোথায় ? বললাম না গল্পের জালে কেমন জড়িয়ে গেছি।'

'কেন এমন হল ?'

'বলব ? শুনলে তুমি খুশি হবে ?'

'বল না।'

'তুমি এসব কথা বলছ অথচ মনে আছে তোমার, একদিন, তুমি চলে যাওয়ার মাত্র কয়েক মাস আগে আমি বিছানার সাদা চাদরে চাইনিজ-ইঙ্ক দিয়ে ছবি এঁকেছিলাম। তোমরা আমার সেই সৃষ্টিকে মেনে নিতে পারনি। শুধুমাত্র একটা পঞ্চাশ টাকা দামের চাদর নষ্ট করাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলে। আমার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিল। সব প্রতিষ্ঠানই আসলে এরকম বাবা।'

'বাবা, বাবা,' অনির্বাণ ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানায়।

'কি হল অনির্বাণ ?' অপর্ণা জিজ্ঞেস করে।

'বাবাকে দেখেছেন কোথায় গেল ? আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ চলে গেল। কাওয়ার্ড। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালিয়ে গেল।'

'অনির্বাণ আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ?'

'না, না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি আমার কাছে বসুন। তাহলেই আমি সুস্থ থাকব।'

৪.

লেখা মানেই এক ব্যর্থতার দলিল নির্মাণ। এক ব্যর্থতার থেকে অন্য এক ব্যর্থতার অভিমুখে যাত্রা। কেননা যতবারই অনির্বাণকে নিয়ে কোন নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গেছি ততবারই

দেখেছি তা এক ধ্বংসের মুখোমুখি গিয়ে শেষ হয়েছে। আজও ধোঁয়াশা থেকে গেছে অনির্বাণ বিষয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন। অনির্বাণ কে ? অনির্বাণকে নিয়ে লেখার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আজও নেই।

'আছে, আছে, উত্তর তোর কাছে আছে। তুই এসব লিখে পাঠককে বুরবক বানাতে চাইছিস।'

'কেন ?'

'চিনতে পারছিস না ?'

'অনির্বাণ ! তুই আবার এলি কেন ?'

'কেন আমি এলে তোর খুব অসুবিধে হয় ? তাই আমাকে হত্যা করে আমাকে নিয়ে যা খুশি লিখে চলেছিস। কেন, তুই জানিস না আমাকে নিয়ে কেন লিখছিস ?

'না।'

'তাহলে তোর লেখার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ?'

'জানি না। তবে মনে হয় প্রতিটি মানুষের মত এও এক ব্যর্থতার দলিল নির্মাণ।'

'এরকম উদ্দেশ্য জেনে কেউ কোন কাজ করে না। তুই লিখছিস কারণ, তুই জানিস, খ্যাতিমান লোকেরই সমাজে ভূমিকা তৈরি হয়। লোকে তার কথা শোনে।'

'কিন্তু তাহলে শুধুমাত্র অনির্বাণ কেন ?'

'তুই জানিস না ?'

'হয়ত জানতাম, কিন্তু ইদানীং আমার সব কিছুই কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। শুরু হয় মাথায় অদ্ভুত এক যন্ত্রণা। আমার লেখার উদ্দেশ্য যায় হারিয়ে। আর সেই জন্যেই কেয়া বা অন্যান্যরা আমার লেখা ইদানীং বুঝতে পারে না।'

'এসব ভিত্তিহীন দার্শনিক কথাবার্তা। কিন্তু শুধু দার্শনিকতা কোন লেখা হতে পারে না। তুই অনির্বাণকে নিয়ে লিখেছিস, কারণ, তুই তোর অতীতকে ভুলতে পারিসনি। বারবার পেছন ফিরে তাকাস। অথচ বেশিরভাগ মানুষই সামনের দিকে তাকিয়ে বাঁচে। যেমন কেয়া। ভবিষ্যতের সুখি সংসারের, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে রবিশংকর কিংবা নিখিল ব্যানার্জি শোনার উষ্ণ কল্পনায় তোকে ভালবাসতে শুরু করেছে। অথচ তুই অতীত ছেড়ে বেরোতে পারিসনি বলে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিস। কেয়াও তোকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।'

'আচ্ছা অনির্বাণ, তুই আমাকে এলোমেলো বলছিস, অথচ তোর মনে আছে তুই একবার বিছানার চাদরে চাইনিজ-ইঙ্ক দিয়ে উলঙ্গ নারীর ছবি এঁকেছিলি ?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। সেটা ছিল আমার প্রচলিত নর্মস্-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।'

'তোর বাবা-মা তোর মধ্যে পারভারসান আবিষ্কার করেছিল। আবিষ্কার করেছিল পাগলামির লক্ষণ।'

'হ্যাঁ। পরদিন আমি সেই রাগে গোটা বিছানায় চাইনিজ-ইঙ্ক লেপে চাদরটা কালো করে দিয়ে তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছিলাম।'

'পরদিন সকালে তোর বাবা-মা ওই অবস্থায় তোকে দেখে কেঁদে-কেটে একাকার।'

'আর আমি ওদের ওই বোকা বোকা কান্না দেখে হো হো করে হেসেছিলাম।'

'তারপর তুই ছবি আঁকা ছেড়ে দিলি। কত সহজে তুই পেরেছিলি এসব ছেড়ে দিতে।'

'হ্যাঁ, নিজের সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করতে শেখাও আসলে এক মহৎ সৃষ্টি।'

'তুই কিভাবে পারিস নিজের সৃষ্টির থেকে দূরে সরে থাকতে ? কই আমি তো পারিনি।

ক্রমশ কেমন লেখক হওয়ার দাসত্ব পেয়ে বসছে আমাকে। কত দিন কোন নদী, পাহাড়, সমুদ্রের কাছে যাইনি। প্রকৃতির মুখোমুখি বসে তার সঙ্গে নির্জনে কথা বলিনি। কোন প্রিয় নারীর বুকে চুম্বন এঁকে দিইনি। এমন কেন হল অনির্বাণ ?'

'আমি তো আগেই বলেছি ...'

এই সময় সে দেখে নার্সের পোশাক পরা কেয়া আসছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে অপর্ণা আসছে, একটা ট্রেতে দু'কাপ চা সাজিয়ে নিয়ে। তাব মনে হল জানলা দিয়ে যে অস্পষ্ট হালকা নীল জ্যোৎস্না ভেসে আসছে তার সাদা বিছানায়, সেই আলোর পথ বেয়েই যেন সে এল। এসে আস্তে পালক স্পর্শে তার কেবিনের বিছানায় বসল। তার দিকে চা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এত রাতে জেগে আছ কেন ?'

'লিখছিলাম। কিন্তু তুমি এখানে নার্স হয়ে এলে কবে ?'

'তুমি যেদিন অসুস্থ হয়ে এই হাসপাতালে এলে।'

'আমার কোন অসুখ নেই।'

'তাহলে তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন ?'

'আমি লিখছিলাম। পড়বে সেই লেখা ?'

'না। তোমার লেখা আমি কিছু বুঝতে পারি না।'

'কেন ?'

'তোমার লেখায় কোন চরিত্র নেই, গল্প নেই, শুধু এলোমেলো কিছু কথা। আর তোমার প্রায় সব লেখাই আত্মহত্যার কেন ?'

'কেননা আত্মহত্যা এমন এক স্বাধীনতা যা আমাদের তাবড় প্রতিষ্ঠান-প্রশাসনকে নাড়িয়ে দেয়। মানুষের এই স্বাধীনতাকে কেউ কোনেদিন কোথাও খর্ব করতে পারেনি। আর এই জন্যে আত্মহত্যার ওপর পাতাব পর পাতা সন্দর্ভ রচনা করেও এর কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। একে এক সময় পাপ বলে মানুষকে এই স্বাধীনতার থেকে দূরে সবিয়ে বাখা হত। এখন নানা আইনের ফাঁদে এই স্বাধীনতাকে খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। প্রশাসন-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে কোন বিদ্রোহকে শেকল পরানো সম্ভব হলেও একে কোনদিন লিগালাইজ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিষ্ঠানকে এই অবজ্ঞার পরিভাষাকে আমি প্রতিটি লেখায় উপভোগ করি।'

'তুমি সব সময় তোমার গল্প ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকো। আর সেগুলোই লিখে যাও। যার কোন মাথা-মুণ্ডু নেই। সংসার, চারপাশে তোমার লক্ষ্য নেই। এমনকি আমার প্রতিও। ইদানীং কারও দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পাও না তোমার লেখা ছাড়া। দিন দিন তুমি গ্রাফোম্যানিয়াক হয়ে যাচ্ছ। কাউকে ভালবাসার মত ফুরসৎ নেই তোমার। কতদিন তোমাব বোনেব কোন খোঁজ নাওনি। তোমার মামা যে মারা গেলেন এলাহাবাদে, মামীকে একটা চিঠি পর্যন্ত লেখোনি কেমন আছে জানতে চেয়ে।'

'বাস্তবিক আজ অনির্বাণের সব ছবিই কেমন ধূসর হয়ে যায়। প্রতিটি ছবিতেই, সে দেখেছে, যতই রঙের বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করুক না কেন তা ধূসরই থেকে যায়। কিছুদিন আগে, একদিন, তার ছবিগুলো দেখতে দেখতে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার সব ছবিতেই এত মোটা, এত গাঢ় রঙ লাগাও কেন ? সে হেসে বলেছিল, তবু তো কোথাও কোথাও ধূসরতা থেকেই যাচ্ছে। ওটাকে ঢাকতে চাই। তাই গাঢ় রঙ। আসলে আমি যে স্বপ্নগুলো দেখি প্রতিরাতে তাতে এত গাঢ় রঙ থাকে যা তোমাদের বললে বিশ্বাস করবে না। সেই রঙগুলোকে যখনই ক্যানভাসে আনতে চাই তখনই তা ধূসর হয়ে যায়।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারি না। ঠিক তোমার লেখার মতই জটিল। এক বললে আর এক উত্তর দাও।'

'তোমার কি মনে হয় বাস্তবিক অনির্বাণের কোন অস্তিত্ব ছিল বা আছে ?'

'আমি অন্তত এই অনির্বাণকে চিনি না। যারা তোমাব বিভিন্ন লেখায় আসছে। আমি চিনি সেই অনির্বাণকে, সেই বন্দিমুক্তি আন্দোলনের মিছিলের পর ঝেঁপে বৃষ্টি এল, তখন সন্ধে হয় হয়, আমরা একটা গোলপাতার ঘরে নিচে দু'জনে, চাবিদিক বৃষ্টিতে ঝাপসা, একই মিছিলের সঙ্গী কিন্তু পরস্পর পরিচয়বিহীন। সেই গোলপাতার ঘরের নিচেই আমাদের প্রথম বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাওয়া। তুমি বলেছিলে, 'কেয়া আপনার সঙ্গে ভালভাবে আলাপই হয়নি, অথচ আমরা একই আন্দোলনের সঙ্গী।'

'সেই তো সেই কাকতাড়ুয়ার গল্প। যে ফসলের ক্ষেতে বর্গী তাড়াতে তাড়াতে সন্ধেব অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজে তোমার কাছে এসে নিজেব লিঙ্গ মুঠো কবে ধরে, 'হেল্প, হেল্প' বলে সাহায্য চেয়েছিল।'

'আঃ, আমি তোমাব গল্পের চরিত্রেব কথা বলছি না।'

'তুমি ভুল করছ, সেই অনির্বাণ আব নেই।'

'কেন, কি হয়েছে তার ?'

'সে আত্মহত্যা করেছে।'

'কেন ?'

'আমি জানি না।'

'তুমি মিথ্যে বলছ। অনির্বাণ আত্মহত্যা কবলে তোমাব হাতে বক্ত কেন ?'

সে চমকে উঠে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। সাবারাত ঘুরিয়ে ফিবিয়ে নিজের হাত দেখতে থাকে। আব প্যাডেব পাতায় ক্রমাগত হাত মুছতে থাকে।

৫.

পরদিন সকালে অপর্ণা কেবিনে ঢুকে দেখে গোটা বিছানার চাদর বালিশ এলোমেলো। বিছানায কালিতে ভর্তি। আর অনির্বাণ তার ওপব বসে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। সমস্ত বিছানায় ছড়িয়ে আছে তাব লেখার কাগজ। চোখে-মুখে রাত জাগাব ক্লান্তি।

অপর্ণা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি সারারাত জেগে ছিলেন ?'

'হ্যাঁ'।

'কেন ?'

'আমি সাবারাত লিখছিলাম।'

'কোথায় আপনাব লেখা ?'

'এই তো প্যাডেব পাতায়।'

'কই দেখি।'

'আপনি পড়বেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেয়া কিন্তু আমার লেখা পড়ে বুঝতে পাবে না।'

'কেয়া কে ?'

'আমার বান্ধবী।'

'সে তো মারা গেছে অ্যাকসিডেন্টে।'

'কি বাজে কথা বলছেন ? আমি কাল এই বিছানায় বসে তাব সঙ্গে গল্প করেছি সারাবাত জেগে। আপনার মত পোশাক পরে এসেছিল।'

অপর্ণা বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আচ্ছা দেখি আপনি কি লিখেছেন !'

অনির্বাণ তার দিকে ছড়ানো-ছেটানো প্যাডের পাতাগুলো এগিয়ে দেয়। অপর্ণা দেখে প্যাডের পাতায় শুধু হাতের পাঞ্জার ছাপ। সে বলে, 'এতে লেখা কোথায় ? এ তো শুধু হাতের পাঞ্জার ছাপ ?'

'আমি কাল সারারাত লিখেছি ওই প্যাডের পাতায়। আপনারা কেউ আমার লেখা বুঝতে পারেন না ! বলছেন পাঞ্জার ছাপ ! কেয়াও বুঝতে পারে না আমার লেখা।'

'আপনাব হাতটা দেখি।'

অনির্বাণ তার হাত দুটো পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

'কি হল হাত লুকোচ্ছেন কেন ? দেখি হাতটা।'

'না।'

'কেন ?'

'হাত দেখবেন কেন ?'

'দেখব হাতে কালির ছাপ আছে কি না। তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনি লিখেছেন না পাঞ্জার ছাপ মেরেছেন।'

'না আমাব হাতে কালির ছাপ নেই। '

'তাহলে লুকোচ্ছেন কেন ?'

'হাতে রক্ত লেগে।'

'দেখি কিসের রক্ত !'

'আমি অনির্বাণকে হত্যা করছি।'

অপর্ণা তার হাত দুটো জোর করে টেনে নিয়ে দেখে দু'হাত ভর্তি শুকিয়ে যাওয়া কালি।

এভাবেই এক আশ্চর্য স্বপ্নের মধ্যে জন্ম হয়েছিল অনির্বাণের।

সৈকত রক্ষিত

মাড়াই কল

চেপুলাল বেশবাব শরীবে মাংস আব নেই বললেই চলে। শবীবটা তার একটা সুষম ছন্দ ও রীতিতে গাঁথা, যেন হাড়ের মালা। অঙ্গেব সঙ্গে অঙ্গেব ঠোকাঠুকি লাগলে ছন্দের কোনো কোমলতা সে টের পায় না। পায় এক ধাতব অনুবণন। দৃশ্যত, তার শবীবে, বাড়তি হাড় যেমন কিছু আছে, তেমনি আছে বাড়তি কিছু উপাদানও। তাব লোমশ ভুরুর পাকা ও মোটা লোমের রাশি, তার বেড়ে ওঠা নখ—যা অপরিচ্ছন্নতাব দরুন নীল থেকে কালো হয়ে উঠেছে আর সারা গায়ে-পিঠে ময়লা, যা আলাদা করে ময়লা বলে আর বোঝা যায় না। ময়লার বঙ হয়ে উঠেছে তার গায়ের রঙ। আব এমন মেটে মেটে গায়ের সঙ্গে অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য নিয়েই পাঁশুটে চুল দখল করে আছে তার গর্দানের ওপব ভারি মুণ্ডুটি। চোখের কোলে পিচুটি জমে। এবং জমলে, পাতা সহজে খুলতে পারে না চেপুলাল। হয়ত তার কষ্টই হয়। কিন্তু সব কষ্ট ক্লেশই চেপুলাল গোপন বাখতে পাবে। তাব মুখের অকপট হাসি, রক্তহীন বিবর্ণ মাড়িতে ভুট্টাব দানাব মতো দাঁতের চেয়ে চেয়ে থাকা -এসবের মধ্যে রয়ে গেছে তাব নির্বিকারচিত্ততা। তাব উদাসীন মনেব অভিব্যক্তি। এই মন নিয়ে, গাড়োযান চেপুলাল, কথা বলে তার রুগ্নপ্রায় গরু দুটিব সঙ্গে। তাদেব কাঁধে কাঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া নড়বড়ে গাড়িটিব সঙ্গেও। কখনো-বা, ধূলো ওড়ানো মেঠো পথের দুপাশে বিস্তব জঙ্গলঝাড়ি আব মাথার ওপবে নীল চাঁদোয়ার মতো ঝুলে পড়া আকাশ দেখে সে আচমকা গাড়ি থামিয়ে দেয়।

ছইবিহীন গাড়িতে, দুলতে দুলতে, ঘুম এসে যায় কুঞ্জ মোদকেব। অকস্মাৎ গাড়ি থেমে গেলে, দুলুনিও থামে। তখন ছন্দপতনের বিরক্তি নিয়ে চেপুলালের দিকে সে চায়। থুতনি কাঁপিয়ে ধমক দিয়ে বলে ওঠে, 'হেই শ্লা চ্যাপা! গাড়ি ককে দিলি য্যা? বাস্তার বাগ আছে না ভালুক আছে?'

অযোধ্যা পাহাড় থেকে নেমে আসার পথে, ঝোপঝাড় আর গাছপালার আড়ালে বাঘ না থাকলেও ভালুক কিংবা বনবরা তো থাকেই। পথ আটকে থাকে বুনো হাতিও। হাতি স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে কেবল হাতি নয়, ঠাকুর। চেপুলাল কি কাছে-দূরে কোথাও সেই ঠাকুরের উপস্থিতি আঁচ করেছে? পাতপালা মাড়িয়ে, দুমড়ে মুচড়ে, ঝোপের মধ্যে কোথাও নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ঠাকুর?

কুঞ্জ দেখে চেপুলালের পিছন। তার পাঁজরার দুটো পাশ যেন কেউ একেকবার ফুলিয়ে ফেব চুপসে দিচ্ছে। হয়ত পাহাড় থেকে সমতলে গাড়ি চালানোর ক্লান্তিতে সে হাঁপিয়ে চলেছে। এভাবে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে একটু জিবিযে নিতে চায় সে। নাকি সত্যিই কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখে সে কাতর, সন্ত্রস্তও?

চেপুলাল, হাতের ছড়িটা নিয়ে, ধীরে ধীরে পাছা ঘষটে কুঞ্জর দিকে মুখ ফেরায। পিচুটি বসা চোখদুটো, এখন, যেন হাড়িয়া খাওয়ার ফলেই রক্তিম। যেন এই জঙ্গলেরই ক্ষয়িষ্ণু এবং শেষতম অসভ্য প্রজাতি সে। একমুখ ভয়ঙ্কর ক্রুর হাসি নিয়ে, সে, কুঞ্জকে দেখে। আর বলে, 'হামি আর কৎদিন বাঁচব, হ্যাঁ কুঞ্জ-খুড়া? বাঁচব হামি?'

কুঞ্জ নিশ্চিন্ত হয। হাতি নয়, বরা নয়, ভালুক নয় – কোনো জংলী জানোয়ার তার

পথ আটকে দাঁড়ায় নি। দাঁড়ালে জানোয়ারের হিংস্রতা এবং গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেপুলাল কি পারে তার কেঠো গাড়িখানা লদপদ গতিতে ছুটিয়ে দিতে ? হয়ত সে পারে। হয়ত গরুর ল্যাজ মুচড়ে দিয়ে, সে বলে উঠত তার গরুকে, 'চল্, হাইক্ যা ! হাইক্ যা ! টাক-টাক-টাক-টাআআআক্ !' চেহারায় তার গাড়োয়নিসুলভ ক্ষিপ্রতার কোনো আভাস না থাকলেও, কুঞ্জ জানে, শ্লা চ্যাপার ভয়-ডর নাই।

ভয়-ডর যত কুঞ্জর। নিজেকে নিয়ে, নিজের জীবনকে নিয়ে। অথচ যেখানে পাহাড়-জঙ্গলের পাদদেশে, সে গড়ে তুলেছে তার বসতভূমি, যেখানে তার আখচাষের জীবিকাও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে বংশ পরম্পরায়, সেখানে থেকে ভয়-ডর পেলে চলে কি করে ? জঙ্গলে থাকলে মানুষকেও জংলী হতে হয়। যার অনেকটাই হতে পেরেছে চেপুলাল। হতে পারেনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ হতেও চায়নি। প্রকৃত আখচাষীর মতোই, সে, বছর বছর চাষের সফলতাটুকু নেবে, ভয়টুকুও সে নেবে। নিজের মতো করে, বুকের তলে তলে, গোপনে। আর চেপুলাল ? কুঞ্জর সে ভয়েরই যেন প্রহরা। সে যেন তার আখের ক্ষেতে, জঙ্গলে, শালঘরে বিকট অগ্নিকুণ্ডের কাছেও এক অনিবার্য বর্ম। অথবা সে স্বয়ং ঢালও। যা দিয়ে সে প্রতিপক্ষ ঠেকাবে। তাই গাড়ির সম্মুখভাগে চেপুলাল। সে গাড়োয়ান। গাড়িব পশ্চাতে কুঞ্জ। সে তার যাত্রী।

মুহূর্তের উদ্বেগ মুহূর্তেই কেটে যায় কুঞ্জর। কপালের চামড়া তার ততখানি কুঁচকে ওঠার অবকাশ পায় না। এই বয়সে তার কাঁচা-পাকা লোমে ঢাকা বুকের ভেতরেও, ভেড়ার শুকনো অণ্ডকোষের মতো হড়হড় করে না হৃৎপিণ্ডটি। আর তাতেই তার ফাঁড়া কাটার আনন্দ, যা সে কৃপণের মতো চেপে রাখে এবং চেপুলালের দিকে তাকায়।

চেপুলাল ঘাড় ঘুরিয়ে থেকে স্বস্তিতে বসতে পারে না। সে লুঙ্গি জড়ানো কোমরটা আবো একটু নড়াচড়া করে বলে, 'কই বৈল্‌লে খুড়া ? বাঁচব ? হামি আর কৎদিন বাঁচব বৈলে দাও ক্যান্নে ?' ঢুকঢুক করে সে হাসতে থাকে।

আপাত অপ্রকৃতিস্থ চেপুলাল, এমন একটি চূড়ান্ত প্রশ্ন করে বসলেও, তাব উত্তরদাতা কি কুঞ্জ ? প্রশ্নের নেপথ্যে সে যেন দাবি করে বসে তার বেঁচে থাকার মোট দিনগুলি জেনে নিতে। সে ভেবে নেয় তার বাঁচা এবং মরে যাওয়াও পুরোটাই নির্ভর করছে কুঞ্জর ওপর। কুঞ্জরই ওপর।

কুঞ্জব চোখে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মুহূর্মুহু কেঁপে ওঁঠা পাঁজরাগুলো। জ্যোতিষির মতো নিরাসক্ত তার দৃষ্টি। সে যেন সত্যিই তার শরীবের আড়েথাড়ে গেঁথে থাকা হাড়কটা গুনে, যোগফল কষে, একটা কিছু বলে দিলেও দিতে পাবে। কিন্তু কুঞ্জ তা দেয় না। তার বহুশ্রুত এই প্রশ্নে সে তাকে উল্টে দাঁত কিচিয়ে দেয়। বলে, 'চুপ যা ! চুপ, হারামী !'

চেপুলাল তখনো হাসে। বলে, 'হুঁ, হামি চুপেই যাছি। লাও ক্যান্নে—' গরুর পিঠে সে তবলাব মতো বাজিয়ে দেয়। গাড়ি ফেব চলতে শুরু।

একটু বিরতি নিয়ে কুঞ্জ আবার নতুন করে বলে, 'তোব মরণ আছে, আঁই ? শ্লা, ই-দুনিয়ার সবকাই মরে ফুঁরায় যাবেক, তবোও—' বাক্য সে সম্পূর্ণ করে না। এদিক ওদিক, ধূসর গাছপালায় চোখ বুলিয়ে, সে তৎপর হয়ে বলে 'লে চাঁড়ে, গাড়িটা চলা। বেলা কৎটা হঁয়েছে ভাল ন উপ্‌রে।'

কুঞ্জর কথায় চেপুলালেব সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা আন্দাজ করার দরকার হয় না। তখনো তার সম্পর্কে কুঞ্জর শেষ মন্তব্যটি তাকে আচ্ছন্ন করেই রাখে।

আসলে, বাঁচা-মরার প্রশ্নটি তার নিজের হাড়সর্বস্ব শরীরটার ভবে দাঁড়িয়ে থাকলেও, কখনো সে নিজের কাছেই নিজে ধন্ধে পড়ে যায়। হয়ত সত্যি-সত্যিই তার মবণ নেই। তা থাকলে পবে, বউব্যাটা নিয়ে এতগুলো বছর সে টিকে আছে এবং টিকে যাচ্ছেও কোন দৈব মহিমায় ? সে তো কেবল কুঞ্জর গাড়োয়ান না ? সে তার পারিবারিক চাকর-মুনিষ-হাল চাঁলেয়া-

শাল বাখাদার কী নয় সে ? ক্ষেতে-মাঠে-ঘাটে-ঝুড়ে-জঙ্গলে সর্বত্র সে নিজেকে মজুত রেখেছে কুঞ্জর প্রয়োজনে। অযোধ্যা পাহাড়েব পাদদেশে বিশবিটাঁড়ে তাব ঘব। ভোব-ভোব সে বউ ভাবনি আর বছর এগাব বয়সের ছেলে হীরালাল বেশবাকে ছেড়ে নদী পেবিয়ে দুল-দুলিতে এসে পড়ে। কুঞ্জর গ্রামে। আর আশ্চর্য ! পথ হাঁটার ক্লান্তিও তাব নেই। এই অমিত প্রাণপ্রাচুর্য কি তবে তার চিরকালীন বাঁচার তাগিদেই ? আর মৃত্যুও যদি হয, তাহলেও, সে চায় দায়মুক্ত মৃত্যু। হঠাৎ করে মরে গেলে কে দেখবে কুঞ্জব আখের চাষ ? শালেব আগুনেব সামনে ঠায় বসে থেকে, প্রহবের পর প্রহব ফুটন্ত রসেব কড়াইযেব গাদ কেটে, টিন টিন আখেব রসকে কে রূপান্তরিত করবে ঝোলা গুড়ে, রজ গুড়ে, বালি গুড়ে ?

চেপুলাল এবাব সত্যিসত্যি সূর্যের দিকে তাকায়। তাবপর হাতের বুয়ান ডালটা দিয়ে নিজের পিঠে সপাসপ কয়েকটা আলতো ঘা মেবে, সে নিজের মতো করে গরুব পিঠেও ঘা লাগায়।

গরু দুটোও, চেপুর দেখাদেখি আলস্য নিয়ে, নড়ে ওঠে। গাড়িব চাকাব শব্দে স্পষ্ট হয সে আলস্য। 'চ্যাঁ-য়্যাঁ-রট্-বটাৎ-চ্যাঁ' শব্দ কবতে কবতে সেটা আবাব চলে।

আবাব ঢুল আসে কুঞ্জর।

'হাইক, হাইক। টাক-টাক-টাক—' গাড়িব গতি বাড়াতে, চেপুলাল, কখনো ল্যাজ মুচড়ে দেয, কখনো চাবুক মারে। গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে ফিবে আসে তার প্রতিধ্বনি। হাইক ! হাইক ! নিজেব ঝুলন্ত পা দুখানিতে সে নিজেই ঠোকা ঠুকি খায়। আর একেকবাব বলে ওঠে, 'হেই কুঞ্জখুড়া ! এখনৌ ঘুমাছই ? উঠবে নাই ? পাছে বিটিঘবে বিহাই তুমাকে গুন্দলু ঘাঁটার সঙে ভাঙ খাওয়াবে ?'

'হেই শ্লা, ভাঙ খাওয়াবেক ক্যানে ?'

'না, বলি এত য্যা ঘুমাছ ?'

'কুথায ঘুমায ? আচকায ?'

'এই য্যা দশ ডাকে তুমার বা পাছি নাই। অমন তলমুখ কবে যদি থাকবে ন, ত কৎক্ষণেই ভালুকে তুমাব মুড়টা ছিঁড়ে লিয়ে যাবেক। আব তুমি জানতেই পারবে নাই।'

এমন ধাবাব বসিকতায কুঞ্জ জ্বলে ওঠে। পাল্টা সে বলে, 'আমাকে ভালুকে খাবেক ? তকে খাক। শ্লা, গবক চণ্ডাল !'

'হুঁ, একদিনকে তাও খোবোর পাবে—' চেপুলাল হাসতে থাকে। বলে, 'শুনবে লদীর ধাবে মৈবে পড়ে আছি !'

কল্পনাব চোখে সে নিজেই নিজেব মৃতদেহ দেখতে পায। বিশরিটাঁড় থেকে ভোরবেলা নেমে আসাব সময জংলী হাতি, নদীতে জল খেতে এসে তাকে তাড়া করছে। তারপর শুঁড়ে আছড়ে—!

'কিন্তুক হামকে ভালুকে খাইলে তুমাব দশা কি হবেক ? কে তুমাকে এমন করে গাড়ি চাপায় বিহাই ঘবকে নিযে যাবেক ?'

কুঞ্জর চোখেব মণিতে, চেপুলালেব এই জিজ্ঞাসাটি কেউ যেন ঝুলিয়ে দেয় এবং সেটা ঝুলতেই থাকে। যেভাবে গরুব গলকম্বলের তলায টুং-টাং শব্দ তুলে ঝুলতে থাকে পলাশ কাঠের ঘন্টাটি।

আব দাঁত কিচিয়ে ওঠে না কুঞ্জ। ধুতিব নিচে, তলপেটে গুঁজে রাখা কাপড়ের থলিটা থেকে সে বের করে মেয়ের দেওয়া গুড়পিঠেগুলি। তাব কয়েকটা চেপুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'হাই লে, মরবি ত খাঁইয়েই মর।'

চেপু এক হাতে পিঠে খেতে থাকে। মুখে গুঁজে গুঁজে। আবেক হাতে সে গরুর পিঠে মাবে চাবুক। তারপব এক সময়, দুড়দাড় গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে, কুঞ্জকে ঠেসিয়ে দেয়

তাব আখের ক্ষেতের আল বরাবর।

শীতের শুরু।

সারারাত্তির বাতাস থাকে ভারি। মিহি ধুলোর মতো শিশির পরতে পরতে জমতে থাকে আখের ক্ষেতগুলিতে। সেই শিশিরে ক্ষেতের মাটি ভেজাব আগে ভিজে যায় গাছগুলি। পাতাগুলি। রোজ যখন ফিনকি দিয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন চকচক কবে প্রতিটি সজীব পাতা। বাতাসে দোল খায়। আব রাতভর জমে থাকা শিশির, বৃষ্টির ফোঁটার মতো, অশ্রুবিন্দুর মতো, আরো দ্রুতি নিয়ে গলে গলে পড়ে। এ যেন প্রকৃতির আরেক রূপভাষ!

গাড়ি থেমে নামতে গিয়ে ধুতির কাছাটা আটকে যায় কুঞ্জব। সে তৎক্ষণাৎ একপ্রস্থ গালাগাল কবে নেয় চেপুলালকে। বলে, 'কৎবার তকে বলেছি–এই খঁচলায কাপড় ছিঁড়ছে। পিটে দিতে তোর কিস্যাব বাজছে?'

চেপু ডুব দেওয়াব মতো কবে, গাড়োয়ানেব জাযগা থেকে তলিয়ে যায়। তারপব দুটো হাত, দুটো হাঁটু, গর্দানের ওপর তার টলমল করা ভাবি মাথাটি দুমড়ে মুচড়ে, গোটা শরীরবটা নুইয়ে সে গরু দুটোর মধ্যিখানে হামাগুড়ি দিয়ে কুঞ্জব পাশটিতে দাঁড়িযে যায। একবুক বাতাস, মুখেব বাসি ও পচা দুর্গন্ধসহ, ছাড়ে। এই প্রথম সে বুকেব ভেতবে সাবারাত আটকে রাখা বাতাস খালাস করে। আর বলে, 'পিটে দিব? ত পিটেই দিছি' বলে, সে, ক্ষেতের বাইবে রাস্তার ধাবে যেখানে বুয়ান গাছের ঝোপ, তার ভেতব থেকে একটা ভাবি পাথবখণ্ড এমন ভঙ্গিতে নিয়ে আসে, যেন আব একটি কথা বললেই কুঞ্জকে সে সটান আঘাত কবে বসবে। অতঃপব জড়েব প্রতি এক যুক্তিহীন আক্রোশ নিয়েই সে কাঠেব পাটাব গাযে বেরিযে থাকা গজালটিব মাথায ঘা মারতে থাকে। ঠাণ্ডাব দরুণ, যে জড়তা ছিল তাব হাতেব কগ্ন পাঞ্জায়, আঙুলে, তা ধীবে ধীরে কেটেও যায়। তারপর পাথব ফেলে দিযে, হাতেব ধুলো না ঝেড়ে যখন সে ক্ষেতের দিকে চায়, তখন ক্ষেতেব লাগোযা পাহাড়ের পুরো পশ্চিম পাদদেশ জুড়ে ছড়িযে পড়ছে প্রত্যূষ! পেকে ওঠা ইক্ষুদণ্ডের মতো, যা ইষৎ লাল ও হলুদে মেশামেশি।

ভাবলে কেবল বিস্ময জাগে, এই ক্ষেতগুলোই কি ধূ ধূ কবে বোদেব তাপে? লাঙল ঘুরলে ফলার মাটি রুক্ষতা নিয়ে বাতাসেব টানে ওড়ে? অথচ এখন? ক্ষেতের পাশে ক্ষেত। যতদূর চোখ যায। হলদে হয়ে এসেছে প্রতিটি গাছ। পেকে খসে পড়ছে পাতাগুলি। এই পাকা ফসলের ক্ষেতটির দিকে তাকালে চোখ বড় শান্ত, শীতল হয়ে পড়ে। পাহাড়েব শীর্ষ জুড়েও আবাদেব প্রগলভতা–অদ্ভুত বৈচিত্র্য নিয়ে উজ্জ্বল! এখন, রুক্ষতার কোনো স্থান নেই এখানে।

যত রুক্ষতা বয়ে গেছে চেপুলালকে ঘিরে। শীত যদিও ততোটা প্রকট হযনি, তবু, ইতিমধ্যে খড়ি কাটতে শুরু করেছে তাব গোটা গাযে। এমনকি, যে কবার সে নিজের থাবাব পাঁচ-পাঁচটা আঙুল দিযে আঁচড় কেটেছে পিঠে, ঘাড়ে, ঘাড়ের পিছন থেকে মেরুদণ্ড বরাবর, যে-কবার সে হাতেব ছড়ি দিয়ে চুলকেছে পিঠ–সমস্ত বেখাচিত্রগুলি এখন জীবন্ত হযেই ভযঙ্কব করেছে রুক্ষতা। তাব নগ্নতাও।

চেপুলাল জাড়ে কাঁপতে থাকলে, নিজেব শবীবটাকে সে নিজেই বোদের দিকে সবিযে সবিয়ে নিয়ে যায়। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে, আখের ক্ষেতের উজ্জ্বল বোদে চোখ তাব ঠিকরে গেলে, সে যেন ঘাড়ে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে নেয তাব মাথাটি। এবং সেই একই জায়গায এক শরীর নগ্নতা নিয়ে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবলেশহীন। স্থবির।

প্রকৃতি ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে। অথচ চেপুলাল? তাব স্থিতিজাড্য নিয়ে সে অনড়। তাব নগ্ন বুকেব উপবি-ভূমিকে কত ঋতুই না ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়। গ্রীষ্মেও সে থেকেছে নগ্ন, এই শীতেও সে প্রায় নগ্ন। চেপুলাল দাঁড়িয়ে থাকে যেখানের সেখানেই।

ক্ষেতভর্তি পাকা আং দেখে, কুঞ্জ যেন আলের মাটিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বাস্তবিক, সে খাযও। আর সে-সময় নিতান্ত অসতর্কতা সত্ত্বেও তার নজরে পড়ে যায় পাযে পায়ে স্পৃষ্ট ভূমিটুকু। সেখানে কযেকটা ভুরভুরে ফুটো দেখে, সে বলে, 'হ্যাঁ চ্যাপা, রাতে পাছে ক্ষেতকে শিয়াল আসছে?'

'শিয়াল ?'

'হঁ রে শালা।' কুঞ্জ খেপে ওঠে। পাহাড়ের শেয়াল তার ক্ষেতে ঢুকে পড়ার পিছনে হয়ত চেপুলালেরই আস্কারা রয়েছে।

চেপুলালও সেই মাটি দেখে। যেন সে দেখে কুঞ্জর দুটি পা। আর বলে, 'হঁ, এই ত। ঠিকেই ধরেছ। ই-গুলা শিয়াল-পাদাই বঠে।'

'তাইলে ?'

'তাইলে আর কি। আখ পাকলে শিয়াল ত আসবেকই। শিয়াল আসবেক, ঠাকুর আসবেক, পকা লাগবেক।' চেপুলাল হাসতে হাসতে বলে যায়, 'মাটি হচ্ছে বসমতা। তার ফল তুমি একাই খাবে ? সবকাই খাবেক নাই ?'

কুঞ্জ রাগতে গিয়েও রাগে না। হাতির প্রতি অসন্তোষ নিয়ে, সে, চেপুকে কুকথা বললে না জানি তার পরিণাম কি হবে। প্রসঙ্গ পাল্টে সে ক্ষেতের ভেতর ঢুকে পড়ে। দুহাত দিয়ে, আখের খাড়া হয়ে থাকা গাছগুলিকে সে দুপাশে টালতে টালতে এগোয়। আর এদিক ওদিক লক্ষ করে বলে, 'ইবার তাইলে ঝুড়াঝুড়ি করলেই হৈল। লয় ?'

'হঁ। পাইকে যখন গেছে, তখন যত চাঁড়ে চাঁড়ে গাছ ঝুড়ে নামাবে, তত চাঁড়ে চাঁড়ে তুমিও শালঘর ইস্টার্ট করতে পারবে। বঠে কি নাই ?'

'বঠে।' কুঞ্জ এক মুহূর্ত থামে। আবার বলে, 'চাঁড়ে আর কুথায় হৈল ? আশ-পাশের ক্ষেতগুলান নাই দেখতে পাছিস ?'

'.. ' সবকাই ঝুড়াঝুড়ি শুরু করে দিয়েছে বা। সহদেও দত্ত, বাধু, গোবিন্দ মাহাত' চেপু পরপর কতগুলো নাম আউড়ে যায়, যারা প্রত্যেকেই স্থানীয় চাষী। তারা ইতিমধ্যে ক্ষেত কাটা আরম্ভ করেছে। অথচ কুঞ্জ ? ক্ষেত কেটে আখের বোঝা নিয়ে সে করবেই-বা কি ? এখনো শালঘরের চালাটাই সে ছাইতে পারেনি। শালঘর হলে, তার মেঝেতে হবে বিশাল উনুন, উঠোনের একদিকে আখ কেটে এনে এনে পাহাড় করা হবে। আর উঠোনের মাঝে বসবে মাদলা—মাড়াই কল। এই সবকটা কাজ বাকি। অথচ সবকটা কাজই টুকুস টুকুস করে হলেও করে যেতে হবে চেপুলালকে। দিনভর খাটতে সে যখন আছেই, যখন সে খোরাকি পাবে, বাড়তি হিসেবে পাবে ঘরের এঁটো মাড়জল, জামবাটিতে বাসিপচা ভাত, ছেলে-বউয়ের খাওয়ার জন্য দুটো-একটা ফাউ আখঁডাড়ি, তখন আলাদা মুনিষ লাগিয়ে, কুঞ্জ, কড়চের পয়সা খসাবে কেন ?

'কই শুনলি। চ্যাপা—' কুঞ্জ পিছনে ঘাড় ঘোরালে, মুহূর্তের ..., চেপুলাল তার চোখের আড়াল হয়ে যায়। আখের গাছে গাছে, ঝাড়ে-ঝুড়ে ঢাকা পড়ে যায় ... শরীর। কুঞ্জর ডাকে, সে, শেয়ালের মতো গুড়খে গুড়খে আসে।

ক্ষেত থেকে বেরিয়ে, কুঞ্জ আবার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়। আগের বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে সে বলে, 'তোর বউকে খোরোর দে তবে। কাল-পরশু ল্যা ঝুড়তে হবেক।'

'ধরে লাও ক্যানে, খোরোর একরকম দিয়াই আছে। বস্‌সর-বস্‌সর তুমার যে কাম করছে তাকে লতুন করে তুমি কি খোরোর দিবে ?' চেপুলাল ফক করে হাসলে, তার হলদেটে দাঁতে পেদো পোকা উড়ে বসে। সাথে-সাথ দাঁতে পালিশ মেরে দেয় সে।

চেপুর এমন জবাবে কুঞ্জ খুশিই হয়। সে বলেছেও ঠিক। প্রতি বছরই এমনি সময়ে ভাবনি আর হীরালাল আসে তার কাজ করতে। তাও কি হালে হালে আসছে ? সেই যখন হীরালাল ছিল ভাবনির কোলে, যখন ভাবনির স্তনের গঠন ছিল ডাঁটালো এবং কুঞ্জর সামনেই সে আদুড় গায়ে তাকে স্তন দিত। চেয়ে চেয়ে ... চোখে দেখত কুঞ্জ। এখন সেই হীরালাল, নাবালক হলেও বাপের দেখাদেখিতে মাদলা ঘোরাতে শিখেছে। আর ভাবনি শুধু কাটাই করে। ক্ষেত থেকে সেই কাটাই করা আখের বোঝা গাড়িতে লাদিয়ে হারামী চেপুলাল, শালা চেপুলাল, গরক চণ্ডাল চেপুলাল 'টাইক্-টাইক্-টাইক্' করে গরু তাড়িয়ে শালঘরে ডাঁই করতে থাকে।

ক্ষেতের কিছুটা অংশ সাফ হয়ে গেলে শালঘরে সে আগুন দেয়। মাটিকে গড় করে সেই অগ্নিকুণ্ডে লোহার জগদ্দল কড়াই বসায় এবং পুরোহিতের মতো সেও আগুনেব পাশে বসে। ঝাঁঝরা হাতে। সেই ছড়ানো কড়াইটি আখের রসে টই-টই করলে, চেপুলাল তাতে নিজেরই প্রতিকৃতি দেখতে পায়। তারপর জ্বাল খেয়ে শ্বাস খেয়ে সেই প্রতিকৃতিই টলটল করতে করতে একসময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এভাবে ছত্রখান হয়ে গেলে পর, রসও আর রস থাকে না। তা গুড়ের চেহারা পায়। যেন আগুনের তাপে, জ্বালায়, ঘামে আব শ্রমে নিজেকে নির্মূল অথবা একাকার করে চেপুলালই চেপুলাল থেকে পাল্টে যায় গুড়ে।

ওই পোড়া পোড়া গুড়ের গন্ধেব জন্য সাল ভর অপেক্ষায় থাকে কুঞ্জ। ওই গন্ধ মানেই তাব সূত্র ধবে মাছির মতো উড়ে আসে যত পাইকার। যত গুড়ের ববাত। গুড়ের যোগান। গুড়ের টাকা। গুড়, গুড়।

অভ্যেসবসত, কুঞ্জ, নিজের ঠোঁটদুটো চেটে নেয়। বলে, 'চালটা কৎটা বাকি আছে, ছাইতে ?'

'নাই বেশি। কিন্তুক ফের শ-ট্যাক পুয়াল লাগবেক য্যা ?'

'ক্যানে, পুয়াল ত আমাব ঘরেই আছে ? ভাঙা ঘরটায় ?'

'স্যা ত আছে। কাল লিতে ঢুকলি ত খুড়ি বলল দিব নাই। বলল, শালঘরে পুয়াল দিলে গাইটাই কি খাবেক ?'

'গাইটা ?' ধ্যেৎ বুড়বক।' কুঞ্জ বউয়ের প্রতি বাগটা সবাসরি চেপুব ওপব দিয়ে চালিযে দেয। বলে, 'গাইটা আগু ন আমার শালঘবটা আগু ? কই, ই-বিত্তান্ত কাল আমাকে তুঁই কই বলিস ?'

'বলা মানে—শুধু পুযাল ক্যানে—ঝাঁটিও ত লাগবেক ?'

'ঝাঁটি লাগবেক ? ত বল দেখি লদীব এপাবটায টুকু ডাঁড়াব ! আজ সেনাবনার হাট বঠে ন ?'

'বঠে।'

পাহাড় থেকে সাঁওতাল মেয়েরা মাথায মাথায় ঝাঁটিব বোঝা নিয়ে নামবে। সেনাবনার হাটে সে-ঝাঁটি বিক্রি করতে যাবে তাবা এপথ দিয়েই। কুঞ্জ এখন সেই মুখে দাঁড়িয়ে, তাদের থেকে কয়েক বোঝা ঝাঁটি কিনে নেবে। চালে বসানোর জন্য। প্রচুর দামাদামি করে কিনে, সে, এই গাড়ি করেই আবাব নিয়ে আসবে শালঘবে। তারপর সেখানেও সে দাঁড়িযে থেকে, চেপুলালকে চালেব মাথায ওঠাবে। মাঝে মাঝে বিড়িতে টান দিযে, চেপুকে গালাগাল আর নির্দেশ দিয়ে যাবে। চেপু একসময় ছেয়ে ফেলা চালের মাথা থেকেই দেখতে পাবে – তাব চোখেব মতো বক্তবর্ণ হযে উঠেছে গোধূলিব সূর্য ! আর চালের নীচে ঠাণ্ডা হচ্ছে তার জামবাটি ভর্তি মাড়ভাত, শাগ বাঁধা। পলাশ পাতে নুন।

গাড়িতে উঠে, চেপুলাল, নিজেব পিঠে চাবুক মেরে গাড়ি ছেড়ে দেয়। তারপব সে গান ধবে। এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়তে নাড়তে –

বাঁশপাতাটি সরু সরু
বেলপাতাটি কল্পতরু
শাগের পাতা কলমি লতা
অগাধ জলেও ডুবল না
দিলদরিয়ার মাঝে

ডুবে দেখবে অজব্ কারখানা ...

ঠাণ্ডা পড়ছে কুলু কুলু। তাব ওপর কুয়াশা।

কোত্থেকে একটা কাঁথা-ছেঁড়া জোগাড় করেছে চেপুলাল। সেটা পিঠে ফেলে, গায়ের ঠাণ্ডা বাঁচাতে টানাটানি করলে শরীরেব বেশিটাই আঢাকা থেকে যায়। কোমব থেকে নাভিব ওপর, এমন কি বগলের নিচের পাঁজরাগুলোও সে ঢাকতে পাবে না। ভুরভুর করে বাতাস ঢোকে তল দিয়ে। তাব গোটা গা কাঁপে। কাঁটা দেয়। এমন ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতেই সে নদী পেরিয়ে এসেছে। এমন ঠাণ্ডায়, উপরন্তু, পবিমণ্ডল কুয়াশায় আচ্ছন্ন বলে কিছুই তার গোচরে পড়েনি। গাছপালা আর ক্ষেতের আলে নাদ ফেলতে ফেলতে মাঠে যাওয়া কাড়া-গরু—এসবই এড়িয়ে গেছে তার দৃষ্টি। অথচ কি আশ্চর্য, কোনো দৃষ্টিসূত্র ছাড়াই চেপুলাল এসে পড়েছে কুঞ্জর ঘরেব দুয়ারে। অনেকটা কুকুরেব মতো, স্বাভাবিক অথচ তীব্র ঘ্রাণশক্তি নিয়ে। সে, জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে শিকল ঠুকতে থাকে। বলে, 'কুঞ্জখুড়া, কই উঠলে ? কপাটটা টুকু খুলতে বল ন। এগৌ লতিকাব মা—'

কুঞ্জব বউ, যে লতিকাব মা-ও, কপাট খুলে দেয তাকে। ভিতর ঘর থেকে কুঞ্জ প্রাযদিন একবুক কাশি নিয়েই ওঠে। কাশতে কাশতে, আব্দাব কবে বলে, 'আইসেছে শ্লা গরক চণ্ডালটা! ইয়াব মু দেখে আমাকে উঠতে হছে। আজ দিনটা কেমন য্যা যাবেক।'

উঠোনে এখনো ভোবেব আবছা অন্ধকাব। সেই অন্ধকাবে চেপুলাল, যেন প্রকাশ্যে আত্মগোপন কবে দু হাঁটু ওপবে বেখে জড়োসড়ো হয়ে বসে। আব কুঞ্জব এমন সৌহার্দপূর্ণ সম্বোধনে সে চোখ কচলাতে কচলাতে হাসে। সে জানে, গাল মন্দই তার মনিবেব কথোপকথনেব ধবতাই। সে খুশি হয। ঠাট্টা কবে বলে, 'টুকু গঙ্গা-জল ছেড়াবে নাকি খুড়া ?'

'গঙ্গাজল ?'

'এই চণ্ডাল তুমাব ঘবকে আইসেছে, তাব হতেই।' চেপুলাল বসে বসে কযেক পা হাঁটে। কড়চ থেকে শালপাতার চুটি বেব কবে লতিকাব মাকে বলে, 'টুকু আগুনটা দাও ন আমাকে।'

'এখন চুলহাই ধবাই নাই।'

'ধবাও চুলহাটা। আব যদি কাঠ-মোটেব জগাড় নাই ত বল ক্যান্নে হামি চ্যালা করে দিছি।'

লতিকাব মা তার পাযেব কাছে কুড়ুলটা ফেলে দিয়ে যায।

কুড়ুলের প্রতিটি কোপেব শব্দে সবে সবে যায ভোরেব অন্ধকার। এভাবে কোপেব পর কোপে, পলাশ কাঠেব ফালিগুলো যখন ঢিবি হযে ওঠে, যখন তাব গায়ে তৈলাক্ত ঘাম আব কোটরে ডুমো ডুমো চোখ চকচক কবতে থাকে, তখন, সে-রকমই রাগ নিয়ে ওঠে দিনের প্রথম সূর্য। কুঞ্জর ঘরের সীমানাব ভাঙা পাঁচিলের তলা থেকে, সূর্য যেন চেপুলালকে উত্ত্যক্ত কবে, দফে দফে তবতর করে উঠতে থাকে।

চেপুলাল, তাতে লক্ষ কবেই হাতের কুড়ুলটা মাথায ওপবে উঁচিয়ে বাখে।

সেই কাঠ দিয়ে উনুন ধবানো হয। গোয়ালঘবে বসে, চেপুলাল, ফুঁ দিয়ে দিয়ে লম্বা চুমুকে চা খেয়ে যায়। তাবপব, চুটিব ধোঁযায সে অস্পষ্ট কবে দেয নিজেব মুখ।

কুঞ্জ বলে, 'শ্লা, চুটি খাঁইয়ে খাঁইয়ে আঙরা হযে যাবেক তোব ফোপশটা। চল্ ইবাব।'

'আব আঙরা হলেই মরণ ? যমেব বেজেস্টেরি খাতায় হামাব সোব চুটির হিশাব আছে। একটি একটি। আজ তক্ক হামি কৎগুলা চুটি খাঁইয়েছি জান কুঞ্জ খুড়া ? এই ধবে লাও ক্যান্নে' চেপু আঙুলের গাঁট গুনে হিশেব কবে। বলে, 'এই শ-দুশ হাজাব কাহন হবেক। ইযাব ক-ন হিশাবেই নাই। ক-ন হিশাব নাই।' বলে সে চুটিব শেষাংশ দাঁতে ধরে, গোয়াল থেকে গরুগুলো খুলে দেয়। তাদেব পাছায গুঁতো মেবে মেবে চৌকাঠের বাইরে বের করতে গেলে, গুঁতোব প্রতিঘাতে সে নিজেই কদম-দুকদম পিছিয়ে আসে। তাবপব, একসময়, সে নিজেও গরুব মতোই খুরে চৌকাঠ মাড়িয়ে বেরিয়ে যায। কুঞ্জর দুযাবে পড়ে থাকা গাড়ির কাঠামোটাতে সে গরু দুটো

দুপাশে জোতে। এবং কুঞ্জর সঙ্গে ধরাধরি করে শাল-ঘরের জিনিশপত্রগুলো সে লাদিয়ে নেয় তার গাড়িতে। পানা ফোটানো বড় বড় কড়াই, খালি টিন, ঝাঁঝরা, গুড়ের ঢাকা এবং কুঞ্জকেও। তারপর ? টাইক্ টাইক্ ।

'তোর বউ এৎক্ষণে আইসে গেছে ? ন পাছে আজও ডেরি করছে ? সকাল সকাল কাজে ঠেসলে তবে ন বেলাকে কাজটা জানাবেক। জাড়ের বেলা দেখতে দেখতেই ফুরায়।'

কুঞ্জ বলেছে ঠিক। শীতকালে রোদ উঠতে উঠতে আবার কখন যে রোদ মিলিয়ে যায় বোঝা যায় না। ছোট দিনের বেলা। সন্ধে হলো মানেই কাজও খতম। তখন না ক্ষেতে গিয়ে আখ কাটা সম্ভব, না শালঘরে মাদলা ঘোরানো সম্ভব। তখন সাত তাড়াতাড়ি কুঞ্জও যে ঘরে ফিরে যেতে চায়। খেয়ে-দেয়ে, কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে সে ছেলে-মেয়ে-বউ আর নাতিপুতিদের নিয়ে মাঝ উঠোনে আগুন জ্বালাবে। হাত-পা সেঁকবে। বাতকহ্নী বলবে।

তেমন কোনো পারিবারিক জীবন চেপুলালের নেই। যদিও তার পরিবার আছে এবং সে পরিবারের সঙ্গে তার মিলন ঘটে কেবল দড়ির খাটেই। তারপরও, পুবাদিনের ভেতরে, বউয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু সাক্ষাতের প্রতিটি মুহূর্ত তৈরি হয় কুঞ্জর উপস্থিতিতে। কুঞ্জর কারণেও। সেখানে কোনো ভাব-বিনিময় নেই, ব্যক্তিগত কথোপকথনের ফুরসত নেই। ফুরসত পেলেও, তাদের অলক্ষ্যেও কুঞ্জ যেন মূর্তিমান হয়েই থাকে।

চেপু মাঝে মাঝে একগুঁয়ে হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কুঞ্জর কোনো কথারই জবাব সে দেয় না। কেবল গরু দুটোকে 'হাইট, হাইট। হিঁঈঈব্যা! লেঠেও লেঠেও!' এমনি সব যিস-তিস অর্থহীন শব্দে চালনা করতে করতে সে আত্মস্থ থেকে যায়। তারপর কুঞ্জ যখন আরো চেঁচিয়ে ওঠে, যখন সে রাগে, নিজেরই খোৎনা দিয়ে ঝাপটা মেরে বাতাস কাটে, তখন চেপুলাল তার ট্যাঁসট্যাঁসে দাঁতগুলো দেখিয়ে শুধু হাসতেই থাকে।

এখনো, চেপু তেমনি হেসে উঠলে, কুঞ্জ বলে, 'মড়ার পারা হাসছেই, হাসছেই। পাছে তোর বউ আজ ব্যাটা ধ্যানাবেক ?'

না, আর কোনো সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা ভাবনির নেই। এটা অবশ্য চেপুর অনুমান। তার একমাত্র ব্যাটা হীরালাল, এখন দশ বছরের। হীরালালের জন্মের পর দশ-দশটা বছর সে ভাবনির সঙ্গে প্রায় নিয়মিত কাম-শ্রম দিয়েও, বিনিময়ে সে তার গর্ভে অঙ্কুরোদগম ঘটাতে পারেনি। যদিও সে-কর্মসাধনে তার কোনো আকাঙ্ক্ষা বা অভিপ্রায়ও ছিল না। তবু, অপ্রত্যাশিত হলেও, সন্তান-প্রাপ্তির বার্তা তার মতো হাভাতে মানুষের কাছেও তো সুখের ? বউয়ের প্রতি অংশত নিরাসক্ত মনোভাব নিয়ে সে টুব-টুব হেসে গলা ভিজিয়ে নেয়। বলে, 'হামার বউ ফের ধ্যানাবেক ? ধ্যানাক কায়ে, ধ্যানাক।'

কুঞ্জর শরীর জুড়ে, চকিতে একটা আলোড়ন খেলে যায়। সেই আলোড়নকে সে নিজের মধ্যে খানিকক্ষণ ধরে রাখতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার কল্পনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে ভাবনির সেই শরীর, যখন সবেমাত্র তার কোলে এসেছে হীরালাল। যখন সে নিপুণ মায়ের মতো যখন-তখন ছেলেকে গুছিয়ে মাই খাওয়াতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে নি। যখন শরীরে তার স্বাস্থ্য ছিল। যখন তার বুক-পাছা ও দাবনা একই ছন্দে মাংসের ভারে টলমল করতো— সেই বিরাট কড়াইয়ের সদ্য ঢালা পানার মতো।

'আর ইটা বুঝে লিবে খুড়া-' গরুকে খেদিয়ে, চেপুলাল, কুঞ্জকে ডাকে।

'কি বঠে ?'

'বলছি যা—' গায়ের কাঁথাটা টানাটানি করে সে বলে, 'ব্যাটা হোক আর বিটি হোক, হামার বউ যদি আখিরে ধ্যানায়, ত স্যাটা তুমারেই লাভ।'

'আমার লাভ ? তোর বউ ধ্যানালে ?'

'বঠে নাই ?'

কুঞ্জ এখনো বুঝে উঠতে পারে না। চেপু তাব বক্তব্য সবল করে বলে, 'হামার পারা উ-ও তুমার শালে কাম করবেক। এক ছোলা যাবেক, ফের এক ছোলা আসবেক। বটে ন ?'

বাস্তবিক, এমন এক অকাট্য কড়ার করেছে সে চেপুকে দিয়ে, যাব এখনো পর্যন্ত অন্যথা হয়নি। এখনো পর্যন্ত কেবল চেপু না, ভাবনি না, কিশোর হীবালালও তাব আশৈশব খাটোয়া, তাব মুনিষ। এবপরও যদি ভূমিষ্ঠ হয় তার নতুন প্রজন্ম, তাহলে সে-ও জন্মলগ্ন থেকে পাবে বসে টুবটুব কবা আখঝাড়ের গন্ধ, শালে জ্বাল দেওয়া পানার গন্ধ, টিনে টিনে বিশুদ্ধ গুড়ের গন্ধ—যার একক মালিকানা কেবল কুঞ্জ মোদকেব।

শালেব কাছে গাড়ি ঠেসতেই কুঞ্জ দূব থেকেই দেখতে পায ভাবনি কাজে লেগেছে। দাউলি নিযে ডাঁই কবা আখের দণ্ডগুলো সে একে কোপ মেবে আগা এবং গোড়া কেটে বাখছে। আগাগুলো রাখছে অন্যত্র, গাদা করে। এগুলো সে পরে গোবব জল মাখিয়ে ভিজে পাঁকে ফেলে বাখবে। তবেই সেগুলো সজীব থাকবে এবং এই সজীব আগাগুলোই আবাব পোঁতা হবে ক্ষেতে। চৈত্র-বৈশাখ নাগাদ।

হীবালাল এতক্ষণ চুষে চুষে খাচ্ছিল চাষের নতুন ওঠা আখ। কিন্তু চেপুলালেব গাড়িতে কুঞ্জকে আসতে দেখে, সে ছুঁড়ে ফেলে দেয গাদাব মধ্যে। সে হাতে মুখ মুছে সেই মুখ আবাব গামছা দিযেও ঘষে নেয়। তাবপবও থেকে গেছে ঠোঁটের জোড়ে আখ চিবানোব টাটকা দাগ। আর এখন সে, ঘুবে ঘুবে, শাল—ঘবেব চালার সামনে বসানো মাড়াই কলটা আনাড়িব মতো দেখতে থাকে। কল এখনো ঘোবেনি। আজ থেকে তা ঘুববে। আজ থেকে শুরু করে, যতদিন ক্ষেতেব আখ থাকবে ততদিন ঘুবে যাবে মাদলা।

'মাদলা' হলো পিনিয়ন। প্রত্যেক মাড়াই কলে তিনটি কবে পিনিযন যান্ত্রিক কৌশলে পবস্পরেব সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঢালাই লোহাব এই বিশাল বিশাল মাদলা-গুলোব প্রত্যেকটির ওজন এক মণেবও বেশি। তাদেব গায়ে সরু সরু খাঁজ কাটা। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল একটি কাঠেব খোঁটা দিযে মাদলাকে ঘোবানো হয়। সেই ঘূর্ণাযমান মাদলাব ফাঁকে, একেবাবে আখেব খণ্ডগুলো ঢুকিয়ে দিলে তা পিষিয়ে যেতে থাকে এবং নিচে পেতে বাখা টিনেব মধ্যে জমতে থাকে তাব বস। এই বসই হলো পানা।

কুঞ্জ ডেকে নেয হীবালালকে। ডাকে সে ভাবনিকেও। তাবা সকলে ধরাধবি করে গাড়ি থেকে টিন, কড়াই ইত্যাদি মালপত্র নামিযে বাখে শালঘবে। শালঘবে জল তো আছেই। মাটিব বড় হাঁড়াতে। খাওযার জন্য, গুড়েব টিন আর হাত মুখ ধোযাব জন্য, ভাবনিই এনেছে সে জল। প্রযোজনে সে আবাব আনবে।

গাড়ি থেকে মাল খালাস হলে, চেপুলাল গরু দুটোও খুলে নে। খুলে সে তাদের পিঠে চাপড় মাবতে মাবতে মাড়াই কলেব পাশে নিয়ে আসে। লম্বা খোঁটাব দু'প্রান্তে বেঁধে দেয এবং সে তাদেব ল্যাজ মুচড়ে চালু কবে দিলে, তাবা বৃত্ত বচনা করে ঘুবতে থাকে। ঘোবে মাদলাও। অথচ পানা পড়ে না। শালঘবে এমন নিষ্ফল মুহূর্ত তৈবি হয় না বললেই চলে। কুঞ্জ তাকে আব দীর্ঘাযিত করতে নাবাজ। হীবালালকে তাই সে তাগিদ দিযে বলে, 'যা মূহা, মুহা সোব জিনিসগুলা।'

হীরালাল ফুর্তি নিযে ছোটাছুটি কবে। সে খণ্ড কবা আখেব বোঝা দু'হাতে নিযে পেটে চেপে এগিয়ে আসে মাড়াই কলেব কাছে। চেপু টিন পেতে দেয়।

শালঘব এবং তাব আঙিনার চাবপাশটি পর্যবেক্ষকেব মতো দেখতে থাকে কুঞ্জ। নতুন চালের ওপর ঠিকবে পড়ছে পুবেব কাঁচা রোদ। নতুন বাতা, নতুন খড়, ঝাড়া উঠোন। চতুর্দিকে একটা কেমন পরিচ্ছন্নতা। অথচ এই পবিচ্ছন্নতা আব ক-দিনেই কেটে যাবে। যখন এমনি সকাল থেকে বেলাডুবু পর্যন্ত মাদলা ঘুববে, তার পাশাপাশি চালাঘবেব মেঝেতে বড়োমুখেব উনুনে ফুটতে থাকবে গুড়—হাওযাব দমকে দমকে ছাই উড়বে, গুড় পুড়বে— ডাবুতে ডাবুতে কড়াইযেব গুড় টিনে আব টিনের পানা কড়াইযে ঢালতে গিযে চারপাশটা কেমন চিটচিটে হযে পড়বে।

আর তখন জমে উঠবে কুঞ্জর এই শালঘর। তখনই সে চট পাতবে তার কেঠো তক্তপোষে। লোকজন এসে বসবে। গুড়ের নমুনা চাইলে, বা না চাইলেও, সে পলাশ ডাল গুড়ের টিনে ডুবিয়ে খদ্দেবের চোখের সামনে লম্বা করে তুলবে। ভাবতে ভাবতে কুঞ্জ কি টের পায় তার ল্যাটপ্যাটে হাতে নোটের গোছা ?

সেই ভেজা ভেজা তৃপ্তিপূর্ণ আমেজে কুঞ্জ গলা বাড়িয়ে দূরবর্তী শালঘবগুলোর দিকে একনজর তাকাতে চেষ্টা করে। নগেন কুণ্ডু, বিরাম মাঝি, ছুটু দত্ত —সবার শালেই চাঁই-পঁক করে ঘুবে যাচ্ছে মাদলার খোঁটা। জোড়া গরু। শালে শালে গুড়ও ফুটছে। বাতাস যেন অল্প অল্প করে ভাবি হতে শুরু করেছে পানার কাঁচা গন্ধ আর গুড়ের গন্ধে। সেই গন্ধ আরো একটু পেতে, কুঞ্জ তার নাকেব ফুটোগুলো শূন্যে ভাসিয়ে বাখে। আব পায়চারি কবতে করতে, মাঝে মাঝেই সে এসে দাঁড়ায় ভাবনির পিছনে।

মাদলা ঘোরাতে ঘোবাতে গান ধরেছে চেপুলাল। খোঁটাব দুপ্রান্তে বাঁধা গরু দুটোর, কখনো সে মোলায়েম পিঠে হাত বোলায়, কখনো বা মুচড়ে দেয ল্যাজ। আব তাদের অক্ষরেখা ধরে সেও ঘুবতে থাকে তাদেব পিছু পিছু। ঘুবতে থাকে।

অবিবাম ঘুরতে থাকার ফলে, তাদের ঘুরে ঘুবে যে বৃত্ত বচিত হয়েছে, সে বৃত্তের পবিধি বরাবর পা ফেলে ফেলে ঘুরে গেছে চেপুলালও। এখন সেই বৃত্তই সে যেন উত্তরাধিকার সূত্রে চিনিযে দেয় হীবালালকে। এখন হীরালাল গরু ঘোরায়—আব ভাবনি, মাদলায় গুঁজে দেয় আখ। পানা পড়ে।

চেপুলাল, তার আখেব ছিবড়ের মতো নির্ভার শবীরটা দিয়ে আগলে বাখতে চায় পানায় টইটম্বুর কড়াইটি। সে বাখেও তা। মাদলার পাশে জমে থাকা আখের ছিবড়ে, যা আবার আলাদা করে শুকনো হয়েছে, তা-ই সে উনুনে *ঠেলে* সেই জ্বালানির লেলিহান আগুন, চেপুলালের বুকেব পাকা পাকা লোমগুলো অব্দি ধুঁড়সে দিতে চায। তার বুকেব লোমগুলো, বগলের গোড়ায় ময়লা জমা পুরু লোমগুলো, তাব শরীবেব ঘাম আব বোঁটকা গন্ধ নিয়ে তেমনি থেকে গেলেও, কনুইয়ের ওপর থেকে হাতেব এমনকি পায়ের কিছু কিছু লোমও ঝলসে গেছে আঁচে।

চেপুব কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। গায়েব লোম, মাথার চুল, আঙুলেব নখরাজি—এসবই বুঝি তাব শবীরের পটভূমিতে নিতান্তই প্রাচুর্য। এমন-কি অন্তত এই মুহূর্তে, দুটো হাত এবং বুকের পাঁজরা বা গর্দানটুকুই যথেষ্ট। একহাত দিয়ে সে জ্বালানি *ঠেলে* দেয়, আরেক হাতে ঝাঁঝরা ধরে কড়াইয়েব পানা উথালিপাথালি কবে। গাদ ফেলে। আব ঝাঁপ খাওয়ায়। আর পাঁজবায় সে শুষে নেয় যত উত্তাপ। কোনো একদিন তার এই উত্তপ্ত পাঁজবাগুলিই কি বজ্র হয়ে ফেটে পড়বে ? এমন কথা চেপুলাল ভাবতে পারে না। তাই সব উত্তাপকে প্রশমিত করে, তাব ম্যাড়ম্যাড়ে দাঁতগুলি হাসি আর উচ্ছ্বাসের ভাষা হয়ে ওঠে। হাতেব ওই লম্বাটে ঝাঁঝরাটি নিয়ে, নিজের সঙ্গে নিজেই অনর্গল কথা বলে চলে। কড়াইয়ের তলদেশ থেকে, ঝাঁঝবাটিকে সে একবার চক্কর খাইয়ে লম্বভাবে আসমানে তোলে। তারপব সেই ক্ষিপ্রতা নিয়ে, ফুটন্ত রসে ক্রমাগত চাপড় মারতে মাবতে সে বলে, 'ঝাঁপ, ঝাঁপ দে! ঝাঁপ !'

তক্তপোষে বসে বসে বিড়িব ধোঁয়া ছেড়ে যায কুঞ্জ। সে কেবল সৃষ্টিশীল রঙ্গ দেখে চেপুলালের। শকুনিব দৃষ্টিতে যখন মাড়েব মতো শাদা রঙ কেটে গিয়ে পানা ক্রমশ লালচে হয়ে উঠছে এবং তখনো ঝাঁপ খাইয়ে যাচ্ছে চেপুলাল, তখন সে তার হাঁটুর ভেতর হাঁটু ডুবিয়ে আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। বসার মুদ্রা পাল্টে, সাময়িক অস্থিরতা নিয়ে, সে এক লোমশ দাবনার ওপরে আরেক পা, অথবা পায়ের ওপরে দাবনা রেখে উশখুশ করে। আর শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে, বুড়ো কৃকলাসের মতো সে ডাকে, 'হেই চ্যাপা ! ভালবি ন—'

ঝাঁপের শব্দে কুঞ্জর ডাক সে শুনতে পায় নাকি ?

'হেই শ্লা চ্যাপা—'

চেপুলাল তাব আঁচে আর ঘামে চকচকে মুখ নিয়ে তাকায কুঞ্জব দিকে। তখনো হাসে। আব শূন্যে তোলা ডান হাতের ঝাঁঝবার প্রতিটি ফুটো থেকে চুঁই চুঁই শব্দে পড়তে থাকে বঙদার পানা।

'আর কৎক্ষণ ফুটাবি ?

'রঙটা আসতে হবেক ন ? এখনি যদি ইয়াব জ্বাল বন্ধ কবে দিই, ত মাল ঢের শাদা দেখাবেক। কাঁচা থাইকে যাবেক। আর কাঁচা মাল—'

'চুপ দে !' কুঞ্জ কাঁচা মাল সম্পর্কে তার মুখে কিছু শুনতে চায় না। সে কি জানে না, গুড় ঠিক ঠিক বঙ পাওযার আগেই তাকে নামিযে দিলে, সে-মাল যখন টিনে টিনে প্যাকিং হয়ে যাবে, তখন বর্ষায় তা গেঁজে উঠবে ? অবশ্য তেমন মাল খদ্দেব কিনবেই বা কেন ? তারা যে কুঞ্জব থেকে চতুব।

তাবা যেমন কাঁচা মাল কেনে না, তেমনি মাল বেশি পাক খেয়ে কালচে হযে উঠলেও তা কিনতে চায না। কালচে মালের দামও কমে যায।

'গুড়েব বঙ হবেক কেমনটি ?' জ্বাল খাওযাতে খাওযাতে, চেপুলাল, এক সময চাটু উঁচিয়ে দেখায, 'এমনটি। এমন সৈল্লা গাছেব লাঠাব পাবা।'

হ্যাঁ, গুড়েব এই বঙ দেখে কুঞ্জ খুশি না হয়ে পাবে না। এবং এই বঙের সঙ্গে, চেপুব উপযুক্ত উপমাব প্রযোগেও। সত্যিই গুড়ে চবকানো যে সাবুটা সে ধবে থাকে, ওই কৃকলাসটির তিরতির কবা চোখের দিকে, তাব বঙ প্রকৃতই সজনে গাছের গাযে জমে ওঠা আঠাব মতো। স্বচ্ছ ও থকথকে।

কুঞ্জ জিভ চাটে, খুশিতে। সেই খুশিব প্রকাশ ঘটে চেপুলালকে ধমকে ওঠাব মাধ্যমে। বলে, 'উটা আমাকে কি দেখাছিস, হ্যাঁহ্ ? ফেব জ্বাল খাওয়াছিস ক্যানে ?'

শেষ ছিবড়েগুলো জ্বলে নিঃশেষ হওযাব মুহূর্তেও, চেপুলাল, অবিকল তেমনি ভঙ্গিতেই তাকিযে থাকে কুঞ্জব দিকে। তেমনি হাতে তাব গুড়ে লটপটানো ডাবু, ডাবু থেকে পতনশীল গুড়ের ধাবা। আব তির্যকদৃষ্টি নিয়ে আগুনেব আঁচে তাব চকচক কবা মুখমণ্ডল।

গুড়েব গবম গবম সুমিষ্ট গন্ধ একবুক টেনে নিতে, কুঞ্জ, তাব নাকেব পিণ্ডটা আরো একটু সামনেব দিকে বাড়িযে দেয।

শালঘরেব মাথা থেকে উঠোনেও, একটু একটু কবে ছড়িয়ে পড়ছে শীতেব বোদ। আখের গাদায়। মাদলাব খোঁটায।

কুঞ্জ এখনো শালে আসে নি দেখে, যতটা পাবে গুড় খেযে নিচ্ছে হীবালাল। ভাবনিও। পলাশ পাতায অনেকটা কবে ঘন গুড় এখন তাদেব প্রাতবাশ। তাবা শালঘবেব চালার পেছনে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে খেতে থাকে। এই খেযে কাজ কবতে করতে দুপুবে ফেব বাসি ভাত, শাগ বাঁধা, যা জামবাটিতে কাপড় জড়িযে শালঘরে এনে রেখেছে ভাবনি। তাবা গুড় চাটে আর একেকবার উঁকি মেরে কুঞ্জব আসাব পথটি লক্ষ করে।

কুঞ্জব উপস্থিতিতে আখ ভেঙে খাওযাবও বড় একটা অবকাশ থাকে না। গুড় খেলে তো সে কাঁই কাঁই করবেই। তবে খাবাব জন্য সে তাদেব মজুবি বাদেও দেয় প্রতিদিন দুটো মাঝাবি সাইজের আখ। সব শালেই এই প্রথা।

ভাবনি সেই আখগুলোই জমা কবে কবে একদিন বোঝা বেঁধে বেচে দেয। আব যে গুড়টুকু সে চেয়ে কিংবা তলপেটে লুকিয়ে নিযে যেতে পারে, সেটা সে ঘরেই রাখে। আগামী দিনগুলোতে একটু একটু কবে খাওযার জন্য।

শালে গুড় নিযে কাজ করতে করতে চেপুর যে কি হয়েছে ! সে না আখ খায, না গুড়। যদিও সারা শরীরটাই তাঁব চিটচিটে হযে থাকে। গুড়ের ভাপ আর ছাইয়ে। মাথার চুলে জট পড়ে পড়ে মাথার ওপবে বিঁড়া হয়ে বসেছে। স্নান করার ফুবসৎটুকুও সে পায় না। পেলে হয়তো কাছের কোনো ঘাট থেকে যে দ্রুতগতিতে সে একটা ডুব দিযে আসে, তাতে গাযে

মাথায় লেগে থাকা গুড়টুকু শুধু গলে। ধুয়ে যায় না।

চেপুলাল এখন শালঘরে ঘুমোয়। টিনে টিনে ভর্তি গুড় সে পাহারা দেয়। সকালে কুঞ্জ শালে এসে পড়ার ঢের আগেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। ভাবনি আর হীরালাল তখনো পর্যন্ত না এলেও, সে নিজেই একা একা কাজ শুরু করে দেয। সারারাত শালঘরের ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে থেকে, অথবা ঘুমতে না পারলেও, নিজের সঙ্গে নিজের মোকাবিলার দরুন কোনো দুর্বলতার ছাপ সে তার সকালের কামকাজে রাখে না। যদিও, চোখেব কোলে জমে পিচুটির দলা। থেকে থেকে সে কাশে। কাশির দমকে যেন মূল ধরে নাড়া খেতে থাকে তাব বুকের হাড়গোড়গুলো।

ইদানিং একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সে। ঘুমও পায়। উনুনেব পাশে বসে থেকে, ঝাঁপ খাওয়াতে খাওয়াতে, কখন যে চোখেব পাতা দুটি নেমে আসে সে নিজেও টের পায় না। বগবগ করে ফুটে ওঠা গুড়ের শব্দেই তার তন্দ্রা কেটে যায়। অথবা, কুঞ্জই তাকে চেঁচিয়ে ডেকে দেয়। বলে, 'য়েই শ্লা চণ্ডাল! মুজুব্ড়ি খাঁইয়ে পড়বি য্যা কঢ়াইটার ভিৎবে।'

ঝাঁঝরা হাতে নিয়েই সে চনমন কবে ওঠে। ম্লান হাসিতে মৃত্যুর আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য কবে যায়। ফের ধুঁকতে ধুঁকতে সেই একই বকমভাবে পানায় জ্বাল খাওযাতে থাকে।

গুড়ের পাইকাবেব সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসে কুঞ্জ। তাকে শালঘবে ঢোকার আগে, পলাশ গাছগুলোর পাশ দিয়ে আসতে দেখেই ওরা গুড়ের এঁটো পাত ফেলে মুখ মুছে নেয। ভাবনি হাতে নেয় কোমরে গোঁজা দাউলি। আব হীবালাল 'হাইট্ হাইট্' কবে গরুদুটোকে মাদলাব খোঁটায় বাঁধাব জন্য নিযে যায।

কড়াইযের গুড় টিনে টিনে ভরে চেপুলাল, এখন ফের কড়াই বসিয়েছে জ্বালে। পালাভর্তি কড়াই এখনো ফোটে নি, এখনো তেমন জোরদাব তেজে জ্বলে ওঠে নি মোটা মোটা পলাশের গুড়িগুলো।

'তরা এখনো কাজটা ইস্টার্ট করতেই পাবিস নাই?' কুঞ্জ হীবালালকে বলে, 'কিস্যাব লাইগে এতো বেলায় শালে ঢুকেছিস, হ্যাঁহ?'

ওরা কিছুই বলে না। কাঁশির শব্দ তোলে চেপু। আর উনুনশালে বসে থেকেই সে যেন বুক উজাড় কবে কাশতে থাকে। কাশে আব মুখভর্তি ভাবি কফ তুলে সে জ্বালানির জন্য জমিয়ে বাখা আখেব ছিবড়েগুলোর ওপর ফেলে।

গা ঘিন ঘিন করে কুঞ্জর। বলে, 'আচ্ছা অঘোবী ত। উঠে টুকু উ-পাশটায যা ক্যানে।'

কতবার সে উঠে উঠে কফ ফেলবে? বুকের ভেতবে কদিন থেকে তাব এমন ঠাণ্ডা জমেছে সে কফ ফেলেও সে কূল পায় না। এইটুকু খাঁচায এতো কফ আসেই বা কোথা থেকে! চেপুলাল ভেবে পায় না।

'বাতের বেলি বড় জাড় লাইগেছে। তাব হতেই এমন কাশি।' বলতে বলতে চেপুলাল একটু থামে। ফেব বলে, 'একটা কম্বল-তম্বল যদি থাকে ত দাও ন খুড়া। আব নাই যদি কম্বল, ত আ-র গটাকতক চট ছিঁড়াই আইনে দাও। রাতেব জাড়টায় বোড়ো কাঁপায়।'

তার কোনো বক্তব্য কানে নেয় না কুঞ্জ। যে চটেব বিছানাটা সে করে দিয়েছে, চেপুব জন্য, সেটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে ঠাণ্ডায় কাতব হলে চলে? তাছাড়া অল্পস্বল্প ঠাণ্ডা-গরম বৃষ্টি-বাদলা সহ্য করার সহজাত ক্ষমতা তো তাবা জন্ম থেকেই পেয়ে যায়। তারা সাঁওতাল যে। জন্ম থেকে ঝুড়ে-জঙ্গলে মাঠে-ঘাটে ঘোরে, রাত কাটা। বাতে কুঞ্জব শাল রাখা করে বলেই কি শালে বাড়তি জাড় এসে ঢোকে?

এতকথা না বলে, স্রেফ মুখ ঝামটা দেয় কুঞ্জ। আব পাইকারকে সে দড়ির খাটে বসিয়ে নিজে বসে তক্তপোষের ওপবে। তার টুকরো কাগজের গোছা, মুদ্রাশূন্য কাঠেব ক্যাশবাক্স ইত্যাদি আগলে নিযে ধুতিতে লুকোনো বিড়ি এগিয়ে দেয় পাইকাবেব দিকে। বলে, 'মাল আপনি যখন খুজবেন আমার টিনে মজুত পাবেন। চায় দশ টিন লেন, চায় বিশ টিন লেন। তবে দবে

আমি এক পসাও কমাতে লাবব। ক্যানে ন, মাল আমাব একলম্বব আছে। নিমুনা দেখে লেন ক্যান্নে–' সে বলামাত্র শবীর ঝুঁকিয়ে একটা টিনে সটান ঢুকিযে দেয নিজেব আঙুল। তর্জনিতে যে গুড় সে লটপটিয়ে তোলে, সেটা জোর করেই পাইকাবেব চেটোতে মাখিয়ে দেয। বলে, 'খান। খাঁইয়ে দেখুন। এই মাল আপনি ছুটু দত্ত কি নগেন – কাবো টিনেই পাবেন নাই। গুড়ের বতরটাই হচ্ছে ম্যান। আমাদের ওই চেপুলাল যা বতব বুঝে, অমন আর কে বুঝতে পারে ?'

পাইকাব চেপুলালকে দেখে। তাদেব দেখাদেখি সেও তাব কানে গুঁজে বাখা পোড়ো বিড়িটা ধবিয়েছে। দাঁতে চিবিযে রাখলেও, অন্তত এই মুহূর্তে তাকে আগের মতো চনমনে ফুর্তিবাজ দেখায় না। অন্য সময হলে সে কুঞ্জখুড়ার এক-কথার বদলে দশ কথা বলে ফেলত। কিন্তু এখন কথা বলাব কোনো স্পৃহাই তাব নেই।। পারলে আগেব কথাগুলোই সে প্রত্যাহার করে নিতে চায়। এখন চেপুলাল তাব হাতের ভাবি ঝাঁঝরাটাব টানেই ঝুঁকে পড়ছে উনুনেব দিকে। কাশছেও।

'ত ঠিক আছে, আশিব দবেই পাকা। আমাব পাঁচটিন মাল বাবটাব 'জয শম্ভু'যে উঠায দেন। পাক্কা ?'

'পাক্কা।'

ব্যস্ত পাইকাবী সটাসট নোট গুনে ফেলে দেয় কুঞ্জব কাঠেব বাক্সব ওপব। কুঞ্জ সেগুলোই আবার থুতু দিয়ে গোনে। আবাব গোনে। এবং পাইকাব উঠতে চাইলেও, সে তাকে জোব করে বসায। তাকে আবো একটা বিড়ি দিযে সে শুনিয়ে যায গুড়েব হালফিল বাজাবেব কথা। যদিও তাব কোনো কথাই অজানা নয় পাইকাবেব। সে তো আজকেব পাইকাব নয। আজ প্রায আট-দশ বছব ধবে এখান থেকে গুড় সে পুরুলিযাব বাজারে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু এখানে, এই দুলদুলি গ্রামেই না, দুলদুলিব লাগোযা গ্রামেব পব গ্রামে কেবল আখেবই চাষ হয, গুড় হয। এই গুড় পুরুলিযা ছাড়াও বাঁকুড়া --মেদিনীপুব-টাটা-চাণ্ডিল চলে যায।

কুঞ্জ বলে, 'গুড়ের তো এই সিজিন। এখন আমদানি আছে, যদি পঞ্চাশ-একশ টিন মাল আপনি ইস্টক কবতে পাবেন, ত বর্ষাটাব পবে-পবেই দ্বিগুণ পোফিট পাবেন। বর্ষায গুড় কে খায় ?'

পাইকাব হ্যাঁ-না কিছুই বলে না। বিড়িতে শেষ টান দিযে সে উঠে পড়ে। যাবাব সময় আবাব বলে যায, 'তাইলে বাবটাব জয শম্ভু ?'

'বাবটাব জয শম্ভু।'

নির্ধাবিত সময়ে জয শম্ভু বাস এসে দাঁড়ালে, কুঞ্জ খালাসি দিযে বাসেব মাথায মাল লাদিযে দেয। তারপব কড়চেব বিড়ি হাতড়াতে হাতড়াতে সে এসে ঢোকে শালঘবে।

শালঘবে যেন মাটি নেই। মাটিব ওপবে গুড় আব আখেব ছিবড়েব একটা পুরু আস্তবণ। তার ওপব দিযে হাঁটা-চলা কবতে কবতে তলপাযেও গুড়েব চাকড়া লেগে থাকে কুঞ্জব। সেই পা নিযে তক্তপোষে উঠে পড়ে সে। আব আগের মতোই শবীব ঝুঁকিয়ে চেপুলালকে ডগমগ হয়ে বলে, 'দিনকে দিন চিনিব বাজাবে আগুন লাগছে। এখন গুড়েই পসা! গুড় ভিন্ন মানুইষেব কাজ হবেক ক্যানে ? হবেক ?'

চেপুলাল কফ ফেলে। কাশিব শব্দে কুঞ্জব উচ্ছ্বাস তাব কানে যায় না।

মাঝবাত্তিবে জঙ্গলেব হাতি নেমেছিল আখক্ষেতে। যদিও ক্ষেতে এখন আর তেমন আখ নেই। কিছু কিছু কবে প্রত্যেকেই কেটে ফেলেছে। তাহলেও যা আছে, তাকে হাতির গ্রাস থেকে বক্ষা করাব জন্য প্রত্যেক শালঘব থেকে লোকজন ছুটে গেছে। মশাল হাতে নিয়ে,

ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে। যেতে পারে নি কেবল চেপুলাল।

হাতি নামার খবর পেয়ে, কুঞ্জ আজ ভোরভোরেই শালে এসে হাজির। পলাশ গাছের সারির পাশ দিয়ে আসতে আসতে সে দেখে – চালের মাথা থেকে ঝুলন্ত চটের আড়াল তখনো তোলে নি চেপু। তখনো সে বুঝি ঘুমিয়েই আছে।

কুঞ্জ চেঁচাতে চেঁচাতেই আসে। যখন সে মাদলার কাছে এসে দাঁড়ায়, দেখে, তক্তপোষ থেকে বিছানার কুণ্ডলী নিয়ে মাটিতে পড়ে আছে চেপুলাল। আলুথালু হয়েছে তার ছেঁড়া লুঙ্গি। একটা কুকুর চেটে চলেছে তার তলপা দুটো। তার পিঠ, তার ঘাড়।

কুকুর দেখে সামনে আর এগিয়ে আসতে পারে না কুঞ্জ। দূর থেকে সে তাকে হাতে ঝাণ্টা দিয়ে তাড়াতে চেষ্টা করে। বলে, 'হাড়িক, হাড়িক!' বলতে বলতে সে, ভয় এবং সন্দেহ নিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই শ্লা চণ্ডাল! আজ উঠবি ন নাই রে?'

কোনো প্রত্যুত্তর আসে না তার। কুকুরটি তখনো গা চাটতে থাকে চেপুলালের! আর পায়ে পায়ে আঁচড় কেটে সে উড়িয়ে দেয় উনুনের বাসি ছাই।

স্বপ্নময় চক্রবর্ত্তী

গনেশ

কতদিন হ'ল নিরুদ্দেশ ?

গত হাটবার থে ।

মানে কতদিন

ধরুন চাইব দিন

বযস ।

বন্যাব সালে জন্ম ।

পাশ থেকে কনস্টেবলটি বল্ল চোদ্দ লিখুন স্যার ।

গোঁফ উঠেছে ?

এই এট্টু বেখা মতন ।

আচ্ছা । চোদ্দ । ঝগড়া-ঝামেলা কিছু হযেছিল ?

না আজ্ঞা ।

টাকাপযসা চুবিটুবি ....

কীইবা আছে আমাব যে নেবে ?

আইডেনটিফিকেশন মার্ক আছে কিছু ?

সিটা কী সাব ?

এই ধব কোন আঁচিল, জডুল, কাটা দাগটাগ ।

পাশ থেকে কনষ্টেবলটি বল্ল চিন্ন, চিন্ন, ঝা দেকি তোমার ছেলেবে চিনা যাবে।

বিজয় হাজবা তক্ষুণি বল্ল আছে সাব, আছে। ছ্যামড়ার বাঁ কানটা বড় । এই এ্যাতো পর্যন্ত, কুলোব মতন ।

নতুন আসা মেজবাবু অবাক হয় । বলে কুলোব মত ? 'অসুখ বিসুখ নাকি ?

কনষ্টেবলটি মানেওলা হাসি মেরে বল্ল আছে স্যার, এ অঞ্চলে ব্যাপার আছে। পরে জানবেন ।

নতুন আসা মেজবাবু লিখলেন ভেবী লার্জ লেফ্‌ট ইযাব ।

থানায ডায়রী করিয়ে বিজয় হাজরা ফিরছিল । তখনই দেখল পিচবাস্তাব বাস স্টপেজে দাঁড়িযে দাঁড়িযে ফিল্টার ফুঁকছে গোপীবল্লভ । চুলে টেবি, গায়ে টেরিকটন, বগলে চামড়ার ব্যাগ, আব থানকাপড়েব পুটুলি । গোপীবল্লভকে আগে নাম ধরেই ডাকতো বিজয হাজবা । বয়সে ছোট । ধোপাদের ঘরের ছেলে । টেন ক্লাস অব্দি পড়েছিল । এখন এই ড্রেস মারা অবস্থায কি ডাকবে ভাবছিল, তার আগেই গোপীবল্লভই ডাকল ও বিজয় ··· । ডাকের মধ্যেও বেশ

মশলা এসেছে। বিজয় হাজরা কাছে গেল। গোপীবল্লভ বলল কি হল, তোমার ভায়রা-ভাইয়ের কেসটা কি করলে ? বিজয় বল্ল ওসব কেস-কথা পরে। আমার ধঞ্জয়ডারে কী করলা তুমি, কানটা ইয়া বড় হয়ি গেল, ইস্কুলেব ছেলেপিলে আর পাড়ার চেটো-চ্যাংড়ারা সব ওর লম্বা কানটা ধরি টানাটানি —এমন অস্থিব করি তুলিল যে ছ্যামবা ক্ষ্যাপা-পান হয়ি নিঘ্‌ঘিননেতি ঘর ছাড়ি পালালো। এখন যে কতি গেচে সে ···

গোপীবল্লভ আঙুলের সিগারেট সমেত হাতেব পাঞ্জাটা ভোটেব হাত-চিহ্নের মত বিজয় হাজরার মুখের সামনে ধবল। মানে থামো। বিজয় থামলে গোপীবল্লভ বল্ল বুঝলে বিজয়, ঝাবা ক্ষেপাচ্ছে, ঐ সব চ্যাংড়াচোটাগুলুন, ওদের মধ্যি দেকো, অনেকিরি কান বড় হবে, নাক বড় হবে, হাত বড় হবে, কিছু ব্যস্ত হবাব নেই, কাজ এগুচ্ছে।

বিজয় হাজরা বলে সি কতা নয়। বলতিচি, তুমিতো পাঁচ জায়গায় ঘাই মারো, আমাব ধনার সন্ধানটা করো। টি.ভি. তে ওরে দ্যাকানো যায় না ?

সে দ্যাখাবে কি করি ? ওর কি ছবি আছে ?

হ্যাঁ, আছে বৈ কি। মেলার সময় তোলা হয়েছিল, পিছনে তাজমহলের সিন।

সে তো পুরোন। কান বড় হবাব পব ছবি আছে ?

তা অবিশ্যি নেই।

তবে ?

তাইলে ধনাবে খুঁজি পাবাব কি উপায় ?

সে আমি দেকচি খনে। তোমাব কিছু চিন্তা কবাব নেই। চিন্তা কববে চিন্তামনি। তোমার ভাযবাব কাছে যাবার ছিল, একটা কেস্ আছে বলছিলে না ?

সিটা মোব দ্বাবা হবিনি। আমি নে যাবনি। মাথা নাড়তে থাকে বিজয়।

ঠিক আছে। আমি একাই যাব। এড্রেসটা, মানে ঠিকানাটা তো বলবে।

ঐতো, আনন্দপুর গেবাম।

ভায়বার নাম ?

মহাদেব হাজরা

বাস এসে গেল। সিগারেটেব হলুদ ফিল্টাব সাদা ধুতবো ফুলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বাসেব হ্যাণ্ডেল ধবল গোপীবল্লভ।

একটু টাউনে যাব। জামাকাপড় গুনু এট্টু লণ্ড্রীতি দিতি হবে।

ধোপাদের ছেলে গোপী এখন জামাকাপড় কাঁচতে ধোপাবাড়ী চল্ল।

গোপীবল্লভ হাজির হল মহাদেব হাজবার ঘবে। গোপীবল্লভেব পবনে ফাইন ধুতি। কোঁচাটা ফুল বানিয়ে পকেটে রাখা। ঠোঁট লাল। বগলে চামড়াব ব্যাগ। বল্ল বিজয় হাজরা পাঠায়ে দেছে।

কী বিত্তান্ত ?

কথা আছে। দরকারী কথাবার্তা আছে কিছু।

মহাদেব হাজরা খেজুর পাতার চাটাই পেতে দিল। গোপীবল্লভ চাটাইয়ে ফুঁ দিয়ে বসল। সটাস্ করে ব্যাগের চেন খুলল। কিছু কাগজপত্তব বার কবল।

মহাদেব হাজরা বুঝে নিল কোন দুনম্বরী ব্যাংক পার্টি। এখন নানা রকমের ব্যাংক গজিয়েছে।

মা লক্ষ্মী সঞ্চয়, ম্যাডোন সেভিং, এরকম সব। টাকা খিঁচে হাওযা হয়। মহাদেব তাড়াতাড়ি বলে টাকাপয়সা মোটে নেই। ওসব দিতি পাববনি।

গোপীবল্লভ বলে টাকা পয়সা তোমায় দিতি হবে না, ববং উল্টি তুমিই পাবা। ম্যালা টাকা। আগে ব্যাপাবটা মন দে শোন।

একটা ফিল্টাব সিগারেট ধবায় গোপীবল্লভ, আব একটা মহাদেবেব দিকে বাড়িয়ে দেয়। কমলা রং-এর ফিল্টারটা মহাদেবের দিকে চেয়ে আছে। নেবনা নেবনা কবেও মহাদেব ওটা নেয়। গোপীবল্লভ সিগারেটের সামনে গ্যাস লাইটাবে পিচ্ করে। লাইটার ফনা তুলে দেয়।

শোন বলি। আমি একটা কোম্পানীব কাছ থেকি আসছি। কামিং ফ্রম ভেরী গুড কোম্পানী। ইন্টাবন্যাশনাল লেবেলিং কোম্পানী। ইনটাবনাশানাল জুড়ে কাজ কাববার। এই কোম্পানী মানুষেব সেবাব জন্যি কাজ কবতিছে। নানান বকমের বিসার্চ চালাচ্ছে। বুঝলে?

মহাদেব মাথা নাড়িয়ে হ-হ কবে। কিন্তু বুঝতে পাবে না এতবড় কোম্পানীর মহাদেবেব কাছে কি দবকার। সিগাবেট টানতে ভুলে যায় মহাদেব।

গোপীবল্লভ বলে আমি হলাম গে সেই কোম্পানীব লোক। ক্যানভাসাব। এজেন্ট। বোঝলা না?

মহাদেব এবাব অন্যবকমের মাথা নাড়ায়। মানে বোঝেনি। গোপীবল্লভ বলে তোমার একটা ছেলে আছে না! একটু কেমন ক্ষ্যাপা মত।

মহাদেব বলে ক্ষ্যাপা নয়, একটু বোকা মতন। আসলে খুব সরল পোকিতিব।

কোম্পানীবে ছেলেটা দ্যাও। ছমাস বাদ ফিবৎ পাবা। সঙ্গে ট্যাকা। কাগজপত্র খোলে গোপীবল্লভ।

আমি যে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পাবতিছিনি।

সব জলেব মত বুঝিয়ে দিখি, কেমন। আমাদেব কোম্পানীর কিছু গেঁড়াগেঁড়ি দরকাব। ছেলেপিলে। খাবে ভাল, থাকবে ভাল। এবাব টার্ম আর কনডিশন গুলি শুনি নাও। আমাদের কোম্পানী হল গে সাইন্টিফিক কোম্পানী। বিসার্চ চলতিছে, বোঝলা না? যে ছেলেদেব ওকানে নেয়া হবে, তাব গার্জিযান ভর্ত্তী কবি দিলেই প্রথমে নগদ পাঁচশো টাকা পাবে। ফাইব হানড্রেড। এবাব ঐ ছেলেদেব অঙ্গে ইনজিকশন ফোঁড়া হবে। বিসার্চেব ইনজিকশন। এক একটা ছেলের একেক অঙ্গে। কাব কোন্ অঙ্গে ইনজিকশন ফোঁড়া হবে তা কোম্পানীর সাইনটিস্টরা ঠিক কববেন। ইনজিকশন ফুড়লি কারোব কাবোব অঙ্গ বড়পানা হয়ে যাতি পাবে, বোঝলানা, যদি বড়পানা হয়ি যায়, তবে ছ মাস পবে ছেলে সমেত পাবা পাঁচ হাজাব। যদি কিছু না হয়, দু মাস পর্যন্ত ওরা দেখবে কাজ হচ্ছে কিনা। যদি কাজ না হয়, দুমাস পবে ছেলে ফিবৎ সঙ্গে একহাজাব টাকা।

মহাদেব বলে ডেলী ডেলী ইনজিকশন ফুড়বে? ব্যাথা লাগবেনি?

গোপীবল্লভ সিগাবেটে টুস্কি মেবে ছাই ঝেড়ে বলে ইনজিকশন যে পিম্ড়ের কামড়েব চেয়িও কম ব্যাথা। তোমাব ভাযবাব গাঁযেব অনেক ছেলেপিলে আমাদেব এই ইস্কীমে গিয়ে আবার ফিবে আসিচে। ওদেব জিজ্ঞাস কবলি ডিটেল জানতি পাববা। সব্বায গাযেব ওজন বাড়ায়ে ফিবি আসিচে। ওদেব কাছে ইনকোযাবী কবি দেকবে ডানলোপিলো, মানে দুধিব ফেনার মত নরোম বিছানায় শুযেচে, ভালো ভালো খাযিচে।

মহাদেব বল্ল ঐ যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব কথা বল্ল, অঙ্গ বড় হলিতো খুঁতো হয়ি যাবানে, তার কি হবে?

তার আর হবেটা কী? তুমিতো আব মেয়ে সন্তান পাঠাচ্ছ না যে একটা আঙুল ছোটবড়

হয়ি গেলে খুঁতো হযি যাবানে, বে দিতি পরবানা। পাঠাচ্ছ তো ছেলি। সোনার আংটি আবাব বাঁকা হয় নাকি। তা তোমাব ভায়বার ছেলেবও তো কানটা বড় হযি গেছে। তয় ? কী হল ? বরং হিল্লে হয়ি গেল এই বেকাবিব যুগে।

কি হিল্লে হল।

অ ! শোননি বুঝি। তোমাব ভায়রা তো। আমার কাছে কেঁদি-পেঁদি একশা। বলে ছেলে হারায়ি গেছে। আমি বল্লাম অত নার্ভাস হবার নাই, আমি দেখছি। ক'দিন আগে স্বরূপনগরে এয়িচিল সার্কাস, ঝা ভেবিচি, ওখেনে জোকারের কাজে ওবে নিয়ে গেছে। তা বোঝ। এই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সি চাকরি জুটোয়ে নিল। কানটা বড় হল বলেই না পেল। তা এখানে বলে রাখি। কোন গ্রান্টি নেই। সবারই যে এমনধারা অঙ্গ বেড়ে যাবে তাব কোন গ্রান্টি দিচ্ছে না কোম্পানী। আসলে ইটাই হ'ল কোম্পানীব রিসার্চ। একটা ইনজিকশন দিলে কারোব কারোব অঙ্গ বড় হয়ে যাচ্ছে আবার ঐ একই ইনজিকশনে কারুর কিছুই হচ্ছে না। কেন এমনধাবা হয় এই হল রিসার্চ। ওসব বড় বড় ব্যাপার, বোঝবানা। এই যেমন ধবো চিংড়ি খেয়ে কারোর গায়ে চাকা চাকা ওঠে, কারুর বা কিছুই হচ্ছে না। তা তোমাব ছেলিটারে দ্যাও।

মহাদেব মাথা চুলকোয। কিছু বলে না। একবার বল্ল ধরো যদি ইদিক সিদিক কিছু হয়ি যায় ?

ইদিক সিদিক মানে ?

এই ভালো মন্দো কিছু।

ও, সে কথাটা বলা হয়নি। কোম্পানী সব ব্যবস্থা বেখিচে। কিচ্ছু ত্রুটি করেনি। যদি বিসার্চ চালাকালীন এক্‌স্‌পাব করে, মানে মরিটবি যায, তবে লগদ দশ হাজাব টাকা দিচ্ছে কোম্পানী। বাড়ী ফিরি আসাব পব ওবকম কিছু হলি অবশ্য কোম্পানী দাযী হচ্ছে না। যদি····

থাক। থাক। ও কথা বলতি হবে না আব।

তবে কি কববা।

ভেবে দেকি। পরিবাবেব সঙ্গে পবামর্শ কবি।

পারমর্শ তুমি কি কববে। সে আমি কয়ে দিচ্চি। ডাকো তোমার পবিবাব।

সে তো এখন ঘবে নেই। মুড়ি ভাজতি গেছে।

আচ্ছা। তবে ছেলিডাবে নে এসো, একটু দেকি।

সে বোধ হয় ঘুমুচ্চে। ও একটু ঘুমোয় বেশি।

বযস কতে হবানে একচুয়াল ?

ধবো দশ চলছে।

নাম কি রেখিচো ?

রেখিচিলাম তো গনেশ। কিন্তু ছেলেটা এটু বোকাসোকা তো, কথা স্পষ্ট বলে না, মুখ দে লালা গড়ায়, ওরে সবায় ডাকতি লাগল ক্যাবলা। এখন বলতি গেলে ওটাই নাম।

মিলিয়ি দুলুয়ি নাম রাখিছিলে তো বেশ, মহাদেবের পুত্র গনেশ। তবে বুধবার আসি ? মঙ্গলে উষা বুধে পা যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

না গো, আর কদিন যাক। পরের মাসে এসো।

মহাদেবের ভায়রা ভাই বিজয় হাজরার ঘর এমন কিছু বেশি দূর না। আটদশ কিলোমিটার

হবে। কিন্তু কথায় বলে বাজায় বাজায় দেখা হয়, ভায়রা ভায়রা দেখা হয় না। বহুদিন দেখা সাক্ষাত নেই ওদের। বিজয়ের ছেলে ধনঞ্জয়ের কান বড় হবার কথা শুনেছে কিন্তু একবারও চোখের দেখা দেখতি যায়নি। এবার গেল। পারমর্শ আছে। বৌকে নিল না। মহাদেবতো মাগের ভেড়ো নয় যে সব বউ-এর কথা মত চলবে।

মহাদেবকে দেখে বিজয় হাজবাবা বেজায় খুশী। স্বামী স্তিবিতে যত্ন আত্তি কবল। মহাদেবকে মানি অর্ডারের কাগজ দেখাল। ধনঞ্জয় ডায়মণ্ডহারবার থেকে পাঠিয়েছি পঞ্চাশ টাকা। তারপর খবরকাগজের ছবি দেখাল। খামে করে পাঠিয়েছে ছেলে। ছেলের ছবি উঠেছে।

মহাদেব পড়তে পারল 'ডায়মণ্ডহারবার টাইম্‌স্‌'। ধনঞ্জয়ের মস্ত কানের উপর বসে আছে একটা টিয়া পাখি। কানের মধ্যে অনেক রিং সার সার আটকানো। একটা রিং-এর সঙ্গে দড়ি বাঁধা, একটা বাঁদর দড়ি ধরে টানছে। মানে দোল খাওয়াচ্ছে। ধনঞ্জয় হাসছে। তলায় লেখা জুপিটার সার্কাসের একটি দৃশ্য।

ভালইতো আছে ধনঞ্জয়।

মহাদেব বল্ল ধনার সঙ্গেতো দেখা হ'লনা। অন্য দু একটা ছেলেপিলে দেখাতি পার যারা ঐ ইস্কীমে গেছে। একটু তত্ত্বতালাশ নিতাম।

বিজয় তখন মহাদেবকে নিয়ে চল্ল। কাছেই একটা ঘর। ঘরে নতুন টিন চকচকাচ্ছে। বিজয় বল্ল যদু ঘরামীর ছেলের আঙুলের টাকায় নতুন টিন। মেয়ের বিয়েও দেছে। বিয়েতে সাইকেল টেপরেকট দিছে। যদু ঘরামীর গাজনের সন্ন্যেসীর মত খাংরা খাংরা মুখে, চুলে দুশ্চিন্তা লেপে থুয়েছে।

যদু বল্ল ভালই হল তুমি এযিচ। তোমার কাছেই যাব মন করছিলাম। আমার ছেলেডারেও সার্কেসে ঢুইকে দাও।

যদুর ছেলে এল। বছর বারোর হবে। ডানহাতের আঙুলগুলো হাতখানেক লম্বা হয়ে পায়ের গোড়ালির কাছটা পর্যন্ত নেমেছে। একবার পিঠ চুলকোল ছেলেটা। আঙুলগুলো ঢ্যামনা সাপের বাচ্চার মত কিলবিল করে উঠল।

যদু বল্ল ছেলেডারে নিয়ে বড় ঝ্যামেলায় পড়িচি। পুলিশ খুব টর্চার মার কবিল। মুখটা এখনো কেমন ফুলি রয়েচে।

টর্চার মারিলো ক্যানো, কী দোষ?

আর বলো ক্যানো। গোপীর কোম্পানী ঝ্যাকন ছেলে ফিরৎ কবিলো এখন তো আঙুলগুলো সব বড় বড়। যুধিষ্ঠির তখন পিছু লাগিলো।

যুধিষ্ঠির কেডা?

যুধিষ্ঠিরির নাম শোননি? যুধো। চোরটা। ও বলিলো তোরে আমার বড় দরকার। তোর আঙুলগুলো এমন কায়দার হয়িচে যে কোন যন্তরের সাধ্য নেই এর ধারে যায়। যুধো ওরে ট্রেনিং দেলো। ঘরের জানালার ভিতরদি হাত ঢুকোয়ে আঙুলের কায়দায় জিনিষপত্তোর গ্যাঁড়াতি শিখোলো। এর মধ্যে করে তালবন্দীর এত মুরুব্বি মাষ্টারের বউ এর গলার হার আঙুলির কায়দায় চুরি করতি যেয়ে বিপত্তি ঘটাল। মাষ্টার সেদিন বাড়ী ছিলনি। পার্টি মিটিং করতি গেয়িছিল বারাসত। মাষ্টারের বউ গলায় সুড়সুড়ি পেয়ি সজাগ হল, আর দেখল মুখির উপর হাত আর লম্বালম্বা আঙুল কিলবিল কর্বতিছি। সে ভাবল ভূত। তারপর অজ্ঞান। মাস্টার পরদিন পুলিশি খবর করল। পুলিশ তো মোর বাবধনটারে ধরি নি-গি প্যাঁদাল। ছেলে সব স্বীকার যেছে। যুধোরে কিচ্ছু করল নি। সে দিব্বি ঘুরি বেড়াচ্ছে। এখন পুলিশ বলতেছে যদ্দিন আঙুল এরম কেঁচোর পানা লম্বা থাকবে, মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে থানায় ট্যাক্সো দিতি হবে। আমিও গেছিলাম থানায়। বললাম এত টাকা কোথে পাব। মেজোবাবু বল্লে ক্যানো, এতগুলো টাকা

পেলে যে, কোম্পানী দিল। বললাম মেয়ে বে দেছি। বড়বাবু বল্লে তাহলি আঙুল কাটি ফ্যালো। তারপব খোঁজ করি এজেন্ট গোপীবল্লভবে ধল্লাম। সে বলি কাটতি হয় হাসপাতালে কাটাও গে যাও। কোম্পানী বড় কবি দিতি পাবে। ছোট করার কুনো কনডিশন নাই।

যদু ঘরামী এবাব বিজয় হাজরাব কাছে প্রায হাত জোড করে। বলে তোমার ছেলেডারে বলি কয়ি আমাব ছেলেডারেও সার্কেসে ঢুইকে দ্যাও। ছেলেডাব হিল্লে হয়ি যাক।

বিজয় বল্ল ছেলেব তো ঠিকানা জানতি পারিনি। আসবে নিচ্চয়। আলি বলবানে।

আর একটা বাড়ীতে মহাদেবকে নিয়ে গেল বিজয। মহাদেবকে বল্ল এ বাড়ীব ছেলেটাব পেচ্ছাপের যায়গায ইনজিকশন দেছে। বিজয ডাকতেই ছেলেটা এল। বিচ্ছিবি ব্যাপার। ওটা ল্যাজের মত লাগছে। মহাদেব তো অচেনা লোক, দেখেই ছুটে গিয়ে ঘবেব ভিতব সেঁধিয়ে গেল। বিজয় বল্ল থাক। লজ্জা পাচ্ছে। এবকম আবও দু একটা ইস্কীমেব ছেলেকে নিজেব চোখে নিস্‌পেকশন কবে ঘবে ফিবল ওবা।

বিজযকে জিজ্ঞাসা কবে মহাদেব – তুমি ভাই কি পবামর্শ দাও। ইস্কীমে পাঠাব ? বিজয বল্ল আমি ভাই কী বলব। নিজিব পাঁঠা···

মহাদেব সিদ্ধান্ত নিল যা টাকা পাওয়া যাবে তাব তুলনায ফ্যাচাং এমন কিছু না। আঙুল লম্বা হয়ে গেলে চোখে চোখে বাখলেই হবে যাতে যুধিষ্ঠিবদেব পাল্লায না পড়ে। আব তাছাড়া তার ছেলে হল হাবা-গোবা। যুধিষ্ঠিরবা নেবেও না। আব অন্য কোন অঙ্গ বড় হয়ে গেলে সার্কাসে না হোক মেলায দেখিয়ে দুপযসা পাওয়া যাবে। সিঁদুব টিঁদুব পবানো ছ'ঠ্যাংওলা গরু দেখেছে মেলায। পঞ্চাশ পয়সা টিকিট কেটে দেখছে সব। গোপীবল্লভকে শুধু বলবে যেন পেচ্ছাপের জায়গাটায যেন ইনজিকশন না দেয়, এটুকু যেন দেখে। মহাদেব আবও সিদ্ধান্ত নিল যে বউকে কিছুই বলবে না। বল্লে বউ কিছুতেই ছেলেকে ছাড়বে না। হাবাগোবা যাই হোক না কেন, বহু আদবেব ধন এই ক্যাবলা। ক্যাবলা হবাব পব আব ছেলেপুলে হযনি। হাসপাতালেও দেখিয়েছিল। বলে দিয়েছে নাড়িতে জট লেগে বয়েছে। অপাবেশন কেস। ম্যালা টাকাব ধাক্কা। এই স্কীমে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায তা দিয়ে অপারেশন কবিয়ে নাড়িব জট ছাড়িয়ে নেবে। গোপীবল্লভ নিতে এলে বৌকে বলবে কলকাতাব বড় হাসপাতালে চিকিচ্ছেব জন্য যাচ্ছে। ছ'মাস পব ভাল হয়ে ফিবে আসবে। আব গোপীবল্লভকে অনেক কবে বুঝিয়ে বলবে দেখো, পেচ্ছাপেব জাযগাটায যেন ইনজিকশনটা··· ।

সকাল থেকে মেঘ। বাতাস থম মেবে আছে। গাছেব পাতা নড়ে না। বিবিধ ভাবতী বাজে। মহাদেব ওর ছেলেকে আদব কবছে সকাল থেকে। ওব মুখের লালা মহাদেবেব সাবা গায়ে লেপ্টেছে। বিবিধভাবতী বাজে। ক্যাবলা হাতেব আঙুলগুলোয আঁচড়ে ধবে আছে ট্রানজিস্টাব। ক'দিন আগে কিনে এনেছে মহাদেব। ছেলে চলে যাবে। ক'দিন বাজাক। বড় শখ ছিল ছেলের।

মহাদেব ছেলেকে জড়িয়ে ধবে বলেছে কিবে, ওখানে গিয়ে ভাল থাকবি তো বাবা ?

ঠাকব।

আমাদেব জন্য খুব ভাববি ?

ভাবব।

ইনজেকশন দিলে ব্যাথা লাগলে কাঁদিস না।

কাদব না।

আমাদের জন্য কাঁদবি না তো !

কাদব না।

চোখেব জল ফেলবি ?

ফেলব ।

আসলে ছেলেটি ঠিক বুঝতেই পাবছে না কোথায যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কি জন্য যাচ্ছে।

মহাদেবেব বউ মুড়িব মোযা বাঁধছে । গুড় মাখানো মুড়িতে নুন মাখালে জল পড়ছে। কাল থেকেই কাঁদছে ও । বিবিধভাবতী বাজছে ।

বাইবে ঘুঘু ডাকে । এমন ঘুঘু কি বোজই ডাকে ?

বাতাস থম । একটা পাতা খসে গেল । ডম্ ডম্ ডিগা ডিগা । মাযামমতা কষ্ট লেগে লেগে মুডিব মোযাগুলি গোলাকাব হযে উঠে ক্রমশ । একটা নিযে ক্যাবলাব হাতে দেয। বলে হাসপাতালে খিদে পেলেই চোযি চিন্তি খাস বাপ আমাব । ক্যাবলা বলে না --চাইবনা। আসলে ঘবে বড্ড খাই খাই কবে বলে বকুনি খায ও । ও পেট ভবলেও ঠিক বোঝে না । বমি কবে ফেলে । তখন মাবও খায । 'আব চেয়ে চেয়ে খাবি' বল্লেই বলে আব চাইব না ।

ক্যাবলাব মা ক্যাবলার সাবা গাযে হাত বুলোতে থাকে । বলে কিচ্ছু দুঃখু কবিসনি বাপ আমাব । ভাল হযি ফিবিবি । ইস্কুলি ভর্ত্তী হবি । হাতেব আঙুলগুলোব মধ্যে এমনি ধাবা আবও অনেক কথা থাকে যা ক্যাবলাব সারা শবীবে মিশে যায ।

ভগবান, আজ যেন গোপীবল্লভ না আসে ।

গোপীবল্লভ আসে । বলে সব বেডি তো ? মহাদেব 'বোসো, আব দশ মিনিট' শব্দ কটা উচ্চাবণ কবতে গিযে কেঁদে ফেলে । ছেলেকে নতুন জামাপ্যান্ট পবানো হযেছে। পলিথিনেব ঠোঙায নাবকেলেব নাড়ু, মুডিব মোযা ।

গোপীবল্লভ বলে এসব কিচ্ছু দবকাব নেই । কোম্পানী বাইবের ফুড এ্যালাউ কববে না । ওবাই যথেষ্ট ফুড দিযি থাকে । গনেশেব মা বলে তবু থাক। ভালবাসে।

ক্যাবলাব সঙ্গে ক্যাবলাব মাকে নিচ্ছিল মহাদেব । মহাদেব যাচ্ছে । ক্যাবলা ট্রানজিস্টাবটা ছাড়ছে না । শক্ত কবে আঁকড়ে বেখেছে । ক্যাবলাব মা ক্যাবলাব কড়ে আঙুল কামড়ে দেয। মাথাব আঘ্রাণ নেয । আব একবাব সর্বশরীব দিযে জড়িযে ধবে। আই এ্যাম এ কমপ্ল্যান বয।

সেই বিবাট বাড়ীটাব সামনে দাঁড়িযে গোপীবল্লভ বল্ল দ্যাখো এই বাড়ী । ঘাঁড় উঁচু কবে মহাদেব দেখল বাড়ী কি ভাবে আকাশ ছুঁযেছে । গোপীবল্লভ বল্ল এই বিল্ডিংটাব চোদ্দ আব পনেব তলায হল আমাদেব কোম্পানী । কী যে কাণ্ডকাবখানা চলতেছে কোন ধারণা কবতি পারবা না । কত বিসার্চ, এক্সপিবিমেন্ট । এমন যে নিমফল-বীজ, তাব পোঙায ইনজিকশন মাবি দেচ্ছে, সেই বীজ পুঁতলি যে নিমগাছ হবে তাব পাতাব হবে মিষ্টি সোযাদ । এইসব চলতিছে। ছাইন্‌স্ যে কোথায গিযে ঠেকিবে তোমবা বোঝবানা। ওবা লিফট এব ভিতব ঢুকল, দবজা বন্ধ হল নিজে নিজে । এই প্রথম ভয পেল ক্যাবলা । কেঁদে উঠল । চোদ্দ তলায একটা ফুল-নকসা কাটা দবজা ঠেললেই ঠাণ্ডা । টেবিলেব ওপাশে সুন্দবী মেযেছেলে । মেযেছেলের সামনে চেযাব । গোপীবল্লভ বল্ল তোমরা এখানে বোসো । নবমেব ভিতবে ডুবে যায মহাদেব । মহাদেবেব কোলে গনেশ । অন্য একজন ছোটচুল সুন্দবী আসে । সামনে মেলে ধবে বঙীন কাগজ । 'সই কববেন, না টিপ' ?

কাঁপা কাঁপা সই কবে মহাদেব হাজবা । ব একবাব চুমো খায ওব ক্যাবলা গনেশকে। ওর লালা লাগে মুখে । মেযেটি মহাদেবেব হাতে পাঁচটি একশো টাকার নোট দিযে মুচকি হাসে । তাবপর মহাদেবেব কোল থেকে ছেলেটিকে নিযে যায । অন্য একটা ফুল-নকসা কাটা

দরজা ঢেকে দেয ওদেব ।

গোপীবল্লভ মহাদেবের কানে কানে বলে মন খারাপ কোরো না । তোমার কোন লস্ নেই । উল্টি লাভ । কীই বা কবতে তোমার হাবাগোবা ছেলেডারে নিয়ে ? যা হোক ঐ পাঁশ্শো থেকে আমাবে গোটা পঞ্চাশ দ্যাও ।

মহাদেব বাড়ী ফেরে । হাতের কব্জীতে ধর্মতলা থেকে কেনা সত্তব টাকার ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি ।

এবপর আকাশে আরও ইনসাট্ উঠে যায় । ক্রয়োজেনিক বকেট ইনজিনেব নো হাউ জেনে যায় ভাবতবর্ষ, কর্ডলেস টেলিফোনের উৎপাদন বাড়ে । ছয় ডিজিটেব টেলিফোন নম্বর সাত ডিজিটের হয় । অনেক স্ত্রী ভ্রূণ নষ্ট হয, ধ্বংস হয়, গৃহবধূ পোড়ে, ক্যাবলা ফিরে আসে।

ওর নাকটা লম্বা হয়ে নাভির কাছটাতে এসে পড়েছে । একটু একটু নাড়াতেও পাবে। শূঁড়ের মতই লাগে। ওব কানদুটোও বড়বড় কবে দেয়া হয়েছে। ওব শরীর নাকি দারুণ সেন্সেটিভ। নাকের উপব কয়েকটা ইনজেকশন দেয়াব পরই নাকটা তাড়াতাড়ি বাড়তে শুরু কবেছিল । এটা একটা রেযাব কেস্ । নাককে নাকি সহজে বাড়ানো যাযনা। এর আগে আফ্রিকায় মাত্র একটি কেস্ সম্ভব হয়েছে । নাকেব পব কানেও ইনজেকশন এ্যাপ্লাই করা হয । এজন্য কিছু বেশি টাকা পার্টিকে দিয়েছে কোম্পানী । ক্যাবলাব গা থেকে অনেকবাব বক্ত নিযে পবীক্ষা কবেছে কোম্পানী । কি আছে ঐ বক্তে । কেন এত তাড়াতাড়ি সাড়া দিচ্ছে । ঐ পবীক্ষার ফল পার্টি জানে না । ক্যাবলার মাথাব ভিতর থেকে নিউবোন সেল নিয়ে পরীক্ষা কবেছে কোম্পানী। ঐ পবীক্ষাব ফল পার্টি জানে না । ওকে নানা বকমেব ইনজেকশন দেযা হয়েছে ওর শবীরেব বিভিন্ন জাযগায়। কী ইনজেকশন, কী হবমোন কিম্বা স্টেবয়েড বা অন্য কিছু পার্টি জানে না। শুধু পার্টির স্কীম ম্যাচুযোর কবে । পার্টি প্রজেক্ট থেকে ফিবে আসে লম্বা নাক আব দুটো বড় বড় কান নিয়ে ।

গোপীবল্লভ বলে গনেশ নামটা এতদিনে সার্থক হল । একেবারে রিয়েল গনেশ কবে দিয়েছে কোম্পানী । গনেশের বাপ মহাদেব । মাযেব নামটা দুর্গা কৰ্বি দিলিই একেবাবে ষোলকলা পূর্ণ হযি যায । তোমাদেব কাঁঠাল গাছে সাইনবোর্ড মাবি দেবা —কৈলাশ ।

ছোটবেলায মহাদেবেব বাবা মহাদেবকে সঙ সাজাতো । মাথায ঝুঁটি বেঁধে, ঝুটিতে পালক গুঁজে মুখ নীল বং করে হাতে বাঁশী লাগিয়ে কেষ্ট ঠাকুর কিম্বা গাযে ছাই মাখিযে মাথায জটা বেঁধে মহাদেব । মহাদেব হলে চোখ বড় বড় কবতে হ'ত আব কেষ্ট হলে চোখ ঢুলুঢুলু কবতে হ'ত। লোকের দুয়ারে গেলে পযসা মিলতো। এখন মহাদেব ভাবে এই সত্যিকাবেব গনেশকে যদি সাইকেল বিক্সাব সীটে বসিয়ে হাঁটে নেযা যায, কেমন হয ।

গনেশেব পেটটাও আগের চেযে একটু বড় হয়েছে । মহাদেব ভাবে কোম্পানীতে ভাল খাওযা দাওযা পেয়ে এমনটা হয়েছে । গাঁয়ের লোকজন দেখতে আসে । বলে একেবারে জ্যান্ত গনেশ গো ! একদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেব দ্যাখে মাদুরেব উপব কিছু খুচবো পযসা ছিটিযে আছে। গুণে দেখে টাকাখানিক হবে ।

পাশেব গাঁ থেকে জীবনের মা, ভামিনী বুড়ি লাঠি ঠকঠক করতে কবতে আসে। এসে বিহ্বল তাকিয়ে থাকে। বলে সত্যিকারের ভগমান দেখনু গো । আঁচলের গিঁট খুলে একটা আধুলি বেব করে গনেশের পায়ের কাছে রাখে ।

গনেশ বলে জিলিপি খাব ।

বুড়ি বলে হ্যা-হ্যা, লিচ্চয । লিচ্চয় আমি জিলিপি ভোগ দোবো । বুড়ি লাঠি ঠক-ঠক কবতে করতে বেরিয়ে যায় । গোটা চাবেক জিলিপি নিয়ে আবার আসে । গনেশের পাযেব

সামনে বাখে। নীল মাছি উড়ে আসে। গনেশেব নাকেব তলায দুটি শাশ্বত ফুটো। ফুটো সমেত নাকেব ডগাটা জিলিপির সামনে উপবে নাড়ায়। শ্বাস ছাড়ে। মাছি উড়ে যায। এবাব শ্বাস নেয, গন্ধ শোঁকে। গনেশ হাসে। একঘর লোক দেখে।

বুড়ি বলে কির্‌পা কব বাবা গনেশ। আব পবতেছিনি। জীবনেব বউটা খাতি দেয না। বড় জ্বালাতন করে। কেবল গালমন্দ কবে। উদ্ধাব কব।

গনেশ মাথা নাড়ে আব জিলিপি খায।

পরদিন ভোববেলা কলমী শাক তুলতে গিয়েছিল জীবনেব বউ। সাপে কাটল ওকে। তাই শুনেই ভামিনীবুড়ি মাথা চাপড়াতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল হায়বে হায। বাবা গনেশ তুমি এমন জাগ্রত বুঝতি পাবিনি গো। আমি ডোকলা বুড়ি, আমাব কথাই শুনলে। আমাব জীবনেব এখন কি হবে। গায়েব লোক জীবনেব বউকে ভ্যান গাড়ীতে শুইযে হাসপাতালেব দিকে যায। ভামিনীবুড়ি মাথা কুটে বলে একবাবটি মহাদেব হাজবাব ঘবে নে চল ওবে, দোহাই তোমাদের।

আশে পাশে ওঝাবদ্যি নেই। যে ওঝাটি ছিল মবে গেছে। তাব ছেলে বিডিও অফিসেব পিওন। সে কিছু কিছু বশীকবণ ইত্যাদি তান্ত্রিক ক্রিযাকর্ম কবে অবশ্য। কিন্তু তাকে তেমন বিশ্বাস নেই। হাসপাতালেব দিকেই চল্ল ওবা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আট কিলোমিটাব। অনেকটা সময লাগবে। বুড়িব কথায কেউ কান দেয না। বুড়ি সাইকেল ভ্যানেব সামনে শুযে পড়ে। বলে আমাব মাথা খা। বউডাবে বাঁচাতে চাসতো গনেশেব কাছে নে চল।

মহাদেবদেব পাড়া হাসপাতালেব পথেই পড়ে। জীবনেব বউ ভ্যানে শুযে আছে। জ্ঞান আছে। ভ্যানেব কোণে ভামিনী বুড়ি বাবা গনেশ বাবা গনেশ কবতে থাকে। মহাদেবেব উঠোনে ভ্যান থামে।

ভামিনী বুড়ি ভ্যান থেকে নেমে বলে বাবা গনেশ, একবাবটি দেখা দাও। আগেব দিন ঝা কর্যেচি অলাজ্য কয্যেচি। মাথাব ঠিক ছিলনা বাবা। এখন তোমাব ঠেঁযে এনিচি ওবে কিব্‌পা কব।

গনেশ তখন হাগতে গিয়েছিল। এতলোক দেখে পাণ্ডব-জবা গাছটাব তলে দাঁড়িযে পড়ে। গনেশেব মা তাড়াতাড়ি জলেব কাজ কবিযে দিযে প্যান্ট পবিযে দেয। গনেশেব কপালে গেবিমাটিব তিলক। শুঁড়ে একটা লাল ফিতে জড়ানো। গনেশেব মা তাড়াতাড়ি পাণ্ডব জবা গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে লাল ফিতেব মধ্যে গুঁজে দেয। গনেশ আসছে হেলতে দুলতে। শুঁড়টা একবাব নাড়ালো। একটু উঠালো। ও বোধহয ভামিনীবুড়িকে চিনতে পেবেছে। জিলিপি ভোগ দেযা বুড়ি। বুড়ি গনেশেব সামনে শুযে পড়ে ভূঁযে। বলে বউডাবে বাঁচিয়ে দ্যাও বাবা, ববং আমাবে পাব কব।

গনেশ এদিক চায, ওদিক চায। কাকব হাতে কোন শালপাতাব ঠোঙা নেই। গনেশ ঘবেব দিকে মুখ ফেবায। বুড়ি হাউমাউ কবে কেঁদে ওঠে। গনেশ কি ভেবে বুড়িব দিকে চায। বুড়ি বলে কির্‌পা হবে তো বাবা।

গনেশ বলে কিবপা হবে।

বুড়ি বলে একবাব বউডাবে স্পর্শ কবি দ্যাও ঠাকুব। গনেশ আস্তে আস্তে বউটাব গলায হাত দেয। লকেটেব ঝুটো পাথবেব লাল চিকচিক দেখে। কে একজন ভ্যান রিক্সাব ঘন্টি বাজিযে দেয টিবিং।

ভ্যান বিকসাটা পীচ বাস্তায় পড়ল। মাইল দুযেক পবেই কৈবর্তহাট। ওখানে মাইক। আলুবচপ ভাজাব গন্ধ। জীবনেব বউ উঠে বসে। বলে চা খাব।

চা খেয়ে অবশ্য হাসপাতালে যায়। ডাক্তার বলে সাপে বিষ ছিল না তেমন। তবু যাহোক ইনজেকশন দেয়। জীবন আর জীবনের বউ মুরগী নিয়ে আসে মহাদেব হাজরার বাড়ী। বলে গনেশকে পুজো দোবো।

এরপর লোকজন আসতে থাকে। পরীক্ষায় পাশ, আই আর ডি পি বা জহর রোজগার যোজনার কাজ, বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভ, শূল বেদনার উপশম স্বামীর সংসারে সুমতি, এইসব কামনা-বাসনা বয়ে নিয়ে লোকজন আসে। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা পাড়ার ছাগল এসে অনেক ফুল খায়, শালপাতা খায়।

ইতিমধ্যে একদিন নতুন পাম্পশু জুতোয় মচমচ শব্দ করতে করতে গোপীবল্লভ এল। বল্ল কোম্পানীর আফটার-সেল সার্ভিস বলে একটা ব্যাপার আছে। দেকতি এলাম। শুনলাম তোমাদের দিন ফিরি গেছে। মহাদেব হাত কচলায়।

গোপীবল্লভ গনেশের কাছে গিয়ে বলে কি গনেশ, কেমন আছ?

গনেশ চোখ পিটপিট করে।

বল, কেমন আছ, ভাল না?

গনেশ মাথা নাড়ে। বলে, না।

কেন? ভাল নেই কেন?

আমাল অচুক।

কে বল্ল অসুখ? তোমার সুখ। তুমি এখন জ্যান্তগনেশ। ভগবান। শোন বলি। কেউ যদি তোমার কাছে আসে, তুমি এই ডান হাতখানা সামনে ধরবা। আঙুল গুলি এই এমনি করি জোড়া রাখবা। যেন ভোটের হাত চিহ্ন। এটা বরাভয় মুদ্রা। কি মহাদেব, এসব শিখোয়ি দেবা তো। আর শোন গনেশ। এই বরাভয় মুদ্রা পাইকিরি সবারে দেখাবা না। যারে মনে হবে তারে দেখাবা। নইলে ওজন থাকবে না। মহাদেবের বউ চা করে আনে। চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট, চানাচুর।

মহাদেবের বউ ঘোমটার ভিতর থেকে বলে — আমার ক্যাবলার মধ্যে সত্যি সত্যিই গনেশের অংশ আছে। নইলে ঠিক ঠিক গনেশপানা হতিছে কেন? পেটটা বড় হতিছে। ঝা বলতেছে তাই হচ্ছে। রোগব্যাধি ভাল হচ্ছে। লোকের মনকামনা পূরণ হতিছে। আমাদেরও ঘরদুয়োর হ'ল। ওর মধ্যে যদি গনেশ নাই থাকবে, মনকামনা পুরে কেন?

গোপীবল্লভ হাসে। বলে গনেশের মধ্যি গনেশ যদি আসি গেছে মনে করো, ভাল কথা। ও, ভালকথা, শোনলাম অনেকে নাকি মুরগী নে আসে। গনেশের পূজায় মুরগী পেসাদ কোথাও শুনিচ? এসব ছোটলোকদের প্র্যাকটিশ, শুধু ফলফলাদি। নিরামিশ। বোঝলানা।

মহাদেব মাথা নাড়ে।

গোপীবল্লভ বলে আমারেও একটু স্মরণে রেখো। আমার জন্যিই তো এইসব। আমিই তো গনেশ বানালাম। একেবারে বঞ্চিত কোরোনা। বোঝলানা? আমিও গনেশের কৃপাপ্রার্থী একজনা।

জোরে জোরে হাসে গোপীবল্লভ।

মহাদেব বলে হাসির কথা নয় বল্লভ। এই ধরোনা কেন আমার নাম মহাদেব। ছেলের নাম রাখিলাম গনেশ। এরপর যে ও সত্যি সত্যি গনেশ হয়ে গেল, এখানে ভগবানের কোন ইচ্ছা ছিল কিনা কে বলতি পারে?

বল্লভ বলে ভগবান নয়, সবই কোম্পানীর ইচ্ছা।

পঞ্চায়েতের ভোট এসে গেল। পাশের ব্লকের এক প্রার্থী এসে পুজো দিয়ে গেল। জিতল সে। গনেশের ঘরে ভীড় বাড়ল।

এখন আর রোজ রোজ গনেশের দেখা পাওয়া যায় না। সপ্তাহে দুবার। সোম আর বুধ। এখন মোকদ্দমায় জয়লাভ বা ব্যাংকলোন প্রাপ্তির জন্যও লোক আসছে। মোপেড মোটর সাইকেলে চড়া লোক আসছে, পকেটে ক্যালকুলেটার নিয়ে লোক আসছে, হাতের কব্জিতে ইলেকট্রনিক ঘড়ি সমেত হাতজোড় করছে।

গনেশ এখন দর্শন দেবার সময় হাফপ্যান্ট পরে না। সিল্কের রঙীন ধুতি পরানো হয় ওকে। অর্ডার দিয়ে বানানো কাঠের সিংহাসনে সে বসে। বেশ মানায় ওকে। পেটটা আরও বড় হয়েছে ওর। মহাদেব একটা টেপ রেকর্ড কিনেছে। পঙ্কজ উধাস, অনুপ জালোটার ভজন, সঙ্গে কুমারশানু মহম্মদ আজিজ।

মহাদেবের বউ আগে অন্যের বাড়ী ধান সেদ্ধ করতে গিয়ে বা মুড়ি ভাজতে গিয়ে দাওয়ায় বসা গিন্নীদের গপ্পো সপ্পো উঠানে বসে শুনতো। এখন মহাদেব গিন্নী মুড়ি ভাজতে বা ধান সেদ্ধ করতে যায় না। তত্ত্বতালাশ নিতে যায়। ও এখন বসতে পিঁড়ি পায়। কার স্বামী কি খেতে ভালবাসে, ডালের বড়া না হলে কার স্বামী খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়, এসব শোনে। কার স্বামীর রোজই চাই, নইলে ঘুম হয় না, শোনে। কার ননদের শহরে বিয়ে হয়েছে, খাট-আলমারী-ফ্রিজ দেয়া হয়েছে, কার বোনের বিয়েতে সমস্ত ষ্টিলের বাসন, প্রেসার কুকার, মশলাবাটার মেশিন, কার ভাসুর-ঝির বিয়েতে টিভি-সোফা টেলিফোন...

— এ্যাই, এটা ভাই মিছা। টেলিফোন কেনা যায় না।

— কে বল্ল যায় না। আমি নিজে দেখলাম। মাইরী বলছি।

— আবার মিছা! আমার দেওরের বারাসতে কাপড়ের দোকান সে কিনা পাচ্ছে না টেলিফোন। কঁড়িপয়সা তার। টাকা দিয়ে কেনা যেত যদি, কবে কিনতো।

গনেশের মা এসব শোনে। ওরও কথা বলতে ইচ্ছা করে। গনেশের স্কীমের টাকায় ঘরে টিন হয়েছে, বাকি টাকা ব্যাংকে। গনেশের দক্ষিণার টাকায় টেপরেকর্ট, গদিখাট, আলমারী, একঘর পাকা, লাল সিমিন্ট। ওর যদি মেয়ে হত, ও তবে দিতে পারতো, বলতে পারতো ওরকম আঠের ভরি সোনা, খাট-আলমারী-ফোঁস কুকার ...। কিন্তু নাড়ির জট খোলবার জন্য হাসপাতালে যাবার সময় হয়না ওর।

বারাসত থেকে লাল শালুতে লিখিয়ে আনা হয়েছে— ওঁ গনেশায় নমঃ। প্রতি সোম আর বুধবারটা মহাদেব বড় ব্যস্ত। ক্যালেণ্ডারের এক-দুই-তিন-চার কেটে কেটে, পিছনে পিস্‌বোর্ডের টুকরোয় আঠা দিয়ে সেঁটে কুপন করেছে। আগে এলে আগে নম্বর পাবে। কোন নির্দিষ্ট দক্ষিণা রাখেনি মহাদেব। যে খুশী হয়ে যা দেয়। সবাই জানে এটা ইনজেকশন মারা শুঁড়। তবু আসে। এমনকি গাঁয়ের অন্য যাদের কান বড় ঠোঁট বড় হাত বড়, তারাও আসে। মহাদেবরা ভাবে সত্যিই ওর মধ্যে গনেশের অংশ আছে। মহাদেব ফিল্টার সিগারেট খায়। আজকাল মাটি কোপালে গা ব্যাথা করে। সারিডন-টারিডন খেলে ব্যাথা কমে।

একদিন রাতে গনেশ বলে, আজ কি বার!

কেন বাবা, রবিবার।

কাল ছোমবার ?

হ্যাঁ বাবা।

গনেশ কাঁদতে থাকে। ওর চোখের জল শুঁড় বেয়ে পড়ে। বলে কালকে আমি গনেছ হবনি।

কেন বাবা।

না। গনেছ না। আমি ক্যাবলা হব আবার।

তা কি আর হয়? ওকে বলে কয়ে, শেষে জোর করে সিংহাসনে বসানো হয়। ও বেশি কথাবার্তা বলে না। কাউকে বরাভয় মুদ্রা দেখায় না। জিলিপি, সন্দেশ কিছুই খায় না।

বুধবারও তাই করল।

ও আগে ওর শরীরে যা কুলোত সেই মত পাড়াব ছেলেপিলেদেব সঙ্গে একটু আধটু খেলত টেলত। ও গনেশ হবাব পব তা বন্ধ। ভগবান কখনো মানুষের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতে পারে না। গনেশ আজকাল নতুন বসানো জানালাব দরজা ফাঁক করে বাইরেব মাঠ দেখে। ছেলেদের দৌঁড় ঝাঁপ দেখে। নতুন বসানো লোহাব শিকের শীতলতা লাগে ওর মুখে, কানে, শূড়ে।

নাপিতকে দিয়ে ওর বিশাল কানেব লতিতে ফুটো কবিয়ে ওখানে পরানো হয়েছিল দুল। তখন গনেশ কেঁদেছে। ওর কানে সাদা পাথব চকচকায। ওব শুঁড়ে উল্কি কবানো হয়েছিল। উল্কির সূঁচ ফুটেছিল গনেশ কেঁদেছে। আর এখন ওব সামনে কমলালেবু আপেল সন্দেশ। আব জানলাব শিকের বাইরে মাঠের সবুজে বাচ্চারা খেলছে। গনেশ কাঁদে।

বিজয় হাজবা আসে। সঙ্গে ধনঞ্জয। ওব বড় কানটা ছেঁড়া ফাটা। বর্ষার দরুন সার্কাস বন্ধ। ধনঞ্জয আব গনেশ মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না।

পবেব বুধবাব গনেশকে জোব কবেই বসনো হল। লাল ভেলভেট মোড়া ডানলোপিলোব কুশন বসানো সিংহাসনে। বাবা, বোস বাবা। ঝা চাইবি দেবানে।

মুখে শ্বেতী-দাগ ষোল বছরেব মেয়েকে নিয়ে এসেছে ওব মা। হাত জোড় কবে বলছে আমার মেযেব মুখেব সাদা দাগ ভাল কবে দাও বাবা গনেশ।

গনেশ চীৎকার কবে বলে আলও দাগ হযি যাক্।

একজন সম্ভ্রান্ত চাষী, হাতে ঘড়ি, গায়ে টেরিকট, খবব কাগজেব ব্যাঙ্কেব বিজ্ঞাপনে আমবা সর্বদা চাষীভাইদেব সেবায় আছি লেখাব সঙ্গে ট্রাক্টবেব পাশে যে চাষীব মুখ থাকে, সেবকম একজন চাষীবাবু এসে বলে বাবা গনেশ, গত বছব পাঁচ বিঘেব আলু ধসা বোগে··

গনেশ ঘাড় কাত করে বল্ল আমি গনেশ না, ক্যাবলা।

মহাদেব বল্ল এঁদেব সব নানাবকমেব লীলা খেলা।

গনেশ তখন টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে টগব ফুলেব মালা। জরিব ফিতে। সিংহাসন থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। শূঁড় বেযে মুখের লালা নেমে আসে গোলাপী বেশমে।

আবও সোমবার আসে, বুধবাব আসে। সিংহাসনেব দারুকাক কাজে ছোট মাকড়সা নিজস্ব কারুকাজ করে। মেঘেব ফাঁক দিয়ে নেমে আসা বদ্দুর কারুকাজ কবে নিমেব পাতায়, জলেব ঢেউযে, গনেশ দেযালের চূনবালিতে নখ চিহ্ন এঁকে এঁকে কী যে বলতে চায ···।

গনেশেব শুঁড়ের ডগাটা লাল হয়ে যুলে উঠেছে। ও ব্যাথাব কথা জানায। কাঁদে। মহাদেব বলে কিছু কি কামড়েছিল? ভোমবা টোমবা, ডাগ-ডোমা। গনেশ মাথা নাড়ে। মহাদেব বলে নিগ্‌ঘাত কিছু কামড়েছিল। ভাল হযি যাবি। গনেশের মা সবষেব তেল বুলিয়ে দেয়। বলে তাড়াতাড়ি ভাল হ বাবা। কিন্তু গনেশ ভাল হয না। একদিন ধুম জ্বরে বলে আমার ছুড় কেটি দ্যাও বাবা। আমি আবার আমি হব। খেলব। মাঠে যাব।

গনেশের শূঁড়ের ফোলা জাযগাটা অনেকটা বেড়ে গেছে। একটা মাংস পিণ্ড জেগে উঠেছে। গনেশ রোগা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কিছু খেতে চাইছে না। পেটটা ফুলে উঠছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারেব কপাল কুঁচকে ওঠে। বলে কলকাতা নিয়ে যান। ভাল ঠেকছে না।

গনেশেব মা ভাবে তবে কি গনেশের মধ্যে সত্যিই গনেশ নেই! গনেশ কেন ওর নিজেব রোগ ভাল কবতে পারছে না? গনেশেব মা একটা মাটির গনেশ কিনে নিয়ে আসে। জ্যান্তগনেশের সামনে মাটিব গনেশকে বসিয়ে দিয়ে বলে পাথনা কব বাবা, ভাল হযি যাবি। গনেশ মাটিব মূর্ত্তি ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে। মাটিব গনেশেব শূঁড় ভেঙ্গে গেলে মাংসেব গনেশ সেই মুখ দেখে। স্মিত হাসে।

একদিন গনেশেব শূঁড়েব জেগে ওঠা মাংসপিণ্ড থেকে বক্ত ঝবে। পূঁজবক্ত ঝবে। কোথা থেকে এসে যায নীল মাছি। মহাদেব ডাক্তাব ডাকে। ডাক্তাব বলে শূঁড়টা কেটে ফেলতে হবে। গনেশ যেন খুশী হয। বলে তাহলি আমি আবাব আমি হযি যাব।

মহাদেব গোপীবল্লভের কাছে যায। বলে কোম্পানীতে বলে শূঁড়টা কাটিয়ে দিতে। গোপীবল্লভ বলে কনট্রাক্ট নেই। কোম্পানী ছোট কবে না। শুধু বড় কবে দেয।

তাবপব গনেশ মরে যায। গনেশের নাকেব ডগাব গলিত মাংসপিণ্ডের মধ্যে দুটি গর্ত্তেব হু হু শূন্যতাব দিকে কান বড হাত বড়বা তাকিয়ে থাকে। একটি বালকেব লম্বালম্বা আঙুলগুলো কিছু একটা ধববে বলে কিলবিল কবতে কবতে ক্রমশ স্থিব হয়ে যায। চলে আসে নীল মাছি।

কোথা থেকে খবব পেয়ে চলে আসে ফটোগ্রাফাব দল, বাণিজ্যিক টিভির। তোযালেতে ঘাম মু[illegible] দেবী হয়ে গেল। তিন পাযেব উপব দাঁড়ায ভি ডি.ও. ক্যামেবা—জাপান নির্মিত। ওযাইড এঙ্গেল, জুম-টেলি ইত্যাদি সহযোগে বঙ্গীন ছবি বকমাবি ইনসাট যোগে চলে যাবে মানচিত্রেব লাল-নীল-সবুজ-হলুদ নানা দেশে। শ্মশান বন্ধুবা মড়া গনেশেব, গন্শাব, ক্যাবলাব, মৃতদেহ ছেড়ে ঘিবে ধবে দেখছে ক্যামেবা যন্ত্র। দেখছে যন্ত্রেব মানুষ।

এ সময়ে কি ভাবে ছুটে এল ধনঞ্জয়। ধনা। ওব বড় কানটাব এখানে ওখানে অনেক গর্ত। এখানে ওখানে অনেক ছেঁড়া কাটা। সে গনেশেব মৃতদেহটাব উপব উপুব হয়ে কাঁদতে থাকে।

ছবি উঠছে এখন। ছবি উঠছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়

বাড়ি ফেরার অন্ধকার

কে ডেকে উঠল বিজ-ন ! একটু থমকানো সুদূব থেকে, ফিস্ ফিস্ চিকন স্বরে যেন ? বোঝা এবং বুঝে না-ওঠাব ঘোব তৈবি হয় যে ডাকে ? অথচ সে তো বিজন নয় মোটেই। সুশোভন । সুশোভন ঘোষ বায় ।

ধবে-আসা কালবৈশাখীব সন্ধ্যাবাতে, অদ্ভুত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভিজেল বাতাসে, এক-আধ চুমুক খেলে মন্দ হয় না —আত্মগত ভাবনায়, বিক্স ছেড়ে স্টেশনের সিঁড়িতে উঠল যখন, তখনই। এবং কী অদ্ভুত, অকল্পনীয় বাস্তব ! কিছুই পাওয়া যাবে না দুর্ভাবনায় দেখে স্টেশন-টার্মিনাসেব ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে, যেটিব সাঁইত্রিশ মিনিট আগে ছেড়ে যাওয়াব কথা । সুশোভন আব টিকিট কাউন্টারের ঝামেলায় না গিয়ে ঝুলপাঞ্জাবিব মুঠোপকেটে, দ্রুত, ভেজা-ভেজা পোশাকেব যাত্রী—গেটেব মুখ জ্যাম কবে আছে যাবা, ঠেলেঠুলে যখন ভযানক ফাঁকাব জন্য একটাব পব একটা বাছছে আযেস বিলাসিতায়—হর্ন, মৃদু গতি এবং সে বড ধবে উঠে পড়ে । কোণেব একটি নিবাপদ আশ্রয় বসতে-বসতে টেব পেল না, তাকে নিজেই কবুল কবতে হবে, 'সুশোভন নয় আসলে সে বিজন বিজন দত্ত এবং একটি ধন্ততায় যে ঝিম মেবে থাকবে ।

জল-কাদা ও কিছু আগেব বিপর্যস্ত ছন্দ পতনেব চিহ্ন মফঃস্বল শহবটিতে । লোডশেডিং থাকায় জেনাবেটব-এব শব্দ, অস্বাস্থ্যকব ধোঁযা ; দু-একটি নির্বিকল্প ষাঁডেব শিংযে কাদামাটি, ঘেয়ো মাছিব জ্বালায পবাভূত কুঁজ—ফলে বিক্স-অটোব যানজট, ভুট্টাপোডানো উনুনেব আঁচ, ঠাণ্ডা হাওয়া, কোণাছেঁড়া পলিথিন —কোথাও জল জমে ওলান হয়ে ঝুলছে এবং অকালে বাত হয়ে যাওয়া আকাশেব আনাচ-কানাচে থেকে-থেকে শান্ত বিদ্যুতেব স্ফূবণ । বোঝা যায গঙ্গার ওদিকটায এখনও মেঘ.বেশ জোরালো ।

ঝাপট উঠবাব আগে সুশোভন ওখানেই ছিল, নদীব কাছে । পুবনো ভাবগ্রস্ত একটি বাড়ির তিনতলাব প্রশস্ত চিলেকোঠায । এবং বাতাস সেখানে বাবকযেক গ্রিল ও কাচেব দবজায ঝন-ঝনাৎ দাপিয়ে উঠতে, সুশোভনই হুমড়ি খেযে ট্যাবা বাঁকা, অনফিট, বাত-দিনেব বং ধূলোব আঁটুনি সবিয়ে বহুকষ্টে..... বলতে গেলে হাঁপাচ্ছিল । শাশুড়ি তো নড়তে পাবে না – সবে ভাঙা থাইটুকুব ট্রাকশান খুলেছে, তক্তপোষেব কোণায একটি জীবন্ত দলা । ৮০ বছব তো হবেই। ছাদে দু টুকরো ইঁটেব পেচ্ছাপেব পূর্ব-ব্যবস্থা ছিল, যুক্ত হয়েছে টুল কেটে প্যান বসানো এবং সামান্য ঘেব-দেওয়া । কোন্ কোন্ ছেলে কোন্ কোন্ অংশ ব্যয় কবেছে—সুশোভন ঝাঁপি খুলতে চায় না, উল্টে বউকে ধমকে দেয ।

– বিকেল হলেই বোজ সেজেগুজে আসছে । বিভাবতী বলেন । শোভনকে পেযে ভাবি খুশি।

– আম ফলেছে বেশি । ... হবেই তো !

– আজ কাছে ছিলে । ... নইলে এ ঘর ভিজেই যায । ... আমাব তো.. ।

– ডাকতে পারেন না নিচে ? ... কেউ না কেউ উঠে আসবে ।

– পান খাবে ?

বিভাবতী জামাইকে পান খাইয়ে তৃপ্তি পান। 'হুঁ বলতেই, কোলের কাছে আপন সরঞ্জাম থেকে চিলতে পানে সুপুরি খয়ের দিয়ে ছোট্ট টুকলিটি জামাইয়ের হাতে তুলে দিতে-দিতে বললেন, খুবই নৈমিত্তিক ভঙ্গিতে যেন — সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

হঠাৎ লোডশেডিং — একটু ঝোড়ো বাতাস উঠলেই যা হয় মফঃস্বলে। তখন কোথায় দিয়াশলাই! কোথায় বাতি! কোথায় তেল এই চিলেকোঠায়!

কাঁচা আমের গন্ধ ছিল ঠাণ্ডা বাতাসে। পাশের জমির গাছটি ফলের ভারে এ বাড়ির ছাদে নিবিড়। এখন বাতাসের আছাড়ে অদ্ভুত ঘ্রাণ! কিছু স্মৃতির! বদ্ধ কুঠুরিতে তাপমাত্রা কমে যাওয়া, ঝড়ের আলুথালু কোঁশানির আভাস এবং অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে কাচের ওপাশের পৃথিবী থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক। সুশোভনের হঠাৎ মনে হল, কেন জানি, ঐ কাঁচা আমের গন্ধ ধরে, ছোটবেলায় একবার বাবার হাত ফসকে পুকুরের জলে ডুবে যাচ্ছিল সে। কী ফিকে সবুজ রং জলের গভীর শরীরে!

— এখনও বাতি পাঠাল না? বিভাবতীর অস্বস্তিতে, সুশোভন বলেছিল — দরকার নেই! . . বেশ লাগছে ঘরের এই অন্ধকার।

বিভাবতীর লম্বা নিঃশ্বাস। তার চুলে কাঁচা-পাকা কদমছাঁট, ছেঁড়া সেমিজ এবং চামড়া-মাংস, বলিরেখা ও ছোট স্ট্রাকচারে — শুকনো খোসামাত্র। কে বলবে আজ, উনি পুরনো দিনের গ্র্যাজুয়েট, ভালো টপ্পা গাইতে পারতেন?

— আলোয় আবার পোকা আসবে। . . বেশ আছি!

স্বগতোক্তি, কিন্তু কোথায় যেন সুশোভনের সরু হীনমন্যতা ক্ষোভের ধোঁয়া হয়ে একটু একটু প্রতিক্রিয়ায় কাঁচা আমের গন্ধ সরিয়ে দিল। অনেকবার, একতলার সিঁড়ির গোড়া থেকে সম্ভবত ছোট ছেলের অংশে— কার যেন ক্ষীণ, অস্পষ্ট কথার টুকরো ছিটকে আসা!

পরিবারের কেউ? সুশোভন সিঁড়ির দরজা খুলে মুখ বাড়ায়।

— মোম পাঠান? লাগবে? দশ-বারো বছরের কাজের মেয়েটি।

— না। .... বলছি তো!

এবার সুশোভন দড়াম করে দরজাটি বন্ধ করলে। ফিরতেই, বিভাবতীর মুখ থেকে ক্ষীণ, হঠাৎ-গড়িয়ে পড়া শব্দ 'চরিত্রহীন'!

একটু আগে যে প্রসঙ্গ চলছিল, তারই রেশ? না-কি এই অন্ধকার, বা আলো-না আলো, এই সময়? না-কি কারও উদ্দেশ্যে জমিয়ে রাখা ক্ষোভ?

— আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। .. কবে আসছেন আমাদের ওখানে?

— বিনুর সেই ব্যথাটা?

— মোটামুটি। খারাপ কিছু না।

সুশোভন বউয়ের ব্রেস্ট-এর টুকরো পেইনটি নিয়ে গম্ভীর হলেও, স্থির বিশ্বাস-ভরসা কিছু নয়।

এইসব ভাবনা ও ছবির টুকরো ট্রেনের গতির মধ্যে সুশোভনের ঝিমুনি আনে। সাকুল্যে এই কামরায় এগারোটি যাত্রী, কিছু সিটে জল, ফাঁকা অধিকাংশই এবং সে একটু দেখেই চোখ বুজল সামনের কচি বউটি বুক খুলে শাড়ির আড়ালে বাচ্চাটাকে শান্ত করছে। খুব যে হেঁজি-পেঁজি পরিবারের, এমন নয়; তালগোলভেজা সন্ধ্যায় সঙ্গে চরনদার হিসেবে নাবালিকা বোন।

সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে, ক্রশহাঁটুতে ঠেকা-কনুই এবং ডান হাতের তর্জনীটি দিয়ে কপালে নিভৃত টুকটুক তালে ঠোকার খেলায় সুশোভন দেখল, ঝড় থামলে একটা মোম উঠে এসেছিল পথ দেখবার ভদ্রতাটুকুর জন্য। অভিমান সত্ত্বেও ফিরিয়ে দেওয়া যায়নি। অনভ্যস্ত, পুরনো ধাপ, হড়কে পড়া এবং একটি প্রায় চরিত্রহীন অন্ধকার ঘিরে বিপদের দুর্লক্ষণ যা যা থাকতে

পারে— আলোটুকুই ভরসা ।

— এসো বাবা ! কী যে ভালো লাগল ।

— আপনার মেয়ে তো আসবার জন্য পাগল !

— কী দরকার ? ওর শরীব তো ভালো নেই !

আলো এবং সুশোভন অদৃশ্য । এই অংশে, ঐ অংশে, নানা ঘুপচিমালাব দরজায়-দরজায় এক-একটি শুকনো শুভেচ্ছা ও চৌকো ভদ্রতাব পর, ভেজা গলি দিয়ে যখন বড় বাস্তার চশমার দোকানটায়— কাচগুলো অতিরিক্ত ঝকমক করছিল । এই যাঃ ! সুশোভনেব, কাচেব ঐ ঝিকিয়ে থাকার জন্য, খেযাল হল ঝড়টি ঠিক উঠবাব মুহূর্তে ছাদের কোণায় সিগবেট ধরিয়ে লাইটাবটি যে-ছোট্ট থামটিব ওপব শোয়ান হয়েছিল, ... এখন কি ফিবে চাওয়া সম্ভব ? আঙুলে সিগবেটটি দুবাব বিরক্তিতে উসখুস ।

— একটা দেশলাই ... !

লোকটা চপ ভাজতে ভাজতে বিস্মিত চোখ তুলে পাশেব পানবিড়িকে বলল — মাধবদা, আলুব চপ ভাজছ ? ... আমি দেশলাই বেচছি !

তারপব, মোলায়েম কণ্ঠে, সুভদ্রতায়, সুশোভনকে বলে— যান.... দেখে যাবেন ···সন্ধ্যাবাতেই হোঁচট খাবেন না যেন !

কী লজ্জা ! দীর্ঘ সময় কুঠুবিতে বদ্ধ এবং বাইবেব তাপমাত্রায মস্ত ফাবাক হলে দৃষ্টিভ্রম । কে বলেছিল ? দাদাব ছোট ছেলে ? ডাক্তাবি সবে পড়ছে যে ? পানবিড়িব মাধব পুবো কথাটি শোনেনি বা আদৌ বোঝেনি কিছু । দেশলাই দিয়ে, চপভাজাব উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল — বলছিস কী ? তুই দেশলাইযেব বিচি ? তাহলে বেগুন-লঙ্কাব গুঁড়ো কী হবে ?

ভাবতেই, সুশোভনের বুকেব খোলে একটি লঘু হাসিব দোল, পিঠ-পাঁজবা নীববে কাঁপতে থাকল এবং নাক দিয়ে খুক্ খুক্ । শান্ত কামবায কেউ টেব পেলেও, নাবালিকা চাবণদারটি গোপনে দিদিকে চিমটি কেটে, চোখেব ইসাবা দেখায । ভয পায, সামনেব মানুষটা হঠাৎ হা হা হেসে উঠে, দুজনকে জাপটে ধববে না তো !

এই অবস্থায়, পরেব স্টেশনে যখন জনাতিনেক উঠল, নামল না কেউ—সুশোভন টেব পেল একজন ওর সিটেব সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে । মানুষটা নতুন স্টেশন থেকে ওঠেনি, এতক্ষণ কামরাব অন্য অংশে চুপচাপ ছিল ।

— দযা কববেন ?

চোখ সামান্য ফাঁক কবতেই, সুশোভন দেখে গণ্ডুষ ধাবণেব কাযদায ডান হাতের একটি কোস, বাঁ হাতেব আঙুল আঁকড়ে আছে একটি লাঠিকে । প্রফেশনাল ভঙ্গিতে নয । ময়লা, আঁটো পাযজামা, খদ্দবেব ফতুযা । একগাল পাকা, সুতীক্ষ্ণ দাড়ি ; ঘাড়টি সামান্য ঝুঁকে থাকায পাতলা চুলের লতান ডগাগুলো মানুষটিব ভেতবে চবিত্রহীন ছাল ফুটিযে তুলেছে । বেশ মজবুত, চওড়া হাড়ের শবীব — ধ্বস্ত হযে, সত্তব বছর পাব কবেও কেমন ভাঙে-মচকায না ভাব ।

— কিছু সাহায্য !

নাবালিকাটি দিদিব মানিব্যাগ হাতড়ে, কুড়িটি পযসা দিলে, গণ্ডুষ-আকাবটি এবার শ্লথ ঘুবে সুশোভনের প্রতি সবাসবি । মানুষটিব শরীব স্থিব, স্ট্যাচুব মতো । যেন দেবীপ্রসাদেব গান্ধীজী—ডাণ্ডিযাত্রার লাঠি ঝুঁকে আছে ঈষৎ । শুধু মূর্তিটিব অদ্ভুত গতির আভাস, এখানে হাড়—মাংসেব জীবন্ত খাঁচাটিব মধ্যে নেই ।

. .·আমি অর্থাৎ সুশোভন মানুষটিকে চিনি । এই ট্রেনেব রাস্তায় বিগত পঁয়ত্রিশ বছব ধরে সোভিয়েত বই বিক্রি করেছিল । একটানা । বরাবর খাঁকি ফুলপ্যান্ট এবং সফরি শার্টের মতো পোশাক থাকত ওর শরীবে । ছেঁড়া, সুতোর ঝালর বার কবা, তেলচিট্‌চিটে এবং কাঁচা-পাকা ঐ সুতীক্ষ্ণ দাড়ি । কাঁধে বিশাল ঝোলায থাকত বই এবং বাঁ হাতে একগাদা নমুনা ।

লোকটি খুব হাসিখুশি বা বিনীত ছিল না বদরাগী, একরোখা, কটুভাষী এবং সামান্য দু চার পয়সা কমিশন ছাড় দিলে খদ্দের পেয়ে যাবে জেনেও, এমন ভঙ্গিতে কথা বলত বই কেনাটা মানুষরই যেন দায়—ওকে সাহায্য করা নয়। ট্রেনের এই ব্যাপারি, কেরানী, ফেরেব্বাজ, হাটুরে, ছাত্র-ছাত্রী, ও বিয়ে পৈতে-শ্রাদ্ধের যাত্রীদের মধ্যে বাদাম, সূঁচ, কমলার মতো টেনে টেনে বিলম্বিত লয়ে, অনেকটা দুপুরের ঘুঘুর মতো, হেঁকে উঠত—ট-ল-স্টয় !গ — র্কি ! চে-খ-ভ ! কিংবা লে-নি-ন !

লোকটা ভীষণ বিড়ি ফুঁকত — এমন যে দাড়িগুলোর রং ধোঁয়াটে, ফিকে খয়েরি চোখজোড়া পর্যন্ত সর্বদা যেন আচ্ছন্ন। কষের দু-টুকরো ঘা আজও বহালতবিয়ৎ এবং ধোঁয়াচ্ছন্ন বাদামি চোখজোড়ায় সময়ের চাপে চকচকে কিছু আস্তরণ — হয়তো ছানি। ওর নাম সুরেন, না মতি, ঠিক জানি না — তবে ও এলাইনে নন্দদার ভাগ্নে বলেই পরিচিত ছিল। নন্দদা ছিলেন কলকাতায় সোভিয়েত বইয়ের বিশাল দোকানের মালিক পার্টির খুবই ঘনিষ্ঠ। মানুষটা কি পার্টি করত ? বলে বেড়াত বটে কিন্তু ওর বাকচাতুর্যের জন্য সে-সব বিশ্বাস করত না কেউ। তবে, শেষের দিকেও, যখন সোভিয়েত বইয়ের কদর কমল, আগ্রহ তেমন রইল না মানুষের, ওকে কিছু রঙিন, গ্লসি ম্যাগাজিন বেচতে দেখা যায়নি ট্রেনে। দগ্ধ পোড় খাওয়া মানুষের মতো ঝোলাটা ছোট্ট বানিয়ে চুপচাপ মানুষের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। হকিং তো বিশেষ আদর্শ নিয়ে আঁকড়ে থাকলে চলে না, ও-ই ছিল ব্যতিক্রম। তাই ব্যস্ত, আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে, কদাচিৎ দুপুর-টুপুরে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ট্রেনে যখন ফ্যাসফ্যাসে বিলম্বিত কণ্ঠে হাঁকত—ট-ল-স্টয়। গ-র্কি। চে-খ-ভ, কোথাও কোনো যাত্রীর মুখে কৌতূহল নেই—যেন প্রত্নতত্ত্বের কিছু শব্দের কঙ্কাল সুদূর কোনো গুহা থেকে উঠে আসছে। অথবা নির্জন গ্রামের পথে, আলখাল্লা পরে, কেউ হেঁকে যাচ্ছে—'বিজয়বসন্ত' 'গোল-এ-বকাবলি' এবং গৃহস্থরা নিঃঝুম, চুপচাপ। দু-চারজন যাত্রী অবশ্য পরিহাসে তাদের বাজিতে রংয়ের তুরুপ করে। হেসে উঠত —এখনও লেনিন ? …সব তো বাওয়া ভেতর ঢুকে গেছে ! কল্ দাও মজুমদার। … খানকিরাও ভালো এদ্দেয়ে ! … তাদের বোঝা যায়। এবং কোথাও নীতি-ফিতি নেই বলে, নিজেদের ঘুষ-চুরি-জালিয়াতি ও অফিস কেটে অসময়ে তাস খেলার অধিকারটুক্ বিবেকসিদ্ধ। খেলায় ফের মৌতাত জমে।

হাতটি পাতা আছে স্থির। সুশোভনের কাছ থেকে আদায় করবেই। না-কি যাত্রী-বিরল কামরায় একজনের পেছনে অনেক সময় ব্যয় করা যেতে পারে।

— আপনি সোভিয়েত বই বেচতেন না ?

'—'

— নন্দদার ভাগ্নে তো ?

— হ্যাঁ। চেনেন নন্দবাবুকে ?

— নাম শুনেছি। কলকাতায় বড় বইয়ের দোকান।

— হ্যাঁ, আমার মামা হতেন।

লোকটি এবার কী ভেবে, পাতা হাতটি সরিয়ে ঐ শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একসময়ে টুপ করে গড়িয়ে পড়ল মুখ থেকে—সোভিয়েত বই-তো আসে না আর !

বন্ধ হয়ে গেছে !

লোকটি এবার দু-হাতে লাঠিটিকে পতাকার ভঙ্গিতে মাটিতে দাঁড় করিয়ে সুশোভনের পাশের সিটে বসে পড়ল। যেন কিছু পূর্বের ভিক্ষাবৃত্তি এই মুহূর্তে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে যাত্রী হয়ে গেছে — যারা গল্পে-গল্পে এই বাদল সন্ধ্যাটুকু ভেতরে যাব-যাব স্টেশনে নেমে পড়বে।

কেউ বলে উঠল না, ও দেশটাই ভিখিরি হয়ে গেছে, লোকটিও চুপচাপ জানিয়ে দিল সে আজ দেউলিয়া। কোনো পাশাপাশি সিটে নতুন যাত্রীটির অস্তিত্ব, মলিন গন্ধের তীব্রতা ও সামান্য অস্বস্তির মধ্যে সুশোভনের বুক-পাঁজর হঠাৎ গুড়গুড় করে উঠল। জলজ্যান্ত, স্বাবলম্ব

পবিচিত কেউ হঠাৎ ভিখিবি হয়ে সামনে হাত পাতলে যে বিধুব পবাভূত ভাব জেগে ওঠে ! গত কালেরই নদীটি যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখা যায় পুবোটাই বলি !

লোকটিব প্রতিটি নখে, সুশোভন দেখে, আলগা ময়লা এবং কাঁপা আঙুলে বিড়ি ধরাল।

বেশ মাথা নেড়ে, বিজ্ঞের মতো বলল – পাখি-দাকে তো চেনেন ! .... দেখা হলেই চা খাওয়ায় ।

– পাখি দা ? রাজ্যেব মন্ত্রী ?

– হ্যাঁ ।

– কোথায় দেখা হয় ? চা খাওয়ায় বললেন ?

মানুষটি যেন শুনতেই পায়নি – গুপ্তাজিব সঙ্গেও ভালো আলাপ। ... কলকাতা এলেই যাই ।

– কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ?

– ঠিক ।

– যান কেন কলকাতায় এলে ?

– আমি পলিটিক্যাল সাফাবাব তো ... পেনশনেব তদবিব কবতে যাই ।

.. আমি জানি মানুষটি কোনো অলীক ভুবনে আশ্রয় নিতে চাইছে । তাই বা কেন ? নন্দবাবু ছিলেন পার্টির পুরনো ভ্যানগার্ড ... মন্ত্রীবা তো এক সময়ে দলেবই কর্মী ছিলেন, পবিচয় হলেও হতে পারে এব সঙ্গে। সেদিন কে ভেবেছিল কপালে মন্ত্রীব তকমা জুটবে কাবও-কাবও ? কিন্তু আমাব কিছুতেই বিশ্বাস হয না দেখা হলে ওকে বসিযে চা খাওযান কোনো বিশেষ মন্ত্রী। এ মানুষটা তো সম্পূর্ণ ভিখিবি হযে গেছে এবং কাঙালেব জগতে প্রবেশ কবলে সে তো স্বাভাবিক সূত্র আঁকড়ে থাকতে চায না ।

– নন্দবাবুব কাছে যান ?

মানুষটি মৃদু হেসে উত্তব দিল – তিনি মারা গেছেন দু-বছব । . . বিযে কবেননি...,

– দোকান ?

– তা নিযে কর্মচাবীদেব মধ্যে মামলা ...

– আপনি !

– নাক গলিয়েছিলাম । ...হল না । .. সব কিছু বন্ধ এখন ।

আমি জানতাম নন্দবাবুব ইতিহাস । যাচাই কবে বুঝলাম মানুষটা সবকিছু অলীক কথা বলে না । ...

হঠাৎ সুশোভন বলে – এখনও অভ্যেস আছে ?

– কীসেব ?

– ঐ যে মোটা গলায টেনে টেনে টলস্টয গর্কি ? ... ছাড়ুন তো একবাব ! লোকটি জববদস্ত ব্যক্তির মতো সুশোভনেব চোখজোড়ায সামান্য ঝুঁকে বলে – মজা করছেন ? ঐ সব নাম ? ... চবিত্রহীনদেব মধ্যে শত বিপদেও উচ্চাবণ কবি না । অহংযে ঘা খেযে সুশোভন বলে– নিজের চবিত্র ঠিক আছে ? .. বোজ বাতে বউযেব পাশে থাকেন ?

– থাকব না কেন ?

– বাসা কোথায ?

– রাণাঘাট ।

– এখন এই বাতে পলতায, ডাউনে ট্রেনে... কটায পৌঁছবেন ?

– হপ্তায যাই ... আজ ব্যাবাকপুর থাকব । স্টেশনের কাছেব হোটেলটায় ... মালিক থাকতে দেয় বিনে পযসায । ... খোঁজ নিতে পাবেন ।

তখনই সুশোভনের মনে হল মানুষটি এ বয়সে নিয়মিত যৌন ব্যাভিচার করে। মনে হয় এইডস্ আছে জেনেও, সবকিছু ঠিকঠাক ভাব নিয়ে গোপন তৃপ্তিতে বাস করছে।

— আপনার সংসার ?

— বউ রোজগার করে। মেয়েটাও আছে। .... চলে যায়।

— তবু ভিক্ষে। অন্ন জোটে না সেখানে ?

— মেয়ে বাজি।

— আপত্তি আসল জায়গায় ?

মানুষটি চুপ করে রইল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে তলপেট ও অণ্ডকোষ অঞ্চলের পেছনটা দেখিয়ে সামান্য পরাজিতের হাসি দিয়ে বলে— ট্রেন থেকে পড়ে গেছলাম !... বছর দুই হল। বাঁচার কথা ছিল না ! ... এখন হাত-টাত পাতি দু-চার জনের কাছে ! . অনেকেই তো চেনে আমায় !

— সোভিয়েত বই ফের আমদানি হলে ?

— আমার বাঁচনের মধ্যে হবে ? খবর কিছু রাখেন ?

— এই যা করছেন গুপ্তাজি জানে ?

ঝোপ, ঘাস, বর্ষার জল, ভেজা ও মলিন ঝুপসির শরীরে শব্দ তুলে ট্রেনটি ছুটছে। এই সব বিরল সন্ধ্যার শীতল হাওয়া সমূহ একটি বুনো গন্ধকে দীর্ঘশ্বাসে জড়িয়ে যায় একঘেয়ে জীবনটা ফুরিয়ে এলেও মহৎ পৃথিবীর কোনো হাতছানিই পাওয়া গেল না।

— শাখিবাবু জানে ?

পরপর দুটি প্রশ্নেরই বিনা শিষ্টাচারে, মানুষটি আস্তে ফের ভিখিরি হয়ে দূরের সিটের এক হিন্দুস্থানি দম্পতির সামনে দাঁড়ান। আর তখনই সুশোভনের শরীরের কোষে তোলপাড়। কপর্দকশূন্যতা চাক্ষুষ কী ভয়াবহ !

লোকটি হঠাৎ এদিকে মুখ করে, টলস্টয়, গোর্কি, লেনিন উচ্চারণের পুরনো ভঙ্গিতে জিগ্যেস করল — কোথায় থাকেন আপনি ? কী করেন ?

— সোদপুর।

— সোদপুরের কোথায় ? ... আমি তো রাতে মাঝে মাঝে ঐ প্ল্যাটফর্মে থাকি ... কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে... অনেক জানাশুনো আছে ! .. কী নাম আপনার ?

তখনই, কে ডেকে উঠল বিজ-ন ! একটু থমকানো সুদূর থেকে, ফিসফিস্ চিকন স্বরে যেন ! খানিকটা খরখরে গলায়, ঢোক গিলে, সামান্য বুক কাঁপিয়ে সুশোভন উত্তর দিল - বিজন।

— বিজন কী ?

— দত্ত। বিজন দত্ত।

— কোথায় থাকেন ?

— কোথায় ?... মানে, চিনবেন ? ... ঐ অমরাবতী !

লোকটি তৃপ্তি পেল। যেন প্রয়োজনে খুঁজে নিতে পারবে।

সুশোভন একটা প্রগলভতায় নিজেকে ধিক্কার দেয়। লোকটি ফের যাত্রী সেজে দূরে ফাঁকা একটি সিটে বসে রইল এবং একটি হকারকে চারটে আধুলির টিপে টিপে সাইজ পরীক্ষা করে দু-টাকার খুচরো সাহায্য করল। এবং ব্যারাকপুর এলে, লোকটি হঠাৎই বিনা আড়ম্বরে নেমে পড়ল। এইবার সুশোভনের মাথায় প্রগলভতার আক্ষেপের শেষে, সামান্য ক্লান্তি, ভালো না লাগা ও চরিত্রহীনতার মিলিত একটি ধিক্কার শব্দ তুলল টিক্ টিক্ টিক্ ! যেন চলন্ত ট্রেনের বাইরের যাবতীয় অন্ধকার ও ঘরবাড়ি মিলিত ঘড়ির সময় বাতাসের বেগে ট্রেনকামরার ভাঙাচোরা

দরজা-জানালা দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় বেরিয়ে যাচ্ছে।

এর তিনটে স্টপেজ পর সুশোভনের নিজের স্টেশন। পা দিয়েই টের পেল আবহাওয়া এখন স্বাভাবিক হলেও দাপট এ অঞ্চলেই ছিল বেশি। জল, কাদা ও ছিন্নতার ক্ষতগুলো মানুষের ভিড়ের চাপে আরও প্রকট। বিশেষত স্টেশন রোডটি। এই রাস্তা ধরেই তাকে যেতে হবে একবারে গঙ্গার পুরনো অঞ্চলে, যেখানে তার প্রকৃত ঠিকানা। চৈত্র-সেল, বিকেলের ঝড়ে খানিকটা বাধা পাওয়ায়, এখন যেন প্রমত্ত। ভারতবর্ষের নাকি দামি কল মিলে সারা বছর যে উৎপাদন বাজার পায় না, চৈত্রের মরা বিকেলে ডাঁই হয়ে জমে এখানে। দাম আপাত কমে যায়, মলিনতা চকমকে হয় এবং শহরের পথে পথে তখন মুক্ত, নির্ভাবনার গন্ধ ভেসে বেড়ায়। মানুষ আর মানুষ! এ-কটা দিন জয়ের নেশায়, গুপ্ত প্রতিযোগিতায় ছোঁ মারতে, দোকানে-দোকানে ভিড় করে।

যে অটোটিতে সুশোভন উঠেছিল, গাদাই ছ-জন এবং ঘরমুখো সকলের হাতেই চৈত্র-সেলের শপিং। পাড়, জমিন এবং রং থেকে বিলোল গন্ধ সারা অটোটির খোলে। আর কী সব কিচিরমিচির সুখের, জিতে ফেরার কথাবার্তা। সুশোভন ভাবছিল বিভাবতীর কথা। বিনু খুশি হবে। কত দিন মা-কে দেখে না। এ বয়সে, এই সময় কালে, ভাঙা পা কি জোড়া লাগে? আচ্ছা, নেমে পাবলিক বুথ থেকে ছোট শালককে একটা রিং করলে হয় না, লাইটারটি কুড়িয়ে যত্নে রেখে দেবে?

মরণ! পোশাকে ঢাকা শরীরের গুহ্য স্থানগুলোতে এত কুট্‌কুট্ করছে কেন? কী যেন সুড়সুড় হাঁটছে। ঘষে চুলকোলে জ্বালা। এবং জ্বালার সঙ্গে সূক্ষ্ম ঘিনঘিনে ভাব। হঠাৎ টের পেল। সুশোভন, নিশ্চিন্ত অন্ধকারে কাঁধের পাশে কলারবোন ধরে ছিলছিলে একটি সিল্কপোকা। ভ্যাদা-ভ্যাদা রূপোলি রঙের। ওঃ! সারা শরীরে যেন। অথচ, স্বস্তির জন্য বেশি নড়াচড়া করলে যাত্রীঠাসা অটোয় পাশের লোকটি বিরক্ত হয়। বোঝে না সুশোভনের গুহ্যউৎপাত কী? কোথায় ছিল কীটসকল? ঐ পাড়, জমিন এবং ডাঁই হয়ে ওঠা আকারহীন জয়-পরাজয়ের বস্তুগুলোর গভীরে ভাঁজে ভাঁজে? এ আক্রমণ সুশোভনকে কেন? সে তো তৃতীয় পক্ষ: কিছু জিতে ফেরেনি।

বাড়ির কাছে, অটো থেকে নেমে, শরীর-পিঠ বাঁকিয়ে সে ঘিনঘিনে ভাব কাটাতে চাইল। লোডশেডিং। পাবলিক বুথের দিকে এগোতেই বিজনবাবু! একটু থমকানো সুদূর থেকে, ফিসফিস চিকন স্বরে যেন! লোকটা কি পিছু নিয়েছে? চমকে পেছন তাকিয়ে বোঝে না! কিছুর প্রতিধ্বনি! স্পষ্ট দেখেছে, সে-তো লাঠি হাতে শ্লথ পায়ে ব্যারাকপুর নেমে গেছে।

নিজের পুরনো বাড়ির মুখে কিছুটা পথ অন্ধকার। সরু গলি। আলো ছাড়া উপায় নেই। জল-ঝড়ে কী হয়ে আছে কে জানে! জীবন্ত বিদ্যুতের তারও ছিঁড়ে শুয়ে থাকতে পারে! এত রাত কেন হল, বিনুর প্রাথমিক মুখ ভার, বিভাবতীর নামে কেমন স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ভাবতে ভাবতে হাঁকল-বিনু!

একটু আলো দরকার এখন, সামান্য মোমবাতি হলেও চলবে।

— বি-নু!

এবারও কোনো সাড়া নেই। নিঃঝুম।

এবার মা-মেয়েকে ডেকে উঠল একসঙ্গে—বি-নু! মন্দি-রা!

ওরা কি বধির, সামনের দরজা বন্ধ করে আছে? আরও চল্লিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সুশোভন। মনে হল ঘড়ির তিলপরিমাণ সময়টুকু ক-ত দীর্ঘ! ভীষণ একঘেয়ে! একটি প্রায় চরিত্রহীন অন্ধকার ঘিরে বিপদের দুর্লক্ষণ যা যা থাকতে পারে জেনেও, সুশোভন বুঝে উঠতে পারে না কী করবে এখন। শরীরের গভীর গুহ্যে দু-একটি অবশিষ্ট, অদৃশ্য পোকা বিচ্ছিন্ন নাছোড়বান্দা, 'বিজনবাবু' বলে সম্ভাবনার ডাকটি অস্বস্তিতে গলার কাছে আটকে আছে, নিরুত্তেজের জন্য সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—তোমরা কি সব মরে আছ বাড়িতে?

একটি বুনো গন্ধ নিয়ে নিশীথ বাতাস ডানা মেলে উড়ে গেল গঙ্গার দিকে!

উত্তরপূর্ব ভারত পর্ব

উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা গল্প

বাংলা ভাষাভাষী তিনটি প্রধান অঞ্চলেব নির্বাচিত গল্প নিয়ে সংকলন অসীমান্তিক।

আখতারুজ্জামান ইলিযাসেব পর ইদানিং বাংলা গদ্যে মৌলিকতা বিবল বিষয। গণ্ডা গণ্ডা গল্প ফাঁদা হচ্ছে ঠিক, তবে ভাষা বিষয আঙ্গিকে মৌলিকতা আজকালকাব বাংলা গল্প উপন্যাসে প্রায নেই বললেই চলে। এককালে উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন, এখন শুধু গপ্পো, এমন মহীরুহ অনেকেই আছেন অপ্রযোজনীয লেখক। কেবল কেচ্ছা, সঙ্গে বগবগে ভাসা ভাসা সমকাল-চর্চা বা অন্ধদেব হস্তিদর্শনের মত অর্ধসত্য —তথাকথিত সমাজ-অর্থ-বাজনীতি সচেতন লেখাগুলি (যা-তে ব্যক্তিবিশেষ, তাব অবস্থান, প্রবৃত্তি, দ্বান্দ্বিক মন, শিক্ষা এব, আচবণে সম্বন্ধ নেই কোনো) বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে কেবল অন্ধকাবে ঠেলেই দিচ্ছে না, ক্রমাগত পোলিওগ্রস্ত কবে চলেছে ভবিষ্যৎকে।

লেখাটি ব্যতিক্রমী না কি প্রথাসিদ্ধ, সেটিও বড় কথা নয। কথাসাহিত্যিক শবৎচন্দ্র থেকে সমবেশ বসু মাঝখানে দু'চার পাঁচটা মাইলস্টোন ছিল। ওবা তো প্রথাসিদ্ধ লেখালেখি কবেছেন, অথচ কত শিল্পসমৃদ্ধ। বস্তু ব্যক্তি মন আচাব আচবণ এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে যাদেব জ্ঞান ছিল অপবিসীম। ঠিক তেমনি কমলকুমাব থেকে আখতাকজ্জামান — একইবকম মাঝখানে কযেকটি মাইলস্টোন ছিল। গল্পে বহুমুখীনতা স্বাতন্ত্র এবং শিল্পে মাখামাখি।

যদিও ইদানিং আব পাচ্ছি না। কি প্রথাসিদ্ধ কি ব্যতিক্রমী সর্বত্রই নিষ্ঠার অভাব এখন স্পষ্ট। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, সর্বত্র। তবে মক্কা-মদিনায যা-ই ঘটুক না কেন উত্তরপূর্ব ভারতেব বাংলা গল্প সম্পূর্ণ অন্যখাতে বইছে। তাব কাবণও আছে যথেষ্ট। প্রথমত এবং প্রধানত যোগাযোগের অভাব। বাংলাদেশের কথা বাদ, অনেক ঝক্কি-ঝামেলা — পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি। দূবত্ব তেমন কিছু না হলেও, পাহাড়-পর্বত ডিঙিযে কলকাতা পৌঁছুতেই প্রায তিনদিন। তাছাড়া পার্বত্য ও সমতল জীবনযাপনেব মিশ্রণ বিসর্জন থেকে শুরু কবে স্ব-ভূমিতে উদ্বাস্তু এবং বারবাব উদ্বাস্তু হবাব আতঙ্ক, ভাষা উপভাষা আঞ্চলিক ভাষার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ডামাডোলে সুযোগসন্ধানী যাজকদেব দ্বাবা ক্রমাগত ধর্মান্তকরণ এবং তার নিট-ফল উত্তবপূর্ব ভাবতেব কৃষ্টি-সংস্কৃতি বাহুগ্রস্ত হযে পড়া। ফলে, একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থী তৎপরতা, অন্যদিকে সেনা অভিযানে সন্ত্রস্ত মানুষের গল্পেব ভাষা আঙ্গিক বিষয যে নদীমাতৃক, শস্যশ্যামলা, কলকাবখানা সমৃদ্ধ সমতলের মত হবে না তা তো বলাই বাহুল্য। চল্লিশের দশক পঞ্চাশেব দশকে এখানে যদিও বাংলা গল্পের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল ধীর লযে, তবুও বিমল

চৌধুরীর মত একজন সংগ্রামী গল্পকারকে তখন থেকেই পাচ্ছি আমবা। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকেই উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা গল্প নিজস্ব চেহাবা চবিত্র লাভ কবে। স্থানীয় জনজীবন এবং তাব সমস্যা নিয়ে শিল্পসম্মত সার্থক গল্প রচিত হয়। মেঘালয থেকে বনমালি গোস্বামী খাসি-জনজীবন এবং তাব সমস্যা নিযে উল্লেখযোগ্য গল্প লেখেন। ত্রিপুবার উপজাতিদের ভাষা-সঙ্কটও তখন অনিবার্যভাবেই গল্পে উঠে আসে। তাবপর থেকে আব পেছন ফিবে তাকাতে হয়নি। এমন একনিষ্ঠ গল্পচর্চায মধ্যেও যে প্রক্রিয়াটি, সত্তর দশক এবং তৎপববর্তীকালে উত্তরপূর্ব ভারতেব বাংলা গল্পেব ধাবাকে স্বতন্ত্র পরিচয দিযে চলেছে, তা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গল্প আন্দোলন। কেবলমাত্র একঘেয়েমি থেকে মুক্তি বা নিছক বিনোদনেব জন্যে নয়। জীবন ও যুগযন্ত্রণা থেকে, বস্তুর স্বরূপ থেকে, সম্পর্ক থেকে, মনের অলিগলি আলোআঁধাবি তন্ন তন্ন করে যে সত্য উন্মোচিত হয, তাব সাথে তথাকথিত গল্প আঙ্গিক ভাষা বিষয়েব কোন মিল নেই।

যা-ই হোক, সংগ্রামের কথা বলছি অথচ সমস্যাব কথা পুবোটা বলা হয়নি। এতদিন আমাদের এখানে কোন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান বা তেমন কিছু পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। এখনও নেই বললেই চলে। যতদূর পথ হেঁটে এসেছি আমবা, পথটিও নিজেদেরই তৈবি করে নিতে হযেছে। লিটল ম্যাগাজিনেব কথা সবাই জানি — খুবই সীমিত আয়ুষ্কাল। সাহিত্যে ধাবাবাহিকতা তাই লিটল-ম্যাগ নির্ভব হয না। বৃহৎ ক্ষেত্র চাই। নিযমিত প্রকাশ প্রতিষ্ঠান ছাড়া সম্ভব না। সাহিত্যনির্ভব জীবিকা এই অঞ্চলেব লেখকদেব কাছে কল্পনার বিষয়। তা সত্বেও বাংলা গল্পে উত্তবপূর্ব ভাবতেব অগ্রগতি গর্বেব বিষয় বৈকি। যদিও অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকাব করে নিতে হযেছে। সময সময এখানে যাবা উৎকৃষ্ট গল্প বচনা করেছেন, পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বা স্থবিরতাব কারণে লেখালেখি ছেড়ে দিযেছেন তারাই। উত্তরপূর্বের বাংলা গল্প তবুও থেমে থাকেনি। ওদেবই পরিত্যক্ত কলম তুলে নিযেছেন অন্য কেউ কেউ। দাপটেব সঙ্গে লিখেও চলেছেন।

কেবল চলমান কলমগুলিব সৃষ্টিই সংকলিত হযেছে বর্তমান সংকলনে। পাঠকদের ভাল লাগলেই প্রয়াসটি সার্থক বলে গণ্য হবে।

দুলাল ঘোষ
আগরতলা
২৪ নভেম্বব ১৯৯৭

মলয়কান্তি দে

আক্রান্ত

ভয়াল, হিম আতঙ্কের ছায়া পড়ে এই শহরের কয়েকশো মানুষের উপর। সরাসরি দরজা ভাঙ্গা আতঙ্ক। অতর্কিত চোরাগোপ্তা আঘাতের আতঙ্ক। অস্তিত্বের শেকড় থেকে উৎপাটিত হবার আতঙ্ক। হঠাৎই ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে যাওয়ার আতঙ্ক। আতঙ্কে দিশেহারা মানুষগুলো রাত্রে ঘুমোতে পারছে না। প্রতিটি সকালের স্বস্তি কাঁটাকাঁটা হয়ে থাকছে পরবর্তী সন্ধ্যার আশংকায়। যেন বাঘের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে হরিণীর বাঁচা। এক ভোরের থেকে আরেক ভোরে, এক আক্রমণের থাবা থেকে আরেক হাঁ-মুখ আক্রমণের ছায়ায়। পালাতে পালাতে হঠাৎ একদিন ঘাড়ে বিঁধবে নখ, প্রাণবায়ু ফুড়ুৎ। হয়ে যাবে জন্তুর মতো বাঁচা। কিন্তু না। অতোখানি ভাবতে পারছে না মানুষগুলো। হরিণী তো নয়। তার সমাজ সংসার আছে। দর্শন বিজ্ঞান আছে। ফিক্সড্ ডিপোজিট আছে। জমি আছে। অমন হুট করে মরে যাবার কথা ভাবাও যায় না। অথচ সেই মৃত্যুই, স্বরূপে বা বহুরূপে, সম্মুখে দাঁড়িয়ে। এক সামগ্রিক বিপন্নতার ঘেরাটোপে পড়ে ভিতরে ভিতরে তাই ঘামছে এই শহরের কয়েকশো মানুষ।

আমি এই বিপন্নতার রেখাচিত্র অঙ্কনে বসেছি। কিন্তু বড়োই জটিল মানুষের বিপন্নতার সংজ্ঞা। কে যে কখন কার দ্বারা আক্রান্ত হয়, কী করে যে কে কার অন্নগ্রাসে হয়ে যায়, শক্তিমানের আক্রমণের মুখে নিরস্ত্র, অসহায় কে যে হঠাৎই কোথায় পেয়ে যায় দাঁতে নখে হিংস্র প্রতিরোধ, কে জানাবে তার অন্ধিসন্ধি! চোখে মুখে বীভৎসতা ফুটিয়ে বন্য হুংকারে যে লোকটি তোমার দিকে ঝকঝকে ধারালো অস্ত্র তুলেছে—সে কি আক্রমণেই উদ্যত, নাকি আত্মরক্ষায়। নৃমুণ্ড-শিকারী বলে যাকে তুমি অসভ্য বর্বর হত্যাবিলাসী রূপে চিহ্নিত করেছো, তারও কি অবচেতনে নেই গোষ্ঠীচেতনালব্ধ উর্বরতাপ্রয়াসী আদিম এক সৃজনী বিশ্বাস? মেয়ে দুটিকে তুমি চিনলে চিনতেও পারো। না চিনলেও জানো, — যেমন হয় অধিকাংশ নাগা কিশোরী, ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো রং, পায়ের গোড়ালি থেকে চুলের ডগা অবধি ঝলমল করছে স্বাস্থ্য। নরুণ চেরা চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ে সরল পাহাড়ী ঔৎসুক্য। স্কুলের ছুটিতে ওরা বাড়ী যাবে। কিন্তু এ-তো আর তোমার শিলচর থেকে গৌহাটী যাওয়া নয়, যে টিকিট কেটে চেপে বসলে রিজার্ভড্ কামরায়, আর শুয়ে বসে পৌঁছে গেলে বাড়ী। যাচ্ছিলো তারা কিছু পথ বাসে, কিছু পথ ট্রাকে, কিছু জীপে, শেষটায় অনেকখানি পায়ে হেঁটে। এখানে একরাত, ওখানে দু'রাত থেমে থেমে। আর যাচ্ছিলো কোথায়। গ্রামের বাড়ীতে। এবং সেই গ্রাম কোথায়? ব্রহ্মদেশে। কিন্তু সে তো বিদেশ। হ্যাঁ, তোমার আমার হিসেব মতো। কিন্তু কার কোথায় দেশ, আর কার কোনটা বিদেশ—তার হিসেব কি এতোই সোজা। থাক বরং সে কথা। মেয়ে দুটি যাচ্ছিলো ব্রহ্মদেশে, গ্রামের বাড়ীতে। তোমার আমার মেয়ে-বোন, আমাদের স্কুলে পড়া মেয়েদের সাধ্য নেই অতো দূরের পথ পাড়ি দেয়, অমন সঙ্গীহীন, এমন জলভাত ভেবে। কারণ তোমার মেয়ের জন্যে যে জিভে জল ঝরিয়ে আমি বসে আছি, গাড়ীতে পাশের সীটে। রাস্তায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে। সুযোগ বুঝে, একটু চাটবো বলে। আমার মেয়ের জন্যেও আছো তুমি। তা ছাড়া আমরা হলাম সভ্য আতুর মানুষ। ওসব গায়েখাটা, পায়ে হাঁটা—ওসব কি আমাদের জন্য? তা, একদিন এমনি পায়ে হাঁটা পথে টিলার পর টিলা পেরিয়ে চলতে চলতে পথে রাত নামলো। কাছাকাছি রয়েছে গ্রাম। যে জাতি যে গোষ্ঠীই হোক, উপজাতি তো? বিশ্বাস করা যায়। অন্ধকারে গ্রামে ঢুকলো আশ্রয়প্রার্থী, পথশ্রমে ক্লান্ত দুই স্কুলের কিশোরী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোপ পড়লো ঘাড়ে। মাথা গেলো কাটা। অন্ধকারেই দুটি কবন্ধ শরীর হাত-পা ছুঁড়লো ছিন্ন স্নায়ুর টানে পোড়েনে। রক্তে ভিজলো মাটি। ঝুঁটি বাঁধা চুল, চুলে বাঁধা বাহারী ক্লিপ, দু'টি কিশোরীর মাথা পড়ে থাকলো গ্রামের প্রবেশপথে। নরুণচেরা দু-জোড়া চোখে ফুটে থাকলো আতঙ্ক। জানা ছিল না এই গ্রামের উপজাতিরা

এখন 'গেন্না' উৎসব পালন করছে। এবং রীতি হলো এই যে, 'গেন্না' চলাকালে গ্রামে যে প্রাণীই ঢুকবে, অথবা গ্রাম থেকে বেরোবে, সে মানুষই হোক, বা কুকুর বেড়ালই হোক, তারই শরীর থেকে মাথার ওজন কমিয়ে দেওয়া হবে। তুমি বলবে বীভৎস। তুমি বলবে জংলী বর্বরতা। কে জানাবে, পিছিয়েপড়া আদিম লোকবিশ্বাসে জীবন আর মরণ কতো ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। কে জানাবে, কোন বিচারে মৃত্যুকে বরণ করা হয় জীবন সৃষ্টিরই আদিম তাগিদে? জানি, তোমার সভ্য, সংস্কৃত রুচিতে এটা কিছুতেই মানা সম্ভব নয়। মৃত্যু দিয়ে জীবন পুজো? 'মরণ বলে আমি তোমার জীবনতরী বাই।' কেউ কখনো শুনেছে? আমাদের সভ্য পৃথিবীতে, আমাদের দিল্লী, কোলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে মানুষ আবার কখনো মানুষকে মারে? অমন নৃশংসভাবে?

মেয়ে দুটি গ্রামে পৌঁছুলো না। তাদের পড়াশোনা করে বড়ো হবার, ফুটে ওঠার বাসনা হঠাৎই এক সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে দু-টুকরো হয়ে গেলো। সে তো গেলো। সে তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিকই যদি না হবে, তো এমন ঘটনা নিয়ে কোনো তোলপাড় জাগালো না কেন? কেন খবরের কাগজে খবরটি পৌঁছুলো প্রায় দু'মাস পরে? স্বীকৃত সরকারী সূত্রে নয়। স্বীকৃতি বিহীন ফেডারেল গভর্ণমেন্টের সূত্রে। এবং ছাপা হলো কাগজের একেবারে কোণ ঘেঁষে। এবং সেই খবরে কারোই কোন চাঞ্চল্য দেখা গেলো না। আমরাও তাই খবরটিকে 'ফাইল' করে ফেলতে পারি, নিছক দৈনন্দিন হিসেবে। আমার শুধু ছোট্ট একটা প্রশ্ন, একটু জানার ইচ্ছে—যারা ঐ অস্পষ্ট লৌকিক অন্ধকারে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মেয়ে দু'টির ঘাড়ে, তাদের চোখে কি জিঘাংসা ছিলো? না-কি, ছিলো ব্রতপালনের স্নিগ্ধতা। কে জানাবে?

তাই বলছিলাম, বড়োই জটিল, বড়োই বহুমাত্রিক মানুষের বিপন্নতার গতি-প্রকৃতি।

খবরের কাগজে একেবারে কোণ ঘেঁষে ছাপা হয়েছে খবরটি। বিলম্বে প্রাপ্ত, বলা যাক, বে-সরকারী সূত্রে। আর সেই কাগজেই ঐ একই তারিখে, কাগজের বুক জুড়ে ফলাও করে ছাপা হয়েছে দুটি প্রধান খবর—যা কিনা সাঁড়াশীর দুই ফলার মতো, ধীরে ধীরে চেপে আসছে—এই শহরের কয়েকশো মানুষের গলায়। আর, খেয়াল রেখো—এ কোন পুরানো কালের ঘটনা নয়। একেবারেই হালের। একেবারে নব্বই-এর দশকের ঘটনা এটা। অর্থাৎ কিনা, উপজাতি সমাজে নৃমুণ্ড শিকারের যে ঐতিহ্য পঞ্চাশ ষাট বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে তুমি জানতে, সেখানে ব্রতপালনের অঙ্গ হিসাবে মানুষের মাথা কেটে নেওয়ার মতো ঘটনা এই আজও ঘটে। ঘটে সভ্যতার ইলেকট্রিসিটি পৌঁছে যাওয়া এক গ্রামে। সভ্যতার বিদ্যুতের সঙ্গে উপজাতীয় আদিম বিশ্বাসের এই যে সমঝোতা, জুমচাষের অর্থনীতির কাঁধে চেপে বসা এই যে আধুনিক ভোগ্য পণ্যের বাজারী ব্যবস্থা, এর ভিতরেই রয়েছে সেই সংঘর্ষের বীজ—যা কিনা রূপ নিয়েছে এক সর্বগ্রাসী আতঙ্কে—যে আতঙ্ক গ্রাস করেছে এই শহরের কয়েকশো সমতল-আগত মানুষকে। যারা এই উপজাতীয় বিশ্বাস ও জীবনধারাকে দেখতে চায় নিজেদের সংহত আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থার চশমা দিয়ে। নাক সিঁটকানো মানসিকতা নিয়ে। ভারতীয়ত্বের ঔপনিবেশিক অহংকার নিয়ে।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে জুড়ে দিলেও এই পাহাড়ী রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের ভারতীয় ভাবেনি কখনো। ভারতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে এদের কখনোই সাংস্কৃতিক বা সামাজিক যোগাযোগ ছিলো না। তাই ভারতের সীমানা থেকে, ভারতীয়ত্বের বেড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার অদম্য ইচ্ছায় তাদের মধ্যে জেগেছিলো বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহ চাপা পড়লো ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বুটের তলায়। ভারতীয় অর্থকোষের টোপ গেলানো বদান্যতায়। উনিশশো ষাট সনে আলাদা রাজ্য হলো নাগাল্যাণ্ড। নিজেদের সরকার বানালো নিজেরা। উন্নয়নের বরাদ্দ অর্থ, মন্ত্রী-আমলা-ঠিকাদার হয়ে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছিটেফোঁটায় গিয়ে পৌঁছুলো প্রত্যন্ত গ্রামে। আধুনিকতার ঝলমলানিতে চোখ ধাঁধালো অনেকের। অত্যাধুনিকতার লেজ ধরে, ড্রাগস্ এলো। পর্ণো এলো।

বিদ্রোহ অবদমিত হলো। কিন্তু ভারতীয়ত্ব এলো না। বাইরে থাকলো ভারতীয় আইন-কানুন-কার্য্যব্যবস্থার সঙ্গে যখন-যতটা সম্ভব মানিয়ে চলার চেষ্টা, অন্যদিকে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতি সসম্ভ্রম, কিন্তু প্রায়শই নিষ্ক্রিয় সমর্থন।

বিদ্রোহ অবদমিত হলো। কিন্তু মুছে গেলো না। উগ্রপন্থার চেহারা নিয়ে সরে গেলো আরাকানের জঙ্গলে। সরে গেলো মাটির তলায়। সেখান থেকে প্রতিনিয়ত আঘাত হানতে থাকলো ভারতীয় কর্তৃত্বের মুখে। আজ উখরুলে, কাল সেনাপতিতে, পরশু চজোবা কিংবা চিজামী-তে। তোমার সেনাবাহিনীকে

সারাক্ষণ সজাগ টহল দিতে হয়। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের ভিতরে ক্যাম্প বসিয়েছে তোমার সুশিক্ষিত সৈন্যদল। তবু যখন তখন, যেখানে সেখানে, এম্বুশ হয়ে যায়। তোমার নাকের ডগা দিয়ে কোটি টাকা লুট হয়ে যায়। তড়াক করে জেগে ওঠে তোমার পুলিশ মিলিটারী। চোখের পিঁচুটি মুছে, প্যান্টের বোতাম এঁটে, বুটের খচ্‌মচ শব্দ তুলে বেরিয়ে আসে। শুরু হয় চিরুনী তল্লাসী। গ্রামের পর গ্রাম ঘরের পর ঘর জুড়ে চলে অভিযান। কাঠের থালাবাসন ভাঙ্গে। কাচের চুড়ি ভাঙ্গে, কুমারীর যৌবন ভাঙ্গে। বালকের সারল্য ভাঙ্গে। ভেঙ্গে যায় পাহাড়ী স্তব্ধতা। ভেঙ্গে খানখান হয় ভারতীয় মহানতার চিত্রকল্প। এতগুলো দশক জুড়ে এই যে লড়াইয়ের পরম্পরা চলছে, জ্ঞাতসারে, কিংবা নিতান্ত বাধ্য না হলে কিন্তু কখনোই উগ্রপন্থীরা হাত তোলে নি কোনো সাধারণ নাগরিকের গায়ে, ভারতীয় বলে এমন কি যাদের তারা দেখে আসছে এক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে।

এখন সেই উগ্রপন্থী সংগঠন জানিয়েছে, জানিয়েছে যে, এখন থেকে তারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতীয় নাগরিকদের গায়েও হাত দেবে। জানিয়েছে যে—এটা করতে হচ্ছে বলে তারা আন্তরিক দু:খিত। কিন্তু যেহেতু ভারতীয় সৈন্যরা উপজাতীয় নাগরিকদের ওপর অত্যাচার চালাতে তিলমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, এখন থেকে তারাও বিবেকের দংশন হজম করে তাই করবে, যা করা থেকে গত চল্লিশটি বছর তারা বিরত থেকেছে পবিত্র মানবিক দায়িত্ব জ্ঞানে।

আর, এটাই হচ্ছে আমাদের শুরুতে জানানো সেই আতঙ্কের সাঁড়াশীর একটি মুখ। এই নাগাল্যাণ্ডে অমন ভারতীয় কত হাজার রয়েছে কে জানে! আর উগ্রপন্থী এই সংগঠনটি যে কথা রাখতে অভ্যস্ত, তা কে না জানে? কিন্তু এ-তো সাঁড়াশীর একটি দাঁত। এসো, এবার অন্য দাঁতটির তীক্ষ্ণতাও একটু পরখ করে দেখি।

তোমার আমার সমাজ হচ্ছে উন্নত অর্থনীতির সমাজ। ঘরে ঘরে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। চাকরী, ব্যবসা যা-ই চাও সব যেন হাতের মুঠো থেকে ফস্কে যায় খালি। তো করবেটা কী? ছড়িয়ে পড়ো সবুজ ঘাসের সন্ধানে। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ, স্কুলের মাষ্টারীর চাকরী তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। অফিস আদালতের চেয়ার খালি পড়ে আছে করে তুমি আসবে তার প্রতীক্ষায়। কিন্তু কাকে ধরে পৌঁছুবে সেখানে? ও হ্যাঁ, আমার তো পিসতুতো দাদার খুড়শ্বশুর রয়েছেন মোককচং-এ, আমার তো নিজের কাকাই ইণ্ডাস্ট্রীর জয়েন্ট ডিরেক্টার। আমার নিজের অবশ্য কেউ নেই, তবে পাশের বাড়ীর অমুক মেশোর তমুক রয়েছেন কোহিমায়, আণ্ডার সেক্রেটারী। ব্যাস, দলে দলে তল্পিতল্পা বেঁধে চলো ডিমাপুর। নয় মরিয়াণী। পাস বানাও। চলে যাও গন্তব্যে। কদিন লজ্জার মাথা খেয়ে কারো ঘাড়ে চেপে থাকো। তারপর ঢুকে যাও কোনো না কোনো অফিসে অথবা মাষ্টারীতে। ট্যুইশনি আছে। এটা সেটা আছে। ভালোই পুষিয়ে যাবে। তারপর বিয়ে করো বাচ্চাকাচ্চা হোক। ব্যাংকে জমুক টাকা। আস্তে আস্তে জমি কেনো বাড়ী করো। গোটা দু'টো প্রমোশন। বুড়ো বয়সে মোটা মোটা অবসর ভাতা নিয়ে বিদেয় হও। কার কী বলার আছে। এটা তো ভারতবর্ষই ভারতের যে কোনো জায়গাতেই চাকুরী করার অধিকার রয়েছে আমার। তাই করছিও। কিন্তু এই ভারত নামক দেশটা যে এদিকে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে মাটির ছেলের দাবীতে? এখানেও সেটা হতে দেরী কেন? হয়েও গেলো তাই। আরেকটি সংগঠন, গতিবিধি যার গোপন, জানালো যে, সমস্ত এডহক অস্থায়ী, সাময়িক ভিত্তিতে থাকা বহিরাগত চাকুরীজীবীদের অবিলম্বে তাড়াতে হবে চাকুরী থেকে। শুধু তাই নয়। স্থায়ী ভিত্তিতেও এরপর থেকে আর কোনো বহিরাগতকেই নিয়োগ করা চলবে না।

একটি চাকুরী — বেঁচে থাকার একটি অবলম্বন। হয়তো বা তারো চেয়ে বেশী। অস্তিত্বের অভিজ্ঞান যেন। কত স্বপ্ন গড়ে ওঠে ঐ একটি চাকুরীকে জড়িয়ে। হঠাৎ কুঠারাঘাতে ভেঙ্গে পড়লো স্বপ্নের ভিত। অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে, চোখ কোটরগত, গাল চুপসানো, বেকারীর অসহ্য গ্লানি সয়ে সয়ে একদিন আলাদীনের প্রদীপের হাতে এসে গিয়েছিলো একটি চাকুরী। সামান্য থিতু হয়ে বসতে না বসতেই সেই সব যুবকের চোখের সামনে হঠাৎই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো আকাশ। চোখে ঘনালো দুশ্চিন্তার মেঘ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জাগলো আর অনিশ্চয়তা। আতঙ্ক গ্রাস করলো তাদের আপাদমস্তক। বিপন্নতার গহীন গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তারা অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়ে থাকলো বিশ্বসংসারের দিকে। এভাবেই প্রকট হলো কাহিনীর শুরুতে জানানো সেই আতঙ্কের আরেকটি দাঁত।

একই দিনের কাগজে ছাপা হলো খবর দু'টি। স্থানীয় পত্রিকা। পাতা জুড়ে টেণ্ডারের বিজ্ঞপ্তি

অথবা স্টেট লটারীর ফলাফল। আর তারই ফাঁকে ফোকরে এপাড়া ওপাড়ার টুকরো খবর। আর যেহেতু এটা এই পাহাড়ী রাজ্যের রাজধানী শহর, তাই কিছু রাজনৈতিক টুকিটাকিও থাকে বৈকি। থাকে ঝালমশলারও যথেষ্ট জোগান। তা কিনে আর কে পড়ে ? বিশেষ করে আমরা, ভারতীয়রা, এই রাজ্যের মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, সমাজ বা রাজনীতির সঙ্গে যাদের নেই কোনো নাড়ীর যোগ। ঐ, কখনো অফিসে কখনো সহকর্মীর টেবিলে পড়ে থাকতে দেখলে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া। রাস্তায়, হকারের হাতেই, হেডলাইনটায় এক নজর। ঐ রকমই কারো কারো চোখ পড়েছিল খবর দুটির দিকে। ঘোলাটে রঙের ডিমাই কাগজে খাটো মানের হরফে ছাপা হেডলাইন দু'টোর দিকে। আর অমনি চোখ চুম্বকের মতো আটকে গেলো যেন। চোখ কচলে আবার দেখতে যায় কেউ কেউ। কিন্তু দশা এমনি, খবরটা যে দশজনের সামনে বসে প্রকাশ্যে পড়ব তাতেও অস্বস্তি। পড়তে হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে। ট্যারা চোখে। কাকে বিশ্বাস করবো। তিরিশ-চল্লিশ বছর পাশাপাশি থেকেও, একই অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করেও, এতদিনে এই বিশ্বাসটুকুই গড়ে উঠলো না যে, তলায় তলায় একটা বিভাজনের খাদ যে গেছে না কিছুতেই। ওদের নাকের ডগায় বসে, ওদের চোখের সামনে পড়বো, ওদেরই মানুষে তৈরী সংগঠনগুলোর সিদ্ধান্তের খবর, যে সিদ্ধান্ত কিনা আমারই অস্তিত্বে কোপ মারবে বলে কুড়ুল শানাচ্ছে পাহাড়ের পাথরে পাথরে ! লুকিয়ে-চুরিয়ে নিষিদ্ধ পত্রিকা পড়ার মতো করে খবরটা পড়লো কেউ কেউ। তারপর যেন কিছুই জানি না, আমি কিছুই শুনিনি—এমনি মুখ করে যন্ত্রের মতো কাজ করে গেলো বাকী দিন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ যখনই মনের মধ্যে উঁকি দিলো খবরের কোনো একটা অংশ, একটি শব্দ বা একটি লাইন, পাহাড় খসা পাথর গড়িয়ে পড়ার মতো গুমগুম শব্দ উঠলো বুকের মধ্যে। বাইরে তবু কেউ তা জানতে দিলো না। অফিস শেষ হলে ক্লান্ত বলদের মতো মাথা নুইয়ে বাড়ী ফিরলো। আর ঘরে ঘরে, সন্ত্রস্ত চাপা স্বরে শুরু হলো জল্পনাকল্পনা। পুরুষেরা কপাল কুঁচকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলো খবর দুটির। মহিলারা মুখ শাদা করে, বাচ্চারা কিছুই না বুঝে ফ্যালফ্যাল চোখে শুনে গেলো সেই বিশ্লেষণ। আর এভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো পাড়ায়-পাড়ায়, ঘরে-ঘরে, হৃদয়ে-হৃদয়ে। পাথর গড়ানো শব্দে গুমগুম করে উঠলো। এই শহরের কয়েকশো মানুষের অভ্যন্তর।

এভাবেই শুরু হয়ে গেলো এক আতঙ্ক তাড়িত জীবনযাত্রার পালা। সর্বস্ব হারানোর অভিজ্ঞতা যাদের—নেই, তারা কি করে জানবে এই করাল ভয়াল বাস্তবের স্বরূপ, আর যাদের জীবন অন্তত: একবার সুযোগ দিয়েছে সেই ভয়ংকরকে অনুভব করবার, তারাই বা কী করে আরো একবার মুখ ঢোকাবে সেই হাঁ মুখগহ্বরে। এই দু:স্বপ্ন তাড়িত অবস্থাতেও কেউ কি হো: হো: করে হেসে উঠতে পারে ? "জানেন, আমার নিজের রাজ্য আসামে আমার চাকুরী হলো না — সন্দেহ ছিলো আমার ভারতীয়ত্বে। আর এখানে চাকুরী হারাতে বসেছি সেই ভারতীয় হবার অপরাধে। নিজের পরিচয় খুঁজেই বোধহয় এই জন্ম চলে যাবে।" কারো কারো আবার ভারতীয়ত্বের অহংকার উঠলো মাথাচাড়া দিয়ে। আরে মুর্খের দল ! আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে তোরা করবিটা কি ? অফিস কাছারী চালাবি তোরা ? তবেই তো হয়েছে। দেশটাকে যে তিনদিনে লাটে তুলে দিবি।' হায়রে অহংকার। বৃটিশরাও কি যাবার আগে ওরকম ভাবেনি ? 'মুর্খ নেটিভের দল, দেশ চালাবে তোমরা ? আমাদের মতো সুশিক্ষিত মেধা যে তোমরা চুরাশি জন্মেও পাবে না হে কালো চামড়ার হনুমানেরা।' বৃটিশরা তা ভাবলেও আমরা, ভারতীয়রা তা মেনে নিইনি। নিজেকে যারা পরাধীন, পদানত ভাবে, স্বাধীনতাকামী তারা কেউ কি অমন কথা মেনে নেয় ? কোনো দেশে, কোনো কালে ? কেউ কেউ আবার ভাবছিল দিল্লী থেকে ফৌজ পাঠাচ্ছেনা কেন সরকার। আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব কি দিল্লীর কাঁধেই ন্যস্ত নয়। আমরা, ভারতীয়রা যে আক্রান্ত এখানে ?

কিন্তু এখন শিয়রে শমন নিয়ে বেশী ভাবনা-চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণের সময় কোথায়? এখন তাই অন্যসব অহংকারী ভাবনা ছেড়ে ঠাণ্ডা মাথায় বসে সম্ভাব্য আঘাত সমূহের পরিমাপ অনুমান করাই জরুরি কাজ। চোখ বন্ধ করে বসে সবাই ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করে। একতো হল চাকরী খোয়ানোর ভয়, তার সাথে তো হানাহানি মারামারির সম্পর্ক নেই সরাসরি দেখাই যাক না, অফিস থেকে যদি বলে দেয় যে পথ দেখো তখন না হয় যা থাকে কপালে বোঁচকা কাঁধে হাঁটা দেবো। আর যদি অফিস থেকে কিছু নাও বলে—কেউ না কেউ তো এসে জানাবে যে বিদেয় হও, অন্তত: সময়টুকু তো পাওয়া যাবে, মানে মানে কেটে পড়ার। আর যদি এক্কেবারে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়েই তাড়ায় তাওতো আশারই কথা। প্রাণেতো মারবে না। অতো সাধ অতো স্বপ্নের একটা চাকরী-অস্তিত্বের শিকড়ের মতো—কেউ টেনে না ছাড়ালে

জোঁকের মতো আঁকড়ে না থেকে উপায় কোথায় ? কিন্তু পাশাপাশি অন্য ভাবনাটি মাথায় রেল ইঞ্জিনের সিটি বাজাচ্ছে। উগ্রপন্থীদেব আক্রমণ। শরীব থেকে মাথাব ওজন কমে যাবাব ভয়। সবাই ভাবতে থাকে কেমন করে রূপ নেবে সেটা। হঠাৎ এক রাতে এসে ঘবে ঢুকে মেশিনগান চালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে সবাইকে ? সবাইকে ডেকে নিয়ে যাবে কোনো বধ্য ভূমিতে সারিসাবি মেশিনগানেব সামনে, নাকি যখন যাকে যেখানে পাবে, পাঁচজন সাতজন করে ? সবকাব কি কববে তা হলে ? পুলিশ প্রশাসন ? অত্যন্ত ঘোলাটে, অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ঠেকে ভবিষ্যৎ। মনেব জোবে যাবা এই দুটো খববেরই তাৎপর্যকে খাটো করে দেখতে, দেখাতে চাইছে তাবা জানে যে ঐ সংগঠন দু'টি যদি আজকালেব মধ্যে কোনো আঘাত না-ও হানে, এক ব্যাপক অনিশ্চযতার সুযোগ নিয়ে সাধাবণ সমাজ বিবোধীবা হযতো কাল থেকেই কাজে নেমে পড়বে। সুতরাং আশাব ইঙ্গিত কোনো দিক থেকেই নেই। মানুষগুলো বুকেব ভেতব গুমগুম আওয়াজ শুনতে শুনতে বাজাব হাট কবে, ভযে গুটিযে থাকে অন্তবাত্মা, বাসে, অসাবধানে কোনো স্থানীয় লোকের পা মাড়িয়ে দিলে মাত্রাতিবিক্ত ভদ্রতায়—পাবলে যেন লোকটির পায়ে হাত বুলিযে মাফ চাইবে—এমনি বিগলিতও হয়ে পড়ে কেউ কেউ। যার পা মাড়ানো হলো সে যতই ব্যাপারটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বেহাই চায, সন্দেহ যায না। বাস থেকে নামলেই বুঝি ঘাড় ধববে কঁক্ করে।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, কিছুই ঘটে না। ষ্টেনগান উঁচিযে কেউ এসে দবজা ভাঙ্গে না। ডেকে নিযে যায না বধ্যভূমিতে, লোকেবা হাওযাব নাড়ি টিপে ধবে বসে থাকে। লক্ষ্মণ বুঝতে চেষ্টা করে, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। আব তখনই খবব বটে, অমুক পাড়ায় রাত্রিবেলা গাড়ী করে এসেছিলো। নোটিশ দিয়ে গেছে, ঘব প্রতি পাঁচ হাজাব টাকা দিতে হবে। 'সত্যি নাকি দাদা ?' এ ওকে জিজ্ঞেস করে। 'শুনলাম তো।' 'তা নোটিশ দিয়ে গেছে যখন, লোকে তো পুলিশে খবব দিতে পাবে' — 'দিয়েছে শুনলাম।' 'তাতে কী আর যায আসে।' হায, এযে আবেক বিপদ। কোথায় পাবো পাঁচ হাজার টাকা। যদি সত্যিই এসে চায ? টাকাটা দিযে দিতে পাবলে তো প্রাণটা বাঁচতো। একদিন যায়, দু-দিন যায, পাকা খবব আসে। হ্যাঁ, পুলিশ মোতাযেন কবেছিলো সবকাব। পুলিশেব নাকেব ডগা দিযে এসে নিযে গেছে টাকা। ভযে ভযে সবাই দিযে দিযেছে। কেউ কোন ট্যা-ফোঁ কবেনি। আব হ্যাঁ, টাকাব বসিদও দিযে গেছে। সীল আছে। সইও আছে।

লোকেদেব মুখে আব কথা ফোটে না। কেউ কেউ আগে থেকে টাকা জোগাড় কবে এনে ঘবে বাখে ; বলা তো যায না। যদি সময না দেয ? পাহাড়েব আড়ালে রাত নামে, লোকেবা ঘবে ঘবে থম মেবে বসে থাকে। নিশ্বাসেব শব্দও চেপে বাখতে হয, পাছে দবজাব বাইবে অন্য কাবো নিশ্বাসেব শব্দ টেব পেতে অসুবিধা হয। গাড়ীব শব্দে, কুকুবেব ডাকে, হৃদপিণ্ডে তুফান ওঠে। এলো বুঝি। ঐ এলো বুঝি ? স্নাযুব চাপ অসহ্য হযে উঠলে একসময ডাক ছেড়ে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয। চেঁচিযে বলতে ইচ্ছে করে—ওহে, এসো! এসে আমাকে বেহাই দাও। মুক্তি দাও আমাকে। এত দেবী কবছো কেন ? আব যে পাবি না। পাড়াপড়শী কেউ এসে দবজায টোকা দিলে ঘরেব দেয়াল ঘড়িও যেন হঠাৎ চুপ করে যায। বাব বাব জিজ্ঞেস করে, ফুটো দিযে ভালো কবে দেখে তাবপব দবজা খোলে। একটি রাত কাটে, যেন এক নবজন্মেব পুলক জাগে শবীবে। কিন্তু তাবপবই আবাব ছাযা ঘনায। আবাব যে বাত নামবে ?

যেমন হয়, এইসব পরিস্থিতিতে, এই শহবেও তেমনি, এই আতঙ্কেব অবসবে গুজবেব বমবমা ফলন। নিত্য নতুন গুজব ছড়ায। তমুকের ছেলেকে উঠিযে নিযে গেছে স্কুল থেকে। এখনো ফেরেনি। মাযেরা ছেলে-মেযেকে স্কুলে পাঠাতে সাহস পান না। বা, খোঁজ নেন, অমুক বাড়ীব মিসেস তমুক বাচ্চাকে স্কুলে পাঠিযেছেন কিনা। খবব এলো, না। মিসেস তমুক জানিযেছেন বাচ্চাব জ্বব হযেছে। স্কুলে যাবে না আজ। অমনি সন্দেহ ঘনায। জ্বব ! কাল বিকেলেই না দেখলাম খেলে গেলো আমাদের উঠানে সাবা বিকেল ? না ভাই, কাজ নেই ছেলেকে আজ স্কুলে পাঠিযে। সে না হয হলো। কিন্তু তুমি নিজে তো অফিস কামাই কবে বসে থাকতে পাবো না। যা না করলেই নয, অফিস-কাছাবী, বাজাব হাটে যেতেই যখন হবে তখন কী আব কবা। ভযে ভযে, সাবধানে চাবদিক দেখেশুনে পা ফেলো। বিপদ যদি হুমড়ি খেয়ে ঘাড়েব ওপব পড়েই যায, সে তখন দেখা যাবে। দু:স্বপ্ন তাড়িত রাত কাটে। অবসাদগ্রস্ত তোমাকে জেগে উঠতে হয়। মনের ভেতব উঁকি দেয নানা দুশ্চিন্তা। কপালেব ভাঁজ গুনতে গুনতে তুমি অন্যমনস্কের মতো দাঁড়ি কামাও। প্রাত:কৃত্য শেষ কবে করে ধীবে ধীবে প্রস্তুত হও। অফিসে যেতে হবে। এমন সময় তোমাব স্ত্রী এসে ভয জড়ানো শুকনো গলায বলে ওঠেন—ওগো শুনছো ? — 'কী?' — 'ঐ ত দেখো না অমুকদেব বাড়ীর চাকবটা সকালে বেবিযেছিলো দুধ আনতে। দৌড়ে পালিযে

এসেছে। রাস্তায় নাকি কারা সব বুকে লাল ব্যাজ লাগিয়ে কী সব চেক করছে?' কপালের ভাঁজ গভীর হলো তোমার। কী হতে পারে? পাশের বাড়ীর চাকরটা নেপালী। চারদিকের খবর শুনে বেচারী প্রাণের ভয়ে দিনের মধ্যে দশবার চাকুরী ছাড়ছে, আর দেশে পালাতে চাইছে। ও হয়তো একটু বেশী ভয় পায় বলে রজ্জুতে সাপ দেখছে। কিন্তু রজ্জুই বা কেন? কী হতে পারে আজ? রেডিয়োতে বলেছে কিছু? ও হ্যাঁ। তোমার মনে পড়তে পারে। আজ কীসের যেন মিছিল বেরোবে একটা। কীসের মিছিল? কাদের মিছিল? ঠিক খেয়াল নেই তোমার। কিন্তু তার সাথে লাল ব্যাজের কী সম্পর্ক। আর চেক করারই বা কী? এক হতে পারে, এখানকার ছাত্ররা মাঝে মাঝেই বাইরের লোকদের পাস চেক করে। বি ই এফ আর নামক আইনের ব্যাপার। এই পাহাড়ী রাজ্যের মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ যাতে বাইরের লোকের অবাধ অনুপ্রবেশে বিঘ্নিত না হয় তার ব্যবস্থা। তেমন কিছু কি? হতেও পারে। তবে তাতে আর ভয়ের কী আছে? তোমার পাস তো তুমি পকেটে করে বয়ে বেড়াও। এইসব যখন ভাবছো তুমি, তোমার স্ত্রী তোমাকে তড়বড়িয়ে বলে যাচ্ছেন অনেক কিছু। শেষ কথাগুলোই কানে গেলো তোমার—'আজ আর কাজ নেই অফিসে যাবার, ছুটি নিয়ে নাও।' তুমি কি করে বোঝাবে যে অমন হুট করে ছুটি নেবার কোনো উপায় নেই তোমার। তাছাড়া ভয়কাতুরে ছেলেটি কী দেখতে কী দেখছে কে জানে। তবে মুখে যাই বলো, মনে মনে তোমারও ঘাম ফোটে। যা অবস্থা চারদিকের, কোন স্ফুলিঙ্গ থেকে কোন দাবানল ছড়ায় কে বলতে পারে। কি হচ্ছে রাস্তায় সেটা ঠিকঠাক জানতে না পারলে স্বস্তি আসবে না তোমার। স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললে—'আরো লোক তো আছে রাস্তায় যদি কিছু হয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

এইভাবে দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে পথে নামতে হয় তোমাকে। চারদিক দেখে শুনে এগোও। কোনো অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে কি? ভালো করে দেখতে তুমি, চেনা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খেতে চাও। ঝলমলে রোদ পড়ছে রাস্তায়। নিত্যদিনের মতোই রাস্তায় নানা লোকের ভীড়। কলকল করে তোমার পাশ দিয়ে ঝরণার মতো চলে গেলো একদল স্কুলের ছাত্রী। না:. সবই তো ঠিক আছে দেখছি। পানের খিলি মুখে নিয়ে পথে নামতেই তোমার মুখোমুখি দুটি ফুটফুটে তরুণী। হাতে কিছু সাদা-লাল-হলুদ ব্যাজ। ওদেরই বুকে সাঁটা ব্যাজ থেকে পড়লে তুমি—রেংমা ইউথ এসোসিয়েশনের কিছু একটা অনুষ্ঠান চলবে এক সপ্তাহ জুড়ে। যেমন এখানকার রেওয়াজ, মেয়েদের একজন তোমারও বুকে পরিয়ে দিলো একটি ব্যাজ। বিনিময়ে পকেটে হাত দিয়ে যা হাতে ঠেকলো এক টাকা কি দু'টাকা—হাতে ধরিয়ে দিতেই সূর্যোদয়ের মতো ঝিলিমিলি হেসে মেয়ে দুটি চলে গেলো। ও হরি। এই তাহলে ব্যাপার। আর এটাকেই কিনা সাত রকমের রং চড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যা খুশী বলে ভয়ের ফোয়ারা ছুটিয়েছে ছেলেটি। ভয়ের কাছে কতোরকমেই যে নাস্তানাবুদ হতে হয় মানুষকে! মনে মনে সাহসও পেলে। এভাবেই, ভয়ের ঠিক মুখোমুখি হয়েই যাচাই করতে পারার সাহসটুকু যদি সবার থাকতো! ভাবলে তুমি। বাসে উঠে বসার মতো একটা জায়গা পেয়ে যাওয়া বড়োই ভাগ্যের ব্যাপার। বসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয় তোমার। কণ্ডাক্টর এগিয়ে এলে ভাড়া মিটিয়ে নিত্যকার অভ্যাসমতো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছো তুমি। কত যে আশকথা পাশকথা মনে আসে। মাঝে মাঝে স্টপেজ আসে। যাত্রীদের নামা ওঠা। হঠাৎই তোমার খেয়াল হয়, বাসটা যেন অনেকক্ষণ থেমে আছে। কী ব্যাপার? অন্যমনস্কতার গভীর থেকে ধীরে ধীরে পরিপার্শ্বের মধ্যে জেগে ওঠো তুমি। সামনের দিকে চোখ গেলো। সার দিয়ে থেমে আছে আরো অনেক বাস, ট্যাক্সি, জীপ। কী ব্যাপার? বুকের ভেতর গুমগুম শব্দটা একবার যেন শুনলে তুমি। কান খাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করলে ব্যাপারটা। তবে কি শুরু হয়ে গেলো? যা হবার কথা ছিলো। সামনেই কী বধ্যভূমি? বাস থেকে টেনে টেনে নামানো হচ্ছে এক এক করে, আর তারপরই —! কিন্তু আশপাশের বসে থাকা, দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা রাস্তার পদযাত্রী কারো চোখ মুখ দেখে তো তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বাসের লোকেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। ইঞ্জিনের শব্দে সব ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তবু তুমি যেন শুনলে, কেউ বললো পিছন থেকে, মিছিল আসছে একটা। হ্যাঁ। তোমারও মনে পড়বে, একটা মিছিলের খবর তুমিও যেন শুনেছিলে। কীসের মিছিল? কাদের মিছিল? কিন্তু ততক্ষণে, আগে আগে দু'চারজন পুলিশ, আর তারপরই দুই নাগা তরুণীর হাতে ধরে থাকা বড়োসড়ো ফেষ্টুনটা নজরে আসে তোমার। বড়ো শাদা কাপড়ে লাল রক্তের অক্ষরে অক্ষরে ইংরেজীতে ফুটে উঠেছে একটি লেখা—যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—'আমরা ধিক্কার জানাই—নাগা রমণীকে ধর্ষণের'। নীচে ডান কোণ ঘেঁষে সংক্ষেপে সেই সংগঠনটির নাম—যারা এই মিছিলের আয়োজন

করেছে। পড়লে তুমি, পশ্চিম আঙ্গামী মাতৃ সংস্থা। মায়েদেব একটি সংগঠন। কে কাকে ধর্ষণ করলো? কোথায়? বাসেব ইঞ্জিন বন্ধ। কথাবার্তা কিছু কিছু কানে আসছে এখন। লোকেদের মুখ থেকেই জানলে তুমি, ক্ষেতেব কাজ সেরে বাড়ী ফিবছিলো এক প্রৌঢ়া নাগা বমণী। হঠাৎ তাকেই জাপটে ধবলো আধাসামবিক বাহিনীর মদমত্ত এক জওয়ান। উগ্রপন্থাব মোকাবিলাব জন্য যাবা দূবান্তবে গিযে ক্যাম্প বসিযেছে। ভারত সরকাবেব সামবিক প্রতিনিধি যারা এই সীমান্ত বাজ্যে। ততক্ষণে মিছিল এগিযে এসেছে। দু'জন-দু'জন কবে সাব দিযে শুধুই মেযেদেব এক দীর্ঘ মিছিল। মুখে তাদেব শব্দ নেই। শ্লোগান নেই। হাত পা ছোঁড়া নেই। সব শব্দ, সমস্ত কান্না, গলাচেবা আর্তনাদ হযে ফুটে উঠেছে প্ল্যাকার্ডে, ফেষ্টুনে। 'নাগা বমণী ভোগ্যপণ্য নয'। 'ধর্ষণকাবীব স্থান নেই নাগা সমাজে'। 'ধর্ষণকাবীব কড়া শাস্তি চাই।' 'ধর্ষণকাবী সেনাবাহিনীকে দূব হঠাও।'

মিছিল দেখছিলে তুমি। মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়া, কিন্তু একটি চুল পেকে না যাওযা বৃদ্ধা থেকে শুরু কবে উজ্জ্বল চোখেব যুবতী, সতেজ কিশোবী, এমনকি, দেখো দেখো পিঠে পুতুল বেঁধে একটি তিন-চাব বছবেব শিশুও, হযতো মাযেরই পাশেপাশে, পা ফেলছে। পাযে পাযে পিছিযে যাচ্ছে, আবাব দু'তিন পা দৌড়ে এসে তাল রাখছে। আসছে তো আসছেই মিছিল। শেষ নেই যেন।

মিছিল দেখে দেখে, এবং মনে পুবো ঘটনাটা কল্পনা কবতে পেবে, এখন তোমাব ভেতবেও ঘনীভূত ঘৃণাব বাৰুদে অগ্নিসংযোগ ঘটছে যেন। তোমাব ইচ্ছে হয তীব্র ধিক্কাবে প্রতিবাদ জানাতে। ক্রুদ্ধ হও তুমি। এক বিগত-যৌবনাবও নিস্তাব নেই মানুষেব মদমত্ত লালসাব হাত থেকে। আশ্চর্য! কত শত বছবেব সভ্যতা সংস্কৃতিব পবেও, আজ অবধি এই পৃথিবীতে আমবা নাবীকে তাব পূর্ণ মানবিক মর্যাদাটুকুও দিতে পাবছি না। এখনো নাবীকে দেখা হয ভোগ্যপণ্যৰূপে। সম্পদৰূপে। সম্পদের মতোই মানুষ কবাযত্ত কবতে চেযেছে নাবীকে। যুদ্ধেব বিজেতাবা বিজিত নগবীতে অবাধে লুণ্ঠন কবেছে ধন সম্পদেব সাথে নাবীকেও। ধর্ষণ কবেছে তাকে। ধবে নিযে গেছে ভোগহেতু। মনে পড়ছে কি, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে অর্জুনেব সেই তীব্র আপত্তি, যুদ্ধ নয়—যুদ্ধ হলে বর্ণসংকব হবে। ক্ষমতাবানেব ক্ষমতা বিস্তাবেব পথে কতবাব যে কত নাবীকে আত্মাহুতি দিতে হযেছে, কে জানাবে তাব পবিসংখ্যান।

বাস থেকে নেমে যাচ্ছে কেউ কেউ। মিছিল পাব হতে সময লাগবে। ততক্ষণে হযতো বা পৌঁছে যাওযা যাবে গন্তব্যেই। কেউ কেউ, যাদেব একটু দূবে যেতে হবে, বসে আছে চুপচাপ। কেউ কেউ ঘড়ি দেখছে বাব বাব। কেউ বা মেনেই নিযেছে বিলম্ব। বেশ সাবলীল হযে বসে গল্পগাছা কবছে সহযাত্রীব সঙ্গে। তাদেব কথাবার্তাব টুকবো টাকবা কখনো কখনো কানে আসছে তোমাব। তুমি কিন্তু খুব স্বাভাবিক হযে বসতে পাবছো না। তুমি জানো তোমাব উপব ঝুলে থাকা বিপন্নতাব খাড়া। তাই তুমি আড়ষ্ট বড়ো। কষ্টসাধ্য এক স্বাভাবিকতা তোমাব মুখভঙ্গীতে ঝুলে থাকলেও। ঐ বকম সমযেই একটি কথা কানে এলো তোমার। ইংবেজীতে কেউ কাউকে বললো কথাটা। বড়ো ধাবালো অর্থ কথাটিব। আড়ষ্ট এবং এই বিপন্ন সমযে এতই কন্টকিত তুমি যে, মুখ ফিবিযে দেখতেও পাবছো না কথাটি কাব মুখনিসৃত। অথচ এটা জানতে পাবা ভীষণ জৰুবী— 'আমবা তো ওদেব কাছে, নিছক ভোগ্যপণ্য'— এই কথাটিই বলেছে কেউ একজন। কথাটিব অর্থোদ্ধারেব জন্যই তোমাব জানা প্রয়োজন 'আমবা' বলতে সে কোন পবিচিতিকে সনাক্ত কবছে। সে যদি এই বাজ্যের লোক হয, তাহলে 'ওদেব' বলতেই বা সে কাদেব বোঝাচ্ছে? সামবিক বাহিনীকে? নাকি তোমাকে আমাকে? অর্থাৎ আমরা যাবা বাইবে থেকে আসা। অর্থাৎ কিনা, ওদেব ভাষায আমবা যাবা ভাবতীয। আবাবও পাথব খসে পড়াব শব্দ ওঠে তোমাব অভ্যন্তবে। আশ্বস্ত হবার কোনো উপায নেই যে তোমার। যেন অখণ্ড মনযোগে জানালার কাঁচটিকে পবখ কবছো, এমনি ভাণ কবে তুমি নিজেকে লুপ্ত কবে ফেলতে চাইছো। তোমাব পাশে বসে থাকা লোকটিও নাগা। প্যান্টেব উপব জ্যাকেট পরে আছে। ও যদি এই মুহূর্তেই তোমাকে ঘাড় ধবে নামিয়ে দেয় বাস থেকে! নিযে দাঁড় কবিযে দেয় ঐ লাঞ্ছিত সম্ভ্রমেব মিছিলের মুখে। বলাৎকাবীরূপেই চিহ্নিত করে দেয তোমাকে?

কী কববে এবাব তুমি? বাস থেকে নেমে যাবে? তাতে কি পবিত্রাণ আছে? তাতে করে কি তুমি এই সামান্য আড়ালটুকুও হারিযে ফেলবে না! জানালার কাঁচে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষবে কী যেন লেখা রয়েছে। প্রস্তুতকারক কোম্পানীর নামটাম কিছু একটা হবে। যেন তাই দেখতে আবো ঝুঁকে পড়ো তুমি। অথচ তুমি তো প্রবল ঘৃণায ধিক্কার জানাতে চেয়েছো ঐ অপরাধী সৈনিককে? তুমিতো সমস্ত সততা নিয়েই চেঁচিয়ে গলা চিরে সবাইকে জানাতে চাও যে তোমারও ভেতরে পুঞ্জীভূত হয়েছে ক্রোধ। এখন

কি ধীরে ধীবে তোমার উপলব্ধিতে জাগছে ধর্ষণের নৈর্ব্যক্তিক একটি চেহারা ? খববের কাগজেব দৈনন্দিনতাকে অতিক্রম করে তুমি কি তার অন্যরূপটিও দেখতে পাচ্ছো—যা মূলত: জাতিধর্ম, ভাষা, বর্ণ কিংবা শ্রেণীর কাঠামোয় আশ্রিত ? তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কি ইতিহাসেব পাতা জোড়া ধাবমান অশ্বারোহীর দল। ক্ষমতার মদমত্ততা। বিজিত নগরীব ঘবে ঘবে আগুন দেওয়া। লুণ্ঠন, আর ধর্ষণ। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের, উপনিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানের এক অঙ্গ হিসেবে তুমি কি ধর্ষণের সেই রূপটিকে চিনতে পাবছো ? যখন এই অপরাধ আব ব্যক্তির মধ্যে সীমিত না থেকে পবিচিত হয়ে যায় এক সমষ্টিগত সংজ্ঞায় ? না হলে কেন আমাদের গণতান্ত্রিক সবকারের সৈন্যবাহিনীর অমন উন্মত্ত আচরণ দেখা যায় শুধু এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলেই, যেখানে ভারতীয়ত্ব বলতে গেলে এখনো প্রতিষ্ঠাই পায়নি যথাযথভাবে। না হলে কেন আমরা, এই ভারতীয়বা, আমাদেব মেযে, বৌ-রা কখনোই গিযে দাঁড়াতে পারলাম না ঐ মিছিলে, গত চার দশকের বহু বহু সুসংগঠিত ধর্ষণেব পবেও ? তাহলে কি সমষ্টিগত সংজ্ঞায় এই ধর্ষণ এক উপনিবেশীয় পরিচয় পেয়ে যাচ্ছে না ? এবং তুমি, আমি, আমরা সবাই কি আবশীতে ফুটে উঠতে দেখছি না আমাদের অহংকারী নির্লজ্জ ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী চেহারা ?

শুরু করেছিলাম এক ভয়াল হিম বিপন্নতার বেখাচিত্র অঙ্কনের প্রচেষ্টা দিয়ে। এগোতে এগোতে কত নতুন মাত্রাই না জুড়ে গেলো মানুষের বিপন্নতাব সংজ্ঞায়। কে যে কাব দ্বাবা আক্রান্ত তার ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে পড়ে গেলাম এক মিছিলের মুখোমুখি। আক্রান্ত মানুষেব নীরব প্রতিবাদের মিছিল। লাঞ্ছিত সম্ভ্রমেব মিছিল। যে মিছিলে আমাদেব মেযে-বৌদেরও সামিল হবার কথা ছিলো মানবিক অধিকাববোধে। গত চাবটি দশকেও আমরা পাবিনি ঐ মিছিলের সাথে আমাদেব সংহতি খুঁজে পেতে। আর আজ তাই আমরা সাবিবদ্ধ এক উপনিবেশবাদী, মদমত্ত আক্রমণকাবী পবিচযে। এইখানে, এই মিছিলেব মুখেই তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি, এই গল্পকাব, বিদায় নিলাম।

দুলাল ঘোষ

সমপরিমাণ মাটি

বিস্ফোবণেব আগে অনুমুহূর্তটি তবে কি ছিল ? সাধাবণত চলমান বলে থাকি আমবা । সম্মিলিত শবীরেব খসখস্ অতি সংবেদনশীল কানেব পর্দাতেই শুধু ধবা পড়ে । সম্মিলিত কোলাহল বলতে কি বিক্ষোভ মিছিল, মাইক, অডিটোবিযাম ইত্যাদিব কথা প্রচ্ছন্ন থাকে ? দিকে দিকে খোলা থাকে জানালা ? তাছাড়া আকাশেব নিচে মযদানে কি হয ? স্বাভাবিক কথাবার্তা । মুখেব সংখ্যা যত বেশিই হউক না কেন, এবং 'খুচবো খাচবা শব্দ', কানে তালা লাগে না । বিক্সা, টেম্পো টেক্সিব ভেঁপু ইত্যাদি স্মৃতি হযনি কখনও । শব্দ এবং সম্মিলিত শব্দের মধ্যে তবে কি কোনো পার্থক্য নেই ? তবে কি প্রকটযন্ত্র ছাড়া কর্ণমূলে কিছুই প্রবেশ কবে না আমাদের । স্মবণে থাকে না ! স্বাভাবিক প্রতিক্রিযা নিযে মাথা ঘামাই না আমরা যতক্ষণ না তা প্রকট হয । বিকট প্রতিক্রিয়াই বিস্ফোবণ । এবং ঠিক তাব পূর্ব মুহূর্তটিকে ধ্বনি দিয়ে বিশ্লেষণ কবা যাবে না । সেটি একটি সমান্তবাল দৃশ্য যা চোখে পড়ে অথচ স্মবণে থাকে না । এক্ষেত্রে আমাদেব ইন্দ্রিয চবিত্রগুলিও কেমন ধোঁযা ধোঁযা । সবই দেখছি আবাব কিছুই দেখছি না শুনছি না । তৎপববর্তী দৃশ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন এক টুকবো কাগজ, তখন পৎ পৎ কবছিল । এলিগেটবের হাঁ-এব মত মধ্য শূন্য । সর্বগ্রাসী । তাব ভাঙা কাঁচেব দাঁতেব পাটি আবো বিশ্রী প্রতিক্রিযা । তাছাড়া উপব দিকটা যেভাবে আবো উপবে উঠে ! অর্থাৎ সেই এবিযেল ডিসটেন্স থেকে দেখা নদীব পশ্চিম পাড়ে ছুটে ছুটে অগনিত অস্ফুট এস ও এস মুভি । নিচেব পাটি স্টিল পিচ্ছিল স্লিপাব । জি বি বাজাব ও তাব পলাযনপব মনোবৃত্তি সবই হুড়মুড়িযে পড়ছিল এখানে । বাস্তবিক ঘটনা ও ফটোগ্রাফি একই বিন্দুতে মিশে গিযেছিল কি ? তাবপব সেই ছবিগুলো থেকেই বস্তা বস্তা ধোঁযা আকাশটা কালো কবে দিচ্ছিল । যাব ফলশ্রুতি হল বাকদেব গন্ধ সঞ্জীবনীতে সম্বিৎ ফিবে পাওযা ।

আবাব বিস্ফোবণে যদি বিকট শব্দ হয এবং মেঘেব মত গুড় গুড় কবে ওঠে, আমরা যারা শ্রোতা অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষদর্শী, আজকাল বলি- আব ডি এক্স । পবে প্রত্যক্ষদর্শীদেবও বলতে শুনেছি— আবাব কী ! কেবলি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায যাবা, ওদেবও আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস কবে দেখেছি- -কেউ কোন উত্তব দিতে চাযনি । প্রত্যেকেবই ক্ষতস্থানে চোখ ও অশ্রু বোগ । থব থব কবে কাঁপছিলেন ওবা । এবপবও কি তথাকথিত প্রশ্নেব উত্তবগুলি ভুক্তভোগীদেব কাছ থেকেই জানতে হবে ! দুর্দশাব ছবি এঁকে এঁকে শিল্পকর্ম চলবে আর কতদিন ? যেখানে কার্যকাবণ শত্রুচিহ্নিত কাবণ সকলই ধোঁযা ধোঁযা । দু:খ বিলাসেব নাম দেওযা হয প্লেনচেট । আবো আবো ভুল ব্যাখ্যাব নাম ধনবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি । অথচ আত্ম বিশ্লেষণেই যেখানে যাবতীয সত্য মিলে । আমাদের বেদ উপনিষদ । স্বদেশী সবকিছুই কি পরিত্যাজ্য ? দেখতে হবে পেটেন্টটির সত্ব এখন কাব । ওনিযে আমেবিকাব সাথে আমাদেব কোনো বিবাদ আছে কি ? আমবাও বিশেষ সুবিধাভোগী দেশেব মর্যাদা চাই । এককালেব সাম্যবাদী চীন বাশিয়াবাই শুধু ভোগ করবে কেন ?

দুই

এখন উত্থিত ধূম্রকুণ্ডলীব বেগ ধীবে ধীবে স্তিমিত হযে এলে দেখা গেল জি টি চৌমুহনী একটি গহ্বর । এবং বাতাস যেভাবে হুড়মুড় কবে শূন্যস্থান পূবণ কবে, ঠিক সেভাবে না হলেও, পাতাল গঙ্গাব উপস্থিতি টেব পাওযা যাচ্ছে চুঁইযে চুঁইযে । চৌমুহনীতে এখন প্রকাশ্য দিবালোক ও অন্ধকাব দুইই বিবাজ করছে । বেলা বাবোটা পাঁচ দশ মিনিট হবে । গোবিন্দবল্লভপন্থ হাসপাতাল জন্মেব আগেও এখানে একটি

বাজার ছিল। আশেপাশে ছিল কবরখোলা, ভাল্লুকাটিলা। কর্তা ব্যক্তিদের দু'একটা দালান বাড়ি বাদ দিলে শুধুই টিলা টংকব, মাইট্যা ঘব এবং অবিন্যস্ত চুলেব মত ছনেব চালা মাঝে মাঝেই দেখা যেত। রাতের অন্ধকাবেও কাটাখালে ঝুপঝাপ মাছ ধরার শব্দ ও ভোরেব প্রথম আলো পড়ত চাষীব তালপাতাব ছাতায, তাবপব লুঙ্গা জমিতে। বন গযাম গাছেব গা ঝুমুব ঝুমুর জঙ্গল ছিল। ঠিক দুপুব বেলা সেখানে ভূতে মারত ঢেলা। হা হা হি হি।

ধীবে ধীরে সবই বদলে যেতে লাগল। ইদানিং বাজন্য চাবুকের শব্দ তেমন শোনা যায় না এদিকে। নূতন টাউনশিপের নাম হযেছে কুঞ্জবন। শুধুই সবকারি আবাসে আবাসে বন। বাবু বিবিদের পোশাক আশাক চালচলন হাবভাবই আলাদা। উনারা হাট বাজাবে এলে ড্যাব ড্যাব চোখে তাকিযে থাকতাম আমবা। তাবও আগে রাজবংশী কাবো কাবো সাথে হঠাৎ দেখা, বমজানেব চান দেখাব মত। সঙ্গে থাকত শংকব মাছের চাবুক!

তবে যেদিন থেকে ওদেব চোখেব কোণা ঠোঁটেব কোণা নিযে আলাপ আলোচনা শুরু কবে দিলাম আমবা, সেদিন থেকেই আবাব পুরণো ক্ষতে ব্যাথা বেদনা। যে ক্ষুধা পেটে ছিল উঠে এল শিবে। সারাক্ষণ কামড়ায়। ঘবের মাঝে আকাশ দেখি বেশি বেশি। পরেব জাযগা পবের জমি আমি ঘব বানাইয়া রই। রিফিউজি। ধ্বনিটি এমনভাবে মাথা চাড়া দিল। ওপাবেও তো ত্রিপুবাবই লোক ছিলাম গো আমরা! মাথা শিকাবিদেব তাড়া খাইয়া উপবে উইঠ্যা আইলাম। সর্বনাশ কবলাম পাইড়া ভাইদেব- অতটুক্ জাযগা, অতটুক্ জল, অতটুক্ জমি, অতটুক্ ফল পলক ফেলতেই ফুবাইল। পাহাড়তল ছাইড়া ওবা পলাইল আবো পাহাড়ে। এখন পাথর গড়াইয়া পড়তাছে নিচে। ভূমিকম্প হয। বোমা ফাটে।

জন সমাগমে একেকটি বিস্ফোরণ এবং তৎপববর্তী মুহূর্তগুলি অন্তত মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন হয তেমন নয়। এক্ষেত্রেও বীব পুঙ্গবদেরই পলাইতে দেখা যায-চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। হুল ফুল দুটিব অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্টই আছে। ফলে একেকটি বিস্ফোবণ এবং তৎপববর্তী দৃশ্যগুলি কি ইতব প্রাণীর মতই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয? হযত। ক্রমাগতই ছুটছে যে উদ্বাস্তুরা তাবা কতদূব গিয়ে থামে? আদৌ থামে কি! নাকি ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায, আর ওঠে না! বিষ বেদনা কম হযনা কিন্তু পিঁপড়েব কামড়ে। তবে তেড়ে এসে হুল আব পথের বাধা কামড়ে ধরা কি একই কথা হল? ঢোল নির্মাণে যখন কোটি কোটি শ্রমিক ব্যস্ত তখনই বিস্ফোবণ হলে যেভাবে ছিত্তুব বিত্তুব হয়ে পড়ে পিঁপড়েগুলো, পবিত্যক্ত হয় কর্মব্যস্ত প্রদেশ, ঠিক তেমনি আগবতলাব জি বি চৌমুহনিতে বোমা ফাটলে বোঝা গেল শব্দ দোষ কি এবং কেন? অবক্ষিত যত দোকান পাট, পার্কিং ভুলে টেম্পো টেক্সি, দু'একটি পবিত্যক্ত দবজা তখনও স্থির হতে পাবেনি। কথা বলতে বলতে সঞ্জয় হঠাৎই থেমে গেলে অসহিষ্ণু ধৃতবাষ্ট্র চিৎকাব কবে উঠলেন — তারপর কি?'

কিছু না। কেউ নেই এখানে। অন্তত: একটি পথেব কুকুরও খুঁজে পাওয়া যায কিনা দেখছি ইউরেকা! লোকটা হযত ছুটতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ে গিযেছিল। আব উঠে দাঁড়াতে পাবেনি বা সে ইচ্ছে নেই তাব।

তিন

আমার পুর্নজন্মের অধিকার আছে। কী বলেন জ্যাক দেরিদা! আমি কি শুধুই ইতিহাসেব অণুপরমাণুতে গড়া সমষ্টি মাত্র? আমাতে ঢিল ছুঁড়লেই গোবরে পোকার মত গুঁড়াগুঁড়া, মানুষের কানেব কাছে, মুখেব উপর ঘুর ঘুর করতে থাকি! অস্বস্তি! ত্রাহি ত্রাহি বব উঠে। দেবে অসুবে যুদ্ধ। ব্যাস ঐ পর্যন্তই। পরিণামে অশ্বডিম্ব আমার জানা আছে। একেকটি বিস্ফোবণ এবং সন্ত্রাস। পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে রোজই বোমা বৃষ্টি হয়, যখন তাদের ফাঁক ফোঁকব দিয়ে নি:শব্দ নদী বয়ে যায়! তাব রঙ দেখেছো তুমি?

আমি কি করে জানি স্থানীয় গড় আয়ু কত? জন্মিলে মরিতে হইবে পাঠটিতো বাল্যকালে শুনেছি। ভুলেও গেছি। তারপরও শুনেছি। তারপরও ভুলে যাই বলেই কি রমণী তুমি বিপরীতে থাকো? চরে খাওয়া মেঘ বা পাখি কেউই পালাতে পারে না কখনও। নাড়ির টান, যার নাম মাধ্যাকর্ষণ। মৃত্যুই জীবনকে গৃহবন্দী করে। মানুষের গড় আয়ু ও ঘর সম্বন্ধে জ্ঞান অঙ্কুরোদ্গমেই মেলে। তারজন্যে অধীত বিদ্যার দরকার নেই।

তবে কি ঘর মানেই হল বর্ম ? মৃত্যুভয় থেকে আপাত মুক্তির জন্য যদি ঘর দরকার, আয়ুষ্কাল যদি মোহে সুখে অতিক্রম করে যেতে হয় তবে দুর্যোগ, বন্য প্রাণী ও দুর্জনের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে ঘর চাই। সে আমাকে দেবে নির্মাণ সুখ, নিরাপত্তা ও শীতল মায়াজাল। কর্মব্যস্ততার ফলে ভয়ভীতির কথা সেখানে মনেই থাকে না। সীমিত দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে। সৃষ্টির নামে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ম দিতে পারে শুধু ঘর। সে জানে বাজার কতদূর, বাসস্টপ এবং শ্মশান। ঘরে থাকলে সমাজে শ্মশানবন্ধুও মিলে কেউ কেউ। গৃহীর শিল্পকর্ম যেন কনে দেখা হারমোনিয়ম।

তখন যে লোকটি ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল আর দাঁড়াতে পারেনি বা সাময়িক শয্যা নিয়েছিল যে, উঠে বসতে চাইছে এখন এবং দাঁড়াতে চাইছে, তারপর ছুটতেও চাইছে খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে, বিশেষ করে যার সামনে পেছনে অনুকরণীয় অনুসরণীয় কেউ নেই কিছু নেই। বরং নিজের পশ্চাৎ দেশটাকেই স্বতন্ত্র ঠেকছে। সেখানে একটি গুলি এসে পড়লে কি দুইই বিদ্ধ হবে ?

পেছন থেকে ছুরি মারার চেয়েও অনেক বেশি ঘৃণ্য কাজ করে পুলিশ। প্রথমে পলাইতে দেয়, তারপর বুলেট বিদ্ধ করে মারে। মারুক। তবু সে আর ছুটবে না। তারচেয়ে খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে যায়। ধীরলয়ে। বিপদকালে যে পথ খুঁজে পায়না ! হোঁচট খেয়ে বিপদেই পড়ে থাকে ! গড্ডালিকার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে যার মাথা ঘোরায় ! সে সত্য জানে অথচ আচরণ করতে ভয় পায় ! যে দ্বিধাগ্রস্ত। পদে পদে নির্বান্ধব হয়ে পড়ার ভয় যার এত বেশি ! যে লক্ষ্যে স্থির নয় ! যে লক্ষ্য ভেদের স্বার্থে ত্যাগ করতে পারে না কিছুই ! এমন কি আত্মত্যাগও না ! তার পক্ষে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত গুলির অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি-ইবা করার আছে ! তখন তাড়া খেয়ে বাজারে এসেছিল নৈবেদ্য। তাড়া মানে তো মাতৃঋণ। দশ মাস দশদিন জঠরে আগলে রেখে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা দান করেছিল। পিতা যিনি প্রতিষেধক দিয়ে দিয়ে কর্মক্ষম করে তুলেছেন, তাদের বার্দ্ধক্যের দায় আমার। আবার কারা বলে যায়-তুমি ঋণীও বটে। পরিশোধ করতে হবে সব। প্রতিবছর মহালয়ার দিন তর্পণে যৎসামান্য শোধ হয়। বাকি সবই হয় বীজমন্ত্র হস্তান্তরে। [illegible], মনে মনে বলে-বীর্যমন্ত্র।

অথচ হরিণীকে কখনও অস্বীকার করেনি সে। তার কারণ গৃহ নয় গ্রহণ। পূর্ণগ্রাসেই মানব জীবন অনুভূত হয়। নতুবা একে অন্যের ছায়া মনে করি আমরা। জীবনে একবার অন্তত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই মাটির পুতুলে। মিথুন লগ্নের মানুষ !

যার ভুল ব্যাখ্যা করেছিল হরিণী। টেনে নিয়ে গিয়েছিল গৃহকোণে। নাহলে নাকি কামুক শরের আঘাতে, যাকে পুষ্পবাণও বলা হয়, বেঘোরে মরতে হবে। তবে মেয়ে চূড়া আর ছেলে অতলান্তের কাছেও কি আমি ঋণী ? নাকি দায়বদ্ধ ? কারো কারো বার্দ্ধক্যের দায় যেভাবে ঠিক সেভাবেই কি ছেলে মেয়ে দুটির শৈশব ও কৈশোরের দায় ? অতএব বাজার ব্যাগ হাতে সে তখন জি বি চৌমুহনিতে উপস্থিত ছিল।

চার

অর্থাৎ সেই বিধ্বস্ত পরিমণ্ডল থেকে লেংচাতে লেংচাতে একটা কথা অন্তত স্পষ্ট হয়ে উঠল — ধ্বংসলীলার কোন আড়াল আবডাল নেই। মৃত্যুও মাঝে মাঝে চুপিসাড়ে আসে। তবে ধ্বংস কখনই নয়। যেমন বিস্ফোরণের পর ধোঁয়ার গন্ধ এখন অসহ্য। কত মরা পোড়ার সাক্ষী অথচ এত উদ্গার আসেনি কখনও ! তবে কি সভ্যতা পোড়া গন্ধ এমনই ! আত্মাহুতির গাঁটফাটা শব্দ ! প্রথম মনে হয়েছিল শরীরে আগুন ধরে গেছে। পরে মনে হল, না, নাভি অত সহজে পোড়ে না। আরো তাপ চাই। চণ্ডালের হাতে বাঁশের খোঁচাখুচি অনেকই সহ্য করতে হবে।

আবার নৈবেদ্যকে এভাবে ছুটতে দেখে এতক্ষণ হতবাক দরজা জানালাগুলি হঠাৎই খটখট বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। স্বাভাবিক মনে হল নৈবেদ্যের। রাস্তার পাশে তখনও অনেক সম্পদ পড়ে রয়েছে। সে সংগ্রহ বা সঞ্চয় কিছুই করল না কেবল ছুটতে লাগল। একটাইতো দোষ — নিজেকে প্রকৃত গৃহী ভাবতে পারিনি কখনও। আবার সন্ন্যাসীও নয়। বৃদ্ধ পিতা-মাতার দায়িত্ব। শরীরে যথেষ্ট যৌনতাও আছে। ভাললাগা ভালবাসা থাকা সত্বেও কেন যে বিরাগী !

বাল্যকালেই যে অন্ধকারের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। জেনে গিয়েছিল আমার মধ্যে আরেকটি আমি আছি। অবাধ্য, লোভী, প্রতিশোধ প্রবণ, বিত্তবান যেমন বিলাসী আলস্যপ্রিয় কৃপণ। ক্রমে ক্রমে

জেনেছিল গুপ্তধনেব প্রতি কেমন কামার্ত সে । ছোটবেলা থেকেই তাব জোবে জোরে বই পড়ার অভ্যেস । আজও চুল আঁচড়াবার সময় সিঁথি কাটতেই যত দেবী হয় তার । আরেকটি কথাব উত্তব পায়নি সে-দেবতাদের চেহাবা মানুষের মত তৈরী করেছে কোন বুজরুক ! কিছু কিছু মানুষ তাই দেবতুল্য । তাদের সৈন্য সামন্ত সকলই মায়াবী । দিব্যাস্ত্রেব অধিকারী । ধবা ছোঁয়ার মধ্যে নেই অথচ যে অস্তিত্ব সবসময়ই টেব পাওয়া যায় । হয়ত মানুষও নয় । তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা । অবয়ব নেই, তবু গবম শ্বাস নিয়তই ঘাড়ে এসে পড়ে । শিউবে উঠে নৈবেদ্য ।মেয়ে মানুষেব ঘাড় সাধারণত চুলে ঢাকা থাকে । তারা কোনখানে টেব পায় তপ্ত বায়ু । গ্রহণ কবে, স্বীকার করে নেয় বা হাল ছেড়ে দেয । আমি তার কি প্রতিকাব করতে পারি ?

শৈশবেই নৈবেদ্য জেনেছিল ছোট-বড় কোন পুতুলেই প্রাণ থাকে না বা প্রতিষ্ঠা করতে পাবে না কেউ । নারী-পুরুষ ছাড়া সম্বন্ধ নেই কোনো । বাদ বাকি সবই প্রযোজন অভ্যাস ও মেযাদী অস্তিত্বেব লক্ষ্যে এককেটি সম্পর্ক । প্রকৃত কিছুই নয় । না মুখেব ভাষা, না ব্যবহাব । সত্য মাত্র চাবটি-জন্ম, মৃত্যু, জবা ও পীড়া সত্য । তাবপব প্রযোজন আছে, যেমন আহাব নিদ্রা ইত্যাদি । বহু কোটি বছর আগে আবেকটি সত্য আবিষ্কৃত হযেছিল সভ্যতা । যার উপকবণ মানবিকতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি । এই নামাবলীটি পৃথিবী শাসন কবে চলেছে এখনও । আবাব এখানেই অনন্ত অন্ধকার । নৈবেদ্য আবিষ্কার কবল-বহুকাল কেউ কোন প্রদীপ জ্বালেনি । অন্তত কোনো মানুষ ! তবু সভ্যতা একটি আলোক বর্তিকা, পচন থেকেই যার জন্ম । মানে তো সৃষ্টি ! সেই গোলাকার আলোব লোভেই কি তুমি অসংসারী হযেছো ?

সঙ্গে সঙ্গে মাথা উপর নিচ করে অভিযোগ স্বীকাব কবে নেয । মনে মনে সংযোজন কবে-সুন্দরেব পেছনে ছুটিনি কখনও । আড়ালে অসত্য, অসুন্দব ও মুখোশ খুলে ফেলাব নেশা কিছুতেই কাটতে চায় না । এব কোন ঘবে ফেবা নেই ।

পাঁচ

একসময লেংচাতে লেংচাতেই বাড়িব পথে পড়ে নৈবেদ্য । দুযাবে জটলা দেখেও দাঁড়ায না । আবাব বাস্তবেব মুখোমুখি হবাব ভযে তালু জিহ্বা গলা শুকায । চক্কব খায মাথা । ঘড়িব কাঁটা উল্টো ঘুবে । পড়ে যাচ্ছে নৈবেদ্য, পড়ে—

তাব আগেই তাকে ধবে ফেলেন সুষমা । রাজা সুবথের লাঠি শীতেব কাঁপুনি কাঁপছে । আব ঘষা কাঁচের ভেতব তিনি সেটিকে দেখছেন এক ঘটি জল-গড়িযে পড়ছে ছড়িযে যাচ্ছে । তাব দুইপাশে এখন হতভম্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে চূড়া এবং অতলান্ত । সুষমাব সাহায্যে গেল হবিণী । হঠাৎ পুরুষ মানুষ হাল ছেড়ে দিলে, সাময়িক নি:শক্তি হযে পড়ে মেযেবাও । কেবল আমাব শাশুড়ি ছাড়া ।

— দাঁড় বেয়ে যা মাঁ দাঁড় বেযে যা ।

সুষমাব কথা শুনতে কোনদিনই দ্বিধা কবেনি । ধবাধবি কবে নৈবেদ্যকে কোনবকমে ঘবে নিযে এল । কাছেই বাবা শ্বশুরের বিছানা, তাতেই শুইযে দিল । ঘটাং কবে রি-এ্যাক্ট করল সিলিং ফ্যান । ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি, জলেব ছিটা পড়েনি তখনও, নৈবেদ্য চোখ খুলে কি যেন দেখে, আবার বুঁজে, ভুরুগুলো ফিবে যায় যথাস্থানে ।

মা অতিবিক্ত হাতপাখা নিযেছে কেন ? বেগুলেটাবের কান মুচড়ে পাঁচে দিল হবিণী। এক মিনিট শুধু সোঁ সোঁ শব্দ ।

– দেখলি তো বাবা, কথা না শোনার ফল ! শিয়রের কাছে বসেছিল মা । জীবনে এই প্রথম কাবো পায়ের কাছে বসল হবিণী— কি হয়েছে বল ? ব্যাথা যেন হুহু করে বেড়ে যায় । স্নেহমায়া মমতা । আবার সবুজপাতা শুকায, বাদামি রঙ ধরে, রোদে কড়কড়া হযে চিনকারি মাবে - এভাবে পুড়িয়ে মাবছ কেন ?

নবি চোখ বুঁজেই টেব পেল বাবার হাতের লাঠি তাড়াহুড়ো করছে, আবাব এঁকেবেঁকেও যাচ্ছে । বুকের মধ্যে হঠাৎ বাজ নাকি ? কান্নায ভেঙে পড়ার মত দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস । বাবা আজকাল প্রায়ই বলে-কর্ম করে খাইনা । জবাব কবলে । বুকে চাপড় মারে খালি । সংক্রামক ব্যাধির মত নৈবেদ্যও কাঁদে-তোমার আগে আমি কিছুতেই যাব না বাবা ।

শুধু টেপাটেপি দুইটাকে দেখছি না এখন । দুইজোড়া চোখে সাবাক্ষণ নিবাপত্তার অভাব আব

অবিশ্বাসের ছাযা দেখে - কি করবে সে ? - কেন এমন হয়েছে ? আমি তো হস্বিতম্বিও কবি ! এতক্ষণ বীজগুলি কি আমাব চাবপাশেই ঘুবঘুব করছে ? চোখ খুলতে গিযেও সে থামায । কে যেন পাথর চেপে বেখেছে ।

সুরৎবাবু ভেবেছিলেন-বৃষ্টির জলে নয, তলে তলে ভবে উঠবে তার পুকুব । পৈত্রিক প্রাণ নিযেই শুধু ঢুকেছিলেন এপাবে । বিষয আশয় সবই কেড়ে নিয়েছিল । তারপবও সীমান্তে তন্ন তন্ন কবে দেখল পোশাকেব যত আড়াল । আব আঁচল চাপা কাঁদছিল তোর মা- কেন জিজ্ঞস কব না ! বাতেব শেষে একে একে সবই দিয়ে দিচ্ছিল যখন-কান দুটো ছিঁড়ে কেন দুল নিযে গেল ওবা ! চেক পোস্টেব বক্ষীবা পর্যন্ত ব্যাজাব হল । কেবল তোকেই তোব মাযেব পেটে লুকিযে নিযে আসতে পেবেছিলাম । তাবপব কতটা বছব কেটে গেল । কত বক্ত কত ঘাম ঝরল ! সুষমাব খবচ হল আবো বেশি । তুই মাস্টাবেব বাড়ি থেকে যতক্ষণ না ফিবে আসতি, কুপির আলোয় বসে ভূত তাড়াতাম আমবা, কাঁপা কাঁপা ভূত ।

ছয়

সুবৎবাবু এখন তাব বুকেব উপব ঝুকে দাঁড়িয়ে রযেছেন অথচ দীর্ঘশ্বাস বিদ্ধ হচ্ছে না নৈবেদ্য । ফিবে যাওযা লাঠিব শব্দও শুনল না । তবে তিনি সবে দাঁড়াতেই এবাব মা-দশ দশটি মাস এইখানে ছিলি খোকা ! চোখ বুঁজা অবস্থাতেও অনুমান কবতে পাবল সে । ছেলে জন্মেব পবই বিশ্রীভাবে পেট মোটা হয়ে গিযেছিল । ডাক্তাব বদ্যিও তেমন ছিল না । মাসী পিসিদেব টোটকাতেই যা কাজ হত । কেবল আমাব হযনি । সবই কপাল । অতুব জন্মেব পব সবল-সোজা ছেলে আমাব বৌকে বেল্ট কিনে দিয়েছিস—বেশ কবেছিস ! আগে অতশত ছিল না । কোনদিন মুখ ফুটে চাইওনি । বাবাব কাছে ভাইযেরা এত চাইত যে নিজেই লজ্জায মবে যেতাম । আব যাব দেবাব ইচ্ছে ছিল, তাব উপায ছিল না । শেষমেষ তুই হলি না সংসারী । [illegible] কবে বল ! শুনেছি এখন মথুবা বৃন্দাবনও নেই । সবই ঘুঘুব বাসা ।

যথাবীতি মাযেব হাতপাখা চলছেই । বাবা বলতেন বাযুচড়া হাওযা । এখন আব টিকা টিপ্পনির বালাই নেই এ সংসাবে । কে যেন ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদছে । শযনে পা দুটিও ভীষণ ভাবি লাগছে আমাব । সেখানে মাথা ঠেকিয়ে কাব আবাব চবণ ধুযে দেবাব সাধ হল ! ও হরিণী ! তোমাব শাঁখা সিঁদুবেব মূল্য আমি বুঝি । তুমিও নিশ্চযই পুরুষেব চোখে রঞ্জন-বশ্মিব কথা জান !

কক্ষনো না ! ববং শুনে শুনে বিভ্রান্ত । কখনও কি ভেবে দেখেছ পূর্ণ মানুষ হওযা যায কিভাবে ? তুমি যে সঙ্গমেব কথা বল - সে তো স্মবণ কবিযে দেযমাত্র । বাশিচক্র । একান্ত লাল সেই ফলটি, তুমি যাকে উপেক্ষাও কবতে পাব না ! তাব দবকাবই বা কি ? বযসকাল অব্দি বথ টেনে নিযে যেতে হবে তো ! জ্বালানী লাগে না ! আবাব তাকেই একপাশে সবিযে ব্যক্তি জীবনেব স্বার্থকতা খুঁজতে হবে । কতটা দক্ষতা দেখাতে পাবলে তুমি, দাযিত্ব পালন কবতে পাবলে !

— তাব বাইবেও অনেক কিছুই আছে হবিণী তুমি জাননা বা ওসব দিযে অলঙ্কাব তৈবী কবা অত সোজা না । কখনো কি প্রকৃত বামধনু বঙনুড়িব মালা পবেছ ? আমি তৈরী কবি তা । তোমাকে দেব । দক্ষতা শব্দটি সর্বত্র ব্যবহাব করো না । তোমবা জান না-পাপেব আঁতুড় আত্মরক্ষা । শৈযালীপনা আব শিল্পচর্চা কি এক কথা হল !

ইদানীং এত কথা বলে নৈবেদ্য, ক্লান্তবোধ কবাই স্বাভাবিক । তাব সঙ্গ নেয সোঁ সোঁ বাতাস । মন উজাড় কবে দু-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে তাবও উপায নেই । অঙ্কুরেই উড়িযে নিযে যাচ্ছে সব । নৈবেদ্য বাস্তবে ফিবে আসে । আমাব চূড়া আব অতলান্ত, নিশব্দ এইখানে এখন তাদেব অবস্থান চোখবুজে অনুমান করতে পারছি না ঠিকই, তবে মা হবিণীর গা ঘেসে দাঁড়িযে থাকাই স্বাভাবিক । মুখ দুটি হাঁ । ছোটোব আবাব লাল ঝবে ।

মানুষকে নিযে কত হেঁযালি করে মানুষ ! মানুষ নাকি নিজেকেই চেনে না ' আরো কত কি বুজরুকি ! একটা কথা তো সকলেই বুঝি - সকলেই আমবা ঊর্দ্ধমুখী, চিল শকুন ছাড়া ! তবে মগজেব কাজ কারবাব নিযে মাঝে মাঝে ধন্দে পড়ে যায । প্রাযশই মনে হয শিক্ষা সহবতেব অনুসাবী নয় । সাময়িক সুখেব তবেই বেসপঞ্জ কবে বেশি । ভূতুড়ে মনে হয সে স্বতন্ত্র সত্বা । তার কাজ কাববাব যদিও ব্যাখ্যাব অতীত নয । এতক্ষণ মা-বাবা হবিণী যা বলে গেল এবং নির্বাক ছেলে মেয়ে দুটি, তাদেব কথা কি বুঝতে পারেনি সে ?

খুব পেরেছি ! কি করা উচিত ছিল আমাব ! তাদেব কোন দোষ নেই জানি । তেমন কিছু দাবীও করছে না ! অথচ কোন মাগীর কাছে আমার হাত-পা বাঁধা কে জানে ! শুনছি. বুঝতে পারছি, স্বীকার করে নিচ্ছি, অথচ অনুরূপ আচরণ করছি না । আসলে মগজটাই দায়ী । তাব মেমরিতে আমি কবে কোন প্রহরে ঢুকিয়ে দিয়েছি-নৈবেদ্য না সন্ন্যাসী না গৃহী । চড়ুই পাখি যেভাবে থাকে । সঙ্গম করে শুধু । তারপর উড়ে যায় । সে সংগ্রহ করে দানা আর আমি দানার সঙ্গে তথ্য । এইতো বেশ কম ! তার প্রকাশিতব্য কিছু নেই । আমার আছে । পর্দা ফাঁস ।

সাত

অনেকক্ষণ ধবেই কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছিল তাব । সে বুঝতে পারল মাথার নিচে বালিশ নেই । দৃশ্যটি বিসদৃশ । শবাসনে লাশ ছেড়ে পড়ে থাকা ! মাথাব চুল বিছানায় লুটায, হাওযায় ওড়ে । ভয় কবে নৈবেদ্যব । আবাব ভেঙেও যায় যখন নাড়ি টিপে ধবে বিশ্বস্ত কেউ । ক্রমশই পরিবাবেব হাতেব বাইবে চলে যাচ্ছি । হযত ভালোই । বিশেষজ্ঞেব হাতে বেশি নিবাপদ । এবং খুশি হয—এখন কবণীয কিছু নেই । যা করার ওরাই করবে । এটাই ফাঁকি দেওযাব প্রকৃষ্ট সময় । নৈবেদ্য চিৎসাঁতারে গা ভাসিযে দেয় সোনালী জলে । স্বপ্নের আদর খায় । তোমাব যেমন ইচ্ছে ! ডুবতেও পার আবাব শোলার মত ভেসে থাকতেও ।

— আমি তো ডুবতেই চাই ! এই সেই বিতর্কিত ডুব সাঁতাব যার জন্যে হরিণীদের এত ধিক্কার ! হরিণী, মুনি ঋষিরাও যাব প্রতি আসক্ত । তার নিতম্ব ও মাযাবী চোখের মত অতল যোনী । তারপবই পূর্ণ চাঁদ দেখল সে—আকাশে অল্প সল্প ঢেং ঢেং খেলছে । আবাব নদীপৃষ্ঠে সোনালী কালির বড়ি ঢেউয়ে ঢেউয়ে গুলে যাচ্ছে । অতল স্বপ্নজলেও যাব উপস্থিতি সমান । শুধু সোনালী নয, এখন মাছের রঙ রূপালী । শিল্পেব ছড়াছড়ি । কেউ ছবি আঁকছে । কাবো হাতে ঝবণা কলম । কেউ বা ছেনি বাটালি নিয়ে ভাস্কর । কোথায় যেন অবিশ্বাসের সুরও কাজ করছে তাব মধ্যে । নৈবেদ্য সন্নিকটে যায় শিক্ষানবীশেব মত । এখনও কালি কলমে লেখা হয় নাকি ? ডটপেনেব যুগ !

তিনি মুচকি হেসে, কোনো প্রমাণ না দিয়েই কিন্তু মুখ বন্ধ কবে বাখলেন । বললেন-দর্পণ ও জলের একটি বৈশিষ্ট্য তুমি জানো তো ! নৈবেদ্য উত্তব দেবাব আগেই আঙুল দিয়ে চৌকো অথচ আবক্ষ একটুকবো জল কাটলেন তিনি । বললেন — নিচে এই মিশিযে দিলাম আব । তাব মনে হল মাছেব বক্ত । অত:পর জলের উপবিভাগে সেই চতুষ্কোণ গণ্ডি থেকে লাটি মাছ ধবাব মত ঢেউগুলিকে ধবে ধবে বাইবে ফেলে দিলেন । সেখানে বোয়াল মাছেব হা হা ঢেউ গিলে ফেলল তাদের । ঝামেলা চুকল ।

— এবার দেখো আয়না । আরেকটা কথা মনে বাখতে হবে—তুমি হলে দর্শক । প্রাণ আছে তোমার । আবাব গাছের মত জড় । আপাত কোন এ্যাকশন বিএ্যাকশন নেই । কেউ যদি দোলায় দুলবে ।.না দোলায় স্থির ।

দোলায মানে কি ক্যাবারে স্ট্রিপটিজের মত ?

হো হো ! সেন্স অব্ হিউমার !

তাবপব আযনায যাবতীয় ক্রিযাকাণ্ড দেখতে লাগল । আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি কাজই তাব জানা দেখা বা কবা । কিন্তু একত্রে এত দেখেনি কখনও । যেন মস্ত এক ল্যাববের্টাব । তাব দেযাল ছাদ এগুলি গেল কোথায ? সবই ম্যাজিক মিবাবেব বিশেষত্ব !

অনেক্ষণ পব আবাবো মুখ খুললেন তিনি — যদি সবই দেখা হযে থাকে, তাহলে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বল ।

— জন্ম-মৃত্যু ও গ্রহণ বর্জন সবখানে একইবকম । কেবল পিঁপড়েব মিছিল আব মানুষের মিছিলে ব্যবধান থাকলেও থাকতে পাবে !

সঙ্গে সঙ্গে আব আযনা আব কিছুই রইল না । ধাবালো ঢেউগুলি এসে আঘাত করতে লাগল । যন্ত্রণায ককিয়ে উঠল সে । একটু আগে দুইগাল চিপে কি যে গিলালো মা—সাবাটা মুখ তিতা !

আট

এভাবে নৈবেদ্যকে ওবা বাস্তবে ফিবিয়ে আনে । সোনাব হবিণ নয়, সোনা জলের মাছ ডাঙায়

তুলেছে। পবনে পানি কাপড়ের সর্ট। শরীর থেকে ঢল নেমে ভিজিয়ে দিচ্ছিল সব। সবাই রেগে রয়েছে এখানে। আর আমাকে জাগিয়ে রাখতে ব্যস্ত। কেন সাপে কামড়েছে নাকি ?

তোর মত একটিও বেকুব দেখি না নবি! ভেবেছিস সঙ্গীরাও নিশ্চয়ই ঘরের খেয়ে বনেব মোষ তাড়ায! মূর্খ! ওদের সংসাব দেখে আয়! ষোল আনা পাকা। কেবল অবসরটা কাটায় তোর সঙ্গে। কাটাক না! যার যা ভাল লাগে। আর তুই হলি গিয়ে চব্বিশ ঘন্টার যোগী। কত কথাই না শুনি তোর মুখে! হাসি পায়। লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কি সারাদিনই পাগলামি করতে হবে! তার ফল কি হয়েছে ? ওদেব চেয়ে তোর নাম ডাক বেশি কখনও শুনিনি বাবা! তাছাড়া ছেলে মেয়ে দুটির কথা কি ভেবে রেখেছিস।

কী ভাববো ? অবসন্ন শরীর থেকে হিন্দী সিনেমার মত লাফ মেরে উঠে নৈবেদ্য। তিন মাথার বুড়ো দুই হাঁটুব ফাঁকে মুখ গুজে কাঁদতে লাগল — আমাব চূড়া আব অতলান্তের কি হবে গো! আমি তো ফিরে ফিরে আসি। আবার যাই। শান্তি পাই না কোথাও। সংসারীদের প্রতিও বীতরাগ নেই বরং ভালবাসা আছে। জন্ম যেখানে হয়! এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, পেছনে যাদের ঘরবাড়ি খড়কুটোর মত উড়ে তাদের ঘৃণা করি। আমি কোন পথে যাব ? সকল ভক্তি হল হোলটাইমারদের প্রতি। একদিন ভোরে স্বপ্নই যাদের ঘুম থেকে ডেকে তোলে! বাদবাকি যাদের কথা বলেছিলে মা ওরা সবাই স্বল্পায়ু। তীব্র রঙিন· তাই বিষাক্ত। উচ্চাভিলাষী কর্পূবের মত। ইঁট কাঠ পাথরে বেচে থাকে। ওদের নিয়ে আমাব কোন সমস্যা নেই। একে অন্যের বেঁচে থাকা আমরা নকল করতে পাবিনা। বেনহুরের রথের চাকা কাটা পড়লে কি হয়!

ঠিক দুপুরবেলা, বাইরে আরেকবাব দেখার ইচ্ছে হল। জগৎপুর, খাঁ খাঁ রোদ্দুব। সবকিছুই পোড়াচ্ছে এখন। একটু আগে জি বি চৌমুহনীতে বিস্ফোরণ হল। ব্যক্তিগত জীবনেব সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! আছে। :ঃ মনে করে আপাতসম্বন্ধহীন ঘটনাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজানো সম্ভব। যেভাবে আঁতুব ঘব থেকে গোরস্থানের দিকে যাওয়া, যেভাবে ভোগ ও উত্তরপুরুষেব জন্যে বাখা হয ঐশ্বর্য। এখন কি ঘাড়ে তপ্ত শ্বাস এসে পড়ছে! কাব শ্বাস ? কর্তা কে ? আমরা হলাম গিয়ে ক্রিয়া কাণ্ড! নৈবেদ্য যতই ডুবে থাকুক, হবিণীর হাত ফসকে যাক বারবাব, সুষমাব নাড়িব সঙ্গে তাব বাঁধা ছিল নাভি।

— কথা বল নবি কথা!

— কি আর বলব বল! কিছুই তো ভাল লাগে না। না পবমায়ু নিয়ে কথা, না সার্থকতা। প্রেম ভালবাসা সুখ-দু:খ, উন্নতি অবনতি ভিন্নভিন্ন হলেও একই চর্বিতচর্বণ। ঈর্ষা ঘৃণা খুন জখম সবই ব্যাক্তিগত। আগ্রহবোধ কবি না। ঘটনা দুর্ঘটনা বিষয হতে পাবে না! প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আমবা যেভাবে মেনে নিযেছি। আব আমি ষড়যন্ত্র খুঁজি কেবল। মানব জাতির পবিপন্থী। সৌন্দর্যেব প্রতি আকর্ষণ আছে তবে সৃষ্টিব চেযে কম। কখনও তাব স্বপ্ন টপ্ন দেখিনা। তবে সুখস্মৃতি মনে কবি তাকে।

নয়

সিলিং ফ্যানই আবার বেশি বেশি শব্দ করছে। সবাই আমাকে ফেলে চলে গেল নাকি! নিশ্চয়ই বিশ্রিভাবে নাক ডাকছিল আমার। হঠাৎ মা এভাবে উড্র করে নিলে লাভই হয়েছে তাব। সে ঘুমের ভান করে কেটে পড়ে। সোনা জলের ডুবুরী। ধরা পড়ার ভযে খুব কমই বুদবুদ তুলছে। যতই নামছে নিচে, জুড়িয়ে যাচ্ছে গা। জল দ্রুত স্বচ্ছতা হারিয়ে নীল হয়। তাবপর কালো। নৈবেদ্য বুঝে মূল স্বপ্নপুরীতে ঢুকে পড়েছি। এখন আর আমাদের আকাশ প্রভাব বিস্তার করবে না। তুলনায় শীত শীত করছে। তবে এখানেও দেখি চেয়ার টেবিল ভেসে থাকে! ভাসমান বস্তু যেভাবে জলের শাসনে থাকে সেভাবে নয়। স্বমহিমায় স্থিত। উপবিষ্টদের মাথার চুল এতটুকুও নড়ছে না। টেবিলে টেবিলে গোলাকার আলো এসে পড়েছে। ছোট মাপের পূর্ণ চাঁদগুলি। তাহলে কি ইত্যাদিকেই লীলা বলা হয়! আব শীত শীত নয়, এখন শিহরিত হয় নৈবেদ্য। কলমচিদের কাছে যায় গুটি গুটি —

— এক্সকিউজ মি স্যার!

তিনি চোখ না তুলেই ইঙ্গিত করলেন — বসো। কিন্তু নৈবেদ্য ন্যূনতম একটি জলচৌকি বা টুল না দেখে উসখুস করতে লাগল। দেবতা আবারও বললেন—বসো বসো। সে তখন নিজেই চেয়ারের মত বসে পড়ল জলে। জানে ডুববে না।

— কি লিখছেন দাদা ?

— কথা সাহিত্য !

— শিল্প নয় ? কাঠাম পুজো করে করে, অতিরিক্ত তেল মশল্লার পাকে প্রোটিন ভিটামিনের যে অবস্থা হয় ! অবশেষে গলার ফাঁস খুলে, মৃত হাঁস মরাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া ।

অলক্ষ্যে কে একটি ফিঙে পাখি ফিক্ করে হেসে উঠল । নৈবেদ্য গেল দ্বিতীয় টেবিলে সেখানে ছোট্ট একটি নেমপ্লেটও রয়েছে । 'সত্তর দশকের কবি অর্জুন সদৃশ ।' নৈবেদ্য নিচু স্বরে ডাকল – স্যার । তিনি বিকট চিৎকার করে উঠলেন – হবে না । উৎকণ্ঠায় সে আবার ডাকল । তিনি খুশি হয়ে বললেন – হবে । আশ্বস্ত নৈবেদ্য এবার পোষা বেড়ালের মত মিউ করে ডাকলে, তিনি বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন — হবে না । রীতিমত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে । তার মনে পড়ল হরিণীও আমাকে প্রকৃত পুরুষ ভাবে না ।

তৃতীয় টেবিলে সে কিছুতেই যাবে না । কিন্তু তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল । নৈবেদ্য বসেনি, দাঁড়িয়েই থাকে । অবশেষে মুখ খুললেন তিনি — ইতিহাস থেকে শিখেছি - দিন দিন সভ্য হচ্ছি আমরা । সিন্ধু সভ্যতা থেকে আজকের জিন প্রযুক্তি । যার লক্ষ্য পূর্ণ মানবতার দিকে যাত্রা । মানব থেকে মানবিকতা । সেই মানুষের আজ কী অবস্থা বল ?

— দাদা কি ?

— তুমি শালা প্রতিক্রিয়াশীল ! শিল্প সাহিত্য কোন গাছের গোটা হে ?

— বটের । অজস্র হলুদ ফল ঝুলে থাকে । পাখিরা মনের আনন্দে খায় । বিষ্ঠা ত্যাগ করে । তখনও তিনি সক্রিয় । মাটি ফুঁড়ে একই অবতার বার বার জন্ম নেন । হে মহানুভব, আরো কথা আছে । সবল খুঁজতে চিকণি তল্লাসীর কোন দরকার আছে কি ? আমার মধ্যেই সে চাড়াল আর আমি ঢাকার বৈদ্য ।

— এবারও কি ক্ষেত্রটি পুরোপুরি চিহ্নিত করা গেল ?

— মনে হয় না ।

— কেন এমন হয় ?

— কারণ কোন একসময় মুখোশগুলোই মুখে পরিণত হয়ে গিয়েছিল । এখন বাদামের ধাঁধা ভাঙতে ভাঙতে দিন-রাত কাবার । হে অভিব্যক্তির এক্সপার্ট ! আমার অঙ্গ ভঙ্গি, ক্রিয়া কাণ্ড, চেহারা ছবি কোনখানে ফাঁকি কোথায় ? চ্যানেল কেনেল কিছুই নির্মাণ করতে পারিনা, কেবল নদীর কল কল ধ্বনি বন্ধ হলেই, চিৎকার করে উঠি ।

দশ

— নবি কি ঘুমিয়ে পড়েছিস বাবা ?

যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে মা । আর আমার হাতের তালুতে অনবরত চিমটি কেটে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে হরিণী । তার হাতে মৃদু চাপা দিল নৈবেদ্য—এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আমি তো কোথাও যাচ্ছি না ! এখনও আবিষ্কারের কথা বলা বাকি ! আজকাল ঠোঁটের কোনা চোখের কোনা ব্যবহার করে না কেউ । চালে চলনে চোর ধরা পড়ার দিন শেষ । তুমি শুধু একটিভিটির ব্যাখ্যা করতে পার ! যদিও ফল অশ্বডিম্ব । মুখে মুখোশ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ নৈবেদ্য বাচ্চাদের মতই ভাবত-পাপগ্রস্ত চোখগুলি কোন না কোন সময় হাজার ভোল্টের বাল্ব হয়ে জ্বলে উঠবে । ইউরেকা ইউরেকা চিৎকার করে উঠতে পারবে সে । দুন্দুভি বাজাবে । কিন্তু বড় ক্লান্ত লাগছে এখন । আরো মনে হত আইবল্ বড় হতে হতে হঠাৎ ঢেকে ফেলবে সাদা অংশ । তাও তো হয় না । পুরণো মূল্যবোধ শুধু ধর্ষণকারীর মধ্যেই মিলে । সমীক্ষায় দেখা গেছে এই প্রজাতিটিও লুপ্ত পায় ।

নৈবেদ্য আরো ভাবে, যে ঘরে জন্ম হয়েছিল তার চাল কেমন আর তক্তাপোষ বুঝতে বুঝতে দশটি বছর কেটে গিয়েছিল । অভাব অনটনের জন্যে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই । তাকে অতিক্রম করে যাওয়াই কাজ । সম্মিলিতভাবে বা একা একা । এককথায় তোমার প্লেস অব ইন্টারেস্ট কি হওয়া উচিত ? ঠোঁট কামড়ায় নৈবেদ্য । যদি জন্ম-মৃত্যু কোন বিষয় না হয় ! প্রেম ভালবাসা ঈর্ষা ঘৃণা দ্বেষ ! যদি ক্ষমতা অক্ষমতা দারিদ্র ঐশ্বর্য সবই স্বাভাবিক মনে করি ! শরীর ও সভ্যতা ছাড়া অন্য ধর্ম বিশ্বাস করি না,

তাহলে কথাটা প্লেস অব্ ইন্টারেস্ট না হয়ে, পয়েন্ট অব্ এট্যাক হওয়া উচিত। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টাব্‌গেট ভুলে ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকে নৈবেদ্য যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। তার চোখের সামনে এখন অন্তর আলো নীল একটি স্ক্রিন আর ঘবে বাইবে অন্ধকাব। যেন কতযুগ ধরে একই বিছানায় শুয়ে বয়েছে। এবং একই ভুল কবে চলেছে বারবার — কবে কিছু বাদামের খোসা পড়েছিল তার পকেটে। এখনও মাঝে মাঝে কি হাতড়ায় সেখানে! নীল স্ক্রিনে অনববত এক্সট্রা টেরিটোরিয়েল সাউণ্ড হচ্ছে। অনেকটা আমাদেব বিপ্ বিপেব মত। আবো কিছু লেখা বিস্ফোবিত হচ্ছে। সে দেখছে, হয়ত পড়ছেও অথচ মনে ধরছে না। এটাই তো অসুখ। নৈবেদ্য যেন তাব মগজ এবং হৃদ্‌পিণ্ডের ঢিলে পড়া তার নেড়ে চেড়ে টাইট কবে নিতে চায়। স্ক্রিনের ইঁদুরটিও তাই তাকে বুঝাব চেষ্টা কবছে। একটু আগে যেভাবে বিস্ফোরিত হচ্ছিল শব্দ বাক্যগুলি, এখন নীল অগ্নি লাভা বেবোচ্ছে নৈবেদ্যেব মগজ ঠুকে ঠুকে। আগে পিছে ইনভারটেড কমা। সে জোরে জোবে পাঠ কবতে লাগল - ক্রিতদাসপ্রথা ছিল। এখনও আছে। অসতীর নামে সতীদাহ আজও হয। যাকে পুজো কবি তাকেই বলিদান কবি। খাদ্য তালিকায় দ্বিতীয় নামটি তাব। এমন উত্তেজক নবম নবম আহাব আব হয় না! বার্দ্ধক্যের বাবাণসী বলতে কি তার কাঁধেই ভব বেখে চলার কথা বলেছেন কবি! তারপব বিষয় সম্পত্তি যে অর্জন কবতে পারে তার। সঞ্চয়েব জন্যে সিন্দুক আব নিরাপত্তাকর্মী দরকাব। সংগ্রহেব কোন শেষ নেই। সীমা সীমান্ত হাস্যকর নয কি? সব সম্পদই নাদিরশাহি লুটতবাজ যোগ্য নয়। যেমন সুলভেব শ্রম, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি। উপযুক্ত বৃষ্টি লুট করা যায় কিভাবে? তাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী সেনাবাহিনী চাই। আরো মৌলিক অধিকাব চাই। আরো সম্পদ। শাসন ক্ষমতা যাব কোন উদয অস্ত নেই। নিযম নীতি নেই। ময়ূর সিংহাসন নিযে দরবাব। আব কিছুই মৌলিক নয়। না দেশভাগ। না মতাদর্শগত বিরোধ বা চামড়ার বঙ।

এগারো

নৈবেদ্য এতক্ষণ যেমন জলে ভাসছিল তেমনি ভাসতে থাকে। ববং ঘামে বাতাস লেগে তার ভেলাব গতি আবো বেড়ে যায। ভয়ঙ্কব ঝড়ো হাওযা। স্বপ্নেব এই কৃষ্ণসাগর থেকে যতবারই মন ফেবাতে চাইছে, পাল সামলাতে পাবছে না এখন। কোথা থেকে কোথায় গুলিযে যাচ্ছে। ডুবছে ভাসছে। একটুখানি উপবিভাগের ফাঁকে চিৎকাব করে উঠছে - মা!

— বল বাবা! আমি তোব কাছেই আছি।

— ভুলে যাচ্ছি মা, ভুলে যাচ্ছি!

— বেশতো মা বলে ডেকেছিস! আবাব কি?

— বাকি সব কিছুই!

— দাঁড়া দেখি! তোব কি রূপকথার কাহিনী একটিও মন নেই নবি?

— না মা! তুমি ববং আবার শুরু কব।

সুষমা প্রথমে তাকে কোলে তুলে নিলেন। যেভাবে স্বপ্নাদেশে জল থেকে ডাঙায উঠে আসেন বিগ্রহ। এত ভাবি পাথর অথচ শোলাব মত। স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলল নৈবেদ্য। মায়েব কোলে চোখ বুজে বযেছে বলে মনে হল রাত্রিকাল। বুকে মুখ গুঁজে থাকাব সময়। এমনই এক রাতে সে বাড়িব বাইবে ছিল। ফিরেই আসছিল বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে, একজন প্রকাশক বন্ধুব সঙ্গে দেখা। সে বলল - দাঁড়া, আমাদেব পথেই পড়বে। একজনেব সঙ্গে একটু দেখা কবে চলে যাব। আমিও তাকে চিনি। আমাদের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীব বাড়ি গিয়ে দেখি - তিনি তখনও ফেবেননি। বন্ধুটির হাতে ছোট্ট একটি উপহার ছিল। বঙিন কাগজ আর ফিতেয় মোড়া। আমবা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

— আমাদের আগাম এপয়েন্টমেন্ট ছিল কি?

— না।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সে ঠোঁটের কোণ ব্যবহাব কবে হাসল। তার হাতে উপহার নেড়ে চেড়ে আবাব দৃষ্টি আকর্ষণ করাব চেষ্টা কবল।

— কি জিনিস?

— যন্ত্র?

— কি নাম ?

— লেডি শেভাব।

— তার কাজ কি ?

— ক্ষৌরকর্ম।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল নৈবেদ্য। তারপর বলল - তুই একটু দাঁড়া, আমার চেপেছে।

বাইবে এসে দেখল — খুব কাছাকাছি অনেকগুলো ল্যাম্পপোস্টের আলো। মিউনিসিপালিটিব নালা যদিও আছে তবে ছায়া বা আড়াল নেই। কি আর করা যাবে ! এদিক ওদিক ভুলে চেইন খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল নৈবেদ্য। এত আলোর মধ্যে বেচারা ! তাছাড়া মন্ত্রী বাড়ির সামনে বেত্রাঘাতের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না ! চোখ দুইটা বন্ধ করে যা একটুখানি আড়াল বা অন্ধকার পেল, তাতেই কাজ হল অবশ্য। সতীশ শীলের বাঁহাতি আঙুল দুইটা যা আমাব গালে প্রায়শই চেপে থাকে, বাব বার মনে পড়তে লাগল। ততক্ষণে গেঞ্জি ধূতি পরিহিত মন্ত্রী মহোদয় তার শোবার ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। যন্ত্রটি তিনি নিজেই চেয়ে নিলেন শান্তনুর কাছ থেকে। নৈবেদ্যের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেনও।

হঠাৎ সিলিং ফ্যান থেকে যেন বিদ্যুৎ চলে গেল। সুষমাও সেদিকেই তাকিযে। চৈত্রেব দুপুর। নিষ্প্রাণ ব্লেইড শেষ চক্কর খেযে থেমে গেলে তার মনে পড়ল হাত পাখাও অনেকক্ষণ বেখে দিয়েছি। তারপর আঁচল দিয়ে নবির মুখ মুছতে মুছতে বললেন — হরিণী চূড়া অতলান্ত তোমবাও এদিকে এসো। দেখো ভালো করে ! শুধু সুবৎবাবুকে কেউ ডাকল না। তিনি যেখানে যেমন ছিলেন, তেমনি কাঁপতে লাগল তার হাতের লাঠি। ঠকাঠক যেন মাথা ঠুকছেন তিনি। সুষমা বললেন জংগল ঠিকই, তবে ফাঁকে ফাঁকে উইটিবির মত নাক চোখ মুখ দেখো, এখনো কত বাঁকা চোখা চিকণ ! এবং একটি ফিঙে পাখি, নিশ্চযই চূড়া হবে, ফিক কবে হেসে উঠল। বাবার পায়ে আঙুল ঠেকিযে বলল — ওউব এডিযা ফাটি হুযি !

রণবীর পুরকায়স্থ

মোহনদাসের জন্মবৃত্তান্ত

আমানতকাবীব নাম — শ্রী সুভাষচন্দ্র মিত্র (মাইনব)
পিতাব নাম — শ্রীগোপালদাস মিত্র (স্টাফ)
নাবালক হইলে জন্ম তারিখ — ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৬৩ ইং (বুধবাব)

অনেক সময় নিয়ে গোটা গোটা অক্ষবে গর্বিত পিতা গোপাল বেকাবিং ডিপোজিটের ফর্ম ফিলাপ করেছিল। ১৯৬৩ ইংবেজিতে ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সি আব বি আব সি স্যার জোব করে পাঁচ টাকা মাসিকের আব ডি খুলতে বাধ্য কবেছিলেন। কেউ যদি বলে-তুমি না পাব আমি দিযে দেব মাসে মাসে— না করা যায়! প্রথম জমাটাও চিত্তবাবুই দিয়ে দিয়েছিলেন। গোপাল একবাব কাঁই কুঁই কবেছিল-আমি স্যার পিওন মানুষ, পাঁচ টাকা চলে গেলে খাব কি সারামাস? চিত্তরঞ্জনবাবু ধমকে ছিলেন,-পিওন কি হে, সাব স্টাফ। দুদিন পব স্টাফ, তার পর অফিসাব। তখন তোমাকে কে পায, কার টাকা কে খায়। তার উপব তোমাব যা এলেম। — স্যাব! এলেমেব কথায় গোপাল হাত কচলায চৌধুরী স্যারের সামনে। পড়াশুনায় মন্দ ছিল না, পড়তে পাবল কই। জন্মাবধি অনাথ। রায়চৌধুরী স্যাব বলেন-সেলফ মেড ম্যান। জন্মেব কথা মনে পড়ে। জন্মেব কথা তো কিছুই মনে নেই, মামার কাছ থেকে শুনেছে। কনভেন্ট বোডেব এদিকে বিশাল গির্জা ওদিকে বেলেব কোয়ার্টার্স। বাজি পটকার দম্‌দমাদম্ শব্দের মধ্যে জন্ম হলো গোপালেব। পঁচিশে ডিসেম্বর মধ্যবাত গির্জাব ঘন্টা তখন বেজে গেছে। সদাপ্রভু যিশুর জন্মেব সাথে তারও জন্ম। মামা নাম বেখেছিল যিশু। যিশুদাস মিত্র। গোপাল নিজেই নিজেব নাম পাল্টে রাখল গোপালদাস। মা বাপ মরা ছেলেকে মামা ক্লাস সিক্স অব্দি পড়িযেছিল। যথেষ্ট পড়িয়েছিল। আদ্যনাথ প্রামাণিক বিদ্যালয় থেকে ক্লাস এইটের সার্টিফিকেট বের কবেছিল আট আনা খবচা কবে। ডাক নামেব যিশুর চাকরি হয়ে যায় গোপালদাস মিত্র নামে। ভৌমিক বায়চৌধুবী স্যার ঠাট্টা কবে বললেও, সেলফমেড ম্যান, কথাটায় গোপালেব শ্লাঘা হয়। বলে — স্যাব!

বিশাল নামের অফিসার চিত্তবঞ্জন ভৌমিক বায়চৌধুবী আর গোপালদাস মিত্র সাবস্টাফ, এই দুজন মিলেই কুমিল্লা কর্পোবেশন ব্যাঙ্ক-এর শ্যামবাজাব শাখাব ক্লিয়ারিং সেকশন। ক'পযসা আর বেতন ছিল। ন্যাশনালাইজ হযনি। প্রাইভেট ব্যাঙ্ক। সি বি সি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা বায়চৌধুবীদের সঙ্গে আত্মীযতাব গর্ব খুব সি আব বি আর সি স্যারের। গোপালকে বলেন-ব্যাঙ্ক আর ট্যাঙ্ক -এব শহর আমাদের কুমিল্লা জানতো। কে জি বায়চৌধুরি আমাব দাদু, দাদুর আপন খুড়তোতো ভাই। ক্লিযাবিং সেকশনে ক্লার্ক একজনও আছেন। গুরুদাস হোড়; জেনাবেল ক্লার্ক কাজ বলতে সকাল বেলাব ঘন্টা দুয়েক। সইকরা, হাতমুখ ধুযে চায়ের অপেক্ষায় বসে ভৌমিক স্যারেব সঙ্গে নাটক নিয়ে গল্প। মাঝে মধ্যে গোপালকে ধমকানো। ইচ্ছে হলো তো দুতিনখানা চেক বিসিভ করা। বাকি কাজ বাকি সমযে। চেক বিসিভিং এন্ট্রি, স্লিপ লাগানো, এসকোটা মেশিনে খট্‌খট্ টোটাল। সব গোপালদাস। পেইং স্লিপগুলোয় ক্লিয়ারিং সিল মেরে বেডি করে বাখাব কাজও গোপালের। পয়সা আনার আলাদা হিসাব। বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের পাশে অভিনয় করা গুরুদাসবাবুব নেশা যেমন, অনেকটা পেশাও বটে। ব্যাঙ্ক-এর চাকরিতে আর ক'পয়সা। বেলা তিনটে নাগাদ একবাব থিয়েটার পাড়া ফেরৎ ইচ্ছে হলো তো ফেরা। তখন গোপালের ভাগ্যে আর একপ্রস্থ বকাঝকা-ধুর্‌ধুর্ পিওনকে দিয়ে কী কোন কাজ হয়, সবই যদি আমাকে করতে হবে। গোপালের করে রাখা গ্র্যাণ্ড টোটালটা ঝর্ণা কলম দিয়ে ইঙ্কআপ কবা আর জি ডি হোড় নামের পাখি ওড়ানো সইটা মেরে রায়চৌধুবী স্যারকে হাত নেড়ে— আসি স্যার। হাওয়া। স্টারে বা রঙমহলে যেখানেই নাটক থাকুক বৃহস্পতিবার শোয়ের পাস একটা দুটো গোপালের জন্য

বরাদ্দ থাকে। নইলে এত গালিগালাজ খেয়েও খাটবে কেন। আব কি নাটক সেসব। টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি। একটাও দেখেনি কখনো গোপাল। পাস দুটো বিক্রি করে সপ্তাহে দুতিন টাকা আয় এ্যাকস্ট্রা।

ছেলের নাম সুভাষচন্দ্র বাখার কৃতিত্বও ভৌমিকবাবুর। ছেলের জন্ম বাড়িতেই, দাই এসে বলল বারটা কুড়িতে। গোপালদাস ছেলের কান্না শুনেছে বারটা পাঁচ-এ। রায়চৌধুবি স্যাবই বললেন, — জন্ম বারোটাতেই হয়েছে, তোমার ঘড়ি দশমিনিট ফার্স্ট ছিল। ছেলে তোমার বীরপুরুষ হবে। গোপালের থেকে বছব দশেকেব ছোট চিত্ত স্যারের বুদ্ধি বড় পাকা। ডিরেক্ট অফিসাবরা খুব ঘাঘু হয় দেখেছে। কলেজ ছেড়েই ঢুকে গেছে দাদুর ব্যাঙ্কে। কত আব হবে বয়স, উনিশ কী কুড়ি। এর মধ্যেই কত বুদ্ধি।

সুবুর জন্মেব পব থেকেই আদুবি সুতিকায় অসুস্থ। এমনিতেই আদুরিব শরীবের গড়ন-পিটন কিছুই ছিল না। ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া মাংসপিণ্ড এদিকে কিছু ওদিকে কিছু। শ্যামলাতেও একটা লক্ষ্মীশ্রী থাকে, রূপের ঝলক থাকে। আদুরি ছিল আবলুস কাঠের যক্ষিণী। কাজ কবতে পারত খুব। এক কামবায় বস্তি ব্যারাক ঝকঝকে করে বাখত। সুতিকারোগীব হাজাবো ঝামেলা। এই ব্যথা সাবল তো, ঐ ব্যথা। সাদা রক্ত লাল রক্ত যখন তখন। শচীর মা, শঙ্কব সিনেমার চৌকিদাবেব বউদিদি না থাকলে দুধেব শিশু সুবুব কি হালই যে হতো। দিদি না থাকলে শচীই সুভাষচন্দ্রেব দেখাশোনা, আদুরির দেখাশোনা করত। আদুরির ততদিনে গিঁটে বাত, নড়তে চড়তে পাবে না। একেবারে অচল। পনেব বৎসবেব শচীই সুবুব দ্বিতীয় মা হয়ে গেল।

কুমিল্লাব রায়চৌধুবিদেব ব্যাঙ্ক-এর পিওন গোপাল, আদুবি বউ-এর চিকিৎসাব খবচে জেববার। কবিবাজি, হোমিপাথি, কবচ তাবিজ, ছেলেব ব্রাহ্মণ শটি, গ্ল্যাক্সোব টিন কিনতে অনেক খরচ। মার শুকনো বুকে ছেলে তো বসতেই পাবে না। শচীরানিব সাজা মাতৃত্ব কখনও ছেলেব কান্না থামিয়ে তো দেয়। ছেঁড়া তোষকেব উপব চটাওটা তেল কাপড়ে শুযে সুবুকে কাতুকুতু দিযে হাসানোই অপিস ফেরতা গোপালেব একমাত্র সুখ। আব সুখ, সুব তেল চিটচিটে সর্ষে-ভবা বালিশ থেকে লাল লাল বা ছোট সাদা ছাবপোকা ধবে মাবা। মেরে বক্তগন্ধ হাত শচীব নাকেব কাছে নিযে যাওযা। শচীব কিছুতেই আমোদ পুলক তেমন নেই। রাগ দু:খও নেই। প্রথম আদুবি খুব মজা পেতো খিকখিকিয়ে হাসত। একঘেযেমিতে মুখেব হাসি ফিকে হযে গেছে।

এব মধ্যে একদিন গোপাল শচীকে প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব দেয কাপড়েব ব্যবসা শুরু কবাব। ক্যানভাসার হবে শচী বস্তিব মেযেদেব ডেকে আনবে আদুরিব কাছে। শাড়ির স্টক টাকা-পযসাব হিসেব আদুরিব। সাহায্য কববে শচী। সাইকেল এ্যাডভান্স দেড়শো টাকা পুবো হাতে এলো না। ক্যাশমেমো পাওযাব জন্য পনের টাকা দিতে হলো দালালকে। একশো পঁযত্রিশ টাকা দিয়ে বড়বাজাব থেকে শাড়ি কিনল দশখানা। ভৌমিক স্যারকে বলেছিল তাব ব্যবসাব কথা। বললে, — মূল দামে ছেড়ে দাও, পারো তো এক টাকা কবে কমিযে দাও। ঘাঘু বুদ্ধিমান মানুষেব কথা ফেলতে পাবল না। লস হযে গেল। একশ কুড়ি টাকা হলো। শাড়ি বাঁচল একখানা। কাদাপাড় পাতলা সবুজ শাড়িটা কেউই নিল না। গোপালেব মাথায় তখন রায়চৌধুবি স্যাবেব বুদ্ধিব তাবিফ। শচীব মা দিদিকে বলল, — শাড়িটা শচীব জন্য নিযে যেও। আদুবিকে শাড়ি পবানোব কথা ভাবতেই পাবে না। এখনকাব যেমন নাইটি, কাঁধে থেকে পা পর্যন্ত শেমিজ পরে থাকত আদুরি। ব্যবসা তাব দাঁড়িয়ে গেল। এক আধবাব লস হলো। তাবপব শচীই দাঁড় করিয়ে দিল বস্তিব ব্যবসা। কাদাপাড় শাড়িতে শচীকেও নতুন কবে দেখতে শিখল গোপাল দাস।

আবেদনকারীব নাম—শ্রীসুভাষ চন্দ্র মিত্র।

পিতার নাম—শ্রীজি ডি মিত্র, ব্যাঙ্ক অফিসাব।

জন্ম তাবিখ—২৩ শে জানুয়ারি ১৯৬৩ ইং

সি আর বি আব সি স্যাব বি এস আর বি-র অফিসার এখন। ডেপুটেশন পোস্ট। সল্টলেকেব বাড়িতে গোপালদাসকে বসিয়ে ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়াবেব ফর্ম ফিলাপ কবিয়েছিলেন। — কি হে দিনটা যে ভুলে গেলে। মনে আছে ছেলেব জন্মের পরদিন বুধবাব পর্যন্ত লিখে দিয়েছিলে ব্র্যাকেটে। — স্যাব। — চাকরি হয়ে যাবে, ছেলে আবার তোমাব মতো করিতকর্মা পুরুষ হবে না তো? — স্যার। সি আব বি আর সি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা গোপালচন্দ্রেব আজীবন। বযসে ছোট লোকটির কাছে তাব জীবন কৃতজ্ঞও। তাই স্যারের কথায দু:খ পাওয়াব বদলে কৃতার্থ হয়। বলে, স্যার, ভাল আঁকতে পাবত না

বলে স্কুলে কখনও ফার্স্ট সেকেণ্ডে হতে পারল না ছেলেটা। কতবার কত প্রজেক্ট করিয়ে দিয়েছি মাস্টারকে দিয়ে। ছেলে নিজে যা পেরেছে, তাই করে জমা দিয়েছে। স্যার, একটা কথা রাখবেন স্যার। চাকরিটা যে আপনি করিয়ে দিলেন ছেলেটা যেন জানতে না পারে স্যার। -না, হে না, তুমি আমার যা উপকার করেছ। চা খাবে তো ? হেনা, এই হেনা দেখে যাও, কে এসেছে।— না স্যার।—না কি, তুমি বললেই আমি মানব !

সি আর স্যারও গরীব ঘরের ছেলে। তবে গোপালদাসের মতো অশিক্ষিত পরিবার নয়। গোপাল আদ্যনাথ প্রামাণিক স্কুলের এইট পাসের সার্টিফিকেট ভরসা করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত করেছিল। তারপর সি আর বি স্যার বুদ্ধির দৌড় করিয়ে বি এ, সি এ আই আই বি, ব্যাঙ্কের নিজস্ব সি এ পাস। সে তো স্বপ্নেও ভাবেনি ক্যাশিয়ার হবে, অফিসার হবে। অনেক সুখের মধ্যে একটা কাঁটা যে বুকে বিঁধে আছে, সে শুধু জানে, জানে আর একজন। আদুরি তো কিছুই জানল না, বুঝল না। এক বৎসরের কষ্টের জীবন পার করে, সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় জন্মদিনে ছারপোকার বিষে বিষক্ষয় করল। বস্তির মানুষ যে এমন হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি গোপাল। গোপাল তার বউকে খুন করেছে, মিথ্যে অপবাদে তাকে বস্তি ছাড়া করল সবাই। আদুরি নড়তে চড়তে পারে না, বিষের শিশি এগিয়ে দিল কে ? সুবু ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়, তাই, গোপাল আদুরির বিছানার পাশে সরিয়ে রেখেছিল। কোন স্বামী স্ত্রীর না ঝগড়া হয়। অতিষ্ঠ উপেক্ষিত স্বামী হিসেবে সে বিষ খেয়ে মরে যাওয়ার কথা বলতেই পারে। এতে প্ররোচনার গন্ধ পায় কি করে প্রতিবেশীরা। বস্তির ঘরে কোনো কথাই বলা যায় না। সব পাঁচকান। আদুরি যখন মরল তখন তো গোপাল অফিসে। শ্যামবাজারে। বস্তির বাড়ি ছাড়তেই হলো গোপালকে। শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের বাড়িতে শচীর মার কাছে পাঁচ মাস থাকল সুভাষচন্দ্র।

গোপালচন্দ্রের দু:খের জায়গাটা কেউই বোঝে না। সি আর বি আর স্যারও না। উনি বলেন, — তোমার মত সুখী মানুষ কজন আছে হে। সি আর স্যারও তো সুখী মানুষ। পঞ্চাশ বৎসরেই সুখ উপচে পড়ছে। মেয়ে সিনেমা করছে। মন্ত্রীর ছেলের সাথে বিয়েও পাকা। ছেলে নামী বিস্কুট কোম্পানির আধা মালিক। হেনাদিদি যখন আসতেন গাড়ি করে, চৌধুরী স্যার বেরিয়ে যেতেন। গুরুদাস বাবুরও থাকা না-থাকা সমান। তখন সি সি বি লিমিটেডের শ্যামবাজার শাখার ক্লিয়ারিং সেকশনের অফিসার, ক্লার্ক, পিওন সবই গোপাল সাবস্টাফ। ফার্ন রোডে বাড়ি হেনাদিদির। হাইকোর্টের উকিল ভবেশ সাহার সুন্দরী মেয়ে হেনাদিদির প্রেমে যখন সি আর স্যারের মতো ঘাঘু মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়, গোপাল পিওন তখন তার বুদ্ধিকে সামলে রেখেছে। স্যারের তখন অনেক টাকার দরকার। শেরখান আফগানও স্যারকে আর টাকা দিতে পারবে না, জবাব দিল। এদিকে আদুরির মৃত্যু, গোপালের ঠাঁইবদল, সুবুর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হতাশার মধ্যে শচীর কাপড়ের ব্যবসাও ডুবতে বসেছে। হতবুদ্ধি গোপালকেও তার উচ্চক্কা বুদ্ধি দিয়ে মাতিয়ে দিলেন। — ডু আর ডাই, গোপাল। এ আমাদের শেষ লড়াই। কেউ যাতে বুঝতে না পারে। একটা অচেনা নামের সেভিংস একাউন্ট খোলা হলো। বামনিধি ঘোষ-এর নামে একাউন্ট ওপেনিং ফর্ম, স্পেসিমেন কার্ড, একটা উইথড্রয়াল ফর্ম সই করে দিল শচীরানি। গোপালের বড়শালা বামনিধি, বললে সেও সই করে দিত। হাবাগোবা ছেলেটি দিদির মৃত্যুর পরও ভাগ্নেকে দেখতে শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের বাড়ি যায় প্রায়ই। গোপাল নামটাই নিয়েছে, শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাও দেয়নি। শচী ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি দিয়ে ফর্মগুলি দেখেছে আর বড় বড় অক্ষরে গোপালের কথামতো লিখে দিয়েছে সব। গোপালের সব ব্যবসারই কমিশন এজেন্ট শচী। একখানা অবিক্রীত শাড়ি ছাড়া কোনো কমিশনই গোপাল তাকে দেয়নি কখনও।

নাম—শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র।

সি আর বি আর সি স্যার গোপালচন্দ্রকে পিতার নাম লিখতে দিলেন না। —রোল নম্বরটা লিখে দাও শুধু। আর হ্যাঁ, ক্যাটাগরিটা। সি সি জি। খামে কাগজটা ঢুকিয়ে দাও। যথাস্থানে পৌঁছে দেব। — স্যার, ছেলে যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। বড় অভিমানী ছেলে স্যার। — হ্যাঁ, হ্যাঁ ওসব অভিমান একটু থাকে। — স্যার। এই একটি লোক গোপালচন্দ্রের জীবন ঘিরে সুখের সায়র। ছেলেকে নিয়ে তার সুখ, গর্ব ও দু:খের কথা মুখ ফোটে জানাতে পারে না। মনে মনেই বলে স্যার, ছেলে আমার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতো কিনা না জানি না, কিন্তু জয়েন্ট এনট্রান্স-এর ফর্মে একটা ব্যাকডেট বসাতে পারবে না বলে এপ্লাই-ই করল না। এত সুখ সার্থকজীবন গোপালদাসের। তবু, রাগের মাথায় ছেলেকে বলে, ধর্মপুত্তুর।

সুভাষচন্দ্রের মা আদুরির অসুখেই গোপালেব জীবনে ধর্মবোধের উদয় হলো প্রথম। শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের সুন্দরী কন্যা শচী আর বড়লোক উকিলের আগুনরূপসী হেনা দিদিই তার ধর্মপথের বড় বাধা হয়ে দেখা দিল। আদুরির মৃত্যু থেকে যতটুকু শাস্তি সে পেয়েছে, যথেষ্ট। পঙ্গু হয়ে সারাজীবন বেঁচে থেকে কি লাভ। বেলেঘাটা রেললাইনের পাশে দু-কামরার ঘর মাত্র দুহাজার টাকায় পেয়ে গেল। কিন্তু, এত টাকা কোথায় গোপাল পিওনের। মাত্র কটা টাকার জন্যই সে লোভে পড়ল, প্রথম অধর্ম হলো। সি আর বি স্যারই তাকে আঠায় জড়ালেন। হেনাদিদিকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত যুবক অফিসার চিত্তবাবুর বিবাহেরও প্রধান প্রতিবন্ধক যে অর্থ সে কথা গোপালকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না। ঘাঘু অফিসার তার সঙ্কট সমাধানের প্রস্তাব দিলেন—গোপাল বিয়ে করো। — স্যার, পিওন মানুষ, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। — সব হবে হে। একটা চান্স নেবে? — স্যার। বায়চৌধুবি স্যারের যে কোন বুদ্ধিই ভগবানের নিদান। — একবার মাত্র। একটা চান্স নিই চলো। এ দুনিয়ার সব ব্যাটাই চোর, বুঝলে গোপাল।। শুধু ধরা না পড়লেই হলো। ভৌমিক স্যার আঁটঘাট বেঁধেই তৈরী ছিলেন। ইনসিওরেন্স কোম্পানির দশ হাজাব টাকার চেক জমা পড়ল রামনিধি ঘোষের এ্যাকাউন্টে। চিত্তরঞ্জন স্যারেব বুদ্ধির কেরামতিতে শচীকে পাওয়ার শেষ ধাপে পৌছল গোপাল দাস। লালপাড় শাড়ি একখানা চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনেই নিল। শঙ্কব সিনেমার চৌকিদাবের বৌ দিদির হাতে দিল না এবার। ছেলেব গ্ল্যাক্সো, শটি, নিপল, গরমদিনের জামা, নতুন অয়েল ক্লথ যেমন, সবার সামনে পনের বছবের ছোট শচীকে শাড়িখানা ঘটা করে দিয়ে দিল।

চিত্ত স্যাবের উন্নতি হলো। আট হাজার টাকায় হেনাদিদির সাথে বিয়ে হলো। গোপালদাস দু'হাজারে ভদ্রবস্তিতে দু'কামরার ঘর পেয়ে গেল। চিত্ত স্যাবের প্রমোশন হলো, গোপালও ক্যাশক্লার্ক হয়ে গেল। টাকা গোনায় গোপালেব হাত চলত ফুরফুবিয়ে। টিফিনের আগেই কাউন্টাব, সর্ট, স্টিচ হযে যায়। রাতে তো থাকতে পারে না, ছেলেকে দেখতে যাওয়ার টানেই তাড়াহুড়োয় কাজ শেষ করত। শচীর মা দিদিবও দয়াব শবীর, দুপুরেব খাওযাটা হয়ে যায়। গোপালদাস কিছুই ফোকটে নেয় না। তখন তার হাতে বেশ টু পাইস। আমূল বাটাবেব প্যাকেট, দুশো গ্রাম সুবোধ ব্রাদার্সের চা, টেরিটি বাজাব থেকে স্পেশাল গুড়াখু কিনে দেয শচীর মা দিদিকে। এর মধ্যেই এক দুপুরে তাব টাকাগোনা খাঁচায় এসে পড়ল পাঁচ হাজাব টাকার বাণ্ডিল। ক্যাশ পিওন সতীশই দিযে গেল স্টিচ কবে। আড়াইটা বেজে গেল। হিসেব তো মিলছে না। কাব টাকা। কোত্থেকে এলো। এন্ট্রি হযনি কোনো ভাউচাব? বাণ্ডিলটা সরিয়ে বেখে পাশের কাউন্টারেব শ্যামল সাহাকে দিযে গোনাল। ঠিকই আছে। তার মানে সতীশ কুমারই অন্য ক্যাশিয়ারেব টাকা তাব খাঁচায দিযে গেছে সেলাই করে। গোপাল আব সময় নষ্ট কবে না। বাণ্ডিলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে বেবিয়ে পড়ে। শঙ্কব সিনেমা। তখনও বিয়ে হয়নি। শচীব অনেক খদ্দেব তখন, কাপড় বিক্রির ব্যবসা থেকে প্রচুর টাকা জমছে। গোপাল শচীর হাতে লুকিযে দিয়ে এলো টাকা।

অপবাধীব নাম—শ্রীগোপালদাস মিত্র

পিতা—ঈশ্বর বটকৃষ্ণ দত্ত।

উদ্ধারকর্তা ডি ডি ও সি আর বি সি স্যাব। তিন অপরাধীর শেষোক্ত জন গোপালদাস। তিন জনেবই জামিন হলো এক ঘন্টাব ভিতর। চিত্ত স্যারের এক কথা, কিছুতেই স্বীকাব করবে না। পুলিশকে তো নয়ই, অফিসকেও না। গোপালদাসের মনে পড়ার অনেক পব সতীশ কুমারের মনে পড়ল ভুল কাউন্টাবে টাকা দেওয়ার কথা। গোপাল ততক্ষণে বামাল নিয়ে হাওয়া। পুলিশ ভিজিলেন্সেব অফিসাব রবীন মুখার্জিকেও যখন টপকে যেতে পাবল, তখন তো জিতে গেছে অর্দ্ধেক রাজত্ব। শচীকেও জেবা কবা হলো। শচীরানি জিতে গেল অগ্নিপবীক্ষায়। সব জেনে বিয়ে হলে গেল গোপালদাস মিত্র আর শঙ্কর সিনেমার চৌকিদারের মেয়ে শচীরানির। সুভাষচন্দ্রর মা, না পাঁচ হাজাব টাকার মালিক গোপালদাসেব বউ, কোনটা যে হতে চেয়েছে কমকথার মানুষ শচী, গোপাল বুঝে উঠতে পাবেনি আজও।

সি আর বি আর সি স্যারের বন্ধু মানুষ এই মুখার্জি অফিসার। ডি ডি ওর চেম্বাবে শেষ জেরা হলো গোপালদাসের। ঘড়েল মানুষ মুখার্জি। ঘড়েলরা সৎ হলে বড় ঠ্যাটা হয়। গোপালকে সে ঠিক চিনতে পেরেছিল। গোপালকে যখন কোনো আইনি উপায়ে ধরা গেল না, মনের দিক দিযে একবার মোচড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। মোক্ষম প্যাঁচ।

— মিত্রবাবু, শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরেই আপনাকে ডেকে আনা। জেরা করার কিছু নেই। শ্যামল সাহা সতীশকে টাকা দিয়েছে সে তার জবানবন্দীতেই বলেছে। সুতরাং শ্যামলবাবু নেয়নি, কারণ

সতীশও বলেছে। সতীশ বলছে স্টিচ কবে টাকা আপনাকে দিয়েছে, আপনি বলছেন পান নি, আপনার খাতাপত্রও পবিষ্কার। আসলে এ জেবা নয়, ধর্মেব কাছে পরিষ্কার থাকা। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াব জন্যই সবকার আমাকে টাকা দেয়। আর সতীশ কুমাবদের অপবাধের যে কোনো শাস্তিই কম। ওর পাবিবাবিক স্বাস্থ্যও ভাল নয়। এক ভাই সিনেমা হলের কাউন্টাবে বসত। টাকা নিয়ে উধাও। জিতে যাওয়া ঘোড়সওয়াব গোপালদাস বিবক্ত হতে পারে না। আবাব ভয়ে ঘেমে উঠে। রবীনবাবুব সম্মোহনী চোখ দুটো তাকে জরিপ কবে চলেছে। একটু থেমে আবাব শুরু করেন বেয়াড়া অফিসার।-আপনাকে আমাব শেষ প্রশ্ন মিত্রবাবু। সতীশ কুমারেব চাকবি তো যাবেই। আপনি টাকা নেন নি, শ্যামলবাবুও না। শ্যামলবাবুকে সে টাকা ফেবৎ দেয়নি, তাব ষ্টেটমেন্ট থেকে পবিষ্কাব। এখন আপনিই একমাত্র সত্য বলতে পাবেন, সে অপবাধী কিনা। এক অপরাধীব না নিবপবাধীব শাস্তি হচ্ছে সে আপনিই বলতে পাবেন। আপনিই বলুন সতীশেব শাস্তি হওয়া উচিত কিনা। — আমি কি বলব স্যার। মনে হয়েছে তখন তার গায়ে জ্বরের পবের ঘাম। গোপালদাস সি আব স্যারের মুখে তাকিয়ে সাহস নেয়। — বলুন, বলুন, হ্যাঁ কিংবা না। — আমি কি বলব স্যার, আপনি যা বুঝবেন। ঠিক তখনই ঝপ করে মুখার্জি তাকে ছেড়ে দিলেন। — যান গোপালবাবু। সতীশের চাকবি যায়নি, মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা শোধ দিয়েছে।

ছাত্রের নাম—শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র।

পিতাব নাম—শ্রীজি ডি মিত্র।

পেশা—ব্যাঙ্ক অফিসার।

নামী স্কুলে ভর্তির ফর্ম ফিলাপ কবে দিয়েছিলেন সি আব বি সি স্যাব। গোপালদাস তখনও অফিসার হয়নি। অফিসারশীপ পরীক্ষায় বসেছে। চিত্ত স্যাব বলেই দিয়েছেন,-তোমাব প্রমোশন কে আটকায়। ক্লাস ফাইভের ছাত্র সুভাষচন্দ্র ফর্ম থেকে কখন যে ব্যাঙ্ক অফিসার শব্দটা কেটে দিয়েছিল বুঝতেও পারেনি গোপাল দাস। ভর্তি তাব হয়েছিল কিন্তু ফর্মে কাটাকাটির জন্য মহারাজের গালমন্দ খেতে হয়েছে গোপালদাসকে। শচী গোপালদাসেব চবিত্রেব অনেক অমিলের মাঝেও দুজনই চাইত ছেলেটা মানুষ হোক, বড় একটা কিছু হোক। শচী তাই কাপড় বিক্রির ব্যবসাটাকে আঁকড়ে থাকলো। মাস গেলে তিনশো চাবশোও রোজগাব হয়ে যেত। গোপালদাসের অল্পে সন্তুষ্টি হইল না।

হেড ক্যাশিযাব হয়ে সোনাপুব বদলী হয়ে গেল গোপালদাস। হাউস বিল্ডিং লোন চল্লিশ হাজাবে বাড়ি হলো বোসপুকুবে। বস্তি থেকে উঠে আসায় শচীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। গোপালদাস লোন-এব টাকায বাড়িও কবল, কয়লাব ডিপোও একটা খুলে দিলো বাড়িতে। কয়লার ডিপো চালাতে অনেক খবচ। পেমেন্ট ক্যাশিযার রতিলালেব সঙ্গে একটা পার্টনাবশিপ বফা হয়ে গেল। সকালে টাকা বেরিয়ে গেল, বিকেলে আবাব জলতল সমান। কখনও এক-দুদিন সময় লেগে যায়। অ্যাকাউন্টেন্টবাবুকে নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সই আর দুটো চাবি ঘোবানোই কাজ। খবব গেল বাবার কানে, হেড অফিস থেকে পাঠানো লোক এলো ক্যাশ ভেবিফিকেশনে। ম্যানেজার নির্ঘাত চুকলি কেটেছে। গোনা-গোনতিব যা নিয়ম পেমেন্ট ক্যাশিযাবকে কুড়ি হাজাব টাকা শর্ট দিয়ে কাউন্টারে পাঠিয়ে দিল। ভেতবে কাউন্টিং চলল বাইবে টাকা রিপ্লেনিশড। হেড অফিস পরদিনও আবার অন্য লোককে পাঠালো। মহাবিদ্যায় গোপালদাসেব ভাগ্য তার বুদ্ধিকে কখনও টেক্কা দিতে পারেনি। সি আর স্যারও বলেছিলেন—জানতাম, গোপাল মিত্রকে ধবা বড় সহজ নয়।

আবেদনকাবির নাম—শ্রীগোপালদাস মিত্র।

পদের নাম—অফিসার গ্রেড থ্রি।

সি আর বি আব স্যারের আগ্রহেই অ্যাপ্লাই করেছিল গোপাল। এবং সোনাপুরের হেড ক্যাশিয়াব অফিসার হয়ে গেল। গোপালদাসেব অর্থের অভাব নেই, কয়লার ব্যবসা থেকে আয় মন্দ না। তবু কেসটা তো করে বসল। চিত্তবঞ্জন স্যার বললেন-বুদ্ধি বটে গোপাল। তার বুদ্ধির সাথে সাহসটাও থাকা চাই, তোমার দুটোই আছে।—স্যার। এই একটি জাযগায়ই গোপাল মিত্র বিবশ হয়ে থাকে। — স্যার, আপনি বুঝলেন কি করে?-বুঝাবুঝির কি আছে, এতবড় একটা কাণ্ড, ভিজিলেন্স হলো, তুমিও আছো ব্রাঞ্চে। —স্যার, আমি তখন ছুটিতে স্যাব। — সেটাই তো সন্দেহের কারণ। স্পেসিমেন কার্ড সরিয়ে বানানো কার্ড রেখে চলে গেলে ছুটিতে। কাকে দিয়ে উইথড্র করালে?— স্যার, আমাব শালা রামনিধি। — রামনিধি সই করেছিল? তোমার সাহস তো কম নয়।—না স্যার, সই কবেছিল শচী। — গুড? স্পেশাল অ্যাসিটেন্ট বেচারি মবল। পনের হাজার টাকা মাত্র। এত কম কেস কেন তোমার?

— স্যার। সাত্যি কথাটাই বলে গোপালদাস — স্যার, সুভাষচন্দ্রেব হোস্টেল খরচা হঠাৎ বেড়ে গেল। পেরে উঠছিলাম না স্যার। অফিসার হয়েও স্যার কম ঝকমারি হলো না। তিনজনের পরিবার, তিন অ্যাসটাব্লিশম্যান্টে।

বাবা ছেলের চাকরি হয়ে গেল একই ব্যাঙ্কে। ভিন্ন শাখায়। সুভাষচন্দ্র এক বৎসরেই শাখার নেতা। রাজ্য শাখা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও চলে এলো। চরিত্রের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য সততা আর বক্তৃতা করার সহজাত ক্ষমতায় শ্রমিক নেতা সুভাষচন্দ্র মিত্র ত্রিশ বৎসর বয়সেই এন এস রোড ট্রাফিক আইল্যাণ্ডে বক্তৃতা করল। ছেলে তো প্রায়ই বাড়ি ফেরে না, ইউনিয়ন অফিসেই থেকে যায়। গোপালদাস ছাড়া কেউই বোঝে না বাপ ছেলের টানা পোড়েন। স্যাব বি এস আর বিতে থাকতে অনেকবার বলেছিল। — স্যার এক ব্যাঙ্কে দেবেন না। গোপালদাসের অতীত কি জানে সুভাষচন্দ্র ? কি করে জানবে, ধরা তো পড়েনি কখনও ? গোপালদাসের ঘর করতে করতে শচী কথা বলতেই ভুলে গেছে। গোপাল তাব চাকরি আর ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। ছেলে তো শৈশব থেকেই কথা বলে না। সুবু চাকরি পাওয়ার পর গোপালকে বলল — ছেলেব বিয়ে দাও। অনেকদিন ঘবে শিশুব কলরব নেই। গোপাল সুভাষচন্দ্রকে বলে। সুবু একদিন বলেই দিল গোপালদাসকে — বিয়ে করে এ বাড়িতে থাকব না। এইচ বি এল এ বাড়ি করব, বিয়ে করব। শচী অনেক কাঁদল। কোলে-পিঠে মানুষ করা স্নেহেব পুত্তলি যে তার সাথে কথাই বলে না। কি বুঝবে ? কাকে বুঝাবে ? নিজেব ছেলে তো নয়। গোপালদাসকে কুরে কুরে খায় অন্য চিন্তা, ছেলে বিযে কবে থাকবে না কেন ? কেউ কি তাকে বলেছে তাব মার মৃত্যুব অস্বাভাবিকতা ?

দেড়লাখ টাকার এইচ বি এল লোন পেল সুভাষচন্দ্র, ফ্ল্যাট কিনল চার লাখে। এদিক ওদিক ধার করল প্রচুর। বিয়ে করল তার পুরনো বস্তির চেনা মেযেকে। শ্রমিক নেতা সুভাষচন্দ্রের বিযেতে প্রচুর লোক সমাগম হলো। সুভাষচন্দ্র বাপের কাছ থেকে কিছুই নিল না। গোপালদাস শচীরানি ছেলের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে ভোরে উঠেই চলে গেল, সন্ধ্যেবেলা ফিরে এলো একা একা।

বিযে কবে নতুন বাড়ি করে সুভাষচন্দ্র বেশ হাসিখুশি মানুষ হযে গেল। প্রাযই বিকেলে আসে বউকে নিয়ে। শচীব সঙ্গে দেবকীর মিল খুব। সুভাষচন্দ্র থাকতে দেয না, নইলে শচীকে ছাড়তে তার মন চায় না। সুভাষচন্দ্র এক সন্ধ্যায় বাপকে জানায় তার ব্যাঙ্কেব নতুন সমাচাব। সদ্য অবসবপ্রাপ্ত গোপালদাসেব কাছে ব্যাঙ্কেব যে কোনো খবরই বড় আপনাব। ছেলে জানায নতুন চেযাবম্যান জযেন কবাব খবব। অনেকদিন পর বাপ ছেলে এক হাসির বিষয় খুঁজে পায। খুব হাসে। জযেন কবেই চেয়াবম্যানের দুর্দশা, চেয়ার ভেঙে মড়াৎ। কাগজেও বেরোল পরদিন। জয়েন করার খবর। সুবুটা মজাও করতে পারে। পরদিন কাগজ খুলে বুকে ব্যথা অনুভব কবে একষট্টী বছবেব প্রৌঢ় মানুষ গোপালদাস। ব্যাঙ্ক-এব ভল্টে টাকার বদলে সাদা কাগজেব বাণ্ডিল, ক্যাশিয়াব ধৃত। না, সুভাষচন্দ্র নয। তবু গোপালদাসেব বুকেব ব্যথা কমে না।

শনিবার বউ নিয়ে বাড়ি এলো সুভাষচন্দ্র। শচীর কাছে দেবকীকে সঁপে দেয়। বাপকে বলে — ফ্ল্যাট বেঁচে দেব। দেবকীর বাচ্চা হবে। জেলেও যেতে পারি, ক্যাশ শর্ট আছে। গোপালদাসের বুক এবার টানটান, ব্যথা নেই। স্বাভাবিক স্ববে ছেলেকে প্রশ্ন কবে — কত ? দুলাখ। — ডোন্ট ওরি, ভাবিস না।

আবেদনকারীর নাম পিতাব নাম কিছুই লিখতে হয় না। সি আব বি আব সি স্যারকে নাম না লেখা প্যাকেটটাই জমা দেয়। সুভাষচন্দ্রের বিজিওন্যাল ম্যানেজার চিত্তরঞ্জন ভৌমিক বায়চৌধুবী স্যার। বলে—স্যার, আপনি আমাব ভগবান। দু'লাখ থেকে অনেক বেশী টাকার মালিক এখন গোপাল দাস। সুভাষচন্দ্র বাড়িতে ফিরে আসে, ফ্ল্যাট ভাড়া দেয় আড়াই হাজার টাকায়। গোপালদাসকে অবাক করে রাত দেড়টায় দেবকীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মায়। ধাই ডেকে ঘরেই প্রসব হয়।

নাতি জন্মের খুশিতে বাইপাস দিয়ে সল্টলেকে সি আর বি আব স্যারের বাড়িতে যায়। সঙ্গে একটা রেকারিং ডিপোজিটের ফর্ম। — স্যার। এই একটা জায়গায় সত্য ছাড়া কিছুই বলতে পারেনি গোপালদাস। স্যার, নাতির জন্ম রাত দেড়টায়। — তোমার ঘড়ি দু'ঘণ্টা ফার্স্ট ছিল বোকা। — স্যার! চিত্তরঞ্জন ভৌমিক রায়চৌধুরী স্যার বলে যান কাঁপা কাঁপা হাতে গোপালদাস লিখে যায়—

নাম — শ্রীমোহনদাস মিত্র (মাইনর)
পিতার নাম — শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র (স্টাফ)
নাবালক হইলে জন্ম তারিখ-২রা অক্টোবর ১৯৯২ (শুক্রবার)

বদরুজ্জামান চৌধুরী

ফুলজান বিবির কথামালা

উঠোনের একধারে সীমের গাছগুলোতে এখন আর কাঁচা সীম নেই। ধরেছিল এবার। সীমের এতো বেশী ফলন গত বছর কয়েক হয়নি। ফুলজান নিজে গর্ত খুঁড়ে তাতে গোবর, ছাঁই, বাজ্যের যতো আবর্জনা ডাঁই করে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিলো। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ যেতেই গোটা ত্রিশেক বীজ পুঁতে দিলো। বীজগুলো সে তার মাসীর বাড়ি থেকে জোগাড় করে এনেছিলো। 'জল্‌দী' জাতের সীমের বীজ। আশ্বিনের শেষাশেষি ধরতে আরম্ভ করে। অন্যজাতের বীজের গাছে কার্তিক না ফুরোলে সীম ধরেই না। মুশকিল এই, ভালো জাতের ফসলের বীজ গ্রামের বৌ-ঝিরা কখনো স্বেচ্ছায় অন্য কাউকে দিতে চায় না। বিশেষ করে নিজে বীজ বপন করার আগে। মাসীকে বলে গত বছরও কিছু বীজ এনেছিলো ফুলজান। কিন্তু কার্তিক পেরোবার আগে সীমগাছে ফুলই এলো না। ফুলজান আসলে ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলো না। মাসীর জায়গায় সে এলেও এমন ধোঁকাবাজি চালাতো। তবু রেগে মাসীকে মনের ঝাল মেটাতে বেশ কিছু গালিগালাজও করেছিলো। অবশ্য মাসীর দিব্যকান না থাকলে বোনঝি'র মিষ্টি বিশেষণগুলো শোনার সম্ভাবনা ছিলোনা মোটেই।

মাসির বাড়ি দূর অনেক। বাসে চড়ে গিয়েও বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। বিয়ের আগে বার দু'য়েক গিয়েছিলো ফুলজান। বিয়ের তিন বছরের মাথায় পরপর দু'বার যাওয়া হয়ে গেলো। শেষের বার একটা বিশেষ কাজে। পাশের বাড়ির মনই দোকান দেয় ডিমাপুরে। তার মা ফুলজানকে ধরে বসে একটা পাত্রী দেখে দিতে। ফুলজান মাসীর দ্বিতীয়া মেয়েটির কথা সুপারিশ করে। দেখা-শোনায় মন্দ নয়, বাংলাও পড়েছে কিছুটা,-পাঠশালা পাশ। মনইর মা বললো, 'ঠিক আছে, তুমিও চলো ফুলবৌ। তোমার যাওয়া-আসার ভাড়া আমি দিমু। পুড়ী আমি দেখি আগে। পুয়ায় ইবার বিয়া কর্‌তা খবর দিছোইন্। পুড়ী তুমি দেখি তোমার পছন্দই অইতে অইবো ই-কথাও কইয়া দিছোইন্। পুয়ার আমার তুমার উপর খুব বিশ্বাস।'

ফুলজান ঠোঁট ভেঙ্গে সামান্য একটু হাসলো বুড়ীর অগোচরে, সাবধানে। বিশ্বাস না ঢেঁকি!

ফুলজানের নিজের শাশুড়ি নেই। বিয়ের বছরই মরে গেছে। শ্বশুর গেছে যে এ'বাড়িতে বৌ হয়ে আসার অনেক আগে। মনই আর ইরফান একই গোষ্ঠীর, তিন-চার সিঁড়ির ব্যবধান। ইরফানের সম্পর্কে মনইর মা ফুলজানের চাচী শাশুড়ি আর মনই দেবর। চাচী মানুষ খুব ভালো। মনইদের অবস্থা আগে ভালো ছিলোনা। মনইর বাবা লোকের বাড়িতে চাষের মরশুমে ক্ষেতের কাজ করতো। অন্য সময় দিন মজুর। গ্রামদেশে ক্ষেতের মরশুম ছাড়া কাজ পাওয়া ভার। কাজে কাজেই মনইদের পরিবার সুদ্ধ মাঝে মধ্যে উপোষ দিতে হতো। এখন ওদের দিনকাল বদলে যাচ্ছে। প্রথম ডিমাপুর পাড়ি দিয়ে মনই একটা লোকের ভূষিমালের দোকানে কাজ ধরেছিলো। তারপর একটা রুটিওলার তুন্দুরে। এখন তার নিজস্ব একটা ছোট্ট পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। মাসে মাসে বাড়িতে বাপজানকে টাকা পাঠায়। ছোট দু'বোন ছিলো। দু'বছরে দুটোকে পার করেছে। এখন ছোট একটা ভাই মঈন। সে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে সেভেনে পড়ে। মনইর ইচ্ছে আর একটু বড় হলেই সে ছোট ভাইটাকে দোকানে নিয়ে যায়। দোকান বড় করতে হবে। পয়সা দিয়ে লোক রাখলে খরচাতো আছেই, তদুপরি সৎ এবং পরিশ্রমী মানুষ তো পাওয়া যায়ই না।

মনইর মা চাচী একটু সময় পেলেই ফুলজানের কাছে এসে বসে। ফুলজানও যায় ও'বাড়ি। চাচী দু'টো সুখ-দু:খের কথা বলে। ফুলজানও নি:সঙ্কোচে ওর কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারে। কালও চাচী ওকে সান্ত্বনা দিয়েছে, 'সবর, খালি সবর। সবরে আল্লা রাজী থাকে। দুনিয়াতো দিন-দুই।' বাকী সব পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েলোকদের স্বভাব-খাছিয়ত তো ফুলজানের দেখা। এর কথা ওকে বলা, এরসঙ্গে

বসে একসঙ্গে অমুকের খুব কুৎসা জীবত করলো, তারপব অমুকের বাড়ি বয়ে গিয়ে বলা সব কথা দশগুণ রঙ চড়িয়ে, কেবল সাবধানে নিজের উচ্চারিত কু-কথাগুলো বাদ দিয়ে।

মনইদের পাশের ঘব ফজিবদের। মনইর আপন চাচাতোভাই। রিক্সা চালায়। ফজিবের বৌটার বড় হাতটান। সেবাব ফুলজানের ঘরে গিয়ে পিঁড়ি টেনে বসেই বলে, 'থুড়া পান দে ফুলজান, ভাত খাইয়া একটুকরা গুয়া পানদি মুখে দিমু তার উপায় নাই। কাইল তর ভাইছাব রাইতে বাড়ি ফিরতে পান আনছে না। জিগার করলাম, কয় ফাউরি গেছে। সাবা রাইত একটা মাতও মাতাইতো পাবছেনা তব ভাইছাব। নিজে বিড়ি খায়, আনতে ফাউরে না। আমি থুড়া সামান্য পান-সুপাবী না অইলে চলতে পারি না, ইতা রোজ ফাউরে আনতে। আসলে মরদ মানুষগুইন্ বড় হারামী, মুখো খালি পীরিতি পীবিতি, কামেব বেলা আত-পাত ধরবো, কাম ফুরাইলে পুঁদে মাবে লাথি!'

ফজির ইরফানের বয়েসে বড়। ভাসুর ঠাকুরকে ফুলজানের চেনা, তার রাতের খবর জানায় তার কোন আগ্রহ নেই। সুপারী না খেয়ে ফজিরাদা'র বৌটা যাবে না ফুলজান জানে। আর সুপারী মুখে দিয়েই সে চলে যাবে সে আশাও দুরাশা! পান-সুপারীর বাটা আনতে ফুলজান ভিন্ন কোঠায় উঠে গেলো। ফিরে এসে বাটায় পান-সুপারী-চূন-সাদা দিয়ে বললো, 'খাও ভাবী। তুমি তো আর গরীবোর বাড়ি আসোই না!'

'আইতাম কুন্‌বালা!' গালে পান-সুপারী-চূন-সাদার পুঁটুলীটা ঠেসে গুঁজে দিয়ে কিছুক্ষণ চিবোলো ফজিরের বৌ। তারপরে প্যাঁচ করে বেশ খানিকটা পিক্-লালা-কফ্ মিশ্রিত তবল পদার্থ বিশেষ নিক্ষেপ করলো দাওয়ার ঠিক নীচেই। ফুলজান ঘৃণায়, বিরক্তিতে তবু নিরুপায়, যেখানে-সেখানে পিক-থু থু ফেলা তার না-পছন্দ, কিন্তু মাগীকে কিছু বলাও যায় না। যা চোপা, ঝগড়া বাঁধিয়ে কুরুক্ষেত্র করবে। ফজিরের পেয়ারের বিবিজান পিক উৎক্ষেপিত করাব পব মুখবিবরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে চিবোনো সুপুরীর মণ্ড ওলোট পালোট করে নিয়ে বললো, 'তুইন তো আরামো আছোস্, বাইচ্চা-কাইচ্চা নাই, বিয়ার তো বছর তিন অই গেলো! আমার বুকো-পিঠো, কান্ধো-খাঁখো পনে দুই গণ্ডা! এবে সো, ওষুধ-ফষুধ থুড়া কুছ্ খাইছত নি? আইজ-কাইলতো কতো বকমের ছিনালী বারইছে। তিন বছবে তো চাইরটা বাইচ্চা দুনিয়া দেখার কথা। তর ভাইছাব হি-দিন আরে জিগার করলো-'

ফজির আলী সম্পর্কে ভাসুর হলেও মতিগতি যে তার ভালো নয় সে তথ্য ফুলজানেব জানা। ইরফান একবাব বাজারে সস্তায় একটা বড় মাছ পেয়ে যাওয়াতে সেটা দিয়েছিলো ফজিবদা'র কাছে তাব বাড়ি পৌছে দিতে। ইরফান শহরে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেবিয়ে যায়। রাতে ফেরার সমযেরও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তখন সমস্ত দিন, বাতেরও প্রথম ভাগেব অনেকটা সময় ফুলজানকে একা থাকতে হতো। ফজির মাছ দিতে এসে সুযোগ পেয়ে ফুলজানের শবীবেব সুখ চেটে নিলো। ফুলজান চিৎকার কববে ভেবেছিলো, ফজিব সাবধান কবে দিয়েছিলো, 'চিখ্ দিলে তোব ও বারোটা বাজবো ফুলজান! ইরফান আমার লগে ঝগড়া-মারামারি যেতা করাব পবে কববো, কিন্তু তোর উপায় কিতা?'

ফুলজান ঘটনাকে একটা দুর্ঘটনা হিসেবেই মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু এরপর থেকে সে সতর্ক হয়ে থাকে। ফজির মুরগীর স্বাদ পাওয়া শেয়ালের মতো আবো একদিন জিহ্বায় লাল ঝরিয়ে এসেছিলো। ফুলজান মাছ-কাটা দা'খানা দেখিয়ে বলেছে, 'ফজিরদা', যে দা' মাছ কাটতো পাবে হেউ দা মানষোর গলাও কাটতো পারে।' ফজিরের সাধ আহ্লাদের সেখানেই ইতি।

ফজিরের স্ত্রী কথায় ফুলজান বললো, 'ওষুধ খাইতাম কেনে ভাবী, আল্লা যেদিন দিবার দিবা।' মনেমনে বলে। 'তর লাখান গণ্ডা গণ্ডা ছানা করোনী আমার দ্বারা সম্ভব অইবোনা!'

আরো কিছু সুকথা-কুকথা বলার পর ফজিরের বিবি উঠে বাড়ি যায়। কিছুক্ষণ পর ফুলজান আবিষ্কার করলো, একটা খালুইতে হাঁসের যে পাঁচটে ডিম রাখা ছিলো, তা' থেকে দু'টো ডিম নিরুদ্দেশ। বুঝলো এ' নিশ্চয় ফজিবের মাগীটাব কাজ। তিনটে ডিম কাল অবধি ছিলো, আজ সকালে হাঁস-মুরগী ছাড়ার খোঁয়াড় থেকে নিজ হাতে আরো দু'টো তুলে রেখেছে। ভেবেছিলো হালি চারেক হলে বিক্রী করে ফেরীওলার কাছ্ থেকে একজোড়া গিল্টি সোনার দূল কিনবে। হারামজাদীর জন্যে প্রথমেই বাধা পড়লো! ফজিরের স্ত্রীকে এখন 'হারামজাদী' ছাড়া আর কি-ইবা বলা সম্ভব ফুলজানের পক্ষে!

আসলে সাত্যই খাবার বাড় ব্যবহার করে যে । ইরফান প্যাকেট কিনে এনে দেয় নিয়মিত । ফুলজান মৃদু আপত্তি করেছিলো, 'মান্ষে যদি জানতো পারে ?'

ইরফান বলেছিলো, ' জানতো কিতা কবি ? তুইন্ আব আমি কিতা মান্ষোরে বইয়া কইয়া বেড়াইতাম নি যে তুইন বড়ি খাছ ! আব জানলে-উ বা কিতা আমড়া কে কববো ? আমি কেউরোব খাই না পিন্ধি ? শরো যাই, দেখি পেবায সব পরিবাবউ একটা দুইটা, বেশী অইলে তিনটা । ফজিরজা'র লাখান ব্যাঙোর পনাব দরকার নাই আমার । আরো থুড়া সময যাউক্, তখন একটা নেওয়া যাইবো ।'

ফুলজান আসলে কিন্তু একটি সন্তান চেযেছিলো, একা একা ভালো লাগেনা সাবাটা দিন । দু'জন মাত্র মানুষেব জন্যে কি এমন বাঁধা-বাড়া কি এমন ঘরকান্নাব কাজ ? সাবাটা দিন অকাজে, সঙ্গীহীন যায । ফজিবেব স্ত্রীব মতো পাড়া প্রতিবেশীনিদেব আসা সে পছন্দ কবেনা । কেবল মাত্র মনইব মা, এমন আরো দু'চারজন । মঈন ছেলেটা কখনো বিকেলে, কখনো স্কুল ছুটিব দিন আসে । কিন্তু সে বসে না । বিকেলে তাব খেলাধূলা, সঙ্গী-সাথীদেব সঙ্গে ধান কাটাব পর দূব-দূবান্তেব মাঠে কেয়াবনে শেয়াল খুঁজে বেড়ানো কুকুব সঙ্গে নিযে । একমাত্র ফুলজানেব বাড়িব পেয়াবা গাছটায় পেয়ারা পাঁকলে, জাম্বুবা গাছে জাম্বুরা বড় হলে তবে মঈন এবং তাব বন্ধুদেব ঘনঘন আগমন ঘটে ।

মনই-মঈনের বুড়ী মা'র দিল ববফেব মতো সাদা এবং ঠাণ্ডা । ফুলজানকে বলে, 'বৌ দিন তো বহুত গেলো ! পুয়া-পুড়ী না অইলে বেটা মান্বে মন বান্ধি বাখা যাযনা, হাজার রূপ-যৌবন সব-উ বিবযা । রূপ পুবোব ছৈযদ সায়বোর পানি পড়ায বড় কাম দেয । যার ব্যারাম তাব নিজে গিযা আনা লাগে । ইরফানরে কইও ।'

ইরফানেব পানি পড়া, তেলপড়া, ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস, এত্বাব নেই । বলে, 'হি গুলান মান্ষে টাটা ভবি হাবাদিন ছাগলোব লাখান গুযা-পান চিবায । মুখোর কোপা বাইযা গুয়ার কষ্ পড়ে । কথা কইতে থু-থু [illegible] । তাবাব পানি পড়া, তেল পড়া, নূন পড়ায থু-থু পড়ে । ব্যাবাম কমা তো দূব অস্ত, জখা-টখা অইবাব সম্ভাবনা ।'

ফুলজান চাচী বুড়ীকে নিযে মাসীব বাড়ী গিযেছিলো । মাসীব ঘবে পাঁচ মেযে । ছেলে দু'জন । মেসোর অবস্থা যেমন ঐ দেশের বেশীব ভাগ মানুষেব, ঠিক তেমনই । নিজেব খুব সামান্য কিছু জমি আছে, বিক্রী কবে কবে এই সামান্যতে এসে পৌঁছা, কিছু অন্যেব ভাগচাষে বাখে । যে বৎসর বন্যা অথবা খবা বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে ফসল-জমি, মাঠ-ঘাট গ্রাস কবে নিয়ে না যায, সে বৎসব পাঁচ-ছ'মাস ঘবেব ভাতে চলে । এ'সব ঘবে এক একটা মেযে পার কবা মানে এক একবাব ফাঁসীকাষ্ঠে উঠা । ভিখাবিনীর ছেলেও এখন বিযে কবাব সময় কনে বাড়ি থেকে ট্র্যানজিষ্টার, হাতঘড়ি দাবী করে ! মাসীর ঘবে এখনো চাব-চাবটে মেযে বিবাজিত-মওজুদ ! মাসীব বড় মেযেটা ফুলজানেব থেকে সাতমাসে বড় । ওদেব পাশেব গ্রামে এক ঠেলাওলার সঙ্গে বিযে হয়েছে । দু'নম্বব বোনটা চৌদ্দ-পনেরোর । পাঠশালা পাশ কবে বাড়িতে মাযেব ঘর-সংসারেব কাজে-কর্মে সাহায্য কবে । গ্রামেব জুম্মা-মসজিদের ইমাম সাহেবের প্রভাতী মক্তবে গিযে কোবাণশরীফ পড়াও আবম্ভ করেছে । ফুলজান একান্তে মাসীব কাছে এবার তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে জানায যে মনই ছেলেটি ভালো, টাকা-পয়সা করেছে, আগামীতে আরো উন্নতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল । ফুলজান চেষ্টা কবলে মনইর মা, মনই নিশ্চিত অরাজী হবে না ।

এর আগে এসে ফুলজান মাসীব বাড়িতে এতো আদর-যত্ন পাযনি । একরাত থাকতে এসেছিলো ফুলজান, চাচীকে নিয়ে দু'বাত কুটুম কবার পবও জোর কবে ফিবতে হলো । মেসো হাট থেকে ফুলজানের জন্যে একখানা ছাপা শাড়ী, জামাই বাবাজীব জন্যে একখানা লুঙ্গী এনে দিলো । মনইর মা চাচী ও বেহাই সাহেবের কাছ থেকে একখানা মিলেব ধূতী উপঢৌকন হিসেবে লাভ করলো ! মেয়ে বেহানের পছন্দ হয়েছে কিনা মাসী বোনঝিকে বিদায় দেবার সময় হাতে ধবে খুব অনুনয সহকারে জানতে চাইলে ফুলজান নির্ভয় দিয়ে বলেছিলো, 'বুড়ীব পছন্দে না-পছন্দে কি আসে যায় ! আমাব পছন্দ মনইর পছন্দ । আর চাচীর ও জরুর পছন্দ অইবো । আমিনাবে কে অপছন্দ করতে পারবো ! আমিনারে কইও বিয়া অওয়ার বাদে যেন এই গরীব বইন্রে মনে রাখে !'

মাসী বিনয়ে গলে যেতে যেতে বলে, 'আমিনা চিরদিন তোমার দাসী-বান্দী অইয়া থাকবো মাঈ ফুলজান ! । এমন উপকারীরে যে ভুলবো তার জানি হাবিয়া দোজখো জাগা অয়।'

কথাটা শুনে সেদিন হয়তো বিধাতা সাত আশমানের উপব তাঁর তখ্‌ত্‌, সিংহাসনে বসে ব্যঙ্গ হাসি হেসেছিলেন। আজ দাওয়াব মাটিতে পা ছড়িযে বসা অবস্থায় মাসীর সে কথাগুলো মনে পড়ায় ফুলজানের হাসি এলো বড় দু:খে।

ফুলজান মাসীকে একটামাত্র শর্ত দিয়েছিলো, 'কিন্তু একটা কথা মইজী —

'কিতা মাঈ?' মাসী শুধিয়েছিলো।

'গতবার তুমি আমারে বড় ঠগ দিছো। ই-বার আস্‌লি আগুড়ি জাতোর উবির বীচি দিবায়।'

মাসী হেসে ফেলেছিলো।

'ও, ঐ কথা! তোর বাপোর ঈমান বড় কম বেটী, বুড়া মানুষ, আগুড়ি জাতোর বীচি, কঁদু উরির বীচি, আঈনা-সব জাতোর উরি আমার আছে, একটা দিতে ভুলে অন্যটা দিছি। আইচ্ছা, এবার চাইয়া দেখি দিমু!'

মাসী এবার আর ঠকায়নি, ঠিক বীজই দিয়েছিলো।

সীম ধরেও ছিলো খুব। ইরফান নিজে তো খেয়েছে, কিন্তু কতো খাবে, প্রতিবেশী আত্মীয়-কুটুম্বদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু দানও করেছে। তার উপর খালুই-খালুই কবে প্রত্যেক হাটবাবে ব্যাপারীব কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রীও করে এসেছে। এতো অগ্রিম বাজারে আর কেউ সীম ওঠাতে পারেনি। সেজন্য দরও পাওয়া গেছে আশাতীত।

খাওয়া-দাওয়ার পব ফুলজানের এখন শরীবে বড় অবসাদ। দাওযায় পা ছড়িয়ে সে অলস বসে। ম্যাসী চাপে পড়ায় এবার তাকে ঠকাতে সাহস কবেনি—তার আহ্লাদিত হবাব কথা, কিন্ত তাব মনে এখন কোন সুখ, কোন আহ্লাদ, কোন আশার কণামাত্র অবশেষ নেই। পা ছড়িয়ে এখন শুধু তাব কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

জ্যৈষ্ঠেব শেষে ফুলজান মনইব মা'কে নিয়ে গিয়েছিলো মাসীব বাড়ি। মাসীকে কথা দিযেছিলো আমিনার বিয়ে সে দিয়ে দেবে। আষাঢ়ের সপ্তাহান্তে সীমের বীজ সে মাটির গর্ভে স্থাপন কবেছিলো। মনই এলো ডিমাপুর থেকে যখন তখন সীমের লতানে গাছ কঞ্চিব আশ্রয়ে দ্রুত বর্দ্ধনশীল। ফুলজানের অন্তরের অফুরন্ত অপত্য স্নেহ যেন সুধাধারা বর্ষণ করছে সে লতাগুলোতে। কৃষক বমণীব তো এমনি স্নেহসুধায় উপচে পড়া হৃদয় অবুঝ অবোলা লতা-বৃক্ষের প্রতি।

তারপর যখন সে লতাগুলোর বোঁটায় বোঁটায় এলো অজস্র নক্ষত্রের মতো ফুল, তারপর থোকা থোকা ফলের ভারে আনত হলো মাতৃরূপিনী লতাকুঞ্জ, তখন ফুলজানের কিন্তু অন্তর ভরা সুধারস শুষ্ক, নি:শেষ। একটা সীমও সে পাতে তুলেনি।

আজ সে লতাগুচ্ছে ফুল ও ফলের সমারোহ নেই সত্য, কিন্তু লতায় লতায সে লতাকুঞ্জ রেখে যাচ্ছে বিস্তর শুষ্ক বীজ-তার সে উত্তরাধিকার। লতাগুচ্ছে ফুল-ফল আসার আগেই সীমেব ঝাড়টাকে দা'ও দিয়ে কেটে ফালাফালা করে দিতে রোখ চেপেছিলো তার বেশ ক'দিন। কাটেনি। ফুলে-ফলে ভরন্ত মাতৃস্বরূপা গাছ কাটলে গৃহস্থের বড় অমঙ্গল। ঘৃণাও নারীকে সে সংস্কাব থেকে চ্যুত কবতে পারেনা!

ফুলজানও ফুল ফোটাতে পারতো, ফল ধরাতে পাবতো! আঁকশী বেয়ে ওঠার নির্ভরতা সেও পেয়েছিলো কিন্তু —

সে আগে জানতোনা বমণীর, বিশেষ করে মুসলমান কৃষক রমণীর আঁকশীর নির্ভবতা বড় ভঙ্গুর, বড় অনির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসঘাতের ঘূণ সে আঁক্‌শী খুব দুর্বল করে রেখেছে! সে যদি আগে জানতো তবে একটা বড়ি অন্তত: সে খেতে ভুলে যেতে পারতো!

মনই ইরফানকে সঙ্গে নিয়ে আমিনাকে দেখতে গিয়েছিলো। ওরা ফিবে আসার পর ইরফান ফুলজানকে জানালো, 'মই কইলো তুইন্‌ নাকি কথা দিয়া আইছশ্‌! মনইর এখন বহুত টেকা। ঠেলাওলার ভায়রা হে অইতো চায় না!'

মনই ফিরে যাবার আগে একান্তে একদিন ফুলজানকে বলে গিয়েছিলো, 'ঠেলাওলার ভায়রা অইতে আমার আপত্তি কিতা ফুলভাবী, আমার বাপতো দিনমজুর ছিলো একদিন! আসলে আমিনারে দেখি ইরফানদা'র মাথা ঘুবি গেলো। প্রেম-ভালোবাসা বড় মূল্যবান ভাবী, মনো আছেনি তুমি আমারে একদিন ফিরাই দিছিলা, আমি ইরফানদা'রে ফিরাইতে পারলাম না! অথচ ফজিরদা'র মতো জোরে আদায় করে নিতে জানতাম—'

ফজিরেব ব্যাপাবটা মনই কেমন করে জানলো জানেনা ফুলজান । মনইব মতো সংসারে ফজিবকেই একমাত্র ইতব ভাবেনা ফুলজান । সংসারে সব পুরুষেরাই পাবলে পরস্ত্রীব সতীত্ব লুঠ করে । বিশ্বজোড়া ইতবদেব কাতাবে ফজিরই একমাত্র অপবাধী তা তো হতে পারেনা ।

আলাদা একটা ঘব কবেছে ইবফান আমিনা সুন্দবীব জন্য । কোন কাম-কাজ কবে না আমিনা । একমাত্র খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ আব ইবফানের সঙ্গে শোযা ছাড়া । বিবি এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে ঘবেব দবজায এসে আড়মোড় ভেঙে জড়তা কাটাচ্ছেন । আমিনাব উদরদেশস্থ ফুল এই ক'মাসেই বেশ স্ফীত । ফুলজানেব মনে হলো স্ফীত ফুলেল উদব দেশটাই নগ্ন অসভ্যতাব একটা সর্বাত্মক নজির ।

অরিজিৎ চৌধুরী

মানবাধিকার

মা, এখন আমরা কী করব ?

সুতপা বোবা দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ছেলেব দিকে, কী উত্তর দেবেন এই প্রশ্নের ? কী করা যাবে এখন এই দুটো জীবন নিয়ে ? বেঁচে থাকাব আব কোন মানে হয় না। বুবুনের বযস কম, ভাল চাকরি করে। বুবুন হয়ত একদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। হয়ত একদিন বুবুন ভুলে যেতে পারবে। এই শোক। বুবুন যাতে ভুলতে পাবে সুতপাব সেই চেষ্টাই কবা উচিত। কিন্তু কেমন করে ? কোন্ মন্ত্রবলে ? চোখের জল যে এখনো অবিবাম ঝবতেই থাকে, দুমিনিটও মাথা তুলে বসতে পারা যায না, এখনো যে শুধু মনে পড়ে গৌরবেব সাবল্যমাখা মুখখানা আব মণিময়েব ভবাট গলাব শেষ কথাগুলো। আমি মর্নিং ওয়াক করে আসছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।

পুলিশের উঁচুপদে চাকবি করতেন মণিময। প্রথম জীবনে কিছুদিন শিক্ষকতা কবেছেন, তারপব সিভিল সার্ভিসেব পরীক্ষায বসে পুলিশে যোগ দেন। ইচ্ছে ছিল এ সি এস হবাব। পবীক্ষাব ঠিক আগে অসুস্থ হবার জন্য প্রস্তুতি ভাল হল না, তাই পুলিশ সার্ভিস্ই নিতে হল। পুলিশে তিনি কোন দিনই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি, তাই জীবনের বেশিব ভাগ সময়ই কাটিয়ে দিতে হয গোযেন্দা শাখায। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সুতপা জানেন কত কষ্ট কবে সংসার চালাতেন মণিময। শেষ জীবনে মাইনে বেড়েছিল, ছেলেও ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ কবাব আগেই ক্যাম্পাস ইন্টাবভিউ দিয়ে চাকবি পেয়ে গিযেছিল। গৌহাটিতে একটা ছোট বাড়িও ধারদেনা কবে বানাতে পেবেছিলেন মণিময। শিলঙে বহুবছর কাটিয়েছেন উনি। শেষ বয়সে শিলঙেই থাকাব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খাসি স্টুডেন্টস ইউনিযনেব আন্দোলন ও সমতলবাসী বিরোধী দাঙ্গার জন্য সেই পবিকল্পনা ত্যাগ করতে হয। কোথায় বাড়ি বানানো হবে তা নিয়ে খুব টানাপোড়েন চলছিল পবিবাবে বেশ ক'বছব ধবে। সুতপার কলকাতায় ফ্ল্যাট কেনাব ইচ্ছে ছিল। মণিময়ের কলকাতার গরম সহ্য হয় না, উনি চাইছিলেন শিলচর অথবা গৌহাটিতে থাকতে। শিলচরে ছেলেদের আপত্তি। এত ভেতবে, যোগাযোগেব সমস্যা, তাছাড়া চাকবি বাকরিব সুযোগ নেই, জিনিসপত্রের অসম্ভব দাম, কারেন্টও থাকে না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল গৌহাটিই ভাল। মণিময়ের চাকরিও গৌহাটিতে। তাতে সুবিধেই হয়েছিল, কোযার্টার্সে থেকে বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা কবতে পেরেছিলেন। বুবুনও প্রাইভেট কোম্পানীতে মোটা মাইনেব চাকরি পেযে গেল। পোষ্টিং হল মহারাষ্ট্রে। ছোট ছেলে গৌরব ততদিন এইচ এস এল সি পাশ করেছে। ওব রেজাল্ট বুবুনেব চেয়েও ভাল হল। গৌহাটিতে আসামের সবচেয়ে ভাল কলেজেও হায়াব সেকেণ্ডারী পড়ছিল।

সব মিলিয়ে সবে সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছিলেন মণিময় ও সুতপা। রিটাযারমেন্টের বছর খানেক বাকি ছিল মণিময়ের, ইচ্ছে ছিল রিটায়ার কবার আগেই বুবুনের বিয়ে দেন। বুবুন অবশ্য কোন মতেই রাজি হচ্ছিল না। তার অনেক পরিকল্পনা, আরো পড়াশোনা কববে আরো ভাল চাকরি কববে বিলেত যাবে। বাবা-মা-ভাইকে সেখানে নিয়ে যাবে, দেশেও একটা এষ্টাব্লিশমেন্ট থাকবে - এইসব।

সেদিন মণিময় যখন মর্নিং ওয়াকে যান গৌরব তখন পড়ছিল। বুবুন তখন মহারাষ্ট্রে। সুতপা মণিময় বেরিয়ে যাবার মিনিট পাঁচেক পর দরজা বন্ধ করেছিলেন। কোলাপসিবল গেটেও তালা দিয়ে রেখেছিলেন। মণিময় যে পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার, সেরকম অফিসারের বাড়িতে খুব কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। আজকাল উগ্রপন্থীদের উৎপাত, তাই বেশি সাবধান থাকতে হয়। মণিময় অবশ্য কোন দিনই তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর। বলতেন ভেব না, আমাকে কেউ কিছু করবে না। সুতপা কখনো কখনো বিরক্ত হয়েছেন, রাগ করেছেন। মণিময়ের

তুলনায অনেক নিচু পদেব অফিসাররাও আজকাল গাড়ি ছাড়া বেবোয না। মণিমযেব এসব বালাই ছিল না। নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্ম তিনি পাযে হেঁটেই করতেন। সুতপা বলতেন, কেন পি এস ও সঙ্গে নিয়ে যাও না? মণিময হাসতেন, কী হবে পি এস ও নিযে বল? বডিগার্ড সঙ্গে ছিল এমন কত লোককে এক্সট্রিমিস্টরা মেবেছে ভুলে যাও কেন? চিন্তা করো না, আমাকে কেউ মাববে না। আমাকে পুলিশ বলে চেনে ক'জন? জীবনে উর্দিই পরলাম না বলতে গেলে।

মণিময মর্নিংওযাকে বেবিযে যাবাব মিনিট কুড়ি পর বাড়িব সামনে অনেক লোকেব পাযেব শব্দ শুনতে পেলেন সুতপা। তাবপর ঘন ঘন কলিং বেল বাজতে থাকে। ওদিকে ফোন বাজারও শব্দ হতে থাকে। সুতপা কোনদিকে যাবেন ঠিক কবতে পাবেন না। গৌবব বাথরুমে। কাজেব লোক বাইবে। দৌড়ে গিযে দরজাটাই খোলেন সুতপা। বেশ কিছু লোক দাঁড়িযে বাইবে। কাবো কাবো মুখ চেনা।

কী হয়েছে? কী হৈছে?

বাউদেউ.....

কী হৈছে কওঁক।

লোকগুলো ইতস্তত কবছে। সবাব মুখে কালো ছাযা। কিছু একটা বলতে চাইছে, পাবছেনা।

কী হৈছে মোক কওঁক। ধমক দেন সুতপা।

বাউদেউ, স্যারক্ গুলি কবিছে।

গুলি করিছে?

হয বাইদেউ। ডেডবডি বাটত পবি আছে, পুলিশক খবব দিয়া হৈছে। ডেডবডি? রাস্তায পড়ে আছে? এসব কী বলছে ওবা! প্রাণপণে চিৎকাব দেন সুতপা, না না না, এ হতে পারে না। এ কিছুতেই হতে পাবে না। গৌবব কোথায তুই? গৌবব, তাড়াতাড়ি বেবো বাথরুম থেকে। তোর বাবাকে মেবে ফেলেছে। ওগো, তুমি কোথায় —

সুতপা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। বারান্দায বসে পড়েন।

তাবপবের কদিনেব ঘটনা সুতপা আব এখন মনে কবতে চান না। কিন্তু সেই দিনগুলির স্মৃতিই মনেব মধ্যে জগদ্দল পাথরেব মত চেপে বসে থাকে। বক্তে ভেসে যাওযা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পবা মণিমযেব মৃতদেহ, বাবাব শোকে গৌববেব টিক-টুযেন্টি খাওযা, বাড়ি ও হাসপাতালে ভি আই পি, অফিসাব ও সাংবাদিকদেব স্রোত, বুবুনেব জন্য অপেক্ষা, মহাবাষ্ট্র থেকে উদভ্রান্ত পাগলেব মত বুবুনেব গৌহাটি ফেবা, দিন কুড়িব মধ্যে দুদুটো মৃতদেহকে নবগ্রহ শ্মশানের চিতাব জন্য সাজিযে দেওযা, দুদুটো শ্রাদ্ধ, আত্মীযস্বজনদের ভিড়, মিথ্যে সান্ত্বনা আব সীমাহীন শূন্যতা, ভয ও আতঙ্ক, — এত খারাপ সময় খুব কম লোকেব জীবনেই আসে!

যখন উনি মর্নিংওযাক কবছিলেন, তখন মোটব সাইকেলে করে এসে দুটো ছেলে তাঁকে গুলি কবে চলে যায়। উগ্রপন্থীদের কোন্ গোষ্ঠী মণিময়কে হত্যা কবেছে সে সম্পর্কে একেকজন একেকবকম কথা বলে।

সুতপা আব জানতেও চান না কে মেবেছে। কী হবে? মণিময়কে, গৌরবকে তো কেউ ফিবিয়ে দিতে পাববে না। এবকম কত মণিময গৌববকে হাবিযেছে কত সুতপা এই আসাম মেঘালযে সেই আটাত্তর সাল থেকে, কে তাব খবর রাখে, কত সুতপাব সংসাব ছারখার হয়ে গেল সেই বিদেশি খেদা আন্দোলনের সময় থেকে কিছু ঘনিষ্ঠ পবিজন ছাড়া কে জানে তা? কেউ জানাব চেষ্টাও কবেনা।

গৌরব ছোটবেলা থেকেই ছিল বাবার ন্যাওটা এবং ভীষণ স্পর্শকাতর, অভিমানী। সুস্থসবল মণিমযেব মৃত্যুটা তাতে এত আঘাত কবেছিল যে গৌবব খববটা শোনার পর থেকে কোন কথা বলতে পারছিল না। সুতপার নিজেরও তখন তুমুল দিশেহারা প্রায় অচেতন অবস্থা। বুবুনও কাছে ছিল না। গৌরবের দিকে আলাদা করে তখন নজব দেবাব কোন উপায় ছিল না। সেই সুযোগে ছেলেটা বিষ খেয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল, বোধহয় ভেবেছিল বাবাব কাছে যাবে। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা কবেছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। গৌরব শারীবিকভাবে এমনিতেই একটু দুর্বল ছিল।

সব চুকে যাবাব পব সুতপা আর বুবুনের সামনে বইল শুধু স্তব্ধ হাহাকাব, শূন্য বাড়ি, যে বাড়িব সঙ্গে জড়িয়ে আছে গৌববেব মণিমযেব বহু স্মৃতি। মণিময খুব যত্ন করে নিজের পছন্দমত বানিয়েছিলেন ছোট্ট বাড়িটি। মণিময় ছাড়া এখানে এক মুহূর্তও থাকা যায না। আর কেবলই মনে পড়ে গৌরবেব কথা, যে ছিল বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্য, সবচেযে আদরেব। সুতপা ভাবেন ছেলেটা অবলীলায চলে গেল,

একবার ভাবল না মা দাদা কী নিয়ে থাকবে। বুবুনের তবু বাইরের একটা জীবন আছে, থাকবে, কিন্তু সুতপা ? সুতপা কী নিয়ে থাকবেন ? জানেন না সুতপা। নানা জনে নানা পরামর্শ দেয়। কেউ বলে গৌহাটিতে বাড়ি করেছো এখানে তুমি একা থাকবে কি করে ? ছেলেকে চাকরি ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ওর যা চমৎকাব রেজাল্ট গৌহাটিতে অনায়াসে চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে মা ছেলে কারোরই মত নেই। বুবুনকে সুতপা এখন গৌহাটিতে বাড়ির বাইরেই যেতে দিতে চান না। মনে হয় যদি আবার কিছু একটা অঘটন ঘটে। সুতপার মনে ভীতি এমন ভাবে ঢুকে গেছে রাতে বুবুনকে তিনি বারান্দায়ও যেতে দিতে চান না।

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ বলে বুবুনকে বিয়ে দিয়ে তুমি কিছুদিন বউ নিয়ে এখানে থাকো, তাবপর বাড়ি বিক্রি করে বা ভাড়া দিয়ে বুবুনের কাছে চলে যাও। এতেও সুতপা বুবুন কারোর সায় নেই। সুতপা বলেন, বাবা কিংবা মা মাবা যাবাব পব এক বছবেব মধ্যে বিয়ে করার তো বিধানই নেই। বুবুন বলে বিধানের কথা ছাড়ো তো মা! বিয়ে হচ্ছে একটা আনন্দ অনুষ্ঠান, এখন কী আমাদেব আনন্দ কবার সময় ? কী করে যে লোকে এসব বলে আমি বুঝি না।

আবার কেউ কেউ বলে, বাড়ি বিক্রি কবে তুমি বুবুনেব সঙ্গে মহারাষ্ট্রে চলে যাও, এখানে থাকলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, বুবুনের পক্ষেও তো বাব বাব গৌহাটি আসা সম্ভব নয়।

পবামর্শের আবর্তে সুতপা শুধু ঘুরপাক খান। কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না।

দুই

মা, এখন আমবা কী করব ?

আকুল প্রশ্নটি আবার আছড়ে পড়ে সুতপাব কানে। ছেলেব দিকে তাকান সুতপা। ওব বযস মাত্র ছাব্বিশ বছব, এই বয়সেই ওকে এমন গভীব সংকটে পড়তে হবে কে ভেবেছিল ? এই কদিন যেন বুবুনেব মুখ থেকে কোমল কচি ভাবটা একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আগের ফুর্তিবাজ বুবুন আব নেই, এখন সে এক গভীর চিন্তাগ্রস্ত বিষাদমগ্ন মানুষ। সুতপা বোঝেন ছেলের সমস্যা। ওব ছুটি আব কোন ভাবেই বাড়ানো যাবে না, এবাব ওকে যেতে হবে। বাবা গেছেন, ভাই গেছে-এখন মাকে ছেড়ে ও যাবে কী কবে ?

সুতপা ছেলেব মাথায একটা হাত রেখে জিজ্ঞস কবেন, তোর কী মত বুবুন ? তুই কী চাস ?
আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই মা। তুমি এখানে একা থাকতে পারবে না। অসম্ভব।

বুঝলাম। কিন্তু বাড়িটার কী হবে ?

বাড়িটা নিয়ে অনেক ভেবেছি মা। অন্যদেব সঙ্গে আলাপও কবেছি। বাড়িটা বাবার খুব সখেব ছিল। কিন্তু এই বাড়িতে আমি আব থাকতে চাই না। তুমি চাও ?

নাবে, আমিও চাই না। তোকে ছাড়া এই বাড়িতে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পাবব না।

তাহলে বাড়িটা বিক্রিই কবতে হবে। কিন্তু বিক্রি তো আব চট কবে হবে না।

এক্ষুনি আমরা ওসব পারব না।

তবে কী ভাড়া দিতে চাও ?

সুতপা আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। নাবে, ভাড়া দেবাব ইচ্ছে নেই। তাছাড়া আমাদেব এত জিনিসপত্র। এসব সরাবি কোথায় ?

তাহলে আপাতত বাড়িটা বন্ধই থাক্। চাবি দিয়ে যাব রিলায়েবল কারোর কাছে। তারপব মাস কয়েক পরে এসে বিক্রিব ব্যবস্থা করতে হবে। সুতপা এবাব হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেন। বুবনকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, কেন আমাদের এরকম হল রে ? কী অপরাধ আমরা কবে ছিলাম ? সবাই বলে তোর বাবা খুব ভাল লোক ছিলেন। ভাল লোকের কেন এরকম হল ? আর গৌরব, গৌববটা একবার আমাদের কথা ভাবল না। একটুও ভাবল না মা কী নিয়ে থাকবে, দাদা কী নিয়ে থাকবে। বুবুন আমাদেব জীবনটা এরকম হযে গেল কেন বে —

বুবুন আস্তে আস্তে মার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে থাকে। কী বলবে সে ? কথা বলে মাকে সামলানোর উপায় নেই। সব কথা এখানে নিরর্থক। সব শব্দ মূক। এখন তার একটাই চিন্তা, কী কবে মাকে সুস্থ রাখা যায়। বাড়ির ডাক্তাবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাব। উনি বলেছেন এমনিতে শরীর ঠিকই

আছে তবে যে শক উনি পেয়েছেন সেটা সামলাতে একটু সময় লাগবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সুতপাকে নিয়ে বুবুন প্লেনে কলকাতা যাবে। কলকাতা দু-তিন দিন থেকে তারপর বোম্বে মেলে ওরা মহারাষ্ট্র চলে যাবে। বুবুন যেখানে থাকে, সেই জায়গাটা বোম্বে থেকে খুব একটা দূরে না। ঘন্টাখানেকের জার্নি। এমনিতে তেমন অসুবিধে নেই। অসুবিধে একটাই, বুবুনের কোয়ার্টারটা ছোট। বিয়ে করলে অবশ্য বড় কোয়ার্টার পাবে।

বুবুনের ইচ্ছে কলকাতায় মাকে ডাক্তার দেখানোর। কিছুটা এই কারণে কিছুটা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কলকাতায় থাকার প্রোগ্রাম করা হয়েছে। কলকাতায় ওদের আত্মীয় প্রচুর, কিন্তু সুতপা এবার কারো বাড়িতে থাকতে রাজি নন। উনি বলেছেন, আমি যে বাড়িতে যাব সেই বাড়িতেই একটা শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এটা আমি চাই না।

এদিকে উনি হোটেলে থাকতেও খুব একটা পছন্দ করেন না। ভাল হোটেলে রুম পাওয়াও কঠিন। শেষ অবধি শিলঙের একজন পরিচিত নেতাকে অনুরোধ করে বুবুনের এক মামা মেঘালয় হাউসে ওদের জন্য রুম বুক করিয়ে রাখলেন।

বুবুন ভেবেছিল বাড়ি ছেড়ে গৌহাটি এয়ারপোর্টে যাবার সময় সুতপা বোধহয় অসম্ভব কান্নাকাটি করবেন। কিন্তু আশ্চর্য, একটুও চেঁচামেচি উনি করলেন না। গাড়িতে ওঠে একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালেন, ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল মুহূর্তের জন্য। ব্যস ঐটুকুই, এরপর নিজেই বললেন, স্টার্ট দিতে বল্ বুবুন।

সমস্ত রাস্তায় সুতপা আর একটা কথাও বললেন না।

এয়ারপোর্টে বুবুনের এক বন্ধু ও এক পিসতুতো ভাই এসেছিলো। বুবুন ভেবেছিল সে সুতপাকে নিয়ে বসবে আর রিপোর্টিং, লাগেজ জমা দিয়ে কুপন নেওয়া, বোর্ডিং কার্ড নেওয়া এগুলো ওরাই করবে। কিন্তু এয়ারপোর্টে আজকাল খুব কড়াকড়ি। সিকিউরিটি গার্ড কোনমতেই প্লেনের যাত্রী ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না। বুবুন অনেক বোঝাল বাবার মৃত্যুর কথাও বলল। কিন্তু কোন কাজ হল না। লোকটা নির্লিপ্তভাবে বলল, রুপেয়া নেহি দিয়া হোগা।

বুবুন বলতে পারত তার বাবার কাছে আলফা বা অন্য কোন এক্সট্রিমিষ্ট গ্রুপ কখনো টাকা চেয়ে পাঠায়নি, কারণ তারা নিশ্চয় জানত তাদের দাবি মেটাবার মত টাকা মণিময়ের নেই। কিন্তু এসব বলে কি লাভ? অগত্যা সুতপাকে নিয়ে বুবুন একাই ঢুকল।

একটু পরে সাইরেন বাজিয়ে কে একজন ভি আই পি এলেন। বুবুন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তাঁর সঙ্গে হুড়মুড় করে কিছু স্বাস্থ্যবান যুবক সদম্ভে সিকিউরিটির গার্ডদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিমানবন্দরে ঢুকে গেল। একটি ছেলেকে চিনতে পারল বুবুন, তাদের পাড়ার। রহস্যময় উপায়ে দু-তিন বছর ঠিকাদারী ও সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে মারুতি ভ্যান কিনেছে। কিছুদিন আগে লাচিত নগরে ভরদুপুরে একটি মেয়েকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে চাইছিল। মেয়েটি চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করায় পারেনি।

প্লেন আধঘন্টা লেট করল। কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে বুবুন লক্ষ্য করল সুতপা যেন একটু একটু করে স্বাভাবিক হতে চাইছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র ডমেস্টিক এয়ারপোর্ট চালু হবার পর সুতপা এই প্রথম কলকাতা এলেন। ঝকঝকে তকতকে আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও সাজসজ্জায় সজ্জিত এয়ারপোর্টটা দেখে সুতপা মুগ্ধ। বুবুনকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কবে করল রে? কী সুন্দর করে বানিয়েছে!

দমদমে বুবুনের মাসতুতো দাদা এসেছিলেন। ওঁরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে এসেছেন, খুব জোর করলেন বালিগঞ্জ প্লেসে ওদের বাড়িতে থাকার জন্য। সুতপা কোনমতেও রাজি হলেন না। বুবুন বলল, মেঘালয় হাউসে রুম বুক করা আছে। কী দরকার মিছিমিছি বুকিং ক্যানসেল করার। তোমরা বরং একটা কাজ করতে পারো, আমাদের পৌঁছে দাও মেঘালয় হাউসে। তাহলে আর আমাকে প্রিপেড্ ট্যাক্সির জন্য লাইন দিতে হয় না।

বুবুনের দাদা বললেন, এটা কোন ব্যাপার না। কিন্তু তোমরা আমাদের এখানে থাকলেই ভাল করতে। মা-ও মাসিমাকে দেখতে চেয়েছিল।

মাসির সঙ্গে দেখা করতে আমরা কাল যাব। বুবুন বলল।

থাক থাক, তোদের আসতে হবে না। আমিই নিয়ে আসব গিয়ে। কালও আমার ছুটি আছে।

সেই ভি আই পি রোড। শেষ যেবার কলকাতা এসেছিলেন সুতপা, মণিময় সঙ্গে ছিলেন।

সেবার উঠেছিলেন তাঁরা ঢাকুরিয়ায় মণিময়ের দিদির বাড়ীতে। একদিন মণিময় ও সুতপা বিবাটি যাচ্ছিলেন সেজ ভাশুরের সঙ্গে দেখা করতে। ঐদিন এই ভি আই পি রোডেই তাঁদের ট্যাক্সিটা খাবাপ হয়েছিল। শীতের হিমেল বিকেল ছিল, দুদিকে হুহু করে ছুটে যাচ্ছিল গাড়িগুলো। মৃদু শীতল হাওয়া বইছিল। মণিময় বাববাব বলছিলেন, তুমি শালটা গায়ে দাও। ঠাণ্ডা লাগবে। সুতপা অবাধ্যতা করছিলেন। আবে দূর, এ আবার ঠাণ্ডা নাকি? শিলঙে থেকে এলাম এতবছর। তুমি ববং সরে এস। গাড়িগুলো যা স্পীডে যাচ্ছে। ধাক্কা মারলে আর দেখতে হবে না।

মণিময় বিরক্ত হচ্ছিলেন। সুতপাব সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেও উনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। ঐদিন ট্যাক্সিটাও স্টার্ট নিচ্ছিল না, কোন খালি ট্যাক্সি পাওয়াও যাচ্ছিল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। মণিময় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সুতপার গলায় একটা সোনার হাব, কানে দুল হাতে আংটিও ছিল। মণিমযেব দিদি বারবার বলছিলেন, ওসব খুলে নাও কলকাতায় কেউ সোনা পরে না।

সুতপা বলেছিলেন, যাব দিনেব বেলায়। একবাত্রি থেকে আসবও দিনদুপুবে। তোমাব বেশি চিন্তা। নিজে তো চিন্তা করছই। আবেকজন চিন্তা সম্রাটকেও উসকে দিচ্ছ।

সত্যিই মণিময় সেদিন খুব দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন। মণিময় কেন, শেষ পর্যন্ত সুতপাও সেদিন বেশ ভাবনায় পড়েছিলেন। সত্যিই যদি ট্যাক্সি পাওয়া না যায়? শেষ পর্যন্ত ঐ ট্যাক্সিটাকেই অনেকখানি ঠেলে স্টার্ট কবা হল। ট্যাক্সি ড্রাইভাব আব দুটো বাচ্চা মজুবেব সঙ্গে মণিমযকেও সেদিন ট্যাক্সি ঠেলতে হয়েছিল।

মনে হয়, এই তো সেদিনেব কথা। মণিমযেব সেই দুশ্চিন্তামাখা শুকনো মুখটা এখনো মনে পড়ে। কোথায সেই দুর্গাব কাঠামোব আকৃতিব গাছটা? যে গাছটা নিচে দাঁড়িযে সুতপা লক্ষ্য কবছিলেন মণিমযেব চাঞ্চল্য। কোথায? সুতপা আব ভাবতে পাবেন না। চোখ বুজে মাথাটা এলিযে দেন। বুবুন তটস্থ হয়।

মা, শরীব খারাপ লাগছে?

নারে। আমি ঠিক আছি।

দুদিন কলকাতায় খুব ব্যস্ততাব মধ্যে কাটল। সব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সুতপা ও বুবুনেব সঙ্গে দেখা কবতে চায়। অনেকেব সঙ্গেই দেখা হল না। কাবণ সব জাযগায যাওয়া সম্ভব না। আবাব মেঘালয হাউসে সবসময় থাকাও যাচ্ছে না। অনেকে জোব করে বাড়ি নিযে যায়।

তৃতীয় দিন মেডিসিনেব এক নামী ডাক্তারেব কাছে মাকে নিযে গেল বুবুন। আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। শরৎ বোস রোডে তাঁব চেম্বার। ডাক্তাবের চেম্বারে প্রায় দেড়ঘন্টা থাকতে হল। দেড়ঘন্টা পর যখন সুতপার পালা এল, বুবুন তখন বাইবে সিগাবেট খেতে গেছে। ফিবে এসে দেখে মা নেই। অ্যাটেনডেন্ট যে মহিলাটি দরজার সামনে দাঁড়িযে আছেন, তাঁব কাছে ছুটে যায় বুবুন।

ওখানে যে ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন, উনি কী ভেতবে গেছেন?

হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু দেখছেন ওনাকে।

আরে, ওনার আগে তো আবেক জনেব নাম ছিল।

ঐ পেশেন্ট আসেনি।

তাহলে আমি ভেতরে যাই?

কেন?

উনি আমার মা।

তাতে কী? হুড়মুড় করে ওভাবে ঢোকার চেষ্টা করবেন না তো।

উফ, দিদি, উনি খুব অসুস্থ। মানসিকভাবেও খুব ডিষ্টার্বড। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন না।

দাঁড়ান। দাঁড়ান। আমি ডাক্তাববাবুকে জিজ্ঞেস করি। একেকটা লোক এমন আসে না, উফ —

বুবুনেব মনে হল এই মহিলা গৌহাটি এযারপোর্টের সিকিউরিটি গার্ডের চেয়েও এক কাঠি ওপরে। সে দাঁতে দাঁত চেপে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। শেষ অবধি বলল না। এখন ঝগড়া কবলে চলবে না।

ভেতবে ঢোকাব অনুমতি পাওয়া গেল। ডাক্তারবাবু সুতপাকে দেখলেন খুব যত্ন কবে। বুবুনেব

দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রেশারটা একটু লো আছে। খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতো করতে হবে। অন্যসব ঠিকই আছে। দুটো ওষুধ আমি লিখে দিচ্ছি। একমাস পরে বোম্বেতে বা আপনারা যেখানে থাকবেন সেখানে কাউকে একবার দেখিয়ে নেবেন।

ডাক্তারখানা থেকে ফেরার সময় সুতপার মুখের দিকে তাকায় বুবুন। এই কদিনে মা যেন বুড়ি হয়ে গেছে। মায়ের মুখের সেই লাবণ্য আর নেই। চোখের নিচে সামান্য কালি পড়েছে, চামড়াও কুঁচকে গেছে। দুই কানের ওপরে রূপোলি রেখার সারি। চোখ গর্তে, কণ্ঠের হাড়ও বেরিয়ে গেছে। অথচ কদিন আগে মাকে দেখতে কী ভালই না লাগত। বুবুন মাকে দেখছে, সুতপা হঠাৎ মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখছিস?

বুবুন লজ্জা পেল। বলল, কিছু না। মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বল্।

তুমি মাছ খাচ্ছ না কেন?

আমার ভাল লাগে না।

ওসব কুসংস্কার আজকাল আর কেউ মানে না।

মানলে ক্ষতিটা কী?

ক্ষতি তোমার স্বাস্থ্যের। তাছাড়া তোমার বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি সবাই তো তোমাকে মাছ খেতেই বলেছে। কেউ তো বলেনি তুমি হিন্দু বিধবা তুমি মাছ খেতে পাববে না।

তা বলেনি। কিন্তু আমি পারি নারে, আমার কেমন যেন মনে হয় এটা ঠিক না—

ট্যাক্সি মিডলটন স্ট্রীট থেকে রাসেল স্ট্রীটে ঢুকে হঠাৎ আটকে গেল। ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। মেঘালয় হাউসের একটু আগে আসাম হাউসের সামনে একটা জটলা। কেউ একজন মাইকে ভাষণ দিচ্ছেন কিছু লোকের হাতে প্ল্যাকার্ড। একটি ফর্সা বেঁটে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার ছেলে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে সমাবেশের ছবি তুলছে। বুবুন একটু উঁকি দিয়ে বুঝল ওটা বিক্ষোভ সমাবেশ। কলকাতার কোন অতিবাম ঘেঁষা সংগঠনের ডাকে বিক্ষোভটা হচ্ছে। এদের অভিযোগ আসামে রাষ্ট্রশক্তি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। সেজন্যেই আসাম হাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। আসাম হাউসে লোহার গেট লাগানো। গেটের ভেতরে কিছু কর্মচারীর ভিড়। আসাম পুলিশের পাহারাদার আছে। ক্যালকাটা পুলিশের পোশাক পরা কিছু লোককেও গেটের বাইরে ও ভেতরে দেখতে পেল বুবুন। বোধহয় ওদের কাছে খবর ছিল।

গলার শিরা মাত্রাতিরিক্ত স্ফীত করে যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁর পরনে আধময়লা ফিকে বাদামি রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা পাজামা। কাঁচাপাকা চুল মাথায়, খুব রোগা। তামাটে রঙ, পুরু লেন্সের চশমা চোখে। দুই কানের ওপরে সামান্য লোম আছে। উনি কেন্দ্রীয় সরকার ও আসাম সরকারকে তুলোধুনো করছেন। উনি বলছেন, বন্ধুগণ, আপনারা জানেন না আসামে কী ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আপনারা জানেন না সেখানে সেনাবাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী আর পুলিশ মিলে কী ভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে, নিপীড়ন করছে। আপনারা এও জানেন না সেখানে আজ নারীজাতির ওপর কী অমানবিক অত্যাচার হচ্ছে। তথাকথিত উগ্রপন্থী দমনের নামে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি আজ আসামে চালিয়েছে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। মানবাধিকারকে সেখানে দুপায়ে মাড়িয়ে চূর্ণ করা হচ্ছে।

সুতপা বুবুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ তো একতরফা অতিরঞ্জিত কথা বলছে। ওরা কী কখনো গেছে আসামে?

বুবুন লক্ষ্য করল মার মুখে ক্রোধ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। ওদিকে ট্যাক্সিরও মিটার উঠছে। বুবুন বলল, একটু ওয়েট করি। যদি রাস্তা ক্লিয়ার না হয়, হেঁটেই চলে যাব। আমরা তো প্রায় এসেই গেছি।

বক্তা চেঁচাচ্ছেন, খবরের কাগজে আপনারা যা পড়েন তাতে পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচারের কথা প্রায় কিছুই থাকে না। কত পরিবার যে আসামে আজ পুলিশ-মিলিটারীর অত্যাচারে ধ্বংস হয়েছে, কত নারী যে আজ পুলিশ-মিলিটারীর বন্দুকের গুলিতে তাদের স্বামীকে হারাচ্ছে, কত নারীর কপালের সিঁদুর মুছে যাচ্ছে চিরতরে, আসামের কত মা আজ রাষ্ট্রশক্তির নৃশংস আক্রমণে পুত্রহারা হচ্ছে, আসামের বাইরে কজন রাখে সে খবর?

সুতপা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়তে চান, বুবুন, আমি নামব, আমি লোকটার কাছে যাব। আমি

ওকে জিজ্ঞেস করব ওবা আমার কথা বলছে না কেন ? আমাব মতো যে সব মা স্বামীহাবা পুত্রহারা হয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করব ওরা তাদের খবর রাখে কিনা-

বুবুন ঝট করে একটা হাত বাড়িয়ে মাকে আটকায়, তোমাব মাথা খাবাপ হয়েছে মা ? এখানে কে তোমার কথা শুনবে ? তাছাড়া ওরা যদি জানে তুমি পুলিশ অফিসারের স্ত্রী, ওরা আমাদের অ্যাটাক করতে পারে, দেখছ না কী রকম উত্তেজিত চেহারা একেকজনের ?

বক্তা হাতে মাউথপিস নিয়ে আসাম হাউসের গেটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কম্পিত হস্তে তর্জনি উঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন, স্বাধীন দেশে নাগরিকদেব শান্তিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকার মত মানবাধিকার যদি সরকার রক্ষা করতে না পারে, তাহলে কিসেব এই স্বাধীনতা ? যদি আমাদেব দেশেব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেদের স্বশাসনেব ন্যায্য দাবীর সমর্থনে সোচ্চাব হয় এবং সেই বৈপ্লবিক গণজাগরণকে যদি পুলিশ মিলিটাবী আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে দমিয়ে বাখতে চায তাহলে জানবেন কোনদিন তাবা তা পারবে না । ব্যর্থ হবে না পুলিশ মিলিটারীব আক্রমণে স্বামীহারা নাবীর ক্রন্দন, বিফলে যাবে না পুলিশ-মিলিটারীব অত্যাচারে পুত্রহাবা মাযেব অভিশাপ-

সুতপা জোর করে ছাড়াতে চান বুবুনেব হাতেব বাঁধন, ছাড় তুই । আমি নামব ! ওব মাইক আমি ছিনিয়ে নেব জোব করে । আমি আমার কথা ওব মাইকে বলব । কলকাতাব লোক কেন আমাব কান্না আমাব দু:খেব কথা শুনবে না ?

বিহারি ট্যাক্সি-ড্রাইভার ও তার হেল্পাব অবাক হয়ে পেছন ফিবে তাকাচ্ছে । ডানদিকের ফুটপাথে কিছু লোক ভাঁড় হাতে করে চা খাচ্ছে । এদেরও কেউ কেউ যেন টের পেযেছে ট্যাক্সিব মধ্যে কিছু একটা নিয়ে বচসা হচ্ছে । বুবুন জোবে আঁকড়ে ধবে সুতপাকে । মা, কী পাগলামি কবছ বল তো ? কে শুনবে তোমার কথা ?

মানবাধিকারবাদী তাঁর ভাষণ চালিযে যাচ্ছেন, এখানে আসাম সরকাব নেই, কিন্তু তাদের প্রতিনিধি আছেন । যে আমলা এখানে আসাম সবকারেব প্রতিনিধিত্ব কবছেন তাঁর কাছে আমবা একটা স্মারকলিপি দেব । তার আগে আবারও বলছি কলকাতাব মানুষের, পশ্চিমবঙ্গেব মানুষেব তথা সাবা বহির্বিশ্বেব মানুষের আসাম তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে মানবাধিকাব লঙ্ঘনের যেসব ঘটনা প্রতিনিযত ঘটছে, সেগুলো সম্পর্কে আবও অধিকমাত্রায় সচেতন ও প্রতিবাদমুখব হওয়া প্রযোজন । বেঁচে থাকাব অধিকাব, সসম্মানে নিজের মতবাদ তুলে ধরাব অধিকাব মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকাব, এই অধিকাব ছিনিয়ে নেবাব বিরুদ্ধে যদি আমরা প্রতিবাদ না কবি, তাহলে আসামে যে অসহায় নারী আজ সেনা আর পুলিশেব সাঁড়াশি আক্রমণে বিধবা হচ্ছে, যে মাতা আজ সেনা বাহিনী আর পুলিশ ফোর্সেব নিপীড়নে ছেলেকে চিরতবে হারাচ্ছে, তাদের কাছে আমরা অপবাধী থেকে যাব —।

সুতপা যেন উন্মাদিনী । গাড়ি থেকে নামার জন্য ট্যাক্সিব দবজা খুলতে চান উনি, বলব বলব বলব । আমি আমার কথা বলব । আমাব সোনাব সংসাব ধ্বংস হযে যাবার কথা কে শুনবে না কলকাতার লোক, কেন জানবে না ? বুবুন ছাড়, আমাকে ।

বুবুন আরও জোবে আঁকড়ে ধবে মাকে ।

কিশোর রঞ্জন দে

দ্বিতীয় অবগাহন

কালভার্টের উপরে বসে মণিময মেজকাকাব বাড়ীর পেছন মিকিব পাহাড় দেখল অলস চোখে। পাহাড় নেমে এসে এই লোকালয়কে ছুঁয়েছে। সিগাবেট খেতে বাইবে এসেছে সে। হাতের সীজার সিগাবেটটা তার অভ্যস্ত চাবমিনার থেকে একটু কড়া। চারমিনাব এদিকেব বাজাবে খুঁজেও পায়নি।

ছবির মতো পাহাড়, ছোট পাহাড়-দেখতে দেখতে নাকমুখ দিয়ে কযেকবার ধোঁয়া ছেড়ে আরাম হল। রমলা বৌদিব কথাটা মনে পড়তে আরাম আরো বাড়ল। বেশ চটপটে এই গ্রাম্য বউটি। ভীড়ের মধ্যে হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে গিযে হাত ছুঁয়ে ইঙ্গিত করেছে। ফিস্‌ফিস্ কবে বলছে-'আজ সন্ধ্যায়।' গলা উঁচু কবে চলে যেতে যেতে বলেছে-'একটা জাদু দেখাবো।'

দুপুরেও হাফ-সোয়েটার পরতে হযেছে। সন্ধ্যা লগ্নে খড়তুতো বোনের বিয়ে। বিয়ে বাড়ীতে সবাই কাজে ব্যস্ত। কয়েকদিন আগে আগবতলা থেকে একাই এসেছে সে। কিন্তু বিযের কাজে নিজেকে জড়াতে পারেনি। মেজকাকা কাকীমা তাকে কাজ কবতেই দিচ্ছেন না। সে কোন কাজে হাত লাগাতে গেছে-চাবদিক থেকে সবাই বাঁধা দিতে ছুটে আসছে। মণিময এসেছে-এইতো অনেক। আসামের এই পাহাড়ী জেলাব নির্জন গ্রামটিতে বাঙালীবাই বেশী। বিযেব কাজে লোকেব অভাব হচ্ছে না।

এবার দীর্ঘদিন পর এলো। ছোট্ট বাঙালী বাজাবটা প্রায় পাল্টায নি। তবে মিকির পাহাড় জেলাটা কার্বিআলং স্বশাসিত জেলা পরিষদ হওয়াতে দালান কোঠা বেড়ে গেছে।

ছোটবেলায মেজকাকার বাড়ীব সাথে খুব যোগাযোগ ছিল মণিময়দের। কত সহজ ছিল তখনকাব বাতাস। আকাশ ছিল ঠিকঠাক নীল। হোক না পাহাড়ী জেলা-তাবমাঝে অনেকগুলো রেলস্টেশন। ডিফু থেকে একটু দূবেব এই গ্রামটার নাম-'ডিসিবিগযানসএ'। পূর্বদিকে পীচ বাস্তা চলে গেছে শিবসাগর জেলায।

'এই মণিময কি করছিস রে ?'

ছোড়দা ছোটনদা সাইকেল থেকে নামল। ছোড়দাব হাতে দুটো হ্যাজাক লাইট। স্টেশনের বাজার থেকে এনেছে। সিগাবেট ফেলবে কি ফেলবে না ঠিক করতে না পেবে ফেলেই দিল মণিময।

'— এই না-এই আব কি, বাইবে -'

মণিমযের জবাব না শুনেই বাড়ীতে ঢুকে গেল দুজন, ব্যস্ত। ধীরেনদা ঢুকল একবোঝা কলাপাতা নিযে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, গেটে কাজ কবছে খুড়তুতো ভাই রজতের সঙ্গে আরো দুজন।

মণিময়ের কিছু করার নেই। সে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করল। রোদ গায়ে জড়াতে ভাল লাগছে।

মনে হচ্ছে নদী লোকালযেব দিকে আরো সবে এসেছে। আসামেব এই বন্য নদীটাব নাম ধানসিঁড়ি। নাগাপাহাড় থেকে বেড়িয়ে একটা মাত্র জেলা গড়িয়ে অন্য কোন নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। প্রায় পনের বছর পর এবারে এসে নদীটাকে অপরিচিত লাগছে। এতো মাটি ভেঙ্গে গেছে। নোংরা হয়েছে। শীতে জল কম। পাড় আবো উঁচু হয়েছে। বর্ষায এ নদীর বঙ পাকা গমের মতো। আর কী তেজ !

আগে সব ভাইবোন, গ্রামেব আবো ছেলে-মেয়ের সাথে ঘন্টাব পব ঘন্টা চান করত নদীতে। মনে পরতেই বুকটা মুচড়ে উঠল। এই নদীতেই ডুবে গেছে মণিমযের আর এক খুড়তুতো ভাই কমল। সে মণিময়েব খুব কাছের ছিল। বুকের ভেতব একটা বাতাস বয়ে গেলে শীত বাড়ল। আবার রাস্তার হলুদ বোদে ফিবে এল সে।

তার আর কমলের খুব বন্ধু ছিল বচন। বচন জন্মান্ধ। ছোটনদা আব বচনের বাবা ছিলেন দর্জি। চোখে দেখতে না পেলেও বচন মণিময়ের সঙ্গে সারাক্ষণ খেলত। একবাব একটা জামবুবা গাছেব নীচু ডালের সঙ্গে ঠোকব খেযে লাল চাপচাপ অনেকটা বক্ত ঝরিযেছিল। মাথায সেলাই লাগল। বচনেব মাথায় লাগানো একটা ঝিমঝিম গন্ধ আজো মনে আছে মণিমযেব। জিজ্ঞেস করি কবি করেও ছোটনদাকে সে বচনেব কথা জিজ্ঞেস করতে পারেনি। যদি বেঁচে না থাকে-কষ্ট হবে।

মা-বাবা-মেজকাকার সঙ্গে একবাব সব ভাইবোন মিলে 'গরমপানি' গেছিল। বচনও সঙ্গে ছিল। 'গরমপানি' হল মিকির পাহাড় জেলাব একটা উষ্ণ প্রস্রবন। এতে চান কবলে রোগ সাবে। জঙ্গলেব ভেতর একটা ছোট্ট হ্রদ। গবম জল উঠছে মাটির নীচ থেকে। পাড়ে ছোট্ট একটা শিবেব মন্দিব। ঘন গাছপালার আড়ালে জঙ্গল তাব সব সম্পদ লুকিযে বেখেছে। তবু তার মাঝে মেজকাকা হঠাৎ তাকে ডেকে একটা ধনেশ পাখি দেখিযেছিলেন। ধনেশপাখিব তেলে নাকি বাতের অব্যর্থ ঔষধ হয়। মানুষ মেবে তখনই শেষ করে ফেলেছে প্রায় সব পাখি।

মূল উৎসে জল টগবগ করে ফুটছে। সেখানে জল বেশী গরম। হ্রদে এসে পিকনিক কবছে অনেকে। পাড়ে পাড়ে উনুন জ্বলছে। তাব উল্টোদিকে জল সহনশীল গবম। সেখানে গিয়েই চান কবছে সবাই। পাথরে পাথবে সাবধানে সেদিকে হাঁটছিল মণিমযও। শ্যাওলা জমে পাথর বড় পিচ্ছিল। মানুষের কোলাহল ছাপিযে উঠে ঝিঁঝির শব্দ। পলকেই ঘটে যায় ঘটনাটা। পা পিছলে পাথর থেকে শূন্যে উঠে যায মণিময। শূন্যেই যে দুটো হাত আটকায তাকে —বাঁচায নিশ্চিন্ত পতন থেকে-সে দুটো হাত বচনের। পিছলে পরলে আবো বিপদ হত। এ জাযগায জল অনিষ্টকব গবম। মাত্র কযেক মুহূর্ত পর আবাব নিজের পায়ে দাঁড়ায় মণিময়। ঝিঁঝিঁ পোকাব শব্দটা আবার শুনতে পায। হ্রদেব পাড়ে বঙিন মানুষদেব পিকনিকও দেখে।

পবে অনেক ভেবেছে মণিময়। বচনকে তাব পাশে চলতে দেখেনি সে। আবছা মনে পড়ছে—অন্য কারো হাত ধরে হাঁটছিল বচন। অথচ কি অলৌকিক পবিত্রাণ তার হাতে। অন্ধ বচন কি করে যেন টেব পায়! শক্তিশালী কোন ইন্দ্রিয় তার সজাগ থাকে বিপদেব জন্য। বচনকে জিজ্ঞেস কবাতে বলেছিল -'আমি টেব পাই। আমি কত কি টেব পাই। তবু তো কমলটাকে বাঁচাতে পাবলাম না।'

ধানসিঁড়ি নদীটাব এদিকটায় কুশিয়ার ক্ষেত। আগে মেজকাকাবও ছিল কযেক বিঘা নদীর পাড়ে পাড়ে। দাঁড়িযে দেখতো মণিমযবা। গোলাঘাট-ডিমাপুব সড়ক দিযে ছোট ছোট লরি ভর্তি কুশিযাব চলে যেত হোজাইয়েব চিনিকলে। লবিব উপবে বসা লোকগুলো কখনোসখনো দু'একটা কুশিযার ছুঁড়ে দিত মণিময়দেব দিকে।

কুশিযাব ক্ষেতেব নীচে নদীতে কযেকজন নেপালী মহিলা কাপড় ধুচ্ছে। বমলাব চেহাবা চোখে ভাসল আবাব। চোখ ঠিক কালো নয বলে সুন্দরী নয। গ্রাম্য শাড়ী পবাব ধবণ, একটা ঋজু বন্যতা শবীরে। কোঁকড়ানো চুল। মণিময়ের মাথায মাথায। গত কদিন ফাঁকে ফাঁকে কথা হচ্ছে। সব কাজেই অন্য মহিলাদের সঙ্গে হাত লাগাচ্ছে বমলা। আব চোখে চোখে দেখছে মণিময়কে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, ইঙ্গিতময় ঠাট্টাইযার্কি হয়েছে। আবাব কালর্ভাটে সিগাবেট ধবালো মণিময। ছেলেবেলাব অতি পবিচিত, প্রায না বদলানো জায়গাটা দেখতে গিযে মিকিব পাহাড়েব সবুজে চোখ আটকালো আবাব। আগে নাগাবা মাঝে মাঝে মিকিবদের বস্তি আক্রমণ কবতো।

একটা যাত্রীবাস চলে গেল গোলাঘাট শহবেব দিকে। দস্তুবমতো আধুনিক স্মার্ট বাস। বাস দেখতে দেখতে আবার বিয়ে বাড়ী ঢুকলো। মণিমযকে দেখে অনেকে হাসলো। চা পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস কবলো। সে অনিন্দ্যসুন্দর সুবেশ যুবক। তার পোষাক চালচলন সবাই মনোযোগ দিযে দেখে।

উলুব শব্দ হল। হাসতে হাসতে কজন বউ ঠেলাঠেলি কবছে নিজেদের মধ্যে। দুজনেব হাতে কলসী। হাসিটা থামছে না। বযস্কা কেউ ধমক দিলেন। হাসিটা কমলেও থামলো না। কেউ একজন এবমধ্যে 'গীত' ধবে-'বাধা জল ভবিতে যায-' বাকী সবাই গলা মেলায। প্রায লাইন ধবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় বউয়ের দল। পেছনে বাজনাদাবদেব লোকেরা। বউদেব মধ্যে রমলাকে খুঁজে পেল না মণিময।

বমলা গ্রামের বিশুদার বউ। বিশুদাকে কত বছব পব দেখল সে। তাদের শৈশবকে মুগ্ধ কবেছিল বিশুদা। একটা সার্কাস পার্টি এসেছিল স্টেশন বাজাবে। মাসখানেক খেলা দেখিয়ে চলে গেলে দেখা

গেল বিশুদাও নেই। অনুমান করা গেল সার্কাস পার্টির সঙ্গে চলে গেছে।

এসব খবর আগরতলায় মণিময়রা চিঠিতে জানতো। বা এখান থেকে কেউ আগরতলায় বেড়াতে গেলে জানা যেত। তবে বিশুদার ফিরে আসার খবর পায়নি সে। দুবছর হলো অ্যাডভেঞ্চারের মায়া কাটিয়ে গ্রামের জীবনে ফিরে এসেছে মানুষটা। এখন আধবুড়ো। রেশন দোকানে চাল চিনি মেপে দেয়ার চাকুরী করে। বিশুদার মা নিশ্চয়ই মরে গেছে। আজ রাতে কি রকমের সুযোগ খুঁজছে রমলা ?'

বাড়ীর লোক ও কর্মীরা খেয়ে উঠতে উঠতে শীতের বেলা শেষ হয়ে এলো। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বিয়ে বাড়ী। লোক বাড়ছে। সব্জিক্ষেতের পাশে নরম জমিতে ঢাকা দেয়া জায়গায় কটা উনুন জ্বলে উঠেছে। আলো থাকতেই হ্যাজাক জ্বালানো হয়ে গেছে। এদিকে বিদ্যুৎ আসেনি। মণিময় ফুল সোয়েটার পরে নিল। উঠোন থেকে মিকির পাহাড় আর দেখা যাচ্ছে না। বর আসবে তিনমাইল দূরের বড় স্টেশন থেকে। এখন গ্রামের প্রায় সব মেয়ে-পুরুষ এসে কোন না কোন কাজে হাত লাগিয়েছে।

বেশ কজন মহিলা আজ সারাদিন গান গাইছেন। সুপুরী কাটছেন। তাদের গানকে সবাই বলছে 'গীত'। গান একটা থামলেই রব উঠছে 'গীত গাও, আরেকটা গীত ধরো।' গানের কোনটা রাধাকৃষ্ণের মিলন, কোনটা হরগৌরীর বিয়ের বিবরণ। একটা বিশেষ সুরে অক্লান্ত গেয়ে যাচ্ছেন তারা। মাঝে মাঝে উলুর শব্দ আর বাজনা। বাজনাকে 'বাইদ্য' বলা হচ্ছে।

'বর আসবে' 'বর কখন আসবে' ভাবটা যখন তৈরী হল ছোটনদা এসে মণিময়কে বললো 'তোকে একটা কাজ করতে হবে মণিময়। আমি আর বিশুদা আরো একপদ মিষ্টি আনতে বাজারে যাচ্ছি।'

বাকীটা বিশুদা বললো—' তোর বউদি একটু রেগে আছেরে। সারাদিন বিয়ে বাড়ীতে খেটেছে তো। একবার বাড়ীতে গিয়ে শাড়ী পাল্টে আসবে। আমারই নিয়ে যাবার কথা ছিল। অথচ আমাকে বাজারে যেতেই হবে। তুই একটু যেতে পারবি না ?'

বিশুদার গলায় একটু বেশী অনুনয়।

— 'নিশ্চয়ই যাবে মণিময়। তুমি আস তো।' ছোটনদার তাড়া বেশী। প্রস্তাবটাও তো নির্দোষ। সাইকেলে চলে গেল দুজন। বিশুদা নিশ্চিন্ত হয়ে। কারণ মণিময় ঘাড় নাড়লো। এখন সে বুঝতে পারছে সন্ধ্যায় রমলা বৌদির তৈরী থাকার আহ্বানটা। কত সহজ ব্যাপারটা। বরযাত্রীদের সামনে তো বউয়েদের একটু সাজগোজ করে আসারই কথা। অন্ধকারে একা যেতে ভয় পাচ্ছে। সারা গ্রাম যখন বিয়ে বাড়ীতে তখন মণিময় রমলা থাকবে আলাদা কিছুক্ষণ। বিশুদার বাড়ী একটু দূরে।

প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশী উত্তেজিত মণিময়। তার আগের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে রমলাবৌদি আলাদা। অন্ধকারে টর্চ জ্বালাতে দিচ্ছে না রমলা। গায়ে গায়ে হাঁটছে। তার কোলে কুটু।

— 'বিশুদাকে দেখি একেবারে আঁচলে বেঁধে রেখেছ। কি ব্যাপার ! কি মন্ত্র শিখেছ।'

— 'চল ভাল করে দেখাবো সব মন্ত্র। বলি নি -সন্ধ্যায় তৈরী থাকলে যাদু দেখাবো।'

— 'কুটুকে আবার সঙ্গে নিয়েছ কেন ?'

—'কেন অসুবিধে হবে বাবুর ?'

না অসুবিধে তো হবে না মণিময়ের। কত সহজ। বাচ্চাটা সঙ্গে থাকাই তো ঠিক।

— ' বিশুদার মা নেই বাড়ীতে ? মানে বেঁচে ...'

— ' আহা ইয়ে আর কি ! শাশুড়ি থাকলে আমি নাগর নিয়ে ঘরে যাই, না !' নাগর শব্দটা অনেকদিন পরে শুনলো। সেই যাত্রাগানের ডায়লগে থাকতো শব্দটা। বিশুদার মা মকর সংক্রান্তিতে নিজে কদমা তিলুয়া বানাতো।

মণিময়ের পায়ের নীচে এখন শিশির পরছে। বিশুদার ঘর আগের মতোই আছে। ছন-বাঁশের ঘরে ঢুকে রমলা লম্ফ জ্বালালো। একটা মাত্র চেয়ার। বসলো মণিময়। বিছানার ঘুমন্ত ছেলের গায়ের সোয়েটার সরিয়ে পেট টিপে দেখলো রমলা।

—' না। পেট ভর্তি। খাবে না এখন।' খাটের নীচে টিনের ট্রাঙ্ক থেকে শাড়ী, ব্লাউজ বের করে বিছানায় রাখলো রমলা। গায়ের গরম খয়েরী চাদরটাও খাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল। হাত মুখ ধোবার শব্দ আসছে। ঠাণ্ডাতেও বেশ জল ঢালছে। একটু পরে ঘরে ঢুকতে দেখলো হাতে ভেজা ব্লাউজ। শাড়ীটা পেঁচিয়ে ঠিকমতো পরা নেই। জড়িয়ে নিয়েছে মাত্র। কাঁধে গামছা। অপাঙ্গে তাকালো

মণিময়ের দিকে।

—'খুব লোভ, না ?'

মণিময়ের হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠলো। চেয়ার ছেড়ে দুপা এগিয়ে গেল হঠাৎ। রমলা লাফিয়ে খাটে উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আধভেজা শাড়ীটা ছুঁড়ে দিল মণিময়ের দিকে। শাড়ীটা হাতে ধরতেই বেশ দামী শাড়ী বলে বুঝতে পারল। বিশুদা আয়ের তুলনায় দামী শাড়ী কিনে দেয় বউকে। রমলার পরনে এখন নীল সায়াশুধু। সায়ার নীচে সাদা সূতার কাজ। নাভির ঠিক নিচে সায়া বাঁধার দাগ। বাদামী বুক দুটো কঠিন। পলকেই সে খাটের উপর রাখা গরম চাদর গায়ে জড়ায়। বিয়ে বাড়ী যাবার শাড়ী ব্লাউজ পরার চেষ্টা করে না। বিছানাটা পরিপাটি করে। বিছানার চাদর টানটান করে। ঘুমন্ত বাচ্চাকে একপাশে সরিয়ে রাখে। খাটে বসে আবার পা নাচায়। মণিময় নীল সায়ায় সাদা কাজ দেখে।

রমলা উঠে একটা স্নোর কৌটা হাতে নেয়। গালে মাখতে থাকে। দূরে বাজনা বেজে উঠে।

—'বর আসছে।" রমলার গলার স্বর ফ্যাসফ্যাসে। নাকের নথ কাঁপছে। লম্ফ শিখার কাঁপা আলোয় মণিময় খাটে উঠে বসতেই রমলা শুয়ে পরে সটান। চাদরে গা ঢাকতে গেলে আবার তার বাদামী বুক দেখা যায়।

— 'দরজাটা–'

মণিময় আবার খাট থেকে নামে। ফ্যাসফ্যাসে গলাটা আবার বলে—" শুধু টেনে দিলেই হবে। কেউ আসবে না। আলোটা নিভিয়ে দেবো।"

মণিময় দরজার কাছে যেতেই দরজায় কার পায়ের শব্দ হয়। সে দেখে এক সবল যুবক এক হাতে লাঠি অন্য হাত সামনে বাড়ানো। বাতাসে হাতড়ে হাতড়ে হাঁটছে।

— 'বৌদি, রমলা বৌদি।'

রমলা চমকে খাট থেকে নেমে আসে। তার কুঞ্চিত ভ্রূতে স্পষ্ট রাগ। মণিময়কে ঠেলে বসিয়ে দেয় চেয়ারে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে- ' তুমি শব্দ করবে না। এ চোখে দেখে না। দুটো কথা বলেই চলে যাবে।'

যুবক এগিয়ে আসে। স্পষ্ট দেখা যায় তার চোখ দুটো বন্ধ। পিঁচুটি মাখা। বলিষ্ঠ গড়ন।

"কি হল ? কথা বলছ না কেন, বিয়ে বাড়ী থেকে চলে এলে যে।" রমলা গায়ের চাদর আবার জড়ায়। পায়ের নখ দিয়ে মেঝের মাটি খুঁড়ে। ইশারায় মণিময়কে আবার চুপ থাকতে বলে। —"কুটুকে দুধ খাওয়াতে এসেছি বচনদা। কাপড় পাল্টে আবার যাবো। তুমি যাও।'

বচন নামটা মণিময়ের বুকে বেজে উঠে পনের বছর পর। তার সেই জন্মান্ধ শিশুসাথী। ল্যাংটো হয়ে ধানসিঁড়ি নদীতে চান করতো। জেদী। চোখে দেখতে না পাওয়াটাকে পুষিয়ে নিত অন্যভাবে। বচন, মণিময় আর তার মৃত ভাই কমল একসঙ্গে খেলতো। একবার তো বচনের মাথাই ফেটে গেল। বচনের শরীর এখন উপযুক্ত হয়েছে। আলো অন্ধকার দিনরাতের তফাৎ নেই। বিশুদাদের পাশের বাড়ী। বিয়ে বাড়ীতে যায় নি।

—' ঘরে আর কে আছে বৌদি ?'

—' ও তুমি চিনবে না। রজতের ভাই বিয়েতে এসেছে। আগরতলা থেকে। তুমি এখন যাও তো বচনদা। আমরা আবার বিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছি।'

রমলা বিরক্তি লুকায় না। চাদর আরো জড়ায় শরীরে। আবার বিছানায় উঠে বসে। তার গলার স্বরে বোঝা যায় শরীর এখনো প্রস্তুত। চাদর সরালেই তার কঠিন বুক দুটো দেখা যাবে। বচনের এখুনি চলে যাওয়া আর মণিময়ের বিছানায় ফিরে আসা সে প্রত্যাশা করে। বচন-মণিময়ের আগের পরিচয়ের কথা সম্পর্কের কথা তার জানার কথা নয়। তাই সে টের পায় না তাদের মনে কোন দরজা খুলে যায়। যেন অন্য জগত থেকে ভেসে আসে বচনের স্বর।

— 'কি বললে বৌদি ? রজতের ভাই ? আগরতলা থেকে ? কে ? মণিময় ? মণিময় এসেছে ?'

মণিময় প্রায় লাফিয়ে উঠলে তার চেয়ার ছিটকে পড়ে।

— 'বচন তুই ! তুই চিনেছিস আমাকে ? আমি। আমি মণিময়।' খোঁপা ঠিক করতে করতে বিছানায় রমলা খুব অবাক হয়। চাদর নিয়ে খেলে।

মণিময়েব কানে তখন ঝিঁঝিঁ পোকাব শব্দ । সাবধানে সে আব বচন পিচ্ছিল পাথর টপকে টপকে 'গবমপানিব' সেই দিকটায় যায় যেখানে জল কম গবম । জঙ্গল বড় বড় গাছের আড়ালে তাব সব সম্পদ লুকিযে বাখে । অন্যমনস্ক অসাবধানী মণিময পা পিছলে পড়ে যায । শূন্যে যে হাত দুটো আটকায তাকে—বাঁচায় নিশ্চিন্ত পতন থেকে-সে হাত বচনেব । মাত্র কযেক মুহূর্ত পর আবার নিজেব পাযে দাঁড়ায মণিময । সভযে টগবগ করা জল দেখে প্রস্রবনের । ঝিঁঝিঁ পোকাব শব্দটা আবাব তাব কানে ফিবে আসে । অবাক হযে উঁচু গাঁছেব ডাল লুকানো ধনেশ পাখি দেখে ।

বচন পাখিটা দেখে না । অনুভব কবে । দুজন গবমপানিব আবোগ্যেব জলে নেমে যায় ।

দীপক দেব

বাঁশ-নৃত্য

যদি বাঁশঝাড়ের জড়ে ইঁদুর ধবে সাথে সাথেই বুঝবে সময় খুব খারাপ আসছে। এক একটা কবে বাঁশ মাটিতে আছড়ে পড়বে আব আগামী দিনগুলো ভবে যাবে হাহাকাব, ক্ষুধা এবং ধ্বংসে। এতটুকু বলেই লালরসাঙ্গির বৃদ্ধ শরীরটা একটু বিশ্রাম নেয যেন। পাহাড়েব একেবারে পাদদেশে তার ঘর। উপরে সাব সার সব অট্টালিকা পাহাড়ের কোলে, শীর্ষে, পাশে। মেঘ অনেক সময়ই ঢুকে যায় ঐসব অট্টালিকার ভিতরে, হেঁটে চলে বেড়ায়। নিচেও মেঘ নেমে আসে আর কাট-টিনেব ঘরে অনেক সময় হাত বুলিয়ে যায। কিছু ঠাণ্ডা বাতাস এবং কুযাশা শবীবটা কুঁকড়ে দেয় তবু তার ঘব ঐসব অট্টালিকা থেকে অনেক ভাল মনে হয়। আবো অনেক কথা আছে। বৃদ্ধা বারান্দায় কাঠেব চেযাবে বসে বসে একেবারে গাছগাছালিহীন আইজল পাহাড় দেখেন। বাঁ চোখে ছানি পড়ে গেছে পুবোপুবি তবু কোন কিছু ঠাহর করতে অসুবিধে হয না। ডান চোখটাতো এখনো অক্ষত। কষ্টও হয না। কষ্ট শুধু এই ধাপ ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উপবে উঠা। তাও এখন মাসে একদিনই উঠতে হয। সেদিন পেনসন্ আনতে ব্যাংকে যেতে হয। বাকি সব কাজতো লালদুয়েমিই কবে। মেযেটা চাকবি কবে তাবই পুবনো অফিসে। তাব পেনশন হলো আব কেবানিব চাকবিটাও মেযেটা পেল।

কিন্তু বড় খামখেয়ালি মেযেটা। কোথায কোথায ঘুবে বেড়ায! অনেক সময পু আন আব ব্লাউজ ছেড়ে জিনস্ আব গেঞ্জিও পবে। আবে, এই যে পু আন এব মত সুখ আছে নাকি অন্যকিছুতে? কে বুঝাবে মেযেকে! আমিওতো জোযান ছিলুম, তখন ঐ যে দূবে আইজল গেইট, কত উঁচু দেখছ? একেবাবে মেঘ ছুঁযে আছে। একবাব উঠেছি, একবাব নেমেছি আবেকবাব উঠেছি, নেমেছি একদিনেই। লালদুয়েমি পারবে? কক্ষণও না। খালি হামবড়াই হামবড়াই ভাব। কি জানো তোমবা? কিছুই জানো না। শুধু ভড়ং আব অহংকাব নিযে বেঁচে আছ। ছি: ছি: ছি:। জোবামথাঙ্গা তখনো বেঁচে, বলতেন, তোমাব মত নাচতে কেউ পাবে না সাঙ্গি।

আহা, তোমরা বলো লালদুযেমি বাঁশেব ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতেব মত নড়াচড়া কবে। কিন্তু আমাব মত! কখনও না। এই যে তাঁতেব ডোবাকাটা পু আন উপবে তাঁতেব তৈবী ব্লাউজ যা পবে এখন লালুদুয়েমি নাচে, এই সবতো আমাব ছিল। নিজেব হাতে বুনেছিলাম। চাপচাবকুট মানে আমাদেব কৃষিকাজ শুরু করার শুভদিনের উৎসব। সেখানে বাঁশনৃত্যেব সময় বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে আমাব পা পড়তে থাকল যে নাচ শেষ হবার পব জোরামথাঙ্গা বলেই ফেলল—আই লাভ যু। বাঁশেব একদিকে তো তাবই দু'হাত ধবা ছিল। এবাব ঝবঝব কবে কেঁদে ফেলেন সাঙ্গি - এই ধাপ বেযে উপবে উঠতে গিয়েই তো স্ট্রোক। অথচ কত অনুবোধ কবেছিলাম, উপরে বাড়ি কবার জন্য। পাহাড়েব তলই নাকি শ্রেষ্ঠ জায়গা।

একটু চুপ করে থেকে চোখ দু'টি মুছে ফেলেন বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ান—দাঁড়াও ইঁদুর ধরা পড়েছে কিনা দেখে আসি। কাল রাত থেকেই কলটা পেতে রেখেছি।

যেখানটায় এখন আইজল গেইট আগে সেখানটায পুরোপুবি পাহাড় ছিল। শক্ত প্রায় অপ্রতিরোধ্য। শিলচব থেকে বাস্তাটা চলতে চলতে এখানে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ডিনামাইট মুখ তৈবী করে পাহাড়ের। এখন অবশ্য বিকল্প রাস্তা আরেকটা হয়েছে মাইরেঙ্গ দিয়ে। হলে কি হবে, মাঝেমধ্যে খোলা থাকে শুধু, বেশির ভাগ সময়ই ধ্বস পড়ে বন্ধ থাকে। আইজল গেইট আসলে মিজোরাম গেইট। এই গেইট স্পর্শ না কবে স্থলপথে মিজোরাম ঢোকা যায় না। আর আইজল

গেইট থেকে আইজল শহরটাকে খেলনা শহর মনে হয়—যেন খেলনা ঘরবাড়ি, খেলনা গাড়ি । গেইট থেকে নিচের দিকে তাকালে শুধু উড়ে যাওয়া মেঘ চোখে পড়ে । এত গভীর যে কিছুই দেখা যায় না । মেঘ না থাকলে শুধু ধোঁয়া ধোঁয়া চোখে পড়ে । আইজল গেইটে দাঁড়ালে মনে হয় মেঘের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যেন ।

কোথাও কনসার্টের মহড়া চলে । গিটার, ড্রাম আর মেরাকনের আওয়াজ গম্ভীর হয়ে ভেসে আসে । মনে হয় কাছেই । নাও হতে পারে, হয়ত পাহাড়শীর্ষে । পাহাড়ে দূরত্ব বোঝা খুবই শক্ত । আওয়াজটা কোথা থেকে আসে বোঝা যায় না । রোদটা কড়া নয় এখন । রোদটা মিঠে সবসময়ই । লালরসাঙ্গি প্রায় বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বারান্দায় আসেন—এতো ইঁদুর, তবু একটাও ধরা পড়ল না এখনো ! খাঁচাটা এমনভাবে তৈরী যে, ইঁদুর ভিতরে ঢুকলে ঝপ্ করে দরোজাটা বন্ধ হয়ে যাবে । ভিতরে অনেক সুস্বাদু আহার দিয়ে রেখেছেন, কলা, শুকনো মাছ ইত্যাদি যা ইঁদুর সত্যিই পছন্দ করে । তবু পড়ল না ! আবার বসে পড়েন চেয়ারে । এই সময়টা বড় একা একা লাগে । রবিবার তবু ভাল, মেয়েটা থাকে কিছু সময় কিন্তু অন্যবারেই মুশকিল । আর জোরামথাঙ্গা মরে যাবার পর উপরে একা একা উঠতে সাহস করেন না । মোট একশ' বত্রিশটা সিঁড়ি । গীর্জায় যাওয়াও বন্ধ, যীশু নিশ্চয় ক্ষমা করবেন । লালদুয়েমি গীর্জায় যায় কিনা তার সন্দেহ আছে । কোন কথারই ভাল করে উত্তর দেয় না । কোথায় যায়, কার সাথে ঘোরাফেরা করে কে জানে ? আগেতো মাঝেমধ্যে লালচুয়ানকিমা আসত । লালদুয়েমি বলেছিল বটে,

— আমার বয়ফ্রেণ্ড ।

তার ভাল লাগেনি ছেলেটাকে । ছোক্রার হাত-পাগুলো এত শীর্ণ যে বাঁশই তুলতে পারবে না । মেয়েটার পছন্দ খুবই খারাপ । লালচুয়ানকিমাকেই যদি বয়ফ্রেণ্ড বানাবি তো এতো সুন্দরী হয়ে তোর কি লাভ হল ? আর বাঁশের ফাঁকে পা রাখার শিল্প শিখেও কি হল ?

— মা, কিমা খুব ভাল গান করে ।

এখনো তড়পান তিনি — ছাই করে ।

এই যে ভেসে আসছে কনসার্ট হয়ত মাইকেল জ্যাকস্যনের অনুকরণ । কিছু আছে এতে ? আধুনিক না ছাই ? এর থেকেতো ক্যারল ভাল । ক্যারলে তবু যীশুকে ডাকা যায় । মেয়েটা আবার ঐসব ক্যাসেট কিনে টাল দিয়ে রেখেছে ঘরে । রুচি-টুচি সব গেছে । তর্ক করেন না তিনি, ভয় পান । হঠাৎ যদি লালচুয়ান কিমার সাথে ঘর বসিয়ে দেয় ! রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু ! ও ব্যাটাতো দুয়েমিকে আঁকড়ে ধরতেই পারবে না । কি সুখ দেবে ? বাঁচোয়া, আজকাল ছোকরা আর আসে না । আসে না কেন মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে করতেও থেমে গিয়েছিলেন, উৎসাহ দেখান ভাল না । অনুমান করেন হয়ত শরীর দেয়া-নেয়ার সময়ই মেয়ের চমক ভেঙ্গেছে । খুশি হন সাঙ্গি । নতুন আর কোন ছোক্রা আসেনি এখনো । ভাল, ভাল । যতদিন মেয়েটা কাছে থাকে ভাল । কথা না বলুক অন্তত ঘুরে ফিরে বেড়াবে তো কাছে কাছে ।

সকালের খাওয়া-টাওয়া লালদুয়েমির সাথেই সেরে ফেলেন লালরসাঙ্গি । ভাল চাল, মাছ-মাংস না হলে খাওয়া রুচেনা তার । খাওয়া-দাওয়ার কোন বাছবিচারও নেই । কেবল সাপ ছাড়া সব খাওয়ারই চলে । আচ্ছা, সাপ কি করে খায় মানুষ ? আমাদের মধ্যে কুকুর খাওয়ার চল আছে, তাও উৎসবে অনুষ্ঠানে । তাই বলে সাপ ! অসম্ভব । সাপের শরীরে ঘেন্না ছাড়া আর কি আছে ? লিকলিকে শরীরটাতে বিষ নিয়ে ঘুরে ফেরে আর কাঁটা জিব্ সবসময়ই ছোবল দিতে লক্ লক্ । উফ !

এই সাপইতো প্রিয় খাদ্য চাকমাদের ! কেমন জাত হবে এবার বোঝ ! দেমাগিরিতে এজন্য মিজোরা ভয়ে ভয়ে থাকে । এই চাকমাগুলো ওখানেই বাসস্থান গেড়েছে । আবার অহরহ সীমান্ত পেরিয়ে এপারে চলে আসে । ঐপার আগে পূর্ব পাকিস্তান ছিল এখন বাংলাদেশ । ব্যাটারা সাপের মতই । যীশুকে মানে না । বড় ভয় করে চাকমাদের । না, আমি দেমাগিরি যাইনি, গিয়েছিল জোরামথাঙ্গা । ফুড ইন্সপেক্টর ছিলতো, তাই সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াতে হত । তো দেমাগিরি যখন যায় সত্যিই আমি কেঁদে ফেলেছিলুম । আর আমি কাঁদলেই থাঙ্গার প্রেম একেবারে উথ্‌লে উঠত । সে রাতে কি আদর কি আদর ভয় করছিল আবার কেউ এসে পড়ে কিনা পেটে, লালদুয়েমিতো তখন চৌদ্দ বছরের । লজ্জাও করছিল খুব । যাক্, প্রভুর কৃপায় এ যাত্রায় কিছুই হয়নি । আসলে থাঙ্গার ডরভয় খুবই কম ছিল । ঐ সেবার শিলচরে বাঙালিদের সাথে ভীষণ মারামারি, কাটাকাটি কিন্তু এরিমধ্যে সে শিলচর গিয়েছিল । আমার

হাহুতাশ কখন থামাতে পারেনি তাকে, বলত — এতো ভয় পেলে কি চলে ? শিলচব না গেলে কি আমাদের উপায় আছে ?

কথাটা সত্যি । শিলচর বন্ধ হলে মিজোরাম বন্ধ । শিলচর দিয়েইতো মিজোরামে ঢুকতে হয় । কিন্তু শান্তি নেই, মাবামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকে ।

তবু শিলচব দেমাগিরি থেকে ভাল । কিন্তু থাঙ্গা দেমাগিরি গেলই । আমি সারাদিন উঠতে বসতে শুধু ক্রস কবি । অফিস, খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ আমার । কেবল লালদুয়েমির ভ্রূক্ষেপ ছিল না । যন্ত্রণাটাতো একা আমারই ।

ফিরে এসে সেকি হাসি থাঙ্গাব — বেশি ভাব তোমার ! কি ভাল মানুষ সব, আহা !

– কিন্তু সাপ যে খায় ?

– তো কি হয়েছে, আমবাওতো কুকুর খাই ।

কুকুর আর সাপ এক হল ? থাঙ্গাকে বুঝান খুব শক্ত ছিল । আর সময়ও ছিল না । কোথাও থেকে ঘুরে এলে আমার শরীরটাকে নতুন করে আবিষ্কার করত । ভালবাসার উত্তবণ ঘটত । সাপ খেলে যে একটা লোক সাপই হয়ে যায় বুঝাব কাকে ? চাকমাদের সাথে একেবাবে মিলমিশ হয় না আমাদের । ওরা অনেক তুকতাকও জানে !

বিকেল হয়ে গেছে প্রায় । আবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান সাঙ্গি । জল রাখার জন্য বড় দু'টি ড্রাম বারান্দা ঘেঁসে দাঁড় করান আছে । বৃষ্টি হলে চাল গড়িয়ে জল একটা ড্রামে পড়বে । জল খুব যত্ন করে বাখতে হয় । অনেক দিনেব জন্য বরাদ্দ থাকে । বৃষ্টিব জল ছাড়াও পাবলিক হেলথের গাড়ি তুইকাৎলাং নদী থেকে জল নিয়ে আসে । রোজ আসে না । তুইকাৎলাং আইজল থেকে চল্লিশ কিলোমিটাব দূব । ঐ জলের গাড়ি উপরেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে । জল বয়ে নিয়ে আসাব জন্য একটা কাঞ্চা ঠিক করা আছে, মাসে দু'শ টাকা দিতে হয় । জলের কষ্ট সারা বছবই লেগে আছে । ড্রামেব ঢাকনা তুলে দেখেন সাঙ্গি, আদ্ধেক খালি হয়ে গেছে । চলে যাবে । সামনেইতো বৃষ্টির দিন আসছে । ঢাকনাটা ছেড়ে দিয়ে ধীবে ধীরে ভারি বঙিন পর্দাটা সবিয়ে ঘবে ঢুকেন । এটা বসাব ঘব, সোফা, টি ভি, ভি সি আব সেন্টাব টেবিলে ঠাসা । উপরে ঝাড়বাতি আর দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশু । এরপর ডানদিকে গেলেই তাব ঘব । জানালা খুললে একেবারে ন্যাড়া পাহাড়ের পিঠ চোখে পড়ে । বাঁপাশে লালদুয়েমিব ঘর । ঐ ঘর আগোছালো থাকে । সব ছড়িয়েছিটিয়ে রাখে দুয়েমি একেবারে থাঙ্গাব মত । ঘবে ঢুকেই সটান বিছানায় শুয়ে পড়বে, মিউজিক সিস্টেমের সুইচ্ হাতের কাছেই মজুত । এই মিউজিকই দুয়েমির উপস্থিতি টেব পাইয়ে দেয় সাঙ্গিকে । কথা হয় বৈকি । খুবই কম । দুয়েমির সময় কোথায় ?

খাটের নীচে রাখা ইঁদুব-কলটাকে দেখেন । এখনো শূন্য । একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার । এতো ইঁদুর তবু কলে ঢুকছে না ! মানে আবার খাবারটা পাল্টে দিতে হবে । মাথাটা সোজা কবেন এবাব । চোখে পড়ে দেয়ালে টানান তার বাঁশ-নৃত্যের ছবি । খাটের নিচে জোবামথাঙ্গার ব্যবহাব কবা একজোড়া বাঁশও বাখা আছে । ছবিটা তাকে টানে—আহা, সে কি দিন ছিল ! আইজলের সমস্ত লোক জমা হয়ে যেত আসাম-রাইফেলস গ্রাউণ্ডে । নাচ শেষে নিজেকে রাণী বাণী লাগত । ভাবছ নাচটা খুবই সহজ, না ? ঐ শক্ত বাঁশগুলো যেকোন সময় তোমাব পা ভেঙ্গে গুঁড়ো কবে দিতে পারে আহা, এতো সহজ নয় বাপু । তালজ্ঞান ষোল আনা চাই । টক্টক্, টক্টক্ ।

প্রথম প্রথমতো লালদুয়েমি ভীষণ ভয় পেত । আর এখন ! টিভি-তে ওব নাচ দেখিয়েছে । আমাদেব সময় টেলিকাষ্ট হত না । তবে ছবি উঠত অনেক । ঐ নাচ লালদুয়েমি পারবে না । সেই জায়গাতেই যেতে পারবে না । সেই আদিম তালইতো নেই । তখনতো এত প্রচাব ছিলো না । তাই তোমরা ভাব এখনকারটাই আদর্শ নাচ । না না । এখনকার সব খারাপ আর আগের সব ভাল আমি তা বলছি না । এখনতো পাহাড়ের রঙটা চুরি হয়ে গেছে তাই এতসব বলছি আর কি । পাহাড়ের আসল রঙ ছাড়া কি আসল নাচ হয় ?

সব ঋতুতেই বিকেলে বিকেলে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে আইজলে । রাতে লেপ-কাঁথা গায়ে দিতে হয় । সাঙ্গি ওয়ারড্রোব থেকে উলে বোনা চাদরটা খুলে গায়ে জড়ান - বুড়ো মানুষের ঠাণ্ডাও লাগে বেশি । লালদুয়েমি বাজার-টাজার সেরে একেবারে শেষ বিকেলে আসবে । রান্না কববে তারপর । সাতটার মধ্যেই রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ । তারপর টি ভি দেখো বা অন্য যা খুশী করো । রাত দশটায় এক কাপ চা বা কফি হলেই চলে । রাতের খাওয়ার পর প্রায়ই বেবিয়ে যায় দুয়েমি । কোনকোন দিন

সাঙ্গির শরীর-টরীবের কথা জিজ্ঞেস করে। গায়ে হাত দিয়েও দেখে। এতোটুকুই যোগাযোগ আছে শুধু।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুলের টবগুলো দেখেন সাঙ্গি। লালদুয়েমির নতুন শখ। আজ আছে কাল থাকবে না। তবে ফুলগুলো ভারী সুন্দব লাগে তার। মেয়ে যত্নআত্তি কবে এখন। একসময় আর ভাল লাগবে না তখন সব পড়ে থাকবে। বড় অস্থিব। এই অস্থিবতা আসলে সংস্কৃতিটা না জানার জন্য। এবা সব জানে শুধু পূর্বপুরুষদেব জানে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে সাঙ্গিব। এই অনুর্বর পাহাড়কে পোষ মানান কি সহজ কথা! ভালবাসা লাগে, মাটির টানেব সাথে নাড়িব টানও জুড়ে দিতে হয়। এদেবতো শুধু অহংকার—আমরা বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং অন্য জাতি থেকে আলাদাও। কিসেব আলাদা? কাব থেকে আলাদা? বুঝেন না তিনি। আসলে বদলোকে ভরে গেছে জায়গাটা, খালি হিংসা, বিদ্বেষ, খুনোখুনি। চিন্তাটা হঠাৎ ছেঁটে দেন—মককগে। আমাব চিন্তা শুধু ইঁদুব। কলে একটাও পড়ল না এখনো! অথচ ঘব ভর্তি ইঁদুর, পাহাড় ভর্তি ইঁদুর। হতাশ হয়ে যান সাঙ্গি। বাঁশঝাড় আব আস্তো থাকবে না। জড় কেটে ফেললে তো জোয়ান বাঁশগুলোও ঝরে পড়বে। দু:সময আসবে। হত্যা আবাব ফিবে আসবে।

সেই কবে এইবকম আবেকবার হয়েছিল। তাইতো বলেছিলেন তিনি। তাঁর জন্ম হযেছিল ববিবারে তাই তাঁর নাম লালডেঙ্গা। কত কথা জানতেন, এক এক করে মিজো ইতিহাস বলে যেতেন গল্পের মত কবে। তিনিইতো বলেছিলেন – 'এক বিশেষ কাজেব জন্যই মিজো জাতি সৃষ্টি কবেছেন প্রভু। তোমরা সবাই বিশেষ কাজের জন্যই জন্ম নিযেছ'। এটাই বিশ্বাস করেছিল সবাই। আব ইঁদুব আবিষ্কার করেছিল বাঁশঝাড়েব জড়ে।

এরপবতো যুদ্ধ। আইজলের লাইটপোষ্টের শরীরে মেশিনগানের গুলিব ক্ষতচিহ্ন। কত লোক মরল, আহা। কেন? আমবা কি বলতে পারি কেন মরল? তবে কিছুদিন আগে যখন সাবসাব কফিন নিয়ে আবার আইজল শহবে ঢুকেছিলেন তিনি, আমিও কফিন দেখে কেঁদে ফেলেছিলুম। ঐ কালো কফিনগুলোর ভিতবে হাড়গোড় ছাড়া আব কিছুই ছিল না। ওদেব বক্তমাংসগুলো কোথায় গেল? কেন গেল? তিনি কিছুই বলেননি। পুরনো কথা সব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁব মাথায় শুধু বাঁশের টুপিটাই ছিল আব বলছিলেন সব নতুন কথা। কিন্তু সেসব কথাতো মিজোদেব নয়! সেসব কথা তো সাধাবণ কথা। মিজোরা কি সাধারণ মানুষ? তিনিতো প্রথমে বলেছিলেন, 'না'। তবে যুদ্ধ হল কেন?

সিঁড়ি ভেঙ্গে লালদুযেমি নামতে থাকে দেখেন তিনি। তাড়াতাড়ি ঘরেব ভিতর ঢুকে যান। কলটা লুকিয়ে ফেলতে হবে। কলের কথা লালদুযেমি জানে না। ইঁদুরের কথাও জানেনা, জানলেও হযত বিশ্বাস করে না। এমনিতেই একা একা কথা বলেন তিনি জানে লালদুযেমি। এখন কল দেখলে একেবাবে খ্যাপে পাগল হয়ে যাবে।

দুই

বরাক বাঁশ যথেষ্ট শক্ত, ঘরেব আড় হয। সেই ববাক বাঁশ পাকবে অথচ খুব একটা মোটা হবে না। এইবকম বাঁশ প্রায ছ-থেকে সাত ফুট লম্বা কবে কাটতে হয গাঁট থেকে গাঁট পর্যন্ত। চাঁচাছোলা কবে বঙ লাগিযে তবে না বাঁশ নৃত্যের বাঁশ হতে পাবে।

বাঁশ ধরে থাকে দুজন লোক দু'দিকে দুহাত দিযে। হাতে ধরা বাঁশ হাঁটুভেঙ্গে পাযেব পাতাব উপব ভর দিয়ে বসে। ডানহাতে একটি বাঁশের একপ্রান্ত বাঁশেব অন্যপ্রান্ত অন্যজনেব হাতে। বাঁহাতে অন্য বাঁশেব একপ্রান্ত, অন্যপ্রান্ত অন্যজনেব হাতে। ভূমি সমান্তবাল বাঁশ, ভূমি থেকে এক ফুট অন্তত উপরে হবে। মুখোমুখি বসা লোকগুলোব খালি গা, মাথায বঙীন কাপড়েব পট্টি বাঁধা পবনে সুতির কাপড়। একসাথে দুজনেব ডানহাত বাঁহাত। মিলে গেলেই টক্ কবে শব্দ করে বাঁশের টুকরো দুটি মিলে যায আবাব হাত ছড়িয়ে দিলেই ফাঁক হয। পু আন পবা নর্তকী হাঁটুব কিনারে পু আনটাকে একটু টেনে নিলেই পাযের পাতা আব গুচ্ছ সামান্য প্রদর্শিত হয। খোলা দুই বাঁশের ফাঁকে পা রাখে নর্তকী, পা তুলে নিলেই বাঁশ দুটো বন্ধ হযে যায আবাব পা রাখলেই খুলে যায়। সাবসার এইবকম বাঁশেব ফাঁকে ফাঁকে একবাব ডানপা একবার বাঁপা বেখে নাচে নর্তকী।

লালদুয়েমিও নাচে। কে যে বাঁশ ধবে বসে আছে দেখে না। তাল রাখ, গতি বাড়াও আব সব ভুলে যাও। চেরা চোখ দুটো এমনভাবে বাঁশে নিবন্ধ রাখতে হয় যাতে বাঁশ চাপতে না পারে পা দু'টি।

ভিড়বাট্টা, টি ভি ক্যামেবা, উজ্জ্বল আলো, ফ্ল্যাশেব ঝলকানি, হাততালি কিছুতেই ধ্যান ভাঙ্গে না। নেচে চলে। লালদুয়েমি যেদিন নাচে, সেদিন খুব ভিড় হয়।

তাব নাচ একবাব মাত্র দেখেছিলেন লালরসাঙ্গি, তাব মা। সন্তুষ্ট যে হননি সে জানে। সাঙ্গিও বিখ্যাত নর্তকী ছিলেন, সৌন্দর্য্যও কম ছিল না। সেদিন বাতে না একেবারে কাছে এসে বলেছিলেন- কৃত্রিম নাচ। একেবারে কৃত্রিম, উফ্।

সে কিছু উত্তর কবেনি। মা কি চান সে জানে না। বড় একবোখা এবং জেদি। মিজো জিদ। যেটা তাবও আছে। মাব চোখে ছানি পড়াতো তখন থেকেই। নাচ মানে তোমার সংস্কৃতি পুবোপুবি আত্মপ্রকাশ করবে। এই ব্যাঙের মত লাফানতো সহজ। তোমাব সাথে সাথে পাহাড়টা তো নাচল না বাপু! যতসব আবোল-তাবোল কথা। শুনতে ভাল লাগে না তবু শুনতে হয়।

আর বাঁশধরা ব্যাটাছেলেগুলোতো আরো বিশ্রী, কিবকম নচ্ছার চেহাবা। হ্যাঁ, ছিল বটে তোমাব বাবা জোরামথাঙ্গা। ওকে দেখতেওতো ভিড় হত।

মনে মনে বিড়বিড় করে দুয়েমি, মা এবাব বলবে, আব ছিলুম আমি!

মা সারাদিন কার সাথে যে কি কথা বলে জানে না দুযেমি বুঝেও না। তবে নিজেকে আহামবি একটা কিছু মনে করে করে দিন কাটায। মা তাকেও অনেক কিছু বলতে চায, বুঝাতেও চায। সে কিছু শুনতেও চায় না বুঝতেও চায না।

লালদুয়েমি এখন মাঠের এক কিনারে বসে আছে। হাত দুটি পিছনে ভব বেখেছে শবীবেব উপরাংশেব, পা দুটো সামনে ছড়ান। অন্যরা নাচছে। আব ক'দিন পবেই চাপচারকুট। সেভাবে, টান কেন থাকবে না? মা'ব ওপব টান থাকবে না? তবে কত সময দে'যা যায বল? সম্ভব! কি সব অবাস্তব কথা বলে মা-'ইঁদুব, বাঁশঝাড়, পাহাড়' নিজের হাতে বোনা পু আন পবিশেষ জোবামথাঙ্গা।' তাকে বসতে দেখে লালচুয়ান কিমা এগিযে আসে। ক্রমাগত পান খেয়ে চলছে, হাতে সিগাবেট। মুখটা সামান্য ঘুবিযে নেয় লালদুযেমি এবং পায়েব আঙ্গুল দিয়ে মাঠেব ঘাস ছিঁড়তে থাকে। কিমা গান কবে ভালই, চাকবিটাও ভাল করে। তবে –।

– হাই।

– হাই।

তার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে কিমা। বিবক্ত হয় না দুযেমি। ভাবে, কিমাব সবই ভাল কেবল যৌন বিকৃতিটা ছাড়া। মনে হয ব্লু ফিল্ম-টিল্ম প্রতিদিনই দেখে। তাব ঐসব আবাব রুচিতে বাঁধে।

– এই উইক এণ্ডে কি কবছ দুযেমি?

হাসে দুয়েমি। দুপুরেব রোদ চিকচিক কবে লেগে যায তাব ফর্সা দাঁতে। মনে মনে ভাবে, তোমার সঙ্গে আব না, একেবাবে বখাটে রুচিহীন।

– সরি কিমা।

পরনেব লেদার জিনস্‌টাতে মরা ঘাস লেগেছিল, বসে বসেই ঝাড়ে লালচুয়ানকিমা, বিস্মিত হয় না জানত উত্তবটা এরকমই হবে, বলে—রাণ্ডবানার ছেলেটিতো মাকাল ফল!

আবাব হেসে উত্তব কবে দুযেমি—উঠি। নাচতে হবে। সামনেব সপ্তাহেইতো চাপচারকুট।

– মিনিংলেস্ নাচ।

মনে মনে ভাবে দুয়েমি কিমার চিন্তাটাতো স্বাভাবিকই। সে পাতান বাঁশের দিকে যেতে থাকে। বসে থাকে লালচুয়ানকিমা।

বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে নাচতে থাকে লালদুযেমি। ঠক্‌ঠক্ শব্দ হয। দু'হাঁটুর কিনারে দুহাত, পু আনটা একটু উপরে তুলেছে। পুরুষ্ট পা তালে তালে পড়ে। বাঁশের গতি এখন কম, ধীরে ধীবে বাড়বে। তাব নাচতে ভাললাগে। মা বলেন, নাচটা খুব স্বাভাবিক তখনই হবে যখন নাচতে নাচতে সারাটা পাহাড় চোখে ভেসে উঠবে। মানুষজন প্রকৃতিও চোখে ভাসবে। পা-তো স্বাভাবিক নিয়মে উঠবে-নামবে কিন্তু মনতো মনের জায়গায়ই থাকবে। আর তোমাব পূর্বপুরুষরাও তোমার সাথে সাথে নাচবে। মনে রেখ মিজোদেবে একটি বিশেষ কারণে সৃষ্টি করেছেন প্রভু!

এই শেষেব কথাটার কোন মানে খুঁজে পায না লালদুযেমি। সব জাতিইতো বিশেষ কারণে সৃষ্টি শুধু মিজো কেন? মা'কে বুঝান খুব শক্ত।

সে নেচে চলে। স্বপ্নেব আইজল। কোথায় স্বপ্ন! সারসাব মদেব দোকান হয়ে গেছে, ব্লুফিল্মের

যথেচ্ছ আনাগোনা প্রকাশ্যেই, চোরাগুপ্তায় ড্রাগ, সোনাব বাট। সবইতো বেড়ে চলছে। মা বলে কৃষ্টি সংস্কৃতির কথা। খুঁজে পায় না লালদুয়েমি। যৌন বিকৃতিব প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকছে সে — উফ্ লালচুয়ান কিমা! এবার জুথানলিয়ানা শরীবটা দেখবে হয়ত। সবাই জানে জুথানলিয়ানাব বাবা রাণ্ডবানার কোটিকোটি টাকা আছে।

– আবে টাকা দিয়ে কি করব আমি?

এইবার বাঁশ ধবে বসে আছে যে লোকগুলো তাদেব দিকে চোখ পড়ে তাব। এদের রুজি বোজগারই এই বাঁশ সঞ্চালন করে। জোবামথাঙ্গাব মত কেউ আর বাঁশ ধবতে আসে না। বাঁশ নৃত্য? হাসাহাসি করে সবাই। তাকেওতো কম হাসাহাসি শুনতে হয়নি প্রথমে। এখন আবার সবাই ঈর্ষা কবে বিশেষত টেলিকাষ্ট হবার পর।

বাঁশনৃত্য কে দেখবে? এখন টাউন হলে মিজোসুন্দরী প্রতিযোগিতা হয় এবং ঐ অর্দ্ধ উলঙ্গ রমণীবা হুড্‌খোলা জিপে শহর পরিক্রমা করে। অথচ আগে এই বাঁশনৃত্য থেকেই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর বিচার বিবেচনা হত। সে হয়নি, তবে মা একবার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হয়েছিলেন। তখন হয়ত মা'ব সাথে পাহাড়ও নেচেছিল।

– দুয়েম! তাল কাটছে।

সে চমকে ডানদিকেব লোকটার দিকে তাকায়। ভাড়াটে, অভুক্ত লোক। একসময় এবা শেষ হয়ে যাবে, বাঁশনৃত্যও শেষ হয়ে যাবে।

– সরি।

এবার একাগ্র হয় লালদুয়েমি। চিন্তা পায়ে না এলে নাচ হয় না। মা হয়ত স্বপ্নেব নাচেব কথা বলেন – চিন্তা আর পা আলাদা আলাদা। অসম্ভব!

মা আরো বলেন, 'এইসব ওয়েস্টার্ন পদক্ষেপে বাঁশ-নৃত্য হয না।' কোথায় ওয়েস্টার্ন পদক্ষেপ! ববং নাচ পরিশীলিত হয়েছে অনেক। তখনতো শ্লথ জীবন ছিল কাজেই নাচের গতিও শ্লথ ছিল। এখন জীবনেব গতি কত তীব্র। মাতো কোনদিন এতো কাজ কবেনি? কে করত তখন? ডেটিংফেটিং এর কথা শুনলেও মা হাহাকার কবে উঠেন।

উফ্ প্রথম উইকএণ্ডের কথা মনে পড়ে। বাত কাটিয়ে পবদিন ফিরে আসার পর প্রায অবাক হয়ে গিযেছিল সে – কেন?

– কেন মানে? শরীর দিয়ে এলি!

– মা, চিন্তাধারাটা পাল্টাও।

যেন ঘবের পবিত্রতাটাই নষ্ট করে এসেছে সে – জোবামথাঙ্গার মেয়ে হয়ে পারলি! ঝর ঝর কেঁদে ফেলেন মা।

– মা, উফ্।

– ও তোকে বিয়ে কববে?

– কেন?

একদিনেই যেন বযেস বেড়ে গিয়েছিল সাঙ্গিব, মেযেটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল? সেই থেকে কথা প্রায় বন্ধ। যতটুকু কথা নাহলে না হয় ততটুকুই। মা সব বুঝেও কেন যে জিদ ধরে থাকে কে জানে! তবে আজ নাচতে নাচতে বাঁশধবা এই লোকগুলোকে দেখে দেখে বড় কষ্ট হয় তার। এতো সুন্দর প্রাণবন্ত, নাচ শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে? এবার তার পা চেপে ধরে দুটো বাঁশ আস্তে করে, তবুও লাগে বেশ — উফ্!

– দুয়েম আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।

একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সরে আসে লালদুযেমি। নাচটা আজ আর হবে না কোনমতেই।

তিন

জুথানলিয়ানা শুয়ে শুয়েই কানে ফুঁ দিতে থাকে লালদুয়েমির। লেপের নিচে আশ্রিত দুটি শরীর। শেষরাতের ঠাণ্ডাবাতাস যেন ঘরে ঢোকার ফাঁকফুকর খোঁজে। বিছানার পাশেই টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। ডানহাত দুয়েমির শরীরে রেখে বাঁহাতে গ্লাসটা হাতে নেয় সে। এই ঘর জুথানলিয়ানার। এই

ঘরের সমস্ত কিছুই চেনে দুয়েমি। গ্লাসটা টেবিলে রেখে এবার ফিশফিশ করে জুথান বলে — কিছু খাবে ?

— উঁহু।

লালদুয়েমি ভাবে, শরীরটা বড় সবল জুথানের, ভালবাসায় ভরা যেন। মাথাটা বালিশ থেকে সামান্য তুলে নিয়ে বলে — তুমি বাঁশ ধরতে জানো, জুথান ?

বিস্মিত হয় না জুথানলিয়ানা। লালদুয়েমির মেজাজ ও মতিগতির কোন কিছু ঠিকানা নেই। যেকোন সময়ে যেকোন প্রসঙ্গে চলে আসতে পারে। তবে এই শেষরাতে যে বাঁশ-নৃত্য প্রসঙ্গ কেন তুলছে বুঝে উঠতে পারে না।

— হঠাৎ বাঁশের কথা কেন দুয়েম!

প্রসঙ্গটা একটু বোকাবোকা হয়ে গেছে বোধহয়। কিন্তু সেদিন থেকে চিন্তাটাতো মাথায় আছে। জুথান ছাড়া আব জিজ্ঞাসাও করবে কাকে ? নাহ্ এসময়ে জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হয়নি বোধহয়। মাথাটা তবু তুলেই রাখে সে। নাকে দামি হুইস্কিব গন্ধ লাগে এখন। মদ যেন খেতেই হবে! কেন ? পাহাড় মানেই কি মদ! তার পায়ের উপর জুথানের ভারী-পা আরাম লাগে। জায়গাটাতে সেদিন চাপা খাওয়ার পব একটু ব্যথা ব্যথা আছে এখনো। জুথানলিযানা একদৃষ্টিতে চেযে থাকে এই অপূর্ব সুন্দবী মেয়েটার দিকে।

— আ-চ্ছা ? নাহ্ থাক।

— বলোই না।

কাছে টেনে আনে সে দুযেমিকে।

দুয়েমি একটু ভেবে নিয়ে বলে — তুমি ইঁদুরের গল্প জানো ?

আবাব অবাক হয় জুথানলিযানা, একটু নড়েচড়ে জিজ্ঞস করে — না। আচ্ছা, তোমার আজ কি হয়েছে বলতো ?

— না মানে মাতো সবসময় ইঁদুর ইঁদুর করে, তাই আব কি।

এবার হাসে জুথান — উনি অনেক কথাই বলতে পাবেন। উনার সবকথা ধবতে হবে।

— কিন্তু!

লালদুয়েমির মনটা স্থিব হয় না। মার মতিগতি ভাল ঠেকে না তাব কাছে। একটা ইঁদুব কলও জোগাড় কবে এনেছে কোথা থেকে, কে জানে। গতকাল বাতেই সে কলটা দেখে। কলটা খাটেব নিচে বাখা আছে। মা ঘুমে কিসব বিড়বিড় কবছিলেন — ইঁদুব। কফিন। স্বাধীনতা।

— আচ্ছা জুথান, আমবা কি স্বাধীনতা চাই ?

এবার খুব মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয জুথান — কিসেব স্বাধীনতা বলত। আমবা কি পবাধীন ?

— কিন্তু কফিন —

এবার সটান উঠে বসে জুথানলিয়ানা। লালডেঙ্গা ফিবে আসার দিন কফিনগুলো শুইয়ে বাখা হয়েছিল বড়বাজারে, তাদেব দোকানেবই সামনে। লালদুযেমিব প্রসঙ্গটা ধরতে পারে এখন।

— ওসব ভুলে যাও দুয়েমি। এই দেশ অনেক বড়। এই দেশ স্বাধীন।

— এই দেশ!

দেশটা যে শুধু মিজোরাম নয় জানে লালদুয়েমি। তার আহ্লাদ হয়, আকর্ষণও বাড়ে আরো জুথানলিয়ানার উপর। এবার উঠে বসে লালদুয়েমি তার আদুল হলদে সাদা শরীরে যেন আলো ঠিকরে পড়তে থাকে। চোখে চোখ রাখে সে জুথানলিয়ানার-আমি বাড়ি যাব জুথান।

— কি!

— বাড়ি যাবো।

— এত রাতে! তুমি কি জানো না রাস্তাতে এখন সামরিক বাহিনীর লোক—

— তা হোক্, আমি বাড়ি যাব। আমাকে পৌঁছে দেবে চল।

সাথে সাথেই বিছানা থেকে নেমে কাপড়-চোপড় পবতে থাকে লালদুয়েমি। এই জেদ্ চিনে জুথান। সাংঘাতিক জেদ্। কিন্তু বিস্মিত হয়, এই শেষ বাতে কেন বাড়ি যাবে! হঠাৎ এমন কিইবা হল! ঘড়ির দিকে তাকায় সে প্রায় দু'টো বাজে।

— পাগলামি কবো না দুয়েম্।

— না, আমাকে পৌঁছে দাও।

— কিন্তু কেন যাবে এখন ?

বন্য হয়ে উঠে লালদুয়েমিব চোখের দৃষ্টি — না আমি যাব ; যাবই।

ভয়ংকব এই চাহনি দেখে স্থিব থাকতে পাবে না জুথানলিযানা, ঝটপট উঠে পড়ে। কাপড়চোপড় পবতে পরতে ভাবে সেনাবাহিনীর লোকগুলোতো চেনাশুনাই আছে।

দবোজা খুলে দিয়েছে লালুদুযেমি। বাইবে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বাতাস। মা। মাকেই ধরতে হবে। মা বড় একা হয়ে গেছেন। তাব ভিতবটা মুচড়াতে থাকে চোখে ভেসে উঠতে থাকে ইঁদুব কলটা। কি গল্প বলে মা ? কেন বলে ? আজই ধবতে হবে মাকে। ন্যাড়া পাহাড়েব কিছুই তার চোখে পড়ে না। ভিতবটা আরো অস্থির হযে উঠে। ঘব থেকে বেবিযে আসে জুথানলিযানা -চল।

একশ বত্রিশটা সিঁড়ি দৌড়ে দৌড়ে নামতে থাকে লালদুযেমি। পিছনে ফিবে তাকাযও না। মা'ব ঘবেব আলোটা দেখা যায। লালবসাঙ্গিব উৎকর্ণ কান সিঁড়িতে পবিচিত পদশব্দ পায়। লালদুযেমি ফিবে আসছে কেন ? তার ডেটিং এর কি হলো ? দু:শ্চিন্তা হয, মেয়েটাব মেজাজ একেবাবে খুনে। নতুন বযফ্রেণ্ডটাকেওতো চিনি না! কি হলো আবাব! ঘুম খুব কম হয তাব। ঘুমটা ধরেছিল মাত্র এমনসময এই পদশব্দ। পদশব্দ আরো কিনাবে আসে। বিছানায উঠে বসে পা দিযে ইঁদুব কলটা খাটেব নীচেব একেবাবে কোণতে ঠেলে দেন—কলটা কোন কাজের নয, জানো ? দু-দু'বার খাবাব পাল্টালুম অথচ একটাও ইঁদুব পড়ল না। এত ইঁদুর তবুও না। এবাব বিছানা থেকে নেমে ড্রযিংকমে এসে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালান। সাথে সাথে কিছু একটা সবে যায়। দেখেছ, ইঁদুব। দরজায় হাত রাখে দুয়েমি—মা।

দরজাটা খুলে দিয়ে সবে আসেন সাঙ্গি। ঘরে ঢুকে মেয়ে তাকে দেখে দরজা বন্ধ কবে। তিনি এইদৃষ্টি উপেক্ষা কবেই তাঁব ঘবেব দিকে চলে যান। দুযেমি দাঁড়িয়ে থাকে। মা সাধারণত তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেন না। সে ড্রযিংকমেব বাতিটা নিভিযে দিযে অন্ধকাবে দাঁড়ায়। ভিতরে অজানা কম্পন টেব পেতে থাকে। তাকে কেউ যেন টেনে মাব ঘবেব দবজায দাঁড় কবিয়ে দেয়। চোখ পড়ে দেয়ালে টানানো মা'য়েব বাঁশনৃত্যের ছবিটা। খাটেব নিচে একজোড়া বাঁশও আছে বাবার স্মৃতিচিহ্ন।

চোখ তুলে তাকান লালবসাঙ্গি। মেয়েব দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার ভাল লাগে না। কিছু একটা হযেছে নিশ্চযই! তবু আগেভাগে কিছু জিজ্ঞেস কবতে মন চায না। লালদুযেমি এবার খাটের একেবারে পাশে চলে আসে। ইঁদুব কলটা যে লুকিযে ফেলেছেন মা, সে জানে। বিস্মিত দৃষ্টিতে মেযেকে দেখেন সাঙ্গি — দুয়েম, কি হযেছে!

নিচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধবে লালদুযেমি — আমি তোমাব সাথে শোব মা। লালবসাঙ্গি এবাব একেবাবে তাড়িত হযে যান—কেন! তা বেশ তো আয়। আয় না। বিছানায উঠে পড়ে দুযেমি এবং শুযেও পড়ে এককিনাবে। সাঙ্গি তবু এককিনাবে বসে থাকেন। বুকটা তার ধড়ফড় করতে থাকে। মেয়ের জন্য এমন দু:শ্চিন্তা হতে থাকে যে বাঁশ নৃত্যেব তাল এখনও যা তাব রক্তে মিশে আছে সব ভুলে যেতে থাকেন।

— তুমি শোও না মা।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইতো।

এবাব দুযেমির ছোঁযা বাঁচিযে কুঁকড়ে শুযে পড়েন তিনি। দূবত্ব যেন কিছুতেই কমে না। বাতি জ্বালন থাকলে ঘুম হয না দুযেমির, হাত টিপে বেড সুইচটা টিপে সাথে সাথেই ঘরটিতে অন্ধকাব ঝট্ কবে ঢুকে পড়ে। সাঙ্গি টের পান তাব শরীবে জড়িয়ে যাচ্ছে দুয়েমি। টেনে নিযে যাচ্ছে তাকে উষ্ণ শরীরেব দিকে। প্রথমে শক্ত কবে বেখেছিলেন শবীবটা, এখন শবীরটা ছেড়ে দেন।

— দুয়েম, কি হয়েছে তোমার ?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভীত স্বরে প্রশ্নটা করেই মনে মনে বিড়বিড় করেন— হা প্রভু! উত্তরটা যেন আমার মনমত হয়।

— কিছু না মা।

তবু সংশয়। দিনকাল খুব খারাপ হয়ে গেছেতো! কি জানি কি করে এসেছে মেয়ে!

— মা!

এবার কান আরো উৎকীর্ণ হয়। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকেন তিনি মেয়ের মুখ। কোন কথা বলেন না। মেয়েব মুখটা একেবারে সুডৌল। তার মত না হলেও লালদুয়েমি যথেষ্ট সুন্দবী। গর্ব হয়

তাব।

— ইঁদুরের গল্পটা বলবে মা!

চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায় সাঙ্গির, উত্তেজনায় উঠে বলেন, কি বলে মেয়ে! হা যীশু! মেয়েটাকে পাগল করে দিলে? কেঁদে ফেলেন। উঠে বসে দুয়েমিও। সুইচটা টিপে আলো জ্বালে, মাকে দেখে অবাক হয়।

— একি কাঁদছ কেন মা!

— না, না!

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেন সাঙ্গি।

— মা!

একটু শান্ত হোন সাঙ্গি, লালদুয়েমিকে কোলে টেনে আনেন—আয় মা, আমার বুকে মুখ রেখে ঘুমো এবার। কাল তোকে গল্পটা বলব।

দুয়েমি একেবারে শান্ত হযে যায়। মুখটা মায়ের বুকের মাঝখানে রেখে শুয়ে পড়ে। আলো নিভিয়ে দেন সাঙ্গি।

— কাল বলবে কিন্তু!

— বলব মা। এখন ঘুমো।

লালদুয়েমির চোখেমুখে প্রশান্তি নামে। সে একেবাবে শিশু হয়ে যায়। মার শরীরটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু জেগে থাকেন সাঙ্গি হাতড়ে হাতড়ে মেয়ের শরীরে কিছু খুঁজেন—কত বড়টি হয়ে গেছে মেয়ে! ঘুম আজ আর আসবে না, তাড়াতাড়ি একটা ক্রশ এঁকে মনে মনে প্রার্থনা করেন—তাড়াতাড়ি ভোর করে দাও প্রভু! মেয়েটাকে সুস্থ দেখি তাহলে!

এবং হঠাৎ টের পান খাটেব তলায় কলটা ভীষণ নড়াচড়া করছে — ইঁদুর ঢুকেছে ইঁদুব। কিন্তু মনে কোন উল্লাস হয় না তার।

বাঁশদুটোর এক কিনারে ধরে আছে জুথানলিয়ানা অন্যকিনাবে লালদুয়েমি। বারান্দাব উপর এখন তির্যক রোদ পড়ে আছে। রবিবাবের সকাল। রাত পোহাতেই চলে এসেছে জুথান। পাগল পাগলভাবে রাতটা কাটিয়েছে সে। সাঙ্গি দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দায় তখন। খাটে আঘোরে ঘুমে লালদুয়েমি আর খাটের তলায় কলের ভিতর ইঁদুরটা নড়ছে, কলটা বের করেননি তবু, মনে বড় অশান্তি। ঠিক তখনই সামনে দাঁড়িয়েছিল জুথানলিয়ানা। ছেলেটাকে দেখে অবাক হন না মোটেই বরং ভিতরটা কেঁপে উঠে, কোন গণ্ডগোল করেনিতো মেয়ে।

জুথান মুখ নীচু করে হেসেছিল — দুয়েম উঠেনি এখন?

সাঙ্গি একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাকে — বসো।

এ বাড়িতে প্রথম এলো জুথান। মনে পাগলামিটা রয়ে গেছে, সারারাত ঘুম হয়নি। সাঙ্গির তবু ভাললাগে ছেলেটাকে, স্বাস্থ্যটাস্থ্য ভাল।

— তুমি?

— আমি দুয়েমির বন্ধু, জুথানলিয়ানা।

— বন্ধু!

— না মানে, আমি দুয়েমিকে ভালবাসি।

লালদুয়েমি হঠাৎ দরজা দিয়ে মুখটা বের করে হেসে উঠেছিল — ভা-ল-বা-সি। অ্যাঁ। মেয়ের এত লঘুস্বরে কথা বলা অনেকদিন শুনেননি সাঙ্গি, তিনিও হেসে ফেলেন।

একটু পরেই বাঁশদুটো খাটের তলা থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল লালদুয়েমি। বাঁশ দেখে প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন সাঙ্গি — এগুলো কি!

— মা তোমার কলে ইঁদুর পড়েছে।

— পড়ুকগে। কিন্তু বাঁশ।

— তুমি নাচবে। নেচে নেচে গল্প বলবে। আমি আর জুথান বাঁশ ধরব।

পাহাড়গুলো যেন উৎসাহে ঝুঁকে পড়তে থাকে বাড়িটার উপর। ভিতরে এক তরল আবেগ গলে গলে নামে লালরসাঙ্গির — হা যীশু!

প্রস্তুত জুথান আর দুয়েমি — এলো মা।

খট্‌খট্‌, খট্‌খট্‌ শব্দ হয । সাঙ্গি নাচতে থাকেন, দৃষ্টি দূবে, দূবে কোথাও –

সেদিন, যেদিন ইঁদুরগুলো বাঁশঝাড়ের জড় কেটে ফেলবে মিজোদের খাবাপ দিনেব শুরু হবে। ভযংকব দুর্ভিক্ষ হবে, হাহাকারে ভবে উঠবে চাবদিক। তিনি আরো বলেছিলেন, ঈশ্বব নাকি বিশেষ প্রযোজনে মিজো-জাতি সৃষ্টি কবেছেন। বিশেষ জাতি আমবা।

খট্‌খট্‌, খট্‌খট্‌।

কিন্তু বুঝলে, আমি বিশ্বাস করি না এখন। কফিন দেখে একবার আমাব স্বপ্ন এই চিন্তায ডুবে গিযেছিল কিন্তু আজ তোমাদেব দেখে এক নতুন স্বপ্ন ফিবে পেযেছি আমি—জাতি নয, আমরা বিশেষ মানুষ হযে জন্ম নেবো এবাব। দুযেম ইঁদুবটাকে কল থেকে মুক্ত কবে দিও।

কেউ কথা বলে না।

অসাধারণ নেচে চলেন লালাবসাঙ্গি। শবীবে যেন যৌবন ফিবে আসে, জোবামথাঙ্গা যেন ধরে আছে বাঁশ। ভিতবটা ভবে উঠে তৃপ্তিতে। গতি বাড়ে, আবো বাড়ে। কিন্তু একটা পদক্ষেপও ভুল হয় না।

খট্‌খট্‌, খট্‌খট্‌, খট্‌খট্‌। এই শব্দ যেন ঘুবে ফিবে এখন সাবাটা আইজল পাহাড়ে। বাঁশ-নৃত্যেব এই শব্দ রোদ বয়ে বেড়ায।

অমিতাভ দেব চৌধুরী

দ্বি

'চার এক চার ছয় – দোতলা বাসের চালককে বলা হচ্ছে— আপনার গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যান - – দশমিনিট বাদে গাড়ি ছাড়ুন – ' গুমটিঘর থেকে ঘোষকের গলা রেওয়াজ করার একঘেয়েমিতে পরপর দুবার উঠে নেমে সম্মিলিত উশখুশকে উস্‌কে দিয়ে যখন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, ঠিক সেইসময় তার হাত স্পর্শ করে একজন যাত্রীর উরুদেশ। এই শালার উরুটা যা-মোটা! হাতও তাহলে মোটাই হবে বেশ। আসলে তার ধারণায় মোটা-মাত্রেই অলস। আর অলস হাত নিশ্চয়ই পকেট হাতড়ে খুচরোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটটিকে বেছে বের-করার মতো তৎপর হবে না। অর্থাৎ লোকটি পয়সা দিলে ভালই দেবে। কুড়ি কিংবা পঁচিশ। আর তার অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে, রোগা-উকুব লোকজনের কাছে হাত-পাতা মানে শতকরা সত্তর ভাগ সময়েই কৃপণের কৃপাপ্রার্থী হওয়া। সরু-হাতে আলস্য তেমন জমাট বাঁধে না বোধহয়। এইসব ভাবতে ভাবতে তার গলা চড়ে: 'এ বাবু-অন্ধলোককে একটু দয়া— বাবু— ভগবান মুখ তুলে চাইবেন—' লোকটি মুখ ফেরায়, ঝটকায় সরিয়ে নেয় নিজেকে, যেন শুচিবায়ুতার প্রবল টোকায় তাড়িয়ে দেয় গায়ের ওপর উড়ে এসে-বসা পোকা। অথচ লোকটির পকেট জুড়ে শব্দ হয়। আর সেই ঝুমঝুম শব্দে যেই আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখচ্ছবি, তাকে নিরাশ করে দিয়ে পেছন থেকে কণ্ডাক্টারের খস্‌খসে গলা ভেসে আসে: 'কত দাদা?' যা শালা! দিল না লোকটা! সে এগিয়ে যায়। অন্য এক যাত্রীর দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থান বুঝে নিয়ে আন্দাজে হাঁটু স্পর্শ করে। 'বাবু অন্ধ মানুষ বাবু-দয়াধর্ম—' তীব্র বিরক্তিতে লোকটি তাকে পেছনে ছিটকে দেয়। 'হবে না।' বাবুলোক রেগে গেছে। হাঁটুতে হাত রেখেছিল বলে? আর কোথায় রাখা যায়? কাঁধ কিংবা হাত ধরে দেখেছে সে, বেশিরভাগ লোক এতে খচে যায়। পয়সা যাও-বা পাওয়া যেত, বাবুলোক খচলে কি আর পাওয়ার ভরসা থাকে? সে শূন্যে হাত রাখতে পারে না। শূন্যে হাত পেতে গলা কাঁপিয়ে চাইতে পারে না। কোনোকিছুর ভর না-পেলে, হাতকে তার নিজের বলে মনে হয় না আদৌ। মনে হয় অন্যকিছু। শীতশেষের ম্লান রক্তিম অসহায় হলুদ পাতা। বৃষ্টির একটি ফোঁটার আঘাতেই যেমন শীতের পাতা ঝরে যায়, তার অবলম্বনহীন হাতও যেন পয়সা-পড়লেই টুক করে খসে যাবে। এমনি মনে হয় তার। তাই ভয় করে। এখন তার নাকে এসে লাগে বৃষ্টির ঘ্রাণ। ঈষৎ সবজে এই ঘ্রাণ— দোলের দিন গালে কেউ আবির মাখিয়ে দিলে যেমন অনেকক্ষণ গন্ধ লেগে থাকত নাকে, তেমনি লেগে থাকে একটানা। আর যথারীতি, গন্ধ তার রঙের চেতনাকে ফিরিয়ে আনে। মাথার ভেতর ঘন হয়ে নামে পুঞ্জ-পুঞ্জ সবুজ প্রলেপ। অজস্র সবুজ। হলদেটে সবুজ, কালচে সবুজ, মাদামন্দা সবুজ, শামুক হেঁটে গেলে মাটিতে ফুটে-ওঠা আবছা সবুজ। তখনো পৃথিবীতে অমাবস্যা নামেনি। গাছের পাতা বেয়ে সবুজ বৃষ্টিপাত হয়। এমনকি, অন্ধকারেরও নানা বর্ণবিচ্ছুরণ হতে থাকে। অন্ধকার চিরে হঠাৎ চলে গেল ঘরভোলা কোনো পাখির বিরহী ডাক, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় নিষ্পলক আকাশের পর্দা কেমন যেন দুলছে। যেন কালো ফিকে হয়ে আসছে। তার ভেতর স্মৃতির মতো জেগে উঠছে এক নীলাভ সরল রেখা। যা ঐ পাখিটির ডানার উল্লাসে মুখর দিনের আলোর স্মৃতি। ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের এক কোণায় জবার বেহায়া-লাল খেলার মাঠে তড়িঘড়ি নেমেই গাঢ় সবুজ হয়ে যায়, সেখান থেকে আর একটু উঠে বারান্দায় পায়চারিরত মাস্টারের হালকা ইটরঙের পাঞ্জাবিতে শাদার ছিট ধরায়। এই মাস্টারমশাইকেই সে সবচেয়ে বেশি সম্মান করত। লম্বা আর ফর্সা, অর্থাৎ, দেখতে মোটেই সুন্দর নন, এই স্যারের হাত কথা-বলার সময় নিজের মুখের ওপর নর্তকীর কোনো-না-কোনো মুদ্রার আদলে ঘুরে-ফিরত। আসলে মুখের গন্ধ ঢেকে রাখার ছল, ফন্দিফিকির। পরে বুঝেছে। ঐ হাতই আবার মাঝেমাঝে পাশে বসিয়ে-রাখা ছাত্রদের শরীর ছুঁয়ে যেত।

সুযোগ পেলেই। কত বয়স তার তখন ? বারো-টারো হবে। ক্লাস সিক্স। ঐ তাঁর শেষ ক্লাসও। কেননা, এর পরেই তো তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার আর শহরে পালিয়ে-আসার উপাখ্যান। আজকাল অন্য লোকের উরুতে হাত ছোঁয়ালেই মাঝে মাঝে মাস্টারবাবুর কথা মনে হয়। কিন্তু তারা নিজেরা মানে ছাত্ররা কখনো বিরক্ত হতো না মাস্টারমশাইর এই ব্যবহারে। এটাকে ভদ্রলোকের একটা যুক্তিহীন, বিচ্ছিরি বদখেয়াল বলে ভাবত। আসলে অস্বস্তি হলেও বিরক্তি প্রকাশের সাহস কারো ছিল না। তখন সে প্রতিদিন সকালে ভদ্রলোকের বাড়ি যায়। সংস্কৃত পড়তে। স্কুলের হেডপণ্ডিতের পড়ানো কিছুতেই তার মাথায় ঢুকত না। তাই মাস্টারবাবু বলেছিলেন, দেখিয়ে দেবেন। বিবেক-কলোনির আল ভাঙতে ভাঙতে প্রতিদিন গোরুমোষের পিঠে লেগে-থাকা রেণুরেণু সকাল দেখে সে। হলুদ নীল সকাল। মাস্টারমশাইর বাড়ির সামনের মাঠে নীল সবুজের ইতস্তত দস্যিপনায় ছোটছোট ছেলেমেয়েরা ভোরবেলার পড়াশুনো সেরে নিয়ে কানামাছি খেলতে নেমে পড়ে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে তাকে পাবি ছোঁ ! আর হঠাৎ একদিন স্যারের লোমশ কালো হাত অবিকল কানামাছি খেলার কায়দায় তার উরু ছুঁতে ছুঁতে সহসা উঠে আসে সেই বিপজ্জনক সন্ধিস্থলে যেখানে হাফপ্যান্টের বোতামনির্দিষ্ট পরিখা। সে বাধা দিতে পারে না। অবাক হতে হতে জানলার রঙের মতো ছাই হয়ে যায় তার মুখ। টেবিলের মেটেখয়েরি প্রেক্ষাপটে বইয়ের পাতার শাদানীল। তার ওপর ফুটে-ওঠা 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'। সে টের পায় চোখের কোণ ধীরে ধীরে উদ্ধত খর হয়ে উঠছে। সেই উদ্ধত দৃষ্টি মাস্টারের মুখের ওপর নিয়ে এলে দেখতে পায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততালে মাস্টারের ওপরের ঠোঁটে তখন অজস্র ঘাম। জিভ বের করে ওপরের ঠোঁট চাটেন তিনি। হ্যাংলার মতন দেখায় তাঁকে। ভিকিরির মতন লাগে। এমনি সময় দরজার টনক নড়ে বাইরে থেকে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে-দেবার আগে, লোকটির কটুগন্ধময় মুখ ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে তার কানে : 'এই ব্যাপারটা তোমার বন্ধুরা না-হয় না-ই জানল।' বাড়ি ফিরে উঠোনের কোণার চত্বরে স্নান করতে গিয়ে জলের পর জল ঢেলেও প্রবোধ মানেনি তার শরীর। এটা যদি সাবান না-হয়ে একটুকরো পাথর হয়ে যেত! ঝামাইট পাথর! তাহলে পাথরের আঁচড়ে আর রক্তের আচমনে ত্বকের সমস্ত পবিত্রতা হয়তো ফিরে আসত! পরিবর্তে সাবানের পিচ্ছিলতায় ক্লেদ বেড়ে গিয়েছিল তার ত্বকের। আর সেই অনুভবকে চামড়ার তলার কোনো গহন প্রদেশে চালান করে দিতে দিতে সে ভেবেছিল : আমাকেও এবার থেকে শিকারী হতে হবে।

কিন্তু সে কি সত্যি সত্যিই শিকারী হয়ে ওঠেনি ? ঈষৎ ভিন্ন অর্থে যদিও। নিবিড় আনমনে সিগারেটে একটা টান দিয়ে জানলার নিচে কেউ নেই দেখে নিয়ে সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে দিল। বাস ছাড়বে এক্ষুনি। বাঁ-হাতের তালুতে কপালের ঘাম মুছল। একজন লেখক হিসেবে সেও তো আসলে বাস্তবতার শিকারী ! আর এখনো এই বাসেও কি সেই শিকারই খুঁজে বেড়াচ্ছে না সে ? ঐ যে অন্ধ ভিখিরিটি দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সিটের হাতল ধরে। নিবিড় যে এতক্ষণ চিন্তাস্রোতে-চিন্তাস্রোতে এই লোকটিকেই অনুসরণ করে যাচ্ছিল, তা তো আসলে একটা গল্প পেয়ে-যাবার আশা মাথায় রেখেই ! লোকটির ঐ অদ্ভুত ধরনের ভিক্ষাপ্রার্থনা দেখতে দেখতে নিবিড় ও অমনি স্পর্শের অনুসঙ্গে-অনুষঙ্গে চলে গিয়েছিল তার নিজেরই স্মৃতিতে, ইস্কুলজীবনের এক অস্বস্তিকর অন্ধ গলিতে। এটা তো আর কখনো এই ভিখিরিটির শৈশব হতে পারে না। কে জানে কেমন ছিল লোকটির বাল্য, কেমন তার কৈশোর। এতক্ষণ ধরে নিবিড় তো আসলে তাকে ক্রমাগতই নিজের আদলে বানিয়ে তুলেছে। কিন্তু হঠাৎ তার ঐ নোংরা ঘটনার কথাই বা মনে পড়ল কেন ? শুধুমাত্র স্পর্শের দৃশ্যই কি টেনে এনেছে প্রাচীন এক দমবন্ধ স্পর্শের অনুষঙ্গ ? কে বলতে পারে এই অন্ধ লোকটির জীবনেও এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা ; কিন্তু ঘটলেও নিশ্চিতভাবেই লোকটির বর্তমান ঐ ঘটনার সূত্রে আবর্তিত হচ্ছে না ! লোকটির বর্তমান তো আসলে চালিত হচ্ছে অন্য এক বাস্তবতার অনুষঙ্গে, যার নাম ক্ষুধা। বাস্তবিক নিবিড়ের ভাবনা এবার রীতিমতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, তার মতো লালু, মধ্যবিত্ত একজন লেখক, যার ক্ষুরধার স্মৃতি কোনো এক ফেলে-আসা আস্তিক-বাল্যের বাৎসরিক সরস্বতী পুজোকালীন আধবেলার উপোসের মধ্যেই সীমিত, সে কী করে অনুভব করবে এই লোকটির বাস্তবকে ? এর চিন্তাস্রোতেরই বা কতটা ধরতে পারবে সে ? ধরাটা কি উচিত আদৌ ? নিজের চিন্তাস্রোতের বোঝা-চাপিয়ে লোকটির চরিত্রকে ধরতে গেলে তা তো বাস্তবকে অস্বীকারই করা হবে কেবল !

দুটি যুবকের উচ্ছ্বাসের টানে তার ভাবনার জাহাজ বন্দরে এসে লাগে। খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা যুবকদুটি পরস্পর কথা চালিয়ে যায়। সে শোনে একজন বলছে : 'চুলদাঁড়ি ছেঁটে তোকে হেভি

ক্যাট্‌ দেখাচ্ছে মাইরি।' প্রশংসাপ্রাপ্তিতে উদ্বেল দ্বিতীয়জনের গলা ভেসে আসে : 'তাহলে বেড়ালেব ভাগ্যে এবার শিকে ছিঁড়বে বল !' কেমন যেন অবাক লাগে। এতক্ষণ ধরে ভেবেই চলছিল সে ? অথচ নিজের হয়ে ভাবছিল না। এ যেন অদ্ভুত এক খেলা। ফাঁকা ক্লাসরুমে নিজেকেই অন্যলোক ভেবে নিয়ে তাব হয়ে লুকিয়ে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা-পড়ে যাওয়া। এ খেলায় বাচ্চামো আছে সত্যি, কিন্তু নির্মলতা নেই। তবু খেলায় একবার নেমে পড়েছে নিবিড়। এখন আর না-খেলে তাব উপায় নেই। অন্ধলোকটি এতক্ষণ যাত্রীব মতো দাঁড়িয়েছিল সিটের হাতল ধবে। এবারে দুই হাতে চোখ কচলে নিয়ে যেন সম্পূর্ণ বাস্তবে ফিরে আসতে চায় সে। তারপব ক্লান্তিব ভারে আস্তে আস্তে সামনে এগোয়। বাস ছাড়বে এক্ষুণি। সকালেব একঠোঙা পেঁয়াজমুড়িব পব থেকে সাবাদিন আব পেটে কিছু পড়েনি। না। শেষ চেষ্টা নেয়া যাক। আন্দাজে অনুমানে দু-তিনজন যাত্রীব শবীবে ব্যর্থ হাত ছোঁযানোব পব হঠাৎ একটি কোমল উরু স্পর্শ কবে তার হাত। কী বকমের যেন আলাদা মনে হয়। অনেকদিনেব মরচে-জমা ট্রাঙ্কের ওপব প্রবল দ্রুততায় হাত ঘষে সরিযে নিয়ে এলে আঙুলে যেমন লেপ্টে যায় ধুলোটে গবম, যেমন ভালো করে অনেকক্ষণ ধুলেও মনে হয় মরচের দানা সমানভাবেই লেগে আছে, তেমনই কোনো এক হঙ্কার আবেশে হাত অসাড়, প্রায় চিত্রার্পিত হয়ে পড়ে। আসলে প্রাণঘাতী এক অসহায়তায় আটকে যায় তার হাত। সরিযে আনার চেষ্টা করে সে। এই মুহূর্তে তার গলা শুকনো। খরায় আক্রান্ত। যেন প্রার্থনার ভাষাও ভুলে গেছে তার স্বর। হায়! এখন যদি এই হাত কব্জির থেকে আঙুল পর্যন্ত শ্বেত শুকনো কঙ্কাল হয়ে যেত! তাহলে তো বাঁ-হাতের নির্মম একটি আঘাতেই খসে পড়ত ডান আঙুলের ইচ্ছুক গ্রন্থি। এ যেন কানামাছি খেলাব হাত। হঠাৎই অন্ধ অসতর্কতায় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে ঝুলন্ত শিকেতে। এখন মাথাব ভেতর শব্দেব ঢেউ তুলে শিকে ছিঁড়ে যায়। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ ...কানামাছি ভোঁ ভোঁ ...

তাব চমক ভাঙে। সাবা শবীর জুড়ে নেমে আসছে ছোবলের মতো আঘাত। একেব পর এক। মুখেব ওপবে প্রবল এক ঘা তাকে পেছনে ছিটকে দেয়। মুখ থুবড়ে পড়ে সে। চুলেব মুঠি জুড়ে এক অমোঘ আকর্ষণ কবে। ঠোঁট বেয়ে নেমে যাওয়া নোনতা স্বাদ তাকে কীসেব কথা যেন মনে কবিযে দেয়। ক্রমাগত মনে পড়ে। শীতের বোদ্দুবে শুকোতে-দেয়া ওয়াড়বিহীন লাল লেপেব ওপব বসে কুল খেতে খেতে একবার বাঁ-হাতেব জমানো নুন পড়ে গিয়েছিল। সে আব ছোটবোন পবম বেয়াড়া ছেলেমানুষীতে সেই নুন লেপ থেকেই চেটেপুটে খেযেছিল। আশ্চর্য ! নুনেব বঙ কি তাব মানে লাল ? এত লাল ? উগ্র লাল ? আবাব আঘাত এসে পড়ে তার ঘাড়ে, মাথায, উপোসী পেটে। অজস্র হাতেব নির্মম চাবুক আঘাত। শব্দের ঢেউ তুলে ওই কি বাস থেকে গড়িযে পড়ল সে ? পড়ে যেতে যেতে এখন কি সে শুনতে পাচ্ছে ছিন্নছিন্ন কিছু কণ্ঠ স্বব : 'ছেড়ে দিন দাদা, অন্ধ '— 'আবে অন্ধ বলে কি চোখের মাথা খেযেছি নাকি ?' 'শালার সাহস দেখ ! মেযে দেখেছে, অমনি সব হুঁশ চলে গেছে।' ওই কি ঝিলিক দিয়ে উঠল মেযেলি একটি কণ্ঠ : 'অ্যা : কী নোংরা - ম্যা গো-?'

বৃষ্টি ধবে গেছে কিছুক্ষণ। সামনেই, বাস আব একটু এগোলে, গাঙ্গুলিবাগান। আস্তে আস্তে আসবে বাঘাযতীন, তারো পরে, যাদবপুর, বেঙ্গলল্যাম্প, যাদবপুব থানা। নিবিড় থানায় নামবে। বাইরে এখন স্নাত কলকাতা রাত্তিবেব পসরা সাজাতে ব্যস্ত। পশ্চিমে, ঐ যে, বৃষ্টিব দীপান্বিতা ভেঙে মেঘের আড়াল হেসে উঠছে সূর্যাস্তের অবনয়ন। অন্ধ লোকটি নেমে গেছে বাস ছাড়বাব একটু আগেই, গড়িয়াতে। এই বাসে তার প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা বোধহয় নগণ্য ছিল ; অন্য কোনো বাসে উঠে এখন পয়সা চাইছে। প্রায় অব্যর্থ-অনুমানে বসে-থাকা কিংবা দাঁড়ানো লোকজনেব উরু স্পর্শ করে অদ্ভুত একঘেয়ে স্বরে করুণা প্রার্থনা করছে। সত্যি, এরকম লোককে একঝলকেব জন্য দেখলেও, সহজে ভোলা যায় না। আচ্ছা, ঐ মেয়েটা ওটা ঠিক ক'পয়সা দিল লোকটাকে ? মেয়েটা দেখতে বেশ ভালো ছিল কিন্তু। অথচ, যতক্ষণ, যে সামান্য কয়েকটি পলক, লোকটির প্রার্থনাময হাত মেয়েটির উরুর সংস্পর্শে ছিল, ততক্ষণে লোকটিকে নিয়ে মনে মনে কত কিছু বানিয়ে ফেলেছে নিবিড়। কিসে পেয়েছিল নিবিড়কে ? গল্প-শিকারের প্রবণতায় ? তবু লোকটাকে সে আর ধরতে পারল কই ? নিজেকে বা নিজের মতো আর কাউকে ছাড়া, স্বশ্রেণীর বা স্বধর্মের বাস্তবতার বাইরের কোনো বাস্তবকে কি সত্যি সত্যিই এভাবে ধরা যায় ? তা উচিত নয় বোধহয়। তবু জালে তো কেউ একজন ধরা পড়েছে ! নিবিড় বন্দ্যোপাধ্যায়-নিজেকেই সে প্রশ্ন করল এবাব -তুমি যে মনে মনে এতক্ষণ ঐ লোকটি হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলে, তা কি, তুমি একজন লেখক, অতএব এরকম হয়ে-ওঠা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়—কেবলমাত্র

এই যুক্তিতেই ? নাকি, তোমার মধ্যবিত্ত নিয়ন্ত্রণে লালিত স্বভাব আসলে মেয়েটির উরুদেশের সান্নিধ্য কামনায় অন্ধভিখিরি হয়ে গিয়েছিল ? অর্থাৎ মনে মনে ঐ ভিখিরিটি না-হয়ে ওঠা ছাড়া তোমার আব কোনো উপায় ছিল না ? কিন্তু এমনো তো হতে পারে ; আমি আসলে লোকটি হয়ে যেতে চাইনি, সমাজ হয়ে-যেতে চেয়েছিলাম । লোকটিব অক্ষম হাত মেয়েটিকে অনায়াসে স্পর্শ করতে পাবে কিন্তু আমাব ভদ্র হাত তা পারে না — এই অচেতন অনুভব থেকে লোকটিকে দণ্ডাজ্ঞা দেবাব জন্যই এই ঘটনাকে বানিয়ে তুলেছিলাম ? ক্লান্তি-ভযঙ্কব ক্লান্তি লাগছে নিবিড়ের এখন । একটা সিগাবেট খেলে হতো । অথচ বাস চলছে, সিগাবেট ধবানো যাবে না । এইমাত্র পেবিয়ে এসেছে বাঘাযতীন । কী করবে নিবিড় ? অস্থির লাগছে তার । যাদবপুর থানায নেমে, হেঁটে, কৌশিকেব বাড়ি যাবে — ঠিক যেমনটি কথা ছিল ? তাবপব কৌশিককে নিয়ে কফি-হাউস ফিবে আসবে ? নাকি ৮বি স্টপেজেই নেমে পড়বে ? কৌশিক নিশ্চযই অপেক্ষা করে কবে একাই কফি-হাউসে চলে আসবে । নাকি, বাড়ি ফিরে যাবে সে ? উফ্ ! কী মাবই না মারা হলো তাকে ! প্রথমে কিল চড় । চুলের মুঠি ধবে টানাটানি । জনতা ক্ষেপে উঠছে ক্রমে । যেন লাঠি নেই ; তাই লাথিই মারা যাক, এবকম ভঙ্গিতে একজন সরোষে পা ছুঁড়ল । পরক্ষণেই 'আ:' করে বসে পড়ল । লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পা সিটের নিচেব লোগায গিয়ে লেগেছে । ভিড় বেড়েই চলেছে । তার শার্ট, যার শার্টত্ব হয়তো বহুদিন আগে কোনো এককালে ছিল, তা এখন সমবেত টানাটানিতে ঝুলে পড়া বস্ত্রখণ্ডমাত্র । লোক বাড়ছে, চাপ বাড়ছে । কোত্থেকে এগিয়ে এসেছে এক ছোকরা । চেহারার সাক্ষ্য মানলে যাকে নেহাৎই স্বঘোষিত এক রক-সম্রাটেব তৃতীয় শ্রেণীব ভাঁড় বলে মনে হয় । 'কী বে শালা, অন্ধের আবার বেন্দাবন দেখাব শখ।' বলেই ঘাড় ধরে জোর এক ঘুঁষি চালালো লোকটির মুখে, তাবপব চোয়ালে । ঠোঁট ফেটে গেছে তার । গড়িয়ে বক্ত স্রোত নেমে আসছে । ভিজিয়ে দিচ্ছে শার্টহীন, হাড়সর্বস্ব বুক । রক্ত রক্ত । ভিড়ের চাপে এখন আব কিছুই দেখার উপায় নেই । দমবন্ধ অবস্থা প্রায় । লোক আব লোক । চিৎকাব আর হল্লা । মাবামাবি । কে যে কাকে মাবছে ! আসলে বোধহয় সবাইকে মারছে তবু কেউই সেটা বুঝতে পারছে না । নাকি কেউ কাউকে মাবছে না, তবু সবাই সেটা না-বুঝেও, বোঝাব ভান করছে ? ভিড় আব ভিড় । উফ । কী চাপ ! শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে । মার খাচ্ছে, কেউ একজন, ভযঙ্কব মার খাচ্ছে । চোখেব ওপব হাত দিযে বাসেব জানলায় মাথা বাখতে-বাখতে নিবিড় বুঝতে পাবল ; সে এখন কৌশিকের বাড়ি যেতে পাববে না, কোথাও যেতে পারবে না, বস্তুত এই মুহূর্তে সে কোথাও যাচ্ছে না ; এই বাস কোথাও আদৌ যাচ্ছে কিনা তাও ঠিক ধবতে পাবছে না নিবিড় ।

সমরজিৎ সিংহ

রূপতমসা

বিড়ালের থাবার মত, অতর্কিতে, অথচ খুবই সন্তর্পণে, নামল সন্ধ্যা। শীতের সন্ধ্যা ; ঘনিয়ে এল, নামতে না নামতেই। কোথাও কোন আলোর চিহ্ন আর রইল না। ব্লটিং পেপার যেভাবে কালি চুষে নেয়, সেভাবে নয় ; সেখানেও কালির দাগ থাকে, রেশ থাকে। এটা অন্য রকম, একচুমুকে গ্লাস খালি করার মত। কেউ বুঝি, আচমকাই, এক চুমুকে শুষে নিল দিনের সব আলো। এখন ঘনান্ধকার। কেবল, ঐ আকাশের গায়ে, আলোক যোজন দূরে নক্ষত্রালোক। এই পৃথিবীতে, এসে, কোনদিন পৌঁছাবে না ঐ আলো। জীবনের আর এক পারে, মনে হয়, রয়ে গেছে ঐ নক্ষত্রালোকিত জগৎ। কত দূরে!

বসে বসে, পাহাড়ী নদীটা দেখছিল গুরুচরণ। এখন, অন্ধকারে, কিছুই দেখা যায় না। ঐ নদীকেও না। শুধু এক কলকল ধ্বনি। অদ্ভুত, মাদকতাময়। ঐ ধ্বনিই সে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট, এক মুগ্ধতার ভেতর, ঘোরের ভেতর। অথচ, এই কিছুক্ষণ আগেও, আলো মিলিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, সে দেখতে পাচ্ছিল, ঐ ছোট্ট নদীর পাথরে লেগে, ফেনা হয়ে, উদ্বেলিত, উচ্ছ্বাসে, ফেটে পড়া। তন্ময় হয়ে। দেখতে দেখতে, ঐ ফেনা স্ফটিকের মত, হীরাচ্ছটার মত ছড়িয়ে, ঠিকরে পড়ছিল চারদিকে। সে যে কী রূপ, কী করে বর্ণনা করবে গুরুচরণ। অপলক তাকিয়ে থাকা, বিভোর হয়ে যাওয়া ছাড়া, ঐ রূপের সামনে করণীয় কিছুই ছিল না তার। এখন আর দেখতে পাচ্ছে না ; অনুভব করছে শুধু, ভেতরে ভেতরে।

নদীর ঐ দিকটায় ঘনজঙ্গল। ভেবেছিল, একদিন ঐ জঙ্গলে ঢুকে যাবে সে। তা আর হয়ে ওঠেনি। ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছে, দিন সাতেক হবে হয়তো। নগর জীবন ছেড়ে, মাঝে মাঝে, কোথাও হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত এক মজা পায় গুরুচরণ। এক ধরণের মুক্তির স্বাদও। এবার তা হয়নি ; সঙ্গে এসেছে গিরিবালা। নাতিকে দেখার সাধ বহুদিনের। ছেলে বদলি হয়ে এসেছে লামডিং জংশনে। এই সুযোগে, বেড়ানোও হবে, ভেবে, তার এই আসা।

ভোরে, হাঁটতে হাঁটতে, গুরুচরণ চলে যায় বাজার অবধি। বাজার না বলে, বরং বলা ভাল, বর্ধিষ্ণু হাট। ইদানিং দৈর্ঘপ্রস্থে বেড়ে যাচ্ছে। স্থানীয়রা অবশ্য রেগে যায় হাট শব্দে। তো, গুরুচরণ ভোরের চা সেখানেই খায়। খেয়ে, পুনরায়, ধীরে ধীরে, ফিরে আসে ছেলের কোয়ার্টারে। ততক্ষণে সবাই উঠে পড়ে। নাতিকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দেয় গিরিবালা। গুরুচরণের তখন মনে হয়, গিরিবালা এই বয়সে এসে, পুনরায় মা হওয়ার সাধ মিটিয়ে নেয় নাতিকে দিয়ে। সারা জীবন ধরে, মেয়েরা কি শুধুই মা হতে চায়? গান্ধারীও কি এই জন্য শতপুত্রের জননী হয়েছিল? কী সুখ এই মা হওয়ার মধ্যে? ভেবে পায় না গুরুচরণ ; কেবল অবাক হয়ে দেখে গিরিবালাকে। তার এত বৎসরের পরিচিত বৌ, নতুন রূপ ধরে আছে যেন!

বিকেলের দিকে, নদীর এদিকটায় আসে, রেললাইন ধরে। ঐ সময় নিজেকে বালক মনে হয় তার। ষাট পেরিয়ে যাওয়া বৃদ্ধের মুখোশ খসে পড়ে শরীর-মন থেকে। কোত্থেকে এসে যায় এক চপলতা। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে, কাউকে না দেখলে, দু-তিন লাফ হয়ত দিয়েই ফেলল। নাচতেও ইচ্ছে করে তখন। বোঝে না, জীবনে এত আনন্দ এতদিন কোথায় ছিল লুকিয়ে।

নদীর পাড় ধরে, হাঁটতে হাঁটতে, গতকালই, এ জায়গাটা আবিষ্কার করেছিল গুরুচরণ। তার কাছে এটা আবিষ্কারই, কুকের অষ্ট্রেলিয়া অবিষ্কারের মত। তখন সারা শরীরে বয়ে গিয়েছিল হিল্লোল। টিলার ঢাল বেয়ে নেমে, নীচে, ছোট্ট এক সমতল ভূমি। হঠাৎ দেখলে, মনে হয়, কেউ বুঝি, টিলা কেটে, তৈরী করে রেখেছে জায়গাটা। এমনই সাজানো। আর তার ঠিক নীচেই নদীটা। ইচ্ছে করলেই

হাত দিযে ছোঁয়া যায় জল । আশেপাশে, পাথবেব বড় বড় চাঁই । উপব থেকে, সহসা, কাবও দেখে ফেলাব সুযোগ কম । ভাবল, এই নির্জনতাই তো এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে ।

আজ দুপুরে, খেয়ে দেয়ে, তব সয়নি তার । হাফ সোয়েটাব-এর উপব, খাদির একটা পাঞ্জাবি চাপিযে, তার উপর শাল চড়িয়ে, ঘব থেকে বেবিয়ে এল সে । ছেলে গেছে অফিসে । গিবিবালা শুধু বলল, এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লে যে ! একটু জিরিযে নিলে পাবতে না ?

কোন জবাব দেয়নি সে, শুধু হাসল । এই হাসির অর্থ কি গিবিবালা জানে ? তাব প্রাণমন পড়ে আছে নদীর কাছে । দেরি করলেই মুশকিল ! যেন নদী কোথাও চলে যাবে, আব তার কাছে গিযে বসা যাবে না । মনে মনে বলল, নদীব কাছে বসে থাকাব আনন্দ যদি বুঝতে গিরিবালা ! সংসাবের মানেটাই পাল্টে যেত তখন ।

অন্যদিন, সাধাবণত, অন্ধকাব হলেই, ঘবেব দিকে পা বাড়ায গুরুচবণ । আজ আব ইচ্ছে করল না তাব । ঐ জলধ্বনি তাকে টানছে, চুম্বকেব মত । তাব মনে হল, ঐ ধ্বনিব একটা অর্থ থাকতে পাবে । থাকাটাই স্বাভাবিক ; কিন্তু কী সেই অর্থ, কী তাব মানে, সেটাই বুঝতে পাবছে না সে। দূরে, কোথাও শোনা যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকাব একটানা ডাক, তাব সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হাওযায় গাছের পাতা উড়ে যাবার এক গা ছমছমে শব্দ । ঐ সব ছাপিয়ে, তার বক্ষে ধ্বনিত হতে লাগল জলধ্বনি । শিউবে শিউবে উঠছে সে । অশ্রুতপূর্ব ঐ সুবের মায়া, ঐ ধ্বনি, ধীরে ধীবে, গ্রাস কবে ফেলছে তাকে ।

অন্ধকাবেব মধ্যে সে উঠে দাঁড়াল । কী এক অনুভূতি তাব সাবা শবীবে ; টেব পাচ্ছে, অনুভব কবছে, অথচ বোঝাতে পাবছে না । তার পা সহসা, কাব অদৃশ্য নির্দেশে শুরু করল নাচতে । হয়তো বা, ঐ ধ্বনিব আকর্ষণেই । এই উন্মাদনা ছড়িযে যাচ্ছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত । টলমল কবছে, টলমল কবছে । শিহবিত সে, হঠাৎ দেখল, ঐ ধ্বনি থেকে বেবিয়ে আসছে এক জগন্ময আলো । আহা ! কী তাব রূপ ! কী তাব দ্যুতি ! ইন্দ্রসভা আলো কবা বজ্রনীল আলোও এব কাছে ম্লান ; দিনেব আলো তো সেখানে তুচ্ছ । ঐ ভুবনভুলানো আলোচ্ছটায জুড়িযে যাচ্ছে, শীতল হয়ে যাচ্ছে তার প্রাণময় শবীর, সব । গ্রীষ্মের তীব্র দহনে শ্রান্ত যে, পাহাড়ী ঝর্ণায় শরীব জুড়োতে গেলে যে বোধ হবে, গুরুচবণের অনুভূতির কাছে তা অতি নগণ্য । তুলনা অনুচিত । ঐ আলো, দেখতে দেখতে, গুরুচরণেব সঙ্গে সঙ্গে শুরু কবল নাচ । যেন সেই বলছে, এসো । হাত ধরে নাচি । এসো ।

নিজেব অজান্তেই, অথবা হযতো ঐ ডাক উপেক্ষা কবা সম্ভব নয, বলে, গুরুচরণ পা বাড়াল আলোব দিকে । অবাক হযে দেখল, আলো সবে গেল তাব কাছ থেকে, আবাব পা বাড়াল, এবাবও যেন সবে যাচ্ছে ঐ আলো । ধবতে চেষ্টা কবল, পাবল না । নাগাল পেল না সে । আকুল হয়ে, হয়তো বা পাগলেব মতো পুনবায় হাত বাড়াল গুরুচবণ ; আব তখনই, মনে হল, সে বুঝি কোথাও পড়ে গেল ।

হিবণ্ময কোযার্টারে ফিরল বেশ দেবি কবে । আজ তাকে যেতে হয়েছিল মাইলংডিসা । একটা ব্রীজেব ওপর পাহাড়ের ধ্বস নেমেছিল । শীতকালে, বৃষ্টিবাদল ছাড়া, ভূমিকম্প ছাড়া ধ্বস নামল কী করে ! বেলের ম্যানেজাব থেকে স্টেশন মাস্টার, কেউ বুঝতে পাবল না এর কাবণ । তবু ধ্বস নেমেছে যখন, তা হবে, বলে হিবণ্ময়কে পাঠানো হযেছিল, কযেকজন অ্যাসিস্টান্ট সহ । ধ্বস সরিয়ে, ফিরতে ফিবতে দেবি হয়ে গেল ।

এই ফিটাবেব চাকরি তার ভাল লাগে না মোটেই । কিন্তু চাকরির বাজারে, এছাড়া সহজে আব কোন কিছুই জোটেনি তার ভাগ্যে । ফলে, এই চাকরি, আর, ঘুবতে ঘুরতে, এই লামডিং । শেষ পর্যন্ত লামডিং ! চাকরি পাবাব পব, অন্য সাতজন বাঙালি ছেলের মত বিয়ে থা করে ; এখন ছেলের বাপ হয়ে, লামডিং-মাইলংডিসা করছে ।

ঘরে এসে শুনল, দুপুবে খেযে দেযে, সেই যে বেড়াতে বেরিয়েছিল বাবা, আর ফিরে আসেনি । এক সপ্তাহ হয়েছে কি হয়নি, এখানে এসে, ছোট্ট ছেলেব মত হয়ে পড়েছিল বাবা । এটা সে লক্ষ্য করেছিল । দেখে বেড়ানোর এক আনন্দে মেতে উঠেছিল ; আনন্দ না বলে, নেশাতে পেয়েছিল, বললেই মানাবে । হিরন্ময় ভেবেছিল, রিটায়ার্ড লাইফেব একঘেয়েমি কাটাতেই বুঝি এসব করে বেড়াচ্ছে বাবা । বাবার এই খুশি দেখে, ভাল যে লাগেনি, তা নয় । বরং সেও খুশি হয়েছিল মনে মনে ।

কিন্তু কোথায় যেতে পারে বাবা ? একটা তিনব্যাটারি টর্চ নিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে ভাবতে লাগল সে, কোথায যেতে পারে বাবা ? কাবও বাড়িতে ? কিন্তু কাব বাড়িতে ? কোন কূলকিনারা পেল না সে । আসলে, কোথায় কোথায় বাবা বেড়াতে যায়, সে খবব হিরন্ময জানে না । নিজের উপর রাগও

হল। বাবার কোন খবর সে এতদিন, তাহলে, রাখেনি। নিজের বাবার খবব! এক মানুষ আর জনের খবব বাখে না?

পাশের কোয়ার্টারে থাকেন সুব্রতবাবু। ব্যচেলার, পুরুলিয়া থেকে এই এতদূবে এসে, একা থাকেন ভদ্রলোক। বয়সও কম হয়নি। চল্লিশের ওপরে। কেন এতদিন বিয়ে না কবে আছেন, জিজ্ঞেস করবে কববে, ভেবেও, জিজ্ঞেস করা হযনি কোনদিন। খুব একটা মিশুকে প্রকৃতিব, তাও নন তিনি। দেখা হলে, এই কেমন আছেন, কোথায় যাচ্ছেন, বলে হাসি বিনিময় হয, এই মাত্র।

এটুকুই সম্পর্ক। এখন, তাবই শরণাপন্ন হল হিবণ্ময।

সব শুনে, সুব্রতবাবুও চমকে উঠলেন। সে কি মশাই! বাত ৯টা বাজে, মেসোমশাই এখনও ফেরেননি। কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়নিতো?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অসহাযের মত বলল হিবণ্ময়। চলুন দেখি।

দু'জনে বেরিয়ে, প্রথমে রেলজংশন, হাট, তারপব লামডিং 'শহর' বলে যেখানেই পরিচিত, সেদিকে গেল। পরিচিত দেখে দু'একজনের কাছেও খোঁজ নিল; কেউ কোন সন্ধান দিতে পারল না। বিফল মনোরথে তারা ফেরার পথে, জংশনের ধাবে, দেখলেন, অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টাব, একা, ফিরছেন। তিনিই বললেন, গত কয়েকদিন ধবে ভদ্রলোককে নদীর দিকে যেতে দেখেছি। ঐদিকে যাননিতো?

হিরন্ময়দেব সঙ্গে ভদ্রলোকও শুরু কবলেন হাঁটতে। তারপর, দেখাদেখি, আরও অনেক লোক। নদীব ধারে এসে, ডাকতে শুরু করল হিরন্ময, বাবা, অ বাবা!

সুব্রতবাবুও, গলা মিলিযে, ডাকতে লাগলেন, মেসোমশাই, অ মেসোমশাই!

কোন সাড়াশব্দ নেই। নির্জন এই প্রান্তে, তাদেব কণ্ঠস্বর ফিবে ফিবে তাদের কাছেই আসতে লাগল। আব টর্চের আলো ঘুরে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক, বনবাজি ভেদকবে। কোথাও বাবাকে দেখতে পেল না হিরন্ময়। মন, প্রকৃতই, খারাপ হযে গেল তাব। বাবা কি ইচ্ছে কবে হাবিয়ে গেল? কোথায় হাবিয়ে গেল? নাকি, সন্ন্যাসী হতে চলে গেল সংসার ছেড়ে? কিন্তু কোন দু:খে? আজ সকালেও, হাসিখুশি দেখাচ্ছিল বাবাকে। বলছিল, তোব এখানে আবও কযেকদিন থেকে যাব, হিরু। এখানে এসে, আমার বয়স কমে যাচ্ছে।

বাবাব ঐ ছেলেমানুষী দেখে, সে, নীরবে হেসে, ঘবে ঢুকে গিয়েছিল। ঐ শেষ দেখা! কযেকদিন থাকব, কথাটার মানে কী এটাই, এই হারিযে যাওয়া? হঠাৎই, কান্না চেপে আসতে লাগল তাব।

কেউ একজন, তখনই, চিৎকার কবে বলল, ঐ যে! নীচে! সঙ্গে সঙ্গে, অনেকগুলি টর্চ জ্বলে উঠল নীচের দিকে লক্ষ্য কবে হিরন্ময়ও, মুখ তুলে, ঐ টর্চেব আলোয় দেখল, নীচে নদীর কাছে কে যেন শুয়ে আছে। তবে কি বাবা? ধড়াস করে, কেঁপে উঠল তাব বুক। ঢাল বেযে দৌড়ে, নীচে নেমে গেল সে; অন্য সময় হলে এটা পাবত না। হ্যাঁ, বাবা! পাথবের একটা বড় চাঁইয়েব উপব দু'হাত রেখে, জলে হাঁটু অবধি পা, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাবা। কেউ ধাক্কা দেয়নিতো? একটা কুচিন্তা, চকিতে, ছায়া ফেলে গেল মনের মধ্যে। যদি বাবাব কিছু হযে যায়! যদি-

এদিকে, ততক্ষণে, সবাই এসে পড়েছে নীচে। সুব্রতবাবু ঝটিতি নাকেব কাছে হাত রেখে বললেন, এখনও বেঁচে আছেন! চলুন, ধবাধরি কবে উপবে তুলি আগে।

হাঁ করে দেখছে হিরন্ময়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে, কি করবে, বুঝতে পারছে না। ফ্যালফ্যাল করে দেখল, অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টারবাবু অঞ্জলি ভরে জল এনে, ঝাঁপটা দিচ্ছেন চোখে মুখে। ধীরে ধীরে, চোখ মেলে তাকাল গুরুচবণ। প্রথমে, একটা দীর্ঘ ছায়াব আস্তবণ, ক্রমক্ষীয়মান সে আস্তরণ সরে গেলে, ক্রমে চোখেমুখে আলো। বুঝতে পারল, এতক্ষণ এক ঘোরের মধ্যে, আত্মহাবা হয়ে, ছিল সে। ঐ নৃত্যরত আলো! ঐ বজ্রনীল আভা! তার সবকিছু মনে পড়তে লাগল।

জ্ঞান এসেছে, আর কোন চিন্তা নেই। কেউ হয়তো বলল।

সবাইকে ঠেলে, মুখ বাড়িয়ে, ঝুঁকে পড়ে, হিরন্ময় জিজ্ঞেস করল, তোমার কোথাও লাগেনিতো, বাবা? কী হয়েছিল তোমরা?

গুরুচরণ, অনেক চেষ্টা করেও, কোন জবাব দিতে পারল না।

কথাটা চাউর হতে বেশি সময় লাগেনি। গোপালও কথাটা শুনে, বাইবে আর বেশিক্ষণ কাটায়নি, বরং তাড়াতাড়িই, ঘরে চলে এসেছে, বৌকে শোনাবে বলে। রেলওয়ের নিম্ন আয়ের কর্মী হিরন্ময়ের

অধীনে কাজ করে গোপাল। ঘরে এসে বলল, জান বৌ, ভূতে নয়। হিরন্ময়বাবুর বাবাকে পেয়েছিল পরীতে। ভূতে ধরলে, ঘাড় মটকে দিত; লোকটা আর বাঁচত না। সবাই বলছে, পরীতে পেয়েছিল, বলে, কথা বন্ধ করে দিয়ে গেছে। কাউকে যাতে বলতে না পারে।

এই, পরী দেখতে কেমন গো? খুঁউব সুন্দর বুঝি? ঐ হাইস্কুলের দিদিমনিদের মত?

বা: রে! আমি কী করে বলব? আমি দেখেছি না কি?

যাই বলো, তুমি কিন্তু নদীর দিকে একা একা কক্ষনো যাবে না। তোমাকে যদি পরীতে পেয়ে বসে, আমার তখন কী হবে, বলো।

আচ্ছা ..., পরীরা কি নদীর ধারেই থাকে? আর কোথাও নয়?

গোপাল হেসে ফেলল বৌয়ের কথা শুনে।

তুমি হাসছ যে!

তোমার কথা শুনে। পরীরা নদীর ধারে নয়, আকাশে থাকে। জ্যোৎস্নায় ঐ আকাশ থেকে উড়ে এসে নামে উদাস মাঠে, ফুলের বাগানে। আবার অন্ধকার রাতে জঙ্গলে, নদীর ধারে। বিজ্ঞের মতো, শোনা কথাগুলিই বৌকে বলল গোপাল।

এই, আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে গো—

গোপালের বৌ তার ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে পারেনি, এরই মাঝখানে, কেউ এসে কড়া নাড়ল, গোপাল, অ গোপাল।

দরজা খুলে দেখল, বিষ্ণুরমন দাঁড়িয়ে। হেড গ্যাংম্যান তাদের। বলল, চল। মাইলংডিসা যেতে হবে।

এখনই?

হ্যাঁ। হিরন্ময়বাবু অপেক্ষা করছেন। ট্রলিও এসেছে।

আবার কী উৎপাত শুরু হল?

ঐ যে, ধ্বস। ব্রীজটায় আবার ধ্বস নেমেছে।

গোপাল অবাক হয়ে গেল। দু'দিন আগে ধ্বস সরিয়ে এলাম না? ঐ যে, যেদিন হিরন্ময়বাবুর বাবাকে নদীর ধারে পাওয়া গেল-

চুক চুক করল বিষ্ণুরমন। আহারে! সেদিন থেকে এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি ভদ্রলোক। বোধহয়, বোবা হয়েই গেলেন। কেউ কিছু বললে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। আশ্চর্য! এই অবস্থাতে বাবাকে ফেলে, কাজে যেতে হচ্ছে হিরন্ময়বাবুকে। সরকারী অফিসের কোন হৃদয় নেই।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, এক বাঁক ঘুরে, গোত্তা খেয়ে, নীচুতে, যে পাহাড়ী নদীটার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে রেললাইন, তার চারপাশের নিসর্গ, সত্যিই, চমৎকার। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এক পাশে মাইলংডিসা পাহাড়। পাহাড়ের উপরে, দূরে দূরে ঘরবাড়ি। ঘাড় কাৎ করে তাকাতে হয়, এত উঁচুতে যে, না হলে, দেখা সম্ভব নয়। সূর্যের আলো ঐ পাহাড়ের উপরেই এসে পড়ে। তারপর ঠিকরে, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে। একপাশে, নীচে, অতলখাদ। মাইলংডিসা নামের পাহাড়ী নদীটাও পাথরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে, ঐ খাদের দিকেই গেছে। জলের ফেনার উড়না উড়িয়ে মাঝে মাঝে আহ্বান করে। ঐ দিকে তাকালে, মাথা ঘুরে যায় হিরন্ময়ের। মনে হয়, এক্ষুনি, কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাবে ঐ অতলে, খাদে।

এনিয়ে, তিনবার হল, এ জায়গাটায় এসেছে সে। রেলব্রীজটার যেদিক পাহাড়ের সঙ্গে লেগে আছে, কেটে বাদ না দিলে, রেল চলাচল অসম্ভব। একটা ব্যাপার, কোনমতেই, তার মাথায় ঢুকছে না, যে, শীতকালে বিনাবৃষ্টিতে ধ্বস নামল কী করে? এত ঘন ঘন? আগে বৃষ্টি হলে নামত, সে আলাদা কথা! ব্যাপারটা ভৌতিক, না অলৌকিক? দুটি শব্দই তার কাছে সমার্থক। কেন না, সে এর কোনটাতেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং এভাবে না ভেবে, অন্যভাবে ভাবতে শুরু করল। তবে কি মাটির দোষেই এসব হচ্ছে? ঠাণ্ডা যখন নামে, হিট এবসর্ভ হয়ে যায়, এরই ফলে কোন বিক্রিয়া হচ্ছে না তো?

রাতে, ঘরে ফিরে দেখল, বারান্দায় বসে আছে বাবা। চুপচাপ। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন আছ, বাবা?

মাথা নাড়ল গুরুচরণ; ইঙ্গিতে বোঝাল, ভাল।

অনেক রাত হয়েছে। চল, ঘরের ভেতরে যাবে। বাইরে, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে তোমার। এক বিষন্ন, উদাস দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকাল গুরুচরণ। চোখের ভাষায় বোঝাতে চাইল, আমাকে একা থাকতে দাও।

হিরন্ময়, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ঘরে ঢুকে গেল।

ছেলেকে দেখেই, হাউমাউ করে, কাঁদতে শুরু করল গিরিবালা। লোকটা আর কতদিন এভাবে থাকবে ? তুমি কী ঠিক করেছ ? ডাক্তার না দেখিয়ে, এভাবেই মেরে ফেলবে, তিলে তিলে ?

মায়ের কান্না দেখে, হঠাৎই, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল হিরন্ময়।

তোমরা আমাকে কী পেয়েছ, মা ? অমানুষ আমি নই। আমিও বাবাকে ভালবাসি। বাবার জন্য ভাবি।

বিছানায়, হিরন্ময়ের বৌ, ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, আমার একটা কথা শুনবে ?

বল।

বাবাকে ডাক্তার দেখাতে, কালই, গৌহাটি চলে যাও। বাবার এই অসহায় বসে থাকা আমিও সইতে পারি না। এখানে এসে যে লোকটা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাঁর এই নীরবতা, ভয়ঙ্কর মনে হয়। বড় ভয় করে আমার।

ঘুমের মধ্যে, ডুবে যেতে যেতে, হিরন্ময় বলল, আমিও ভাবছি। এই ফাঁকে মালিগাঁও গিয়ে, মাইলংডিসার রিপোর্টটাও দেব।

মাইলংডিসার কথা মালিগাঁও জানে। ঐ জানাটাই সার। কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সে বিষয়ে তারাও মূঢ়। একরাশ আশ্বাস নিয়ে ফিরে এল হিরন্ময়, এর বেশি কিছু নয়। তবে, কাজের কাজ একটা হয়েছে। বাবা দু'একটা কথা বলতে শুরু করেছে। সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। চূড়ান্ত কোন উত্তেজনায় নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি, বলে, এই অবস্থা।

গুরুচরণ ধীরে, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, উত্তেজনা নয়। সত্য।

হ্যাঁ সত্য। তবে, উত্তেজনাও এক ধরণের সত্য বটে। আর যাই বলুন, মিথ্যে তো নয়। হা হা হা করে হাসতে লাগলেন সাইকিয়াট্রিস্ট।

গম্ভীর হয়ে গেল গুরুচরণ। হিরন্ময় তখন ভাবছে, কোন সত্যের কথা বলতে চাইছে বাবা। কী এমন দেখেছিল যাতে চূড়ান্ত উত্তেজনা হয়। তখনই, মনে পড়ে গেল, গুজব হয়ে যাওয়া কথাটা। বাবা কি সত্যিই পরী দেখতে পেয়েছিল ? সত্যিই ?

গাড়িতে, ধীরে ধীরে, বাবাকে জিজ্ঞেস করল হিরন্ময়, বাবা, তুমি কী পরী দেখেছ ? চমকে উঠল গুরুচরণ। কই, নাতো !

সবাই বলছে, তুমি সেদিন পরী দেখেছ। পরীরা তোমাকে অজ্ঞান করে রেখে গিয়েছিল ঐ নদীর কাছে।

গুরুচরণ বুঝল, কথা বলে লাভ নেই। শুধু বলল, হতেও পারে।

সেই থেকে, আরও স্বল্পবাক হয়ে গেল গুরুচরণ। তার মন পড়ে থাকে ঐ ধ্বনির আলোয়। সে টের পেয়েছে, পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্যই সব সত্য নয়। আরও আছে। কিন্তু সেটা কি ? ঐ আলো ? আলোটা নাচতে শুরু করেছিল। তারপর আর মনে নেই তার।

ঘর থেকে বেরুনো এখন বারণ। ছেলে পইপই করে বলে গেছে, ঘর থেকে বেরুবে না, বাবা। বৌমাকেও বলে গেল, বাবা যেন, একা, কোথাও না যায়।

গিরিবালা বলল, আমরা বরং চলে যাই। কলকাতায় ফিরে যেতে মন চাইছে। ওখানে আরও বড় বড় ডাক্তার—

আরও কয়েকটা দিন থেকে যাও, মা। এ অবস্থায় বাবাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। যে লোকটা পরী দেখেছে, তার মন বোঝা দায়। কখন কী ঘটে যাবে, তুমি সামলাতে পারবে না।

তুমি এসব কি বলছ, হিরু ? লোকের কথায় তুমিও নাচছ ?

হিরন্ময়, কোন কথা না বলে, বেরিয়ে গেল।

গুরুচরণ বুঝল, ব্যাপারটা আরও সঙ্গীন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে যা দেখেছে, তাও কাউকে বলতে পারছে না। কে বিশ্বাস করবে ? কোন ভাষায় বর্ণনা করবে ঐ রূপ ? হয়তো, লোকের কথাই

ঠিক, ঐ আলোর রূপই পরী। সে হয়তো পরীই দেখেছিল সেদিন, ঐ নদীর ধারে। বিকেলে, এক ফাঁকে, চুপি চুপি, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে, পুনরায়, ঐ জায়গায়। নির্জনতম স্থানটির স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে পাখির ডাকে। জলের কল্লোল, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, হাওয়ায় গাছের পাতায় কেঁপে ওঠার শব্দে প্রাণ ভরে যাচ্ছে গুরুচরণের। মানুষের সঙ্গ নয়, এই নীরব নির্জনতার সঙ্গই পুনরায় যেন চাঙ্গা করে তুলছে তাকে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। এখানে, সন্ধ্যে মানে অন্ধকার। ঘরে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়াল গুরুচরণ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পরিষ্কার এবং স্পষ্ট গলায় কে যেন তাকে বলল, দাঁড়ালে কেন ? বসে পড়।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই। গা শিব শিব করে উঠল তার। আবার শুনতে পেল ঐ গলা, বসে পড়।

বাধ্য শিশুর মত বসে পড়ল গুরুচরণ। তখনই, তার চোখে পড়ল দৃশ্যটা। দূর থেকে ঐ পাহাড়টা হেঁটে আসছে। কোয়ার্টারের বারান্দা থেকে কতদিন দেখেছে সে নিশ্চলনীল পাহাড়টাকে। নাম জানে না পাহাড়ের। তার সঙ্গে, তাল মিলিয়ে হেঁটে আসছে গাছপালা। এমনকি, পথে আসতে, বামদিকে যে অশ্বত্থ গাছটা দেখে এসেছিল সে, সেই অশ্বত্থ গাছটিও হেঁটে আসছে। তার বুক কাঁপতে লাগল, হাত-পা কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে এল। কী ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটতে যাচ্ছে, সে জানে না।

তখনই ঐ গলাটা, পুনরায়, শুনতে পেল। ভয় পেয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি করব না। তুমি শুধু দেখে যাও।

গুরুচরণ এই প্রথম লক্ষ্য করল, ঐ স্বরধ্বনি, আসলে, জলের কলকল সুর। আজ, ধীরে ধীরে, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে মানে। সেদিন সে বুঝতে পারেনি। দেখল, জলের মধ্যে যেসব পাথরের চাঁই পড়ে থেকেছিল, সব উঠে আসছে ডাঙ্গায়, লাফিয়ে লাফিয়ে। তার মনে হল আজ কী কোন উৎসব ?

সঙ্গে সঙ্গে, চারদিক থেকে শব্দ হতে লাগল, উৎসব, উৎসব। গাছেরা, মাথা নেড়ে নেড়ে, এগিয়ে আসতে আসতে, বলছে, আজ উৎসব। পাথরও গড়াতে গড়াতে বলতে লাগল, উৎসব। নদী নাচতে নাচতে বলল, আজ উৎসব। আর, তাদের কলতান থেকে বেরিয়ে আসছে বজ্রনীল আলো। চারদিক আলোকিত হয়ে গেল, নিমেষে। মুগ্ধ, বিস্ময়ে, হতবাক গুরুচরণ দেখতে লাগল ঐ আলো ....

আবার মাইলংডিসা। এবার, পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হিরন্ময়ের। ব্যাপারটা যে কি, কেউ বলতে পারছে না পরিষ্কার করে। এরই মধ্যে ঘুরে গেল মাটি বিজ্ঞানীরা। দিল্লী থেকে এসেছিল। বড় বড় যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে দিল পাহাড়ের পেটে। স্থানীয় লোকজন ক্ষেপে গিয়েছিল : দেবতার পেটে অস্ত্র ঢুকিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, এই ভয়ে শুরু করেছিল হৈ চৈ। কাজ প্রায় আটকে যাচ্ছিল। একজন মুরুব্বী গোছের লোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কিছু অর্থও হয়তো হাতে গুঁজে দেয়া হয়েছিল, এক্সপেরিমেন্টের কাজ শুরু হয়। পাহাড়ের পেট থেকে বের করে আনল নরম, তুলতুলে, মানুষের ভুঁড়ির ভেতরের নরম পদার্থের মত মাটি। কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। লোকজন খুব খুশি। দেবতা কি মিথ্যে হয় ? জয়বাবা মাইলংডিসা !

হিরন্ময় শিহরিত বোধ করে। এই স্থানটির রহস্যময়তা তাকে মুগ্ধ করে, আবার বিপন্নও করে তুলেছে। রাশিয়া-আমেরিকা-জার্মান থেকে বিজ্ঞানীরা আসছেন শীঘ্রই। তবু তার সংশয় কাটে না। 'জয় বাবা মাইলংডিসা' বলে যারা উল্লসিত হয়েছিল, ঐসব পাহাড়ীদের বিশ্বাস কি অমূলক ? বেশ ধন্ধে পড়ে যায় সে। ঝাটিঙ্গা নিয়ে এমনিতেই রয়েছে আর এক বিস্ময়। দল বেঁধে পাখিদের আত্মহননের কথা, সে পড়েছিল কাগজে ; এবার চাক্ষুস দেখল। এলাকাটাই কি কোন রহস্যঘেরা ?

আজও, ব্রীজের লাইন কাটাতে কাটাতে চুল ছিঁড়ছিল নিজের। কি চাকরি নিয়ে এসেছে সে ! আর কেউ এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। তবে কি সব মাথাব্যথা একা তারই ?

একজন স্থানীয় লোক এসে খবর দিয়ে গেল, বাবু। দেবতা মুখ তুলে চেয়েছেন। তিনি কয়েকহাত দক্ষিণে সরে গেছেন।

কী আবোল তাবোল বকছ ? ধমকে ওঠে হিরন্ময়।

লোকটা জিভ কেটে বলল, মিথ্যা বলব না, বাবু। পাহাড় ঘেঁষে আমাদের গাঁ। জমি আছে। এখন দেবতা সরে গেছেন, আমাদের জমি বেড়ে গেছে। জয় বাবা মাইলংডিসা।

হিরন্ময়ের সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

গোপাল লাইন কাটা থামিয়ে বলল, এসব জিন পরীদের কাজ। গোটা এলাকাটাকেই পরীতে পেয়েছে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল হিরন্ময়। বলল, পরী!

সন্ধ্যের দিকে, পাহাড়ের অপরপ্রান্ত স্বচক্ষে দেখে, ফেরার পথে, হিরন্ময় বলল, একটু মদের ব্যবস্থা করতে পারবে, গোপাল? ঐ একটু না খেলে, আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব রে!

গভীর রাতে, টলতে টলতে, কোয়ার্টারে ফিরল হিরন্ময়। এসে দেখল, বাবা বারান্দায় বসে আছে। এত রাতে, বাবাকে, এভাবে বসে থাকতে, দেখে, অবাক হয়ে গেল সে। তাকে দেখে, গুরুচরণ জিজ্ঞেস করল, এসেছ?

হ্যাঁ।

আমি ভাবছি, কাল চলে যাব।

কালই?

হ্যাঁ। এখানে থাকলে, আমি পাগল হয়ে যাব হিরু।

আমিও পাগল হয়ে যাচ্ছি বাবা।

তুমিও!

আজ ক'দিন ধরে মাইলংডিসাকে নিয়ে, ভাবতে ভাবতে, আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। মাইলংডিসা, বাবা, মাইলংডিসা।

কেন? মাইলংডিসার কি হল?

ঐ পাহাড়টা পিঁপড়ের মতো হেঁটে আসছে। মাথায় জনপদ, বাড়িঘর নিয়ে। কেউ বুঝতে পারছে না, বিশ্বাস করছে না। তুমি কি বিশ্বাস করবে?

আমি বিশ্বাস করি, হিরু। আমি নিজের চোখে দেখেছি-

কোথায় দেখলে তুমি? ঐ নদীর ধারে?

হ্যাঁ।

লোকে যে বলে, তোমাকে পরীতে পেয়েছিল!

পুনরায়, নিজেকে গুটিয়ে নিল গুরুচরণ, তৎপরতার সঙ্গে। বুঝতে পারল, অনর্থক বেশি কথা বলার মানে নেই। বলল, আমাদের জন্য রেলওয়ে পাশ এর ব্যবস্থা কর। আমার সঙ্গে তোমার মা যাবে।

বিছানায় বৌকে দেখে মনে হল, দুটি মাইলংডিসা বুকে চাপিয়ে শুঁয়ে আছে বৌ। ঐ পাহাড়টার মত সুন্দর রহস্যময়। সে, সহসা, কী ভেবে, ঠেলতে শুরু করল। আর বলতে লাগল, তোমাকে কোনরকমেই নীচে নামতে দেব না। নীচে নামতে দেব না।

ধড়ফড় করে উঠল বৌ। হিরন্ময়কে এ অবস্থায় দেখে, একটু ভয় পেয়ে গেল। বলল, ওরকম করছ কেন? শুয়ে পড়।

হিরন্ময় দেখল, মাইলংডিসা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে পরী। দুহাত তুলে তাকে ইশারা করছে। এস, এস। সে পরীকে জড়িয়ে ধরতে গেল। পারল না।

বৌ প্রথমে একটু সরে গেল। পরে ভাবল, কী লাভ। এই শরীরের উপর তো হিরন্ময়েরই অধিকার। সে আর সরে গেল না।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় হিরন্ময় ধরতে পারল পরীকে। তারপর তার পালক খসাতে শুরু করল, একটার পর একটা।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল তার, হঠাৎই। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন। মাইলংডিসা পাহাড় ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে নীচে। আর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে বাবা, থামাও, থামাও। নীচে একটা জটলা। কেউ কার কথা শুনছে না, প্রত্যেকে নিজের কথা বলতে ব্যস্ত। নেমে আসছে, পাহাড় নেমে আসছে।

সবাই উপর দিকে তাকাল। দেখল, মাইলংডিসা এগিয়ে আসছে হাতির মত থপথপ করে। সারা শরীর থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আশ্চর্য এক আলো। ঐ আলোর দিকে তাকানো যায় না। ভয়ে, বিহ্বল মানুষগুলি ছুটতে লাগল এদিক ওদিক।

গুরুচরণ তখনও উপর থেকে চিৎকার করছে, ওকে সবাই মিলে থামাও। ওকে থামাও। কেউ

একজন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কী করে থামাব ?

সবাই মিলে একসঙ্গে ধাক্কা দাও ।

যারা পালাচ্ছিল, তারা সবাই মুহূর্তে, দাঁড়িয়ে পড়ল । বলাবলি করতে লাগল । তারপর একজন একজন করে, সবাই জড়ো হল পাহাড়ের পাদদেশে, মাইলং বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে, সমবেতভাবে, গাড়িতে গাছ তোলার সময়, অথবা আরও ভারী কোনও বস্তু, ঠেলতে হয়, সেভাবে ঠেলতে লাগল, প্রাণপনে । তাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলতে লাগল, জয় বাবা, মাইলংডিসা —

আর সবাই যেন দোঁহার হল হেঁইয়ো মারো, হেঁইয়ো ।

হিরন্ময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, মাইলংডিসাকে ঘিরে, লক্ষ লক্ষ লোক চিৎকার করছে, হেঁইয়ো মারো, হেঁইয়ো ।

তন্ময় হয়ে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে দেখতে সে ভুলে গেল বাবার কথা । হঠাৎ যখন খেয়াল হল, দেখল, পাহাড় চূড়ার কোথাও বাবা নেই । চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল বাবাকে । পেল না ; বরং দেখল ঐ কোবাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক আলো, হিমশীতল আলো, গা জুড়িয়ে যাচ্ছে তাতে ।

আলোয় দাঁড়িয়ে, সে দেখল, সমবেত মানুষ, সবাই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে পড়েছে । স্থির, কেউ নড়ছে না, এমনকি, তাদের হাত পাও আর নড়ছে না । যেন গাছেদের বদলে এই মানুষগুলিই দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাইলংডিসাকে ঘিরে ।

স্বপ্নের কোন মানে খুঁজে পেল না হিরন্ময় । পাশে, চিৎ হয়ে অঘোর ঘুমোচ্ছে বৌ । উরুর উপরে উঠে গেছে কাপড় । ছেলেটা মায়ের একটা স্তন বাঁহাতে ধরে শুয়ে আছে । সে, ধীরে ধীরে বৌয়ের কাপড় ঠিক করে দিল ; তারপর ডানহাত দিয়ে, বড় মমতায, বুলিয়ে দিল বৌ আর ছেলের মুখ।

বারান্দায় এসে, অবাক হয়ে, দেখল, বাবা বসে আছে সেই চেয়ারে ।

তুমি ঘুমোওনি, বাবা ! তোমার প্রেসার একবার চেক করাতে হবে । সারারাত ঘুমোওনি তুমি —

এবারও কোন উত্তর দিল না বাবা ।

তুমি কেমন পাল্টে গেছ, বাবা !

গুরুচরণ ছেলের দিকে একবার তাকাল ; বলতে পারল না, বাইরে থেকে আমাকে কী করে বুঝবে তুমি । কী করে তোমাকেই বা বোঝাই, যে এখানে এসে আমি পুনর্জন্ম লাভ করেছি !

হিরন্ময় বাবার কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে বলল, তুমি কি আজই চলে যাচ্ছ ? আরও দিন কয়েক থাক না ! সোমা বলছিল, যে, কলকাতা থেকে তোমরা যদি এখানে এসে থাকো, আমাদের সঙ্গেই, তুমি আর মা —

গুরুচরণ বুঝল, সবই মায়া । পুনর্বন্ধনে আর জড়াতে চায় না সে । ঐ আলো এখনো নাচছে তাকে ঘিরে । বলছে, এস, এস । হরিদ্বার, বৃন্দাবন ঘুরেও ঐ আলো দেখেনি কোনদিন । এসে দেখল, এইখানে । এই পুনর্জন্ম আর হাতছাড়া করতে চায় না গুরুচরণ । ছেলের ব্যাকুলতা দেখে, শুধু বলল, তোমার মা যদি থাকতে চায়, থাকুক ।

আর তুমি ?

আমি একবার গঙ্গোত্রী যাব, কলকাতা হয়ে । ভাবছি, বাড়িটা বিক্রি করে দেব, অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা করব । ভয় নেই, তোমার পাওনা গণ্ডা তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েই যাব ।

বাবার দৃঢ়চিত্ত দেখে, কথা ঘুরাবার জন্য হিরন্ময় হঠাৎ বলে ফেলল, তুমি একবার মাইলংডিসা যাবে ? ঐ রহস্যময় পাহাড়টা —

হাঁটছে তো ? চেষ্টা করে দেখ, মাইলংডিসার কোন ব্যবস্থা করতে পার কিনা ! গুরুচরণের মুখে এক অলৌকিক হাসি ছড়িয়ে পড়ল । ঐ হাসি দেখে, ভয় পেয়ে গেল, হিরন্ময় ।

সকালে, খবর এল, আমেরিকা থেকে বিজ্ঞানীরা এসে পৌঁছেছেন ; তাকে সঙ্গে যেতে হবে, ঐ মাইলংডিসায় ।

দেবীপ্রসাদ সিংহ

এক বিকেলে

তবে আমরা আজ সেই বিকেলের গল্প বলি যে বিকেল আমাদের জীবনে একবার আসে যে বিকেল আমাদের জীবন পূর্ণতর করে যে বিকেলে মুহূর্তের জন্যে আমরা অলৌকিকের মুখোমুখি আর যে বিকেলে অনন্তর প্রসারিত ঘোলাটে মাথার ঠিক ওপরে আকাশ দিব্য বিভা হয়েছিল, আর অনন্ত! নশ্বরতার কেন্দ্রে ধ্রুব সেই বহমানতার তীব্র, ঝাঁঝালো, অনিবার্য আস্বাদ সে এই বিকেলে আর কিছুক্ষণের ভেতরেই পাবে তবে সেই রূপকথা এখন নয় এখনো নয় কেননা এখন সেই দিব্য বিভার নীচে ঘাসের রং ঘাসের ওপর আলতোভাবে লেগে থাকা আলোব রং আলো ঘাস আর স্মৃতিতে মাখামাখি রং বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ: কোমল ক্রমশ: জলে ধুয়ে ধুয়ে যাওয়া ক্রমশ: টার্ণারের ছবি হয়ে উঠছিলাম আমরা আর আমার বুকের ভেতর পাগলা ঘন্টি বাজছিল আমার চোখেব মণির ভেতর শেষ কার্তিকের ব্রহ্মপুত্র উত্তর যৌবনা গর্বিনী নারীর মতো অলস মন্থর রূপ ঝরে গেছে বিয়োবার দেরী নেই আর জীবন কি তবে বার বার মৃত্যুরই সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে ? মাঝ নদীতে চিত্রার্পিত নৌকার সারির হৃদয় চিরে সোনালী রক্তিম আলোর ফলা আসন্ন আঁধারের সঙ্কেত দেয় যেমন তেমনই ? আমার মাথাব ভেতর অবিরাম পতনের শব্দ হচ্ছিল হাঁ করা এক অতল কালো গহ্বরেব ভেতব আমি কেবলই পড়ে যাচ্ছিলাম অনন্তকাল ধবে আর চবাচর জুড়ে শুধু আমার হৃৎপিণ্ডেব ধ্বক ধ্বক দুহাতে আমি ধরে আছি দুমুঠো গাঢ় শূন্যতা হৃৎপিণ্ডে ঘা পড়ছিল পাগলা ঘন্টি ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং কোথাও কি আগুন লেগেছে আমি এই হাজাব বছব ধরে পথ হেঁটে আসা মানব সভ্যতার মুখে সযত্নে আগুন দিই তাবপর সেই আগুনে রমেনের সিগারেট যা দুটো টানের পর নিভে গিয়েছিল ধবিয়ে দিই। এই মানবিক উষ্ণতার ভঙ্গি আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে জীবন সম্পর্কে মোহময় করে, এমনই স্ব-নাটকীয়তার আচ্ছন্ন করে আমাকে যে রমেন হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল আমাকে আমি শুনতে পাইনি রমেন কি বলতে চেয়েছিল অনন্ত নদীর অতো কাছে যাস না নদী তার ভাঁজ পড়া বিপুল শরীরে অপরাহ্নের রহস্য খুলে ভেঙ্গে দেখাব জন্যে আমাকে চোখে ইশারা কারা শরীর খোঁজে কেউ শরীর খুঁজেছে কোনদিন আমি আমার শরীর খুঁজছিলাম তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এল জল জল ছানতে ছানতে পাথর পাথরের সেই খোসা ছাড়ানো অনেক শতাব্দীর মনিষীর কাজ আমি সেই খোসা একটা একটা ছাড়াতে ছাড়াতে এক সময় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্তে কাদায় মাখামাখি আর একজন মানুষ তার কালো ভয়ংকর তীক্ষ্ণ নোখ আমার দুচোখে বিঁধিয়ে বলল 'আমি তোর স্মৃতি তোর সত্তা তোর ধ্বংস' নদী খলখল শব্দে হেসে উঠে ডাকল 'আয় আমার কোলে আয় ইদীপাস' আমার দুচোখে রক্ত গড়াচ্ছিল আমি জলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে দিলাম আ: জল মাতৃজঠর আমার মুখ সস্নেহে ঘিরে নিয়েছিল সেই এখনো অপ্রসূত আমি সেই আদিম ভ্রূণ চিৎকার করে বললাম 'আমি কি পথ হারিয়েছি কপাল কুণ্ডলা ?' ঘন ইস্পাতবর্ণ সেই জলরাশি ফিশ ফিশ করে বলল 'পথ তো একটাই সবাই যেমন আমি নদী রাত্রির দিকে চলে যাবো ' এবং তখন আকাশের আদিম বিষন্নতা পৃথিবীকে ভর করে সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় ছায়াঘনায় আলো মুছে মুছে আসে আহ্ সেই প্রলম্ব আলোর জাফরান রেখাগুলোর ওপর স্থিরছবি নৌকার কম্পন আমাদের অন্ত:স্থ কবিতাকে আলোড়িত করে আমরা অন্তর্জলি যাত্রার তীব্র বিস্ফোরক শেষ দৃশ্য অনুভবে নিয়ে আসতে পারি রমেন আমার মাথা জল থেকে তুলে ধরে ঝাঁকুনি দেয় আমি প্রচণ্ড ক্রোধে রমেনকে বললাম, 'তুই জ্যোতিষ্কপিণ্ড অ্যামিবা ডাইনোসর আরশোলার অনর্থক জান্তব ট্র্যাজিক ইতিহাস আমি তোকে ছুঁতে চাই না-at my back I always hear Tinne's winge‹ chariot hurrying near রমেন আমাকে বলল দ্যাখ আমি বমেনের দিকে চাইলাম রমেনেব শরীর থেকে মাংস খুলে খুলে পড়তে থাকল আমি প্রচণ্ড ভয়ে বিজুর দিকে বিজুর হিমশাদা করোটি হাওযায

শব্দ করে উঠল তীব্র শিবাধ্বনি সমস্ত ঘাসজমি জুড়ে বই এব ছেঁড়া পাতা বাতাসে উড়ে উড়ে জলে পড়ছিল সীমাই যদি চূড়ান্ত তবে অসীম কোথায় আমি যে চঞ্চল আমি সুদূবের পিয়াসী আমি এক হারামজাদা নচ্ছার আমি অসীম অসীম বলে ডাকতে থাকি আমাব গাল বেয়ে জল পড়ে আব আমার ভেতর অনবরত পতনের শব্দ পতনের শব্দ । বিজু সিগারেটে দীর্ঘ দুটো টান দিয়ে বমেনেব দিকে বাড়িয়ে বলল 'জিনিষটা খাস্তারে দুটানেই ব্যোম' । রমেন মাথা নাড়ল । 'অনন্তব অবস্থাটা দেখ ঘাটেব মড়ার মতো পইড়া আছে শালা' । বিজু একঝাঁক সাবসের নদীব এপাব থেকে ওপাবে উড়ে যাওয়া দেখছিল । এখন সে বমেনের বাড়ানো হাত ছুঁযে সিগারেটে আরো এক বড়ো টান দিল । 'ফার্স্ট ডে, সামলাতে পাবেনি ; আমি কতো করে বললাম বাঁড়া ।' বিজুব এই উচ্চাবণেব ভেতর এক ধরণেব আত্মসচেতনতা ছিল, পেখম ফোলানো মনোভাব, আসলে আমার এই গল্পেব যে সময় তখন এই শব্দগুলো-যে শব্দগুলোব মহামহিম যৌন প্রতীকময়তা সরাসবি ও অভ্রান্ত আব বাংলা সাহিত্যে যাদেব এখনো পেছন দবজা দিয়ে ঢুকতে দেয়া হয না—মহানগরী থেকে ফোঁটা ফোঁটা চুঁইযে আসছে মফস্বল । বিশেষ এক উচ্চাবণে, যা বিজু এখানে চেষ্টা করেছিল, এ ধবণের প্রতিটি শব্দ মহার্ঘ কেন না এই শব্দেবা মধ্যবিত্ত দৈনন্দিনতাব বাইরেব বিশাল জগতের দিকে আমাদেব চোখ ফেরাতে বাধ্য কবে । এমন নয যে এব চেয়ে খাবাপ শব্দ, ইঙ্গিতেব প্রচলন ছিল না তবে সে অন্য মহল, অন্য পবিবেশ, অন্য ভুবন । আমি এখানে আমাব গল্প বলার ইচ্ছে করি সেই বিকেলের গল্প যেদিন আকাশ দিব্য বিভা আর সেই আকাশেব নীচে নদীতীবে একজন মানুষ-অন্তত-মরতা আক্রান্ত হচ্ছিল । বিজু আবাব বলল 'বুকে দম নেই গাঁজাতে এসেছে বাঁড়া ।' এই এক শব্দে বিজু যে ইদানীং উনিশ পেবিয়ে কুড়ি, কলেজের শেষ বছরেও যে পড়ার বই জোবে জোরে মুখস্থ কবে, যে দেব আনন্দ ও আশা পাবেখের ফ্যান, এবং সম্প্রতি আত্মবতিব রোমাঞ্চ জেনেছে, সে পুরুষ হয় । বমেন তারদিকে চোখ ছোট কবে তাকাল, ঘাসেব উপর মুখ নীচু করে থু থু ফেলল, কিছু বলল না । ব্রীজে একটা মালগাড়ি ঝং ঝং শব্দ কবে প্রথমে মাথা তাবপবে শবীব সমেত ঢুকে গেল । আলো কমে যেতে ব্রীজটা ক্রমশ: প্রাগৈতিহাসিক হয়ে উঠছিল । বাজাবের কাছে একটা মাইক থেকে অনেকক্ষণ ধবে হিন্দিগানের ক্ষীণ বেশ বাতাসে ভেসে ভেসে নদীব ওপবে মিলিয়ে যাচ্ছিল । বিজু কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল, তারপব বলল 'চল শালা ফার্স্ট শো কাববাঁ মেবে আসি আর ডি পাগলা করে দিচ্ছে ।' বমেন চিৎ হয়ে শুযে থাকা অনন্তেব দিকে তাকিয়ে ডাকল 'এই অ্যাই অনন্ত হইল কি তোর ?' অনন্ত তাকে মুখ ফিবিযে দেখল, বিজুকে দেখল তাবপব স্বচ্ছভাবে বলল 'জগতেরে ছেড়ে দাও যাক সে যেখানে যাবে ।' বিজু হেসে উঠল । 'অনন্তটা তখন থেকে মবাব কথা বলে যাচ্ছে, এবকম চললে আমাদেব সবাইকে পাগলা করে ছাড়বে ।' বিজু সেইসব ভাগ্যবান মানুষদেব একজন যে মৃত্যু সচেতন নয় । জীবন কি সবল কি সহজ কি অমানুষিক হয়ে উঠতে পাবে যদি আমরা সেই অন্ধকার থেকে চোখ ফিবিয়ে থাকি ? বিজু বলল 'অনন্তটাকে একটা লাভ জুটিযে না দিলে হবে না।'

বিজুর কথায় মাতৃস্নেহের প্রতিধ্বনি ছিল । সেই আবেগে আমাদের শহবে সন্ধ্যা নেমে আসে । নদীব ওপাবে গাছেব ফাঁকে নীল কুয়াশা মেঘেব মতন, রোমকূপে শিহরণ, শীতের প্রথম অনুভূতি, মাঝনদীতে নৌকাগুলিতে একটা দুটো মৃদু বাতি জ্বলে উঠছে, আকাশময় পাখিব ডানার কোলাহল । প্রদোষেব মৃদু, নবম, ঠাণ্ডা, বিষন্ন, মুমূর্ষু আলো তাদেব শরীরকে সুদূর ও স্বপ্নময় করে । এই সেই সময় যখন বাস্তব পেছনের বেঞ্চে চুপ কবে এসে বসে, আমাদেব জীবনযাপন অনির্বচনীয়ের সান্নিধ্য পায় । চটকা প্রথম ভাঙে বিজুব, তার মাথাব ঠিক ওপবে একপাল মশা বৃত্তাকারে স্থির হয়েছিল । বিজু দুহাত মাথার ওপবে তুলে তালি দেয়, মশার পাল সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়, আবার তাব মাথার ওপবে পুরনো ফর্মেশনে ঘুরে আসে । বিজু উঠে পড়ল, প্যান্টের পেছনে লেগে থাকা ঘাস মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল 'চল রে অনন্তকে ওঠা ফার্স্ট শো মেরে আসি।' আ: কি চমৎকার, কি শিশু দিন ছিল তখন, সিনেমার সামাজিক অন্ধকার আমাদের উত্তেজনাকে তখনো পবিত্রতা দিত, ছিল তখনও অফুরন্ত, তখনও বহস্যখনি । রমেন অনন্তকে তোলার চেষ্টা করছিল, 'অনন্ত উঠ উঠ নেশা ফাটা এখন সন্ধ্যা হইয়া আইছে।' অনন্ত টলোমলোভাবে উঠে বসল, তার দুচোখে বেলাশেষ প্রতিবিম্বিত । সে দুহাত রমেনের ঝুঁকে থাকা কাঁধে বেখে ব্যাকুল ভাবে বলল 'গভীর অন্ধকারের ঘুমেব আস্বাদে আমার আত্মা লালিত, আমাকে কেন জাগাতে চাও ? হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথেব কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া, আমাকে জাগাতে চাও কেন ? ' বিজু খিক খিক করে হেসে উঠল । 'পোঁদে লাথ মার শালার, খোয়াবি কেটে যাবে।' অনন্ত বমেনেব দুহাত চেপে ধরল । ' দিনি মরে যাচ্ছে তুই দেখতে পাচ্ছিস না রমেন ?' এবং

তারপর হঠাৎই, 'আমি তোকে ভালবাসি, কসম।' এবং অনন্ত উঠে দাঁড়িয়ে রমেনের মুখচুম্বন করে। বিজু হাসতে হাসতে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। 'শালা আজ এক কাণ্ডই করবে মনে হচ্ছে। কি করবি ওকে নিয়ে বলতো রমেন ?' রমেন অনন্তের আবেষ্টনি থেকে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর অনন্তর চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল 'চল তোকে আজ এক জায়গায় নিয়ে যাব। সব অভিজ্ঞতাই কইরা দি তোর।' বিজু ভ্রুকুঁচকে তাকাল রমেনেব দিকে, কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করল, তারপর বুক পকেট থেকে চারমিনাবের প্যাকেট বের কবে একটা ধরাল, একটা রমেনকে বাড়িয়ে দিল। 'আমিও আসবো নাকি গুরু ?' বমেন সিগারেট ধরাল, ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ, তারপর আগের মতোই শান্ত অথচ দৃঢ়গলায় বলল 'না তুই চলে যা, আমি অনন্তরে একটা জায়গা ঘুরাইয়া বাসায় নিয়ে যাব।' বিজু কোন কিছুর ঘ্রাণ পেয়েছিল, সে মুখটাকে নেড়ি কুকুরের মতো উদগ্রীব করে বলল ' কোন স্পেশাল ঠেক আছে নাকি গুরু ?' বমেন ছোট করে বলল 'ফোট', অনন্তর হাত ধরল।

তারপর সন্ধ্যা এল কলির সন্ধ্যা রাস্তার বাতি কুয়াশার মতো অরণ্যকুয়াশার মতো আমাদের চলমান শরীরের ওপব গলে গলে পড়ছিল আর একটা গরুর গাড়ি ভাঙা রাস্তাটার মাঝখান দিয়ে টিংটিং শব্দ করতে করতে মন্থর গতিতে কোন এক দূবেব গ্রামের দিকে হয়তো বা খড়ের সুসমাচার (সুসমাচার ?) বুকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল পেছনে বাঁধা হারিকেন চলার ছন্দে এদিক থেকে ওদিক আমাদের রাস্তা দুলে দুলে এদিক থেকে ওদিক রমেনের হাত শক্ত করে ধরে থাকি কেননা আমাদের জীবন একদিন ঝরে যাবে at my back I always hear পুজোর ঋতু শেষ পথচারীরা মুখ নামিয়ে নি:শব্দে পথ হাঁটে তাদের মুখের ওপর ছায়া ঘনাইছে বনে বনে যেন এক বিশাল প্রেতবাহিনী কবরখানার শীতল নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে ঘুম ভেঙে উঠে আজ অন্য এক শীতলতায় তাদের চোখে লেগে ছিল ঘুম ঘুমের স্বপ্ন ক্লান্তি আর অনিশ্চয়তা যারা ঠিক জানে না জানেনি কোন বাড়ির সদব দরজা হাট কবে খুলে তারা আজ বেরিয়েছে আব এখন এই একাকী বিষণ্ন রাত্রিতে তারা কোন দবজাব সামনে প্রার্থীর মতো দাঁড়াবে কেন না আমাদের ঠিকানা নেই কোন আমাদের হৃদয়ে কুয়াশা জীবন ঝবে যায় ঝরে যায় আর আমাদেব চোখের ভেতর রাত্রি বাস্তা দুলতে দুলতে এগলি থেকে ওগলি গাছের ফাঁকে ফাঁকে একফালি রোগা চাঁদ আকাশের মাঝখানে মুমূর্ষু ঝুলে থাকে পিটপিট করে তাকিয়ে দেখে নিয়তির দিকে আমাদের অনিবার্য যাত্রা আমাদের হাজার রজনীর বণরক্তসফলতাধন্য যাত্রা আকাশের নীচে এই মুক্ত মঞ্চে যার শেষ দৃশ্যে ঘাসের নীচে আমাদের বক্তমাংসকে আমবা শুইয়ে আসব আব অর্কেস্ট্রা ভেঙে পড়বে তুমুল চিৎকাবে আমি বমেনের হাত আঁকড়ে ধরে বললাম 'রমেন তুই কোথায় নিযে যাচ্ছিস আমাকে আমি অমবত্ব চাই' এখানে আমাদেরও কিছু বলার আছে ; আমাদেব সমস্ত কবিতা গল্প নাটক ছবি গান মৃত্যুকে পেবিযে যাবার চেষ্টা, কববখানার নীচে এক গোপন সুড়ঙ্গ যা আলো থেকে আলোতে যায় যতোক্ষণ আলো আছে আমাদের এই পৃথিবীতে। আমাব এই গল্পেবও অমরত্বের সেই আকাঙ্ক্ষা আছে স্বভাবত:ই, কিন্তু তা ছাড়াও গল্পে বা শিল্পকর্মে আমরা সত্যকে ছুঁতে চাই। কিন্তু এই সত্য নীতিকথাব সত্য নয় সবলবেখার সত্য নয় আলো আর অন্ধকাব শাদা আর কালোর সত্য নয় এই সত্য বিকেল বেলার সত্য যখন রাত্রি ও দিন পবস্পবকে অশ্লেষ ধরে বাখে এই সত্য বহুমাত্রিক সত্য এই সত্য রশোমনেব সত্য।

দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এ জায়গাটা আমাদের শহবের প্রধান বাস্তা থেকে কিছুটা সরে। বড়ো নালা চলে গিয়েছে নদীব বরাবর, তাব পাবে রাস্তার ধারের ফাঁকা জমির ওপবে ঝুপড়ি গজিয়ে উঠেছে এক সাবি। বেড়ায় ঘুঁটে লেপার দাগ, নালা থেকে পুবনো কাদার গন্ধ উঠে আসছিল। একটু দূবে বাস্তার বাতির নীচে গামছা পেতে চাবটে লোক তাস খেলছিল। লোকগুলি একবার ঘুবে তাকাল রমেন আব অনন্তের দিকে, কিছু বলল পবস্পর পরস্পরকে, হেসে উঠল তারপর ফিরে গেল খেলায়। রমেন অনুচ্চ গলায় ডাকল 'হাবাণ। হারাণ আছ নাকি ?' দরমাব বেড়ার ফাঁক দিয়ে কথাবার্তার সামান্য শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল, হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। রমেন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিল। ' ঠাণ্ডা লাগছে না তোর ?' বাঁশের কঞ্চির ভাঙাচোবা দবজা ভেতব থেকে খুলে গেল। দবজায় দাঁড়িয়ে রোগা খোঁচা খোঁচা দাড়িআলা একটা লোক, ভ্রু কুঁচকে কেননা রাস্তায় আলো ছিল রমেন ও অনন্তেব পেছনে, তাবপব চিনতে পেবে একগাল হেসে বলল 'রমেনবাবু নাকি ? আসেন আসেন !'

হাবিকেনেব ঝুলপড়া ফ্যাকাশে আলোয প্রথমে চোখ পড়ে ঘবেব এককোণে খাটিয়াব ওপব বঙিন ছেঁড়া সতবঞ্চিটা একদিকে ঝুলে আছে, তার ওপাশে কেরোসিন কাঠেব বাক্সের ওপব লক্ষ্মীর পট, তাতে সিঁদুব লেপা। হারাণ বলল 'লক্ষ্মী দেখ দেখ কে আইছে !' লক্ষ্মী মাটিব নেবন্ত উনুনটাব পাশে হেঁট

হয়ে বসে একমনে ঠোঙা বানাচ্ছিল, এখন চোখ তুলে দেখে ভ্রুভঙ্গে হাসল। 'কতো ভাগ্যি আমাদের, আমাগো কথা মনে পড়ছে রমেনবাবুর !' এই কথার ভেতর ঘনিষ্ঠভাবে জানার ফাজলেমি ছিল, মাংস ছিল, নোনা গন্ধ ছিল। রমেন বলল 'কেমন চলছে তোমাদের ?' লক্ষ্মীব সামনে মাটি লেপা মেঝের ওপর পিঁড়ি পেতে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ল, আর একটা পিঁড়ি টেনে অনন্তকে বলল 'বোস।' হারাণ গিয়ে বসেছিল খাটিয়ার ওপব। সেখান থেকে বলল 'দিন কি আব আমাগো চলে রমেনবাবু, চালাইতে অয়। দ্যাখেন না কালকে পজ্জন্ত একটা দিনমজুরি আছিল বাজারের সামনে যে তিনতলা বাড়িটা হইতাছে অইখানে, আইজ ছাঁটাই কইরা দিছে।' লক্ষ্মী মুখ তুলে তীব্র চোখে স্বামীকে দেখল। 'তোমাব মরণ নাই তাই কথা কও, মজুবিব ট্যাহাটা কি করছ শুনি ? '' হাবাণ অপ্রতিভ ভঙ্গীতে মুখ চুলকাচ্ছিল, কিছু বলল না। রমেন হাতে ধরা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট হাবাণেব দিকে বাড়িয়ে দিল। ''মাল খাইসো ?'' হারাণ কৃতজ্ঞভাবে সিগাবেটটা হাত বাড়িয়ে ধরল, তারপব নোংবা পায়জামাটার পকেট থেকে বের করল দেশলাই। 'জানেই তো রমেনবাবু, পাকিস্তান থাইকা আইস্যা অব্দি একটু শান্তি নাই দেহে প্রাণে।' লক্ষ্মী আবার গলা চড়াল। 'পোলাডার কথা তো খেযাল কববা। দ্যাখেন না রমেনবাবু আইজ খাওনের একটা দানা নাই ঘবে।' ছেলেটা মাযের পাশে উবু হয়ে বসে নোখ দিয়ে নাক খুঁটছিল আব বমেন আর অনন্তের দিকে তাকাচ্ছিল ফ্যাল ফ্যাল করে। উনুনেব এপাশে টিনেব তোবড়ানো থালা গেলাস হাঁড়ি উল্টনো ছিল, যেন লক্ষ্মীব কথারই ব্যাখ্যা হিসেবে, সেদিকে তাকিয়ে রমেন অনন্তব পবিচয় কবিয়ে দিল। 'এ হইল আমার বন্ধু অনন্ত, ওবেও একটু খেযাল কইরো লক্ষ্মী।' লক্ষ্মী অনন্তকে কয়েক মুহূর্ত স্থির ভাবে পর্যবেক্ষণ কবল, তারপর বমেনেব দিকে ফিবে প্রগলভ গলায় বলল 'আপনেও বন্ধু দেখি কথাই কয় না !' অনন্ত ঘোলাটেভাবে কিছু বলার চেষ্টা করল। তাব এই চেষ্টাব ভেতবে স্বপ্নের অনিবার্যতা ছিল। রমেন বলল 'আমরা বেশী দেরী করব না। বাত বাড়ছে।' লক্ষ্মী হারানেব দিকে পলক ফেলে তাকাল, যেন অপেক্ষা করছে। হাবাণ পায়জামাব ভেতর দিয়ে অণ্ডকোষ অন্যমনস্কভাবে চুলকেচ্ছিল, এখন উঠে দাঁড়াল। 'গোপাল যা বাবা মোড়েব দোকানটা থিক্যা গরম গবম কচুবী জিলাপি আব চা নিয়ে আয়। কাকাবা আইছে!' বমেন মনিব্যাগ থেকে একটু কুড়ি টাকাব নোট ছেলেটাব দিকে বাড়িয়ে ধরল। লক্ষ্মী ঠোঙা ফেলে উঠল, খাটিয়া থেকে একটা বংওঠা চাদব ছেলেব দিকে বাড়িযে বলল 'এইটা গায়ে দিয়ে দিযা যা বাবা, ঠাণ্ডা লাগব।' ছেলেটা বাঁহাতে ইজের টানতে টানতে উঠে দাঁড়াল, নাক দিয়ে শিকনি গড়াচ্ছে, ডানহাতে মুঠো করা ছিল টাকা আব চাদর মা গাযে জড়িয়ে দিতেই সে দবজা ঠেলে বাইবে হাওয়া।

হাবাণ অনন্তকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাড়ছিল, অনন্তর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আবছা কুযাশা, কুযাশাব ভেতর সেই চাবটে লোক তখনো একমনে তাস খেলে যাচ্ছে। ঘবের দবজা বন্ধ হয়ে গেল। হাবান একবার সেদিকে তাকাল, তারপব চোখ ফিবিয়ে বমেনের দিয়ে যাওয়া প্যাকেটটা থেকে একটা সিগাবেট ধবল, আবেকটা অনন্তর দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আপনে রমেনবাবুব বন্ধু, বমেনবাবু আমাদেব অনেক সাহায্য কবছে। রমেনবাবু না থাকলে' - গাছেব পাতা বাতাসে উড়ে উড়ে আসছিল অনন্তব পায়েব কাছে, নীলচে কুযাশায দূরে বাজারেব আলো টিম টিম করছিল যেন দূর নক্ষত্রের দ্বীপ, অনন্তর মনে হচ্ছিল সে ও হাবাণ এক অথৈ সমুদ্রের মাঝখানে একমাত্র জীবিত মানুষ কাঠের তক্তা ধরে প্রাণপণে ভেসে আছে। সমুদ্রেব কলবোল তার কান ছাপিয়ে উঠেছিল, তার মনে হচ্ছিল হাত পা ছেড়ে দিয়ে সে একবার ঘুমোতে চায়। 'খিদার জ্বালা বড়ো জ্বালা বুঝলেন বাবু।' এই কথাব ভেতর অসহায়তা, ক্রোধ ও বিস্ময় ছিল যা অনন্তকে মুহূর্তে সাবালক কবে। সে হয়তো হারাণকে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু হারাণ তখন দবমার ফুটোয় চোখ বেখে ভেতবে দেখছিল।

রমেন আমাকে বলল যা ভেতরে যা গুড লাক আর আমাব পেছনে দরজা বন্ধ হযে যেতেই সেই ভয়ংকর অলৌকিক দৃশ্যের মুখোমুখি লক্ষ্মী মেঝেতে পা ফাঁক করে শুয়েছিল তার চোখে ছিল শ্রান্তি নিযতির আমন্ত্রণ তার কালো রোগা শরীরের ভেতব থেকে এক সোঁদা গন্ধ উঠে আসছিল সমস্ত ঘরময় আর সেই অতলস্পর্শী গহ্বরের ভেতর আবার পড়ে যেতে থাকলাম লক্ষ্মী মৃদু অধৈর্য গলায় বলেছিল তাড়াতাড়ি করেন বাবু পোলাডা আইসা পড়ব সেই অতল শীতল অন্ধকারে লক্ষ্মীব গলা আমাকে নোঙব দিয়েছিল আমি হাঁটু গেড়ে লক্ষ্মীর পাশে বসে পড়েছিলাম লক্ষ্মী আমাকে বলল লক্ষ্মী কি আমাকে বলেছিল তুমি অমরত্ব চেয়েছিলে হে অনন্ত তবে দ্যাখো এই খেলা শরীবের এই রহস্য যা সভ্যতা ও ইতিহাসের আদিমাতা যা মানুষকে বিধাতার স্বগোত্র করে কযেক মুহূর্তেব জন্যে আব যে লক্ষ্মীর নিবারণ বিশাল

প্রসারিত শরীরময় ভূমিকম্প ছিল আমি একে একে লক্ষ্মীর কালো পুরু ঠোঁট খুলে নিলাম ঝুলে পড়া করুণ শঙ্খের মতো স্তন খুলে নিলাম যোনি খুলে নিলাম দরজায় শব্দ হয়েছিল মা মা আর লক্ষ্মীর শরীরে কোন রহস্য ছিল না প্রদোষ ছিল না কিন্তু লক্ষ্মীর চোখে মায়া ছিল স্বপ্ন ছিল স্নেহ ছিল বেড়ার ফাঁকে ব্যগ্র সেই জোড়া চোখ আমাকে বলেছিল রহস্য তুমি কি লক্ষ্মীর ভেতরে খুঁজেছো আমাদের পৃথিবীর সেখানে ধীরে ধীরে মাতৃরসে গড়ে উঠছে আর দরজায় ধাক্কা পড়ছিল মা মা দরজা খোল লক্ষ্মীর চোখে স্নেহ ছিল আকুলতা ছিল আমি প্যান্টের বোতাম খুলে এতোক্ষণ পর নিজেকে ছেড়ে দিলাম ধারা বর্ষণে আমাদের পৃথিবী স্নাত স্নিগ্ধ হচ্ছিল আর আমার মাথার তলপেটের অসহ্য ভার ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছিল এই অমোঘ মুহূর্ত যখন কমলকুমার মজুমদারের মতে আমাদের বলা উচিৎ ছিল জগজ্জননী মা ব্রহ্মময়ী কিন্তু হায় আমাদের সেই নির্ভর কোথায় ?

তারপর আমাদের শহরে রাত এল । লক্ষ্মী পাখি মার মতো সস্নেহে সামনে উবু হয়ে বসা হারাণ গোপালকে কচুরি জিলিপি খাইয়ে দেয়, রমেন খাটিয়ায় হাঁটু ছড়িয়ে বসে দেখে এবং জীবন বহমান থাকে যে জন্যে অনন্ত এখন ঘুমোচ্ছিল ।

শ্যামল ভট্টাচার্য

জামি ছলঙ

ভগবতীর দুধ

বিশাল দুই স্তনে আমার প্রাণপক্ষী থাকে। ডাক্তার রাজা রায়ের কথা শুনে বজ্রপাত হয়। আর্ত পক্ষী ডানা ঝাপটায়। ঘুরন্ত টুল থেকে উঠে দরজার দিকে পা বাড়াতেই পৃথিবী দুলে ওঠে। হুমড়ি খাই। দরজাটা ধরে কোনমতে নিজেকে সামলাই। — মাগ্‌গুমা — আস্তে মাসী, সাবধানে — রাজা ছুটে এসে আমাকে ধরে। আমি সোজা দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাই। কষ্টে বলি, বাইচ্যা থাকো বাবা — টেহাপইসা জুগাড় কইরা আমু —

পৃথিবী স্থির হলে ওর পিঠ হাতিয়ে আদর করে রাস্তায় পা রাখি। ছাতা খুলি। কী রোদ কী রোদ! ছাতা ভেদ করে উত্তাপ ব্রহ্মতালু ছোঁয়। গরম পিচে চপ্পল বারবার আটকে যায়। আমি কিনারায় চলে যাই। তবু শরীরে ভাপ লাগে। শুধু চলতে পারি রাজার কথা ভেবে ভেবে। ওর স্পর্শ এখনো আমার পিঠে, হাতে। কী মোটা হয়েছে আঙুলগুলি, পেশীবহুল পুরুষমানুষ!

কখনো ডানকাতে কখনো বামকাতে শুইয়ে ও আমার দুধ টিপে টিপে দেখে। শরীর শিরশির করে। ও নিশ্চয়ই আমার ব্যথা সারিয়ে দেবে। প্রতিবারই ও আমাকে রে দিয়ে সারায়। ধীরে ওর হাত ছোট হয়ে যায়। গায়ে ছোট্ট নিমা। মাথায় হালকা চুল। গাল ফোলা গোবিন্দ। আলতো থোৎনা মেরে মেরে বান থেকে দুধ টানে বাছুর। এ সময় পৃথিবী কত সবুজ — আহা! বাজপড়া গাছেও পাতা গজায়। গ্রামোফোনে বিদেশী সুরে মৃদু কোনো বাজনা। শুনতে শুনতে কী যেন হয়! ছোট নরম হাত আমার ঠোঁট ছোঁয়। গাল থাবড়ায়। অন্য দুধের বোটা কচলায়। এসব করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। রাবার কাপড়ের ওপর পাতা নকশীকাঁথায় শুইয়ে একটা পা পাশবালিশে তুলে আস্তে বিছানা ছেড়ে নেমে আসি।

ওর মা বড় আয়নার সামনে বসে গালে রুজ মাখে। ঠোঁটে লিপস্টিক। — যাই গো দিদি! দিদিমনি উঠে একগ্লাস কাঁঠালের রস, কোনদিন একগ্লাস দুধ দেয়। বাধ্য মেয়ের মতন চো চো খেয়ে নিই। কী ভাল দিদিমনি! ঘুরে ঘুরে আয়নায় নিজেকে দেখে। কী সুন্দর! সরু কোমর। মনেই হয় না বাচ্চার মা! ঐ শরীর ঠিক রাখতেই দিদিমনিরা সন্তানকে নিজের দুধ খাওয়ায় না। আমার দুধের কথা যারা জানে না কৌটার দুধ খাওয়ায়। আর যারা জানে-

বাংলাদেশের যুদ্ধ লাগার দু'দিন আগে এই টিলায় এসেছি। কোলে শুধু গুরুদাস। ওর বাপ মহাদেব চিরকাল গাঁজা খেয়ে ভোম। শুধু কবিগান, যাত্রাগানের মহড়ায় ও মঞ্চে সুবেলা বিবেকের মনের মাধুরী হাজার পরান ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে এলে তার নেশার দরকার হয় না। ও এখন জবুথবু। উদাস তাকিয়ে থাকে তিতাস পারের কবিয়াল। আমার কান্না পায়। গুরুদাসকে ওরই কোলে রেখে অভিজাত সরকারী বসতিগুলিতে ঠিকা ঝিয়ের কাজ করি। কাজ করতে করতে ভারি হয় বুক। টনটন করে। ব্লাউজ ভিজে ওঠে। আঁচল ভিজে যায়। এই দেখে রাজার মা অভিনব প্রস্তাব রাখে। সারাদিন ভাবি। সারারাত ভাবি? শিশু ত মা ষষ্ঠীর। তোমার পুলা আমার পুলায় তফাৎ নাই। শিশুর জন্যেই দুধ। আমি ভাবি মন্দ কী? সব শুনে কবিয়াল সায় দেয়। এই প্রথম আমি ওর পালাগানের বিষয় হই। রোজগার তিনগুণ বাড়ে। প্রতিদিন দিদিমনির নির্দেশে ঝকঝকে স্নানঘরে সুগন্ধি সাবান মেখে স্নান করি। সুগন্ধি তেল মাখি। ইলেকট্রিক পাখার হাওয়ায় মৃদু বাজনার সঙ্গে রাজার ঠোঁটের ছোঁয়ায় প্রাণপক্ষী সময় সময় গান গেয়ে ওঠে। জাদুঠোঁট সব শুষে নেয়। বাড়ি ফিরে গুরুদাসকে বার্লি গুলে খাওয়াই। আরো বড় হলে সাবু ঘুটে

খেতে দিই। রাতে শেল পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে কাঁদলে নিজের দুধ ওর মুখে গুঁজি। তখনই শুধু কান্না পায়। বাপধন তোবই ত হক! কিন্তু পিছামারা পেটের জ্বালা, তেয়ার প'রবে নতুন শাড়ি ব্লাউজ-হায়!

মহাদেব ত সবসময় ভোম। মনে মনে কত গান বাঁধে। গুণগুণ সুর ভাজে। চৌমুহনীতে শোনায়। খুব একটা আমদানি হয় না। তাই ভাবে গান জমেনি। বারবার শব্দ পাল্টায়। সুর বদলায়। রাতে বিছানায় আমাকে শোনায়। মানুষটা বড় ভালবাসে। পক্ষী ওর আদরে অবশ হয়ে পড়ে। আমি টিলার মাটিতে মিশে যাই। তখন ত যুদ্ধের শেলকেও ভুলে যাই। মনে হয় ফুলশয্যার বাত। ছেলেরা বাইরে বাজিপটকা পোড়ায়। যদিও অষ্টপ্রহর যুদ্ধ চলতেই থাকে। বিরামহীন।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বুঝে যাই বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও আমরা আর ফিরব না। কবিয়াল যখন তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সময়ের কাছে মানুষ অসহায়। আমার চৈতন্য নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দুধ পাতলা হয়ে আসে! প্রকৃতির কাছেও মানুষ অসহায়। কবিয়ালের মানী বন্ধু কেরাও কবিবাজ কলমি শাকের ঝোল অনন্তমূলেব ক্বাথ আর ভুঁই কুমড়া বেটে শুকিয়ে গুঁড়ো খেতে বলে। আমি নিয়মিত খাই। এভাবে আরো কয়েকমাস দুধ জিইয়ে বাখি।

তারপর আমি কী করি? কবিয়াল চিরকাল অভিমানী। দু'হাত বাড়িয়ে না ডাকলে সাড়া দেয় না। কবিগান কিম্বা বিবেক গাইতে অগ্রিম টাকা দিয়ে আদর আপ্যায়ন করে নিয়ে না গেলে যায় না। জাত কবিয়াল। পেটে গামছা বেঁধে পড়ে থাকে তবু জলপিড়ি পেতে ভাত বেড়ে না ডাকলে কোনদিন আসে না। অথচ এখন প্রচারের যুগ। ফড়ে আর দালালে ভরে গেছে দেশ। তাই মানুষটার জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট। সযত্নে রান্না করি খিচুড়ি আর এচোঁড়। ওব প্রিয় খাদ্য। তৃপ্তিভবে খেয়ে ঢেঁকুর তোলে। বাদশা জর্দা আর এলাচ দিয়ে পান খায়। গোবর লেপা মেঝের ওপর পাতা কাঁথায় গা আড়িমুড়ি দেয়। প্রাণপক্ষী গড়াগড়ি যায় লুঙ্গার নবম মাটিতে। একসময় সোনা কামদেব জেগে ওঠে। আমাব শীৎকার স্পর্শ করে আকাশ।

মা ষষ্ঠীর কৃপায় আসে ষষ্ঠীচরণ। আবাব দু'বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত। এমনি করেই সংসাবে একে একে আসে জপমালা, হরিদাস, আহ্লাদি ও জবা। জবা আসার আগে থেকেই কবিয়ালের মাথায় যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা জবা জন্ম হওয়ার সাতদিনের মাথায় নীল করে দেয় লোকটাকে। আমি আছাড়ি বিছাড়ি কাঁদি। নিজের থাপ্পড়ে ফেটে যায় বুক। তবু চবকের রাতে গাজনের বাজনার সঙ্গে আগুনে ছাই হয়ে যায় আমাব মহাদেব। শুধু বেতাবে মাঝেমধ্যে ওর কবিগান ভেসে আসে।

তারপরও কিছুদিন বাবুদের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াই আমি। ওরা আজ কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসার। কত গর্ব আমার। কেউ জানে না শুধু প্রাণপক্ষী জানে। এই রাজা আজ কতবড় ডাক্তার। গত এক বছর ধরে আমাকে বে দিচ্ছে। নিয়মিত সব ওষুধ কিনে খেতে পারিনি পয়সার অভাবে। আজ রোগটা বেড়ে গেছে। দুধ কাটা ছাড়া গতি নাই। ওর নিজের মাকে দুধ কাটতে হয়েছে। এক নার্স দিদিমনি বলে, অভিশাপ, যে মা নিজের সন্তানবে দুধ খাওয়ায় না ....

তিতাস পারে ভিটে মায়ের বুকে যেমন অশান্তি আমি ভাবি টিলাদেশেও ঠিক উল্টো কারণে অশান্তি। আমি এখন টিলা মা। নিচের লুঙ্গা এখন জমজমাট চৌমুহনী। বোদে খা-খা গোলচক্করে বাজপড়া অর্জুন গাছের এক চিলতে টুইন্‌ড়া ছায়া। নিচে দুই মনুষ্য—মানিক্য আব ওচাই। প্রাণপক্ষীর ডানা ঝাপটানিতে আমি ঐ ছায়ার দিকে এগিয়ে যাই।

অগ্নিবাত

— আমার মায়ের দুধ দেখ্‌ছো বুলি? এই তল্লাটে কারো নাই অমন দুধ, আমার রগে ঐ দুধ দৌড়ায়! ফুলশয্যার রাতে আমার সোয়ামি বলে, তর বুকভরা মায়ামমতা! প্রথম কথায় খুশি হই। দ্বিতীয় কথায় লজ্জা লাগে। মনে মনে বাবুর বাচ্চাকে প্যারামবুলেটরে বসিয়ে চলতে চলতে ওর সামনে দাঁড়াই। এক টাকার ঘুঘনি দিয়ে লাজুক হেসে পঁচিশ পয়সা ফেরৎ দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলে বলে, ছাড় —

হবিদাস আমাকে খুব ভালবাসে। সেজন্যেই ত মজেছি। মাঝেমধ্যেই ওর সঙ্গে সূর্যঘর, রূপসী, রূপছায়া, চিত্রকথার আলো-অন্ধকাবে হারিয়ে যাই। স্বপ্নলোকের মানুষজন দেখে ভাসতে থকি। সুন্দর নাদুসনুদুস শিশু দেখে কত ইচ্ছা জাগে! কিন্তু ফিরে এসে খালপারের হু হু ঠাণ্ডা আশ্বিনেই মাঘ হয়ে তরজা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢোকে। চাদরে কাঁপুনি থামে না। হরিদাস মা ভায়েদের সঙ্গে থাকে না! বড় দুই

ভাই এখনো মায়ের কেনা গরুছাগলের দুধ বেচে সংসার চালায়। কথায় কথায় ঝগড়া চুলোচুলি। হরিদাস বলে, ওরা মায়ের মায়া-মমতা বেচে খায়। বোনগুলিও তাই। শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘুরে ফিরে আসে আর পোটলা বেঁধে ফিরে যায়। সব মায়ের জানের কামাই। কেউ মাকে দেখে না! এই যে দেড় বছর ধরে বুকের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে! কারো কোনো হুঁশ নাই।

এই নিয়ে সবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি। রেগে ষষ্ঠীচরণের মাথা গাছে ঠুকে দেয়। ষষ্ঠীচরণের বউ মনসা আর গুরুদাস ওকে লাঠি মারে (আমি ওদেরকে কাছে পেলে চুল ছিঁড়বো!)। সেই দু:খে মায়ের কান্না উপেক্ষা করেও হরিদাস আজ খালপারে। সে স্বপ্ন দেখে একটু পয়সা হলেই ভাল ঘর তুলে মাকে নিয়ে আসবে। যত্ন করবে, ভাল চিকিৎসা করাবে।

আমি স্বপ্ন দেখি একটি লাল শালুমোড়া লেপের! বাবুবাড়িতে আমি ছাড়া সব্বাই এরকম লেপে শোয়। আমি রোজ গরম হতে দিই আর ভাবি, লেপ তুমি কার? ঠাণ্ডা লেপ বলে, অহন আমি বাবুদের!

– তুমি কবে আমার হইবা?

– আগে তর বিয়া হোক্! বিকালে রোদ থেকে ঘরে তোলার সময় অভিমানে আর জিজ্ঞেস করি না। তবু গরম লেপ বলে, কান্দিছনা মাইয়া, আগে তর বিয়া হোক।

খালপারের ঠাণ্ডায় আমার স্বপ্নের কথা শুনে হরিদাস খালি টাকা গোনে। হিসাব করতে করতে ভোর হয়। এমনকি হিসাব করতে করতে আমরা পোস্টঅফিস চৌমুহনীর এক লেপের দোকানে ঢুকি। টুলে পাশাপাশি বসি। লেপঅলা গোল গোল লেপের বোচকা খোলে আমাদের হাঁটু আর হাত লেপে দিয়ে ঢেকে দেয়। – দ্যাহেন বৌদি কত ওম! লোকটার চোখ চকচক করে। দাম শুনে হরিদাস বলে, ঠিক কইর‍্যা কন, নগদে কিনুম!

দামদর চলতে থাকে। লোকটা পনের টাকা কমে ত হরিদাস ক্রমে কুড়ি টাকা বাড়ে। মাঝখানে আরো কুড়ি টাকার ফারাক থেকে যায়। এও বাড়ে না। ও-ও কমে না। দামদর চলতেই থাকে। অথচ এটাই সবচেয়ে সস্তা লেপ। আমার অস্বস্তি বাড়তে থাকে। দামদর অসহ্য লাগে। লেপের তলায় সুড়সুড়ি দিই। চোখে চোখে কথা কয় চৌখ্যার বউ। হরিদাস উঠে দাঁড়ায়। বলে, আর পাঁচ টাকা দিতে পারি। লোকটা মাথা নাড়ে। হরিদাস আমার হাত ধরে টানে, চলো —। আমিও উঠে দাঁড়াই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিদাস এগিয়ে যায়। তখনই একদম মরিয়া হয়ে বলি, আমার কাছে আরো চাইর টেহা আছে-

লোকটা কী ভেবে রাজী হয়ে যায়। হরিদাসকে অবাক করে কাঁপাহাতে শাড়ির খুট থেকে চার টাকা বের করে দিই।

ওমের স্বপ্নে আলুসিদ্ধ-গরমভাত অমৃত সমান। দূরে কোথাও ঢাক বাজে। সেই মৃদুবোল লেপের তলায় ঢুকে প্রচণ্ড হয়ে পড়ে। হরিদাসের শরীর ভীম সেনের মতন বাড়তে থাকে। আমিও হিড়িম্বা হই। আহা কী আনন্দে বাঁশের মাচা মচমচ করে! এমন বিরামহীন বাদ্যি কোনদিন শুনি নি। কমবেশি আঁচে বারবার উথলে ওঠা দুধের মতন আমাকে আবিষ্কার করে হরিদাস।

এমনি দুরন্ত সময়ে হঠাৎ মনে হয় আমার হাত-পা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। পা যখন লেপের বাইরে থাকে সেই জ্বালা থাকে না। লেপে ঢুকলেই দাবানল। কাটা ছাগলের মতন ছটফট করতে করতে আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিই।

– দয়া করো, আমার হাত পাও ছ্যাৎছ্যাৎ করে—

– কী? আমি লেপ ছুঁড়ে ফেলি, ভিৎরে থাকা যায় না আর—

সময় দ্রুত শীতল হয়ে যায়। বারবার ও আমাকে লেপ দিয়ে ঢেকে দেয়। আমি প্রতিবারই ফেলে দিই। সারারাত এমনি দুর্বোধ্য এক বিভীষিকা আমাকে গ্রাস করে। ওর জন্যেও কষ্ট হয়। মনে হয় লেপটা অভিশপ্ত। কেউ কি তুক করেছে?

— কেডা তুক করবো?

— তুমার ভাই ভাজরা।

ধ্যাৎ! বিশ্বাস হয় না ওর। -জীবনে প্রথম লেপ, তা-ও আনকোরা! বিড়বিড় করে বলে, আমারও শুরুতে অস্বস্তি অইছে—

কিন্তু এক রাত দুই রাত তিন রাত চেষ্টা করেও আমি পারিনি। এখন ছ্যাৎছ্যাতানি বেড়েছে। লেপের বাইরে চলে এলেও আধঘণ্টা ঝিনঝিন করে হাত-পা। চতুর্থ দিনে হরিদাস আমাকে হাসপাতালে

নিয়ে যায়। বিশাল লম্বা লাইন পেরিয়ে ডাক্তারবাবুর চাঁদবদন। খসখস করে সিলিপে ওষুধ লেখে কয়েকটা। হরিদাস হাউহাউ করে বলে, তাইর কী অইছে ডাক্তারবাবু ? ডাক্তারবাবু একটু চিন্তা করে বলে, ওষুধ কিনতে অইব, সরকারী সাপ্লাই নাই !

হরিদাস ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে আসে। বাইরে বেরিয়ে আমার দিকে তাকায়। থমথমে। আমি কেঁদে ফেলি।

ও আমার পিঠে হাত রাখে। — কাইন্দ না বুলি ! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে-আগে দুকানে গিয়া দামটা জিগাই — চৌমুহনীতে এক সুদৃশ্য দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে সার সার ওষুধ দেখতে থাকি আমরা। পয়সা থাকলে সব কেনা যায়। এ রাজ্যে পয়সাওলা লোকের অভাব নেই। তবু যে কেন লোকের রোগ সারে না। আকাশে উড়ে কোথায় যেন যেতে হয় ! দোকানের বাবু হাত বাড়িয়ে সিলিপটা নেয়। হরিদাস বলে, বাবু, আগে দামটা কন। লোকটা ভুরু কুঁচকে হিসাব করে বলে, একশো ছিয়াশি টাকার মতন অইব —

হরিদাস বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন তাকায। অসহায় চোখে মেঘ কালো হয়ে আসে। আমার খুব কষ্ট হয়। মরিয়া হয়ে বলি, বাবু এর মইধ্যে কুনো ওষুধ পরে নিলে হয় না ? দোকানেব বাবুটি হাসে। — ইডা কি তুমার ঘুঘনি যে মর্জি অইলে খাইলাম, না ঐলে —

হরিদাস কাঁদোকাঁদো বলে, আমরা পবে আমু —

বাবুটি ঘাড় নেড়ে অন্য গ্রাহকের দিকে মন দেয়। এই ভবদুপুরে এত কম আলো কেন চারপাশে। তখনই চৌমাথার গোলচক্করে দেখি ওচাইয়ের সামনে হাঁটুমুড়ে বসে আছে আমার শাশুড়ি। পরনে চিকনপাড় সাদা শাড়ি। গত দশদিনে ওচাই জাদুমন্ত্রেব মতন ওঁর ব্যথা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। আমি হরিদাসকে বলি, চল না আমার অসুখের কথাও ওচাইরে কই ! পিচগলা রাস্তা থেকে তখনো গবম ভাব উঠছে। সব শুনে ওচাই বলে, অগ্নিবাত !

ঈশ্বরের বৃত্তান্ত

কেউ বলে ওচাই। কেউ বলে ওঝাই। আমি বলি জামি ছলঙ। কেননা আমি ঈশ্বর। আমি অতীতে আছি। বর্তমানে আছি। ভবিষ্যতে আছি। জামি ছলঙও আছে। সেই কবে পাহাড়ের জন্মের পর গাছেরা জন্ম নেয়। বৃষ্টি রোদে বাড়ে। তখন থেকেই ও আছে। জামি ছলঙ শক্তিধর। হিংস্র জন্তুরা আক্রমণ করলে গাছ উপড়ে লড়াই করে। শিকার করে উপড়ানো গাছ বা গাছের ডাল দিয়ে। হাতির মাথা থেৎলে দেয়। একে একে অনেককে সে পোষ মানায়। না মানলে এক বাক্ষসীকে একদিন মেরেই ফেলে গাছের আঘাতে। এই ত সেদিন মামার বাড়িব পাশের বাড়িতে এমন এক বউকে লাঠি দিয়ে মেরেছে তার বীর স্বামী। আমার এসব খুব ভাল লাগে।

এই মারমার কাটকাট খুন-জখম-সেক্স, ব্লু ফিল্মের স্যাডিস্ট পুরুষ-আহা কী উত্তেজনা ! দারুণ ভাল লাগে আমার। কিন্তু আজকাল সহদর্শকেরা দূরছাই করে। কেউ বলে, দুর্গন্ধ, মামু ছোঁচে না নাকি ? আমার রাগ ওঠে। অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম করে দিই। চেহারাগুলি গলে গলে ধ্বংস হয়ে যায়। আমার হাসি পায়। ঈশ্বরের গায়ে দুর্গন্ধ ? ঈশ্বর ছোঁচে না ? তোদের গায়ে ত বিজ্ঞাপনের দুর্গন্ধ ! নীল আঁশটে পোড়া গন্ধ !

আসলে কয়েকশো বছর ধরে চুলদাড়ি আর কাটি না। সারা শরীরে বড় বড় ঘাস। যখন শরীর গরম হয় স্নান করতে ইচ্ছা করে কাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ি। আকাশে মেঘ জমে। আমি নির্দেশ করি। বৃষ্টি আমাকে স্নান করিয়ে দেয়। জল পেয়ে জংলি গুল্মলতা আবো বড় হয়। হাল্কা অথবা গাঢ় কালচে সবুজ পাতায় উঠোন ভরিয়ে দেয়।

এই উঠোন তখন মাইতুকমায়-মুখেভাতে, বিবাহ উৎসবে গোবর লেপা হয়। গড়িয়া পূজায়, মাইলুমা খুলুমা—ধানের দেবী তাঁতের দেবী নানা রঙের আলপনায় রঙিন হয়ে ওঠে। আমার দিদিমা অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমানের মতন অথচ আরো সুন্দরী নিজের তৈরী তিনমুখা উনানে শুকনা পাতা গুঁজতে গুঁজতে ভাত, ডাল, গোদক, মাংস সব রান্না করে। দখিনা ঘরের দেয়ালে গোলগর্ত। সংলগ্ন বাঁশের খাঁচায় কিম্বা বাইরে দুই কবুতর পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে ততবড় বাঁশের বারান্দায় বকম বকম। অনবরত বকম বকম। উনানের উত্তাপে কাঠের জলচৌকিতে বসে রূপসী আমাকে জামি ছলঙের রূপকথা

শোনায় আর বলে জামি ছলঙেবই মতন আর এক জ্যান্ত মানুষ, প্রিয় পুরুষেব গল্প। অরণ্যে সারাদিন ঘুরে ঘুবে কোনো গাছের পাতা, ছাল অথবা শিকড় জোগাড় কবে। দুর্লভ কোনো চারাগাছ পেয়ে গেলে উঠিয়ে এনে নিজস্ব বাগানে রোপন কবে। সযত্নে লালন করে। আমি দেখি জীবন্ত উনানেব আভায লাল রূপসীর মুখ।

ঐ ঘরের মাঝামাঝি বাঁশের তৈরী চাম্পাখাম্পা বেড়া। ওপাশে আরেকটি উনানে বড় জালার মতন কড়াইয়ে সিদ্ধ হয় গাছের পাতা, কোনো গুল্মের শবীব কিম্বা মূল, ঘিয়ে অথবা ধনেশ তেলে ভাজা হয নানা বনজ গন্ধ। আমাব দৃষ্টি রূপসীব ফর্সা পায়ের গোছায়। একটা লাল জরুল। কবুতরকে ভেঙাচ্ছি দেখে বলে, খাইবি কবুতরের মাংস ?

– না, আমি তুমাব মাংস খামু ! এই কথা শুনে চল্লিশেব রূপসী লজ্জায় আরো লাল হয়ে ওঠে। বেড়ার ওপাশে হ্যাক হ্যাক হাসে চিকুন্দ্রি কবিবাজ, আমাব দাদু, রূপসীর স্বামী, কেরাঙেব গুরু। আবো অনেকেব গুরু। ওদের এখন আগবতলায় বড় বড় দোকান আছে। পাহাড়েব দিকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ওরা আর আসে না। নিজেরা অরণ্য থেকে ওষুধ সংগ্রহ না কবে দিল্লী কলকাতাব কাবখানায় তৈবী প্যাকেটের ঔষধ বিক্রী কবে চড়া দামে।

কেরাঙের দোকান নেই। কেরাঙ ব্যবসা বোঝে না। অবণ্য বোঝে। গাছপালা বোঝে। শুধু ওব কাছেই চিকুন্দ্রি কবিবাজের ফটো আছে। কাঠেব ফ্রেমে বাঁধানো। ওষুধ দেয়াব সময় ঐ ফটোতে ছোঁয়ায়। রুগীরা দেখে কাঁচেব ভেতরে জল চুঁইয়ে কোনো মানুষেব অবয়ব আর অবশিষ্ট নেই। আমি দেখি বিশাল গাছ। ঝাঁকড়া চুলের নিচে চিকুন্দ্রিব অভয়মাখানো হাসি।

আমি কাউকে প্রণাম কবিনা। কিন্তু ফটোটা টানে। সেজন্যে কেবাঙ টানে। কখনো মনে হয় দাদু আর কেবাঙ একাকার। দাদুর স্বপ্নাদেশ পেয়েই কেরাঙ এই চৌমুহনীতে বসে প্রতিদিন। রোদ-বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্মে। ওর কাছে গেলে তাই ঈশ্বরের পা ছোট হয়ে যায। সেই উঠানে ছোটাছুটি কবে। গিলা খেলে। গোল্লাছুটের গোল্লা ছেড়ে নিজেবই মতন কয়েক জোড়া হাতেব ছোঁযা বাঁচিয়ে দখিনাঘবের মাটিব দেযাল ছুঁতে উর্দ্ধশ্বাস।

ছুটতে ছুটতে ঢলঢলে প্যান্টেব ফাঁকে পাগুলো আবাব ধীবে ধীবে বাড়ে। বাড়তে থাকে। কিত-কিত-কিত একটাব পর একটা রূপসীর আঁকা ঘর এক পাযে জোড়া পাযে পেরিয়ে স্কুলেব নবম শ্রেণীতে প্যান্টটাও লম্বা হয। আবো বড় একটা ঘর দুটো ঘব জোড়া পায়ে পেবিযে বন্ধুদের ঠ্যাঙানি খেয়ে অবশেষে অনেক কলাকৌশল শিখে এক এক কবে অনেককে ঠ্যাঙাই। বন্ধুরা সমীহ কবে।

ঐ উঠানে দিদিমা ও দাদু একে একে সটান শুয়ে পড়ে। শিউলি ফুল চোখমুখ শবীবে। ধুপ ও শিউলির গন্ধ উঠানের গভীরে ঢুকে যায। ধীরে ধীরে অনেককিছু পাল্টে যায়। একে একে ভেঙে পড়ে মাটিব ঘরগুলি। স্নেহছাযা আব কই ? শুধু দখিনাঘরের তিনটা দেয়াল এখনো আস্ত। চতুর্থটার শরীর বেযে সময় বৃষ্টিব জলেব মতন গড়িযে উঠানে মিশে আছে। তবু উঠানে হৃৎপিণ্ড ধকপক করে। জামি ছলঙেব ফুসফুসে উইয়ের ঢিবি বাড়তে থাকে। বাকি অংশে ঘাসেব বংশ বাড়ে।

আমার চুল বাবার মতন কোঁকরানো। ফর্সা শরীর জামি ছলঙের মতন। এ শহবে দুটি মেয়ে ভালবেসে ঘনিষ্ঠ হয়। আমার মাংস খেতে ইচ্ছা জাগে। আমি ওদের মাংস খাই। সহপাঠিরা শত্রু হয় ওরা মানুষ তাই হিংসা আছে। সেজন্যেই যখন নতুন ছেলেদের ব্যাগিং করতে বাধা দিই ওবা সবাই মিলে আমাকে মাবে। আমিও মারি দু-তিন জনকে। ধস্তাধস্তিতে দু'নম্বর হস্টেলের শ্যাওলা জমা ছাদ থেকে পড়ে যাই। একতলাব কার্নিশে বদাম কবে লাগে মাথার পেছনটা। তাবপব সব অন্ধকার।

কলকাতার এক নার্সিং হোমে শ্রীদেবীর খিলখিল হাসিতে জ্ঞান ফেরে। ওর হাসি বাচ্চা মেয়ের মতন। গ্রাম পাহাড়ের প্রতিটি কিশোর এই হাসি চেনে। ও আমার মায়ের মতন নার্সের পোশাক পরেছে। অভিনয় করতে গেলে কতবকম পোশাকই না পরতে হয়। শ্রীদেবী নার্সের ভূমিকায়। আমি রোগীর ভূমিকায়। ধমনীতে ফোঁটা ফোঁটা সেলাইন ঢুকছে। সত্যিকারের সেলাইন। কেউ বুঝতেই পারবে না এটা অভিনয়। আমাব যন্ত্রণা হয। শ্রীদেবী তা বুঝতে পেরে একটু পরে সেলাইনটা খুলে দেয়। দুপুবে খাবার সময় বলে, খেয়ে নিন। আপনি ত ভাল হয়ে গেছেন ! আমার রোলটা ভুলে যাই। এখানে কি ডায়লগ আছে ? আমি ভুলে গিয়ে চুপচাপ খেয়ে নিই। খেতে খেতে হাসিহাসি মুখ শ্রীদেবীকে দেখি। আমার ইচ্ছে করে শ্রীদেবীকে পেতে।

বিকেলে বাবা দেখতে এলে বলি, অভিনয়ের বাইরেও ত একটা জীবন আছে, অহন বড়

হইছি, আমারে বিয়া দেও ! বাবা থতমত খেয়ে যায় । তারপর হেসে বলে, আচ্ছা ! তুই ভাল হইয়া বাড়ি চল, তারপব মাইয়া দেখুম –

– মাইয়া আমি দেখছি !

বাবা অবাক হয় । – কই মাইয়া ?

– ঐ ডিউটিরুমে নার্স সাইজ্যা আছে ! আমার বাবা বাঙালী । ককবরকও জানে ; তবু বাংলাতেই বলি । বাবার চেহারা হঠাৎ করুণ হয়ে যায় । রুমাল দিতে চোখ মোছে । বাবা কি কাঁদছে ? ধীরে হেঁটে গিয়ে ডিউটিরুমে ঢোকে । ডাক্তার ও শ্রীদেবীর সঙ্গে কথা বলে । আমি উঠে চলতে গেলে মাথা ঘোরায় । বিছানা থেকে ডিউটিরুম বিশ হাতও হবে না । ততটাই অতিক্রম কবতে পারিনা । মানব শরীর এক জটিল যন্ত্র । তার ভাবসাব বোঝা মুশকিল । বাবা ও ডাক্তার বেরিয়ে এসে ধরাধবি করে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয় । আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করি- শ্রীদেবী কী কইলো ? বাবা কিছু জবাব দেয় না । তাহলে কি শ্রীদেবী রাজি নয় ? বাবাব মুখ গম্ভীর । ডাক্তার হেসে বলে, হবে, আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন–

বুঝতে পারি তখনো শুটিং চলছে । কী বোকা ! আমি মনেব কথা বলছি, ওরা সেটাকে মেকআপ দিচ্ছে । আমি শুয়ে শুয়ে ভাবি এরকম চলতে থাকলে আমার প্রথম ছবিটা ফ্লপ হবে নির্ঘাৎ । আবার ভাবি হয়তো আমার রোল ঠিকই করছি অথচ বুঝতে পাবছি না । আগামীকাল এই ধন্দ দূর করতে হবে । শ্রীদেবীকেই চুপিচুপি জিজ্ঞেস করবো ।

কিন্তু পরদিন থেকে ও আর আসে না । কখনো রতি, কখনো বেখা বা বয়স্কা হেমামালিনী, আসে । ওরা বলে শ্রীদেবী এখন অন্য সিনেমাব শুটিংয়ে ব্যস্ত । আমার সেখানে যাওয়াব উপায় নাই । পরিচালক যিনি এখানে ডাক্তাবের ভূমিকায়, আমাকে বোঝায়–আপনি ত হিবো, মূলচবিত্র-এখন শুধু ভাল খাওয়া-দাওয়া আর অন্য নায়িকাদেব দেয়া ট্যাবলেট খেযে যাওয়া ! চোখ টিপে বলে, আয়েস করুন ! আমার কিন্তু রোলটা আর ভাল লাগে না । তবু ঠিক ঠিক নির্দেশ মতন বোল করি । হলঘরটার ঘুলঘুলিব মতন ফুক্কাগুলিতে সব ক্যামেবার লেন্স ফিট করা । দিনবাত ওরা আলো জ্বালিয়ে রাখে । দিনবাত শুটিং চলে অথচ ক্যামেরাম্যানদের একবারও দেখি নি । শুধু ফোকাস করে যাচ্ছে আড়াল থেকে ।

অবশেষে একদিন শুটিং শেষ হয়ে যায় । আমাকে নার্সিংহোম থেকে ভ্রমণে নিয়ে যায় পুবী কোণাবক । সূর্যমন্দিরে কী সুন্দর মৈথুন ভাস্কর্য ! অসংখ্য ভঙ্গীতে মৈথুন । সেখানেই আবার হঠাৎ শ্রীদেবীকে দেখতে পাই । ভুলে যাই বাবা পাশে আছে । ইশারায় শ্রীদেবীকে একটা আড়ালে ডাকি । সে আসে না । এখানেও কি শুটিং ? নাকি অবজ্ঞা ? ঘুরতে ঘুরতে খানিকবাদে ওকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করি । ও কেমন ভয় পেয়ে যায় । আমি ওব হাত ধরে জানতে চাই কী ব্যাপাব ! শ্রীদেবী চেঁচিয়ে ওঠে । চিৎকার শুনে অনেক মানুষ আমাকে পেটাতে শুরু কবে । বাবা অনেক কষ্টে মাঝখানে ঢুকে সবাইকে বোঝায় — ও অসুস্থ, সিজোফ্রেনিয়া ভাই !

– পাগল নিয়ে রাস্তায় বেরোন কেন মশাই ? আমার বাগ হয় । আমি পাগল ? বাঁ'হাত বাড়িযে একটি ধাবমান ছোট্ট উল্কা মহাকাশ থেকে নামিয়ে ওদের ভস্ম কবে দিই । শ্রীদেবী ও ভস্ম হয়ে যায় । এতে আমারও কষ্ট হয় । তবু নিরুপায় । মনে মনে ঠিক করি আব অভিনয় করবো না । আমি ত এখন ঈশ্বর । চন্দ্র সূর্য ছায়াপথের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রপরিবার আমার ইচ্ছাধীন ।

প্লেনে আগরতলা আসার সময় মাধুরি জুহিবা এয়ারহোস্টেস্ সেজে আসে । চেহারায় স্পনসর্ড হাসি । আমি পাত্তা দিই না । নি:শব্দে একমুঠো টফি নিয়ে একটা একটা করে চিবিয়ে খাই । শিল্প বিপ্লবের এই ক্ষুদ্র উপহার খেতে আমার ভাল লাগে । মনে হয় গ্যালিলিও নিউটন রাদারফোর্ড খাচ্ছি । মাধুরি প্যাকেট লাঞ্চ দিয়ে গেলে চুপচাপ খাই । তৃতীয় বিশ্বের হয়ে ডাঙ্কেল খাই । জুহি জল দিয়ে যায় । খানিকবাদে চা দিয়ে যায় । সব খাই । বুঝতেই দিই না আমি এখন ঈশ্বর । আগরতলা এয়ারপোর্টে বাবা একটা সুটকেস তুলে নিতে বলে । আমি হাসি । ঈশ্বর কি কোথাও সুটকেস বহন করে ? অগত্যা বাবা-ই বহন করে ।

বহন করতে করতে একসময় কেৎরে পড়ে মারা যায় বাবা । মারা যায় মা । আমার কষ্ট হয় । আবার ভাল লাগে । ঈশ্বরের আর অভিনেতার কাজ এক নয় । ঈশ্বরকে অনেক নির্মম হতে হয় । কিন্তু মানুষের শরীর ধারণ করা ভীষণ ঝক্কির । এখানে গ্রহণ আর বর্জন, দখল আর পলায়ন । সবকিছু ছাপিয়ে এখন ক্রেতা আর বিক্রেতার বাজার হয়েছে মানুষের সভ্যতা । এই সব আমার ভাল লাগে । সব সম্পর্ক

কী সুন্দব পয়সা দিয়ে কেনা যায় !

অভিনয় ভাল লাগে না। ঈশ্বর অভিনয় কববে কেন ? গাল্ফ-ওয়ারের তেলপোড়া গন্ধ আব মিশাইলের আওয়াজ শুনে আমি অদৃশ্য হই। মুহূর্তে ফ্রিজ কবে দিই বাগদাদের পথে মৃত সন্তান বুকে মায়ের হাহাকার। মানুষ তখন আমাকে দেখতে পায না। অতীত ভুলে যায়। ভবিষ্যৎ ভাবতে পারে না। এক শূন্যতাময় হাহাকারময় বর্তমান তাবৎ ক্রীতদাসদেব গ্রাস করে। যে মা অন্যেব শিশুকে দুধ খাওয়ায় তাব দুধেও একসময় ঢুকে পড়ে ক্যানসার। যে নারী পুরুষের ভালবাসা চায়, বর্তমান তার হাত পায়ে ঝিনঝিন ছ্যাৎছ্যাৎ করে। বড় বড় হাসপাতালে সারিবদ্ধ কাতব মানুষ ডাক্তারদেব দিয়ে স্লিপ লিখিয়ে এনে কাড়ি কাড়ি টাকার বিনিময়ে ওষুধ কিনে খায়। কারো বোগ সাবে না। উপসর্গ পালটায মাত্র। একা কেরাঙ কবিরাজ চৌমুহনীতে বসে বাঁশের হুক্কা টানে গুড়ুক গুড়ুক।

চৌমুহনীতে তামাকের গন্ধ। মোবিল-ডিজেল-পোড়া গন্ধে কেরাঙ আমাকে শিকড় ছুঁইয়ে দৃশ্যমান কবে। এখন ভাবি মানুষেব শরীরে অনেক শান্তি। দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকাবে এ শহরের ফ্লুরোসেন্ট আলো ছাড়া আর সব ইলেকট্রিক কাবসাজি নিষ্প্রভ। এখানে ডাক্তার রাজা রায়কে দেখে অবাক লাগে। ডাক্তার কেরাঙের সামনে ঘাসে বসে কী যেন বলে। কেরাঙ নির্বিকাব হুক্কা টানে।

— মানিক্য বুঘনি খান্ ! অনেকদিন পব বুলবুলি হবিদাস আব ভগবতী।

আমার ভীষণ খিদে। যে যা দেয় খেয়ে নিই। নষ্ট মিষ্টি, বাসি রুটি তবকারী। মাঝেমধ্যে বদহজম, পেট খারাপও হয়। তবু খাই। এত গবম ঘুঘনি বেশ ভাল লাগে। কেবাঙ খেতে চায না। ভগবতী কত মিনতি কবে ! কেবাঙ বলে, মানিক্যরে দ্যান ! ডাক্তার রায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তুকতাক কিচ্ছু নাই বাবু, মিশিনেব লাল শিকড়, চুনধারাই আব বাঁশপাতার ছাই ! আপনেরা বিদ্বান, কইলে বুঝবি, সব অসুখ গাছে সাবে !

বুলবুলি কেবাঙের ঘুঘনিটাও আমাকে দেয়। কেবাঙ মানে বনকচ্ছপ। ইহা একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। ভগবতী বলে, বুলবুলিব অসুখও সাইব্যা গ্যাছে, এক অমাবস্যা এক পুর্নিমা পাব অইল লেপে ঢুকলে আর হাত পাও ছ্যাৎছ্যাৎ কবে না !

বুলবুলি বলে, চলেন আপনেবা খালপাবে, নতুন ঘবের গৃহপ্রবেশ !

হরিদাস বলে, ভিডিও ভাড়া কইরা আনছি, ছুডু জেনাবেটাব —

আমি বলি, চলো মামা জামি ছলঙ ! কতদিন পব মানুষের ভাষায় কথা বললাম আমি। ধাতব আওয়াজ। যেন দৈব আহ্বানে মুখ তুলে তাকায কেরাঙ কাববাজ। তারপর আবাব মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। হরিদাস কেবাঙের পাশে বসে কাতর প্রশ্ন করে—কেরে যাইতানা ওচাই ?

কেরাঙ ফাটা বাঁশের মতন আওয়াজ কবে বলে, খুব কষ্ট বাপ্ !

ভগবতী বোকাব মতন বুলবুলিকে দেখে। দু'জনেই হবিদাসকে দেখে। সবাই হা করে কেরাঙকে দেখে। ভগবতী বলে, ইডা কেমুন কতা ?

কেবাঙের আওয়াজে এখন আবো কষ্ট, মাইনষেব তৈবী মাযা, আমি যাইত না —

আহত হবিদাস এসব বোঝে না। অর্থ বুঝতে পাবে না বুলবুলি কিম্বা ভগবতী। তাই হঠাৎ কেবাঙের একহাত ধরে টানে হবিদাস। অন্য হাত ধবে বুলবুলি ও ভগবতী জোব কবে ওঠাতে যায, সারাদিন একজাযগায় বইয়া থাকেন, যাইতেই অইব —

মাটি চড় চড় কবে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায। কেবাঙ ছটফট কবে। পৃথিবী দুলতে থাকে। কড়কড় মেঘেব শব্দে চেঁচিযে উঠি আমি—থামো, থামো তুমরা !

ততক্ষণে গভীবে প্রোথিত শিকড়সহ কেবাঙকে উঠাতে না পেবে কাত কবে ফেলে ভযে দৌড়ে পালায় উপকৃত তিন মূর্খ। ডাক্তার রায় ছুটে এসে প্রায অচৈতন্য কেরাঙকে জড়িযে আবাব মাটিতে পোতার চেষ্টা কবতে থাকে। আমার চোখ দিযে অনেকদিন পর জল বেরিয়ে আসে। অবাক হই। এখনো ধুকপুক ধুকপুক হৃৎপিণ্ডের শব্দ। আমি নুযে কেবাঙের চোখের পাতায চুমু খাই। সাবা শরীবে চুমু খাই। বাজপড়া অর্জুনগাছটি কেঁপে ওঠে। ধীবে চোখ খুলে কাতব তাকায এক জীবন্ত ফসিল।

আমার আবার মানুষ হতে ইচ্ছে কবে।

অনুপ ভট্টাচার্য

কামড়

সত্তা

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে রুরু মাথা নুইয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে চোখে অসহায় চোখ রাখে। কিশোরের শান্ত চোখে মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ শ্বাপদেব দৃষ্টি ঝলসে ওঠে। চোখ এড়ায় না। হঠাৎই আমি রুরুর এই চাহনিব সামনে ভীত হয়ে পড়ি। আমার হাত দুটো কাঁধ থেকে দুপাশে ঝুলে পড়ে। পোষাকের আড়ালে ঘাম হয় শবীরে। মনে হয় রুরু তার হিংস্রতা নিয়ে একদিন না একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ নোখ বসিয়ে দেবে হৃৎপিণ্ডে। চিৎকাব শেষ কবে দিতে চাইবে আমাকে।

অথচ আমি জানি রুরু আমাকে ভয় করে। ভীষণ ভয়। ওদের বাবাব ঘরটা দারুণ আগ্রহ দেখিয়ে আমি ভাড়ার নামে অধিকার কবে নিয়েছি বছব দুই আগে। প্রায় জোরেব সঙ্গে রুরুদেব ওপব একটা নীরব অভিভাবকত্ব ফলাচ্ছি দীর্ঘদিন। আমি যেন এদেব বাড়ীর একজন হয়ে যেতে চাই। যা বাস্তব পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। এখন আমি নিশ্চিত জানি রুরু হাঁটুতে চিবুক গেড়ে এই সন্ধ্যে বেলায দরজাব বাইবে বসে আছে। ব্যাপাবটা শেষ হলেই বাইরে গিয়ে দেখব নির্ঘাৎ সে সিঁড়িতে বসে বযেছে নি:শব্দে। এটা জানা হয়ে গেছে দরজা খোলা রাখলেও সে ভেতবে আসবে না। ডাকলেও কোনো কথা বলবে না।

ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে প্রায দিনই আমাকে পালানোর মত কবে চলে আসতে হয়। আসতে আসতে রুরুকে আমি একটা কাঁচা টাকা ধরিয়ে দিই হাতে। টাকাটাব দিকে মনযোগ থাকে বলে সে আমার ভীরু চেহাবা দেখতে পায না। বিমি তখনই হয়তো পেছনে পেছনে দরজায় এসে দাঁড়ায়। কাঁধে আচল উঠিয়ে নেয়। বুক ঢাকে। ব্লাউজের হুক লাগায়। আমি বুঝি, ব্যাপার শেষে বিমিও আমাকে, মানে এই মুহূর্তে বিশ্রীভাবে নিচ্ছে। আমাব আসল চেহাবাটা আবিষ্কাব কবছে।

দৈনন্দিন

রোজ সকাল বেলা শেভ করতে গিয়ে নিজেকে নিখুঁত আবিষ্কারের চেষ্টা কবি। ইচ্ছে কবে রেজারের ব্লেডে কণ্ঠনালীর কাছে খানিকটা রক্তপাত ঘটিয়ে নিজেব রক্তটা চিনে নিই। স্পষ্ট আয়নায আমিই যেন কেবল আমার এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ঠোঁট ভেঙ্গে চুবে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে অপরিচিতেব গলার প্রশ্ন কবি—তুমি কেমন আছো হে চরিত্রবান মহাপুরুষ ?

রুরুদের এই পলেস্তারা খসে পড়া স্নান ঘবটা প্রথমদিন থেকেই আমার দারুণ পছন্দ ? চৌবাচ্চার হিম শীতল জলের কাছে দাঁড়াতে বড় ভাল লাগে। চোখ বুজলে এক কিশোব শাওয়াব বৃষ্টির জলের ফোঁটায় দাঁড়ায়। যাব চেহারা থেকে ভাল লাগা আমার শৈশবের আমিটার মতো। একদম আমি। আসলে চৌবাচ্চার জল আঙ্গুলে নেড়ে আমি এক ধরণের জলের শব্দ প্রতিশব্দ সৃষ্টি করি—অবিকল বৃষ্টি পতনের শব্দের মত। চোখের পাতা খোলে, চৌবাচ্চার জলে এক কিশোর বয়েস। খিল খিল হেসে ডুবে যায়। যাকে প্রতিদিন সকালে পেয়ে সকালেই শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্চার জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। এই মুখ ছেড়ে গেলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবিম্ব আমাকে কিন্তু ছাড়ে না। অফিসের টেবিলের কাছে এ মুখ আরো অসহায়। চোখে জল আসে। নি:শব্দের শব্দ যেন কেবলই সাপের মতো হিস্ হিস্ শব্দ করে। চতুর্ধারে যেন ক্ষুরের শব্দ-আমার তখনই দারুণ ঘুম ঘুম ভাব হয়। প্রবলভাবে কেবল জেগে থাকার চেষ্টা করি।

তখন তো নিরস্ত্র হাত দুটো টেবিলের নীচে খুলে পড়ে থাকে। এভাবেই বিশাল এক কাচেব প্রাসাদে দুপুর বেলাটা কাটে। শীতগ্রীষ্মে গায়ে লেপটে থাকে এক হিমধারা আবহাওয়া। এখানে সবই

আমাকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলে কেবল ত্রাসটাই বাড়িয়ে দেয়।

কেন জানি ত্রাসেব মধ্যে একটা শক্ত টেলিফোন আশা করি। জয়িতার টেলিফোন। ফোন বাজলেই তুলসীবাবুব টেবিলেব কাছে ছুটে যাই। তুলসীদা কি আমাকে পাগল টাগল ভাবে, কে জানে। তবু রিসিভার দ্রুত হাতে তুলে নিই। অফিস সংক্রান্ত দরকারী ফোন আসে সব। অ্যাটেণ্ড কবেও দাঁড়িয়ে থাকি। যদি ফের ফোন বাজে –

ফোনে গম্ভীব গলায় নিশ্চিত বাড়ী ছাড়াব নোটিশ দেবেন জয়িতা। আপোসের মীমাংসায় আসতে চাইবেন এক সময়। ইনসিকিওরিটি ফুটে উঠবে স্পষ্ট গলায়, বুঝতেই পারছেন, বিমিকে নিয়ে আপনার বেড়িয়ে বেড়ানো হাসি কথা গল্পে পড়শীরা আজকাল কান থেকে কানে কানে কথা বলে। ব্যাচেলারকে ভাড়া দিয়েছি বলে ট্যাবা কথাটাও শুনতে হয়। শহবটা তো পাড়াগাঁর গা ছাড়া বড় নয়। চরিত্রেও নয়।

না, জযিতার ফোন সারা দিনই আসে না। চেযাবে ফিবে গিয়ে কেবলই বুক দুরু দুরু করে। তুলসীদার বিরক্তি মেশানো ডাকে প্রতিবারই রিসিভাব হাতে নিয়ে ভয় হয়।

অফিসের পব থেকে রাতটা ঘবের মধ্যেই কেটে যায আমার। জযিতার কোনো অনুমোদন ছাড়াই রিমির ইঙ্গিত পেলে পড়াশোনা দেখানোর অছিলায তাব ঘরে কেবল একবাব মাত্র যাওয়া। দু'বছর আগে এই শহবে বদলি হযে আসা অবধি কোনো বন্ধু-আত্মীযস্বজন কাবো সাথে আমার তেমন যোগাযোগ নেই।

এ বাড়ীতে জয়িতা রুক বিমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। শুরু থেকেই জযিতা আমার কাছে এক রহস্যময়ী। আমাব ভাড়া নেবাব ব্যাপাবে তিনি কোন সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই জানান নি। নিজে থেকে কোনো কথাটথা বলেন না। দারুণ প্রযোজনে, অসুখ-টসুখ হলে ডাক্তাব ডাকতেও না। একটা কঠিন ব্যক্তিত্ব আব প্রগাঢ় দু:খেব আববণে নিজেকে ভীষণভাবে মুড়ে বেখেছেন। সময় সময় খানিকটা উদাস, পাংশু মুখ করে অনেকক্ষণ আকাশেব দিকে চেযে বাবান্দায় বসে তাকিয়ে থাকেন। আচানক বৈধব্য আর দারিদ্র্যে তাব চোখে সময় সময় আতঙ্কেব ছায়া ভাসে। অতি সন্তর্পণে রুক আর রিমিকে আটকে বেখেছেন এক কঠিন অনুশাসনে। তবু আমাব অমোঘ বক্তের পাপ আব অনিবার্য দেহ সৌষ্ঠব বিমিব সদ্য ফোটা উচ্ছল যুবতী মনেব ছোঁয়ায় আপনা আপনি গোপনে ক্লিক মেবে বসে।

স্মৃতি

যাই হোক, এ বাড়ীটা আমার অতি প্রিযজন বঞ্জনদার বাড়ী। সিনিয়র বঞ্জনদা চাকরীর শুরু শুরুতে আমাকে হাত ধবে অফিসেব কাজ শিখিয়েছিল। এক সাথে থাকা-টাকা অফিস করার পর নিজেব এই শহবে ট্রান্সফাব নিযে ববাবরেব মতো চলে এসেছিল। এখানে এসে, অফিসে জয়েন কবার আগে সোজা হোটেল থেকে বঞ্জনদাব শহব প্রান্তেব বাড়ীটা খুঁজে বের করছি।

আমার পরিচয় শুনে তাব বাবা ঝরঝব করে কেঁদে ভাসিয়ে ছেলের মৃত্যু সংবাদ দিযেছেন। আর্থিক অসংগতির কথা বলেছেন খোলা মনে। ববাববেব মত গ্রামের বাড়ীতে যাবার মুখে আমাকে এ বাড়ীতে ডেকে এনে প্রতিষ্ঠা করে বেখে গেছেন পরম নিশ্চিন্তে। অথচ প্রথম দিন থেকেই জয়িতা আমার কাছে যেন এক পাথব প্রতিমা।

রঞ্জনদা, আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে – এখন আমি যে খাটে শুয়ে রয়েছি ঠিক এই খাটের উপরেই নাকি গলায় দড়ি দিয়ে—

শুয়ে শুয়ে আমি প্রায়দিনই ভাবি বঞ্জনদা কেন গলায় দড়ি দিতে গেল। একসাথে থাকা টাকার পব, এতো ব্যক্তিগত গল্প গুজবের পরেও তাব কোনো গোপন দু:খের খবর আমি পাইনি। খোলা গলায় গান গাইতে গাইতে, হো হো করে হাসতে হাসতে আর কম বয়েসী রূপসী স্ত্রীব কত গল্পই না তার মুখে শুনেছি। খুব দাবিদ্র্য বা অন্য কোন মেয়ে টেয়ের বিষয যতদূর জানি, ছিল না।

এ-ঘরটায় রঞ্জনদা থাকত জেনেও আমি ভাড়া নিয়েছি স্ব-ইচ্ছা খাটিয়ে, বোধ হয় কোনো এক ভাল লাগার কারণে।

এ বাড়ীতে একটি নবযুবতী আব কিশোর থাকা সত্বেও রাত ৯টায় বাড়ীটা ঘুমিয়ে পড়ে। রাত যত বাড়তে থাকে বাড়ীতে নানাবকম শব্দ হয়। প্রথম প্রথম একটা অস্বস্তির মতো হত। এখন হয় না। মাঝে মাঝে সিলিং থেকে এক ঝাঁক পাযবা জ্যোৎস্নায কোথায় উড়ে যায়। আবাব সঠিক ফিবে আসে। জ্যোৎস্নায তাদের চলাফেবা বড ভাল লাগে। ভাল লাগে জয়িতাকে নিয়ে ভাবতে। জযিতা এখনো এই

বয়েসেও সুন্দরী ও আকর্ষণীয । বয়েসের সামান্য মেদ তাকে এক রকম সৌন্দর্য দিয়েছে । এক আত্মহীন সৌন্দর্য নিয়ে তিনি বিকেল শেষের সন্ধিক্ষণে উদাস মুখে বারান্দায বসে আকাশের তারা দেখেন । দেখতে দেখতে মুখের রঙ ও বেখা পাল্টায় । তখন মুখের চামড়ায় একধবণের উজ্জ্বলতা তাকে আরো করুণ করে তুলে ।

স্বপ্ন দু:স্বপ্ন

আমি আজকাল একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢলে পড়ি । এক অষ্টাদশী জ্বলা-মোমবাতি হাতে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায় । মোমের আলোয় তার স্বল্প সাজ পোষাকের আড়ালে ঠেলে ওঠে উগ্র শরীর-কেবল শরীরটাই আমাকে হাতছানি দেয় । পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই । তির তির করে কেঁপে ওঠা চোখের পাতায় আবার সে ইশারা করে । আমি আরো এগোই । ভেতরে যেতেই সে দরজা বন্ধ করে নি:শব্দে । মসৃণ ফর্সা বাহু মেলে আমারে জড়িয়ে নেয় । শরীরের নেশা নেশা ঘ্রাণে পায়রা নরম বুকে আমি ডুবে যেতে থাকি । যেতেই থাকি । হঠাৎ আমাকে ও অষ্টাদশীকে ভেতরে নিয়ে ঐ ঘরটা উপরে উঠে যায় । গোটা শহরটার বেশ উপর দিয়ে ঘরটা শূন্যে ভাসতে থাকে । ভেসে ভেসে চলতে থাকলে আমার মনে হয় বকফুল চাঁদ আর নক্ষত্রমালা আমাদের ঘরটা থেকে বেশী উপরে নয় । হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলা যাবে এরকম অষ্টাদশীর শরীরেব সুঘ্রাণ নিতে নিতে ঘর সুদ্ধ শূন্যে নক্ষত্রেব দেশে বেড়াতে বেশ মনোরম লাগে ! হঠাৎই আমি ছিটকে একটা নির্জন বিশাল মাঠে পড়ে যাই । আশ্চর্য, চোট লাগে না একদম । প্যারাসুট ছাড়াই, শূন্যে ভাসতে ভাসতে নীচে মাঠে নেমে আসে আমার দেহ । নির্জন এই বিশাল মাঠে ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নালোকে ক'টা শবদেহ তা তা থৈ নৃত্য করে । আচমকা আমাকে পেয়ে গিয়ে দু'টো শবদেহ আমার দুই বাহুমূল ধরে টানাটানি করে । আমি ডাইনে একবার, বাঁয়ে । দু'ধারে স্পষ্ট তাকিয়ে চিনতে পারি-একদিকে আমার মৃত বাবা, অন্যদিকে রঞ্জনদা ।

পরিত্রাণ চেয়ে প্রাণপনে তাদের হাত ছাড়িয়ে দুরে দাঁড়িয়ে থাকা পবীর মত অষ্টাদশীব দিকে দৌড়তেই বুঝতে পারি, আমার হাত-পা মাঠের জমিনে গেঁথে যায় । তখন বাবা ও রঞ্জনদা, রঞ্জনদা ও বাবা আমার চারদিকে ঘুরে ঘুবে অনেকটাই কানামাছি কানামাছি খেলে ।

আমি অষ্টাদশী পবীটাকে ছুঁয়ে ফেলতে চাইলে মৃত বঞ্জনদা আব বাবাব শবদেহ আমাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় এক বিশাল অন্ধকার গর্তের দিকে ।

দুরে দাঁড়িয়ে অষ্টাদশী খিল খিল হাসে আর হাত তালি দিতে মজা পায় । গর্তে, অন্ধকারেব ভেতব, আমার দমবন্ধ চাপা কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে । বেরোতে গিয়ে সাপের মতো বুকে মাটি ঘষতে ঘষতে এক সময বড় ক্লান্ত, বড় অসহায় অনুভব কবি ।

ভবিষ্যৎ .

এখন অফিস থেকে ফেবার পথে গলিব এই রাস্তাটুকু অতিক্রম কবতে গিয়ে গলা শুকিযে যাচ্ছে । হাত-পা দুটো অবশ অবশ । কী যেন এক উত্তেজনা – খুব ভেতরে একটা অস্বস্তি – একটা কাঁটা কাঁটা । গভীব ভেতরে একটা যন্ত্রণাদায়ক স্রোত । কেন যে এমন হয় বুঝি না । দু'ধাবেব বাড়ীগুলো থেকে লোকজন কি আমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে সনাক্ত করছে ? এখনই থুথু ছিটাবে কেউ কেউ ?

জয়িতার পাথর প্রতিম মুখ ক'দিন একবারও সামনে পড়েনি । বিমিকেও ক'দিন থেকে ঠিকমত পাচ্ছি না ।

সম্ভবত জয়িতা সব জেনে গেছেন । রিমি আর আমার ঘনিষ্ঠ উজ্জ্বল মুহূর্তে মাঝে মাঝে আচমকা পাথর দৃষ্টি নিয়ে এমনভাবে পেছন থেকে নি:শব্দে সামনে এসে দাঁড়ান, বুকের রক্ত হিম হয়ে ওঠে । চাপা রাগ নিয়ে সন্দেহের চোখে দু'জনকে স্থির দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন । এক ঝলক । পালিযে এসে আত্মরক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না ।

জয়িতা হয়তো একই ভঙ্গিতে বিষণ্ণ রিমির সামনে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়ান । চোখে তাব ক্ষমাহীন আগুনটাই জ্বলতে থাকে তখন । যার লেলিহান শিখা একটা খাঁচায পোবা পাখির অঙ্গই জ্বালিয়ে দেয় কেবল । রিমির উপর দিয়ে জয়িতা নিজে থেকেই এভাবে নিজের একটা সর্বনাশ ঘটাতে চাইলে এক রহস্যময় পর্দা আমার চোখেব সামনে দুলে ওঠে । নড়ে চড়ে । আমি সরাতে চাইলেও যা সবাতে পাবি না ।

অথচ জয়িতা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় ডেকে বাড়ী ছাড়ার, এমকি পাড়া ছাড়ার প্রস্তাবটা অবলীলায় দিতে পারেন। শুনিনা শুনছি না করেও যদি আমি উঠে না যাই, অবশ্যই লোকজন ডেকে, নয়তো যে ছেলে ছোক্‌রাগুলো তাকে মাসীমা, কাকিমা ডেকে কেবল বিমির জন্যে এ বাড়ীতে যাতায়াত করে তাদের চোখের ইশারা করলেই তো আমাব একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

নির্দ্বিধায় তিনি এসবের একটা করতে পাবেন। প্রথম দিন থেকেই আমাকে যখন একটা দাকণ দূরত্বে রেখেছেন। রেখেছেন কী, আমাকে নিয়ে পাঁচজন পাঁচ কথা বলবে বলে। শহরটা অবশ্য এমন সীমান্ত লাগোয়া—এখানে গ্রাম্য রাজনীতিব সঙ্গে অনববত ঘুরপাক খাচ্ছে খুনী বেশ্যা দালাল আর গুণ্ডাবা। সব সময সর্বত্রই একটা আতঙ্কেব বাষ্প ভাসে। ভাসে বলেই একলা একজন মেয়ে মানুষ — তাও বিধবা, বিধবার যুবতী সুন্দবী কন্যা ও নাবালক শিশু নিযে থাকা টাকা মানেই পায়েপায়ে বিপদ। সুযোগ সন্ধানীবা দিনরাত বাড়ীটার আশেপাশে ঘুরপাক খায়। আমাকে সামনে রেখে দিব্যি তুড়ি মেরে নির্ভযে চলাটাই ছিল বুদ্ধির কাজ। অথচ আজকাল উল্টোটাই আশঙ্কা কবছেন — আমাব অনিবার্য চালচলন তার কোন সর্বনাশ ডেকে আনছে কে জানে?

যাই হোক, রিমির বোধ হয় একটা অসুখটসুখ করছে। দেহের কোন রূপান্তর ঘটছে কিনা কে জানে? তবে আমি তো সাবধানে চলি। মধ্যে মধ্যে আমাব এরকম মনে হয, মনে হয সামনেই কোন ভীষণ বিপদ।

সুখ-অসুখ

বাড়ী ঢুকে ঘবেব তালা খুলতে খুলতে লক্ষ্য কবি, জয়িতা এখনো তাব অফিস থেকে ফেরেন নি। বাজ্য সবকাবেব কোনো এক অফিশে বিসেপশনিষ্টেব কাজ তাব। আজকাল ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায। বিমিব কাছ থেকে জেনেছি বাড়তি রোজগাবেব জন্যে দুটো শিফ্‌ট করেন প্রায়ই।

যাই হোক, রুরু এখন ভাবলেশহীন চোখে বিমিব ঘরের বারান্দায বসে আকাশের ঘুড়িওড়া দেখে। আমার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই মাথা নীচু কবে নীচ থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নেয়।

এবং সঙ্গেসঙ্গেই আবাব উঠে চলে আসে আমাব একদম কাছে।

নীচু স্ববে বলে — মা এখনো ফেবেনি। বলে গেছে আজ দেরী হবে।

আমি শব্দ কবে হেসে উঠে, প্যান্টেব পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাঁচা টাকা তুলে ওব হাতে ধবিযে দিই। টাকাটা হাতে নিয়ে ভোঁ কবে রুরু দৌড়ে গেইট ঠেলে বেবিয়ে যায। খানিকক্ষণ বাদেই ঘবেব দরজা ভেজিযে ওদেব দরজায এসে দাঁড়াই। আলতো ঠেলা দিতেই দবজা খুলে যায। ভেতবে ঢুকি এবং একেবাবে এঁটে দিই।

প্রথমে অন্ধকাবে কিছুই চোখে পড়ে না ভাল মতন। অন্ধকার সবে এল দেখি বিমি পেছন ফিবে শুয়ে বয়েছে এখন। জেগে আছে কিনা ঠিক বুঝা যায় না। জেগে থাকলে আমাব পদশব্দ শুনে ঠিকই চিনতে পাববে। চিনতে পারলেও ফিবে তাকাবে না জানি। বুক থেকে এতক্ষণে সাবাদিনের অস্বস্তিটা ধীবে ধীবে পাতলা হযে আসে। বক্তে চঞ্চলতা বাড়ে। ধীরে ধীবে ঘুমিযে থাকা একটা নেকড়ে জেগে ওঠে — থাবা তাক কবে। দ্রুত পেছনেব দবজা চেক কবে নিযে আমি বিমিব ওপব ঝাঁপিযে পড়ি। পাশ ফিবিযে চিৎ কবে শোযাই।

স্তনে হাত বাখি। চুমু খাই ঠোঁটে। মুখ থেকে ঠোঁট সবিযে বিমি দাঁতে দাত চেপে একটা অস্ফুট যন্ত্রণাময় শব্দ কবে। আমার শবীবের নীচে তাব পলকা শবীবটাও কেঁপে ওঠে থবথব। তখন আমি লক্ষ্য কবি তাব শরীব কেন নীলাভ হযে যায। কিন্তু বেশীক্ষণ হুঁস থাকে না আমার। আবো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতেই সে প্রত্যুত্তবে চুম্বন আমাকে ফিবিযে দেয ঠোঁটে। বুক থেকে উঠে আসা গোঙানিটা তার আপনা আপনি চাপা পড়ে যায়। ক্রমশই বিমি আব আমি শবীব উন্মাদ ও বিকাবগ্রস্ত হযে উঠি। বিচিত্র প্রক্রিয়ায বিমিকে আবো বেশী বেশী আনন্দের অংশীদাব কবে নিই। এভাবে এক প্রবাহিত নিববচ্ছিন্ন যন্ত্রণার মাঝে আমাদেব সুখ ও আনন্দপর্বেব পবিসমাপ্তি ঘটে।

রিমির স্তনের ভেতর মুখ গুঁজে আমি এখন শুযে বযেছি। সে হঠাৎই আমাব মুখটা দুহাতে তুলে ধবে চোখে চোখ বেখে প্রেমাপ্লুত দৃষ্টিতে আমাব মাঝে তাব প্রেমিককেই খুঁজে বেড়ায। আমি বুঝি রিমি এখনো একটা ঘোবের মধ্যে রয়েছে। একটু পরেই, ঘোব কেটে গেলে আমাকে বিশ্রী ভাবতে শুরু করবে।

সন্ধ্যা এক সময় গাঢ় হয়ে নেমে আসে। অন্ধকারের এক বাষ্পস্রোত বন্ধ দরজা জানালায় ফাঁক ফোকর দিয়ে মসৃণ মেঝেতে ছড়িয়ে ওপরে উঠে এসে আমাদের নগ্ন শরীরে তিল তিল করে জমতে শুরু করে।

এক সময় রিমি অধীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে — এভাবে আর কতদিন ? আমাকে নিয়ে কী ভাবছ তুমি ?

সহসা উত্তর আসে না মুখে। ওকে আরো ভিতরে জড়িয়ে গালে গলায় ঠোঁট ঘষতে ঘষতে ফিস ফিস করি। ও কান্নায় কঁকিয়ে ওঠে। এলো চুলে উঠে বসে। বাঁ হাতের পিঠে কান্না আটকায়। বলে — আমাকে এসবে জড়ালে কেন ? বলো কেন জড়ালে ?

জবাব না দিয়ে কখন যে ঘরে ফিরে গেছি বুঝিনি। এখন, মানে খানিকটা আগে বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। উঠোনটা দারুণ ফর্সা। বেশ রাত। আমার ঘুম আসেনি।

জানালার পাশে বসে ফর্সা উঠোনটা দেখছি। রিমির প্রশ্নে এখনো খুব বিব্রত লাগছে নিজেকে। ভেতর থেকে কে যেন বলছে আর এগোনো ঠিক হবে না, কেটে পড়। হ্যাঁ, আমি চলে যাব। এ বাড়ী এ শহর ছেড়ে চলে যাব। আজ তিন নম্বর দিনে রিমির একই প্রশ্নের জবাব যোগায়নি ঠোঁটে। অতএব এ বাড়ী এ শহর ছেড়ে আমি চলে যাব। আমার এখানকার টার্মও ফুরিয়ে আসছে। একটু চাইলেই ফের চলে যাওয়া যাবে আগের শহরে। জানালায় বসে এরকম চিন্তাজালে জড়িয়ে রয়েছি যখন — ওদের বারান্দায় চোখ পড়ল। জয়িতা। কিন্তু একী, এতো সাজগোজ করেছেন কেন ? এতো আমার দেখা তার বৈধব্যের পরিচিত বেশ নয়। যেন মেঘ ছেঁড়া ঝলসে ওঠা এক বিদ্যুৎরেখা —

তার সৌন্দর্য ফেটে পড়ছে যেন। যে সৌন্দর্য বড় ভয়ংকর। এ রকম সৌন্দর্যের দিকে তাকানো যায় না। তার স্তন এখন দৃঢ়। গোল নাভি। উজ্জ্বল উরু তলপেট দারুণ মসৃণ। ঝলমলে পোষাকেব নীচে সব মিলিয়ে এক উত্তেজনা সুন্দর সর্বাঙ্গ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বিমূঢ় হয়ে দেখেই যাচ্ছি ? নিরাভরণা করুণ সেই বিধবাকে সবিস্ময়ে খুঁজে পাচ্ছি না। চিরচেনা সেই সকরুণ রূপটা ঝরে পড়েছে যেন। এখন এ এক অন্য মহিলা। অসাধারণ সুন্দরী এক নারী। একে পুরুষের চোখে সহজেই চেনা যায়। যায় বলে আকাঙ্ক্ষা জাগে দেহের তন্ত্রীতে।

আলো নেভানো ছিল ঘরের। তাই রক্ষে। সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নামলেন জয়িতা। জ্যোৎস্নায় দাঁড়ালেন কোমরে হাত রেখে। সাক্ষাৎ উর্বশী যেন। মুখ তুলে আকাশে তাকিয়ে রাশি রাশি জ্যোৎস্নাধারা পান করলেন। তাচ্ছিল্যে তাকিয়ে দেখলেন উপরেব অগণিত নক্ষত্রমণ্ডল। তাবপর ময়ূরীর ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালেন শিউলি গাছটাব নীচে। এ গাছটা রঞ্জনদার লাগানো। এখন বড় হয়েছে। শেষ শরতেও বেজায় ফুল ফুটেছে। রোজ ঝরে পড়ে নীচে। ম' ম' গন্ধ ছড়ায়। গন্ধ নিচ্ছেন জয়িতা এখন প্রাণভরে। একটু বাদেই কুড়োবেনও যেন দু'একটা। বুকের খাঁজে রাখবেন। যেন রঞ্জনদাবই স্পর্শ নিতে চান দেহে। দেহের গোপনে।

কিন্তু না, খুব আশ্চর্য লাগছে, পায়ে পায়ে জয়িতা আমার ঘরের বারান্দায় উঠে এলেন একসময়। জানালা থেকে দ্রুত সরে গিয়ে আরো অন্ধকারে মিশে গেলাম আমি। জানালার কাছে এসে তাকিয়ে ভেতরে চোখ রাখলেন নিঃশব্দে। তারপর মৃদু পদশব্দ তুলে ফিরে গেলেন একসময়।

একসময় ওঘরে দুয়ার আটকানোর শব্দ হল।

ঐ রাতটা পেরুতেই আমার অস্বস্তি আর যন্ত্রণা একটা অন্যমাত্রা পেল।

দিনের বেলা জয়িতার উপস্থিতিতে একটা হিমশীতল আবহাওয়া। চোখাচোখি হলে তার চোখে চোখ রাখা যায় না বড়। এমন করুণ স্থির দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকেন কৈফিয়ৎহীন ভাবে রক্ত পর্যন্ত শুষে নেন।

আর রাত হলেই ইদানীং এমন চাকুর মত ঝলসে ওঠেন, উঠে উঠোনময় ঘুরে বেড়ান, আমার বারান্দায় উঠে আসেন একসময়, দরজায় মৃদু মৃদু করাঘাত করেন — জ্বলে যায় অন্তর।

জয়িতা কি আমাকে শায়েস্তা করতে চান। ভয়ে শিউরে উঠি। রিমিকে কি ভয়ংকর শাস্তি দেবার পরিকল্পনা আটছেন ? কিন্তু তাব এই বিকারগ্রস্ত ভাবমূর্তি নিজে থেকে নিজের যে ভযংকর বিপদ ডেকে আনছে মুহূর্তেও ভাবছেন না তিনি। নাকি, আমার ভাবনার প্রকারান্তরে অন্য কোনো নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন এই রহস্যময়ী দক্ষ অভিনেত্রী।

আমি তো দেখছি, জয়িতাব মত্ত পদবিক্ষেপে এখন এই বাড়ীটা কাঁপতে কাঁপতে গোটা

শ্মশানঞ্চলটাই কাঁপছে থব থব। ভাঙ্গা মন্দির চুড়োটা কেটে চৌচিব উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে শূন্যে। শূন্য থেকে এক অতি নীলাভ রশ্মি বহস্যময় ছড়িয়ে গিয়ে ব্যপ্ত কবছে চবাচব। আর চামড়া পোড়া গন্ধ উঠে আসছে বাতাসে ভুরভুর। এইমাত্র নেভানো চিতার আগুন থেকে। অন্য কোনো শব্দ নেই। কেবল জয়িতার পদশব্দ ছড়িয়ে কাঁপছে দ্রিম দ্রিম। জনমানবশূন্য শ্মশানঞ্চল দুলছে। ততোধিক দ্রুতলয়ে দুলছে বাড়ীটা।

এইভাবে কতক্ষণ চলছে জানি না। শেষ বাতে অস্বাভাবিক নীববতার মাঝে আমি আত্মস্থ হয়েছি। টিনের চালায় তখন শিশিব পড়ার শব্দ। ওপরেব ঘুলঘুলি দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, পশ্চিম আকাশে একটা ফ্যাকাশে আস্ত চাঁদ। আমার বুক জুড়ে এইমাত্র একটা নতুন কষ্ট জেগে ঠেলে উঠছে — এই কষ্টটা মৃত রঞ্জনদা না জয়িতার জন্য ঠিক ধবতে পারছি না।

বিমিব চোখে আজকাল আবাব এক তীব্র ঘৃণাব আগুন জ্বলে । সময় সময় এমন এক ভ্রুভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে — যার অর্থ দাঁড়ায় অপদার্থের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন। চোখাচোখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। মনে হয় একদলা থু থু ছিটিয়ে দেবে আমার নাকে মুখে সর্বাঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না আমি। ভীতু আমি অবশ্যই। বিমি যা চাইছে সেভাবে আমাকে কিছু একটা সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব নয়। তবু একবাব, অন্তত বিমিব মুখোমুখি হওয়া দবকার। সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই। করুও সহযোগিতা কবছে না। তার চোখে আজকাল স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। দেখা হলে কথা আদায় করা যায় না। ভয় বাড়ছে কেবল। একদম যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থায়, একদিন বিমিকে শেষ বিকেলেব আলোয় গলিব মাথায় বাঁকেব রাস্তাটায় একা হেঁটে যেতে পেয়ে গেলাম।

আমাকে স্পষ্ট দেখেও না দেখার ভান কবে পাশ কাটিয়ে সামনে হেঁটে যাচ্ছিল রিমি।

প্রায় মরিয়া হয়ে তাব অবহেলা হজম কবেই ডাকলাম – বিমি — শোনো রিমি — । শুনতে পায়নি শুনতে পায়নি ভাব করে জবাব দিল না সে। এগোতেই থাকল। রিমি — আমার আর্ত চিৎকার ফুটে উঠল গলায।

ঘাড় ফিবিযে বারেক তাকাল সে এবার।

দৌড়ে কাছে গিয়ে খপ কবে ধবে নিলাম ওব একটা হাত। ব্যাকুল শোনালো আমাকে — শোনো রিমি, তোমাব সঙ্গে কিছু জরুবী কথা আমাছে আমাব। এবাব বিমি ঝট কবে ছাড়িয়ে নিল হাত। চোখে ছুঁড়ে দিল ঘৃণাব অঙ্গাব। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা স্বরে বলল সে — তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। শুধু জানতে চাই — ঐ বাড়ী এ শহব ছেড়ে কবে যাবে তুমি ?

একশ্বাসে বলে, জবাব না দিয়েই হন হন কবে রিমি খানিকটা সামনে এগিয়ে, শ্মশানের ভাঙা মন্দিরটা বাঁয়ে বেখে ডানদিকে গলিব মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই ঘটনাও নিষ্কৃতি দিল না। মা ও মেয়ে দু'বকম দুঃসাহসিক আচবণে এক গুমোট দমবন্ধ আবহাওয়ায় কী দুঃসহ কাটিছে আমাব। হঠাৎই বদলীব অর্ডার পেয়ে যাওয়ায় আমি পালানোর একটা পথ পেযে যাই। চোখ কান বুঁজে চলে আসি আমাব আদি ও অকৃত্রিম শৈল শহরে।

যেদিন চলে আসি বাঁধেব বাস্তায উঠে যেতে যেতে দেখেছিলাম শ্মশান পারের ভাঙাচোরা মন্দিবটার বারান্দায বসে আছে রিমি। সঙ্গে অন্য কেউ। সে আকাশের চিল ওড়া দেখছে। অনন্ত নীলে মিশে যাচ্ছে যে চিল ডানা মেলে একটু একটু কবে।

সত্তার আবিষ্কার

ফিবে এসেছি আজ প্রায় ছ'মাস হল। আমার কিন্তু এখনো কোনো অবলম্বন নেই। সেই থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়। আজ আপিসে এসে একটা রেজিস্ট্রি খাম পেয়েছি। ঠিকানাটা বেশ চেনা হাতেব লেখা। আবার অচেনা অচেনা। খামটা খুলেই তাজ্জব বনে গেলাম — আমার মা জয়িতা আজ মাস খানেক হল আত্মহত্যা কবেছেন। আমার এ ক্ষতিটা হল কেবল তোমার জন্যে। আমার বাবা যে ঘবে আত্মহত্যা করেছিল ঠিক সে ঘবেই মা ... ।

সুব্রত কুমার রায়

আয়না

পলাশ নদীর ঢালু পার বেয়ে নেমে আসে। শীতেব নদী। জলের কোল বলতে গভীর খাত শুধু। কুয়াশার পর্দায় সাঁঝের ছায়াছবি এইমাত্র শুরু হয়েছে। একটু আগে পারে দাঁড়িয়ে পলাশ যখন গুলালচা'র খেয়াব অপেক্ষা করছিল তখন পশ্চিমেব আকাশপানে চেয়ে প্রকৃতিব প্রেক্ষাগৃহে নিজেকে একমাত্র দর্শক বলে মনে হচ্ছিল পলাশের।

সাইকেলটা কাঁধে নিয়ে ছোট্ট লাফে নৌকাব পাটায় পা রাখতেই দুলে উঠে নৌকা। আর একটু হলেই টাল সামলাতে না পেরে পলাশ পড়ে যেতো। গুলালচা' লগিব ঠেকায় নৌকাটাকে স্থিব কবতে কবতে বললো : আ আ করো কিতা, খাড়া রও।

'গতো হপ্তা আইলায় না ? খুব বাড় চাইছ্লাম তুমার'

নৌকাটা এখন আটাল মাটাল চলতে শুরু কবেছে।

'কলেজে ফাংশন আছিল চাচা'

'তে খবর এগুতো দিতায'

পলাশ শুধু একচিলতে হাসে।

পড়ন্ত রোদের 'রক্তিম আলোয় যেন কোথাও এক অন্য সময়, আবেক জগতের ইশাবা ছিল তখন। বৈঠাব ছপ্ছপ্ শব্দেব ছন্দ আর নৌকার দুলুনিতে পলাশেব মনে হচ্ছিল সে অচেনা অজানা কোন পথে চলেছে। দূবে পার জুড়ে ঘন ছায়া আর বহস্যময় কুয়াশা ধীবে ধীবে নেমে আসছিল নদীব উপবে।

পলাশ চাবপাশের এই বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে গোপন অলৌকিককে অস্বীকাব কবাব জন্যই যেন নৌকার গলুই ধবে শরীরটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ছুঁতে চাইলো নদীব জল আব তখনই স্বচ্ছতোয়া জল্মায় তার মুখটা দর্পণে প্রতিবিম্বিত কোন মুখেব মতোই ফুটে উঠলো। সেই মুখ যেন পলাশেব দিকে তাকিয়ে নি:শব্দ হাসিতে তাকে বিদ্রূপ করছিল আব সেই মুখ যতোই সে জলেব মধ্যে ঢেউ তুলে ভেঙ্গে দিতে চাইছিল ততোই জল্মার জল আয়নাব কাঁচেব মতো জমাট বাঁধছিল।

আয়নার সাথে শুধু পলাশ নয়, তবাইকান্দিব ইতিহাসও যেন কোন না কোনভাবে জড়িযে আছে।

আজ থেকে দশকুড়ি বছর আগে (হুই যিবাব ভইচালো চানুব ঘরোব পুতাত ভুবইতদি পানি উঠ্ছিল) যেদিন সাদা হাতিব হাওদায চড়িয়ে গিল্টি কবা ফ্রেমে বাঁধানো একটি বিচিত্র, বহস্যময জিনিস নিযে আসা হয়েছিল সেদিনের কথা তবাইকান্দিব 'বয়েসেব-গাছ-পাথব-নাই' যাদের তাদেব অনেকেবই মনে আছে।

পলাশ এই ইতিহাস শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে, তার বাবা শুনেছেন তাব বাবাব কাছ থেকে, দাদামশায় শুনেছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে, এইভাবে চৌদ্দ প্রজন্ম বাহিত এই ইতিহাস আজও তরাইকান্দিব কোন ছেলে হয়তো শুনছে তার বাবার কাছ থেকে।

সেদিন চড়কের মেলা থেকেও বেশী ভিড় হযেছিল ঘোড়ামারা মাঠে। ভুবনমোহনেব কোন এক পূর্বপুরুষ গ্রামসীমানায গিয়েছিলেন সেই মিছিলকে এগিযে আনতে।

সে কি বিচিত্র মিছিল !

মিছিলেব সামনে ছিল বঙচঙে জরিদার কাপড় পরা বাদকেরা। শিঙা, ঢোল, কাঁসব, বাঁশি আব আম আঁটিব ভেঁপুর শব্দে যতোই গ্রামেব দিকে এগিয়ে আসছিল সেই অদ্ভুত মিছিল, ততোই ভিড়

বাড়ছিল। লাল মখমলেব হাওদায় বসা সেই বিচিত্র জিনিসটা ছিল সত্যিই দেখাব মতো। বিকেলেব সূর্যকিরণ যেন শত-সূর্য হয়ে ঠিকবে পড়ছিল সেই জলেব মতো মসৃণ কিন্তু জমাট সীসাব মতো শক্ত জিনিসটা থেকে। আব এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে নিজেব আবেগকে আব সেদিন ধরে রাখতে পাবেন নি, তবাইকান্দিব জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষ পাগলা সিতু। প্রচণ্ড কোলাহলেব মধ্যেও তাব আবৃত্তি করা সুললিত গীতাব স্তোত্র — দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদযুগপদুত্থিতা-সবাব কানে পৌঁছেছিল। শ্লোকটি জোরে জোবে পড়াব পব পাগলা সিতু আবাব আপন মনে শ্রী ভগবান উবাচ এই কথাটিব পব মাথামুণ্ডুহীন কথাব তোড়ে জমায়েত সেই দর্শকদেব একটু হলেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

সেদিনেব সেই বিচিত্র মিছিলের আকর্ষণেব কেন্দ্র ছিল আবও কিছু। সুসজ্জিত হাতিব সামনে ঘোড়ায় চড়ে হাত নাড়তে নাড়তে আসছিলেন যে মানুষটি, নিরুদ্দেশ হওয়ার পব সেই গোকুলচন্দ্র নাথ সম্পর্কে তবাইকান্দিব মানুষেব কৌতূহল যথেষ্টই ছিল। ভাগ্যসন্ধানে তাব দেশভ্রমণেব কাহিনী লোকমুখে বেশ প্রচাবও হয়েছিল। অবশেষে সেদিন গোকুলচন্দ্রকে মিছিলেব সামনে দেখে সবাই আশ্বস্ত হয়েছিল, ঘবেব ছেলে ঘবে ফিবে এসেছে। পবে, তবাইকান্দিব জ্ঞানীগুণীরা জানতে পেবেছে সেই বিচিত্র বস্তুটি ঈজিপ্ট-এব প্রচীন শহব তেল-আল-আমবানা থেকে বোমকসাম্রাজ্য হয়ে দামাস্কাসেব মধ্য দিয়ে অবশেষে ভেনিস এবং বেলজিয়াম হয়ে পৌঁছেছে তবাইকান্দিতে। গোকুলচন্দ্রেব সেই গৌববময় ইতিহাস তবাইকান্দির কেনা জানে।

ঘোড়ামাবা মাঠেব যেখানে চড়কগাছ পোঁতা হতো সেখানে জিনিসটা একটি সুদৃশ্য কাঠের চেয়াবেব উপর বসানো হয়েছিল। তাবপব গোকুলচন্দ্র একটা চোঙ্-এ মুখ লাগিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, যাবা জিনিসটা দেখতে চায় তাবা যেন সবাই এক নয়া পয়সা কবে মাহুতেব (যে গোকুলচন্দ্রেব সঙ্গে সেদিন এসেছিল) হাতে দিয়ে লাইন ধবে একে একে এসে জিনিসটা দেখে যায়। এই ঘোষণাব পব কেউ দৌড়েছিল তাব ঘবে, উত্তব পোতার ঘরেব খুঁটি কেটে জমানো পয়সা বাব কবতে, কেউ তাব ঠাকুবঘরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে জমানো পয়সা আনতে, কেউ ফটিক ঘবেব মেঝে খুঁড়ে মাটিব ঘড়া থেকে লুকানো বাদশাহী মোহব আনতে, কেউ মাজনেব ঘবে দুই ‘কাটি’ ধান দিয়ে পয়সা আনতে, আব মুহূর্তের মধ্যেই, তাব ফলে, কাবো উত্তব পোতার ঘব হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল, কারো ঘবেব মেঝেতে মাটিব ঢিবি, কাবো লক্ষ্মীঘবেব ঝাঁপি তছনছ হয়ে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়েছিল সেদিন।

তবাইকান্দিব সবচেয়ে রূপসী মেয়ে কনকবালাব শবীবেব গমক-এব সঙ্গে পয়সার দেমাকও আছে। আঁচলেব খুঁট থেকে সেই প্রথম এক নয়া পয়সা মাহুতেব হাতে জমা দিয়ে বিচিত্র জিনিসটা দেখতে যায়। শাড়িটা গাছ কোমব বেঁধে শবীবে লাস্য তুলে মাহুতেব দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখেব বিদ্যুৎ খেলে কনকবালা এসে দাঁড়ায় চেয়ারে আসীন জিনিসটাব সামনে। আর তার পরই হাতে তালি মেবে আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে।

‘কি যাত্ সোন্দব লাগেব্!’

কনকবালাব কথা শুনে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল সবাই। কনকবালা সুন্দবী, একথা কনকবালা কখনো বলেনি সবাই কনকবালাকেই বলেছে। আজ কনকবালাব মুখে সুন্দব কথা শুনে সবাই ধরে নিল কনকবালা নিজেই নিজেকে সুন্দব বলছে। তবাইকান্দিতে এরকম কথা সেদিনই প্রথম শোনা গেল। কনকবালা তাবপব ঘুবেফিবে বাববাব শুধু একবাব নিজেব দিকে একবাব ওই বিচিত্র জিনিসটা দেখে।

গ্রামের মানুষ যাবা এবমধ্যে পয়সা জোগাড় করে ফেলে লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তারা কনকবালাব বকমসকম দেখে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল।

‘হবো হরো অখন আমবাবেও দেখতে দেও’ —

গোকুলচন্দ্রেব ধমকে নেশা ভেঙ্গেছিল সেদিন কনকবালাব। তখনও সে সমানে চেঁচিযে যাচ্ছে। ‘আয়নাখালোব পানিত থাকিও সাফ দেখা যায়’

তারপর জিনিসটা যাবাই দেখেছে বোবা বনে গেছে।

সেকি আতংক সবাব মনে। তবাইকান্দিব মানুষেব মতো দেখতে, ধুতি, লুঙ্গি, শাড়িপবা সেইসব মানুষ কোথায় ছিল এতদিন, এখনই বা কোথায় আছে — এ নিয়ে ভযংকব তর্ক শুরু হয়েছিল সেদিন ঘোড়ামাবা মাঠে।

‘মানু ইতা কই আছোইন ই ফযসলা খেডুলউগো ভাঙ্গিলাইলেউতো অইযাইবো’ কথাটা কানে যেতেই হুঁশ ফেবে গোকুলচন্দ্র নাথেব। ফের চোঙ্ মুখে নিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় জিনিসটা কী। সবকিছু

শুনাব পর তরাইকান্দির উত্তেজিত মানুষেরা সামান্য হতাশই হয়ে পড়ে। 'ই আব অমন কিতা, খালোর পানিত চাইলেউতো মু দেখা যায়' জিনিসটাব বিদেশী নাম কারও পছন্দ হয়নি। খাল মানে আয়না খাল — তরাইকান্দির নদী। অবশেষে কনকবালাই জিনিসটার নাম দিলো আয়না। রূপসী কনকবালার নামের সঙ্গে সেদিন থেকে আরও একটি গুণবাচক শব্দ জুড়ে গেলো— বুদ্ধিমতি। আয়নাখালের খাল কেটে শুধু আয়না। সেদিনই চণ্ডীমণ্ডপে মুরব্বিরা বসে ঠিক করলেন তরাইকান্দির একমাত্র নদী আয়নাখালের নাম পাল্টে রাখা হবে জল্মা। মুরব্বিদের মাথা সংস্কৃত পণ্ডিত লালমোহন ন্যায়রত্ন পঞ্চশাস্ত্রী নামকরণটা করে তার ব্যাখ্যা করে দিলেন।

'সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্, জলোর পথ বর্ণনা করিয়া কালিদাস কইত্রা খিন্ন: খিন্নঃ শিখরিষু পদং, শিখর থাকিয়া জল ক্ষীণধারায় নামিয়া আয় নদীত, যে জল আমরার মা .....'

তরাইকান্দির অনেকের মতেই এর পর থেকেই দেশের ভাগ্যবিপর্যয়ের শুরু। যে আয়নাখাল ছিল শান্ত, ফটিক জলের নদী সেই আয়নাখালই নাম বদলে জল্মা হওয়ার পরই বর্ষায় ফুলেফেঁপে ভাসিয়ে নিতো দু'কূল। সেই বছরই অনাফসলে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাকে তরাইকান্দির লোক সভয়ে মন্বন্তব বলে। তারপর থেকে জল্মার জল থাকে ঘোলা, কাকপক্ষীব ছায়াও সে ধরেনা।

আর গোকুলচন্দ্রের সেই বিচিত্র জিনিসটি আয়না নাম নিয়ে গোকুলচন্দ্র নামের বাড়ী থেকেই সমগ্র গ্রামের উপরই কর্তৃত্ব চালাতে থাকলো। যেন, তারপর থেকেই, তরাইকান্দির সব সহজ সরল ভালোমানুষগুলো চলে গিয়েছিল আয়নার ভেতরেব কোন এক অদৃশ্য জগতে আর তরাইকান্দির মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু ক্রূর, ধূর্ত, কি বিকৃত, খল মানুষগুলো আয়নাব ভেতব থেকে বেবিয়ে এসে জুড়ে নিয়েছিল তাদেরই জায়গা। তরাইকান্দির যে ক'জন মহৎ মানুষ আয়না থেকে সভয়ে নিজেদের দূরে রাখতে পেরেছিল তারা তরাইকান্দির আয়না পূর্ববর্তী সময়কে সত্যযুগ আর আয়না পরবর্তী সময়কে কলিযুগ বলে।

তার পরের দুশো বছর জুড়ে শুধু দাঙ্গা, মৃত্যু, ধর্ষণ, শিশুহত্যা, গণহত্যা। আর মৃত্যু যেমন রাক্ষসের বংশের মতো ঝাড়েমূলে বাড়ছিল তেমনই গোকুলচন্দ্রের গিল্টি কবা বিশাল মানুষ মাপের ওই আয়না থেকেই জন্ম নিয়েছিল আরো ছোট ছোট আয়না, আয়নার মানুষের জন্য এক একটি আয়না। আর সেই আয়নাগুলোই যেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কোন এক নিশারাতে শযতানেব অনুচরদের পাঠিয়ে ধর্মের নামে একটা বিশাল দেশ ভাগ করার গোপন মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আয়নামানুষদের আর তারপর তরাইকান্দি অদ্ভুত এক পাগলামিতে মেতে উঠেছিল। জল্মার জল সেদিন রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল সমস্ত গ্রাম। আর আজ পলাশ নৌকা থেকে ঝুঁকে জল্মাব জলে সেই রক্তের কোন চিহ্ন দেখে চিনে নিতে চাইছে, তার পরিচয়, তার পিতৃমাতৃহীন বেজন্মা জীবনেব কোন রক্তসূত্র। সুতোর মতো সরু চিড়টা দেখে আতংকিত হয় পলাশ। মনে হয় যেন আয়নার ওই চিড় তার চেহারাকে দ্বিখণ্ডিত করতে চাইছে, যেন ইশারা করছে তার চেহাবার আদলেব সাথে আবেকটি চেহারাব মিলের দিকে।

এ নিয়ে ভাবলেই পলাশ তার মাথার ভিতর সহস্র কাঁকড়া বিছের কামড়ের যন্ত্রণা টের পায়, আর তারপরই এক ধরণের খুনে রাগ জমা হতে থাকে। গোকুলচন্দ্রেব শেষ বংশধব পরেশচন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে।

'মামী ও মামী আয়নার আব ভাঙ্গি গেছে'

মামী পলাশের উৎকণ্ঠায় বিরক্ত হন। রান্নাঘর থেকেই নিজের মনেই উত্তর দেন। 'আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া আর কতো চুলো বাউগ তুলতায়। কালা মু লইয়া তো জন্মিছো, বংশোর বাত্তি-হুঃ'

পলাশ চিরুনি ছুঁড়ে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে। কান্না গুমরে উঠতে থাকে তার ভেতরে। মাটির কলশ ভাঙার শব্দ, কাঠের নীচে আস্তে আস্তে মা'র শরীরটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, বটগাছটার নীচে বাঁধানো বেদীতে বসে ঠাণ্ডায় তার দাঁতে দাঁতে লেগে যাওয়া, আর ভেতর থেকে উঠতে থাকা এই গুমরানো কান্না স্মৃতি আর বাস্তবের হাডুডু খেলা হতে থাকে পলাশের মধ্যে। ডাক পাড়তে পাড়তে একবার এ ঘরে তো একবার ওঘরে।

প্রায় বৃদ্ধ পরেশচন্দ্র পুকুরঘাটে বসে ভুরিতে তেল মাখেন। তেল মাখবার আগে সেই সোনার রঙের সর্ষে তেল ডানহাতের তালুতে নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যেন সূর্যকিরণ মিশিয়ে নেন তেলে, তারপর প্রায় উলঙ্গ শরীরে তেল মর্দন করতে থাকেন পরেশচন্দ্র। তার সেই তেলচকচকে তামাটে শরীর যখন পুকুরের ঘাটে নিবিষ্ট হয়ে শেষ সিঁড়ির ধাপে দাঁড়াবে, তখনই প্রায় নিয়মিত একটি কেঁচোর

ল্যাদা তার শরীরে আছড়ে পড়বে। পরেশচন্দ্র কপট রাগ দেখিয়ে ভয়ংকর গর্জন তুলে যখনই পেছন ফিরে কাপালিক ভঙ্গীতে দাঁড়াবেন, তখনই পলাশরা ছুটে পালাবে। আর তার ঠিক পরই পরেশচন্দ্র সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠবেন। আর সেই হাসির শব্দে তাড়িত হয়ে বয:সন্ধিতে দাঁড়ানো পলাশ পালাবে, বন-বাদাড়, খাল-বিল, তেপান্তর পেরিয়ে পালাবে।

পরেশচন্দ্র পলাশকে আজও এক ঝলক দেখে এক আবিল স্মৃতির ঘেরাটোপে নিজেকে খুঁজে পান। পলাশের প্রতি এক পরম অনির্দিষ্ট মমতা তার ভেতরে উথলে ওঠে। একসময় এই আবেগ চোখের বাঁধ ভেঙ্গে পুকুরের জলে কান্না-হাসিতে মিশে যেতে থাকে আর অশ্রুজলে পুকুরের পাড় উজিয়ে জল ছুটতে থাকে জল্মার দিকে, আর কোন এক বন্যার সংকেতে জল্মার জল ক্রমে ফুঁসতে থাকে, শাসাতে থাকে পুরো তরাইকান্দিকে।

পরেশচন্দ্র একটা মস্ত আয়নাশাসিত বাড়ীতে একদম একা, অকৃতদার জীবনে ক্রমে ছেলেমানুষ হবার আকুলতায়, পলাশের আক্রোশময় পেছনে লাগার প্রতিক্রিয়ায় একা একা হেসে, কপট রোষকষায়িত মুখ করে আমোদ করেন। সে মূকাভিনয় আয়না ভিন্ন কেউ দেখে না।

পুকুরের জলের টলটলে আয়নাকে যেন ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাঙ্গতে চাইছিল পলাশ। একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে বেলা ঠাওর করার চেষ্টা করলো।

পলাশ এখন রীতিমতো যুবক। পশ্চিম গাঙপার মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবছরই সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

আজকেও জল আর কাচালংকা দিয়ে কোনমতে ভাত ঠেসে স্কুলে যেতে হবে।

'পুযাটা হাবা দিনোর লাগি ইস্কুলো যাইতো' মামার কথায় দাঁতচাপা পাল্টা প্রশ্ন করেন মামী।

'তে?'

'না কইছ্লাম ঢেঁড়সও ভাজিযা দিলে একটু স্বাদতে খাইতো পারলো নে'

'গুষ্টির পিণ্ডি হইলোনে। আনে পড়া বানে পড়া কিগু না কিগু, যেগুর জন্মোর নাই ঠিক হিগুর লাগি দরদ দেখিয়া শরীর পুড়ি যাব'

পলাশ আর খেতে পারে না। হাতমুখ-কলতলায় ধুয়ে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। টিউবকলের পাম্প সে দিতে পারছিল না। এখন মনে হচ্ছে সাইকেল থেকে সে পড়ে যাবে। চকচকে নতুন রেলি সাইকেলটা মামা কিনে দিয়েছেন। মা.... মা। মামার জন্য দু:খ হয়। মামাদের ছেলেপুলে নেই — উঠতে বসতে মামীর খোঁখোঁচ — আটখুড়া, না-মরদ। আশ্রিত ভাগ্নেকেও মামীর মুখের চাবুক-জন জামাই ভাইগ্না...। মামা পলাশের কাছে যেন মাঝেমধ্যে ক্ষমা ভিক্ষে করেন।

'ম্যাট্রিক পাস করি লাইলে তোরে হোষ্টেলে দিলাইমু'

টিলাটা চড়ার মুখেই পলাশের সাইকেলের চেন পড়ে যায়। এতক্ষণ সব রাগ জমছিল, ভেতরে গুর গুর করছিল। এবার ঝরে। কিক্‌টা মারতে তিনপাক খেয়ে সাইকেলটা ঢালু বেয়ে ছেঁচড়ে পড়ে। অসিত 'আগুন' পাল ঠিক তখন কাঠের গেটটা খুলে বাড়ী থেকে বের হয়েছে। আর পলাশেরও মুখ ফস্কে, যেন অভ্যাসবশতই দু'দুবার বেশ জোরে — 'আগুন' — 'আগুন' বেরিয়ে যায়।

অন্যান্যদিন খুব বেশী হলে, হালার হালা—খবিচ্—মুখপোড়া এসব গালাগালি দিয়েই আগুন পাল আক্রমণ চালায়। আজ, কোন কারণ ছাড়াই চণ্ডাল রাগের মাথায় আগুন পাল 'পুঙ্গির পুত' কথাটা বলেই হুঁশ ফিরে পায়।

পলাশ তখন সাইকেলটা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগুন পাল পলাশের মুখ-চোখের রকম সকম দেখে গেটটা খুলে নিমেষের মধ্যে বাড়ীর ভেতরে – হাওয়া।

সাইকেলে উঠেই প্যাডেল মারতে থাকে পলাশ। পুঙ্গা কথাটার অর্থ পলাশের জানা ছিল না। যেদিন শব্দটার অর্থ তার কাছে প্রকট হয়েছিল, তার জীবনটাকে নিরর্থক করে দিতে, সেদিনের কথা ভাবলে এখনও তার গায়ের 'রোম' দাঁড়িয়ে যায়।

ন'টার পরই মাইঝগাঁও-এর এই রাস্তাটা নির্জন হয়ে পড়ে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছিল। নতুন সাইকেলের হেডলাইটের আলো মাটির কাঁচা রাস্তা চিরে এগোচ্ছিল। রাবলার বাবা বারণ করেছিলেন।

'এত রাইত যাইও না রে বা, রাস্তা ইগু বড় খারাপ'

মাটির রাস্তা, হয়তো বৃষ্টিতে দু'এক জায়গায় জল জমেছে। ও কিছু না, পলাশ ভেবেছিল, নতুন সাইকেল, একবার চেপে বসলে তাকে পায় কে ?

পোয়ামারার কাঠের পুলটা উঠার মুখে সামান্য চড়াই। প্যাডেলে জোরে চাপ দিতেই, লাইটটা নিভে যায়। সাইকেলে চড়াব সময় এমন ঘোরকৃষ্ণ বাত, পলাশ খেয়াল কবেনি। চরাচব জুড়ে ঘন অন্ধকার। পলাশকে সাইকেল থেকে নামতেই হলো। বলা যায না, পুলে না উঠে সে হয়তো খালেই পড়ে যাবে। বৃষ্টিটা এখন ছেঁচড়াব মতো পড়ছে। বাস্তাটাব ডানদিকে বাঁদিকে ন্যাড়া বন্দ্। ঘন কুয়াশা আব অন্ধকাবে মাঝেমধ্যে জোনাকির ঝাঁক। উপব দিকে তাকিযে মনে হলো, ঘন কালো মেঘের চাঁই হাজার মাইল বেগে দিশেহারা ছুটছে। আশেপাশে কোথাও কোন জনমনুষ্যি আছে বলে পলাশের মনে হল না। দূরে কাছে ঝিঁঝি'র বাজনা নির্জনতা আবও নিশ্ছিদ্র কবে তুলছে।

পলাশ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের বাঁ হাতে ধবে একটু ঝুঁকে পেছনেব চাকায় হুইল আটকে দেওয়া ডায়নামোটা দেখতে গিয়েই খেয়াল কবে ক্যারিয়ারের কাছে দাঁড়িযে একটা তিনচাব বছরের সম্পূর্ণ ন্যাংটা ছেলে তার দিকে তাকিযে হাসছে। সেই নি:শব্দ দাঁত বেবা হাসিকে তবাইকান্দিব ভাষায় 'বিজলানো' বলে, যা দেখলে শরীর রাগে চিড়বিড় করে, কানবেড় চড় মাবতে ইচ্ছে হয। অথচ, আশ্চর্য পলাশেব তেমন কিছুই হলো না। শুধু তাব মনে হলো, কাদামাটি মাখা ছেলেটিব মিশমিশে কালো শরীবে মধ্যে ওই জ্বলজ্বলে মার্বেলেব মতো চোখ দু'টি অস্বাভাবিক, প্রায় ভৌতিক। সম্মোহিত হওয়ার আগে কানেব কাছে সেই প্রথম ও শেষবার তাব মৃত মা'ব গলা ফিস্‌ফিস্ কবে বলে উঠেছিল – পালা, পালা। আব তারপব সাইকেলটা নিযে ঠেলতে ঠেলতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য পলাশ প্রথমে হাঁটতে থাকে, তাবপব ছুটতে থাকে। কিছুটা যাওয়ার পব, সে লক্ষ্য করে, তিন চাব বছবেব আবো অনেকগুলো বাচ্ছা ছেলে-মেযে তাব সাথে সাথে, ডাইনে বামে পেছনে ছুটছে। বাচ্ছাগুলো যেন মাটি ফুঁড়ে উঠছিল। অদ্ভুত সেই জ্বলজ্বলে স্ফটিকেব মতো উজ্জ্বল অথচ সবুজ শ্যাওলা ভাসা চোখ নিযে ছেলেমেয়েগুলো যেন তাব কাছ থেকে কিছু চাইছিল। ক্ষুধার্ত বুভুক্ষু এবং ছিঁচকে-দুষ্টুমি, শযতানি ছাড়াও তাদেব চোখে আবও কিছু ছিল—ক্রোধ, খুনে-আনন্দ, না আরও কিছু।

তাদের 'বিজলানো' ঘোড়ার বা বেজিব ডাকেব মতো 'হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ' হাসিব শব্দে মবিযা হযে ভিমরুল তাড়াবাব মতো বাঁ হাত, কখনো পা' ছুঁড়ে ছুঁড়ে —'ধুর ধুব-যা: যা:। কবতে কবতে যখন পলাশের মনে হচ্ছিল আব পালাতে পাবছেনা, তাব দম ফুবিযে আসছে — পারাপাবহীন হাওবে সাঁতবে সাঁতবে অবশেষে হাল ছেড়ে দেওয়াব মতো, যখন তাব মনে হচ্ছিল এই 'খবিচ্' বজ্জাত এবং ভুতুড়ে পোলাপানগুলো একটু পরই তাকে ধবে চিমটে, খামচে, কামড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে, ঠিক তখনই ঈশ্বরেব মতো একটি লণ্ঠন তার দিকে এগিযে এলো।

শক্ত সামর্থ বুড়ো মানুষটা তাকে ঠিক সময়ে ধবে না ফেললে পলাশ জ্ঞান হারাত। ভদ্রলোক তাকে দু'একবার ঝাঁকুনি দিতেই হুঁশ ফিবলো। বন্দ্ পেবিযে এই পোড়ো ছোট ছোট ঝোঁপঝাড় ভর্তি জায়গায় সে এলো কী কবে বুঝতে পাবলো না। অবসন্ন, বৃষ্টিতে ভিজে লতপতে পলাশেব মুখ থেকে সব শুনে ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনি:শ্বাস ফেললেন।

'জোর বাঁচছো বে বা, ই গাড়াউনিত আমি তোমাবে না দেখলে তো পুঙ্গাইনতে তোমাবে আইজ মাবি লাইলো নে'

পলাশেব গা'য়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে কববের উপর দাঁড়িযে আছে! শুধু কবব নয, বৃদ্ধ তাকে বুঝিয়ে বললেন — এখানে জারজ বাচ্চাদের গোব দেওয়া হয। আর এই বেজন্মার বাচ্ছাগুলোই মরে গিয়ে পুঙ্গা হয়।

'পিছে দি না চাইযা ঠাকুবের নাম জপিযা জপিযা যাও গিয়া রে বা'

কাঁচা রাস্তাটায় পলাশকে তুলে দিয়ে বৃদ্ধ সেদিন ঐ কথাই বলেছিল। আর আজ দিশেহাবা হযে রাগে আক্রোশে কাঁপতে কাঁপতে পলাশ পেছন ফিরে না তাকিয়েই পালাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল আগুন পালের মুখ থেকে বেরোনো 'পুঙ্গিব পুত' শব্দটি তার পেছন ধাওয়া করছে, একঝাঁক ছিচ্‌কে শয়তান পুঙ্গা ছেলেমেয়েব মতো। স্কুলে যাওয়া হলো না আজ।

প্ল্যানটা আগেই করা ছিল। পলাশেব মাথা থেকেই বেরিযেছিল বুদ্ধি। হয়তো বুদ্ধিব নীচে ধুযা দিয়েছিল পরেশচন্দ্রের প্রতি পলাশের গোপন আক্রোশ। পালোয়ান শংকর এসময় বাজার করতে যায়।

গাছ বাইতে সময় নষ্ট করেনি একদম। পলাশ চড়েছিল গাছে। আর ঝটপট গাছ থেকে পাঁকা

বাতাবিলেবু পেড়ে পেড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল নীচে দাঁড়ান গাজু, বাবলা, ঝিনুকের হাতে।

যখন পাকা লেবু খুঁজতে ব্যস্ত হঠাৎ একটা ধমকে পলাশেব ধ্যান ভাঙ্গে।

'কুত্তার বাইচ্চা, নাম'

গাজু বাবলাবা আগেই বিপদ বোঝে সটকে পড়েছিল। পলাশকে সেদিন মাবতে মাবতে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল শংকব। মারটা কখন থামতো কে জানে। পবেশচন্দ্র এসে শংকবকে থামিয়েছিলেন। পলাশের মনে হয়েছিল এটা পরেশচন্দ্রেবই চালাকি। ভালোমানুষ সেজে হাত কবতে চাইছেন তাকে। পলাশের হাতটা নিশপিশ করছিল, হাতেব কাছে একটা বাঁশের গল্লা থাকলে এক বাড়িতে মাথাটা দু'ফাঁক করে দিতো।

পবেশচন্দ্রেব কথাবার্তা এমনকি হাবভাব সবই তাব কাছে অভিনয় মনে হতো। কোন ক্লাসে পড়ে পলাশ তখন ? হাফপ্যান্ট পিছলে নেমে আসতো পাছা থেকে। পবেশচন্দ্র হাতে একটা পেযাবা নিয়ে ডেকেছিলে। ভযে ভযে কাছে যেতেই, বাঁ হাতে পলাশকে জড়িযে খুঁচো খুঁচো দাড়িভর্তি মুখটা ঘসে দিয়েছিলেন তাব কাঁচা মুখ আব ডান হাত দিয়ে একটানে খুলে দিয়েছিলেন তাব প্যান্ট। তারপব পলাশের কড়ে আঙ্গুল মাপের নংকু দেখে পরেশচন্দ্রের সেই গা কাঁপিয়ে হাসি।

হা: হা: হা:। পলাশ বাড়ীটার আশেপাশে গেলেই হাসিব শব্দটা শুনতে পায। পরেশচন্দ্রের নয়পুরুষ যেন হাসছে ভিতু পলাশকে দেখে, যেন সেই বিশাল ঐতিহাসিক আযনার ভেতব থেকে তাবা এখনও তরাইকান্দিকে ভাঙ্গছে, গড়ছে, আবাব ভাঙ্গছে।

সব কিছুব পেছনেই ওই আযনা। পলাশেব মনে হযেছিল ওই আযনাব কাছে গিযে মুখটা দেখলেই নিজের আত্মপবিচয খুঁজে পাবে, সে নয শুধু, তবাইকান্দির মাটিব নীচে সব বেজন্মাব বাচ্চারা যারা মবে পুঙ্গা হযে গেছে।

বোদ ঝিম্ মেরে আছে, অপেক্ষা কবছে কিছু ঘটাব। গাজুই বাজিটা ধবলো।

'বেটটা অইলে যা, বাজ্জি' —

ঠিক হলো পলাশ পবেশচন্দ্রের ঘবেব ভেতব থেকে চক্কব লাগিযে আসতে পাবলে গাজু তার 'সিন্ভর্তি' বইটা দিযে দেবে। গাজু একদিনই কিছু সময়েব জন্য বইটা স্কুলে তাদেব দেখিয়েছিল। তাবপব কযেক বাত পলাশ ঘুমুতে পাবেনি, ছবিগুলোব নগ্ন মেযেবা যেন বাত্রে চোখেব ভেতব ভিড় জমাত। বইটা পুবো দেখতে পাবেনি তাবা, তাব আগেই গাজু এক ঝাপ্টা মেবে পত্রিকা দিযে মলাট দেওযা বইটা নিযে নিযেছিল। একটা পাতাব কিছুটা ছিঁড়ে পলাশের হাতে চলে এসেছিল সেদিন। সেই টুকবোটা এখনও লুকিযে চুরিযে মাঝেমধ্যে দেখে — একটা বিশাল বুক আর পেটেব অর্দ্ধেক হযে ডানদিকটা, পাযেব পাতা অব্দি।

প্রাণেশ খুব উস্কে দিতে জানে।

'ডবাছ কিতা, আউলি গল্ফো ওতা মাথাত না আনলেউ অইলো' আউলি গল্ফো মানে পবেশচন্দ্রেব আয়না বাড়ীব গল্প। আযনাটাই পবেশচন্দ্রেব প্রাণভোমরা। গ্রামে মুখ থেকে মুখে এই গল্প বাড়তে বাড়তে এখন ঝুবিভর্তি প্রাচীন বটগাছ, যাব ছড়ানো পাযের পাতায সিঁদুব লেপা, সিন্নি আর মানতের পযসাব ঝন্ঝন্। কে জানে কখন এই গল্পটা বটে গিয়েছিল, আর গল্প থেকে জন্ম নিয়েছিল ভয আব ভয থেকে ভুতুড়েপনা। সেই ঐতিহাসিক আযনাব ভেতব পরেশচন্দ্রের ভুতুড়ে পূর্বপুরুষদের আত্মাবা নাকি বন্দী হযে আছে আব ওই প্রাচীন আযনাব সামনে একবাব দাঁড়ালে রক্ষা নেই, আয়নার ভেতরে তোমাকেও টেনে নিয়ে যাবে তাবা।

প্রাণেশের কথা শুনে পলাশ হাসলো। সে হাসিব মধ্যে অভিনয যতোটা ছিল বিশ্বাস ততোটা ছিল না।

বাবলা সাহস দিচ্ছিল। পরেশচন্দ্র নাকি এ সময়ে গাইঞ্জা আনতে সাধুটাব কাছে যায়, আব বাড়ীতে যে কেউ নেই এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে. একবার জানালা টপকে ঢুকে পড়লেই হলো।

গাজু বাবলা, প্রাণেশ বাগান অবদি এগিযে দিয়েছে তাকে। জানালাব চৌকাঠে পা'টা বাখতেই পলাশেব বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে শুরু করলো। একবাব ভাবলো ফিরে যাবে, কিন্তু এখান থেকে পালালে ভিতু বদনামটা সাবা তরাইকান্দিতে রটে যাবে।

বারান্দা পেরিয়েই বড় ঘব। ঘুলঘুলিব ফাঁক দিযে যে আলো আসছিল তাতে আলো আঁধারেব এক গা ছমছমে পরিবেশ তৈবী হয়েছিল। পুবানো কাঠেব বাড়ী, বংচটে যাওয়া ঘুণে খাওযা কাঠের

খুঁটিগুলোর নীচে নাকি বলি দেওয়া শিশুর রক্ত দেওয়া হয়েছিল। পলাশ শিউরে ওঠে। কাঠেব ছাদের উপর দিয়ে কিছু সর্‌সর্‌ করে হেঁটে যায়। বাড়ী রাখাল।

বড় ঘরটায় দরজার ঠিক মুখোমুখি কোন মহামূল্যবান ছবির মতো একটা কালো আবলুশ কাঠের টেবিলের উপর পলাশের মাথার উচ্চতায় আয়নাটা দাঁড় করিয়ে রাখা। আয়নার পাশে দেওয়ালটায় দু'দুটো হরিণের শিঙওয়ালা মাথা। ঘরের ডানদিকে কাঠের উপর ময়ূরের সাজ তোলা বিশাল পালংটি শূন্য। ঘরে যে কেউ নেই বারান্দায় পা রেখেই বুঝেছিল পলাশ। এবার সাহস করে ঘরে ঢুকে পড়লো। চকচকে সোনালী রং-এর গিল্টি করা বিশাল আয়নাটি যেন তাকে ডাকছিল। পলাশ যেন বুঝতে পারছিল, ওই আয়নাটির সামনে একবার দাঁড়ালে সে তার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জেনে যাবে। তার আত্মপরিচয়ের চাবির সন্ধান ওই আয়নার ভেতরেই আছে। ঘুলঘুলি থেকে আলো সরাসরি এসে পড়েছিল আয়নার কাঁচে, যেন কোন সিনেমাহলের প্রজেক্টর মেশিন থেকে মাটির সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণ কবে আলো এসে পড়ছিল রূপোলী পর্দায়।

বুকটা এত জোরে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছিল যে পলাশের মনে হচ্ছিল যেন সেই শব্দে সারা ঘর ভরে উঠেছে। থিয়েটার হলে ছায়াছবির টাইটেল মিউজিকেব মতো। আয়নার কাঁচে পলাশের মুখটা ফুটে ওঠার পরই হঠাৎ পলাশের খেয়াল হলো আয়নায় তার মাথা বাদ দিয়ে উপরটুকু জুড়ে পরেশচন্দ্রের বিশাল মুখ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

একটি মুহূর্ত শুধু, প্রচীন কোন সাদাকালো ফটো যেন, দু'টি মুখ, প্রৌঢ়ের থুতনি ছুঁয়ে নেমে গেছে সদ্য গোঁফের রেখা ওঠা আরেকটি কচি মুখ। আর সেই মুহূর্তে পলাশ শেষবারের মতো তার আত্মপরিচয় জানতে পেরেছিল এবং সেই জানাই ছিল চূড়ান্ত।

তার ঠিক পরই, এক বিকট আর্ত চিৎকার দিয়ে পবেশচন্দ্রকে এক ঠেলায় ছুঁড়ে ফেলে পলাশ পাগলেব মতো ছুটে গিয়েছিল বাড়ীতে।

জংধরা পুরোনো ট্রাঙ্কটা খুলে মায়ের কাপড়জামা, কাগজপত্রের মাঝে খেপাব মতো খুঁজতে খুঁজতে ঘরেব মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল সব। কী খুঁজছিল, পলাশ নিজেই জানে না।

মামী ঘবে ঢুকতে সাহস পাননি। মামাকে ডেকে এনেছিলেন। বাবলা ভযে আতংকে সব বলেছে পলাশের মামাকে। আয়নার ভূতে ধবেছে পলাশকে, নয়তো পবেশচন্দ্রেব বাড়ী থেকে বেবিয়ে টিলার পেছনটা দিয়ে ছেঁচড়ে, হাত-পা কেটেকুটে লাল জবা ফুলের মতো চোখ করে ছুটতো না বাড়ীর দিকে। ঘরের ভেতরে ঢুকে পলাশের মুখ চোখেব রং দেখে ভযই পেয়ে গিয়েছিলেন মামা। চিড়ধবা ছোট আয়নাটা দেওয়ালে ছুঁড়ে ফেলে ভাঙ্গার পরই ছুটে গিয়ে ধরেছিলেন পলাশকে। টেনে নিযেছিলেন বুকে।

'কেনে ই বাড়ীতে গেলে তুই, কিতা অইতো ইতা জানিয়া'

গলা ধরে এসেছিল মামাব। পলাশ হাউমাউ কবে কেঁদে উঠেছিল।

'মামাগো আমাব কিতা দোষ'

তার পবদিনই পরেশচন্দ্রের ঘরে রাখা ঐতিহাসিক আয়নাটিকে এক নির্ভুল টিপে ঢিল ছুঁড়ে চৌচির করে দিয়েছিল পলাশ।

গিল্টিকরা সুদৃশ্য ফ্রেমের চৌচির কাঁচে মাকড়সা – জাল ফুটে উঠার পরই হঠাৎই এক দমকা বাতাস শোঁ-শোঁ শব্দে পরেশচন্দ্রের উত্তরকোণার আমগাছেব ডালটা মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে জল্‌মার ঘোলা জলকে টল্‌টলে করে, তরাইকান্দির মানুষদেব বদলে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগর হয়ে অন্য মহাদেশে। আর আশ্চর্য আয়নার ঝুরঝুরে কাঁচের মতো তারপর থেকেই দিনের পব দিন ভেঙ্গে পড়তে থাকেন পবেশচন্দ্র, যেন তার প্রাণের আয়ুর সাথে ওই আয়নাটির সত্যিই কোন রহস্যময় সম্পর্ক ছিল। তিনি রুগ্ন ক্ষয়গ্রস্ত মানুষের মতো বড় ঘরের ঘুণেধবা ইজি চেয়ারটায় বসে তাকিয়ে থাকেন চৌচির আয়নাটির দিকে, যেন খুঁজতে থাকেন কোন হারানো মানুষকে, ফ্যালফ্যাল করে। তার মুখের ঠিক নীচে পলাশের মুখের জায়গায়, পুরোনো ফটোর মতো, আরও একটি মুখকে যেন তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পান।

এই আয়নাই সূচনা করেছিল একটি অমোঘ ক্ষণকালীন শারীরিক সম্পর্কের। সাদা শাড়িপরা সেই শরীরের ছটফটানো, যেন বেড়ালের থাবার নীচে জালালী কবুতর, পুরো আয়নার ভেতবে তোলপাড় তুলছিল, আর আয়নার কাঁচ থেকে যেন পরেশচন্দ্রের মৃত কয়েক পুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রায় বিবস্ত্র একটা নারী শরীরের উপর, তারপর টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওই আয়নার ভেতরে। সেই শীৎকাবের ধ্বনি

একটি ক্লান্ত ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাস পবেশচন্দ্রের মুখ থেকে বেবিয়ে এসে ছুঁযে থাকে কাঠের ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা টানাপাখাকে।

সেই ভেঙ্গে পড়া আয়না আব তার অন্ধকাব অতীত থেকে কিছুটা দূরে সবে গিযেছিল পলাশ। একটা নদী, তারপর কাঠের পুল, ধানখেতেব মাঝবরাবব বর্ডাব বোড, জেলাশহব, তারপ্রান্তে কলেজ, তাব-বিশাল দিঘীর পার এবং হোষ্টেল। এই ছিল পলাশ আব তার অতীতের মধ্যেকার দূবত্ব। মাঝেমধ্যে বাড়ী আসা, পুরোনো বন্ধুবান্ধব এবং আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হযে আসা একটা গ্রাম। এর মধ্যেও এডভেঞ্চারের নেশা পলাশের রক্তে থেকেই গিয়েছিল।

ববি, ঝিনুকদের টানাটানিতে সামান্য দ্বিধান্বিত পলাশ বাজী হয়ে গিয়েছিল। বাবলার জায়গা তাকে নিতে হবে। একটু অন্যধবণের অভিজ্ঞতা, গপ্‌সপ্‌ কবে দারুণ কাটবে। মাঝেমধ্যে তিন পাত্তি। তরাইকান্দিতে কয়েকটা ডাকাতি হবার পরই এই ব্যবস্থা। ভিডিপিব বাউণ্ডে খেযেদেযেই বেরিয়ে পড়েছে তারা।

শীতেব রাত। কুয়াশার ভেতব দিয়ে গুঁড়ো দুধের মতো জ্যোৎস্না পড়ছিল। জল্‌মার জলে ওবকম চাঁদ ভাসতে কোনদিন দেখেনি পলাশ। বাত একটার পব আর জাগতে পারবে না, আগেই বলে বেখেছিল পলাশ। পরদিন কলেজ। রবি, পানু এগিয়ে দিতে চেযেছিল তাকে, সেই বারণ করেছিল। মণি টিপ্পনী কেটেছিল, 'বেটি নি লগে যাওয়া লাগবো'। চোখেব পাতায সামান্য তন্দ্রা এসে ভারী করছিল। একটু ভয়ও লাগছিল তাও বুকে হাত দিলেই বোঝা যায়। টিলাটার পাশ দিয়ে তাকে যেতে হবে। টিলার পেছনটা, চোখ বুজলে দৃশ্যটা মনেব ভেতর তৈরী হয। বসে থাকা শবীবটার উপব মাটি পড়ছে, মাটির ভেতর মিশে মিশে যাচ্ছে পবেশচন্দ্রেব শরীর।

যে লোকটার কাছ থেকে সাবাজীবন পালিয়ে বেড়িযেছে, সেই লোকটা মবে যাওয়াব পব এখনও পালাবে? পলাশ রুখে দাঁড়ায়, আব কতো হারবে সে।

পা'চালাতে চালাতেই স্মৃতিটা হানা দেয, নাছোড় ভযের মতো। পবেশচন্দ্রের আয়ু ফুবিয়ে আসছে শুনতে পেযেছিল পলাশ। প্রাণপাখিটাকে আযনাব খাঁচা থেকে সেই মুক্ত কবে দিয়েছে। পবেশচন্দ্রের মৃত্যুরই যেন সে অপেক্ষা কবছিল। যদিও সেদিনই কেন সবাব অজ্ঞাতে তাকে দেখতে গিয়েছিল তা পলাশ জানে না। হযতো মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো একটা লোকেব পরাজযকে দেখতে, অথবা হয়তো সে দেখতে গিযেছিল পবেশচন্দ্রেব মুখেব আদল ভেঙ্গেচুবে তাব মুখ থেকে কতটা বদলে গেছে, যেন বা পবেশচন্দ্রের মুখটাই সেই আয়না যাব সামনে দাঁড়িযে সে একবাব শেষবারেব মতা বোঝাপড়া কবতে চাইছিল। আব আশ্চর্য, পলাশ সেই বড়ঘবটায় ঢোকাব ঠিক আগেই মালতীর মা-ও সেই অন্তিম নাটকীয দৃশ্যেব বাইবে সরে পড়েছিল।

বিছানার সাথে মিশে যাওয়া একটি ঘুমন্ত কঙ্কালেব যতো কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল পলাশ, ভেতবের একটা আগ্নেয়গিরি থেকে গলন্ত টগবগে লাভা তার চোখেব কোণ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বেরিয়ে আসছিল। বিছানার ঠিক পাশটায় দাঁড়াবাব পরই হঠাৎ চোখ মেলে পলাশকে দেখতে পেযেছিলেন পরেশচন্দ্র। পলাশেব মনে হয়েছিল যেন চিনতেও পেরেছিলেন তাকে।

আব তখনই পরেশচন্দ্র দেখলেন তার বিছানাব পাশে গিল্টিকবা সেই আয়নার চকচকে নিটোল কাঁচের ভেতব থেকে একটা ছাযা বেরিয়ে এসে তার মুখে নাকে সজোরে কিছু একটা দিয়ে চেপে ধবছে। দমবন্ধ হওয়ার আগে পরেশচন্দ্র আযনাটির কাছে শুধু একটু জল চেযেছিলেন।

সেই ছটফট কবতে থাকা নীল হযে যাওয়া মুখেব আফোটা কোন শব্দ পলাশের কানে গুমরে উঠার আগেই পলাশ এক ঝট্‌কায় বর্তমানে ফিরে এসে দেখলো টিলাটাব নীচেই চলে এসেছে সে।

ডাইনে বাঁমে না চেয়েই ঢিব্‌ ঢিবে্‌ বুক নিয়েই টিলাটা পেরিয়ে যেতো পলাশ, কিন্তু ফটফটে জোছনার মধ্যে চোখের কোণ ছুঁয়ে যেন টিলাব উপরে কাবো আবছা ছাযামূর্তি ভেসে উঠলো। চূড়ান্ত আতংক নিয়ে পলাশ চোখ তুলে তাকাতেই স্পষ্ট দেখতে পেলো টিলাব উপবের গোবস্থান থেকে পরেশচন্দ্র হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছেন। সেই লোমশ বুক, কাঁচাপাকা চুল, সাদা চওড়া গোঁফ নিয়ে পদ্মাসনে বসে থাকা পরেশচন্দ্র, তাকে ডাকছেন। ভয়ের বিদ্যুৎ আছড়ে পড়ার পরই এক মরিয়া আক্রোশে শবীর থেকে খাদির চাদরটা ঝেড়ে ফেলে পলাশ মুখ দিযে বোমাশব্দ কবে টিলা দিয়ে আছড়ে পিছড়ে উঠতে থাকলো। কতক্ষণ, পলাশ জানে না। খানিক পরই যখন সে বুঝতে পারলো কবরটাব ঠিকপাশেই দাঁড়িয়ে আছে, তখন শীতল ভয়ে জমাট বাঁধাব আগেই হাতের লাঠি বাগিয়ে শরীবের সব শক্তি নিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়লো পরেশচন্দ্রের উপর। চেতনা ফিরে এলে পলাশ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলো পরেশচন্দ্রের গোরেব উপর একটা কলাগাছ ছিন্ন ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। আর অদ্ভুত, সে শুনতে পেলো সামনের জীর্ণ-ভেঙ্গে-পড়া প্রায় বাড়ীটার সেই বড় ঘর থেকে হা: হা: হা: অট্টহাসি। পরেশচন্দ্রেব গলায় এবং আরও কতজনেব গলাব সেই দমকা ঝড়ো হাসিব শব্দে লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে পলাশ পালাতে থাকলো, বন-বাদাড়-তেপান্তর পেরিযে।

হা: হা: হা:, হাসিটা যেন এইমাত্র আবাবও শুনতে পেলো পলাশ। জল্‌মার জল থেকে হাতটা তুলেই তার খেয়াল হলো সন্ধ্যার নির্জনতা আর আলো-আঁধাবের মধ্যে অনেকক্ষণ থেকেই নৌকাটা চলছে। এপার ওপাব হতে মিনিট পনেবো, অথচ আজ তাব মনে হচ্ছে নৌকাটা অনন্তকাল ধবে চলছে অথচ ওপারে পৌছুচ্ছে না।

সামনে বসে গুলালচা' নিবিষ্টমনে দাঁড় বাইছে।

'কিতা অইলো গুলালচা' পার লাগাও'

পলাশেব কথাটা শুনে গুলালচা'ব শবীব থেকে যে মুখটা সামান্য ঘুবে তার কথাব জবাব দিলো।

এই মুখেব আদলটাব সাথে কখনো তাব পরিচয হযনি এমন বলা যায না, তবু কেন জানি পলাশের মনে হলো মুখটা গুলালচ'ার নয, আরো কাবো খুব চেনা কাবো, অথচ প্রচণ্ড অচেনা। এসব ভাবার আগেই পলাশের কানে অতীতে শোনা কারো গলাব স্ববে বলা কথাটা ভেসে এসেছিল।

'গফ্‌তো অখনো হেষ অইছে না হেষে কিতা অইলো হুনতায না নি ?' ওই হিমস্বব, মৃত মানুষেব কণ্ঠ শোনার পব পলাশ একবাব চাবপাশের দিকে চোখ মেলে তাকিযে ঘটতেথাকা অলৌকিক ঘটনাগুলোকে বাস্তবেব কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চাইলো আর তাবপবই সে স্তম্ভিত হযে দেখলো একটু আগেই যে পারটায় ঝোপঝাড়, গাছপালা ভর্তি ছিল সেই পাব জুড়ে আছে আযনা, সে দিশেহারা হয়ে ডাইনে, সামনে, পেছনে, উপবে তাকিয়েও দেখতে পেলো দিকচক্রবাল—চাবধাব জুড়ে আছে চকচকে কাঁচেব আয়না। এই প্রথম, ঘোবটুকু কাটিয়ে উঠে, সে শুনলো ছপ্‌ ছপ্‌ দাঁড়েব শব্দও হচ্ছে না। সেই নি:সীম মহাশূন্যের নীববতার মধ্যে সে দেখলো তারদিকে পেছন ফিবে বসা আবছা একটি কঙ্কালেব হাতেব বৈঠা থেমে আছে আব তাদেব নৌকা তীব্রবেগে বরফেব উপব চলতে থাকা স্লেজগাড়ীব মতো, জলেব বদলে আযনাব কাঁচেব উপব দিযে কোন এক আযনা পৃথিবীব দিকে এগিযে যাচ্ছে।

অলক দাশগুপ্ত

চিঠি

বাধাচন্দ্রনগর আসাব পর প্রথম ক'টা দিন বিস্তব অসুবিধা আব অস্বস্তি দুই-ই হতো তনুময়েব। এমন নির্জন গা ছমছমে বাত, ফাঁকা ফাঁকা বাড়ী-ঘব, ভাঙ্গাচোবা কাঁচা রাস্তা এসব পাড়াগাঁব অসুবিধেব সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছে তাব। এখন অবশ্য দিব্যি লাগে। ঘব থেকে দুপা ফেললেই বইয়ে পড়া আদর্শ গ্রামের মতোই পবিপাটি ধানক্ষেত। ক্ষেতের শেষে চকচকে সবুজ বন। তাব পেছনে অতিকায় লংতরাইয়ের চূড়াগুলো। অন্যদিকে আঠেবোমুড়া। বেশ পাগলা পাগলা ছোট্ট নদী ধলাই। তার পাড়ে সবসময় ঝিরিঝিরি বাতাস। প্রচুব আম আর কাঁঠাল গাছ। সবচেয়ে ভাল এখানকার নিশ্চুপ বাত আর বাতের জোনাকিব দল। তনুময়কে প্রকৃতিপ্রেমিক বা কবি মনে করার কোনও কারণ নেই। যদিও সে জুলোজীতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট তবু বইয়েব বাইবে সাপ, ব্যাঙ, লতা-পাতা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে কেউই দেখেনি। বন্ধুবান্ধবে ঘিবে থাকা আগবতলার বঙচঙে দিন যখন একটি মাত্র অ্যাপযন্টমেন্ট লেটারে মিলিয়ে গেল তখন থেকেই ববং বন, পাহাড় কিংবা জোনাকিদেব একটু-আধটু ভাল লাগতে শুরু কবল তার।

স্কুল থেকে ফেবাব পব বাড়ীওলাব মস্ত পুকুবটা তোলপাড় কবে আধঘন্টা সাঁতাব কাটার পব চৌকিতে হাত-পা ছড়িয়ে ঘন্টাখানেক আযেস। ততক্ষণে কাজেব মাসী এসে পড়ে। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে মাসীকে বাতেব মেনু বলে দেবাব পব তনুময তৈবী হযে নেয একটা চমৎকাব সন্ধ্যে কাটাতে। ইদানীং প্রতি সন্ধ্যেবেলাযই সে অজন্তাব বাড়ী যাচ্ছে। অজন্তা দেববর্মা তাব সঙ্গে একই স্কুলে চাকুবী কবে। খাসা দেখতে, কী ফিগাব! স্কুল থেকে ফিবতে এতোটা পথকে যে খুব একটা দীর্ঘ মনে হযনা তাব কাবণও ঐ অজন্তাই। অজন্তা এবং তনুমযেব এই ঘনিষ্ঠতা যে গ্রামেব মানুষদের অজানা তা নয, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেজন্য তনুমযকে কোন ঝামেলা পোহাতে হযনি। স্কুলেও যথেষ্ট গুঞ্জন — তনুমযেব তাতে বযেই গেছে। সে তৈবী ছেলে। তনুময কি অজন্তাকে বিযে কববে ?— দুস্, এতোটা এখনো ভাবেনি তনুময -- 'তোমাকে ভালোবাসি' গোছেব কথাবার্তা তনুময অজন্তাকেই তো আব প্রথম বলেনি। ছাত্রজীবনে ও তাব পর আবো বেশ কবাব, কমসে কম আবো চাব-পাঁচজন মেযেকেও বলেছে। বান্ধবীদেব বাড়ী গিযে প্রথমেই তাদেব বাড়ীব লোকজনকে এভাবে পটিযে ফেলে তনুময, যে তাবাও বলতে বাধ্য হয-'আহা তনুমযেব মতো ছেলে হয না।' অজন্তাব বাড়ীতেও তনুময সেই কাযদাটাই ফলিয়েছে, ফলে পবপব দুটোদিন না গেলে অজন্তাব মা ছেলেকে পাঠিযে খবব নেন। অজন্তাব দাদা অর্থাৎ সত্যবঞ্জন দেববর্মা গ্রামে বেশ কেউকেটা। পার্টি কবেন, পঞ্চাযেত মেম্বাব। তনুমযেব সাথে খুব জমে গেছেন আসলে তনুময়ই পটিয়ে ফেলেছে। এই গ্রামে এখনো 'ডাক্তব' আব 'মাস্টব'দেব বেশ সম্মান আছে নইলে অজন্তাব সাথে এই বাড়াবাড়ি বকমেব মেলামেশাব জন্য তনুমযকে নির্ঘাৎ আব কিছু না হোক টিটকিরি খেতে তো হতোই। ফেবার পথে বাধাচন্দ্রনগবেব ছোট্ট বাজাবে যদু ডাক্তাবের চেম্বাবে একবার ঢুঁ মেবে যায তনুময়। চেম্বার নামেই। বাঁশেব আট ফুট বাই ছয ফুট ঘবেব চালে ইযাবড় সাইনবোর্ড। দুখানা লম্বা বেঞ্চি, চারটে চেয়াব। ছোট্ট টেবিলে দুটো হোমিওপ্যাথি ওষুধেব শিশিভবা বাক্স নিয়ে বেশ খানদানি চেহাবাব একটা চেযাবে গ্যাঁট মেবে বসে থাকেন ষাটোর্ধ যদু ডাক্তাব। বুড়োকে এমন হাত করে ফেলেছে তনুময যে সামান্য সর্দি-জ্বরেও ফ্রি ওষুধ নিযে যায়। যদু ডাক্তাবেব চেম্বাবে সন্ধ্যেব পর গ্রামের মুবব্বি টাইপেব লোকদেব তুমুল আড্ডা বসে। যদিও তনুমযেব বযস তাদের হাঁটুর সমান, সবচেযে কমদিন সে এই গ্রামে এসেছে তবুও সেই কথা বলে সবচেয়ে বেশি। মাস্টাবেব ঝকঝকে কথাবার্তা হাঁ

করে শোনে অন্যরা। মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে তাব জ্ঞানের তারিফ করে। অবশ্য রাত আটটার পরই আড্ডা ভেঙে যায়। গ্রামেব লোকগুলো শহরের মানুষেব তুলনায় ঘুমোতে যায় অনেক আগে, ওঠে সূর্য ওঠারও আগে। তনুময়ের ঘুম আগেও কখনো সাড়ে সাতটার আগে ভাঙত না। এখন তাড়া দেবার কেউ নেই বলে সেটা পিছুতে পিছুতে আট সাড়ে আটে ঠেকেছে।

আড্ডা শেষে ঘরে ফেরার পথে রোজই এক ঝাঁক জোনাকি ঘিরে ধবে তনুমযকে দুয়েকটা লেপ্টে থাকে তার জামা-প্যান্টে। এক ফালি সরু আলপথ। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় লংতরাই আর আঠেরোমুড়াব টানটান মাথাগুলো। জোনাকি গায়ে নিযে হাল্কা বাতাসে নির্জন পথ ধরে হাঁটতে থাকে তনুময়। আর এ সময়টাতেই তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। বন্ধু বান্ধব, ঝলমলে কামান চৌমুহনী কিংবা চিত্রকথার সামনে আড্ডাচ্ছলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরী খোঁজা। প্রিয় বান্ধবী ও প্রেমিকাদের মুখ। বাবা, মা ছোটবোনের কথা। নিজেকে হঠাৎই নির্বাসিত বাজকুমার বলে মনে হয়। এ সময়টাতেই তনুময় একটু বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

দুই

স্কুলে যাবার জন্য বেডী হচ্ছে তনুময় ঠিক তখনই বাড়ীওলা বৌদি চিঠিটা দিয়ে গেলেন। বৌদির শরীরটা এ বয়সেও কী ফিট! চিঠিটা কালই এসেছিল কিন্তু বৌদি নাকি নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এটাকে বেমালুম ভুলে গেছিলেন। হলুদ খামের উপর নীল গোলাকার সিম্বল। মনটা বেশ তৃপ্তিকে ভরে উঠল। না খুলেই বোঝা যাচ্ছে ভেতরে কি মাল আছে। খুলে কেবল দিনটা জানার অপেক্ষা। যাহ্ বাবা শালারা মাত্র চারটে দিন সময় দিল। অবশ্য তেমন চিন্তার কিছু নেই — তনুময় এবার তৈবী। হুঁ হুঁ বাবা কপাল ভাল হলে লাইন ধরে সুখবরেরা আসে। এতোদিন বেকার থাকার সময় কত্তো পরীক্ষা দিয়েছে তনুময়, ব্যাঙ্কেই তো গোটা পাঁচেক রিটেন টেষ্ট হবে সব শালা মায়েব ভোগে চলে গেছে। আর এবার স্কুল টীচারের চাকরীটা পাবার পর মাত্র একটা রিটেন টেষ্ট স্টেট ব্যাঙ্কে, তাতেই আর্ধেক পথ কাবার। আজ বুধবার, ইন্টারভিউটা রোববার। ঈশ্ বৌদি যদি চিঠিটা দিতে একদমই ভুলে যেতেন কিংবা পোস্টের গণ্ডগোল ... মাগো:, তনুময় খামটা কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে ভারী ভক্তিব সাথে দু'বার নমস্কার ঠোকে। ভগবান জোর বাঁচিয়েছেন। নাহ্ ইন্টারভিউ নিয়ে তনুময়ের খুব একটা মাথাব্যথা নেই। দেখতে সে যাকে বলে বীতিমতো সুপুরুষ, ভাল বলিয়ে কইয়ে, ঝরঝবে ইংরেজী বলাব ক্ষমতাও ভাল। তাছাড়া প্রচুর ম্যাগাজিন পড়ার ফলে সব বিষয়েই একটু আধটু বলতে পারে। হুঁ হুঁ বাবা এতা সুন্দবী সুন্দরী মেয়েদের দেখামাত্র কাৎ করে ফেললাম আর ইন্টারভিউ বোর্ডে তো বসবে কাকুব বয়সী কিছু গোলগাপ্পা। মুখে এক পোঁছ অহঙ্কার মাখিয়ে নেবে। ঠাটের মুখ, একটুকুও হাসবে না। তনুমযের স্কুলের হেডমাষ্টারের মতো। যেই কাকুকে দুদিনে ম্যানেজ কবে তনুময় এখন এন্তার ক্লাশ ফাঁকি দিচ্ছে। এসব লোকেব সামনে টানটান দাঁড়িয়ে সাহস করে সোজা চোখে চোখ রাখলেই তারা হাফ খর্চা। রাস্তার মোড়ে বিশুর দোকান থেকে একটা জর্দা পান মুখে পুরে চারমিনার ধরিয়ে তনুময় স্কুলের দিকে পা বাড়ায়। মুখে গুণগুণ হিন্দী গানের কলি — 'এক লেড়কী কো দেখা তো...।'

তিন

বেশ ফুরফুরভাবে কেটে গেল দুপুরটা। মনটা খুশী খুশী। চোখ স্বপ্নে ঢুলুঢুলু। ফেরার পথে অজন্তার সাথে মিঠি মিঠি বাৎ করতে করতে সুযোগ বুঝে কল্ লেটার পাবার ঘোষণাও করল গর্বগর্ব সুরে। টেনশনে ভোগা তো দূরের কথা তনুময় যাকে বলে ইন্টারভিউটার জন্য একদম মুখিয়ে আছে। তাছাড়া বেশ তৈরীও সে এবার। ঘরের তালা খুলতেই পায়ের কাছে চৌকাঠের ইঞ্চি ছয়েক দূরে একটা চিঠি পড়ে আছে দেখে একটু অবাকই হয় তনুময়। সে না থাকলে বৌদিতো কখনো চৌকাঠেব নীচ দিয়ে চিঠি ঢুকিয়ে যান না। খামটা তুলে হাতে নেয় তনুময়। তারই নাম লেখা তবে বানানে ভুল আছে। খামটায় কোনও পোষ্ট অফিসের ছাপ নেই। কারোর হাতে হাতে এসেছে। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে তনুময়। মুহূর্তেব মধ্যে ভ্রূ কুঁচকে যায়। তনুময়ের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে শরীরটাকে। হাত কাঁপছে। ধপ্ করে চৌকিতে বসে পড়ে তনুময়। জোরে জোরে শ্বাস নেয়। বিহ্বল চোখে অবিশ্বাসী দৃষ্টি। বানান ভুল হলেও সন্দেহ নেই চিঠিটা তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। সাদা কমদামী কাগজেব প্যাড। উপরে কোণাকোণি দুটো বন্দুকের মাঝে দাঁত খিঁচোনো বাঘের মুখ। তার নীচে বড় বড়

ব্লক লেটারে লেখা গ্রীন ভলান্টিয়ারস্ অব ত্রিপুরা । গোরিলার চিঠি হাতে নিয়ে থরথর কাঁপতে থাকে তনুময় । চিঠিটায় লেখা—

"আপনার উপর বাৎসরিক কর মং পাঁচ হাজার টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে । আগামী শনিবার রাত্রে ঐ টাকা লইয়া অপেক্ষা করিবেন । আমাদের সদস্যরা আসিয়া লইয়া যাইবে । নির্দেশ অমান্য করিলে বা পুলিশে খবর দিলে আমাদের সরকারের আইন মোতবেক আপনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে ।"

তনুময়ের গলাটা শুকনো শুকনো লাগে । গ্লাস হাতে টলতে টলতে কলসীর পাশে যায় । গড়িয়ে জল ঢালে । তনুময় প্রাণপনে কলসীটা চেপে রাখার চেষ্টা করে । জলে ভিজে যায় তনুময়ের দুপা, হাত । তনুময় হতাশমুখে উঠে দাঁড়ায় । কলসীটা ভেঙে গেছে ।

— 'বৌদি, একগ্লাস জল খাওয়াবেন ।' বৌদি হাসিমুখে জল এনে দেন । সাথে দুটো নারকেল বরফি ।

— 'কি ব্যাপার এমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে ? অবশ্যি যা রোদ... এতোটা হেঁটে আসা ...।' বৌদির গলায় আন্তরিকতা ।

— 'বৌদি এ চিঠিটা কি আপনি আমার ঘরে ফেলেছেন ?' তনুময় মুঠোয় ধরা ছেঁড়া খামটা দেখায় ।

— 'কই নাতো ।'

— 'স্কুলে যাবার পর আমায় খুঁজতে কেউ এসেছিল ?'

— 'নাহ্ কেন ? কেউ ত আসেনি । কি ব্যাপার ভাই ?' বৌদির উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ।

— 'কিচ্ছুনা, এমনি ।' বৌদিকে বিস্মিত অবস্থায় রেখেই তনুময় ঘরের দিকে পা বাড়ায় । বৌদি কি সত্যি কথা বলছেন ? কেউ আসেনি, তবে চিঠিটা এলো কিভাবে ? একটা জলজ্যান্ত লোক এতোবড় উঠোন পেরিয়ে তার ঘরের চৌকাঠের নীচ দিয়ে চিঠি গলিয়ে গেল আর বৌদি কিনা দেখলেনই না, হতে পারে ? নাকি ভয়ে কিছু বলছেন না ? তনুময় দেখেছে লোক যেমন রাতে সাপকে সাপ বলে না ঠিক তেমনি এ অঞ্চলটাতে উগ্রপন্থী শব্দটা উচ্চারণ করতেও লোকে ভয়ে কুঁকড়ে যায় । দরজা এঁটে তনুময় চৌকিতে শুয়ে পড়ে । পেছনের জানলাটা খোলা । দূরের অরণ্য আর লংতরাইয়ের কিছুটা অংশ এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে । সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই চঞ্চল হয়ে পড়ে তনুময় । আরে তাইতো ! এই ঘরটাতো বাড়ীর একদম পেছনদিকের এককোণায় । পেছনের বাঁশঝাড় আর আগাছার জঙ্গলটা পেরিয়ে যে কেউই একটা চিঠি অনায়াসে ঘরে ঢুকিয়ে যেতে পারে । বাড়ীর কেউ টেরই পাবে না । এমন কী রাতে এই পথ দিয়ে এসে সটান তনুময়ের ঘরে ঢুকে গুড়ুম, গুড়ুম...।

— 'নাহ্' ! বেশ জোরেই চেঁচিয়ে তনুময় তাড়াক করে শোয়া থেকে উঠে বসে । দিনটা প্রচণ্ড গরম । দরদর করে ঘামছে তনুময় । অথচ স্কুলের জামা-কাপড় খুলতে ইচ্ছে করছে না, সাঁতার কাটতে না, টিফিন করতে না, ঘর থেকে বেরুতেও না । আবার শুয়ে পড়ে তনুময় । ভাবতে থাকে । পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার সে তো মেলা টাকা । তনুময়ের পাশ বইয়ে আছে সাকুল্যে তিনশো সাঁইত্রিশ টাকা । আচ্ছা যদি টাকাটা না দেওয়া হয় ? মাস দুয়েক আগে কলিগ্ কাজলবাবুর ভাইকে কিডন্যাপ করেছিল উগ্রপন্থীরা । অপহরণের ঘটনা এখন এমন নিত্যদিনের রুটিন রুটিন ব্যাপার হয়ে গেছে যে কারোরই তাতে আর মাথাব্যথা নেই । গভীর অরণ্যে ছাগল চরতে বেরিয়েছিল আর বাঘে মুখে করে নিয়ে গেছে, অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা । তনুময় সচক্ষে দেখেছিল কাজলবাবুর দুর্দশা । ছোটাছুটি করতে করতে ওজন কমে গেল । চোখের নীচে কালি । শেষ পর্যন্ত ভাই ফিরে এসেছিল প্রায় পঙ্গু অবস্থায় । উঠতে বসতে বেধড়ক ঝাড় দিত উগ্রপন্থীরা । কতো টাকা দিয়ে ছাড়া পেল তা কাজলবাবু বলেননি । অন্যরা কেউ বলেছিল এক লাখ, কেউ আশি হাজার । ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তনুময়ের । কাজলবাবুর ভাইয়ের মতো তারও পায়ের চারটে আঙ্গুল যদি বন্দুকের বাঁট দিয়ে থেৎলে দেয় উগ্রপন্থীরা ! আচ্ছা গায়ে গুলি ঢুকলে কেমন লাগে ? তনুময় চোখ বুঁজে — একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ ভেসে ওঠে । অজস্র গুলিতে ছিন্নভিন্ন তনুময় রায়চৌধুরীর মৃতদেহ । মাথার মধ্যে একটা ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক । তনুময় উঠে পোশাক ছাড়ে । তোয়ালে কাঁধে পুকুরের দিকে পা বাড়ায় । কি করা যায় ? কালই আগরতলা গিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা যোগাড় করে শনিবার রাতের জন্য অপেক্ষা ? তনুময় পুকুরের নিস্তরঙ্গ টলটলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

অজন্তার বাড়িতে রাত সাড়ে সাতটা অবাধে কাটিয়ে মনটা অনেকটা হাল্কা হলো তনুময়ের। যদু ডাক্তারের চেম্বারে প্রচুর ধাড়ি ধাড়ি লোক জুটেছে। বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আড্ডা জমে উঠেছে। সব শালা বুড়ো ভাম বসে বসে কংগ্রেস-সি পি এম, রাজনীতি মারাবে। উগ্রপন্থীদের নিয়ে একটা কথাও কেউ কোনদিন জোর গলায় বলেনি। মনে আছে গ্রামে আসার কদিন পরই তনুময় কি একটা প্রসঙ্গে বলেছিল জোয়ান পুরুষদের নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ার কথা। যারা রাতে গ্রাম পাহারা দেবে। শুনে বুড়োগুলো এমন চোখে তাকাল যেন রূপকথার আশ্চর্য গপ্পো শুনছে। কালীবাবুর সে কী হাসি—'আরে কন্ কিতা মাস্টর, আপনে কি নেতারার ভাত মারনের তালে আছেন ? ঐসব কুনুদিন কিস্ছু হইত না। লাঠি লইয়া বন্দুকের সাথে লড়বেন ? তাও যদি বা বরাত জোরে লাঠি দুই ঘা কোন উগ্রপন্থীরে দিতে পারেন তইলে কিতা হইব জানেন ? আপনেরেই কোমরে দড়ি বাইন্ধ্যা সোজা হাজতে চালান করব। আরে মাস্টর উগ্রপন্থীরে হাতে-নাতে ধইরা পুলিশের হাতে তুইল্যা দিলেও শুনবেন পরদিন দারোগাবাবুই কাইন্দা-কাইট্টা কইতাছেন, – রাইতে নেতার রক্তচক্ষু ক্যামনে ফাটকে আটকাইয়া রাখুম ভাই ? পুলিশেরই হাত-পা বান্ধা আর আপনের গ্রামসেবক বাহিনী। ঐসব কেরদানী আমার মেলা দেখা আছে, বুঝলেন।'

– 'তবে কি এভাবেই চলবে নাকি ?' প্রশ্নটা করার পরই তনুময় বুঝতে পেরেছিল খুব বোকার মতো একটা প্রশ্ন করে ফেলেছে সে।

– 'আরো খারাপ হইব। মিলাইয়া দেইখ্যান মাস্টর।'

যদু ডাক্তারের চেম্বারের ভেতর থেকে হাসির শব্দ আসছে। তনুময় আর ভেতরে ঢোকে না। হন্‌হন্ করে এগিয়ে যায়। ক্রম দূরবর্তী হতে থাকে বাজারের টিমটিমে লালচে আলো। জোনাকিরা জড়িয়ে ধরে তনুময়কে যেভাবে জড়িয়ে ধরে রোজ গত সাতটি মাস ধরে। হঠাৎ তনুময়ের খটকা লাগে, বুড়োগুলো এতো হাসছিল কেন ? ওরাই রসিকতা করে চিঠিটা পাঠায় নি তো ? তনুময় জানে মুখে ওরা তার তারিফ করলেও মনে মনে তাকে হিংসে করে। কারণ তার স্মার্ট হাঁটাচলা, ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান সবকিছুই ঐ হামবাগ বুড়োগুলোর চাইতে অনেক বেশি। হয়তো সেকারণেই তাকে একটু চুপসে দিতে ...। গ্রামের লোকদের বিশ্বাস নেই। ভিলেজ পলিটিক্স যে কি বস্তু তা শহরের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। এটা নিশ্চয়ই একটা বিশ্রি গেঁয়ো রসিকতাই হবে। তনুময় সান্ত্বনা পেতে যায়। কিন্তু ঐ ছাপা প্যাডটা... দাঁত খিঁচোনো বাঘের মুখ। মনে পড়তেই আগাপাস্তলা কেঁপে ওঠে তনুময়। সিরসিরে হাওয়া। আবছা অন্ধকারে অজস্র জোনাকি। আশে-পাশে একটি প্রাণীও নেই। অবিকল যেন রূপকথার সর্বনাশা তেপান্তরের মাঠ। হঠাৎই খস্‌খস্ শব্দে হৃৎপিণ্ড চমকে ওঠে। পেছনে পায়ের শব্দ। তনুময় মাথা ফেরায়। মাঠের উপর দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে যায় একটা কুকুর কিংবা শেয়াল জাতীয় জীব। তনুময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপরই আচমকা প্রাণপনে ছুটতে থাকে নির্জন মাঠের উপর দিয়ে। কানের ভেতর ঝিঁঝিঁ পোকাটা আবার একটানা ডাকছে।

এমন ভয়ানক রাত তনুময়ের জীবনে আসেনি। চোখ ভেঙে পড়ছে ঘুমে অথচ চোখ বুঁজলেই আতঙ্কে শিউরে ওঠা। কাজলবাবুর ভাই নাকি চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছিল তাই তাকে অফিস ফেরতা পথে তুলে নিয়ে ...। মুক্তিপণ আশি হাজার বা এক লাখ — যাই হোক না কেন টাকার অঙ্কটা প্রচুর। তনুময়ের দামও তার চেয়ে বেশী বৈ কম হবে না। কে দেবে অ্যাত্তো অ্যাত্তো টাকা ? রিটায়রমেন্টের পর বাবা যে টাকা পেয়েছিলেন তার হয়ত লাখ খানেক এখনো ব্যাঙ্কে আছে। কিন্তু তনুময়ের ছোট বোনওতো বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে। হন্যে হয়ে তার জন্য পাত্রও খোঁজা হচ্ছে। ছোট বোনটার মুখ মনে পড়তেই তনুময়ের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকটা থামছেনা কেন ? তনুময় কানে বালিশ চাপা দেয়। ঝিঁঝিঁ-র একটানা ডাক তবুও শুনতে পায়।

চার

— 'কিতা তনুময় এমন ম্যান্দামারা চেহারা কইরা রাখছ ক্যান ?' সত্য দেববর্মা খোস মেজাজে আছেন। চারমিনারের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন — 'লও'। তনুময় মোমের আলোয় সিগারেট ধরায়। পেছনের বেড়ায় সত্য দেববর্মার ছায়াকে অস্বাভাবিক বড় মনে হচ্ছে। সত্যদা বোধহয় কিছু লিখছিলেন। টেবিলে সাদা খাতা, খোলা পেন। মোমের আলোয় তনুময় সত্যদার মুখের দিকে

তাকায । চিঠিটাব কথা বলব বলব কবে । সত্যদার জানাশোনাব পবিধিটা বিবাট । তিনি একবাবটি বললে দারোগাবাবুও তনুময়েব নিরাপত্তাব একটা ব্যবস্থা অবশ্যই কববেন । মোমেব ম্রিয়মান আলোয সত্যদাব ফর্সা মুখটাকে হলদেটে দেখাচ্ছে । সত্যদাকে এতো কাছ থেকে খুঁটিয়ে কখনো দেখেনি তনুময । সিগারেটে ঘন ঘন টান দেয তনুময । কুণ্ডুলী পাকিয়ে ওঠা সাদা ধোঁয়াব পেছনে সত্যদাব মুখ আবছা হয়ে যায় । সেই আলোছাযাব আবছাযাটা হঠাৎই এক ঝটকায তনুময়েব মাথাব ভেতবেব বন্ধ জানালাটা খুলে দেয ।

-- মাই গড্ ! তনুময়ের গা গুলিয়ে ওঠে । একটা তীব্র ভয দলা পাকিয়ে বুক থেকে গলাব কাছে জমে শ্বাস বন্ধ কবে দেয় কয়েকমুহূর্তের জন্য । সত্যদা.... অজন্তাব দাদা সত্যদাই কি তবে .. ! আশ্চর্য এতোক্ষণ একথাটা মাথায আসেনি কেন ? আপন বোনেব সাথে তনুময়েব দহবম-মহবম সহ্য করতে না পেরে তবে কি সত্যদাই... ? সত্যদা কেমন একদৃষ্টে তাব দিকে তাকিয়ে আছেন । কি তীব্র পলকহীন দৃষ্টি । দেহের ভেতবেব প্রতিটি ইঞ্চি যেন স্পষ্টভাবে ধবা দিচ্ছে ঐ দৃষ্টিব কাছে । তনুময উঠে পড়ে, 'সত্যদা আমি আসি ...।'

-- 'আবে কিতা হইল ! এইত্তো আইলা । মা আব অজন্তাব লগে দেখা কইবা যাও।' তনুময় পেছন থেকে সত্যদাব গলা শুনতে পায় । পিছু ফেবে না । গেট ঠেলে সোজা বাস্তায । হৃৎপিণ্ডটা একটা চঞ্চল চড়ুই পাখীব মতো লাফাচ্ছে । তনুময় আকাশেব দিকে মুখ তোলে । ঝকঝকে বাত । তাবায তারায পরিপূর্ণ আকাশটাকে অজস্র চুমকী বসানো একটা অতিকায কালো চাদব বলে মনে হচ্ছে । কোত্থেকে হু হু কবে উড়ে আসে এক ঝাঁক উদ্দাম বাতাস । এলোমেলো হয়ে যায তনুময়েব দীর্ঘ পবিপাটি চুল । বুকেব খুব গভীর থেকে ছিটকে বেবোয় একটা দীর্ঘশ্বাস । তনুময কাব কাছে নিবাপত্তা চাইবে আজ ?

বৃথা ঘুমোনোব চেষ্টা কবে তনুময় । মন বারবাব বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে । উগ্রপন্থীব চিঠি, স্কুল, অজন্তা, আগবতলা, ইন্টাবভিউ সব জট পাকিয়ে একাকার । আচ্ছা, জীবনে কতোগুলো পাপ করেছে সে ? কিসের পাপে এমন দুর্দশায পড়তে হলো ? সেই ছেলেবেলায পাড়াব নেড়িকুত্তাব লেজে তাবাবাজি বেঁধে দেওয়া । ছাত্রজীবনে কিছু খুচবো ঝাড়পিট । দুর্গাপুজোব চাঁদা তুলতে গিযে পাড়াব কাউকে কাউকে ফাঁকা হুমকি । গোটা কয়েক মেয়েব সাথে অন্তবঙ্গভাবে মেশা । কলেজ লাইফে বান্ধবী অনুবাধাকে জোব কবে চুমু খাওয়া-এগুলি কি পাপেব মধ্যে পড়ে ? দুস্ কি বোকাব মতো ভাবছে সে । উগ্রপন্থীবা কি পাপীদেব বিনাশকারী ভগবান নাকি যে বেছে বেছে পাপীদেব হেনস্থা কববে ?-'নাহ্ সাত মাস গ্রামে থেকে তুই শালা আস্তো কুসংস্কাবেব ডিপো গেঁযো ভূত হযে গেছিস।' নিজেকে নিজে গাল পেড়ে হো: হো: কবে হেসে ওঠে তনুময । একটা সিগারেট ধবিযে আধশোয়া হয়ে বসে । কিছুক্ষণ পবপবই ভেসে ওঠে প্রশ্নগুলো । চিঠিটা কে দিয়ে গেল, কিভাবে ? টাকাটা না দিলে কি হবে ? দূব এভাবে বেঁচে থাকাব চেয়ে মবে যাওয়া ঢেব ভালো ।

পাঁচ

— 'ডোন্ট ওবি । আচমকা মানসিক আঘাতে এবকম হয । দুটো ওষধ দিচ্ছি । ডিনাবেব পর খেযে বিলাক্স মুডে শুয়ে পড়বেন ।' ডঃ দত্ত খস্ খস কবে প্রেসাক্রিপশানটা লিখে তনুময়েব হাতে দেন ।

— 'এটায ঘুম হবে তো ? গত তিন বাত আমাব চোখে একফোঁটাও ঘুম নেই ।'-'আপনি সেটা প্রথমেই বলেছেন । চিন্তার কিছু নেই । ওষুধগুলো পড়লেই মিনিট পনেবোব মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন । তবে বেশিদিন এগুলো ইউজ কববেন না । অ্যাডিক্ট হযে যাবাব সম্ভাবনা থাকে।'

ডক্টর দত্ত বলেছিলেন, মিনিট পনেবো অথচ দুঘন্টা হতে চলল । নাহ ঘুমেব এখনো পাত্তা নেই । মাথাব দুপাশে চিন্‌চিনে ব্যথা । কানেব মধ্যে ঝিঁঝিব সেই একটানা ডাক । কাল ন'টা থেকে ইন্টারভিউ । তনুময কিচ্ছু ভাবতে পাবছে না । শবীবটা অবশ লাগছে । মাথাটা গবম । আজই তো শনিবার । সকালেব গাড়িতে তাকে আগবতলা আসতে অনেকেই দেখেছে । তাদেব মধ্যে কি উগ্রপন্থীদের ইনফর্মাব কেউ ছিল না ? কি ভাববে ওবা ? মাস্টব পালিযে গেল ? পালিয়ে যাবো কোথায ফিবে তো যেতেই হবে ঐ হাঁ করা বাঘেব মুখগহ্ববে । কিংবা হযতো খবব পাযনি । কটা বাজে এখন ? ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে কবছে না । এ মুহূর্তে কি বাধাচন্দ্রনগবেব ছোট্ট ভাড়াটে ঘবের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে বেশ কিছু বন্দুকধারী ? তনুময়কে হাতেব মুঠোয না পেয়ে তাদেব মনেব অবস্থাটা কেমন হবে ? ক্ষেপে গিয়ে ঘবেব জিনিষপত্র ভাঙচুব কবছে না তো ? এতোটা ঝুঁকি নেবাব পর যখন দেখবে পাখি উড়ে গেছে তখন তনুময়কে খুন কবাব ইচ্ছেটা তাদেব আবো চাগিয়ে বসাটাইতো স্বাভাবিক । ফিবে তো যেতেই হবে কিন্তু

তারপর ...? তনুময়ের সর্বাঙ্গে শিহরণ। বাথরুমে যায়। পেচ্ছাপ করে। ফিরে এসে শোবার সাথে সাথে গাটা গুলিয়ে ওঠে। দৌড়ে আবার বাথরুমের গিয়ে দুহাতে জলের কলটা ধরে মাথা নীচু করে তনুময়। বমিতে ভরে যাচ্ছে বাথরুমের মেঝেটা। তনুময়ের পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে নিজেরই বমিতে। ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে। তনুময় ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে বাথরুমের নোংরা মেঝেতে চার হাত-পায়ে উবু হয়ে বসে পড়ে। বমি শেষ হয়ে লালা বেরুচ্ছে। তনুময় পাগলা কুকুরের মতো হ্যা: হ্যা: করতে থাকে। ঝিঁঝির ডাকটা তীব্রতর হচ্ছে। তনুময়ের চোখের তারা দ্রুত ঘুরতে থাকে। কোনওক্রমে কলটা খুলে তার নীচে মাথাটা এগিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা জলের অবিরল ধারায় আধঘণ্টার উপর মাথা ভেজায় তনুময়। অবসন্ন শরীরটাকে টেনে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘরে হাল্কা নীল আলো ডিম লাইটের। বেশীরভাগ লোকই বলে ড্রিমলাইট। হু: ড্রিমলাইট ....। ড্রিমলাইট জ্বলছে অথচ স্বপ্ন কই? ছেলেবেলায় মা কেমন গুনগুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন,– 'ঘুমের মাসী ঘুমের পিসী মোদের ঘরে এসো..।'

– 'তনুময় রায়চৌধুরী।' একটা ধাতব স্বর।

– 'গুড মর্ণিং সারস্।' তনুময় অবসন্ন চোখে তাকায়। হাল্কা নীল আলো। পাশাপাশি নিশ্চল বসে হুবহু একই গড়নের চারজন। ওরা কি পাথরে তৈরী? আবছা অন্ধকারে মুখগুলো দেখা যায় না। তনুময়ের চোখ জুড়িয়ে আসছে। এতোদিন পর তার ঘুম আসছে। ভীষণ ঘুম।

– 'মিস্টার রায়চৌধুরী, জুলোজীর স্টুডেন্ট হয়ে আপনি ব্যাঙ্কে জয়েন করতে চান কেন?'

– 'খাঁচা' শব্দটা আপনাআপনিই বেরিয়ে আসে তনুময়ের মুখ থেকে। প্রশ্নকর্তা কি চমকে গেলেন? তনুময়ের কিছু যায় আসে না। আহ্ কী স্বপ্নময় নীল আলো। ঘুমে শরীর ভেঙে পড়ছে। আহ্ ঘুম কতো সুন্দর। কোথায় পালিয়ে ছিলে এতোটি দিন? ঘুম তুমি জুলোজিক্যাল গার্ডেনের খাঁচায় বন্দী পাখি নও, ব্যাঙ্কের কুঠুরীর ক্যাশিয়ারও নও।

—'স্করপিয়নের কটা পা?' কণ্ঠস্বরটা এতো যান্ত্রিক কেন?

তনুময় অতিকষ্টে চোখের উপর নেমে আসা ভারী পাথরদুটোকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে। শহরের আয়েসী বাবুর দল তোমরা জান না স্করপিয়ন কেন, পৃথিবীর তাবৎ হিংস্র প্রাণীরই আসলে মাত্র দুটো পা, স্রেফ দুটো।

– 'র‍্যাটল স্নেক কোথায় পাওয়া যায়?

শাল্লা কেন যে ডিস্টার্ব করছে। ঘুমটা যে কী চেপে বসছে। স্টুপিড ফেলোজ্ তোমরা জাননা কতোদিন তনুময় রায়চৌধুরী একটুকুও ঘুমোতে পারেনি? র‍্যাটেল স্নেক, র‍্যাটেল স্নেক। আহ্ দক্ষিণ আমেরিকার তীব্রতম বিষধর সাপ। এক ছোবলে ছ সি সি বিষ ঢালার ক্ষমতা। ছোবল মারার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে যে কোনও প্রাণীরই হার্ট ব্লক হয়ে যায়। এক নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি। লেজের পেছনে আলগা হাড়ের ঝুমঝুমি। তুমি ত্রিপুরার জঙ্গলে কেন এসেছো গো? তনুময় রায়চৌধুরীকে বিষে নীল করে দিতে? তনুময়ের কান থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। তার বদলে ঝুমঝুমির শব্দ। ঝুম, ঝুম, ঝুম.. ভয়ঙ্কর র‍্যাটেল স্নেকের উপস্থিতির সগর্ব ঘোষণা।

কী যে সম্মোহক শব্দতরঙ্গ। তনুময়ের দু'চোখে আড়াই মণি পাথর। মাথাটা সাফ। কানে র‍্যাটেল স্নেকের ঝুমঝুম মুগ্ধ করা ঘুমপাড়ানী আওয়াজ। তনুময় একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে ঘুমের অতলে ডুবে যেতে থাকে। আহ্ কী শান্তি, কী শান্তি আজ পৃথিবীর চারধারে।

মিথিলেশ ভট্টাচার্য

রিপু জাতক

— শাবাশপুব— শাবাশপুব — !

দু'বাব চেঁচাল হেল্পাব ছেলেটা। কণ্ঠ যান্ত্রিকতাময় ! আবেগহীন। রোদ তাতানো প্রান্তবে ধূ ধূ হাওয়াব ভেতব নিমেষে ভেসে গেল পলকা শব্দ জোড়া। হুঁশ হ'ল অমিতাভর। জায়গাটা তাব বিলক্ষণ চেনা, তবু দ্বিধান্বিত ছিল ; যদি অন্যমনে সঠিক ষ্টপেজটা উজিয়ে যায় ! বলে রেখেছিল ওই ছেলেটাকে। কথা বাখতেই বোধকরি অমন হাঁক অথচ ব্যাপারটা যে নিছক অভ্যাসে ঘটছে তা' অমিতাভ খেয়ালই করল না।

কেবিনে, ড্রাইভিং সিটের পিছনে বসেছিল অমিতাভ। বাসের বিশাল কাচ জুড়ে বাস্তার দু'পাশের সবুজ ও বঙীন দৃশ্যাবলীব সামনে থেকে পিছনে নির্ভার ভেসে যাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিব্যি হালকা মেজাজে সেও ভাসছিল লঘুচিত্ত কীটপতঙ্গ অথবা কোনও পাখিব মতো। হেল্পার ছেলেটাব হাঁকেব প্রায় সাথে সাথেই গতি কমে আসছিল গাড়িব। সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একবার বাইরের পবিচিত জাযগায় পক্ষী-দৃষ্টি নিক্ষেপ কবেই অমিতাভ একটু থমকে একটু দমে গেল। ধূ ধূ ধানক্ষেতেব মধ্যিখানে সহসা অনেকখানি জাযগা। সিমেন্ট বাঁধানো নতুন ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেবা। দৃষ্টিটা পাঁচিলে ঠোক্কব খেল এতো অপ্রত্যাশিত যে ক্ষণিক পবিবেশ প্রভাবিত বাধা বন্ধনহীন ফুবফুরে মেজাজ তাতে বেশ আহতই হ'ল !

একটু উদাসীন অন্যমনস্কতায দবজাব কাছে আসতে গিয়ে অমিতাভব চোখ পড়ল হাবু মণ্ডলেব ওপব। জানালা ঘেঁষে বসা অল্প বযস্কা শ্যামলাপনা বউটি তিবিশ-পঁযত্রিশ মিনিটেব মধ্যেই পুবনো-পবিচিতেব ভঙ্গিতে দিব্যি কথা চালাচ্ছে হাবু মণ্ডলেব সঙ্গে। হাবু মণ্ডল লোকটি এই শহব ও তাব আশপাশ এলাকায বেশ উল্লেখযোগ্য এক চবিত্র। সে স্বঘোষিত সমাজসেবী, জনদরদী ও সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। দু'দু'বাব এম এল এ পদপ্রার্থী হযে জামানত বাজেযাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাব রাজনৈতিক বিশ্বাস, জনদবদ বা সমাজ সেবায ভাঁটা পড়েনি। তবে তাব সত্য পবিচয় অন্যত্র। প্রাথমিক পরিচযের মোড়কে তা এমন আবৃত যে সাধাবণেব দৃষ্টিতে প্রায়শ অনাবিষ্কৃতই থেকে যায। হাবু মণ্ডল আসলে এক অতি ঘুঘু কাঠ ব্যবসাযী এবং কাঠ চোবাচালানকারী দলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের আঁতাত হে... বেশক'টি কাঁচা পযসাব মুখ দেখেছে সে। তবে তাব চেহারা-ছবি, পোষাক-আসাক বা চলন-বলনে সেসবের কোন ছাপ খুঁজে পাওয় যায় না।

পঞ্চাশোর্ধ হাবু মণ্ডলেব স্বাস্থ্য চমৎকার, বেঁটে-খাটো মজবুত গড়ন ; কুচকুচে কালো গায়ের বঙ ; লোমহীন টান চামড়ায় ঈষৎ কক্ষতা ; চৌকো মুখমণ্ডল তাতে ড্যাবেড্যাবে দু'টি চোখ ; চোখের নিচে শাদা দাগ, সম্ভবত কোলাষ্টারল-এর ; খাঁদা নাকেব আবছা আঁধাব ফোড় দু'টি বেশ বড় ; মুখটা সামান্য হা করা, পুরু ও কালচে ঠোঁট জোড়া ওল্টানো বলেই বোধ হয় ; জিভেব স্থুল ডগা প্রায় সময় বাইবে বেরিয়ে থাকে ; মাথার চুল কদমছাট তার একটা কালো তো অন্যটা শাদা। ডান হাতের তর্জনী থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত সোনা ও রূপো দিযে বাঁধানো লাল-সবুজ-নীল ও খয়েবি রঙের পাথর সেট করা আংটি।

বাসে উঠেই বউটিকে দেখতে পেযেছিল অমিতাভ। জানালা ঘেঁষে বসে আছে একা। পাশেব সিট খালি। দেখতে আহামরি কিছু না। আটপৌবে। তবে ছিমছাম গড়ন, শ্যামলা চেহাবা ; পুরুষ-চোখকে বেশ টানে ঐ শরীবী মায়া। ছোট্ট কপালে ... টিপ। দু'বেনী করে বাঁধা চুল পিঠ গড়িয়ে সিটে লুটাচ্ছে। ইচ্ছে করলে অমিতাভও ওব পাশে বসতে পাবতো। তবে নব্বুই বা তাবও চেয়ে বেশির ভাগ

মানুষের মতো জানালার সিটটা ওরও প্রিয়, তাই এড়িয়ে গেছিলো। কেবিনের দিকে যেতে গিয়ে সহসা পিছনে পরিচিত গলা শুনে 'আরে হাবুদা যে' এরকম বিস্ময়সূচক সম্বোধন জিভের জগায় সামলে ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল অমিতাভ। হাবু মণ্ডলের ড্যাবড্যাবে চোখ জোড়া তখন বউটিকে তির্যক পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। বাঁ হাতের কব্জিতে ঝোলানো কাঠের বাঁটঅলা পুরোনো ধূসর ছাতা, পায়ে ধুলোমাখা রবারের জুতো — গ্রীষ্ম-বর্ষার পরিচিত বেশে খালি সিট দখল করতে ব্যগ্র হাবুমণ্ডল বউটির দিকে ঝুঁকে ওখানে আর কেউ আসবে কিনা জানতে চাইছিলো। বউটি নাবোধক মাথা ঝাঁকতেই সে তার পৃথুল শরীর সিটে স্থাপন করে স্বস্তির হাসি হেসে ওর গন্তব্য জানতে চেয়েছিল।

সেই শুরু। তারপর শরীরে শরীর লেপ্টে গল্পে গল্পে বউটিকে সারাক্ষণ ভাসিয়ে দিয়েছে হাবু মণ্ডল।

একটু ইতি-উতি তাকিয়ে অমিতাভ দেখল এখনও চারধারে অবাধ বাতাসের মতন অকৃপণ, অব্যাহত প্রকৃতি। পিচ রাস্তার দু'দিকেই ক্ষেতের পর ক্ষেত মিশেছে দিগন্তে — ধূসর নীল পাহাড়ের পাদমূলে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে কিছু খড়, ছন ও টিনে মেশামেশি উঁচু-নীচু দোচালা-চারচালা বাড়ি-নুয়েপড়া বাঁশঝাড় আর আম-জাম-সুপারি- নারকেল ও নাম-না জানা বুনো গাছপালার চকিত হরিৎ বিস্তার। এসবের মধ্যিখানে আলপথের প্রায় গা ঘেঁষে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সিমেন্ট বাঁধানো ইঁটের পাঁচিলকে কী বেমানান ও কিম্ভূত লাগছে! অমিতাভ তির্যক চোখে তাকায় এই পাষাণ আড়ালের দিকে — ওর নির্দয় বেষ্টনীতে কতখানি সবুজ যে একসাথে বাঁধা পড়ে গেল! এই ভাবনার ভেতর অকস্মাৎ হাবু মণ্ডলের কথা মনে পড়ে অমিতাভ'র। এতক্ষণে দু'তরফে ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয় অনেক দূর গড়িয়েছে। হাবু মণ্ডলের সবল বাহু বেষ্টনে এই সবুজেরই মতো হয়ত বাঁধা পড়ে গেছে শ্যামরী বাউটি!

২.

শেষ অব্দি বাস যেখানে মন্দগতি ছুট থামাল, বেশ বড় গঞ্জ জায়গা সেটা। আধঘন্টাটাক বিরাম দিয়ে এখান থেকেই কুড়িয়ে বাড়িয়ে দু'দশ জন সওয়ারি নিয়ে ফের দৌড় লাগাবে শহরের দিকে।

একসাথে নামল দু'জন। সামনে যুবতী বউ, হাবুল মণ্ডল পিছনে। খর রোদ থেকে অব্যাহতি পেতে মাথার ওপর ধূসর ছাতা মেলল হাবু মণ্ডল। সামান্য এগিয়ে থাকা বউটি পিছন ফিরে হাবু মণ্ডলকে দু'দণ্ড জিরিয়ে এক কাপ চা খেয়ে যেতে অনুরোধ করল।

এই আমন্ত্রণের জন্যই মনে মনে ওৎপেতে ছিল হাবু মণ্ডল। চরাচর জোড়া তীব্র গরমে ছায়াশীতল বৃক্ষের মতো বউটির নিকট সান্নিধ্য তাকে ক্রমশ তাজা আর উষ্ণ করে তুলেছে। চোরাপথে একেকটি মূল্যবান গাছ হাপিস করতে যে উল্লাস ও উত্তেজনা হাবুমণ্ডলকে তাতিয়ে রাখে এখন নিজের ভেতর তারই খানিকটা অনুভব করছিল সে। কিন্তু হাবু মণ্ডলের অন্তরভাব মোটেই প্রকাশ পেল না বাইরে, ঈষৎ কপটতার সঙ্গে মিথ্যা ব্যস্ততা দেখানোর নিখুঁত অভিনয় করল সে।

— দেরি হয়ে যাবে যে! আমাকে বেলাবেলি ফিরতে হবে তো। আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন, যাচ্ছি। তবে বেশিক্ষণ বসব না কিন্তু।

এয়ারপোর্ট রোড থেকে দু'দিকে দু'টি অপ্রশস্ত পাকা সড়ক বেরিয়ে কিছু বর্ণহীন একঘেয়ে গ্রাম্য জনপদ, দু-চারটা চা-বাগিচা, মন্দির-মসজিদ ও জঙ্গল ডিঙিয়ে এঁকেবেঁকে একটি চলে গেছে দূর হাফলং পাহাড়ের দিকে এবং অন্যটি এক পাহাড়ি নদীর পাগলপারা সঙ্গ ধরে অনেকখানি পথ পেরিয়ে মাথা নত করেছে জাতীয় সড়কের উদ্ধত অহঙ্কারের কাছে।

কিছুদূর পর্যন্ত এই তিনটি পথের সঙ্গমস্থলের দু'ধারে সার সার দোকানপাট, ভাত চা ও মিষ্টান্নের দোকান এবং গঞ্জের হই হই ভিড়ভাট্টা। এলাকাটা খুব বড় না, মিনিট দশেক হাঁটার পরই হাফলং পাহাড়ের দিকে যে সড়কটি তার দু'পাশ নির্জন হয়ে আসে। দু'পাশের ঘন বন নির্জনতায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে একেকটা আসাম টাইপ বাড়ি। সবুজ গাছপালার ছায়ায় ঢাকা বাড়িগুলোর শাদা চুণকাম শরীর থেকে এই ভরদুপুরে এক নৈঃশব্দ চারপাশে ঝরে ঝরে পড়ছিল যেন। এরকম ঝিমধরা পরিবেশ বহুদিন হ'ল হাবু মণ্ডলের অচেনা।

— আরো দূর বুঝি! হাবু মণ্ডলের ফ্যাসফেসে প্রৌঢ় গলায় শঙ্কা চাপা থাকে না।

— না না। এইতো এসে গেছি। দু'পাল্লার একটা কাঠের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে

উত্তব দেয বউটি ।

গোটা বাড়িব দিকে একপলক চোখ তুলে চেযে তাজ্জব বনে যায হাবু মণ্ডল । শাল, সেগুন, দেবদারু, এ'যেন গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ টাকাব নোট দিয়ে বাড়িটাকে সাজানো হযেছে ! হাবু মণ্ডলেব তপ্ত শরীব-মন শীতল ছায়ার লোভে যত না ব্যাকুল তারচে' বেশি চঞ্চল পুষ্ট গাছগুলোকে দেখে । বাসে উঠে বউটাব দিকে তাকিয়ে প্রায় ওবকমই এক চঞ্চলতা তাব অন্তর্গত বক্তস্রোতে তড়িৎপ্রবাহেব মতো বযে গিয়েছিল !

— বাহ্ চমৎকাব বাড়িতো আপনাব ! তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে ওঠে হাবু মণ্ডল ।

— ভিতবে আসুন । সপ্রতিভ বউটি হাবু মণ্ডলকে উষ্ণ আহ্বান জানায ।

যাবে নিশ্চযই ভেতবে যাবে হাবু মণ্ডল । নবম গদিঅলা চেয়াবেব সবটুকু আবাম নিংড়ে নিতে হাত পা' ছড়িয়ে শবীর ডুবিযে বসবে । ভেতব ও বাহিব — দু'মুখো উষ্ণতাব প্রবল চাপ তাকে বড্ড চঞ্চল আর অধীব কবে তুলেছে । এখন চাবদিককার ঝোঁপে থাকা গাছপালা আব তন্বী শ্যামাঙ্গীব সজীব শীতল ছাযায তাপিত শবীব-মন অবশ্যই জুড়োতে চাইবে হাবু মণ্ডল ।

৩.

গবম গবম আব গবম ।

সবিৎদেব ভিড়-ভিড়াক্কাব উৎসব বাড়িতে ঘটা কবে গবমেব কথাই হচ্ছিল । আব কথাগুলো শুনতে শুনতে দবদবিযে ঘামছিল অমিতাভ । আলপথেব গা' ঘেঁযে কখে দাঁড়ানো একবাশ সবুজ খামচে ধবা কিম্ভূত পাঁচিলটা হা হা গবম বাতাস হজম কবে দ্বিগুণ বেগে যে তাপ উগবে দিচ্ছিল তা' আগুনেব হলকাব [illegible] ও ভযঙ্কর বলে বোধ হচ্ছিল অমিতাভব ।

একটি অল্প বযস্ক তরুণ বলল, জানেন, ওজোন স্তবেব ক্রমাগত সংকোচনে একদিন আকাশটাই ফুটো হযে যেতে পাবে ! কথাটা শুনে অমিতাভ চমকে ওব দিকে ফিবে তাকাল । অন্যান্যবা একচোট হাসল । কীসব আবোল-তাবোল কথা ছেলেব, পাকামো আব কী । আকাশতো মহাশূন্য, ওটা আবাব ফুটো হয কেমন কবে ! এই বোকামার্কা মন্তব্য শুনে অমিতাভ শিউবে ওঠে । লোকগুলো কিছুই জানে না দেখা যাচ্ছে, আজো পড়ে আছে আদিম অন্ধকাব গহ্বরে । আকাশ কী একটা, পাঁচ পাঁচটা আকাশ ছড়িযে বযেছে মাথাব ওপব ! আকাশেব ওপাবেও যে আকাশ, বাতসেব ওপাবেও যে বাতাস-এটাতো শুধু শুধু কবিব কল্পনা না, বৈজ্ঞানিক সত্য । ওজোন স্তবে ছিদ্র দেখা দেযাতে কত বড় বিপদ যে মাথাব ওপর ঘনিযে এসেছে তাব আঁচও কী ঐ নির্বোধ লোকগুলো পাচ্ছে না, আশ্চর্য — !

একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পবা মধ্যবযস্ক তরুণের বলা কথা অগ্রাহ্য কবে পাঁজির কথা পাড়ল । খুঁটব মিলিযে দিযেছি পাঁজি এবার। বৈশাখে-জৈষ্ঠে বৃষ্টি নেই । আষাঢ়-এ ঢল নামবে । চাই কী তুমুল বন্যাও হতে পাবে !

আবেকজন, ধুতি-পাঞ্জাবি থেকে সামান্য কমবযসী, নিমেষে গোটা ভিড়টাকে টেনে নিলো ওব দিকে । জানেন, একজন লোক, বিবজু নাম, চা বাগানের ছাঁটাই লেবাব, জঙ্গলে গিযেছিল ঘাস কাটতে । দুপুরবেলা ঘাসেব বোঝা নিয়ে বাড়ি এসেই বউযেব কাছে ভাত চাইলো । বউ ভাত দিতে দেরি কবছিল, হয়ত ঘরে চাল ছিল না, বাঁধেনি । ঘবে চাল থাকবেই বা কোত্থেকে, এম্নিতে ছাঁটাই লেবাব, কাজ-কাম নেই, পাথবেব মহালে মজুবি কবে কোনমতে দিন গুজবান কবছিল, সবকারেব হুকুমে পাথরেব মহালও বন্ধ । লোকটা বউযের দেবি দেখে বেদম ক্ষেপে গেল, একছুটে ঘবে ঢুকে ঘাস কাটার ধারাল কাস্তে দিয়ে বউয়েব গলা দু'ফাঁক কবে দিলো — !

ঘাস কাটছিল বিরজু মাল । টিলাব নিচে জলা জাযগাটাব অনেকখানি জুড়ে ফনফনে ঘাস হয়েছে । সঙ্গে শন ও ছুঁইমুই লতাব জঙ্গল । দু'আটি ঘাস বেচতে পারলে এক বেলার নুন-ভাত জুটতে পারে । দু'দিন আগে ছোট টিলাবাবুর শাদিতে যে ভাত খেযেছিল বিরুজ, তার বউ সামদবিযা ও ছেলেপিলেরা । কী সুন্দব শাদা ভাত সব ! এখনও চোখে লেগে আছে দ্রোণফুলেব মতো ভাতগুলো । বাবুর বুড়ো বাপটা বড় বজ্জাত । ওদেব শাদা ভাতগুলো দিতে মানা করছিল বাব বার । বলছিল মোটা মোটা লাল চালের ভাত রেঁধে দিতে । মাছ, মাংস কিছুই ওদের ভাগে পড়েনি । বাবুরা সব দল বেঁধে

ওগুলো সাবাড় করে গেল। শুধু সব্জি আর ডাল বেঁচেছিল ওদের জন্য। তাও কম কম। যে বাবুটা তাদের দিচ্ছিল সে শুধুই হাতা বাজাচ্ছিল আর মুখে নেই নেই করছিল। তবে শালা আমাদের খেতে বসালি কেনে! মনে মনে ফুঁসছিল বিরজু মাল।

এখানে বেশ ঘাস আছে। বেশ ক'দিন কাটতে পাবে। বেশ ক'দিন নুন-ভাতও জুটবে। কিন্তু ঘাস নাগাড়ে কাটার অসুবিধা। বড্ড তাপ এখানে। চারপাশে কোন বড় গাছ নেই যাব ছায়ায় বিরজু দু'দণ্ড জিবোতে পরে। ক'দিন আগেও অনেক গাছ ছিল, ছায়া ছিল। এখন কাটা গাছের কালচে হয়ে আসা গুঁড়িগুলো শুধু পড়ে আছে। ঠিকেদার বাবুরা রাতের আন্ধারে গাছগুলো সব হাপিস করে দিয়েছে। সূর্যটা তাই সরাসরি মাথার ওপর উঠে ছোবল মারছে। মথাটা বোধহয় ফেটেই যাবে বিরজুর। আকাশকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে ওর দিকেই ধেয়ে আসছে বিবাট গোলাকার অগ্নিপিণ্ড। মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলছে যেন বিরজুর। ঘাসের বোঝা কোনরকমে তুলে নিয়ে ঘরের দিকে ছুট লাগল সে। উঠোন অব্দি পৌঁছে বোঝাটা আছড়ে মাটিতে ফেলেই বিরজু টেব পেল সূর্যটা যেন টুপ করে মাথা থেকে পেটে নেমে গেল! জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে পেটটা। সামদরিয়া ভাত দে — বিশ্ব চরাচর দু'ফাঁক করে দিতে চাইলো বিরজু একমুঠো ভাতের জন্য। কিন্তু সামদরিয়া ভাত নিয়ে আসছিল না — আসছিল না — আসছিল না .... ! পেটটাকে ছাই করে দিযে সূর্যটা আবার লাফ মেরে মাথায় চড়ে বসল — দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল মাথায় — ঘাস কাটার ধারাল কাস্তেটা শক্ত কঠিন করে বাগিয়ে ধবল বিবজু — বিবজু মাল —।

হেই সামদবিয়া — সামাল হো —।

৪.

সব দেখতে পাচ্ছিল অমিতাভ। স-ব। বিরজু মাল দু'ফাঁক কবে দিলো বউয়ের গলা। ফিনকি দিযে বেবোল সামান্য দু'চাব ফোঁটা ফ্যাকাশে রক্ত! এদিকে দুবন্ত সবুজ সহ কচি বউটিকে কব্জা করে নিলো হাবু মণ্ডল। আকাশের ওপারে আকাশ ভাঙছে। বাতাসের ওপাবে বাতাস অশান্ত হয়ে উঠছে। তাপ জন্মাচ্ছে নিচের পৃথিবীতে। একটা করে গাছ কেটেছে ওরা, ঐ হাবু মণ্ডলেবা, ঠিকেদাবেরা আব ফোঁটা ফোঁটা করে তাপ বেড়েছে হাওয়ায — মাটিতে—শরীরে—মনে—। আর তাপ জন্ম দিচ্ছে তলহীন লোভের বিষয়—প্রতিপত্তির—শরীরী সুখেব—আর তলহীন ক্রোধেবও—ঐ ছাঁটাই, নিরন্ন অবোধ লোকটাব যেমন —।

দেবব্রত দেব

বিষকরবী কথা

আমার শিয়রে ডানদিক ঘেঁষে যে জানালা, মনে হয়, সেটা কোনদিনই বন্ধ কবা হয়নি। ওই জানালাটার ওপার দিয়ে এইমাত্র সেই মেয়েটি চলে গেল।

আমাব মেয়ের চাইতে সে বড়জোব বছব আড়াই এগিয়েছে।

কদিন পব বিশ্বকর্মা পূজা। মেয়েটি সরে যেতেই আবাব খণ্ড আকাশ। আকাশে চাঁদিয়াল, লাল নীল — শৈশবে আখাউড়া চেকপোস্টে পাকিস্তানেব সঙ্গে কাটাকাটি — আমি বলতাম — 'দৈখল গুড্ডি'।

তখন আমাব বুক টনটন কবে। আব কদিনই বা। এখন সবই শে প্রায় শেষ। তবুও আমি কন্যা আব আকাশ আর ঘুড়ি দেখে তলপেট খেলিয়ে গানটা তুলে আনি, এই গানটা — 'চুড়ি নেহি ইয়ে মেবা/ দিল্ল-ইল্ হ্যায়/দেখো দেখো টুটে না —'

তার কি! সমস্ত ঘরময় তখন কুয়াশা ঢুকে পড়ে। আমাকে শাসন কবে তীর্যক বিভঙ্গে। আমিও, শ্রীযুক্ত অমবকৃষ্ণ দত্ত, জানালা দিয়ে আকাশ আব ঘুড়ি দেখি।

আমি তো দুটো সত্য বুঝি। পোষা ও পোষমানা জীবনেব সত্য হলো — মৃত্যু।

এই কারণেই আমি আগে যা কবতাম এখন তা কবি না। মানুষেব ব্যবহৃত ভঙ্গীসমূহ থেকে সবে দাঁড়িয়েছি। তেমন কান্না নেই বলে কাঁদি না। মানুষের মত আনন্দিত হই না বলে হাসি না।

এখন আমি অনেকটা — ঐ চেয়াবটাব মত। ওটাব বযস পঁযতাল্লিশ। ঐ যে, আমার শয্যার বাঁ-দিকে মাঝ বরাবব দেযালে ঠেসান দেযা — ওটায় বসলে আমাব মাথা এবং পা থেকে দুটো সবলরেখায় সমদ্বিবাহু কোণ সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে ওটা আমাব বাবাব। ছিল। ছাপ্পান্ন সালে একবার আমাদেব ভূমিতল ডুবেছিল। সপবিবাবে বাবা ছাদে পাক্কা একদিন একবাত বৃষ্টি ভিজেছিলেন। এসব কথা প্রাকৃতিক নিযম মোতাবেক আমাব মনে থাকা উচিত কিন্তু, আমাব স্মৃতি এখন বিঘ্নহীন।

এটুকু বলতে পারি, চেযাবটা বাবা বন্যাব জল থেকে ধরেছিলেন। আজ অব্দি কোন মানুষ এসে বলেনি — আবে! ওটা! ওটা তো..!

বাবা, তিনি অবশ্য আমাকে ঘোবেব মধ্যে গুঁজে দিযে আজো ঐ চেয়াবে বসেন। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই এই শয্যা থেকে। নীবব মধ্যাহ্ন যেমন সহসা বিনবিন কবে কথা বলতে শুরু করে বাবাও তেমন।

'অমবকৃষ্ণ, তোমার পত্নী কি বিপথগামীনি।' বাবাব বাক্য শেষে কোন প্রশ্ন বা বিস্ময় বা আতঙ্কসূচক ধ্বনি থাকে না।

আমি ঠোঁট না নেড়ে বলি — 'হযত, হে পিতা। হযত না।' সংসাব সম্পর্কে বাবার এটুকুই আগ্রহ। মিটে গেলে, আমি শাখান পাহাড়ে দেও নদের উৎস-গর্জন শুনতে পাই। বাবার এখনকার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অদ্ভুত মিল। কবে যে বাবা নদ-নদীর ভাষায় কথা বলতে শিখলেন!

আমি জানি মানুষ নদীর ভাষা শিখবে না। মানুষেব প্রযোজন অপ্রয়োজনের হিসেব বড় নিষ্ঠায় মেলান হয়। তার চেযে, ওসব অপ্রয়োজনীয় চর্চার চেয়ে — সিরিয়াস ছাত্রের মত পরীক্ষাহলেব করিডরে হেঁটে হেঁটে আওড়াই — ই ইজ ইক্যুযাল টু এম সি স্কোয়াব।

দুই

বিকেল হবাব একটু আগে ছেলেটা এল। আমাদেব ঠিকে ঝি ওর মা। বিকেলেব সিফ্‌টে ওর মা

খুব কমই আসে। বিশেষ করে, এসব প্রথম শরতে। ছেলেটার বাপ নির্ঘাৎ এসময় বাড়ি ফেরে।

তখন ছেলেটাই সমস্যা হয়ে ওঠার কথা। ফিকির করে ওরা তখন ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠায়। এসে, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলে — 'মা-র শইলডা খারাপ মৌশা, এই বেলা আইতো না কইছে।'

প্রত্যেকদিনই ছেলেটাকে কিছু দেব ঠিক করেই রাখি। দিইও যাহোক কিছু।

আজ আমার শিয়রের কাছে উঁচু র‍্যাকটায় এক প্যাকেট বাটার আছে। দুটো সেদ্ধকরা ডিম, শক্ত হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে।

এক কিস্তি এক্স-রে দিয়ে লোকটা বলেছিল — 'পাশের ঘরে নিয়া যান গিয়া। ডিম খাওয়ান বাটার দিয়া।'

আর, ঘরটা ছিল ফাঁকা। ফাঁকা ঘর মানেই হিড়িক। একসঙ্গে নানারকম। ফলে আমার পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সফল হয়ে গিয়েছিল।

আমি অবৈধভাবে বাটারের প্যাকেট আর সেদ্ধ ডিম দুটো ঝটপট গোপন স্থানে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর অনেকক্ষণ ঐ ঘরে কেউ আসেনি।

আমিও খেলা শুরু করে দিয়েছিলাম। একলা খেলা। আমার প্রিয় খেলা। ডিম বাটার লুকনো স্থান থেকে বের করেছি বারবার। দরজায় চোখ রেখেছি। আবার লুকিয়ে ফেলেছি। এরকম অনেকবার।

তারপর ওরা আমার ভরপেট এক্স-রে নিয়েছে। বুক থেকে সন্তর্পণে আধা-তরল জল সিরিঞ্জ দিয়ে শুষে তুলেছে। আমি বাড়ি ফিরে আসার পর সুযোগ বুঝে ঐ উঁচু র‍্যাকে সব সারবস্তু তুলে রেখেছিলাম।

যেন এক্স-রে প্লেটের ওপর ডিম আর বাটার রেখে এক করতলে ধরা। অন্য হাতে ম্যানড্রেকের মুদ্রা করে ছেলেটার সামনে ধরে বললাম — 'নে'!

– স-ব ! ছেলেটা আমার চোখে চোখ না রেখে বিস্ফারিত হল।

– সব। আমি বললাম।

এক খাবলায় নিয়ে নিল। মেঝেয় বসল। ডিম খাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে—কপ্ কপ্। তার দাঁতে ঠোঁটে জিভে সাদা-হলুদ। তারপর বাটারের প্যাকেট। সেলোফেন পেপারের মোড়ক মানেই কোথাও একটা উৎস থাকে। যেখান দিয়ে খুলবে। খুঁজে না পেয়ে অসহায় চোখে আমার দিকে তাকাল।

— ওটা পরে। আমার একটা কাজ করে দিবি ?

ছেলেটা ঠিক নাদুস না হলেও ফর্সা গোলগাল পায়ের গোছ থাই নধর নধর। বুকের পেশি এখনও পোক্ত না। সামান্য ভারী। এ-ই বারো বা তেরো বা মাঝামাঝি কোথাও।

অভিজ্ঞও। ওর মা আরো কয়েকটা বাড়িতে কাজ করে। সব বাড়িতেই অন্তত একজন অসুস্থ মানুষ— যারা চাঁচারও — থাকতেই পারে। কেউ কেউ আমার মত তেচাইল্যা। যার তিনটে চালা টান হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে একটাই বাকি চৌচালা হতে। মানে, পঞ্চাশ ছুঁই বা ছুঁই না। এমনই কেউ না কেউ এইসব ছেলেদের অভিজ্ঞ করে তোলে।

ছেলেটা মেঝে থেকে উঠে এসে আমার শয্যার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি তো শুয়েই থাকি। পাজামার দড়ি ঢিলেই থাকে। সে তার কচি আঙুল দিয়ে অভিজ্ঞ বিলি বন্টন করে আমার নাভিমূলে। তারপর টিভির বিজ্ঞাপনের মত ঢিলে পাজামার অভ্যন্তরে — যেমন যেমন তাকে শেখানো হয়েছে আর কি। সে ঢুকে যেতে থাকে কামুক অদৃশ্য ক্যামেরার অমোঘ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে।

— না ! আমি বললাম।

অবাক না হয়েই হাত সরিয়ে পকেট থেকে বাটারের প্যাকেটটা খুলে নিল ছেলেটা।

— এখন না, পরে। আগে আমার কাজ — ' আবার দেখি তার আঙুল এগিয়ে আসছে আমার পেটের রোম ছুঁয়ে দেবার ভঙ্গিতে — বললাম, 'আ:হা ! না ! ওসব না। নে, ধর !

তখন সে খামটা নিল হাত বাড়িয়ে। এ পিঠ ও পিঠ উল্টেপাল্টে দেখল।

— ইডা কি ? বাটারের প্যাকেটটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল।

— সে তোকে বুঝতে হবে না। ওটা জগন্নাথবাড়ি রোডে — আরে ! ওটা পকেটে ঢোকাচ্ছে দ্যাখো ! বাটারের প্যাকেটের সঙ্গে লেপ্টে — না, না ওটা হাতে — হ্যাঁ, এই যে, আলাদা আলতো

করে ধরে রাখ। হ্যাঁ, বলছিলাম তুই খবরের কাগজের অফিস চিনিস? চিনিস না! আচ্ছা আমি চিনিয়ে দিচ্ছি, শোন — ঐ যে ডানে মুড়লি বাঁয়ে এগিয়ে গিয়ে নাকবরাবর —' জাদুকরের মুদ্রায় ফিরে গিয়ে বলছি আমি — 'হ্যাঁ, ঐ লাল-দালানটায় ঢুকে —'

চলে গেল ছেলেটা।

এখন হয়েছে এই — যে, কোন ভুল করলাম কি? ছেলেমানুষ, ও কি কাজটা ঠিকভাবে করতে পারবে? ঠিক এভাবে আজকাল আমি ভাবি না। ওসব মানুষের বাই। মতিভ্রম মানুষের।

এ হল দিব্যশয্যা।

আমার এ শয্যায় শুলে কোন ভ্রম হয় না।

তিন

— বিধাতৃ, এক কাপ চা হবে?

— হবে। একটু অপেক্ষা করো। আমি চেঞ্জ করে কিচেনে ঢুকছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর টুং-টাং চায়ের কাপ চামচ বেজে গেল নিরবতা ভেঙে। এবার বিধাতৃ আসছে। ওর পরনে নির্ঘাৎ নতুন ছাপ-শাড়ি। আমি গন্ধ ও শব্দ, খস্ খস্ ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছি এবং চোখ বুজতেই চেয়ার টানার শব্দ। সেন্টার টেবিলে ট্রে রাখার।

— খাসা। আ-হ্!

— আজ আনলাম। ভাল না?

— দা-রু-ণ। কোন দোকান?

— ফ্লেভারা। কামান চৌমুহনীর মোড়ে। ও হ্যাঁ, কাল গোটা চারেক কাপ এনো তো। আনব্রেকেবল।

আমি চোখ বুজে রয়েছি। ত্রিদিব ওঘরে চা খাচ্ছে। ও চা খেলে শব্দ হয়। বিধাতৃর হয় না। স্বৈরিণীরা শব্দহীন চলাচল করে বলে শুনেছি। তাদের জীবনভরা শব্দই কিন্তু। এসব আমার নিঃশব্দ ধারণা।

— পাপ্পু কই, দেখছি না।

— টিচার না। আজ ইংলিশ।

— সাইকেল নিল?

— এখন নেয়। আজ নেয়নি। দু'বাড়ি পরেই তো।

খুব ভোরে ত্রিদিব পাপ্পুকে সাইকেল শেখাতে আসতো। রিক্সভাড়া ভীষণ বেড়েছে। ত্রিদিব ভাড়া বাঁচায়। আমার ফ্যামিলির কত কিছু যে বাঁচায় ত্রিদিব।

আমার কলিগ ছিল। ঘুরিয়ে পরিস্থিতি মাফিক বললে — আমি ওর কলিগ ছিলাম।

এখন পাশের ঘরে ত্রিদিব আর বিধাতৃ টুকিটাকি কথা বলছে। শয্যায় শুয়ে শুয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি। একটু আগেই ওরা দুজন অফিস থেকে ফিরেছে। আলাদা আলাদা। বিধাতৃ টেলিফোন ভবন। ত্রিদিব এজি। দুজনেই সেন্ট্রাল গবমেন্ট। ন'টা-ছ'টা।

আমার আর বিধাতৃর একমাত্র সন্তান পাপ্পু। স্কুল থেকে টিচারের বাড়ি চলে যায়। ওর পড়ার খুব চাপ। সেন্ট্রাল স্কুল। আমার ইচ্ছে ও ওর মত বেড়ে উঠুক। বিধাতৃর অন্য ইচ্ছে। পাপ্পুকে ডাক্তারী বা কম্পিউটার করতেই হবে।

— ওর মেচা কিন্তু আর্টসের দিকে। ত্রিদিবের মুখে বোধহয় বিস্কিট টিস্কিট।

— কী জানি। সে তুমি বোঝ। শেষ চুমুকের পর কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে যেমন বলে বিধাতৃ।

আমি জানি কাল আমার আবার ইসিজি হবে। হলেই বিজ্ঞাপনটা বেরুবে কাগজে। তার আগে কিছু একটা ঘটে না গেলেই হয়। সিটিস্ক্যান আগেও একবার হয়েছে। ত্রিদিবই করিয়েছে। আবারও হয়ত হবে। এবারও ত্রিদিবই করাবে। তবে এখানে না। কলকাতায়।

তখন তো ত্রিদিব বেশ আঁটোসাঁটো। আমার মেডিকেল এইডের টাকা নিয়ে সেদিন এসেছিল। সহকর্মীরা তো আসবেই। ও ছাড়া অন্যরাও আসে। এখন কম। এখন শুধু ত্রিদিব। আমি তো দেড়বছর ধরে উইদাউট-পে।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এডভান্স -ফর্ম সই করাতে যেদিন ঢুকলো — সেই অব্দি আমার সন্দেহ যথেষ্ট গাঢ় হয়েছে। বিধাতৃ পারবে না। পারবে না তার কারণ টিভিতে সেসব দিনে লোহিত কিনারে চলছিল।

বিধাতৃ বলত — 'থাক আলো। চলুক টিভি। লোহিত কিনাবে টিনারে আমি দেখি না। এক রাউণ্ড হয়ে যাক এই ফাঁকে। এসো। দুপুর থেকেই আজ — এ্যাই, জানো শিবানী আজ কী করল . . উহ্ ... দুপুরে বরকে ফোন করে বাড়ি নিয়ে চলে গেল ...আহ্.. কই! এসো!

বিধাতৃ পারবে! কিছুতেই না। ওতো কামুকী। ঘি আর আগুন ইকুয়াল টু-বিধাতৃ-ত্রিদিব।

বৃহস্পতিবার এলেই তারপর থেকে আমি সাপ্তাহিক হিসেবে গোলমাল শুরু করি। আজও সেই একই গোলমাল চলছে।

কারণ বিধাতৃ বৃহস্পতিবাব নিয়ম কবে পাঁচালি আরতি আর একটাই গান তার সাপ্তাহিক। 'গুরুদেব দয়া করো দীনজনে/ভবসাগর তাবণ কারণ হে'।

বিধাতৃ কেন পারবে! কাজে কাজেই আমি ভীষণ সন্দেহে গলগল করে গলছি তখন ফর্ম হাতে ত্রিদিবকে দেখে।

— ত্রিদিব! এ সময় কেউ সাদা শার্ট প'রে আসে! লাল সার্ট নেই? তোমার! ত্রিদিব? ছি:! একটানা বলে আমি হাঁফাচ্ছিলাম।

গানও থেমে গিয়েছিল ঠাকুরঘরে। বিধাতৃর সব খেয়াল থাকে। মা আমার বড় লক্ষ্মীমন্ত। খাবার পর হাতের কাছে পান রেডি পেয়ে আমার বাবা ভীষণ তৃপ্তি পেতেন। বিধাতৃর ঘোমটাটানা আবছা মুখ নিচু কবে প্রশংসা নেবাব ভঙ্গিটা অবিকল গৃহদাহের অচলা।

অচলাই যেন সে; ঘৃণা আর ক্রোধ মিশিয়ে চাপা স্বরে দু'ঘরেব মাঝখানের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল। 'ছি:। অমব!'

তার ঘোমটা খসে সে তখন সাক্ষাৎ রিক্তা। তখন উল্টোরথে সুচিত্রা সেনেব ছবির মত। সৃষ্টি-স্থিতি কাঁপিয়ে দেয়া সেই ছবিটা — যেটায় ছেলের হাতে মায়েব মৃত্যু ঘটে — আমি ভুলে যাই ইদানিং নামটাম।

সবই বলা হযে যায় এমন সুনির্দিষ্ট চাহনি বোধহয় পুরুষেব অন্তর্গত নয়। ত্রিদিব ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। শুধু বলেছিল—'টাকাতো লাগবে। এটায় সই কবে দাও।'

আমি তাও বলতে পারি নি। অথচ বলতে চেয়েছিলাম মেযেটার দিকে লক্ষ্য বেখো তোমবা। আমার আব কিছু বলার নেই। মনে মনে তো আমি তোমাদের দুজনেবই গলা টিপেই চলেছি। জোড়াখুন! কিন্তু হচ্ছে না। হয়ে উঠছে না। তোমবা কথা বলতে বলতে—মানে, সাংসাবিক কথা, রাজনৈতিক, ডাঙ্কেল কমিশন, উন্মুক্ত অর্থনীতি — এসব যাহোক কিছু নিযে কথা বলতে বলতে — একটা রিদমও তো লাগে না কি! ওঘরে তোমরা হঠাৎ নি:শব্দ হলে, কিছুক্ষণের জন্যে — না, দোহাই তোমাদের। আমার লাগে। ভীষণ। আমি তো অসুস্থ। রোগগ্রস্ত। সময় হযনি এখনো। সময় না হলে কেউই যে মরতে চায় না। এ সত্যটা জান না তোমরা? জান না! মেয়েটার পায়ের শব্দ শুনতে পাবে না ঐ সময়। জান তো আজকালকাব বাচ্চারা— তোমরা পিয়ানো দেখোনি? যে ছবিটা অস্কার না কি পেল? মিনিমাম এই সেন্সটুকু...'

— তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম, ভেবেছো? চিন্তাগ্রস্ত শোনাল বিধাতৃব স্বর।

— দাঁড়াও না। আর ক'টা দিন যাক। ত্রিদিব সামান্য বিবক্তিও চেপে রাখতে পারে না।

আবাব চুপচাপ। ফ্যানের শন্-শন্ শব্দ। ওই ঘরের ফ্যানটা আমি আর্মি ক্যান্টিন থেকে এনেছিলাম। সঙ্গে এক বোতল রাম। রাতে পেটে দু-পেগ পড়েছে কি পড়েনি — এসো এসো। আমি আর অপেক্ষা কবতে পারি না। বিধাতৃ চিবিয়ে ছিবড়ে কবেও পুঁইডাঁটা দাঁতের ফাঁকে রাখতে ভালবাসে। তলপেটের ব্যথাটা খোলসা করতাম না তবুও। ইতর গাধা মাকাল — তোমার চেয়ে একটা ঘাটের মড়াও — খাটের একপাশে অর্ধ-বজ্রাসনে বসা ভঙ্গি আমি কতবার যে পিঠের দিক থেকে দেখেছি।

ভীষণ ব্যথাটা ঠিক তার তিন মাসের মাথায় অর্জন করেছিলাম আমি।

— ব্যাপারটা স্কুলের — সরু হয়ে এসেছে বিধাতৃ। একটু পরেই আর শোনা যাবে না কিছুক্ষণ।

— হয়ে এসেছে। নেক্সট সেসান। আগামী মাসে নিয়ে গিযে — আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

ও ঘরের চলন্ত সিলিং ফ্যানের শব্দ সহসা বেড়ে গেল।

এখন আর তেমন কিছু হয় না। শরীরী স্থাপত্যে ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দেওয়া আনন্দ নাকি কোনদিন হয়নি বিধাতৃর। নয় নয় করেও আমাদের বিছানার বয়স পনের বছর। সপ্তাহে এভাবেজ তিন। বিধাতৃর মতে খচে যাবার জন্যে যথেষ্ট। তবুও হিসেবটা তো এমন — ফিফ্‌টিটু ইন্‌টু থ্রি ইন্‌টু দশ! এ-ক-বা-র-ও না!

বিধাতৃ আসলে কাজল দিঘী।

অথচ টেমির দু'বার, তিনবারও। ওর টিন-এজ পেকতে পেকতে — একদিন কেন যে ভরদুপুরে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। খুব খুশি হয়ে টেমি আমাকে খাবার বেড়ে দিয়েছে। বারবার জিজ্ঞেস করেছে, 'মৌশা, আরেট্টু হঁচা-গুঁড়ার তরকারী লন? একহাতা ভাত দেই?' এভাবে বহুকাল আগে একজন বলতো।

মুখটুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখেছি পান জর্দা সব রেডি। বিছানাও। টানটান। এমনকি সাদা চাদরও।

— ওটা কেন করেছিস। আমি এক্ষুণি ফিরব। অফিস না।

— এট্টু জিরাইয়া লন না মৌশা। ভাত তরকারী এট্টু তল পড়লে যাইবেন নে।

আমার চুলের গোড়ায় গোড়ায় ভীষণ ব্যথা হতেই পারে। আমি চুপচাপ মধ্যাহ্নকে, বলতেই পারি — 'দে তো, আমার চুলে হাত চালিয়ে দে দেখি।'

প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত আমি রুখে দিতে পারিনি।

চুল থেকে কখন আমার পাশে এবং মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখেছি ইজের ফ্রক ইত্যাদির সঙ্গে আমার লুঙ্গি। গড়াগড়িও গলাগলিও।

টেমির প্রশ্বাসের হাল্কা বাষ্প আমার নাকের ডগায় ভ্রূপল্লবে ধাক্কা খেল। ফিরে গেল না। 'আমার মা-বাপ নাই। যদি কিচ্ছু হয়।'

আমি আধবোজা। কাক্কেশ্বর কুচকুচে। টিপ করে একটা প্রণাম করেছিল টেমি। আমি গ্রহণ করেছি।

তারপর দুপুর গড়িয়ে গিয়ে টেমিকে আবার জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল নিরাপদ দূরত্বে। আমি আবিষ্কার করেছিলাম বিধাতৃ একটা জ্বলন্ত আর উন্মুক্ত মোম হাতে আমার অভ্যন্তরে তখনো ঘুরপাক খাচ্ছে।

চেষ্টা করেছি। বহুবার ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি আমার নবতম অর্জন। একবার মনে হয়েছে পেরেছি। একবার বুঝতে পেরেছি পারিনি।

কোন প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ টেমিকে খাবলে বুকের ওপর চেপে ধরে ঝিমঝিম ঝিমঝিম। কেঁদেছিলাম আমি। কেন কে জানে। নি:শব্দে কেঁপে উঠে তার গড়ন্ত স্তনের ওপর আমার মাথাটা প্রাণপণে চেপে ধরেছিল। পাগলের মত থুতনি দিয়ে আমার চুল এলোমেলো করেছিল। আর, কেঁদেছিল। কেন কে জানে।

আমার মনের ভিতর একটি ছবি ভেসে বেড়িয়েছিল। অনেক অনেক দিন আগেকার। ভয়ের প্রভাবে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত এক কিশোরের ছবি। একজন মাঝবয়েসী মহিলা শান্ত হাতে কিশোরের তপ্ত কপালে জলপট্টি বদলে দিচ্ছিলেন। এসব ছবি, পুরনো ছবি—কেন কে জানে।

টেমির সঙ্গে সেই-ই শেষ।

রোগশয্যার প্রথম মাসে ত্রিদিব তখন দুবেলা—সে সময় টেমি এক সকালে আমার এই ঘরে এসেছিল।

— মৌশা। অসম্ভব শরীরবিহীন স্বরে ডেকেছিল। চোখ জ্বালা করছিল আমার। লালও বোধ হয়। তখন এমনই সিমটম। তবু চোখ মেলেছিলাম।

— আমি যাই, মৌশা।

আমি তো নদীর মত। গোমতী নদীর মত সুভাষ বোসের নামে সেতু হয়ে যাবার পর যে নদীতে আর বান ডাকে না। শুধু ভাটার টান। তাকিয়েই ছিলাম।

— মাইনষে শুইয়া থাকলে পাওয়ে ধইরা ভক্তি করন নাই। মাটিতে হাত ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল — 'আমার ভক্তি লইয়েন, মৌশা'।

পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল টোমি । ঠিক তখনই আমার মনের ভিতর চারজন মাত্র শববাহক । আমি ছোটমামা জগাদা আর চিন্ময় । চিন্ময় আমি হরিপদকাকু আর মণি জেঠু । আবির জামাইবাবু সন্তোষ আর আমি । ঝুলন্ত দুলন্ত খাটে সাদা কাপড়ে মোড়া সাদা মশারীতে ঢাকা এক নারীদেহে কী প্রগাঢ় বৈভব । বৈভব আর সহন । সহন আর রহস্য ।

আগুনের পাটকাঠি হাতে আমি বুঝি শূন্য শয্যায় আরও একবার নিরুচ্চার বলেছিলাম — জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু ....'

চার

ফোর্থ পেজ ডাবল কলামে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে । সেল ! সেল ! ভীষণরকমভাবে এবং প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে । রিপিট, মুহূর্তের কোটিভাগের একভাগ — এই এককে হিসেব করলে যতটুকু, ততটুকুও পরস্য নয় এমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি । যোগাযোগ —

— বিজ্ঞাপনটা তুমি দিয়েছো ? ছোট্ট একটা গ্লাসে করে আমার সকালের ওষুধ এগিয়ে দিতে দিতে বিধাতৃ বলল ।

আমি বললাম — হ্যাঁ । ..... আরে ! এখানে একটা পুরনো উল্টোরথ ছিল — বহু পুরনো, তুমি নিয়েছো ?

— না । কী বিক্রি ?

— পা-র-সো-ন্যা-ল বিলঙগিংস্ । বইটা ··· এখানেই তো ছিল ! আমি যথাসম্ভব ঘাড় উঁচু করে এদিক ওদিক দেখলাম ।

— হয়ত খাটের ওপাশ দিয়ে তলায়—হোয়াট সর্টস্ অব পার্সোন্যাল বিলঙগিংস?

— হ্যাঁ, তলায়ই পড়েছে তাহলে । একবার দেখবে, তলাটা ?

— দেখব । পরে । কী কী ? সামান্য ঝুঁকে পড়েছে এবার বিধাতৃ ।

— কী নয় ! আজ আমার দিন । এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছি আজ আমারই দিন ।

— যা যা তোমার, এই তো ?

— হ্যাঁ । যা যা আমার । আমি দাঁত দিয়ে দাঁত চিবিয়ে বললাম ।

— কী কী তোমার ? সামান্য হাসে এবার বিধাতৃ । তার হাসির শব্দ আমার কান বরাবর থাপ্পড় মারে সহসা । আমি গন্ধও পাই । হাসির গন্ধ । ফিল্টার উইলস্ । ত্রিদিবের ব্রাণ্ড ।

— সব । স-অ-অ-ব ! তারপর ভিতরে ভিতরে বললাম — তু ভি ক্যা ইয়াদ করেগা, প্রেম নাম হ্যায় মেরা — প্রেম চোপড়া !

— স-ব ! মানে, ফ্রিজ টিভি । মোটরবাইক । টেপ রেডিও চেয়ার টেবিল আলনা বিছানা বালিশ তোষক – এই বাড়িটা —

— আর মেয়েটা । বাইরে বলি । ভিতরে অন্য সংলাপ । আব আয়েগা মজ্জা খেল্ কা ! আমার জিভ থেকে বোধহয় রস গড়ালো খানিকটা ।

— ফর আ চেঞ্জ — তাও । আর ? কৌতুক ঝিলঝিল করলো তার দুচোখের তারায় । কয়েকবার ।

এবার একটু ধন্দে পড়ে গেলাম । কী বলতে চাইছে বিধাতৃ ! কোনদিক থেকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে । এই অব্দি যতটা কথা হয়েছে — বিধাতৃর তো ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার কথা । ওর কি মারাত্মক কোন প্ল্যান আছে ? ফারদার ফেটাল !

কিছুটা বিব্রত চিন্তার স্রোতে ভেসে পড়তে পড়তেও সামলে নিলাম ।

— আইনসম্মতভাবে যা কিছু আমার সে-সবই আমার ! একটু গোঁয়ারের ভাষায় বললাম ।

— তাহলে তো আমিও ! আরো কৌতুক । তার দুচোখে তো বটেই । এমনকি ঝুঁকে দাঁড়াবার ফলে তার অন্তর্বন্ধনীহীন অদৃশ্য কিন্তু আভাসদায়ী স্তনের দুলুনিতে কৌতুক । ঘাড়ের বাঁ-পাশে একটা লালচে জড়ুল — একবার সিপাইজলার স্তব্ধ অভয়ারণ্যে আমার কাঁধে মাথা রেখে হাঁটার সময় একটা কুচুটে পাখি হলদে বটফল ফেলেছিল টিপ করে ঐ জড়ুলের ওপর — ওটায়ও কৌতুক । বাড়িয়ে ধরা ওষুধের গ্লাসেও । বলল — 'ধরো, ওষুধটা খেয়ে নাও।' সেই বলার শিল্পেও কৌতুক ।

— বিষটিষ না তো ! আমিও কৌতুক করি । আজ আমার দিন । আমি জানি আজ আমারই

দিন।

— না। সহজ স্বর, তবে ক্লান্ত। অথবা নিপুণ অভিনয়। — কি আমি নই ?

আমি শুনতে না চাইলে কী হবে। শুনতে পেলাম ঠিক। কী একটা যেন আছে বিধাতৃর বলার মধ্যে, দানাদার — সে কি। কষ্ট ? না কি বেদনা!

বেদনা শব্দটা আমার শরীরের কোথাও ধরে রাখতে পারি না কিছুতেই। রামাশ্যামা যারই হোক। আমি বেকায়দায়। সহসা, সমস্ত জীবনভর যে চলে এসেছি এই অঙ্ক, সবটাই বেকায়দায় মনে হল। ধৈর্য্য ধরে ব্যূহটা পরিকল্পনা করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমি যা ভীষণভাবে অপছন্দ করি — সেই নাতিনাদুস ছেলেটার, যার তেরো প্লাস সুডৌল উরু অভিজ্ঞতায় টসটসে ঈষৎ বক্তবর্ণ ঠোঁট চামনে আঙুল — সেই ছেলে আমার ঢিলে করে বাঁধা পাজামার ভিতরে ভস করে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার হাত।

— দাও না সব বিক্রি করে। স-ব। স-অ-অ-ব!

অপরিচিত বিধাতৃর গলার স্বর। এই স্বর বুঝি অনেক দিন আগে ভীষণ চিনতাম। এখন মনে হচ্ছে, এ তো টেমির গলার স্বর! ঝুঁকে ফিসফিস করে বলছে — 'মাইনষে শুইয়া থাকলে পাওয়ে ধইরা ভক্তি করন নাই ...'।

সব ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। ষড়যন্ত্রটা, ব্যূহটা উন্মোচিত হয়ে পড়ছে দ্রুত। প্রতিরোধ খুঁজছি আমি।

— দিয়ে দাও না সব। আমরা একটু বাঁচি। এই এতটুকু। আমি পাপ্পু ত্রিদিব আমরা কি বাঁচতে চাইতেও পারি না। তুমি ?

গলছে। সব। আমি টের পাচ্ছিলাম বিধাতৃর ভাষার পাকস্থলিতে ছিল আকুতি ও নিষ্ঠা। প্রতিস্পর্ধী তৃপ্তিকামনা ও অহঙ্কার। এ সবই ধ্বংসগন্ধী। যে কোন সৃষ্টি, মানুষের উৎপাদন বৈভব—সব বিধ্বংস করে দিতে পারে। সব শব্দ। শব্দ-শৃঙ্খল।

আমিও এলোমেলো। উন্মোচিত। পরাভূত। ভিতরে জিঘাংসার নদ। এখন মৃত আত্মার পুণ্যস্রোতে পরিণত হলে আমি মূক হয়ে রইলাম।

পাঁচ

অনেকদিন বাদে আজ এঘরে চায়ের আসর। সেন্টার টেবিলটাও চা-গাছের মূল। ভীষণ মূল্যবান। ইতিহাসে এবং সংগ্রহে। এক ক্ষয়িষ্ণু রাজপুরুষ যখন ভাগ্যান্বেষণে ত্রিপুরা ছাড়ছেন তখন জলের দামে আমি ওটা কিনেছিলাম বা সংগ্রহ — এ তথ্য আমি ভুলে যেতে চাইছি।

আমার বিছানার পাশে সেই টেবিল দুপাশে দুটো চেয়ার। একটায় ত্রিদিব বসেছে। এইমাত্র বহুদিন পর আজ আমি আধশোয়া। ত্রিদিব খুব যত্ন করে আমার মাথার দিক বিধাতৃ পা — ওরাই আমাকে খানিকটা তুলে ধরেছে আজ।

এমনকি আজ পাপ্পুর টিচার নেই। ঐ তো দূরে ফ্লোরে বসে — ও কি ছবি আঁকছে ? হয়ত। আমি ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জাম দেখতে পাচ্ছি।

বললাম — কী করছিস তুই, মা।

বলল — দেখাব। আগে — না, তুমি উঁকি দেবে না একদম। বলে আরো আড়াল করে বসল পাপ্পু।

—ভাল লাগছে, না অমরদা। ত্রিদিব বলল। একটু উঠে বসলে আরো ভাল লাগবে। কতদিন উঠে বসোনি তুমি।

— দারুণ। আমি বলি। বিধাতৃ কই ?

— চা আনছে। না না, তুমি বেশি নড়ো না। আর ক'টা দিন যাক। তারপর। অতিথি খাবার পর থালা হাতে উঠতে গেলে গৃহস্বামী যেমনভাবে হা-হা করে বলে ত্রিদিব তেমন করে বলল।

বিধাতৃ চা নিয়ে ঢুকতে চাইছে। পর্দার জন্যে পারছে না। তার দুহাতেই চা। পর্দাটাও ভাবি। মনে করতে চাই নি। তবু মনে পড়ে গেল খুব কম দামে পর্দার জন্য দুটো থান আসাম-রাইফেলস্ ক্যান্টিন থেকে কিনেছিলাম।

— পর্দাটা একটু সরাও না। বিধাতৃ ওপাশ থেকে বলল। ত্রিদিব অবিকল আমার ঢঙে উঠে

গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে ধরল। ঢুকতে ঢুকতে বিধাতৃ মুচকি হাসল। যেমন হাসত।

আমি আবার বললাম — দারুণ!

— কী ? হাল্কা মজলিশী প্রশ্নে বিধাতৃ তাকায়।

— চা। তুমি তো বাইক চড়তে জানো, না ত্রিদিব ?

— হ্যাঁ। ত্রিদিব বলে।

— তুমি আমারটা — মানে, বলছি যে পড়েই তো রয়েছে — ওটা চড়তে পারো। কখন আবার জণ্ড-টণ্ড ধরে .....

— তা ঠিক। চায়ে চুমুক দেয় ত্রিদিব।

— তাছাড়া এঘরে টেপ রেকর্ডার বা টিভির কী দরকার ? ও ঘরে নিয়ে নিও। নাও না কেন! নিয়ে নিও। আমি ভেঙে ভেঙে বলি।

— থা-আ-ক-না! কাপ রাখতে রাখতে বলে ত্রিদিব।

— কিন্তু এটা — এটা তোমার ভী-ষ-ণ অন্যায় ত্রিদিব !

ত্রিদিব হাসি-লজ্জা-নম্র চোখে তাকাল আমার দিকে। চোখ সরিয়ে নিল। আবার তাকাল। এবার বিস্ময়, সামান্য। হাল্কা করে প্রশ্নও মেশানো।

— না, এ ঘোরতর অন্যায়! তুমি এখানে থাকো না কেন ? ভাড়াই তো থাক বাপু! এ কি ঠিক কথা! না না, তুমি আজ থেকেই — আচ্ছা, কী অসুবিধা তোমার এখানে ?

— না, অ-সুবিধা আর কী — শিথিল স্বর থামিয়ে দেয় ত্রিদিব।

— তাহলে! আমি বলি।

— থাকব।

তারপরও আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। এখন আমি নতুন ভাষায় অনেক বপ্ত। বিশ্বাস করতে চাই সব অনন্ত রহস্য। অনিত্য সংসার। কেউ কারো না। কিছুই কারো না। সবই তোমার। তোমার আবার কিছুই না। সঠিক শব্দটা হলো — সবাই। আমি না। ওটা ভুল শব্দ। ফলে হাসলাম। অনেকদিন পর। একা না। সবাই মিলে। কারণ কথাটা হাস্যকরই ছিল বোধ হয়।

কেননা আমি বলেছি — আর হ্যাঁ, শোন ত্রিদিব লাল সার্ট তোমাকে পরতে হবে না। আই উইথড্র!

— তাহলে ? কে পরবে লাল ? ত্রিদিব অবাক।

— কেন! আমি পরব।

এই হল হাসির কথা। ত্রিবেণী হয়ে গেল হাসির। সঙ্গম। আমি বিধাতৃ ত্রিদিব।

কেবল পাপ্পু না।

পাপ্পু ভীষণ ঝুঁকে বসে গভীর কোন ছবিতে মগ্ন। আমি সারাক্ষণ একটা চোখে ওকে ছুঁয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিলাম — অনিত্য হে। অনিত্য হে। হে অনিত্য।

ছয়

রাত।

ওপাশে আলো নিভেছে। অনেকক্ষণ। মাঝে একবার মিনিট পনেরোর মত জ্বলে নিভেছে।

এখন অন্ধকার।

এ ঘরে সারারাত বাল্ব জ্বলে। জ্বলছে। আমার বালিশের পাশে আজ পুরনো উল্টোরথ নেই। অন্য কী একটা বই। একটু পরে বইটা আমি পড়তে শুরু করব।

তার আগে একটা হিসেব। মানুষের অংকে ও ভাষায় মিলিয়ে নেওয়া একান্তই দরকারী। তখনই শুরু করেছিলাম হিসেবটা, এভাবে —

অনিত্য হে, কোন সালে চেয়ার ভেসে যাচ্ছিল বানে ?

মনে নেই।

আগরতলায় প্রথম স্কুটার করে এলো ?

মনে নেই।

দু'চার কথা লোহিত কিনারে বা সিটিজ্যান বা যাহোক কিছু সম্পর্কে সংক্ষেপে বল।

মনে নেই।

— তাহলে বাকি কী রইল ত্রিদিব ? লোডসেডিঙ হবার আগে আমি বলেছিলাম।

— ও বাপি, হচ্ছে না ! ধু-র ! এটা একটা বাজে — পাপ্পু তুলিটুলি ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িযে এবং প্রায় ছুটে আমাব কাছে— তখন ভীষণ অসহায় দেখিয়েছিল ঐটুকুন মেয়েটাকে। ফ্লোবের দিকে চোখ ফেলে দেখেছি রঙ। একটাই। কালো। কৌটো উল্টে গড়াচ্ছে এখানে ওখানে।

— কী হচ্ছে না ? আমি বলেছিলাম।

— ছবিটা। হবে না ওটা। থাক। ফেলে দিযেছি। বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবংআমাব নাকেব ডগায় নাক। আজ আমি তোমার সঙ্গে শোব। ক-ত-দি-ন শুই না তোমাবগলা জড়িয়ে।

সাত

হিসেব মিলছে।

হিসেব বলছে, আমি অনেক কিছু জানি। এত গভীব আমি। আমি ইচ্ছে কবলেএকটা আগ্নেযগিরীব মুখে বসে যুগ যুগ তপস্যা কবতে পাবি। আমি এত বিশুদ্ধ।

হিসেব বলছে ।

বলছে — তুমি হুবহু মুকেশেব মত গাইতে পার — 'দুনিয়া বানানেবালে/ক্যা তেবে মনমে সমায়ি/কাঁহে কো দুনিয়া বানাযি।' তুমি, এত মগ্ন এখন।

তুমি এখন বাতাসেব সঙ্গে যে কোন শর্তে পাল্লা দিতে পারো। এতো গতিবান এখন, তুমি।

হিসেব বলছে — হা অনিত্য।

শুধু তুমি জানতে পাববে না — পুরুষ বা পিতা বা ঔরসেব অধিকারী কেন পুঁতে বাখে একটা করবীচারা ; তার নিজস্ব আঙিনায ?

এবাব কববী দারুণ বিষ হবে।

অসীমান্তিক লেখক পরিচিতি

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য : ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার খাগড়া গ্রামে জন্ম। পেশায় অধ্যাপক। ছাত্রাবস্থায় মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত 'সমকাল' সাহিত্যপত্রটি সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশিত গল্প সংকলন 'খড়ের মানুষ' এবং 'দশক ও দুই।' প্রকাশিত উপন্যাস 'সময়ের অপেক্ষায়।'

অভিজিৎ সেন : ২৮ জানুয়ারী ১৯৪৫-এ বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কেওড়াগ্রামে জন্ম। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ 'বহু চণ্ডালের হাড়', 'ছায়ার পাখি', 'আঁধার মহিষ' ইত্যাদি। বঙ্কিম পুরস্কার লাভ করেছেন।

অমর মিত্র : ৩০ আগষ্ট ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের ধূলিহর, সাতক্ষীরায় জন্ম। হিন্দী, ইংরেজী, তামিল, মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গল্প। 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ', 'অমর মিত্রর ছোট গল্প', 'বসন্ত বিলাস' ইত্যাদি মোট পনেরটি গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। লাভ করেছেন – সমরেশ বসু পুরস্কার, সমতট পুরস্কার, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার।

অসীম ত্রিবেদী : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চব্বিশ পরগণার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের জাতীয় সঞ্চয় সংস্থায় কর্মরত। ১৯৮৮-এ তাঁর প্রথম গল্পটি 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গল্প সংকলন – 'অবেলার গল্প' এবং 'বর্ণপরিচয়। ১৯৯৫-এ পেয়েছেন গল্পমেলা পুরস্কার।

কামাল হোসেন : ১৭ জুলাই ১৯৫৬-এ কলকাতায় জন্ম। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্তের মানুষ।' প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ 'বাণপ্রস্থ', 'অন্য আকাশ', 'মর্ত্যে তিন পরী' ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার জয়ী এই সাহিত্যিক ১৯৯৪ সালে পান সোমেন চন্দ পুরস্কার।

কিন্নর রায় : ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর কলকাতার চেতলায় পিসিমার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো সময়ের জন্য সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। 'একালের রক্তকরবী' পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদক। প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পুরস্কার লাভ করেছেন-১৯৯৩-এ সোপান পুরস্কার ও চন্দননগরের গল্পমেলা পুরস্কার, ১৯৯৪-এ রণজিৎ স্মৃতি শৈব্যা পুরস্কার, ১৯৯৫-এ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯৯৬-৯৭-এ পূর্ণিমা পুরস্কার। ১৯৯৫ সালে সাহিত্য অকাদেমির ভ্রমণভাতা পেয়ে ভারত ভ্রমণ করেন।

নলিনী বেরা : ২০ জুলাই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে জন্ম। পেশা সরকারী চাকরি। প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ – 'ভাসান', 'শবরপুরাণ', 'এই এই লোকগুলো' ইত্যাদি। প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'হলুদ বনের টুসু।'। গল্পমেলা পুরস্কার ও সোপান পুরস্কার লাভ করেছেন।

ভগীরথ মিশ্র : ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার সাঁতরাপুর গ্রামে জন্ম। পেশায় সরকারী অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্থ –'আড়কাঠি', 'অন্তর্গত নীল স্রোত', 'মৃগয়া', 'চারণ ভূমি' ইত্যাদি। সমরেশ বসু পুরস্কার, কথা পুরস্কার এবং তারাশঙ্কর পুরস্কার লাভ করেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ম্যাজিক শিল্পে আগ্রহী।

মুর্শিদ এ. এম. : ৯ মার্চ ১৯৫৬-এ কলকাতার ব্রহ্মপুরে জন্ম। পেশা ব্যবসা। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'জাড়কাঁটা' এবং 'ফেরেশতা।' ১৯৯৬-এ পেয়েছেন চন্দননগর গল্পমেলা পুরস্কার।

মানব চক্রবর্তী ঃ জন্ম ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫১-য জামশেদপুরে। সাহিত্যই জীবিকা। প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য – 'কুশ', 'আগুনের কুয়োতলা', 'প্রীতিকথন নিম ডাইরি' (উপন্যাস), 'সমীপেষু', 'ওয়াগুাবের মৃত্যু' ইত্যাদি।

রবিশংকর বল ঃ ৮ মে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায জন্মগ্রহণ কবেন। একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে চাকরি করেন। প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ – 'রবিশংকর বলের গল্প', 'স্বপ্ন যুগল', 'আর্তের শেষ অভিনয়' ইত্যাদি। সম্পাদনা কবেছেন 'আধুনিকতা, প্রগতি ও ইতিহাস' গ্রন্থটি।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ৮ মার্চ ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। কর্মসূত্রে ভারত সবকারের মানব উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্য অকাদেমির সহকারী সম্পাদক। নযের দশকের শুরুতে বাংলা ছোট গল্প (১৯৭০-১৯৯০) বিষয়ে গবেষণা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ কবেন। একাধিক লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ – 'চাবণে প্রান্তরে', 'ব্রিগেড', 'মাদলে নতুন বোল' ইত্যাদি।

বীরেন শাসমল ঃ ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার কিয়া গ্রামে জন্ম। ব্যাঙ্ক কর্মী। আবৃত্তি, নাটক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে দীর্ঘদিন পথ-নাটিকা কবেছেন। 'তীব্র কুঠার' নামক গল্প পত্রিকার সম্পাদক। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য – 'গ্রামনগরের গল্প', 'সাদা চিঠি লাল বর্ণমালা', 'আঁধিগ্রামে আলো' ইত্যাদি। ৯২-৯৩ সমতট পুরস্কার এবং ১৯৯৫-এ উত্তরাপথ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন।

সমীর চৌধুরী ঃ ১৭ এপ্রিল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায জন্মগ্রহণ কবেন। পেশায কম্পিউটার অপারেটার। 'লিটিল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৪৭-১৯৯৭)' সংকলনটি সম্পাদনা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ 'গুটেনবার্গের সৈন্য'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুযারী বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শোলনা গ্রামে জন্ম। পেশা শিক্ষকতা। সম্পাদনা কবেন 'ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি। প্রকাশিত গ্রন্থ 'পক্ষ বিপক্ষ', 'সাধন চট্টোপাধ্যাযের গল্প সমগ্র ১,২', 'নির্বাচিত গল্প' এবং 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প'। সোমেন চন্দ পুরস্কার, দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার এবং বি এফ জে এ পুরস্কার লাভ কবেছেন।

সৈকত রক্ষিত ঃ ৩ মার্চ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরুলিয়া জেলার সিন্দরি গ্রামে জন্ম। সর্বক্ষণের সাহিত্যকর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ 'আবাম চেযার', 'আকরিক', 'শব্দভেদী' ইত্যাদি। সম্পাদনা করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়নের – 'আমার জীবন যাত্রা' গ্রন্থটি। পুরস্কার লাভ করেছেন, ১৯৯০-৯১-এ বাকচর্চা পুরস্কার, ১৯৯৭-এ বাংলা অকাদেমি সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কার। ১৯৯৫-৯৬ সালে কেন্দ্রীয় সবকারের মানব সম্পদ মন্ত্রক কর্তৃক ফেলোশিপ লাভ কবেছেন।

সোহরাব হোসেন ঃ ২৫ নভেম্বর ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বসিরহাটে জন্ম। পেশা অধ্যাপনা। একটা রূপকথার বিবরণ অথবা কেয়ামতের দরবেশ হবার কাহিনী' উপন্যাসটির জন্য পেয়েছেন দিবারাত্রির কাব্য পুরস্কার। প্রকাশিত কবিতা ও গল্পগ্রন্থ –'বক্তদেহে অন্যস্বর', 'বৃষ্টির নামতা', 'দোজখের ফেরেশ্‌তা'।

স্বপন সেন ঃ ১১ নভেম্বর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায জন্ম। একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরীরত। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'প্রত্নভূমিতে কুচকাওয়াজ'।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী ঃ পঞ্চাশের প্রথমপর্বে জন্ম। ইতিমধ্যে আধুনিক বাংলা গল্প উপন্যাস রচনায় এক অতি

33

পরিচিত নাম। প্রকাশিত গ্রন্থ একাধিক। বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রচার বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মরত।

অনুপ ভট্টাচার্য ঃ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল জন্ম। পেশা সরকারি চাকবি। সত্তর দশকের শুরু থেকে গল্প লিখতে শুরু করেন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'পাখি ও পালক'।

অমিতাভ দেব চৌধুরী ঃ ষাটের প্রথমার্ধে জন্ম। শিলচব নিবাসী। গল্প ও কবিতা দুই'ই লেখেন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বাজে খাতা'। শিক্ষকতা করেন।

অরিজিৎ চৌধুরী ঃ ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে অসমেব কবিমগঞ্জে জন্ম। পেশা সবকারি চাকরি। বর্তমানে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক, করিমগঞ্জ। আজ পর্যন্ত তার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

অলক দাশগুপ্ত ঃ ৩ জানুয়ারী ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আগবতলায় জন্ম। পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী। সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রস্তাবিত আত্মনাশা দলিল'। অলংকরণ করেছেন কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী'র ককবরক উপকথা 'কেবেঙ কথমা' গ্রন্থটি। ত্রিপুরায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ কমিকস্ তৈরী করেছেন।

কিশোর রঞ্জন দে ঃ ১৯৫৩-ব নভেম্বর মাসে অসমেব উত্তর লখিমপুর জেলার সালকাতনি চা-বাগানে জন্ম। কেন্দ্রীয় সবকাবেব দূবসঞ্চাব বিভাগে কর্মরত। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকে পাথব ছুঁড়ে মারো' এবং 'যুবকের হাত সাবারাত পাপ ছোঁয় নি'।

দীপক দেব ঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট'এ জন্ম। পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – 'সালোকসংশ্লেষ', 'কামাবশালা', 'বক্তমাংসের শবীব', 'পবিত্যক্ত প্রদেশ'। সম্পাদিত গ্রন্থ – 'এখন বাল্মিকী'। প্রবজ্যা শর্মিষ্ঠা মিত্র স্মৃতি পুরস্কার পেযেছেন ১৯৯৭ সালে।

দুলাল ঘোষ ঃ জন্ম ৫ এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কেন্দ্রীয সবকাবেব এ. জি অফিসে কর্মবত। ১৯৭৪-এ প্রথম গল্প রচনা করেন। স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন কবেছেন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'হেই সঞ্জীব'। গৌহাটি থেকে নির্মল চন্দ্র স্মৃতি 'একা এবং কয়েকজন' সাহিত্য সম্মান লাভ করেছেন।

দেবব্রত দেব ঃ পঞ্চাশেব শেষভাগে জন্ম আগরতলায। পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী। এ যাবৎ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'স্বতন্ত্র সূর্যোদয়' এবং 'মাটি ও অন্যান্য গল্প'। 'মুখ' নামক গল্প পত্রিকা সম্পাদনা করছেন চুরাশি সাল থেকে। কলকাতাব 'সমতট কমলা ঘোষ স্মৃতি গল্প-নাটক পুবস্কার ১৯৯৬' এবং গৌহাটির 'একা এবং কয়েকজন' সাহিত্য সম্মান ১৯৯৬' লাভ করেছেন।

দেবীপ্রসাদ সিংহ ঃ পঞ্চাশের গোড়ায় কাছাড় জেলায জন্ম। উত্তরপূর্ব ভারতেব একজন শক্তিমান গল্পকার। ইতিমধ্যে একটি গল্প সংকলন 'রূপকথার প্রত্যাবর্তন' প্রকাশিত হয়েছে। গৌহাটি নিবাসী এবং ব্যাঙ্ক কর্মী। গৌহাটি থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'একা এবং কয়েকজন' সম্পাদনা করেছেন ইতিপূর্বে।

বদরুজ্জামান চৌধুরী ঃ ১ জুলাই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অসমের করিমগঞ্জ জেলাব মালুয়া গ্রামে জন্ম। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। আজ পর্যন্ত তার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও 'বরাক পারের গল্প', 'বরাক উপত্যকার গল্প' এবং 'উত্তর পূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প' এই তিনটি সংকলনে তাব গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ৯২-৯৩-এর স্মরণিকাটি সম্পাদনা করেছেন। বহু পুরস্কার লাভ করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য – সোনার কাছার পুরস্কার '৮৪, গণতান্ত্রিক লেখক সংস্থা, হাইলাকান্দি, উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ পত্রিকা কর্তৃক মানপত্র এবং সংবর্ধনা প্রদান।

মলয়কান্তি দে ঃ ১১ মার্চ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটের জিন্দা-বাজারে জন্ম।

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী এই গল্পকারের কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

মিথিলেশ ভট্টাচার্য : চল্লিশেব মাঝামাঝি জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ বীগোষেণা গ্রামে। এ যাবৎ কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। শিলচর থেকে প্রকাশিত 'শতক্রতু', 'পরম্পরা', 'ডাউক' ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী।

রণবীর পুরকায়স্থ : পঞ্চাশের প্রথম পর্বে জন্ম। কাছাড়ের করিমগঞ্জে শিক্ষা ও বেড়ে ওঠা। পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই শক্তিমান গল্পকার বর্তমানে কলকাতা নিবাসী।

শ্যামল ভট্টাচার্য : ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দেব ১৩ জুলাই আগবতলায় জন্ম। পেশা সরকাবি চাকরি। রাজস্থান থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা 'সূর্যনগরী' (১৯৮৩-৮৫)'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ -- 'চিলতে দাগ', 'ফুলমতির বসন্তকাল' এবং 'বুখারি'। হিন্দী, পাঞ্জাবী এবং রাজস্থানী ভাষায় বচিত বাইশটি ছোট গল্প এবং অন্যূন ত্রিশটি কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছেন।

সমরজিৎ সিংহ : ১২ জানুয়ারী ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। ত্রিপুবা সরকাবের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরে একটি সরকাবী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কর্মবত। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ – 'মাধবীলতা', 'উৎসর্গ পৃষ্ঠা' এবং 'কৃষ্ণতরল'। প্রকাশিত উপন্যাস 'বিপন্ন'।

সুব্রত কুমার রায় : ৫ জুলাই ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অসমেব কবিমগঞ্জে জন্ম। পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'মৌন যোগাযোগ'। সাহিত্য পত্রিকা 'অক্ষর' এবং চলচ্চিত্র পত্রিকা ঋত্বিজের প্রাক্তন সম্পাদক। বর্তমানে সম্পাদনা করছেন সাহিত্য পত্রিকা 'লালনমঞ্চ'।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : জন্ম ১৯৪৩। বগুড়ায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব অধ্যাপক হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, ঢাকা-য দীর্ঘদিন অধ্যাপনা কবেছেন। উপন্যাস : 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোযাবনামা' আধুনিক বাংলা গদ্যেব শ্রেষ্ঠতম উদাহরণেব নাম। গল্পগ্রন্থ : 'খোযারি', 'দুধভাতে উৎখাত' 'দোজখের ওম', 'অন্যঘবে অন্য স্বর' ইত্যাদি। বাংলা একাডেমী পুবস্কাব ও আনন্দ পুরস্কার প্রাপক। মৃত্যু ১৯৯৬।

আলাউদ্দিন আল আজাদ : জন্ম ১৯৩২। নরসিন্ধি। অধ্যাপক বাংলা বিভাগ – চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। উপন্যাস : তেইশ নম্বব তৈলচিত্র, শীতেব শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, কর্ণফুলি, শ্যামল ছাযাব সংবাদ – ইত্যাদি। কবিতা গ্রন্থ : মানচিত্র, আমি যখন আসবো, সাঁজঘর, গাওচিল। গল্পগ্রন্থ : জেগে আছি, ধানকন্যা, মায়াবী তস্কর ও অন্যান্য। পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুবস্কাব। একুশেব পদক।

বসির আল হেলাল : জন্ম : ১৯৩৬। মুর্শিদাবাদ। ভূতপূর্ব পবিচালক বাংলা একাডেমী। গল্প গ্রন্থ : স্বপ্নের কুশিলব, প্রথম কৃষ্ণচূড়া, বিপবীত মানুষ ইত্যাদি। উপন্যাস : কালো ইলিশ, গীতাকুমাবী, শেষ পণপত্র। নাটক : সাগরেব সিঁড়ি। বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপক।

বিপ্রদাস বড়ুয়া : জন্ম : ১৯৪০। চট্টগ্রাম। সহকারী পবিচালক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। প্রকাশিত গ্রন্থ ৫০টি। গল্পগ্রন্থ : নদীব নাম গণতন্ত্র, সাদা কফিন, আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি, যাদুমানিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য। বাংলা একাডেমী পুবস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার পেযেছেন।

হাসান আজিজুল হক : জন্ম : ১৯৩৯। বীবভূম, পশ্চিমবঙ্গ। অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। গল্পগ্রন্থ : সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্যে, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গোত্রহীন, পাতালে হাসপাতালে, আমরা অপেক্ষায় থেকেছি ও অন্যান্য। বাংলা একাডেমী পুবস্কার. আলাউল সাহিত্য পুরস্কার. ফিলিপ্স পুরস্কার প্রাপক।

মঞ্জু সরকার : জন্ম ১৩৬০ বাংলা। রংপুর। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের প্রাক্তন কর্মকর্তা। ছোট গল্প : অবিনাশী আয়োজন, মৃত্যুবান, পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প, উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা। উপন্যাস :

তামস, নগ্ন আগন্তুক, প্রতিমা উপাখ্যান ইত্যাদি। ফিলিপ্‌স পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার প্রাপক।

রাহাত খান : জন্ম ১৯৪০। কিশোরগঞ্জ। পেশা সাংবাদিকতা। দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক। গল্পগ্রন্থ : ভালমন্দের টাকা, অন্তহীন যাত্রা, নির্বাচিত গল্প ইত্যাদি। উপন্যাস : হে অনন্তের পাখী, শহর, এক প্রিয়দর্শিনী, কয়েকজন এবং অন্যান্য। বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশের পদক পেয়েছেন।

রসীদ হায়দার : জন্ম ১৯৪১। পাবনা। পরিচালক জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। গল্পগ্রন্থ : মেঘেদের ঘরবাড়ি, উত্তরকাল। উপন্যাস : খাঁচায়, অন্ধ কথামালা, স্বাদ আহ্লাদ। নাটক : তৈল সংকট। বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন।

সেলিনা হোসেন : জন্ম ১৯৪৭। রাজশাহী। উপপরিচালক বাংলা একাডেমী। উপন্যাস : জলোচ্ছ্বাস, হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, মগ্ন চৈতন্যে শিষ, যাপিত জীবন, নীল ময়ূরের যৌবন, চাঁদবেনে, পোকামাকড়ের ঘরবসতি এবং অন্যান্য। গল্পগ্রন্থ : উৎস থেকে নিরন্তর, খোল করতাল, পরজন্ম ইত্যাদি। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ফিলিপ্‌স পুরস্কার, অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন।

শওকত ওসমান : জন্ম ১৯১৭। হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। পেশা অধ্যাপনা। বর্তমান অবসর জীবন এবং নিরবচ্ছিন্ন লেখালেখি। উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ : বনি আজম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি, রাহা উপাখ্যান, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্যে, পতঙ্গ পিঞ্জর, রাজসাক্ষী, জন্ম যদি তব বঙ্গে। লাভ করেছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আনন্দমঠ সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, মুক্তধারা পুরস্কার ইত্যাদি।

সুশান্ত মজুমদার : জন্ম ১৯৫৪। বাগেরহাট। পেশা সাংবাদিকতা। গল্পগ্রন্থ : ছেঁড়াখোড়া জমি, রাজা আহমনি বাদ্য বাজাও। উপন্যাস : গরম হাত।

সৈয়দ শামসুল হক : জন্ম ১৯৩৫। রংপুর। পেশা লেখালেখি, সাংবাদিকতা। গল্পগ্রন্থ : তাস, শীত বিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, প্রেমের গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি। উপন্যাস : খেলারাম খেলে যা, এক মহিলার ছবি, অনুপম দিন, সীমানা ছাড়িয়ে, নীল দংশন, ছায়াপথ, স্বপ্ন সংক্রান্ত, নিষিদ্ধ লোবান ইত্যাদি। নাটক : পাওয়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, গণনায়ক, নূরুল দিনের সারাজীবন ইত্যাদি। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আদমজী পুরস্কাব, আলাউল পুরস্কার, কবিতালাপ পুরস্কার, একুশে পদক, পদাবলী পুরস্কার প্রাপক।

কায়েস আহমেদ : জন্মেছেন ১৯৪৮ সালে হুগলি জেলার তাজপুর গ্রামে। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। বাংলাদেশে যে কয়জন গল্পকার মানুষের জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন – কায়েস আহমেদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অন্যান্য বই 'অন্ধ তীরন্দাজ', 'নির্বাসিত একজন', 'দিনযাপন' ইত্যাদি।

মণীশ রায় : জন্ম ১৯৬৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ মাস্টার্স। বর্তমানে ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গল্পসংখ্যা হবে প্রায় ৮০টি। এখনও মণীশ রায়ের কোন গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পায়নি।